

বনফুল

রচনাবলী ১৪

বনফুল রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬০

সম্পাদনায় :
সরোজমোহন মিত্র
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :
দুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সন্দীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ রূপায়ণে :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

উপন্যাস

অগ্নীশ্বর

উৎসর্গ

অগ্রজ কথাশিল্পী, স্নেহময় সুরসিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

ভাগলপুর — **বনফুল**

৪।৩।৫৯

ভূমিকা

'অগ্নীশ্বর' গল্পটি খণ্ডিত ভাবে গত পূজাসংখ্যা 'বেতার জগতে' বাহির হইয়াছিল। সম্পূর্ণ গল্পটি এই গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হইল।

এই গল্পে যেখানে কথোপকথন ইংরেজিতে হইয়াছে সেখানে আমি অনেক জায়গায় ইচ্ছা করিয়াই শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করিয়াছি। ইহা ইচ্ছাকৃত 'গুরু-চণ্ডালী'।

ভাগলপুর — **বনফুল**

৪।৩।৫৯

ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় সার্থকনামা ব্যক্তি। জানিনা এখন তাঁহার চেহারা কেমন আছে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি দেখিতে মূর্তিমান অগ্নিশিখার মতোই ছিলেন, যেমন উজ্জ্বল তেমনি প্রখর। কিন্তু অগ্নির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য ওইখানেই শেষ হইয়াছে। তাঁহার বাহিরের খোলসটার অন্তরালে, তাঁহার মর্মভেদী ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ তীব্রতার নেপথ্যে যে স্নেহাতুর আদর্শবাদী ন্যায়পরায়ণ পরার্থপর সত্তাটি ছিল লেলিহান অগ্নি-শিখার তাহা থাকে না। তাঁহার এই সত্তাটি কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই নয়নগোচর হইত না। তিনি যখন কাহারও হৃদয় বা মস্তক লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তখন সে বেচারীর মনে রাগ ছাড়া অন্য কোন ভাবোদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। তিনি অন্য ভাবোদ্রেক করিতে চাহিতেনও না। লোকে যেমন মশা, ছার-পোকা, সাপ, ব্যাঙকে ঘর হইতে তাড়ায়, তিনি তেমনি অধিকাংশ লোককে নিজের সান্নিধ্য হইতে বিতাড়িত করিতেন। কোন প্রকার বোকামি, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, ন্যাকামি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায়ই বলিতেন—বাইবেলে পড়েছি মানুষের মুখে একটা ডিভাইন লুক (Divine look) আছে, কিন্তু আমি তো বোভাইন লুক (Bovine look) ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। তার সঙ্গে পেজোমিরও মিশেল আছে। সব বোকা বদমাইসের দল।

এঁর সঙ্গে আমার প্রথম সংস্পর্শ ছাত্র-জীবনে। ইনি তখন ছিলেন রেলের মেডিকেল অফিসার। সে যুগে গভর্ণমেণ্ট অফিসারই রেলের মেডিকেল অফিসাররূপে কাজ করিতেন।

অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় কাজে যোগদান করিয়াই এমন একটা কাণ্ড করিলেন যে রেলের বাবুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। তিনি আসিয়াই শুনিলেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী মেডিকেল অফিসার অন্নদা ঘোষালের সহিত রেলের বাবুরা নাকি বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষাল ভালো-মানুষ লোক ছিলেন, সকলকে বিনাপয়সায় দেখিতেন, বিনাপয়সায় সার্টিফিকেটও দিতেন। যে যখন ডাকিত তখনই ছুটিতেন। কিন্তু সাধারণত যাহা হয় তাহাই হইল। সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকেই অসন্তুষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নামে ওপরওলার কাছে দরখাস্ত গেল, তিনি যে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন তাহাও প্রমাণিত হইল। ডাক্তার ঘোষাল হতমান হইয়া বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার সার্ভিস-রেকর্ডে কলঙ্কের ছাপ পড়িল। অগ্নীশ্বর যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ডাক্তার ঘোষাল তখন সেখানে হাউস-সার্জন ছিলেন। তাই তাঁহাকে তিনি মাস্টার মশাই বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহার উদার স্বভাবের জন্য ভক্তিও করিতেন। চার্জ লইবার সময় ডাক্তার ঘোষালের মুখে অগ্নীশ্বর সমস্ত শুনিলেন এবং তাহার চোখে জল দেখিয়া বিচলিতও হইলেন। ঘোষাল ধরা-গলায় বলিয়া গেলেন,

"বিশ্বাস কর, ওদের ভালর জন্যেই এসব করেছিলাম আমি। ওরা শেষটা যে আমাকে এমন দাগা দেবে, তা আমি ভাবতে পারিনি।"

পরদিন সকালে অগ্নীশ্বর আপিসে গিয়া দেখিলেন যে, একটি স্থূলকায়, বেঁটে, কালো লোক একটি চেয়ারে গদিয়ান হইয়া বসিয়া আছে।

"নমস্কার, আপনিই নতুন ডাক্তারবাবু নাকি—"

"হ্যাঁ। আপনি কে—"

"আমার নাম সর্বেশ্বর সান্যাল। আমি এখানকার ডি-টি-এস আফিসের বড়বাবু—"

"আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার—"

"আজ তিনদিন থেকে আমার ছোট্ট মেয়েটার হুপিং কাশি হয়েছে—"

"আপনি এখানে কেন। বাইরে বারান্দায় ওই কাঠের রেলিংটার ওপারে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর ডাক্তার লতিফ আপনার মেয়ের কথা শুনে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানে রোগীদের বসবার জায়গা নয়, বাইরে যান—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ধ্বনিত হইল যে সর্বেশ্বরবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

"আমরা এখানেই তো বরাবর বসে এসেছি।"

"আর বসতে পাবেন না।"

"কারণটা জানতে পারি কি—"

"কারণ আপনি চেরিটেব্‌ল হাসপাতালে ওষুধ ভিক্ষে করতে এসেছেন। ভিকিরিদের কেউ চেয়ারে বসতে দেয় না। বসতে দেবার নিয়ম নেই। ওই দেখুন, লেবেল লটকানো রয়েছে—ফর আউটডোর পেশেণ্টস—ওইখানে যান।"

"আপনি কোন প্রেসক্রিপশেন দেবেন না?"

"এখন দেব না। ডাক্তার লতিফের ওষুধে যদি না সারে আর তিনি যদি আমাকে দেখতে বলেন তখন দেখব, তার আগে নয়।"

অগ্নীশ্বর টং করিয়া টেবিলের ঘণ্টা বাজাইলেন। চাপরাশি প্রবেশ করিল।

"বাবুকে আউটডোরে নিয়ে যাও। আমার বিনা হুকুমে এখানে কাউকে ঢুকতে দেবে না। যদি দাও, চাকরি যাবে।"

চাকরির প্রথম দিনেই তিনি যে চাবুক হাঁকড়াইলেন, তাহা সেখানকার রেলওয়ে কলোনীর সকলের পিঠে জ্বালা ধরাইয়া দিল। কিন্তু তিনি চাবুক সম্বরণ করিলেন না, সপাসপ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটিল সেইদিনই সন্ধ্যায়।

"ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটার সাতদিন থেকে জ্বর ছাড়ছে না, যদি—"

"আজ তো হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকাল আটটায় ডাক্তার লতিফের কাছে যাবেন—"

"আমি আপনাকে 'কল' দিতে এসেছি।"

"আমি ষোল টাকার কম ফি নিই না, সেটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। আর টাকাটা অগ্রিম জমা করতে হবে।"

ভদ্রলোক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অগ্নীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অগ্নীশ্বর অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি অন্নদা ঘোষাল নই, আমি অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে। আমার নিয়মকানুন অন্য রকম—"

ভদ্রলোকটি সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি ডাক্তার, না পিশাচ—"

"পিশাচ।"

"বেশ, এই নিন ষোল টাকা। চলুন—"

অগ্নীশ্বর তাহার বাসায় গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ছেলেটিকে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া চলিয়া আসিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই ভদ্রলোকটি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনি রুগীর বিছানায় আপনার ফি'টা ফেলে এসেছেন সার।"

"না, আমি ফেলে আসিনি। ও আর কেউ ফেলে গেছে বোধহয়—"

ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন। যে জ্বর সাতদিনে ছাড়ে নাই, তাহা তাহার পর দিনই ছাড়িয়া গেল।

তৃতীয় চাবুকটি পড়িল বীরু মিত্তিরের পিঠে। তিনিও অগ্নীশ্বরকে কল দিয়াছিলেন স্ত্রীর জ্বরের জন্য। অগ্নীশ্বর তাঁহাকে একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলেন, কুইনিন মিকশ্চার। ছয় দাগ। তিন দাগ খাইয়াই জ্বর ছাড়িয়া গেল। হোমিওপ্যাথীতে বিশ্বাসী বীরু মিত্তির আবার অগ্নীশ্বরের কাছে গেলেন।

"সার, তিন দাগ খেয়েই জ্বরটা ছেড়ে গেছে। বাকী তিন দাগ খাওয়াব কি? শুনেছি কুইনিন ওষুধটা একটু তীব্র—"

অগ্নীশ্বর একটা বই পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আপনার গালে যদি ঠাস ঠাস করে ছ'টা চড় মারা দরকার হয় তিন চড়ে শানাবে কি? ছ'টা চড়ই মারতে হবে। তিন দাগ ওষুধে হলে আমি ছ'দাগ দিয়েছি কেন—"

অগ্নীশ্বর চোখ পাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বীরু মিত্তির অবিলম্বে সরিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ যে ঘটনাটি পল্লবিত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সেটি ঘটিয়াছিল প্রায় মাসখানেক পরে।

স্থানীয় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত রেলওয়ে কোম্পানীতে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। গোঁফ-জোড়া বেশ পুষ্ট, বুকের ছাতি বেশ চওড়া, হাত-পায়ের পেশীগুলি বেশ সমৃদ্ধ। চোখ দুটি বেশ বড় বড় এবং লাল। দেহের বর্ণ মসীনিন্দিত। তাঁহার গর্ব যে তিনি যার-তার সহিত মেশেন না। আলাপ করিবার মতো লোকই নাই শহরে, এই তাঁহার ধারণা। মাঝে মাঝে ফিরিঙ্গি ডি-টি-এস মিস্টার স্কটের বাড়িতেই যান, যখন

সময় পান। ডাক্তার অন্নদা ঘোষালকে তিনি মানুষের মধ্যেই গণ্য করিতেন না। বলিতেন, উনি হচ্ছেন কাদার গোঁজ। যে দিকে টান সেই দিকেই হেলিয়া থাকিবে। যদিও অগ্নীশ্বরের কড়া ব্যবহারে সকলে প্রথমটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু অগ্নীশ্বর নিজের ব্যক্তিত্ব, চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং চরিত্রের জোরে সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, মাখনের তালের ভিতর ছুরির মতো। তাঁহাকে অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তিনি কড়া লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু ডাক্তারও অসম্ভব রকম ভাল। তাছাড়া, কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল তিনি লেখকও। ছবিও আঁকিতে পারেন। ছদ্মনামে সে-সব লেখা আর ছবি ছাপাও হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আশঙ্কা-সম্মান-কৌতূহল-মিশ্রিত একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন তিনি নিজের চারিদিকে। তিনি কখনও কাহারও বাড়িতে যাইতেন না। অবসর সময়ে নিজের ড্রইংরুমের ইজিচেয়ারে বসিয়া থাকিতেন, আর পা দোলাইতেন, মুখে চুরুট, হাতে বই।

ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত একদিন স্থির করিলেন, তিনি অগ্নীশ্বর ডাক্তারের উপর অনুগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহার বাড়ি গিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিয়া আপ্যায়িত করিবেন তাঁহাকে। গেলেন একদিন। অগ্নীশ্বরের সহিত তাঁহার সাধারণ ভাবে আলাপ ছিল, একজন অফিসারের সঙ্গে আর একজন অফিসারের যেমন থাকে।

"গুড মর্নিং ডাক্তারবাবু, কেমন আছেন—"

"প্রবলভাবে ভাল আছি। 'ঘরে-বাইরে' পড়ে শেষ করলুম একটু আগে—"

"ঘরে-বাইরে? সেটা আবার কি!"

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, ওই যিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতন করেছেন তিনিই তো—"

"হ্যাঁ, তিনি বইও লেখেন।"

"ও।"

ইহার পর রক্ষিত মহাশয় যে-সব গল্প ফাঁদিলেন তাহা ইঞ্জিনিয়ারিং গল্প এবং সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে তাঁহার 'আমিত্ব' কলকল-নিনাদে আত্মজাহির করিতে লাগিল। তিনি কোথায় কোথায় ব্রিজ ডিজাইন করিয়াছেন, কোন কোন বিলাতী-ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনিয়ারকে 'থ' করিয়া দিয়াছেন, তিনি না থাকিলে রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট কিভাবে অচল হইয়া যাইত—এইসব গল্প।

হঠাৎ অগ্নীশ্বর বলিলেন, "দেখুন দেখুন, কেমন একটা অদ্ভুত পাখী। ল্যাজটা ঠিক সাপের মতো—"

"কই—"

"ওই যে তেঁতুলগাছের ডালটায় বসে আছে।"

রক্ষিত মহাশয় ভালো করিয়া দেখিবার জন্য জানলার ধারে গেলেন এবং ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"কই মশায়, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"পাবেন না, চলে আসুন।"

"পাব না কেন। দেখি দাঁড়ান, কোন ডালটায়—"

"ওরকম পাখী নেই ওখানে। চলে আসুন। আমি আপনার বাক্যস্রোতে 'ড্যাম' দিয়ে দিলুম একটা। কথার তোড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আসুন, চা খান—"

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আনিয়াছিল। অগ্নীশ্বর নিজেই চা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। গল্প আর জমিল না।

"আজ উঠি। টেবিলের উপর ও বইটা কি?"

"ঘরে-বাইরে।"

"ও, সেই যেটার কথা বলছিলেন। নিয়ে যেতে পারি কি?"

"যান।"

"আপনার নানারকম বইটই কেনার বাতিক আছে, না?"

"তা আছে। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গ তো জোটে না বড় একটা। বইটই নিয়েই থাকি।"

রক্ষিত মহাশয় দুই দিন পরেই 'ঘরে-বাইরে'খানি হাতে লইয়া আবার দেখা দিলেন।

"কি একটা বাজে বই দিয়েছেন মশাই। যাকে বলে ইম্মরাল, এ একেবারে তাই। আমাদের ঝক্সু সর্দার কিছুদিন আগে একটা কুলির বউকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল, এ যে দেখছি সেই গল্পই। আরে ছি ছি ছি। একটা ভালো বই দিন এবার।"

"ভালো বই? ভেবে দেখি দাঁড়ান, ভালো বই কি আছে আমার? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে একখানা—"

অগ্নীশ্বর ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং একটা মোটা পাঁজি বাহির করিয়া আনিলেন।

"এইটে নিয়ে যান, অনেক ভালো ভালো কথা আছে এতে, ভালো লাগবে আপনার—"

যোগেশ রক্ষিতের চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

"আমাকে ঠাট্টা করছেন?"

"পাগল! অতটা বেরসিক আমি নই। হিজড়ের সঙ্গে প্রেম করা যায় নাকি!"

অগ্নীশ্বর আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেইদিন হইতে যোগেশ রক্ষিতও তাঁহার শত্রু হইয়া গেল। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইত তাঁহাকে। বাড়িতে আসন্নপ্রসবা কন্যা, স্ত্রীর হাঁপানি, নিজেরও হাই ব্লাডপ্রেসার, অগ্নীশ্বরকে তিনি পুরাপুরি বয়কট করিতে পারিলেন না। আর যাই হোক, লোকটা ডাক্তার ভালো। তাঁহার কচি মেয়েটা কাসিয়া কাসিয়া সারা হইতেছিল, শহরের কত ডাক্তারের কত ওষুধই খাওয়ানো হইল, কিছুতেই কিছু হয় নাই।

অগ্নীশ্বরকে ডাকা হইল, তিনি বলিলেন, "নাকে একটু করে তেল বা লিকুইড্ প্যারাফিন দিন তাহলেই সেরে যাবে। কোন ওষুধ খাওয়াতে হবে না।"

তাই করা হইল এবং মেয়েটা সারিয়া গেল। সুতরাং অগ্নীশ্বরের সঙ্গে খোলাখুলি-ভাবে ঝগড়া তিনি করিতে পারিলেন না। কিন্তু হৃদ্যতা'টা আর রহিল না। অগ্নীশ্বর কাহারও সহিত হৃদ্যতা করিতে চাহিতেনও না।

পঞ্চম যে ঘটনাটি ঘটিল তাহা আরও চাঞ্চল্যজনক! সাহেবমহল পর্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল।

ডি-টি-এস মিস্টার স্কটের স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। অগ্নীশ্বর একদিন গিয়া তাঁহাকে যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া উপদেশ প্রভৃতি দিয়া আসিয়াছিলেন।

দিন দুই পরে এক বেয়ারা সাহেবের এক চিঠি লইয়া আসিল।

Doctor, come immediately. My wife is not feeling well.

একটা প্লীজ পর্যন্ত লেখে নাই লোকটা।

অগ্নীশ্বর গেলেন না। তাঁহার অধীনে আবদুল লতিফ নামে যে সাব-এসিস্টেণ্ট সার্জন ছিলেন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি গিয়ে দেখে আসুন ব্যাপারটা কী। যদি দরকার হয় আমি যাব। যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস কেসটা রেডি করতে বলেছিলাম সেটা রেডি হয়েছে?"

"আজ্ঞে হাঁ—"

"ওটা এখনি অপারেশন করব। সব ঠিক করতে বলুন। আর আপনি গিয়ে চট করে দেখে আসুন মিসেস স্কটের কি হয়েছে—"

ডাক্তার আবদুল লতিফ প্রবীণ ব্যক্তি, সেকেলে মুসলমান। লম্বা দাড়ি, চুস্ত পাজামা-আচকান-পরা, মাথায় লাল রঙের টিকি-ওলা মুসলমানী টুপি। পান জর্দা খান, দাঁতগুলি কালো। অতিশয় সজ্জন।

তিনি অগ্নীশ্বরের আদেশ শুনিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'হুজুর, আমাকে উনি ডাকেননি, আপনাকে ডেকেছেন। সাহেবটা একটু বাঘা গোছের। আমি গেলে কিছু বলবে না তো—"

"যদি বলে তখন ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি গিয়ে বলুন, আমি একটা অপারেশন করছি, এখন যাবার উপায় নেই। তেমন সিরিয়াস যদি কিছু হয়ে থাকে, যাব—"

আধঘণ্টা পরে আবদুল লতিফ ফিরিয়া আসিলেন। মুখ থমথম করিতেছে।

"আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়িয়ে দিলে হুজুর। এমন অপমানিত আমি জীবনে হইনি। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম—"

আবদুল লতিফের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

"**I am extremely sorry, Dr. Latif.** লোকটা যে এরকম বর্বর তা আন্দাজ করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।"

ডাক্তার লতিফের দুই হাত ধরিয়া তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একটু পরেই মিস্টার স্কটের নিকট হইতে আর একটি পত্র আসিল। চিঠির সুরটি একটু গরম। চিঠির বাংলা মর্ম এই—

"আমি চাই তুমি আসিয়া আমার স্ত্রীকে দেখ। ওই জরদ্গব লতিফকে দেখাইবার ইচ্ছা নাই। তুমি অবিলম্বে চলিয়া এস।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন।

"সরি, আমার এখন যাইবার উপায় নাই। একটি অপারেশন লইয়া ব্যস্ত আছি। যদি আমার দেখা নিতান্তই প্রয়োজন মনে করেন, মিসেস স্কটকে এখানেই পাঠাইয়া দিবেন। আমি একটি নার্স, চারটি বেয়ারা এবং একটি স্ট্রেচার পাঠাইয়া দিতেছি।"

বলা বাহুল্য, মিসেস স্কট স্ট্রেচারবাহিত হইয়া আসিলেন না। তাঁহার পেটের এক-ধারটা সামান্য কুন্ কুন্ করিতেছিল মাত্র। স্ট্রেচার যখন গেল তখন তাহাও কমিয়া গিয়াছিল।

ডি-টি-এস কিন্তু চটিয়া আগুন হইয়া রহিলেন। একটা নেটিভ ডাক্তার, হ'ল হউন না তিনি মেডিকেল অফিসার, তাঁহার এতবড় স্পর্ধা! হাসপাতাল কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন। একটি মিটিংয়ে তিনি অগ্নীশ্বরকে বলিলেন, "দেখ ডাক্তার, তোমার বিরুদ্ধে অনেক নালিশ শুনিতেছি। এমন কি, আমার সহিতও তুমি যে ব্যবহার করিয়াছ তাহা ভদ্রজনোচিত নহে, তুমি যদি—"

অগ্নীশ্বর তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনারা সুসভ্য জাতির প্রতিভূ। আপনাদের ব্যবহার, পোশাক, ভাষা সব আমরা নকল করি। সেদিন আপনি আপনার পিতার বয়সী ডাক্তার লতিফের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা কি ভদ্রজনোচিত?"

বলিয়াই অগ্নীশ্বর উঠিয়া যাইতেছিলেন, সাহেব বলিলেন, "দেখ ডাক্তার মুখার্জি, আমিই এই রেলওয়ে কোম্পানীর দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, আমি যদি ইচ্ছা করি, তোমাকে খুব বিপদে ফেলিতে পারি, একথাটাও ভুলিও না।"

"না, ভুলিব না, আমার স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ নয়।"

সাতদিন পরেই এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিল। ওই জংশনটি হইতে প্রত্যহ কুড়িটি গাড়ি ছাড়িত। একদিন দেখা গেল, একটি গাড়িও ছাড়িবার আশা নাই। অগ্নীশ্বর সমস্ত ড্রাইভারগুলিকে সিক্ সার্টিফিকেট দিয়াছেন। একটিও বাড়তি ড্রাইভার নাই। ডি-টি-এস আপিসেও এত অধিকসংখ্যক কেরানী সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে আপিস বন্ধ হইবার উপক্রম।

মিস্টার স্কট অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের নিকট ছুটিয়া আসিলেন।

"এ কি কাণ্ড ডাক্তার মুখার্জি। এতগুলি লোক একসঙ্গে 'সিক্' হইল কি করিয়া?"

"চট করিয়া তো ইহার জবাব দিতে পারি না, বইটই ঘাঁটিয়া দেখিতে হইবে। তবে

এদেশে ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা এইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকেই হয়। গোটা দুই অ্যাপেনডিক্স্, গোটা ছয়েক হেপাটাইটিস, কয়েকটা প্লুরিসিও আছে—"

"উহারা কি কাজ করিতে অক্ষম—?"

"আমাদের শাস্ত্রানুসারে উহাদের শুইয়া থাকা উচিত। কিন্তু আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আপনি হুকুম করিলে হয়তো উহারা কাজে যোগ দিবে। তবে যদি কেহ মরিয়া যায় তাহার দায়িত্ব আপনার, আমার নয়। কারণ, আমার মতে উহাদের এখন শুইয়া থাকা উচিত, আমি এখন উহাদের একজনকেও ফিট্ সার্টিফিকেট দিব না।"

মিস্টার স্কট অনন্যোপায় হইয়া অগ্নীশ্বরের চাকরির যিনি হর্তা-কর্তা-বিধাতা সেই আই-জি'কে টেলিগ্রাম করিলেন। আই-জি আসিয়া অগ্নীশ্বরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যালো, আগ্নী, তুমি এখানে! হোয়াট্স দি রাউ অ্যাবাউট ?"

অগ্নীশ্বর যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন এই আই-জি ছিলেন সেখানকার অধ্যাপক। প্রায় সব বিষয়ে স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত অগ্নীশ্বরকে সেকালের কোন অধ্যাপকই ভোলেন নাই। এই আই-জি তো তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি !"

"ব্যাপার কিছুই নয়। আমি যাদের সিক্ মনে করেছি, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। এর জন্যেই আমি মাইনে পাই। রেলগাড়ি চলবে কি না, ডি-টি-এস আপিস চলবে কি না, দ্যাট ইজ্ নট্ মাই কনসার্ন, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয় আমার—!"

আই-জি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। অগ্নীশ্বরকে তিনি চিনিতেন।

"এ সব তো শুনেছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি—"

অগ্নীশ্বর এবার হাসিয়া ফেলিলেন, "সেটা তো সার কথায় বলা যাবে না। এই রেলওয়ে কলোনীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তার ভদ্রতা-জ্ঞানের সমালোচনা আমার মুখে মানাবেও না।"

"কি হয়েছে বল না। স্পীক্ দি ট্রুথ—"

তখন অগ্নীশ্বর তাঁহাকে আগাগোড়া সব বলিলেন। সেকালে সাহেবদের মধ্যেও ভাল লোক অনেক ছিল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঠিক করেছ তুমি !"

লিখিয়া গেলেন ইনফ্লুয়েঞ্জা আর ম্যালেরিয়া এপিডেমিকের জন্যই এতগুলি লোক একসঙ্গে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। রেলের কাজ চালাইবার জন্য বাহির হইতে লোক আনানো হউক। যাইবার পূর্বে তিনি ডি-টি-এস মিস্টার স্কটকে আড়ালে বলিয়া গেলেন—"অগ্নি খাঁটি ইস্পাতের তৈরি শাণিত তরবারি। উহাকে যদি ঠিক মতো ব্যবহার করিতে পার অনেক উপকার পাইবে। বোকার মতো নাড়াচাড়া করিলে কিন্তু রক্তারক্তি হইবার সম্ভাবনা।"

এই ব্যাপারে অগ্নীশ্বরের খাতির আরও বাড়িয়া গেল। অমন দুঁদে স্কটকে নাজেহাল করিয়াছে, একি সোজা লোক!

যে স্টেশনে অগ্নীশ্বর মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন, তাহার দুই স্টেশন পরে এক গ্রামে আমি থাকিতাম। আমি তখন স্কুলে পড়ি। কিন্তু অগ্নীশ্বরের কীর্তিকলাপ আমার অবিদিত ছিল না। তাঁহার চতুর্দিকে যে মহিমা-দ্যুতি বিকিরিত হইতেছিল, তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতিটি গল্প পল্লবিত হইয়া আমাদের চিত্তকে রঞ্জিত করিয়া দিত।

এই লোকটিকে প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগ একদিন আমার ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়িতে আমাদের দূর সম্পর্কীয়া একটি ভগ্নী আসিয়াছিলেন, তিনি সাংঘাতিক নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। স্থানীয় ডাক্তার কুলদাবাবুর চিকিৎসাসত্ত্বেও রোগ বাড়িতে লাগিল। শেষে স্থির হইল ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে ডাকা হোক। আমার উপর ভার পড়িল তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার। আমার বয়স তখন ষোল বছর, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে বেকায় বসিয়া আছি। কুলদাবাবুর পত্র লইয়া গেলাম তাঁহার কাছে। তাঁহার চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সত্যিই এ যে জলন্ত অগ্নি।

পত্র পড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যাব চারটের ট্রেনে। তুমি খেয়ে এসেছ?"

"জলখাবার খেয়ে এসেছি। খেয়ে নেব এখানে কোথাও হোটেলে—"

"হোটেলে কেন। আমার এখানে খেতে আপত্তি আছে তোমার? ও, আমি মুরগি খাই, সেটা টের পেয়ে গেছ বুঝি—"

কি বলিব, কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিলাম।

"মুরগি খেয়েছ এর আগে?"

"না।"

"খেতে আপত্তি আছে?"

"আছে।"

"বিপদে ফেললে দেখছি। মাছ খাও তো?"

"খাই।"

"বেশ, মাছের ঝোল ভাতেরই ব্যবস্থা হবে।"

খাইতে বসিয়া অনুভব করিলাম, আমার জন্য মৈথীল পাচক দিয়া আলাদা রান্না করানো হইয়াছে। তিনি নিজে খান বাবুর্চির হাতে, সাহেবী খানা। তখনও বিবাহ করেন নাই, বাড়িতে স্ত্রীলোক নাই। বাবুর্চি আর খানসামার সংসার। উঠানের একধারে দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড খাঁচায় কতকগুলো মুরগি।

আমি সমস্ত দিন ছিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত কথাবার্তা বিশেষ হয় নাই। তিনি হাসপাতালেই প্রায় সর্বক্ষণ ছিলেন। পড়িবার জন্য আমাকে খানকয়েক বই দিয়া

গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'খানাও ছিল। সেটা আগে পড়ি নাই, পড়িয়া ফেলিলাম। ট্রেন ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে আসিয়া হাজির হইলেন তিনি। স্নান করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "চল এইবার। ট্রেনের আর বেশি সময় নেই। বইগুলো পড়েছ?"

"ঘরে-বাইরেটা পড়েছি—"

"কেমন লাগল?"

"ভাল লেগেছে। কিন্তু সন্দীপ আর একটু বেপরোয়া হ'লে আরও ভাল লাগত।"

"বাঃ ছোকরা, তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি। খুব খুশী হলুম।"

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টাই বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "আরও খুশী হয়েছি তুমি মুরগি খাওনি দেখে। আমার গোড়ে গোড় মিলিয়ে তুমি যদি মুরগি খেতে আই উড্ হ্যাভ হেটেড্ ইউ।"

কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার বোনকে ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া আমাদের বলিলেন, "এর তো বাঁচবার আশা নেই। এখানকার ডাক্তারবাবু কি কি ওষুধ দিয়েছেন দেখি।"

প্রেসক্রিপশন বাহির করিয়া দিলাম। কুলদাবাবু ডাক্তারও নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

"আপনি বসুন।"

প্রেসক্রিপশনের উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "কোন ওষুধই তো বাদ রাখেননি দেখছি। এ ওষুধগুলো কেন দিয়েছেন।"

তিনি প্রেসক্রিপশনের কয়েকটা ঔষধ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কুলদাবাবু কোন উত্তর না দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন কেবল। ভাবটা যেন, কেন দিয়াছি তাহা তোমার মতো অর্বাচীনকে বলিয়া লাভ কি।

অগ্নীশ্বর কিন্তু না-ছোড।

"কেন দিয়েছেন এগুলো?"

সহসা কুলদাবাবুর জরা-কুঞ্চিত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"দিলে ক্ষতি তো নেই—"

"ও, আপনার চিন্তাধারা নতুন রকম দেখছি। কিন্তু রোগী যে খাটে শুয়ে আছে, তার নৈঋ'তে কোণের পায়াটায় একজন বসে যদি দিনরাত হাওয়া করে যায়, তাতেও রোগীর কোন ক্ষতি নেই, সেটা তো আপনার প্রেসক্রিপশনে দেখছি না।"

কুলদাবাবুর ছোট ছোট চক্ষু দুইটি অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতো জ্বলিতে লাগিল, মুখের কালো রঙে বেগুনির ছোপ পড়িল।

"আপনার বয়স কি সত্তর পেরিয়েছে?"

"বাহাত্তর চলছে।"

"আর কেন, এইবার কাশীবাস করুন গিয়ে। ভাল কথা, আপনি কি এখানকার হাসপাতালে চাকরি করেন ? এত বয়স পর্যন্ত তো চাকরি থাকবার কথা নয়।"

"না। প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস করি। এখানকার ডাক্তারবাবু ছুটিতে গেছেন, তাই তাঁর হয়ে হাসপাতালে কাজ করছি।"

"ও। আচ্ছা, উঠি।"

ফি কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "পঞ্চাশ টাকা—"

টাকা আনিবার জন্য বাড়ির ভিতর ছুটিলাম। টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, অগ্নীশ্বর ভুটুনের সহিত আলাপ করিতেছেন। ভুটুনের বয়স ছয় বৎসর। আমার ভাগনা। ইহারই মায়ের নিউমোনিয়া হইয়াছে। কানে গেল—"তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কে।"

"আমার ছোট মাসী।"

"কোথা থাকেন।"

"পাটনায়।"

"পুরো নাম কি ?"

ভুটুন বলিতে পারিল না।

আমিই বলিলাম, "কমলা বসু"।

টাকা লইয়া অগ্নীশ্বর চলিয়া গেলেন। দিন সাতেক পরে একটি মনি-অর্ডার আসিল ভুটুনের নামে। তাহার ছোট মাসী তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছে। আমরা অবাক হইয়া গেলাম। সে তো ইতিপূর্বে কখনও টাকাকড়ি পাঠায় নাই। টাকাটা পাইয়া অবশ্য সুবিধাই হইয়া গেল। ভুটুনের মায়ের শ্রাদ্ধের খরচটা কুলাইয়া গেল। শ্রাদ্ধে কুলদাবাবু ভুরি-ভোজন করিলেন, তাঁহার খাওয়াটা সত্যই দেখিবার মতো হইয়াছিল। আরও কয়েকদিন পরে কমলার চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে, সে তো টাকা পাঠায় নাই।

অগ্নীশ্বরের ওই এক ধরণ ছিল, তিনি যখন কাহারও উপকার করিতেন তখন কাহাকেও সেটা জানিতে দিতেন না। এমন কি উপকৃতকে পর্যন্ত নয়। তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুবিমল তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল তিনি কেন এমন করেন।

অগ্নীশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন—"ওরে বাপরে, এরকম না করলে রক্ষে ছিল আমার। বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়নি ? যদি কারও উপকারটি করেছ, অমনি সে শত্রু হয়ে গেছে তোমার। মেরেই ফেললে ও লোকটাকে শেষ পর্যন্ত। এমনিই তো দু'বেলা খাচ্ছি-পরছি, মোটামুটি সুখে আছি, এতেই তো অগণিত শত্রুসৃষ্টি হয়েছে, তার উপর তাদের পিঠে যদি উপকারের চাবুক পড়ে তাহলে তো ক্ষেপে যাবে তারা, দেশছাড়া করবে আমাকে। অথচ উপকার না করেও পারি না, ওটা একটা রোগ বিশেষ, **a sort of exhibitionism**, যখন চাগাড় দেয়, তখন বে-এক্তার হয়ে পড়তে হয়। তাই যথাসাধ্য লুকিয়ে করি।"

২

ছাত্রজীবনে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই। দ্বিতীয়বার দেখা হইয়াছিল আরও কয়েক বছর পরে একেবারে বিভিন্ন পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে। তবু তাঁহার সব খবর আমি পাইতাম সুবিমলের কাছে। সে আমার সহপাঠী ছিল, দুইজনে একসঙ্গে আই, এস, সি পড়িয়াছি। সে আই, এস, সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে গেল, আমি বি, এস, সি ক্লাশে ভর্তি হইলাম। সুবিমল যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র সেই সময় অগ্নীশ্বর সেখানে ছিলেন। সুবিমল ছাত্রজীবনেই কবিতা-গল্প লিখিয়া সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। অগ্নীশ্বর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি যখন মেডিকেল কলেজ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং সুবিমল যখন বারকয়েক ডাক্তারি ফেল করিয়া শেষ পর্যন্ত সাহিত্যকেই পেশারূপে গ্রহণ করিল, তখনও তাঁহার এই আকর্ষণ সমানভাবে প্রবল ছিল।

সুবিমলকে লেখা তাঁহার চিঠিপত্র হইতে বোঝা যায়, তিনি তাহাকে কতটা ভালো-বাসিতেন এবং কিভাবে ভালোবাসিতেন। তাঁহার সর্বদা ভয় হইত—ওই যাঃ, পাঁচজনে মিলিয়া এমন একটা প্রতিভাকে বুঝি নষ্ট করিয়া ফেলিল। মেডিকেল কলেজে যতদিন ছিলেন ততদিন যাচ্ছেতাই করিয়া গালাগালি দিতেন তাহাকে। বলিতেন, "দেখ, আর পাঁচজনের মতো গালে-ঠোঁটে রং মেখে, রাংতার গয়না পরে, ফিনফিনে রঙীন শাড়ির বাহার দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াতে যেও না। সত্যিকার রসিকের জন্য লেখ, তারই আশাপথ চেয়ে থাক, তপস্যা কর। মতঙ্গমুনির আশ্রমে শবরী যেমন প্রতীক্ষা করেছিল রামচন্দ্রের জন্য, তোমার প্রতীক্ষাও তেমনি হবে।"

সুবিমলকে লেখা কয়েকটা চিঠি আমি পাইয়াছি। পরে বিভিন্ন স্থান হইতে চিঠিগুলি তিনি তাহাকে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিগুলির মধ্যে তাঁহার মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে পরিচয় বাহিরের লোক কখনও পায় নাই। কারণ, সে পরিচয় তিনি কখনও কাহাকেও দেন নাই, দিতে চাহেন নাই।

একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন—"আমার লেখা সম্বন্ধে আমি unconcerned থাকতে চাই। কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর যে সম্বন্ধ, আমার লেখার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা সেইরকম। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের goggle eyes এবং সিনেমা screen এ দুয়ের মাঝখানে আমার এই ভাগ্যহত অপত্যকে দাঁড় করাবার মতো বুকের পাটা আমার নেই। তুমি লিখেছ, আমার লেখা তোমার ভাল লাগে। আরও দু'একজনের লেগেছে। আমার ছবির একজন সমজদার আছে জানি। আমার ডাক্তারিও একটা আর্ট এবং তাকে আর্ট বলে কেউ কেউ হয়তো চিনতে পেরেছে। কিন্তু এদের কেউ পপুলার হবে না। যদি হয় তো নিজেদের রাধাপুত্র বলে পরিচিত করে তবে হবে। আমার লেখা আর একজনের হাত দিয়ে বেরুলে এত অপাংক্তেয় হবে না। আমার ছবি একদিন আর একজনের নামে ছাপা হবে এবং নাম করবে। আমার ডাক্তারী কোন ছাত্রের মারফৎ

হয়তো তাক লাগাবে। কিন্তু আমার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের কোন কল্যাণ নেই। বার্ধক্যের ব্রেন সফনিংয়ের (brain softening) সঙ্গে সঙ্গে এইরকম একটা বিশ্বাস আমার দাঁড়িয়েছে। তোমার লেখা আমাকে পাঠাতে পার। সমালোচনা করব, from my point of view, সমালোচনা মানেই তাই, আমার কেমন লাগল সেইটে স্পষ্ট করে বলা, ম্যাথু আর্নল্ড বা রবীন্দ্রনাথের কথার চর্বিতচর্বণ করা নয়। প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনেই কিছু না কিছু tragedy আছে, তোমারও নিশ্চয় আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না অভিজ্ঞতা কম বলে'। তাছাড়া তোমার নিজের চোখের দেখা জিনিসই তোমার আঁকায় ফুটবে ভালো, আমার impression হয়তো তোমার কাজে লাগবে না। আমার red হয়তো তোমার green। এ সব শোনবার পরও যদি লেখা পাঠাতে ইচ্ছা হয় পাঠিও—"

চিঠিপত্র হইতে মনে হয় সুবিমল তাঁহাকে লেখা পাঠাইত। একটা চিঠিতে দেখিতেছি—

"তোমার ওই ভুতুড়ে বইটার সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। কিন্তু চিঠিতে বলা যাবে না। এ রকম লেখায় তুমি অদ্বিতীয়। যেখানে তুমি অদ্বিতীয় সেখানে আমি কোন ত্রুটি সহ্য করব না। তুমি লিখেছ খুব ভালো, কিন্তু সবটা এক sittingএ লিখেছ। একটু রয়ে বসে যদি লিখতে তো five hundred times better হ'ত। বই যত ভালো লাগে তত অস্বস্তি হতে থাকে। A beautiful bust, blinding love, an opportune moment and a ruptured perinium! মনের ভিতর হায় হায় করতে থাকে, কেবল মনে হয়, আহা, যদি দুটো stitch লাগানো হ'ত।

…চিঠিতে আর সমালোচনা করব না। চিঠি এক sittingএ লিখে ডাকে ফেলে দিই। তারপর মনে পড়তে থাকে, ঐ যাঃ, এখানটায় তো মনের ভাব পরিষ্কার করা হয়নি। ওখানটায় আর এক রকম করে লিখলে হ'ত, ওখানটায় দুটো লাইন কম পড়েছে—ইত্যাদি। তারপর বুক চাপড়ানো আর রাত্রে অনিদ্রা, এ আর সহ্য হবে না।"

তবু চিঠিতে সমালোচনা করিতে তিনি ছাড়েন নাই।

আর একটা চিঠিতে দেখিতেছি—"তোমার লেখার অনেক লাইন বদলাতে ইচ্ছে করে, অনেক Para rewrite করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাছবার সময় আর সাহস হল না। এরকম বাছা একজনের কাজ নয়। তোমার চাল ডাল মশলাপাতি খুবই ভালো। কেবল কাঁকর বাছা হয়নি। কাঁকর বাছবার সময় তোমার নেই। আমারও নেই। আশা আছে বাংলা দেশের ফোকলা দাঁতে কাঁকরগুলো অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে… ।"

আর একটা চিঠি।

"তোমার সঙ্গে সুরে মিললে মনে কর স্নেহ প্রকাশ করছি, সুরে না মিললে মনে কর রাগ করেছি—এ তো মহা মুশকিল দেখছি। সুর মেলা না মেলার সঙ্গে স্নেহ বা রাগের কি সম্পর্ক ?

আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ও আমার রুচি বিভিন্ন। তোমার সঙ্গে আমার সুর মিলবে না। যৌবনের ঐশ্বর্যে তুমি অজস্র অসংযত বোল ফুটিয়ে চলেছ। আর আমি বৃদ্ধ, কানে কলম আর হাতে হিসাবের খাতা নিয়ে তোমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম—"হায়, হায়, এত অপচয় কেন? সমস্ত energyটা একাগ্র হয়ে একটা বোলে নিয়োজিত হলে যে বিশ-মণি আম ফলানো যেত!" তোমার সৃজন-তাণ্ডবে আমার হিতোপদেশ শতধা হয়ে দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দেখে আমি থমকে দাঁড়ালুম। ভেবে দেখলাম, এইটেই ঠিক হয়েছে। তোমার genius তোমাকে যে পথে নিয়ে যাবে সেইটেই তোমার পথ। সে পথে আমার interference হয় নিজে ব্যর্থ হবে, নয় তোমাকে ব্যর্থ করবে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে বার্ধক্যের মুখরতা সংযত করলুম, with a jerk, এর মধ্যে রাগ কোথায়? মাইকেল, বঙ্কিমকে আমি genius মনে করি। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা আমার 'বিজনবাসে সিগারেটের সহচরী' হয়নি। তা বলে কি তাঁদের উচিত ছিল আমার পছন্দমতো লেখা? মনে করেছিলুম তুমি ধীরভাবে বসে চিন্তা করলে হয়তো ভালো ছবি আঁকতে পারবে। কিন্তু দেখছি ধীরভাবে বসে ভাবা তোমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমার আশা ছেড়ে দিলুম। তোমার উপর নিজের রুচির জোয়াল চাপাবার স্পর্ধাও ছাড়লুম। এ থেকে কি বুঝলে আমি রাগ করেছি? বুঝলেও উপায় নেই।"

এরপর আর একটা চিঠি।

"সমালোচনার শেষকথা বলেছি বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখছি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারছি না। কারণ একটা কুকর্ম করে ফেলেছি—চিঠিটা বড় রূঢ় হয়ে গেছে। অতটা রূঢ় করবার ইচ্ছা ছিল না। হয়ে গেল শুধু উপমার খাতিরে। ওই আকারান্তের মন জোগাতে দু'-একটা খুনখারাপি করা বিচিত্র নয়। তাছাড়া লোককে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার মজ্জাগত স্বভাব। তোমরা সব কলা গাছ কিংবা পেঁপে গাছ, প্রশস্ত চওড়া-চওড়া পাতা, সুমিষ্ট ফল ফলাও। আর আমি হচ্ছি খেজুর, প্রত্যেক পাতার ডগায় ছুঁচ আছে, ফল যদি বা কখনও ফলে তা প্রায়ই কষা আর আঁটিসর্বস্ব। আমাকে চেঁছে যে সুমিষ্ট রস বার করতে পারবে, সেরকম পাশী তো দেখতে পাই না। রূঢ়তার জন্য ক্ষমা চাইছি—"

এইসব চিঠি পড়িয়া কাহারও যদি ধারণা হয় যে, সুবিমলের লেখা তিনি ভালবাসিতেন না, তাহা হইলে ধারণাটা ভুল হইবে। কারণ আমি তাঁহার একজন বন্ধুর নিকট ঠিক উলটা কথা শুনিয়াছি। কথায় কথায় সুবিমলের কথা উঠিল। ভদ্রলোক বলিলেন, "কাল অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের কাছে গিয়েছিলাম। সুবিমলের লেখার কথা ওঠাতে তাকে বললাম, সুবিমলের evolutionটা দেখছো?"

অগ্নীশ্বর বললে—"হাঁ, দেখবার মতো। আমি মাঝে মাঝে তার নিন্দে করেছি। লম্বা লম্বা উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখি।" আমি বললাম, "কিছু দরকার হবে না, পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ বিদীর্ণ করি—he is bound to come out."

অগ্নীশ্বর শুনে লাফিয়ে উঠল, বলল, আমি add করছি yes, resplendent ruthless and irresistible—এই আমার বিশ্বাস। কারুর কাছে সমালোচনার কাঙাল হবার তার দরকার নেই। He has grown beyond it and above it."

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "অগ্নি এখনও ঠিক তেমনি আছে। আমার সামনে এক প্রবীণ ডেপুটিকে যেভাবে অপমানটা করলে তা আর কহতব্য নয়। এই জন্যে ওর কিছু হল না। তা না হলে অত ভালো ডাক্তার, অমন বিদ্বান লোক, ওর কি টাকার ভাবনা হবার কথা? ওর নিজের অবশ্য ভাবনা নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় ওর চেয়ে অনেক বেশি নিকৃষ্ট ওর সহপাঠীরা যতটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে ও ততটা পারে না। মাইনেটিই ওর সম্বল। ওই আগুনের কাছে কে যাবে বল ছ্যাঁকা খাবার জন্যে। প্রবীণ ডেপুটিকে দেখে কষ্ট হল আমার—"

প্রশ্ন করিলাম, "কি হয়েছিল কি—"

"যা সাধারণত হয় তাই, human weakness, কিন্তু human weaknessকে ক্ষমা করার লোক তো অগ্নীশ্বর নয়। ভদ্রলোকের হাঁটুতে ব্যথা হয়েছিল। বোধহয় অনেকদিন আগেই হয়েছিল। তিনি বললেন, "অগ্নিবাবু, এ হাঁটু তো সারল না, কত আর নেংচে নেংচে বেড়াই বলুন. আপনার প্রেসক্রপশনটাই দিন, ট্রাই করে দেখি ওটা—"

"আপনাকে তো প্রেসক্রপশন দিয়েছিলাম একটা মাস তিনেক আগে—খাননি সে ওষুধ?"

অগ্নীশ্বরের প্রশ্ন শুনেই বুঝলাম গতিক ভালো নয়।

ডেপুটি বললেন, "না, সেটা আর খাওয়া হয়নি। আমার বেয়াই বললেন বিধানবাবুকে দেখাতে। তিনি ব্লাড কেমিস্ট্রি করালেন, পাইখানা পেচ্ছাবও পরীক্ষা করালেন। তারপর এমন এক ওষুধ লিখে দিলেন যে, ওষুধ জোগাড় করতেই মাসখানেক লেগে গেল, এখানে পাওয়া গেল না, বম্বে থেকে আনাতে হল, একটি গাদা দাম লাগল, কিন্তু কিচ্ছ হল না। তারপর গেলাম ব্রাউন সাহেবের কাছে, তিনি মালিশ দিলেন, ইনজেকশন দিলেন, ওষুধও খাওয়ালেন চার-পাঁচরকম—"

অগ্নীশ্বর জিগ্যেস করলেন, "আমার প্রেসক্রপশনটা ব্যবহারই করেননি?"

"না, সেটা আর ব্যবহারই করা হয়নি। হারিয়েও ফেলেছি সেটা। দিন আর একবার লিখে দিন, ট্রাই করে দেখি এবার ওটা—"

"আর তো লিখব না। সেবারই একটা অন্যায় করে ফেলেছিলুম ফি নিইনি—"

ডেপুটিবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "বেশ, এবার কি দেব। কত কি নেন আপনি—?"

"লক্ষ টাকা দিলেও আর লিখব না"—গর্জন করে উঠল অগ্নীশ্বর। তারপর একটু থেমে বলল—"একটি শর্তে লিখতে পারি, যদি ওই ফোলা হাঁটু গেড়ে করজোড়ে প্রার্থনা করেন—'দয়া করে সেই প্রেসক্রপশনটা আবার লিখে দিন।' তবেই দেব, তা না হলে নয়—"

ভদ্রলোক গুম হয়ে বসে রইলেন মিনিট খানেক। তারপর উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, "আপনি যে এত অভদ্র, তা জানা ছিল না আমার—"

অগ্নীশ্বর বসে বসে বা দোলাতে দোলাতে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এ লোকের কখনও প্র্যাকটিস হয়?"

সত্যই অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্র্যাকটিস হয় নাই। মাঝে মাঝে দুই-এক জায়গায় তাঁহার নাম হইয়াছে, হৈ হৈ করিয়া প্র্যাকটিসও হইয়াছে, কিন্তু তাহা অল্পদিন মাত্র। বদলির চাকরি, এক জায়গায় বেশি দিন তিনি থাকিতে পান নাই।

৩

ইংরেজের কবল হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সব বাঙালী ছেলেমেয়ে একদিন জীবনপণ করিয়াছিল, যাহারা দলে দলে জেল ভরতি করিয়াছিল, ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়াছিল, দ্বীপান্তরে গিয়াছিল, পুলিশের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছিল, যাহাদের ঘরে-বাহিরে কোথাও শান্তি ছিল না, মা-বাপ আত্মীয়-বন্ধুরাও যাহাদের আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করিতে ভয় পাইতেন, একটা বিরাট আদর্শের প্রেরণায় যাহারা নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছিল, কিন্তু সর্বহারার গান গাহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, বরং যাহারা নিজেদের সর্বতোভাবে লুকাইয়া রাখিয়াই লোকচক্ষুর আড়ালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আমার মতো লোকও যে একদিন তাহাদের সঙ্গে ছিল একথা ভাবিলে আজও বিস্ময় এবং লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়ি। লজ্জার কারণ আমি এখন নামজাদা পুলিশ অফিসার বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমার প্রথম যখন আলাপ হয় তখন আমার যে নাম ছিল সে নাম এখন আমার নাই, সে নামের ব্যক্তিটি বহুপূর্বে মারা গিয়াছে।

আজ জীবনের অপরাহ্ণে বসিয়া অতীত দিনের সেই ঘটনাগুলি ভাবিতে গিয়া একটি কথাই কেবল মনে হইতেছে, এ সবের মধ্যে আমার কি কোন হাত ছিল? অজানা কোন উৎস হইতে অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধারা প্রবলবেগে আসিয়া বারবার আমার জীবনের সবকিছু ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে, পুরাতন পরিবেশ বারম্বার বিপর্যস্ত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, পরিচিত লোক অপরিচিতের পর্যায়ে পড়িয়াছে, অপরিচিত লোক অত্যন্ত পরিচিত হইয়াছে। কখনও গৃহকে শ্মশান করিয়াছে, কখনও শ্মশানই গৃহ হইয়াছে, ছবির পর ছবি বদলাইয়াছে, একদিন যাহাকে সুখ-শান্তির আদর্শ বলিয়া ভাবিয়াছি, দুইদিন পরে তাহাই অসুখ ও অশান্তির আকর হইয়াছে। আমার এই সদাপরিবর্তনশীল জীবনে একটিমাত্র ছবির কেবল পরিবর্তন দেখি নাই, সে ছবি অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের। আমার জীবনে কয়েকবারই তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে আসিয়াছেন ও চলিয়া গিয়াছেন, প্রতিবারই তাঁহাকে একরকম দেখিয়াছি। তরবারির মতো তীক্ষ্ণ,

অগ্নির মতো উজ্জ্বল, অন্তরের অন্তস্থলে কিন্তু স্নেহ-করুণার ফল্গু বহমান। বজ্রের মতো কঠোর অথচ কুসুমের মতো মৃদু এক তাঁহাকেই দেখিয়াছি।

আজ তাঁহার জীবন-কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি নিজের দায়ে। কারণ ঋণশোধ করিবার অন্য উপায় নাই।

মনে হইতেছে, আমার মতো তিনিও সারাজীবন একটা আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। সে আলেয়াটা কখনও ডাক্তারি, কখনও সাহিত্য, কখনও নাস্তিকতা, কখনও শাস্ত্রবিচার, কখনও দেশভক্তি, কখনও স্বদেশবাসীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা—নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পথে-বিপথে লইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ভাবিয়াছি, এই আলেয়ার মধ্যে তিনি কি পাইতে চাহিয়াছিলেন। সত্য? আনন্দ? জনপ্রিয়তা? অর্থ? আমার মনে হয়, ইহার একটাও তিনি চাহেন নাই। জনপ্রিয়তা তো তাঁহার দু'চক্ষের বিষ ছিল। তিনি যখন সিনেমা দেখিতে যাইতেন, খোঁজ লইতেন কোন্ সিনেমাটায় সবচেয়ে কম ভীড়, যখন কোনও হোটেলে যাইতেন, মেনুর কোন্ খাদ্যটা লোকে সবচেয়ে কম খায় সেইটা খোঁজ করিয়া তাহাই আনিতে বলিতেন। তাঁহার সহপাঠী এক ডাক্তারের মুখে এরূপ নানা গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার ধারণা ছিল পেটের দায়ে বা পপুলারিটির লোভে কোনও প্রথম শ্রেণীর গুণী কখনও নিজেদের স্থর নামাইয়া ফেলেন না। সুবিমলকে একবার লিখিয়াছিলেন—"তোমার গল্পের সাহিত্যিক নায়ক পেটের দায়ে পয়সার জন্যে অপরের নামে গল্প-কবিতা লিখতে লাগল, এটা আমার তত ভালো লাগেনি। কি জাতের সাহিত্যিক লোকটা? আমি তো ভাবতেই পারি না যে, রবীন্দ্রনাথ বা গোপেশ্বর বাঁড়ুয্যে পেটের দায়ে গান গেয়ে গেয়ে চানাচুর ফেরি করে বেড়াচ্ছেন! তুমি ওকে যদি সত্যিকার ভালো সাহিত্যিক করতে চাও, ও ছবি মুছে ফেল।"

সত্য-অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি এবং সত্যনিষ্ঠা তাঁহার ছিল নিশ্চয়, না থাকিলে তিনি অত বড় ডাক্তার হইতে পারিতেন না। কিন্তু সত্যকেই তিনি আকুল হৃদয়ে সারা জীবন সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন তাহা তো মনে হয় না। আমার নিকট আজ যে তিনি নমস্য তাহা তো তাঁহার মিথ্যা আচরণের জন্যই। তিনি সুন্দরকে ভালবাসিতেন, সত্যকে নয়। তাঁহার সত্যের আদর্শ তাঁহার নিজের কাছে ছিল, তাহা আর পাঁচজনের সত্য নয়, আইনের সত্য নয়, ধর্মের সত্য নয়, শাস্ত্রের সত্য নয়, তাহা তাঁহার নিজের সত্য এবং সে সত্যের প্রধান গুণ, (সম্ভবত একমাত্র গুণ) তাহা সুন্দর।

আমি যতদূর খবর জানি জীবন তাঁহার নিরানন্দ ছিল। তাঁহার এই জীবনী লিখিবার জন্য আমি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের সহিত দেখা করিয়া যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে মনে হয় পারিবারিক জীবন তাঁহার সুখের ছিল না। পারিবারিক জীবনের মেরুদণ্ড যে স্ত্রী, তাঁহার সহিত তাঁহার জাতে মেলে নাই। শতকরা নিরানব্বুই জনেরই মেলে না। বিবাহের সুসজ্জিত মণ্ডপে শঙ্খধ্বনি-উলুধ্বনির মধ্যে যে-সব শুভমিলন

অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের অধিকাংশই অসবর্ণ বিবাহ, কঠিনের সহিত কোমলের, কবির সহিত অকবির, সরলতার সহিত প্রতারণার, লম্পটের সহিত সতীর. অসতীর সহিত সাধুর, কতরকম গরমিলই যে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অধিকাংশ লোকই দুর্ভাগ্যটাকে আব-আঁচিলের মতো মানিয়া লইয়া ভবিতব্যের দোহাই দিয়া সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করেন। অগ্নীশ্বরের প্রকৃতি ছিল ঠিক উলটা ধরনের, কোন-কিছু নির্বিচারে মানিয়া লওয়া তাঁহার ধাতে ছিল না। বিশেষত তিনি যখন উপলব্ধি করিতেন যে, যে-ফাঁদে তিনি পড়িয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই তখন তিনি যেন ক্ষেপিয়া যাইতেন। তাঁহার বিবাহ ব্যাপারটা অনেকটা ফাঁদের মতোই হইয়াছিল। নিজে বিবাহ করিবার পূর্বে তিনি তাঁহার বিধবা বোনের আবার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেজন্য কিছুকাল তাঁহাকে গোঁড়া-সমাজে একঘরে হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য. পাত্র হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণীর পাত্র ছিলেন, দুই-একটি ভালো ঘর হইতে তাঁহার সম্বন্ধও আসিয়াছিল, কিন্তু যেই তাহারা খবর পাইল যে ইনি বিধবা বোনের আবার বিবাহ দিয়াছেন অমনি সরিয়া পড়িল। অগ্নীশ্বর তাঁহাদের একজনকে নাকি বলিয়াছিলেন, "দেখুন, তামাক খাবার যদি ইচ্ছে হয়, নিজের হুঁকো কেনবার পয়সা আমার আছে। আর শাল-পাতায় বসে আপনাদের ওই ছ্যাচড়া-চচ্চড়ি-বোঁদে-দই মাখামাখি পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসবার প্রবৃত্তি আমার কোনকালে নেই। আমার বক্তব্যটা ডি. এল. রায় নামক লেখক আরও ভালো করে বলেছেন তাঁর 'একঘরে' প্রবন্ধে। পড়ে দেখবেন—ও. বেগ ইওর পার্ডন, যা আপনার পক্ষে অসম্ভব তাই করতে বলছি, আপনি ব্রাহ্মণ যে, পড়াশোনা তো আপনার ধাতে সইবে না!"

আঃ, এসময়ে আবার কে ফোন করিল।

"হ্যাঁ, আমি কথা বলছি। কি বলুন, ও দলকে দল ধরা পড়েছে? বাঃ, সুখবর খুব। এখন লক্‌আপে রেখে দিন সবাইকে। জামিন যাতে না পায় সে চেষ্টাও করতে হবে। ওরা ছাড়া পেলে ওদের আর ধরতে পারবেন না। আচ্ছা, গুড্ নাইট। থ্যাঙ্ক ইউ—"

যাক্, মস্ত একটা শিরঃপীড়া সহসা সারিয়া গেল। একটা বেদে-বেদেনীর দল বহুদিন হইতে জ্বালাইতেছিল।

হ্যাঁ, কি বলিতেছিলাম? অগ্নীশ্বরের পারিবারিক জীবনের কথা। শেষ পর্যন্ত একটা পরিবার তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়া ছিল। একটু ভণ্ডামী করিলেই যে অগ্নীশ্বরের মতো সৎপাত্র পাওয়া যায় এ বুদ্ধি অন্তত একটি ভদ্রলোকের মাথায় খেলিয়াছিল। তিনি একদিন বিবাহের প্রস্তাব লইয়া অগ্নীশ্বরের কাছে গেলেন। অগ্নীশ্বরের পিতা-মাতা তখন কেহই বাঁচিয়া নাই, অগ্নীশ্বর নিজেই তখন নিজের বিবাহের কর্তা। শুনিয়াছি, কন্যার পিতা যখন অগ্নীশ্বরের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন তখন নাকি বলিয়াছিলেন, "আমার একটি সুলক্ষণা গৃহকর্মনিপুণা মেয়ে আছে, সেটিকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে চাই।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রে সুলক্ষণা মেয়ের যা বর্ণনা পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে সুলক্ষণা মেয়ে মানে কেষ্টনগরের পুতুল একটা। পুতুল বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই। আর গৃহকর্মনিপুণা মানে যদি কমবাইণ্ড চাকরানি আর রাঁধুনি হয় তাহলেও—"

"না, না অতটা কিছু নয়। গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সাধারণত যেমন হয়, তেমনি আর কি। দেখুনই না একদিন—"

"পাঁচ মিনিটের চোখের দেখা দেখে কি হবে বলুন। তার রক্তে সিফিলিস আর ফুসফুসে টি. বি. আছে কি না, টনসিল দুটো কেমন, এই সবই দেখতে হয়। এসব দেখতে দেবেন?"

"বেশ, ইচ্ছে হয়তো দেখুন। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি গরীব লোক, ওসবের জন্য বেশি পয়সা খরচ করা আমার ক্ষমতায় কুলোবে না—"

এই সরল উক্তিতে গলিয়া গেলেন অগ্নীশ্বর। বলিলেন, "বেশ, দেখব না কিচ্ছু। কিন্তু আপনি একটা কথা জানেন কি? আমার বিধবা বোনের আমি বিয়ে দিয়েছি।"

"জানি। তাতে আমার আপত্তি নেই।"

"আমি মুর্গি, শুয়ার, গরু সব খাই। জাত মানি না। আমার রাঁধুনী মুসলমান বাবুর্চি, আমার যে চাকর জল তোলে সে মেথর। এসবে আপনার আপত্তি নেই তো?"

"কিছুমাত্র না। এই সবই তো দরকার আজকাল। সেকেলে গোঁড়ামি না থাকাই তো বাঞ্ছনীয়।"

অগ্নীশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, "বেশ, দিন ঠিক করুন। আপনার মেয়েকেই আমি বিয়ে করব।"

"কবে দিন ফেললে সুবিধে হবে—"

"কালই ফেলতে পারেন, কাল পরশু দু-দিন ছুটি আছে। আমাকে অবশ্য রুগী দেখতে বেরুতে হবে, তবে আপিসের ছুটি আছে। জগু আর কার্তিককেও পাওয়া যাবে—অন্তরঙ্গ লোক। অবসর পেলে ওদের সঙ্গে বসেই পর-চর্চা করি। ওদের দুজনেরই কাল ছুটি—"

"অত তাড়াতাড়ি আমি পারব না। অন্তত মাসখানেক সময় দিতে হবে আমাকে—"

"বেশ, তাই নিন।"

ওই পাত্রীর সহিতই অগ্নীশ্বরের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরদিন তিনি তাঁহার বন্ধুদের বলিলেন, "তোমরা শুভদৃষ্টির সময় আমার চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিলে, বৌয়ের মুখ দেখে কি মনে হল জান? মনে হল সারা মুখময় পক্‌সের (pox) গুটি বেরিয়েছে, আর প্রত্যেকটি গুটির মুখে পুঁজ। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম, ওগুলো চন্দনের ফোঁটা।"

তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহার আর এক উক্তি তাঁহার এক বন্ধুর চিঠিতে পাইয়াছি।

"আমাদের কি রকম মিল হয়েছে জান ? একেবারে রাজযোটক। আমি সজারু আর উনি তুলতুলে খরগোস। একটি ছোট্ট খাঁচায় পাশাপাশি বাস করছি। কারও পালাবার উপায় নেই। যতদিন না একজনের মৃত্যু হচ্ছে, ততদিন আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। ঘৃণ্যতম খুনেরাও কি জেলে এত কষ্ট ভোগ করে ? ইচ্ছে করলে ওকে খাঁচাটা থেকে দূর করে দিতে পারি, আমাদের দেশে এ রকম পৌরুষের অনেক নজীর আছে। কিন্তু ওর ভীরু ভীতু চোখ দুটোর দিকে চাইলে সব কেমন গুলিয়ে যায়। অথচ ওর জ্বালায় আমাকে বাবুর্চি তাড়াতে হয়েছে, ফাউল রোস্টের বদলে সুক্তো খেতে হচ্ছে, দুঘণ্টা ধরে পূজো করে, হঠাৎ আচমকা মাথায় গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেয়। বকলে বোকার মতো চেয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে! এর চেয়ে বেশি দুর্গতি কল্পনা করতে পার ? সেদিন একটা দূরের কলে গেছি, রুগীর বাড়িতে পকেট থেকে স্টেথোসকোপ বার করতে গিয়ে কতকগুলো শুকনো ফুল আর বেলপাতা ঝরঝর করে মাটিতে পড়ে গেল। পাছে আমার অমঙ্গল হয়, এইজন্যে লুকিয়ে পূজোর ফুল দিয়ে দিয়েছে আমার প্যাণ্টের পকেটে। ভাবলুম বাড়ি গিয়ে খুব বকব। কিন্তু পারলুম না। দূর থেকেই দেখতে পেলুম, সে জানলার ধারে বসে আছে আমার আশাপথ চেয়ে। চোখে পড়ল ঢলঢলে মুখখানা. যৌবন উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। বকতে পারলুম না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ছি, ছি এ কি degradation, কি শোচনীয় অধঃপতন। খানিকটা মাংস-স্তূপের লালসায় আমার ভিতরকার পশুটা আমার মনুষ্যত্বের গলা টিপে ধরছে, আর আমি সেটা সহ্য করছি। যার সঙ্গে আমার মনের মিল নেই, বুদ্ধির সমতা নেই, চিন্তার যোগ নেই, তার সঙ্গে ক্রমাগত প্রেমের ভান করে যেতে হচ্ছে। আমার মনে হয়, এ শুধু আমার ট্রাজেডি নয়, বিশ্বব্যাপী ট্রাজেডি। কিন্তু এর থেকে তুমি যেন মনে করে বস' না যে আমি সেক্‌স-বিরোধী। মোটেই তা নয়, এ বিষয়ে আমি সাবেক আর্যঋষিদের সঙ্গে একমত। আমিও তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, 'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।' মহাভারতের বীররা মামাতো বোনদেরও বিয়ে করতেন, অর্জুন সুভদ্রাকে, শিশুপাল ভদ্রাকে, পরীক্ষিৎ ইরাবতীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা কন্যারত্ন পেলেই আহরণ করতেন সেটি, ভীম রাক্ষসী হিড়িম্বাকে পর্যন্ত ছাড়েনি, অর্জুন মণিপুরী চিত্রাঙ্গদাকে, অনার্যা নাগকন্যা উলূপীকে পর্যন্ত বাগিয়েছিলেন। ধীবর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে পরাশর ঋষির কাণ্ড-কারখানা তো জানই। জীবন্ত আর্যদের এইসব প্রাণোচ্ছল বীর্য-গর্ভ কাহিনীর সঙ্গে পরবর্তী যুগের স্মৃতি-শাসিত সাবধানী সমাজের তুলনা করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। ওই, বিরাট-পক্ষ আকাশচারী মহাবিহঙ্গের দল কি করে' কোন মন্ত্রে মুখস্ত-বুলি-আওড়ানো খাঁচার পাখী হয়ে গেল সব! না, আমাকে তুমি ওই নিন্‌কম্‌পুপ্‌দের দলে ফেল না। আমি ওই সতীত্ববিলাসী ফোঁটা-তিলকধারী মতলববাজ ভণ্ডদের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাকতে চাই। বাজী শৃঙ্গীদের চেয়েও ভয়ানক ওরা। কিন্তু আমি যে কথাটা তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি সে কথাটা হচ্ছে এই যে, শুধু আমাদের দেহ নেই,

মনও আছে। দেহের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বারবার সে মনটার টুঁটি টিপে ধরতে হচ্ছে এইটেই দুঃখ। প্রাচীন গ্রীক বা আর্যদের মতো কালাও কারবার করবার সুযোগ তো আমাদের নেই, তাগদও নেই। ওই একটি পরিবার নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমি যখন আইনস্টাইনের বই বা রুপার্ট ব্রুকের সনেট নিয়ে মত্ত, তখন আমার অর্ধাঙ্গিনী মত্ত সিনেমা-স্টারদের নিয়ে। আমার মন যখন নর্থ পোলে জ্যাক লণ্ডনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার অর্ধাঙ্গিনীর মন তখন ব্যস্ত শাড়ির পাড়, ব্লাউসের ছিট, আর ধোপা-দর্জি নিয়ে। দু-জন দু-জগতে বাস করি। 'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে। জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে'। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় বীণা বাজাচ্ছি, না, ক্যানেস্তারা পিটছি! কে জানে। অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি কিন্তু—যাই করি।"

সজারুর কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত কলেবর হইয়া খরগোসটি কিছুদিন বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু বেশী দিন নয়। শুনিয়াছি, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি নাকি তাঁহার এক ভাইকে বলিয়াছিলেন, "আমার কাছ থেকে পালাও তোমরা। আমি খুনে। কথায়, ভঙ্গীতে, ব্যবহারে সারাজীবন ছোরাছুরি চালিয়ে এসেছি, কিন্তু যে শত্রুর উদ্দেশ্যে চালিয়েছি, সে মরছে না, সে অমর, মরে যাচ্ছে আমার নিজের লোকেরা। তোমরা বাঁচতে চাও তো পালাও আমার কাছ থেকে—"

তাঁহার কয়েকটি ছেলেমেয়ে হইয়াছিল জানি। শুনিয়াছি ছেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন, রূপে গুণে অমন ছেলেমেয়ে নাকি আর কাহারও হয় না। আমি জানি এটি অসুখী লোকের লক্ষণ। যাঁহারা আত্মপ্রশংসার ঢাক বাজাইয়া অপরের কান বধির করিয়া তোলেন, তাঁহারা আসলে নিজেদের অন্তরের হাহাকারটাকেই আত্মপ্রশংসার ঢক্কা নিনাদে স্তব্ধ করিয়া দিতে চান। আসল সত্যটা অন্তর্যামী মন ঠিক জানিতে পারে; কিন্তু সে সত্য যদি বেদনাদায়ক হয়, বাহিরে সেটা স্বীকার করিতে পারে না অনেকে, প্রশংসার মুখোশ পরাইয়া সেটা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অগ্নীশ্বরের মতো লোকও যে ইহা করিতেন তাহা বিশ্বাস হয় না। তাঁহার পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, হয়তো যাহা শুনিয়াছি তাহা ভুল। একটি ঘটনা কিন্তু জানি যাহা ভুল নয় এবং যাহার তীব্র আলোকে অগ্নীশ্বর আজও আমার নিকট অদ্ভুত বিস্ময়ের মতো হইয়া আছেন। যখনই তাঁহাকে কল্পনা-নেত্রে দেখি, মনে হয়, তিনি এমন একটা আলোকের পরিবেশের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন যে, তাঁহার কাছাকাছি যাইবার সাধ্যও আমাদের নাই। তাঁহার ছেলে বিবাহ করিয়াছিল এক ভিন্ন জাতের মেয়েকে। ভিন্ন জাত বলিয়া অগ্নীশ্বরের আপত্তি ছিল না, কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন কন্যার পিতা খুব বড লোক, জামাইকে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা, একটি মোটরকার এবং কলিকাতায় একখানা বাড়ি যৌতুক স্বরূপ দিবেন, অমনি তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করিলেন। তখন তাঁহার নিজের অবস্থা খুব খারাপ, চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করাতে আয় অর্ধেকেরও

কম হইয়া গিয়াছে, কোথাও প্র্যাক্‌টিস জমে নাই। কলিকাতায় একটা সরু গলিতে স্যাঁতসেঁতে একতলা ঘরে বাস করেন।

ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ বিয়েতে আমি মত দিতে পারলুম না।"

ছেলে বলিল, "কেন, আগে তো মত দিয়েছিলেন, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন আবার অমত করছেন কেন—"

"আগে মত দিয়েছিলুম, আমার ধারণা হয়েছিল তুমি একটা আদর্শের জন্য বিয়ে করছ। ঝুটো ব্রাহ্মণত্বের মাথায় লাথি মেরে প্রেমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাচ্ছ। এখন দেখছি তা নয়, তুমি বিয়ে করছ টাকার লোভে।"

"কিন্তু বিয়ের দিন তো ঠিক হয়ে গেছে—"

"ও বিয়েতে আমি যাব না। আমাকে বাদ দিয়ে যদি তোমার বিয়ে করবার প্রবৃত্তি হয়, যাও গিয়ে করে এস—"

অগ্নীশ্বরের এক ছোট ভাই তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—"বিয়ের যখন সব ঠিক হয়ে গেছে তখন তোমার না যাওয়ার কোন মানে হয় না। তুমি না গেলেও বিয়ে হবে, তুমি গেলে দেখতে শুনতে একটু শোভন হত। তুমি যাচ্ছ না কেন—"

"আমার ছেলেকে চাঁদির জুতো মারতে মারতে গলায় গামছা দিয়ে হিড় হিড় করে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য দেখা আমার পক্ষে শক্ত।"

"কেন, বড়লোক হওয়াটা কি অন্যায়? কোন ধনী যদি তার জামাইকে গাড়ি বাড়ি টাকা দেয় সেটা কি তার অপরাধ?"

"পায়ের অপরাধ কখনও থাকে না। যে পা চাটে অপরাধ তারই।"

"এটাকে পা-চাটা বলে মনে করছ কেন। সিধু সত্যিই ভালবেসেছে কমলাকে। এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন--"

"তোমার সিধু ওই রেবা নার্সের সঙ্গে যখন ঘোরাঘুরি করত তখনও লক্ষ্য করেছিলাম, তার মুখের ভাবটা রসে-ডোবানো মালপোর মতো হয়েছিল। আমি প্রত্যাশা করেছিলুম বিয়ের প্রস্তাব এল বুঝি। কিন্তু যেই তোমার সিধু কমলার সন্ধান পেলে অমনি সব বদলে গেল। রসে ডোবানো মালপো দেখতে দেখতে হয়ে গেল কেঠো লেড়ো বিস্কুট। রেবার বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স যদি কমলার বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের চেয়ে বেশী হত তাহলে তোমার সিধু ওই দিকেই ঝুঁকত—"

"এটা তুমি গায়ের জোরে বলছ। এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কি যুক্তি আছে তোমার।"

"যুক্তি দিতে পারব না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ আমি ডাক্তার। এক নজরেই অনেক সময় ঠিক রোগটা ধরতে পারি। প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক পরে। এ বিষয়ে আমার ভুল হয়নি।"

"দেখ, সিধুর মা নেই, বৌদি বেঁচে থাকলে কি তুমি—"

"তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ বিয়ে হত না। সোনার বেনের মেয়েকে সে

কিছুতেই পুত্রবধূ করতে রাজি হত না। সিধু জোর করলে সে গলায় দড়ি দিত, তবু রাজী হত না।"

তাঁহার ভাই তবু ছাড়েন নাই।

"তুমি তো অত অবুঝ নও। তলিয়ে ভেবে দেখ না ব্যাপারটা, অনিবার্যকে নিবারণ করবার চেষ্টা করছ কেন। ছেলে বড় হয়েছে, ছেলেও খুব ভালো—তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা যদি ভালো করে ভেবে দেখ, তাহলে—"

অগ্নীশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, "না, আমি পারব না। যে দুধে কেরোসিন তেলের গন্ধ ছাড়ছে, সে দুধ আমি গিলতে পারব না। কিছুতেই পারব না।"

বিবাহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু অগ্নীশ্বর সে বিবাহে যোগদান করেন নাই। এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ আমি তাঁহার ভাইয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি।

এ ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার নববৈবাহিক তাঁহাকে একটি পত্রাঘাত করিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম—"আমার কয়েকটি চায়ের বাগান এবং কোলিয়ারী আছে। তাছাড়া একটা কাপড়ের কলও আমাকে চালাইতে হয়। প্রত্যেক জায়গায় আমাকে ডাক্তার রাখিতে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, এইসব ডাক্তারদের ঠিকমত চালাইবার জন্য একজন চীফ মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত করা। আপনি একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসক। আপনি যদি এই ভারটি গ্রহণ করেন, আমি অনুগৃহীত হইব। এ সমস্ত সম্পত্তি তো আপনারই পুত্রের, আপনি ইহার তত্ত্বাবধানের ভার লইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন, "আপনার চিঠি পেলাম, কিন্তু আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। আমি একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের লোক। রবি ঠাকুরের ক্ষ্যাপা পরশ-পাথর খুঁজে বেড়াত, আমি সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছি স্বাধীনতা, যা এদেশে পাওয়া অসম্ভব। যখন ডাক্তারী পাশ করে বেরুলাম, তখন মনে হয়েছিল এটা স্বাধীন ব্যবসা, এবার বোধ হয় স্বাধীনতার আস্বাদ কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলুম, ও বাবা, এদেশে স্বাধীন ব্যবসা করা মানে সক্কলের মন রেখে চলা। পদি পিসি থেকে আরম্ভ করে গুরুঠাকুর, দালাল, দোকানদার সক্কলের পায়ে তেল দিতে হবে। খোশামোদ করতে হবে গাঁয়ের কোয়াক্‌দের, প্রতিযোগিতা করতে হবে কম্পাউণ্ডার, হোমিওপ্যাথ আর কবরেজদের সঙ্গে। মাদুলি, কবচ, ওলাবিবি সক্কলের সঙ্গে আপস করে চলতে হবে। সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে লোকে লাথাবে, অপমান করবে, তুমি টুঁ শব্দটি করতে পাবে না। দেখলাম, এ রকম স্বাধীন ব্যবসা করা আমার পোষাবে না। সুট সুট করে গিয়ে চাকরি নিলুম। সারাজীবন চাকরিই করেছি। চাকরিতেও খানিকটা গ্লানি ছিল বটে, কিন্তু একটি মনিবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে আর কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না, আর সে মনিবটি সাধারণত শিক্ষিত সাহেব হত। অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই গুণের কদর করত তারা। চাকরি করে খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করেছিলুম। রামা শামা যতুর পায়ে তেল দিয়ে অন্নসংস্থান করতে হয়নি, কিম্বা উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে রুগী ধরতে বেরুতে হয়নি। আপনিও আমাকে চাকরি অফার করেছেন। কিন্তু আমি যাদের অধীনে এতকাল চাকরি করেছি তাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না, তাদের সভ্যতা, সাহিত্য, তাদের শৌর্য বীর্য, রাজনীতির দাপটে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, তাদের কলমের এক খোঁচায় অসম্ভব সম্ভব হত—সুতরাং আমারও মেজাজটা অনেকটা সেই রকম হয়ে গেছে। আপনার অধীনে আপনার চা-বাগানে বা কোলিয়ারিতে চাকরি করা আমার পোষাবে না। তাছাড়া আপনার চাকরিটি আসলে একটি টোপ, আমি যদি মাছ হতুম, গিলে ফেলতুম, কিন্তু আমি মাছ নই—মানুষ, তাই একটু মুচকি হেসে এড়িয়ে গেলুম। নমস্কার জানবেন।"

চিঠিটা অগ্নীশ্বরের ভাই-ই আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে—বোধহয় মাস তিনেক পরে—একদিন সকালে একটি ফুটফুটে সুন্দরী বধূ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অগ্নীশ্বর তাহাকে পূর্বে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না।

"কে তুমি, তোমাকে চিনতে পারছি না।"

"আমি কমলা।"

অগ্নীশ্বর নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন মেয়েটির দিকে। লক্ষ্য করিলেন, মেয়েটির চোখের কোণে জল টলমল করিতেছে। তাঁহার চোখেও হঠাৎ জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না।

কমলা বলিল, "বাবা, আপনি এত কষ্ট করে এখানে আছেন, আমার কাছে চলুন, আপনাকে নিতে এসেছি।"

"সে তো অসম্ভব।"

"আমরা এখানে আসব ?"

"আসতে পার। কিন্তু একটি শর্তে। যদি তোমার বাবার ওই ত্রিশ হাজার টাকা, মোটর গাড়ি আর বাড়ি ফেরত দাও।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল, "আমাদের তাহলে চলবে কি করে ? উনি কোথাও চাকরি পাননি, পাবার আশাও তো কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।"

"আমি যা পেনশন পাই তাইতে কুলিয়ে নিতে হবে। তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে সিধুকে এই পেনশনের উপরই নির্ভর করতে হত।"

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, বেশ আসব—"

সত্যসত্যই তাহারা টাকা গাড়ি বাড়ি ফেরত দিয়া অগ্নীশ্বরের স্যাঁতস্যাঁতে একতলা বাসায় আসিয়া উঠিল একদিন। বাড়িটিতে তুইখানি মাত্র ঘর ছিল, একটিতে অগ্নীশ্বর শয়ন করিতেন, অপরটি ছিল তাঁহার বাথরুম। নিজে তিনি বাথরুমে গিয়া খাটিয়া

পাতিলেন, ছেলে বউকে ছাড়িয়া দিলেন নিজের শুইবার ঘরটি। তাঁহার মেয়েদের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরই তাঁহার একমাত্র পুত্র। সুতরাং খুব বড় বাড়ির দরকারও ছিল না তাহার। কিন্তু কিছুদিন সে বাড়িতে বাস করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন কমলার খুব কষ্ট হইতেছে। কমলা তাঁহার সেবা করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। রাঁধিবার চাকরটি আসিয়াই সে ছাড়াইয়া দিল। নিজে হাতে সমস্ত করিত, এমনকি, অগ্নীশ্বরের 'পিসপট্' পরিষ্কার করা পর্যন্ত। অগ্নীশ্বরের অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হইত না, তিনি শুইয়া শুইয়া বই পড়িতেন। ঠিক পাশের ঘরটিই কমলা আর সিদ্ধেশ্বরের, অগ্নীশ্বর উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, যদি তাহাদের হাসির গিটকিরি বা গল্পের টুকরা তাঁহার কানে ভাসিয়া আসে। কিন্তু কিছুই আসিত না, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না। হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে হইল—'ওটাতে কারা শুয়ে আছে? নতুন-বিয়ে-করা বউ-ছেলে, না, দুটো মড়া! আমার ভয়ে ওইরকম করছে না কি—।'

তাহার পরদিন হইতে তিনি সকাল সকাল আলো নিভাইয়া দিতেন। ঘুম আসিত না, বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া জাগিয়া থাকিতেন। দিন দুই পরেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার 'ডায়াগ্নোসিস্' ঠিক। তাঁহার ভয়েই উহারা চুপ করিয়া থাকে। দুইটি ঘরের মাঝখানে যে পার্টিশন ছিল, তাহা ছাত পর্যন্ত ছিল না। সেই ফাঁক দিয়া পুত্র-পুত্রবধূর বিশ্রম্ভালাপ তিনি দিন কয়েক শুনিলেন, সম্ভবত উপভোগও করিলেন।

একদিন সকালে উঠিয়া কিন্তু দেখা গেল তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরকে তিনি যে পত্রটি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই—

সিধু,

আমি তোমাদের মুক্তি দিয়ে গেলুম। নিজেকেও মুক্ত করলুম। তোমাদের সঙ্গে বাস করতে হলে যে অনভ্যস্ত সংযমের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হবে সে কারাগারে বাস করা এ বয়সে আমার পক্ষে অসম্ভব। রাত্রি একটা দেড়টা পর্যন্ত বই না পড়লে আমার ঘুম হয় না, অথচ পাশের ঘরে আলো জ্বেলে বই পড়লে তোমাদের প্রেমালাপ জমে না। সামান্য চারটি আলো চালের ভাত, একটু মুগের ডাল, গাওয়া ঘি, দু'একটা ভাজাভুজি এই খেয়ে আমি তৃপ্তি পাই। কিন্তু তোমার কমলা যখন সেবা করবার আতিশয্যে মশলা গরগরে তরকারি তৈরি করে আনে, তখন সোনামুখ করে সেটা খেতে হয়, খেয়ে বাহবাও দিতে হয়, না দিলে অভদ্রতা হয় সেটা। রান্না যে খারাপ হয় তাও নয়, কিন্তু ও ধরনের রান্না খেয়ে আমার তৃপ্তি হয় না। আমার নিজের রুচির কথা ওকে বলতে ভয় পাই, কারণ ও একা-হাতে আবার সব করতে যাবে আমাকে খুশি করবার জন্য। তোমরা মশলা-গরগরে রান্না পছন্দ কর, হজমও করতে পার, আমিও এককালে পারতুম, এখন আর পারি না, ভালও লাগে না। তোমার কমলা নাকি-সুরে যে আধুনিক গান গায়, তা একেবারে ভালো লাগে না আমার, আমার কান যে গান শুনতে অভ্যস্ত, তা ওস্তাদী গান, আধুনিক গান শুনলে মনে হয়,

কতকগুলো উইচিংড়ে ফড়িং-জাতীয় পোকা তাদের antics দেখাচ্ছে লাফালাফি কোরে। আমার এই ব্যক্তিগত অ্যাকোয়ার্ড রুচিকে বদলাতে পারি না, জোর করে তোমাদের উপর চাপাতেও পারি না। কিন্তু রেডিওতে যখন ভালো কানাড়ার আলাপ হচ্ছে, তখন সেটা কঁ্যাক করে বন্ধ করে তোমরা যখন অমুকবালা বা তমুকনাথের সিনেমার গান শোন, তখন আমার সর্বাঙ্গ রিরি করতে থাকে, অথচ মুখের হাসিটি ফুটিয়ে রেখে পা দুলিয়ে দুলিয়ে তাল দিতে হয়। হিটলার না মুসোলিনী, কে যেন তাদের পলিটিকাল প্রিজনারদের শাস্তি দেবার জন্যে এই ধরনের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এ আমার আর সহ্য হল না, তাই পালাচ্ছি। নিজের ব্যক্তিত্বের শূলে চড়িয়ে একটি নারীকে তো হত্যা করেছি, আর করবার ইচ্ছা নেই। কমলা ভালো মেয়ে, আশা করি ওকে নিয়ে তুমি সুখে ঘর-করনা করতে পারবে। নিজের জন্যে পঞ্চাশ টাকা রেখে আমার পেনশনের বাকি টাকাটা তোমাকে প্রতিমাসে পাঠিয়ে দেব। আমি একটা নামজাদা দাতব্য চিকিৎসালয়ের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছিলাম। কয়েকদিন আগে তাঁরা জানিয়েছেন যে, আমাকে তাঁরা 'অনাহারী' সার্জনের পদে বাহাল করতে রাজী আছেন। মাসে শতখানেক টাকা অ্যালাউন্স হিসেবে দেবেন, থাকবার বাড়ী দেবেন, চাকরও দেবেন একটা। এর সঙ্গে পেনশনের পঞ্চাশ টাকা যোগ দিলে আমার ভালই চলে যাবে। সেখান থেকে আমাকে যেন আর টানাটানি করে আনবার চেষ্টা করো না। বাইরে থাকলেই আমি সুখে থাকব এবং আমার ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বের আঁচটা সরে গেলে তোমরাও সুখে থাকবে আশা করি। ইতি—

যে আলেয়ার পিছনে তিনি সারাজীবন ছুটাছুটি করিয়াছেন, সে আলেয়া তাঁহাকে কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহাই আমি বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ধন মান ধর্ম মোক্ষ এসব কিছুই তিনি চাহেন নাই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তিনি সম্ভবত স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন—সেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, যাহা সামাজিক মানুষের পক্ষে দুর্লভ।

৭

আপনাদের অনেকের মনে এ প্রশ্ন হয়তো জাগিতেছে যে, আমি একজন পুলিশ অফিসার, অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে লইয়া আমি এত মাথা ঘামাইতেছি কেন। ঘামাইতেছি, কারণ, আমার এই মাথাটা তিনিই একদিন রক্ষা করিয়াছিলেন।

সেই কথাটাই এবার বলিব। পূর্বে একটু আভাসমাত্র দিয়াছি, এইবার খুলিয়া বলিব। বোমার দলে কেন যোগ দিয়াছিলাম, কবে যোগ দিয়াছিলাম, তাহা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। সে যুগে যে উন্মাদনা বাংলার আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করিতেছিল, সে উন্মাদনার প্রভাব আমিও এড়াইতে পারি নাই। আমি যে-দলে ছিলাম, সে-দলের কাজ ছিল নানা স্থানে স্বদেশী ডাকাতি করা এবং সেই ডাকাতির টাকা দিয়া বিদেশী

অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা। বহুকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত বাহ্রা ডাকাতিই ছিল আমাদের আদর্শ। ডাকাতি করার ফাঁকে ফাঁকে সাহেব অথবা গোয়েন্দা মারিবার চেষ্টা। ইহাই ছিল মোটামুটি আমাদের কার্যক্রম। কিন্তু হায়, একদিন ধরা পড়িলাম। আমাদেরই দলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করিল। বাঙালীদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক কম ছিল না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকও অনেক ছিল। মানবসভ্যতা যেমন কৃষিসভ্যতা ও যাযাবর সভ্যতায় ভাগ হইয়া দুইটি বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙালী সমাজও যেন অনেকটা তাই। একদল চাকরিবিলাসী শান্তশিষ্ট সুবিধাবাদী কেরানীর দল। বড় সাহেবের মন রাখিয়া, গৃহিণীর গহনা গড়াইয়া, বংশ বৃদ্ধি, দোল-দুর্গোৎসব, পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিয়া জীবনের অপরাহ্নে পরচর্চা, পরলোক-চর্চা, দলাদলি, ঘোঁট প্রভৃতিতে মত্ত থাকিয়া হরিনাম করিতে করিতে শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করা—ইহাই মোটামুটি তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। কিন্তু এই বাঙালীর ঘরেই আবার এমন একদল ছেলে- মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, গৃহের বন্ধন, গৃহস্থালীর মায়া যাহাদের বাঁধিতে পারে নাই, আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যাহারা যুগে যুগে গৃহত্যাগ করিয়াছে। এই দলে চৈতন্য ছিলেন, ক্ষুদিরাম, কানাই-লালেরাও এই দলের লোক। ইহাদের সহিত প্রথমোক্ত দলের ঘোর শত্রুতা। কারণ, ইহাদের নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জনের আগুন, ইহাদের ভূমাকাঙ্ক্ষী প্রাণের প্রচণ্ড ঝড়, গৃহস্থের সুখের সংসারকে বারবার শ্মশান করিয়া দিয়াছে। তাই যখনই এইরূপ ত্যাগী আদর্শ-পাগল লোক সমাজে দেখা দিয়াছে, তখনই তাহাদের বিরোধিতা করিবার লোকও দেখা দিয়াছে সংরক্ষণশীল সমাজ হইতে। সংখ্যায় বাঙালী বিপ্লবী এবং বাঙালী গোয়েন্দা প্রায় সমান।

দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা ধরা পড়িয়া একটি মফঃস্বলের জেলে বন্দী হইলাম। আমাদের বিরুদ্ধে চার্জ—সশস্ত্র ডাকাতি এবং হত্যার। কোনোটাই মিথ্যা নয়। ফাঁসি সুনিশ্চিত। মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় বিধাতা দয়া করিলেন। আমাদের দলের লোক জেলের চাকরদের হাত করিয়া আমাদের কাছে গোটা দুই লোডেড রিভলবার পৌঁছাইয়া দিল। যে পাত্রে করিয়া মেথররা প্রতি 'সেল' হইতে বিষ্ঠা পরিষ্কার করে, সেই পাত্রের মধ্যে বিষ্ঠার স্তূপে আত্মগোপন করিয়া আমাদের উদ্ধারকর্তারা আসিলেন। নরেন গোঁসাইকে খুন করিবার জন্য কানাইলালের নিকটও একদা তিনি আসিয়াছিলেন। আমরা আর কাল বিলম্ব করিলাম না, দুইজন ওয়ার্ডারকে হত্যা করিয়া পরদিনই জেল হইতে পলায়ন করিলাম। জেলেরই চাকররা আমাদের সহায়তা করিয়াছিল। তাহা না করিলে পারিতাম না। সেকালে জেলের অনেক চাকরেরা স্বদেশীদের মনে মনে ভক্তি করিত। অনেকে বাহির হইতে টাকাও পাইত প্রচুর।

পাগলা ঘণ্টা যখন বাজিয়া উঠিল, তখন আমরা জেলের বাহিরে। প্রাণপণে ছুটিতেছি। আমাদের তাড়া করিয়াছে রাইফেলধারী মিলিটারী পুলিশ। ঘোড়ায়, মোটরে, পদব্রজে। অধিকাংশই লালমুখ টমি। জেলের নিকটেই তাহাদের একটা ছাউনি ছিল।

কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ একটা গুলি খাইয়া পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধরাও পড়িলাম।

…যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি হাসপাতালের একটা বিছানায় শুইয়া আছি। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় আমার ক্ষতটা পরীক্ষা করিতেছেন। কাছেই একজন টমি দাঁড়াইয়া আছে। কথাবার্তায় মনে হইল, সেই ক্যাপ্টেন। অগ্নীশ্বর বলিলেন, "এর পেটে বুলেট ঢুকেছে। সেটা বার করে না দিলে বাঁচবার আশা নেই। তোমরা কি একে বাঁচাতে চাও?"

"নিশ্চয়—"

"তাহলে এখুনি অপারেশন করতে হবে। আমি কিন্তু আমার আপিসে তোমাদের ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। দু বোতল হুইস্কিও পেয়েছি। তুমি আগে ডিনার খাবে, না, আমার সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে যাবে—"

"আমি অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে কি করব? ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার, আমি খাই গিয়ে। আই হোপ, আই ক্যান ট্রাস্ট্ ইউ, ইউ আর মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড.।"

"অফ কোর্স—"

সাহেব ডিনার খাইতে চলিয়া গেলেন। অগ্নীশ্বর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন অন্য একটা দরজা দিয়া। তিনি কি করিলেন জানি না, একটু পরে দুইটি বেয়ারা একটি স্ট্রেচার লইয়া আসিল। স্ট্রেচারে চড়িয়া আমি যে ঘরে উপস্থিত হইলাম, তাহা অপারেশন থিয়েটার নয়, মর্গ। অগ্নীশ্বর সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মেথর দুইজনকে বলিলেন, "যে আনক্লেমড বডিটা এখানে রয়েছে, সেইটা তুলে নিয়ে যা অপারেশন থিয়েটারে। তুমি শিগ্‌গির নাব—"

স্ট্রেচার হইতে আমাকে নামাইয়া দিয়া আমার কানে কানে বলিলেন, "তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি পালাও—"

স্ট্রেচারবাহিত হইয়া আন্‌ক্লেম্‌ড্‌ মৃতদেহটি অপারেশন থিয়েটারের দিকে চলিয়া গেল। আমি অজানার উদ্দেশ্যে আবার অন্ধকারে পা বাড়াইলাম। বুলেট আমার পেটে প্রবেশ করে নাই, পেটের চামড়া ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছিল, খানিকটা চামড়া তুলিয়া লইয়াছিল, আর কিছু করিতে পারে নাই। কয়েকদিন পরে কাগজে দেখিলাম, হাসপাতালে আমার মৃত্যু হইয়াছে। পেটে বুলেট ঢুকিয়াছিল, তাহা বাহির করিবার জন্য আমার পেট কাটা হয়। সার্জন এ. মুখার্জি অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও বুলেটটি পান নাই। অপারেশনের ফলে আমার মৃত্যু হইয়াছে।

…কিছুদিন পরে দাড়ি, লুঙ্গী আর চাটগাঁয়ের ভাষার সাহায্যে ভোল বদলাইয়া ফেলিলাম। তখন মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট খুব প্রসন্ন ছিলেন, তাই মুসলমানের ছদ্মবেশ গ্রহণ করাই নিরাপদ মনে হইল। চট্টগ্রামের এক মুসলমানের বাড়িতেই চাকর হিসাবে বাহাল হইয়া গেলাম। পরিচয় দিবার সময় বলিলাম,

কলিকাতায় আমার বাবা বাবুর্চির কাজ করিত, হিন্দু-মোসলেম রায়টের সময় হিন্দুর ছুরিতে মারা গিয়াছে, মা কোথায় পলাইয়া গিয়াছে জানি না। ভাই বোন কেহ নাই।

হায়রে, আমার নিজের বাবা মা তখন হয়তো তাঁহাদের শহীদ পুত্রের মৃত্যুশোকে ভালো করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছেন না, কারণ আমার আর একটি ভাই ছিল, সে যে আমার ভাই, একথা পুলিশের কানে গেলে তাহাকেও লইয়া পুলিশ টানাটানি করিবে, এই ভয়ে তাঁহাদের পুত্রশোকও হয়তো ভাষা পাইতেছে না, এই রকম একটা কল্পনা করিয়া আমি সুখ পাইতাম। কিন্তু সত্য যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আরও নিদারুণ। আমার বাবা মা ভাই কেহই রক্ষা পায় নাই। আমার বাবা মা পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন, যে বিশ্বাসঘাতক আমাদের ধরাইয়া দিয়াছিল, আমার ভাই তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে কুকুরের মতো হত্যা করিয়া ফাঁসি গিয়াছে। পুলিশের লোকেরা আমার মা বাবাকেও রেহাই দেয় নাই। আমি যখন বিলাত হইতে ফিরিলাম, তখন তাঁহাদের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত। আমাদের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে না, রাজানুগৃহীত এক ব্যক্তি সেখানে বাড়ি করিয়াছেন, তাঁহার অ্যালশেসিয়ান কুকুরের দাপটে সেখানে কেহ ঘেঁষিতে পারে না। আমি বাবা মায়ের শ্রাদ্ধ তর্পণও করিয়াছি লুকাইয়া। সহজে তাহা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিহার-উত্তর প্রদেশে আমি মুসলমান বলিয়া পরিচিত, প্রকাশ্যে হিন্দুমতে বাবা মার শ্রাদ্ধ করিব কি করিয়া? তবু করিয়াছিলাম। ধনুষ্কোটি যাইতে হইয়াছিল।

হ্যাঁ, আমি শেষ পর্যন্ত বিলাত গিয়াছিলাম। ব্যাপারটি সম্ভব হইয়াছিল বড় অদ্ভুত উপায়ে। আমি যে হাজি সাহেবের বাড়িতে চাকররূপে বাহাল হইয়াছিলাম তাঁহার বৃহৎ পরিবার। তাঁহার নিজের চারটি বিবি! দুইটি বয়স্ক পুত্রও পিতৃ-পন্থা অনুসরণ করিয়া একাধিক বিবাহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, একটি কন্যা এবং একটি ভাগ্নী সপরিবারে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেন। বৃহৎ পরিবার। আমাকে বাসন মাজিতে হইত, বাহিরের ঘর ঝাড়ু দিতে হইত, পুরুষদের কাপড় কাচিতে হইত, ইহা ছাড়া ফাই-ফরমাস তো ছিলই। বাজারও করিতে হইত। বাজার করিতে গিয়া লক্ষ্য করিতাম, একটি ভিখারিণী প্রায় প্রতি দোকানেই গিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। কেহ ভিক্ষা দিতেছে, কেহ দিতেছে না, কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি প্রলুব্ধ। মেয়েটির বয়স আন্দাজ ত্রিশ বত্রিশ হইবে। যুবতী নয়, কিন্তু রূপসী। তাহার চোখের দৃষ্টি ঠিক পণ্য-রমণীর দৃষ্টি নহে। কিন্তু অদ্ভুত সে দৃষ্টি। তাহার ভাষাও চট্টগ্রামের ভাষা নহে, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা। মনে হইল মেদিনীপুরের। মেদিনীপুর বিপ্লবীদের চক্ষে তীর্থস্থান। মেয়েটির কথায় মেদিনীপুরের টান শুনিয়াই প্রথমে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহার পর একদিন সে আমার কাছেও ভিক্ষা চাহিল।

বলিলাম, "আমি তো নিজেই গরীব। তোমাকে আর কি দিতে পারি।"

"যা পার তাই দাও—"

আরও দিন দুই পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভিক্ষা কর কেন। রোজগার করতে পার না?"

মেয়েটি তাহার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। তাহার পর বলিল, "আমার মতো মেয়ের পক্ষে রোজগারের একটি পথই খোলা আছে। অনেকেই আমাকে সে চাকরি দিতে চায়। কিন্তু আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, চোখের দুটি তারা যেন দুটি ছর্‌রা। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার ছেলে হবে? আমাকে মা বলে ডাকবে? আমাকে কেবল খেতে পরতে দিও, তোমার সব কাজ আমি করে দেব—"

"আমি যে মুসলমান মা, আমার ছোঁয়া খাবে তুমি?"

"তুমি যদি মা বলে আমাকে ডাক, তাহলে তো জাতের বিচার আর রইলো না। মায়ের চোখে সব ছেলেই এক জাত।"

"বেশ, তাই হবে। তোমার দেশ কোথা?"

"মেদিনীপুর জেলা, কণ্টাই সাবডিভিসন।"

শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"এখানে কি করে এলে।"

"ভাসতে ভাসতে। এক স্বদেশী আন্দোলনে সায়েবরা এসে পেট্রোল দিয়ে আমাদের ঘর-বাড়ী সব পুড়িয়ে দিলে। আমার স্বামীর মুখের উপর গুলি করলে একজন সাহেব। তার অপরাধটি কি জান? সে বলেছিল 'বন্দে মাতরম'। আমার ছেলেটাকেও মেরে ফেললে। মারলে না কেবল আমাকে।"

তাহার চোখের ছর্‌রা দুইটি প্রখর হইয়া উঠিল। মনে হইল, এখনই বুঝি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

"আমাকে তারা ফেলে চলে আসছিল। কিন্তু আমি সঙ্গ ছাড়িনি। খবর পেয়েছি, ওরা এখানে এসেছে। তাই আমিও এসেছি—"

"ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছ কেন—"

"এখনও বকশিস পাইনি যে।"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল সহসা।

"তুমি ছেলে বলেই তোমাকে সব কথা বললুম। বলা বোধহয় উচিত ছিল না, না? মাথার ঠিক নেই। তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে তো? একবেলা দুটি খেতে দিও কেবল, কেমন? কোথা থাক তুমি।"

"হাজি সাহেবের বাড়িতে। সেখানে যেও না যেন। আমি তোমার খাবার এইখানেই নিয়ে আসব। তুমি কোথায় থাক?"

"কোথাও না। দিন-রাত ঘুরি। ফাঁক খুঁজি। শোবার বসবার কি জো আছে

কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ দাঁড়াবে কাছে এসে। খালি ঘুরে বেড়াই। সকালবেলা বাজারে আসি। এইখানেই খাবার দিয়ে যেও, কেমন ?"

অভিভূত হইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

তাহার পরদিন হইতে রোজই আমার খাবারের খানিকটা অংশ তাহাকে দিয়া আসিতাম। ও অঞ্চলে সকলে তাহাকে পাগলী বলিত। প্রথম প্রথম অনেকে তাহাকে বিরক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, শেষে আর করিত না। সে একজনকে নাকি কামড়াইয়া দিয়াছিল।

এইভাবেই চলিতেছিল। ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। একদিন নদীতে স্নান করিতেছি, হঠাৎ সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। দেখিলাম একটি ছেলে ডুবিতেছে। ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। বাঁচিবার আশা প্রায় নাই। প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম এবং অনেক কষ্টে ছেলেটার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে তীরে তুলিলাম। অনেক জল খাইয়াছিল, হাসপাতালে গিয়া কোনরকমে রক্ষা পাইয়া গেল। শুনিলাম একজন সারেং-এর ছেলে। সারেং একদিন আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং আমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। পুরস্কার লইলাম না। বলিলাম, "আপনার ছেলের 'জান' বাঁচাতে পেরেছি এই তো আমার যথেষ্ট বকশিস। খোদাতালা ওকে বাঁচিয়ে রাখুন, এর জন্যে আমি টাকা নিতে পারব না। গোস্তাকি মাপ করবেন।"

দিনকতক পরেই কিন্তু বকশিসটা লইতে হইল অপ্রত্যাশিতরূপে এবং অন্য প্রকারে। একদিন বাজারে সেই পাগলীটা বলিল, "তুই যে আমাকে মা বলিস, পেন্নাম করলি না তো একদিন। পেন্নাম কর আজ—"

ভঙ্গীভরে শাড়িটা তুলিয়া পা বাড়াইয়া দিল। দেখিলাম, তাহার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি. চোখের কোণে জল।

"পেন্নাম কর। মাকে পেন্নাম করবি তাতে আর লজ্জা কি—"

চারিদিকে লোক জড় হইয়া গিয়াছিল। আমি সত্যই একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শেষে তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই তাহাকে একটা প্রণাম করিলাম। সে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। সহসা তাঁহার চিবুক ও নিচের ঠোঁটটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল—"মানুষের মতো মানুষ হও। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি হবে।"

মেয়েটির নাম ছিল বিশাখা। বাঁ হাতে উলকি দিয়া নামটি লেখা ছিল। সে আজ কত দিনের কথা। তাহার হাসি-কান্না মাখা মুখখানি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে। এতটুকু ম্লান হয় নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, তাহার আশীর্বাদ কি আমার জীবনে ফলিয়াছে ? সত্যই কি মানুষের মতো মানুষ হইতে পারিয়াছি ?

প্রণাম করার পরদিনই ঘটনাটি ঘটিল। একজন মিলিটারি সাহেব বাজারে

আসিয়াছিল, বিশাখা ছুটিয়া গিয়া একেবারে তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। সে কামড় সাংঘাতিক মরণ কামড়। বুলডগ যেমন একবার কামড়াইয়া ধরিলে সে কামড় আর খোলে না, এ কামড় তেমনি কামড়। অনেক টানাটানি ধস্তাধস্তি করিয়াও বিশাখাকে ছাড়ানো গেল না। তাহার পিঠের উপর লাঠি জুতা ঘুষি চড় বর্ষিত হইতে লাগিল, তবু সে ছাড়িল না। শেষে একজন সার্জেন্ট তাহার কাপড় খুলিয়া সর্বাঙ্গে শপাশপ হাণ্টার চালাইতে লাগিল। তবু কোন ফল হইল না। শেষে তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। বিশাখা মরিল, কিন্তু তাহার মৃতদেহটা সাহেবের টুঁটি কামড়াইয়া ঝুলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার রক্তাক্ত মুখটা সাহেবের গলা হইতে যখন ছাড়াইয়া লওয়া হইল, তখন দেখা গেল, সাহেবের টুঁটিটা সে একেবারে চিবাইয়া দিয়াছে, একাধিক বড বড় শিরাও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আধঘণ্টা পরে সাহেবেরও মৃত্যু হইল।

বাংলার অগ্নিযুগের ইতিহাসে বিশাখার নাম লেখা নাই। আরও অনেকের নাই। ইচ্ছা করিয়া অনেকে নিজেদের পরিচয় মুছিয়া দিয়া গিয়াছে। কাজটাই তাহাদের কাছে বড় ছিল, নামটা নয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে আমাদের সেই পলাতক জীবনে যখন বন্যপশুর মতো আমরা একস্থান হইতে আর একস্থানে পালাইয়া বেড়াইতাম, যখন পথের বদলে বিপথ এবং গৃহের বদলে অরণ্যই আমাদের নিকট বেশি নিরাপদ মনে হইত, যখন ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, বিশ্রামের শয্যা দুর্লভ বিলাসের মতো ছিল, সেই সময় কত অপরিচিত গৃহে আশ্রয় পাইয়াছি, কত অচেনা মা-বোনেদের সেবা পাইয়াছি, তাহার ইতিহাসও কোথাও লেখা থাকিবে না। তাঁহারা জানিতেন আমরা বোমার দলের লোক, তাঁহারা জানিতেন আমাদের আশ্রয় দেওয়া নিরাপদ নয়, তবু আশ্রয় দিতেন, হয়তো একঘণ্টার জন্য, হয়তো এক রাত্রির জন্য, আজ কোথায় তাঁহারা, ইতিহাসে তাঁহাদের নাম নাই। বিশাখারও নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবন আমার ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাহাকে একবারও অন্তত প্রণাম করিয়াছি।

বিশাখা মরিয়া কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলিয়া গেল। পুলিশের খবর পাইতে বিলম্ব হইল না যে, আমি তাহাকে রোজ খাইতে দিতাম। বাজারে যাইতেই একজন আমাকে বলিল, "তুমি শিগ্‌গির এখান থেকে পালাও। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে—"

বাজার না করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া গেলাম। হাজি সাহেবকে খুলিয়া বলিলাম সব। তিনি বলিলেন, "পুলিশ তোমার খোঁজে এখানেও এসেছিল, আমি বলে দিয়েছি, তুমি এখানে নেই। তোমাকে আমি জবাব দিয়েছি। তুমি এদেশ ছেড়ে পালাও।"

"কোথা পালাব হুজুর। আমি গরীব মানুষ—"

হাজি সাহেব গম্ভীরমুখে দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

"কিন্তু আমি তো বাপু তোমাকে আর আমার বাড়িতে থাকতে দিতে পারি না। তুমি তাহলে এক কাজ কর, সারেং সাহেবের কাছে যাও। তাঁর জাহাজ দু'-একদিনের

মধ্যেই ছাড়বে। তিনি যদি তোমাকে জাহাজে তুলে নিয়ে কোথাও পার করে দেন, তাহলে বেঁচে যাবে তুমি এ যাত্রা—"

"কোন সারেং—"

"আরে, যার ছেলেকে তুমি বাঁচিয়েছিলে—"

সারেং বলিল, "নিশ্চয়, তোমার জান বাঁচাব বইকি। তুমি আমার আলীকে বাঁচিয়েছ। আমার জাহাজ বিলেত যাবে। যেতে রাজী আছ তো? জাহাজের খোলের ভিতর লুকিয়ে থাকতে হবে কিন্তু।"

"আপনি যা করতে বলবেন, তাই করব। খোলের ভিতর কতদিন থাকতে হবে?"

"বেশিদিন হয়তো না-ও হতে পারে। কাপ্তেন সাহেবকে বলব, আমি একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি হয়তো আপত্তি করবেন না।"

কাপ্তেন সাহেব আপত্তি করিলেন না। শুধু তাহাই নয়, দিনকয়েক পরে আমি কাপ্তেন সাহেবেরই প্রিয় ভৃত্য হইয়া পড়িলাম। তিনি মদটা একটু অধিক মাত্রায় খাইতেন এবং মত্ত অবস্থায় আমাকে গালাগালি দিয়া সুখ পাইতেন। এটা বোধহয় তাঁহার চাটের কাজ করিত। দুই এক পেগ পেটে পড়িবামাত্র তিনি আমাকে সন্ অব্ এ বিচ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং ধাপে ধাপে গালাগালি যে ভাষায় গিয়া শেষ পর্যন্ত পৌঁছিত তাহা লেখা যায় না। আমার কাজ ছিল সোডার বোতল খোলা, মদের বোতল খোলা, বরফ ভাঙা, গালাগালি শোনা এবং তিনি যখন বে-এক্তার হইয়া পড়িতেন, তখন তাহাকে লইয়া গিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়া। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে লাথিও মারিতেন। সবই আমি নির্বিকারভাবে সহ্য করিতাম। অভিনয় ভালই করিতেছিলাম। যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে বেমালুম খাপ খাওয়াইয়া লইবার শিক্ষা বিপ্লবী জীবনেই লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিপ্লবী জীবনে বাহিরে যেভাবেই আত্মপ্রকাশ করি না কেন, ভিতরে ভিতরে স্বকার্যসাধনের লক্ষ্য ঠিক থাকিত। এক্ষেত্রে তাহা ছিল না। তাই মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিলাম। নিজেদের দলের লোকই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের ধরাইয়া দিয়াছে এই গ্লানিতে বিপ্লবীজীবনের সম্বন্ধেই আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তখনও জানিতাম না যে, আমার ভাই সেই বিশ্বাসঘাতকটাকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইয়াছে। জানিলে হয়তো আবার বিপ্লবী জীবনেই ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু তখন জানিতাম না। বিশাখার মৃত্যু মনকে নাড়া দিয়াছিল, বিশাখার মৃত্যুর জন্যই এই জাহাজে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছে, অদৃষ্ট যে কোন পথে আমাকে চালিত করিতেছে, ইহার পর কোথায় কি করিব, চিরকাল পলাতকের ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হইবে কি না, এই সব অনিশ্চিত ভাবনায় মনটা সর্বদাই অবসন্ন হইয়া থাকিত। এমন সময় হঠাৎ একটা পথের নির্দেশ মিলিয়া গেল। জীবনে হঠাৎই এইরূপ পথের নির্দেশ মেলে। জীবনে যাহা হইয়াছি তাহা আকস্মিক

যোগাযোগের ফলেই হইয়াছি। পুরুষকার না থাকিলে অবশ্য কিছুই হয় না। কিন্তু পুরুষকার প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় এইরূপ আকস্মিক যোগাযোগের ফলে। কোথা হইতে কে আসিয়া একটা বিশেষ পথে কেন যে লইয়া যায় তাহা কে বলিবে।

একদিন চোখে পড়িল, ডেকে বসিয়া একটি যুবক নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছে। চেহারাটা ভারতীয় তো বটেই, বাঙালী বলিয়া সন্দেহ হইল। আস্তে আস্তে পিছন দিকে গিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কি বই পড়িতেছে। দেখিয়া বিস্মিত এবং চমকিত হইলাম। বাংলা বই, কিন্তু ছাপা নয়, হাতে-লেখা। লেখাটাও আমার চেনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল, তাহার পর সহসা মনে পড়িল। এ যে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের হস্তাক্ষর। সুবিমলকে লেখা তাঁহার অনেক চিঠি যে আমি পড়িয়াছি। এ ভদ্রলোক কে? অগ্নীশ্বরের কোনও আত্মীয় না কি। তখন আর কিছু বলিলাম না। আস্তে আস্তে সরিয়া গেলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ঔৎসুক্য জাগিয়া রহিল। ভদ্রলোকটির পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইবে। পরদিন ঝড়বৃষ্টি নামিল। ডেকে কেহই বাহির হইতে পারিল না। তাহার পরদিনও ভদ্রলোকটিকে পাইলাম না। তাহার পর চোখে পড়িল তিনি জাহাজের ডাক্তারবাবুটির ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন। একটু পরেই তাঁহার সহিত দেখা হইল। তিনি ডাক্তারবাবুর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, আমি আগাইয়া গিয়া নমস্কার করিলাম এবং বাংলায় বলিলাম, "নমস্কার, গায়ে পড়ে আলাপ করছি বলে ক্ষমা করবেন। আপনি বাঙালী, তাই আলাপ করবার লোভ সামলাতে পারলুম না।"

"আপনিও বাঙালী?"

তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আমার পোশাকে এবং চেহারায় বাঙালীত্ব কিছু ছিল না। মুখময় দাড়ি, গোঁফ কামানো, পরনে আধময়লা পাজামা, গায়ে লম্বা নীল কোট একটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মুসলমান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"জাহাজে চাকরি করেন?"

"হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। হয়তো আত্মীয়তাও বেরিয়ে পড়তে পারে—"

"আমি হিন্দু। আপনি তো মুসলমান।"

হাসিয়া বলিলাম, "হিন্দুর সঙ্গেও মুসলমানের আত্মীয়তা হয় বই কি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি কেবল জাত বা রক্তের সম্পর্ক দিয়েই ঠিক হয়?"

আমার মুখে এ ধরনের কথা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় নয়। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বের সম্পর্কটাই সব চেয়ে

বড়। বেশ, আসবেন, নম্বর আঠারো আমার কেবিন। যখন সুবিধে হবে আসবেন। আমি ঘরেই থাকি প্রায়।"

সেইদিনই একটু পরে অবসর মতো তাঁহার কেবিনে গিয়া দেখা করিলাম। তিনি তখনও অগ্নীশ্বরের লেখাটা পড়িতেছিলেন।

"আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। কোথা বাড়ি আপনার—"

হাসিয়া বলিলাম, "রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'—আমার অবস্থা অনেকটা তাই। কোথায় যে আমার বাড়ি তা জানি না। সর্বত্র সেইটেই খুঁজছি।"

সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন তিনি।

"আপনি তো গুণী লোক দেখছি মশাই। আমার সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা আছে একথা তখন হঠাৎ মনে হল কেন—"

"আপনি যে বইটা পড়ছেন, তার হাতের লেখাটা আমার চেনা। সেদিন ডেকে বসে যখন পড়ছিলেন তখন চোখে পড়েছিল লেখাটা।"

"ও, কার লেখা বলে মনে হয়েছিল আপনার?"

"ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের।"

"ঠিক বলেছেন তো। তাঁরই লেখা। আপনার সঙ্গে এঁর আলাপ কি করে হয়েছিল—"

"ছাত্রজীবনে ওঁকে প্রথম দেখি আমি। তখনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কোলকাতায় যখন কলেজে পড়তে গেলাম, তখন ওঁর আরও পরিচয় পেলাম। আমার এক সহপাঠী সুবিমল সাহিত্যচর্চা করত, এখনও করে বোধহয়, অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে তার লেখার সমালোচনা করতেন। সুবিমল আমাকে দেখাতো সে সব। তখনই তাঁর ধারালো মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। খাপখোলা তলোয়ার যেন। যদিও তখন ওঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমার হয়নি, কিন্তু মনে হয়, পরে আমি যে পথে পা বাড়িয়েছিলাম তা ওঁরই প্রভাবে।"

আবেগের মুখে এই পর্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলাম। ভয় হইল, এ কি করিতেছি! অপরিচিত একটা লোকের কাছে এসব কথা বলা তো নিরাপদ নয়।

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমিও অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের ছাত্র। এফ-আর-সি-এস পড়ব বলে বিলেত যাচ্ছি। সত্যিই তিনি অসাধারণ লোক, অসাধারণ ডাক্তার, অসাধারণ মানুষ। বাংলা দেশে ও রকম লোক বেমানান। ওঁর কদর করবার লোক নেই আমাদের দেশে। বিদেশে জন্মালে উনি ভলটেয়ার রুশো হতে পারতেন, এদেশে ওঁর নাম পর্যন্ত জানে না কেউ।"

"ওটা ওঁর কি লেখা পড়ছেন?"

"এটা একটা অদ্ভুত লেখা। লেখাটার নাম হচ্ছে 'আধুনিক পঞ্চকন্যা।' যখন কলেজে পড়তুম, ওঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার তর্ক হত আমাদের ধর্ম পুরাণ নিয়ে। উনি

আর্যসভ্যতার একজন গোঁড়া ভক্ত, গীতা রামায়ণ মহাভারতের অনুরাগী পাঠক এবং সমালোচক। আমি ওঁকে একটা চিঠিতে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম যে, আমাদের দেশে যে পঞ্চকন্যাকে রোজ সকালে স্মরণ করতে বলা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকটিই তো একাধিক পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছেন। এঁদের স্মরণ করার মানে কি? তার উত্তরে উনি ছোটোখাটো একটা বই লিখে পাঠিয়েছেন। এটা পেয়েছি অনেকদিন আগে, কিন্তু ভালো করে পড়া হয়নি তখন। তাই সঙ্গে করে এনেছি ভালো করে পড়ব বলে। আপনি তো মুসলমান, পঞ্চকন্যার কথা জানেন না, নামই শোনেননি বোধহয়—"

হঠাৎ কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। ইচ্ছা হইল বলিয়া ফেলি—গীতা আমার কণ্ঠস্থ, রামায়ণ-মহাভারত গুলিয়া খাইয়াছি, পঞ্চকন্যা আমার নিকটও দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মতো বিস্ময়জনক। শুধু পঞ্চকন্যাই নয়, মহাভারত-রামায়ণের অনেক চরিত্রই। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া ফেলিলাম। ভয় হইল, ভাবিলাম, 'না, এখন ধরা-ছোঁয়া দেওয়া ঠিক নয়'।

বলিলাম, "নাম শুনেছি বই কি। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী এদের কথা বলছেন তো? খুবই শুনেছি। গোঁড়া হিন্দুরা হয়তো ওদের অসতী বলবেন, কিন্তু মুসলমানরা বলবে না। সের আফগানের বিবি মেহেরুন্নিসার জগদ্বিখ্যাত নূরজাহান হতে আটকায়নি—। লেখাটা আপনার পড়া হলে যদি দয়া করে দেন আমাকে, একটু পড়ে দেখব—"

"আপনার মনের চেহারার সঙ্গে বাইরের চেহারার তো মিল নেই দেখছি। এ জাহাজে আপনি কতদিন চাকরি করছেন?"

"বেশি দিন নয়। এ জাহাজ ছাড়বার সময়ই বাহাল হয়েছি—"

"কি কাজ করতে হয়।"

"ক্যাপ্টেন সাহেবের ফাই-ফরমাস খাটতে হয়। ওরই চাকর হয়ে যাচ্ছি—"

"আপনি এ কাজ নিয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। আপনার কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় আপনি শিক্ষিত লোক। লেখাপড়া কতদূর করেছেন?"

"বি.এস.সি পাশ করেছি। দেশে কিছু জুটল না, তাই ভাগ্যঅন্বেষণ করতে বেরিয়ে পড়েছি। প্রথম এই চাকরিটাই জুটল, তাই করছি। তারপর দেখি অদৃষ্টে কি আছে—"

দুয়ারের কাছে কাহার যেন পদশব্দ পাওয়া গেল। পরমুহূর্তেই ঠক্‌ঠক্ করিয়া দুয়ারে টোকা পড়িল।

"মে আই কাম্ ইন্ ডক্?"

"ও ইয়েস।"

যিনি প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া আমার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। ইনি সেই মিলিটারি ক্যাপ্টেন, যিনি আমাদের পিছনে তাড়া করিয়া আমাদের উপর গুলি

চালাইয়া অবশেষে অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারই চোখে ধুলা দিয়া অগ্নীশ্বর আমাকে অপারেশন থিয়েটারে না লইয়া গিয়া মর্গে লইয়া যান এবং সেখান হইতে আমাকে ছাড়িয়া দেন। এ লোকটা এখানে আসিল কোথা হইতে। আমি ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করিয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিলাম বটে, কিন্তু চলিয়া গেলাম না। দরজার বাহিরে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বলা বাহুল্য, আলাপ ইংরেজিতেই হইতে লাগিল।

"ডাক্তার, আমার লিভারের ব্যথাটা আবার বেশ বেড়েছে। জাহাজের মেডিকেল অফিসার যে ওসুধটা দিয়েছে তাতে তো কিছু হচ্ছে না। তুমি কিছু বাতলাতে পার ?"

"পারি। কিন্তু তাতো তুমি শুনবে না। মদটা ছাড়।"

"সে তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। কাল আধ বোতলের বেশি খাইনি তো—"

ডাক্তারবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

"কিছু বলছ না যে, কি পড়ছ তুমি ওটা। হাতের লেখা দেখছি। লাভ্ লেটার ?"

"না—"

"পর্ণোগ্রাফি না কি! হাতে-লেখা কেন ?"

"ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখার্জি আমার শিক্ষক ছিলেন, তিনিই লিখে পাঠিয়েছেন। খুব ভালো লেখেন।"

"ওয়েট্, ওয়েট্, অগ্নীশ্বর মুখার্জি ? যিনি সিভিল সার্জন ছিলেন ?"

"হ্যাঁ—"

"গ্রেট ম্যান ছিলেন তিনি। হি ওয়াজ এ নাট্"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "আমাকে খুব বাঁচিয়েছিলেন একবার। একবার একাই শিকারে গেছি এক মফঃস্বলে। আমার সঙ্গে একটা ইণ্ডিয়ান বয় আমার জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে একটা গাছতলায় বসিয়ে আমি তিতিরের সন্ধানে ঢুকলুম গিয়ে একটা জঙ্গলে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হল না। ছিল অনেক তিতির, একটাও মারতে পারলুম না। ফুর্‌র ফুর্‌র করে ঝোপঝাপে ঢুকে পড়ল সব। টেম্পার খারাপ হয়ে গেল খুব। তিন-চার মাইল হাঁটতে হয়েছিল বনে-বাদাড়ে, আবার হেঁটে হেঁটে ফিরলুম। খুব ক্ষিধেও পেয়েছিল। তবে আশা ছিল, আমার কিটের ভিতর কিছু বিস্কুট আর খানিকটা পোর্ট আছে, তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে। ফিরে গিয়ে কি দেখলুম জান ? কিট্ ব্যাগ খোলা, বিস্কুটের টিন খালি। সেই ছোঁড়া সব বিস্কুটগুলি খেয়েছে। কিট্ ব্যাগটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে পোর্টের বোতলের ছিপিটাও ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। পোর্টও দেখলাম পড়ে গেছে অনেকটা। লুক্ অ্যাট্ দি চীক্ অব দি বয়। জিজ্ঞেস করলাম, বললে, আমি কিছু জানি না।

আমার আর সহ্য হল না, বুটসুদ্ধ এক লাথি ঝেড়ে দিলাম তার মাথায়। হল কি জান? ডিমের মতো মাথাটা ফেটে গেল। এটা প্রত্যাশা করিনি। এক লাথিতে মরে যাবে এ কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু ছোঁড়া মরে গেল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি স্টোন ডেড্। কি করি, তখন এক ডুলি ভাড়া করে নিয়ে গেলাম তাকে হাসপাতালে। সেখানে তাকে ফেলে রেখে যেতে পারি না, দ্যাট্ উড্ হ্যাভ বিন্ ক্রিমিন্যাল। হাসপাতালে ছিল অগ্নীশ্বর দি গ্রেট। পুলিশে খবর দিতে হল অবশ্য। কিন্তু অগ্নীশ্বর এমন রিপোর্ট দিলে যে আমি বেঁচে গেলাম। হি ওয়াজ এ স্পোর্ট।"

একটু থামিয়া সাহেব আবার বলিলেন, "অবশ্য, আমারও পরে একটা সুযোগ এসেছিল, অগ্নীশ্বরের এ ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি। উই আর কুইট্স্।"

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছিল?"

"এখন আমি রিটায়ার করে ফিরছি, বলতে আর বাধা নেই। তবে কথাটা আর কাউকে বোলো না। আমি একবার একদল টেররিস্টকে তাড়া করেছিলাম। জেলে দুটো ওয়ার্ডারকে খুন করে পালাচ্ছিল তারা। গুলি খেয়ে পড়ে গেল কয়েকজন। তাদের ফার্স্ট-এড দেবার জন্য নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। কাছেপিঠে ও ছাড়া আর হাসপাতাল ছিল না। সেখানে গিয়ে দেখি, সেখানকার ডাক্তার অগ্নীশ্বর। আগে আলাপ ছিল, খুব খাতির করে বসালে আমাদের নিজের কোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে। বললে, যদি আপত্তি না থাকে ডিনারের ব্যবস্থা করতে পারি। তখন রাত আটটা হবে। খিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। বললাম, কর। কিন্তু আগে চল, যাদের ধরে এনেছি, তাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। অগ্নীশ্বর যখন ওদের পরীক্ষা করছিল, তখনই সন্দেহ হল, ওদের মধ্যে একটা ছোকরা যেন ওর চেনা। ওর চোখমুখের ভাবভঙ্গী থেকে বুঝলুম সেটা। সে ছোকরার পেটের উপর দিয়ে একটা বুলেট চলে গিয়েছিল। অগ্নীশ্বর বললে, বোধহয় পেটে ঢুকেছে, পেট কাটতে হবে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি অপারেশন থিয়েটারে আমার সঙ্গে যাবে, না, ডিনার খাবে গিয়ে। আই টুক্ দি হিন্ট্। বললাম, অল রাইট, তুমি অপারেশন কর গিয়ে, আমরা ডিনার খেতে যাচ্ছি। ফিরে এসে দেখলাম, সে ছোকরা পালিয়েছে, অগ্নীশ্বর একটা মড়ার পেট কেটে ঢাকা দিয়ে রেখেছে। সম্ভবত কোনও আন্‌ক্লেম্‌ড্ বডি ছিল মর্গে। আমি বুঝতে পারলুম সবই, বাট্ আই ওভারলুক্‌ড্। আর জান? এই জন্যে তার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। হি ওয়াজ এ নাট্—"

আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ মনে হইল না। দূরে কাপ্তেন সাহেবের গলার আওয়াজ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি সেই দিকেই চলিয়া গেলাম।

পরদিন আবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, লণ্ডনে তাঁহার এক আত্মীয় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং লইতেছেন। ইনি তাঁহারই বাসায় গিয়া উঠিবেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করবেন ? ফিরে আসবেন না নিশ্চয়। আপনার পাসপোর্ট আছে তো ?"

"না। আমি সারেং সায়েবের দয়ায় লুকিয়ে জাহাজে ঢুকেছি। আমাকে নাবতে দেবে না বোধহয়।"

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি কি নাবতে চান ?"

"চাই। কিন্তু কি করে সম্ভব হবে জানি না।"

"যে সারেং আপনাকে এনেছে, তিনিই কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন হয়তো। বলেছেন তাঁকে কিছু ?"

"না, এখনও বলিনি।"

"বলে দেখুন। আমার কাছে কাল আসবেন একবার। আপনার ফোটো তুলে নেব একখানা।"

ভয় পাইয়া গেলাম।

"ফোটো ? কেন ?"

"এমনি নেব। আপনাকে ভালো লেগেছে আমার। একজন বি. এসসি পাশ ছেলে যে দরকার হলে চাকরের কাজও করতে পারে এটা—"

প্রশংসা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "অগ্নীশ্বরবাবুর লেখাটা কি আপনার পড়া হয়েছে ?"

"একটু বাকি আছে।"

"পড়া হলে আমাকে দেবেন দয়া করে।"

"দেব।"

পরদিন আবার একফাঁকে তাহার কেবিনে গেলাম। তিনি অগ্নীশ্বরের লেখা খাতাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "নিন্। পড়া হয়ে গেলে ফেরত দেবেন। হারায় না যেন।"

"আমার ইচ্ছে আমি এটা টুকে নি। এতে আপনার আপত্তি নেই আশা করি।"

"টুকে নিতে পারেন, আপত্তি নেই, কিন্তু আগেই অত কষ্ট করতে যাবেন কেন। পড়েই ফেলুন না আগে। ভালো লাগে টুকবেন।"

"আচ্ছা।"

"আসুন, এবার আপনার একটা স্ন্যাপ তুলে নি। অদ্ভুত জিনিসের ফোটো সংগ্রহ করার বাতিক আছে আমার।"

"আমার মধ্যে কি এমন অদ্ভুত দেখলেন।"

"অদ্ভুত বই কি। বাঙালীর ছেলে হয়ে বি. এসসি. পাশ করে আপনি এই চাকরি করছেন, এরকম আমি অন্তত দেখিনি।"

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আপনি হিন্দু হলে বোধহয় পারতেন না, মুসলমান বলেই পেরেছেন। হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা বড় বিলাসী।"

"হিন্দু বাঙালী ছেলেদের সম্বন্ধে আপনার এ হীন ধারণা কেন?"

ক্যামেরাটা ঠিক করিতে করিতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা হয়েছে। হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানি হবার জন্যে আপিসের দরজায় মাথা কুটে বেড়াবে, রকে বসে আড্ডা মারবে, সিনেমায় ভীড় করবে, রাজনীতি নিয়ে হুজুক করবে, কিন্তু গতর খাটিয়ে পরিশ্রম করে কিছু করবে না। ওদের স্বাধীন ব্যবসার দৌড় মণিহারী দোকান পর্যন্ত, সেখানে সকাল-সন্ধে একদল ছোঁড়া জুটিয়ে বেশ আড্ডা মারা যায়, ওদের স্বাধীন পেশার দৌড় বার-লাইব্রেরী পর্যন্ত, যেখানে পয়সা না থাক রাজা-উজির মারবার সুযোগ আছে, এম. এসসি. পাশ করেও উকিল হচ্ছে দলে দলে। আপনার মতো বেঠিক পথের পথিক হওয়া হিন্দু বাঙালীর ছেলের পক্ষে শক্ত। তাই আমার মনে হয়, বাংলা দেশে কার্নেগী, ফোর্ড যদি কোনও কালে জন্মায় তা জন্মাবে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে। ওরাই দুঃসাহসী, বেপরোয়া, ওরাই মরীয়া হয়ে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, ওদের মধ্যে আরব বেদুইনদের রক্ত আছে। আপনাকে দেখে তাই খুব ভালো লাগলো—"

আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। বলিয়া ফেলিলাম, "আমি মুসলমান নই, আমি হিন্দু বাঙালী।"

"বলেন কি, তাহলে মুসলমান বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন কেন?"

"কারণ আছে—"

"কারণটা কি?"

"আমার জীবন-মরণ সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন একথা গোপন রাখবেন, তাহলে সব খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখেন নি, এ রকম লোক অবশ্য আমি দেখেছি। আপনার প্রতিশ্রুতি পেলেও আমি হয়তো নির্ভয় হতে পারব না। কিন্তু আপনার মতো লোকের চক্ষে হিন্দু বাঙালীর ছেলে এতো হীন হয়ে আছে, এ আমি সহ্য করতে পারলাম না। তাই হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছি। যে হিন্দু-বাঙালীর ঘরে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, যতীন দাস, বিনয়, সুভাষ জন্মেছে, যাদের কীর্তি অমাবস্যার আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের মতো ঝলমল করছে, তাদের আপনি ছোট বলবেন? বাঙালীর ছেলে কুলি, রিক্সা-ওলা, মুটে-মজুর হতে পারছে না বলে আপনারা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করছি, সোনা দিয়ে কখনও কোদাল হয়? ভালো ইস্পাত দিয়েও কি হয়? যারা আজ সারা ভারতে কুলি, রিক্সা-ওলা, মুটে-মজুর হয়েছে, তারা কি শ্রমের মহিমা-মর্যাদায় মুগ্ধ হয়ে তা হয়েছে? তারা হয়েছে, তাদের অন্য কিছু হবার যোগ্যতা নেই বলে, তারা প্রচ্ছন্ন কার্নেগী বা ফোর্ড বলে নয়। এটা সত্যি

কথা, হিন্দু বাঙালীর ছেলেদের শারীরিক পরিশ্রমে রুচি নেই, তার কারণ তারা অন্য ধাতুতে গড়া। পেটের জন্যে তারা শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারে না। করতে উৎসাহ পায় না। কিন্তু আদর্শের জন্যে পারে। স্বদেশীর সময় ওই হিন্দু বাঙালীর ছেলেরাই জেলে যে শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছে তার তুলনা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নেই। তাদের জেলে নিয়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতে হাতকড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, উঠ-বোস্ করিয়েছে, দাঁড় করিয়ে পা দুটো টেনে যতদূর সম্ভব ফাঁক করা যায় তার চেয়েও বেশি করেছে, হাণ্টার মেরে ক্ষতবিক্ষত করেছে, খিদের সময় খেতে দেয় নি, তেষ্টার সময় জল দেয় নি, অসুখ হলে ওষুধ দেয় নি। গোঁফ ভুরু চুল টেনে টেনে উপড়ে ফেলেছে, তবু ওই হিন্দু-বাঙালীর ছেলেদের দমাতে পারে নি। শারীরিক কষ্টকে তুচ্ছ করেছিল তারা আদর্শের জন্যে। তারা আজ বাসন-মাজা চাকর, মুটে, রিক্সাওলা আর ফ্যাকটারির কুলি হচ্ছে না বলে তাদের আপনি অবজ্ঞা করবেন ? এ আমি সহ্য করব না—"

"বড্ড উত্তেজিত হয়েছেন। বসুন। দাঁড়ান, আমি কপাটটার খিল লাগিয়ে দি—"

সত্যিই আমি উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ডাক্তারবাবু কপাটটা ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি যে হিন্দু বাঙালীদের কথা বললেন, তাঁরা নমস্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা তো নিঃশেষ হয়ে গেছেন। হিন্দু-বাঙালীর ঘরে ওরকম ছেলে আর আছে কি এখন ?"

"নিশ্চয়ই আছে। বাঘের বংশে বাঘই জন্মায়। কিন্তু আপনারা ব্যাঘ্রবংশধরদের নতুন বুলির কারাগারে বন্দী করে, অনাহারে জরাজীর্ণ করে শেষে বলছেন, তোমরা লাঙল টানো, ঘানি টানো, গাড়ি টানো। তা তারা পারবে কেন ? তারা গরু হতে পারে নি বলে আপনারা তাদের গালাগালি দেবেন এ আমি সহ্য করতে পারব না। তবে এইখানেই একটা কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই। হিন্দু-বাঙালীদের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে বলেই তাদের কথা বললাম। এর থেকে এটা যেন মনে করবেন না যে, অহিন্দু বা অবাঙালীদের প্রতি আমার ঘৃণা আছে। তাঁদের কাছেও অনেক ঋণে ঋণী হয়ে আছি আমরা। সে ঋণ সারা জীবন অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে স্বীকার করব। মুসলমান হাজি সাহেব, মুসলমান সারেং আমাকে যদি না সাহায্য করতেন, আমি কোথায় থাকতাম আজ। তাঁদের অনেকের কাছে এত ভালোবাসা পেয়েছি, যা নিজের লোকের কাছেও পাই নি। হিন্দু-বাঙালীর ছেলের এ-ও একটা বৈশিষ্ট্য, তারা সবাইকে আপন করে নিতে পারে—"

"বসুন, বসুন, ভালো করে বসুন। সব কথা শুনি আপনার। ভয় নেই, আমার কাছ থেকে কোনও কথা বেরুবে না।"

হাসিয়া বলিলাম, "ভয় আমার নেই। বেগতিক দেখি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয় !"

তাহাকে আমার জীবন-কাহিনী শুনাইতে লাগিলাম।

কাহিনী শেষ হইলে উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর ডাক্তারবাবু বলিলেন, "অদ্ভুত। আপনার কথাবার্তা শুনে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এতটা কল্পনা করতে পারি নি। কিন্তু একটা খটকা আমার এখনও আছে। বলব?"

"বলুন।"

"আপনি বলছেন, বাঙালী বিদ্রোহীর জাত। বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবার সুযোগ পেলেই তার প্রতিভার মশাল দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করে জ্বলতে থাকে। এ সুযোগ না থাকলে স্তিমিত হয়ে পড়ে সে। কিন্তু এরকম অগ্নিকাণ্ড করে করে একটা জাত কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?"

"পারে বইকি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই তো একটা জাত বেঁচে রয়েছে, যারা চির-বিদ্রোহী। এরা বৈদিক সভ্যতা, বুদ্ধ সংস্কৃতি, গ্রীক আক্রমণ, মুসলমান আক্রমণ, তৈমুর, নাদিরশাহ সব হজম করে বসে আছে। ইংরেজের কাছেও মাথা নোয়ায় নি। আমান-উল্লা এদের আত্মার আধুনিক নমুনা। এখনও তারা অপমানের জবাব দেয় রাইফেলের গুলি চালিয়ে, আবেদন-নিবেদন করে নয়। ওরা মুসলমান, কিন্তু ওরা বাঙালীর স্বগোত্র, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ওদের কাছেই গিয়েছিলেন সেইজন্য—"

"কিন্তু এরকম করে কি একটা জাত বাঁচবে?"

"হয়তো বাঁচবে না। রানা প্রতাপ সিং বাঁচে নি, শিবাজী বাঁচে নি, লক্ষ্মীবাঈ বাঁচে নি, আমি যে সব বাঙালীকে বাঙালী জাতির গৌরব বলে মনে করি, তারাও বাঁচবে না। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে যে দাগটা তারা রেখে যাবে, সেটা সোনার দাগ।"

"কিন্তু কেউ যদি না বাঁচে, তাহলে শুধু সোনার দাগ নিয়ে কি হবে—"

"আপনার ভয় নেই, ওই বাঙালীরই মধ্যে এমন একদল লোক আছে, যারা চাকরি করে, সেলাম করে, খোশামোদ করে, অপরের মন জুগিয়ে ঠিক বেঁচে থাকবে আর শুয়োরের পালের মতো বংশ বৃদ্ধি করে যাবে। এদের কথাই কবিগুরু একটা কবিতাতে বলে গেছেন, 'ভদ্র মোরা শান্ত বড় পোষমানা এ প্রাণ, বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান। দেখা হলেই মিষ্টি অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি, অলস দেহ ক্লিষ্টগতি, গৃহের প্রতি টান!' এদের কেউ মারতে পারবে না। এরা পোকামাকড়ের মতো অমর! এদের মারবার মতো ডি. ডি. টি. বেরোয় নি এখনও।"

"কিন্তু এদের নিয়েই তো জাত। এদের কথা ভাবতে হবে বই কি।"

"এরা জৈবিক নিয়মে চলে। প্রকৃতিই এদের জন্যে ভাবছেন। আমাদের ভাবনা প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তানদের জন্যে, যারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে না।"

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাই আপনার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের উপর এত ভক্তি। এ লেখাটা পড়ে সুখ পাবেন। এটা আপনার যদি খুব ভালো লাগে, আপনার কাছে রেখে দিতেও পারেন। আমি হয়তো কোথাও হারিয়ে ফেলব।"

"উনি কোথায় আছেন এখন—"

"কোথাও সিভিল সার্জন হয়ে আছেন। কিছুদিন আগে চব্বিশ পরগণায় ছিলেন, এখন কোথায় আছেন, ঠিক জানি না।"

"আমি এবার উঠি তাহলে আজ।"

"আচ্ছা, আপনি বিলেতে গিয়ে যদি পৌঁছতে পারেন, কি করবেন তা কি ঠিক করেছেন কিছু ?"

"কিছু ঠিক করি নি। কিন্তু কাল রাত্রে একটা কথা মনে হচ্ছিল। যদি ওখানে সুযোগ পাই, পুলিশের লাইনে ট্রেনিং নেব।"

"পুলিশের লাইনে ?"

"হ্যাঁ। পুলিশ হয়ে এদেশেই ফিরে এসে পুলিশের চাকরি করব। যে পুলিশ আমাদের এত লাঞ্ছনা করেছে, তাদেরই একজন হব।"

"উদ্দেশ্য কি ?"

"বিপ্লবী এদেশে চিরকালই থাকবে। যতটা পারি তাদের বাঁচাব। এই আশা। অবশ্য দুরাশাই এটা।"

"আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের সুপারিশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং নিচ্ছেন। তিনি ভারতবর্ষে পুলিশেরই চাকরি করেন, বড় অফিসার, উপরওলার নেক-নজরে পড়ে বিলেতে যেতে পেরেছেন। আমি তো তাঁর বাসাতেই উঠব। আপনার কথাটা মনে রাখব। যদি অবশ্য বিলেতে নেবে আপনার নাগাল পাই।"

"নাগাল নিশ্চয়ই পাবেন। আমার নিজের গরজেই আমি আপনার পিছু নেব। কিন্তু আপনার যে দাদা ভারতবর্ষে পুলিশের চাকরি করে গভর্নমেণ্টের পেয়ারের লোক হয়েছেন, তিনি তো আমাকে হাতে পেলে সন্দেশের মতো মুখে ফেলে দেবেন টপ্ করে। হয়তো আমার ফোটো তাঁর অ্যালবামে আছে।"

"যদি থাকেও, কিছু এসে যাবে না। আপনার চেহারা তখন অন্যরকম ছিল নিশ্চয়। অতি বিচক্ষণ ডিটেকটিভও এখন আপনাকে দেখে হিন্দুর ছেলে বলে সন্দেহ করবে না।"

আমি উঠিতেছিলাম, এমন সময় ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি চাকর-বাবুর্চির কাজ করেছেন। রান্নাবান্না কিছু শিখেছেন কি ?"

"খুব। হিন্দুদের শুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা এসব তো জানাই ছিল, হাজী সাহেবের বাড়িতে মুসলমানী রান্নাও শিখেছি কিছু কিছু। শিককাবাব, সামিকাবাব, মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি—"

"তাহলে একটা রাস্তা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।"

"কি রকম ?"

"পরে বলব।"

৫

ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক পঞ্চকন্যা' সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হল। কারণ তোমার অজ্ঞতার পাহাড় ওড়াতে হলে যে ডিনামাইটের দরকার তা হাতের কাছে ছিল না। জোগাড় করতে দেরি হয়ে গেল। তুমি পঞ্চকন্যার মহিমা বুঝতে পারনি, তার কারণ যদিও তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এম-বি পাশ করেছ, সাহেবী পোশাক পরে বেড়াও, হয়তো লুকিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খাও, পরের পয়সায় পেলে ভালো মদেও অরুচি নেই, কিন্তু আসলে তুমি একটি পদিপিসি। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে এই পদিপিসিরা যে কাণ্ড করেছে তার একমাত্র তুলনা মেলে বোধহয় বর্বরসমাজের ডাইনী আর উইচ্ ডক্টরদের কার্য-কলাপে। সভ্যসমাজ এদের পুড়িয়ে মেরেছে, সেই খাণ্ডব-দাহনে জোয়ান অব আর্কের মতো দু-চারটে ভালো লোক পুড়ে মরেছে হয়তো, কিন্তু এতে ওদের সমাজ থেকে বন্য-বর্বর আগাছাগুলো দূর হয়েছে। ওদের বাড়ির উঠোন এখন তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, ওদের সবুজ লন আর ফুলের বাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ওই পদিপিসির দল এখনও সশরীরে প্রবল প্রতাপে বর্তমান। এই পদিপিসিরা অসামান্য লোক, অসামান্য তাদের শক্তি। এর প্রমাণ আর্যসংস্কৃতির বিরাট মহা-মাতঙ্গকে এরা হিন্দুধর্মের ঘোরো শূয়োরে পরিণত করেছে। আর্যসভ্যতার আকাশচুম্বী হর্ম্যের গা বেয়ে উঠেছে উইয়ের মতো। ধসিয়ে দিয়েছে সে হর্ম্যকে। সেই ধ্বংস-স্তূপের উপর গজিয়েছে ঘেঁটু, ফণীমনসা, বুনো ওল আর কুটকুটে কচুর বন। আর সেই বনের আড়ালে বাস করছে যেসব শামুক-ব্যাং, টিকটিকি-গিরগিটি, ইঁদুর-ছুঁচো, সাপ-তক্ষকের দল তারাই টিকি-তিলক গেরুয়া-গুরুর ভড়ং করে আলো করছে তোমাদের রক্ষণশীল সনাতন হিন্দু-ধর্মের চণ্ডীমণ্ডপগুলো। আগে এই চণ্ডীমণ্ডপগুলো গ্রামে গ্রামে থাকত। এখন তারা শহরেও এসেছে। ইউনিভার্সিটিতে, সাহিত্য-সভায়, রাজনীতির আসরে, খবরের কাগজের পাতায় পাতায় এদের খুব দবদবা আজকাল। তোমরা এদের বক্তৃতা শুনে গদগদ। উচ্ছ্বাসের আবেগে এবং তর্ক করবার মুখে তোমরা মাঝে মাঝে নিজেদের আর্যবংশধর বলে জাহির কর, কিন্তু আর্যরা, মানে বৈদিক যুগের আর্যরা, কি ছিল আর তোমরা কি হয়েছ, তা তুলনা করে দেখেছ কখনও? তারা গরু, শুয়োর, কচ্ছপ কিছু বাদ দিত না। তোমরা লাউ খাবে তা-ও পাঁজি দেখে, অলাবু ভক্ষণ নিষেধ আছে কিনা বিচার করে। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল শত শরৎ বাঁচব, বীরের মতো বাঁচব, বেগবতী প্রস্তরাকীর্ণ নদী সামনে পড়লে সাঁতরে পার হব, পৃথিবীকে ভোগ করব, মৃত্যু এলে তাকে বীরের মতো বরণ করব। কিন্তু তোমরা দিন-রাত কাঁদুনি গাইছ 'লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়,' তোমরা গাইছ—'এ সংসার-কারাগারে আর কতদিন আমারে এমন করে বেঁধে রাখবি মা তারা,' কিন্তু মা-তারা যেই সদয় হয়ে মুক্তির

ব্যবস্থা করলেন অমনি বাবারে মারে বলে মুক্তকচ্ছ হয়ে দে দৌড়। সিন্নি মেনে, মাদুলি বেঁধে, ঠাকুরের দোর ধরে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়ে বাঁচবার জন্যে হাস্যকর সে কী করুণ প্রয়াস। তোমরা ভালো করে বাঁচতেও জান না, মরতেও জান না। তোমরা পেট ভরে খেয়েছ কখনও? প্রাণভরে কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছ? প্রাণভরে ভালোবাসতে পেরেছ কাউকে? প্রাণভরে ঘৃণা করতে পেরেছ? কিছুই পারনি। অপরে যখন ভোগ করে তখন তোমরা আড়নয়নে চেয়ে দেখ আর আড়ালে মুখ চোকাও। আর মুখে বল, 'হরি হে সবই মায়া'! নারী তো তোমাদের কাছে নরকের দ্বার। অনেক কষ্টে, অনেক খতিয়ে, অনেক অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে, সপ্তমে বা অষ্টমে মঙ্গল বা শনি আছে কিনা দেখে, পণ নিয়ে মেয়ের বাবাকে সর্বস্বান্ত করে, তোমরা হাড় ডিগ্‌ডিগে একটি বালিকার পাণি-পীড়ন কর আর সেই নরকের দ্বারটির চৌকাটে বসে সারা জীবন হন্যে হ্যাংলার মতো বংশবৃদ্ধি করে যাও, আর ক্রমাগত খবরদারি করতে থাক ওই নরকের দ্বারে এসে আর কেউ উঁকি দিচ্ছে না তো! উঁকি দিলেই সর্বনাশ। তাকে ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে যতক্ষণ না বিদায় করতে পারছ ততক্ষণ তোমাদের শান্তি নেই। তোমাদের সমাজের গোলক চাটুজ্যেরা তা না হলে তোমাদের একঘরে করবে, তোমাদের ঊর্ধ্বতন অধস্তন চোদ্দ পুরুষরা স্বর্গের পথে যেতে যেতে হঠাৎ হোঁচট খাবে। তোমরা কি বলে নিজেদের আর্যবংশধর বল তা তো বুঝি না, তাদের সঙ্গে কোনখানটায় মিল তোমাদের? স্ত্রী দ্বিচারিণী হলে তাদের ব্যবস্থা ছিল—তাকে উপদেশ দিও, বোঝাবার চেষ্টা কোরো, তিরস্কার কোরো, দরকার হলে প্রহারও কোরো। তাতেও যদি কোন ফল না হয় তাহলে তাকে বর্জন কোরো, কিন্তু অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতে ভুলো না। তাকে গলাধাক্কা দিয়ে একেবারে বেশ্যা-পল্লীতে পাঠিয়ে দেবার নিয়ম তাঁদের সমাজে ছিল না। সতীত্ব জিনিসটা তাঁরা যে অপছন্দ করতেন তা নয়, কিন্তু ও নিয়ে তোমাদের মতো ছুঁই-ছুঁই গেল-গেল ভাব ছিল না। এ বিষয়ে অত্যন্ত র‍্যাশনাল ছিলেন তাঁরা। ক্ষেত্রজ পুত্রে আপত্তি ছিল না তাঁদের। এমন কি দরকার হলে বিধবার গর্ভেও তাঁরা পরপুরুষকে দিয়ে পুত্র উৎপাদন করিয়ে নিতেন, তাতে যে বিধবার ব্রহ্মচর্য নষ্ট হতে পারে একথা তাঁরা মানতেন না। তোমরা এঁটো পাতে বসে মাছি তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভাত খাও, অপরের ব্যবহার-করা পায়খানা বা গামছা-তোয়ালে ব্যবহার করতে তোমাদের আপত্তি নেই, সিফিলিস-গণোরিয়া-গ্রস্ত বেশ্যাদের সহবাসেও তোমরা আনন্দ পাও, কিন্তু স্ত্রীর যদি একবার পা ফস্‌কেছে অমনি সর্বনাশ। অমনি তোমাদের চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায়, কুলে কালী পড়ে, পুর্ব-পুরুষরা নরকস্থ হন।

তোমাদের আর্যত্ব কোথায়? তাদের নকলে তোমাদের বিয়ে- পৈতেটা হয় বলছ? কিন্তু কী হাস্যকর কাণ্ডটা হয় তা ভেবে দেখেছ কখনও। আর্যদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম জীবনের প্রথম আশ্রম, যে সময়ে ছাত্ররা গুরুগৃহে বাস করে নিজেদের চরিত্র গঠন করত। তোমরা সেটা সেরে দাও ন্যাড়ামাথা ছেলেটাকে একটা গুদোম ঘরে তিনদিন

বন্ধ করে রেখে। তিনদিন সে শূদ্রের মুখ দেখবে না। তারপর বছরখানেক খেতে বসে বোবার অভিনয় করবে। গায়ত্রীর মানে সে বুঝবে না, কেবল আউড়ে যাবে। এই হল তোমাদের উপনয়ন। পৈতেতে পরে চাবি বাঁধা থাকবে। আর বিয়ের সময় তোমাদের স্ত্রী-আচারটা বড়, না বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর ভোজটা বড়, না একটা মূর্খ পুরুতের সামনে বসে নামতা-ঘোষার মতো কতকগুলো অশুদ্ধ উচ্চারণের মন্ত্র আওড়ানোটা বড় তা আজও বুঝিনি। দিনের বেলা কতকগুলো ভিজে-কাঠ জ্বেলে চতুর্দিকে একটা ধূম্রলোক সৃষ্টি করে তোমাদের কুশণ্ডিকা হয়। পুরোহিত যখন বলেন, ওই দেখ সপ্তর্ষি উঠেছে, ওই দেখ বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী, তখন তোমরা দেখ রঙীন কাপড়-পরা কতকগুলো মেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে কিম্বা যদি ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইতে যাও, দেখতে পাও ঘরের কোণে অরুন্ধতী নয়, একটি মাক'শা জাল পেতে বসে আছে। তোমরা বিয়ের সময় শুধু যে পণ নাও তা নয়, প্রজাপতি আর ব্রহ্মার ছাপ-দেওয়া কতকগুলো নিমন্ত্রণপত্রও ছাপ আর চেনা অল্পচেনা অচেনা সবার নামে সেগুলো পাঠাও বুকপোষ্ট করে—উদ্দেশ্য যদি কিছু লৌকিকতা পাওয়া যায়। অনেকে যদিও নীচে ছেপে দেন, 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়', কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ যদি সে প্রার্থনার মর্যাদা রেখে লৌকিকতা না পাঠিয়ে আশীর্বাদ জানায়, তাহলেই মনোমালিন্য হয়ে যায় তার সঙ্গে। এই তোমাদের বিয়ে। এর সঙ্গে আর্য-বিবাহের কোন মিল নেই।

আর্যদের সঙ্গে কোনখানটায় তোমাদের মিল নেই। হয়তো আর্য-সভ্যতা একদিন বাংলাদেশের আদিবাসী পক্ষীজাতি বা বগধজাতিকে জয় করে তাদের আর্যত্বের ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছিল, কিছুলোক হয়তো আর্য-ধর্ম আর্য-সভ্যতা বরণও করেছিল। এটাও একটা লক্ষ্য করবার মতো জিনিস, বাইরে থেকে নতুন কিছু একটা এলেই তাকে বরণ করে নেবার জন্যে একদল লোক বাংলাদেশে সর্বদা উদ্বাহু হয়ে থাকে। ওরা আর্য হয়েছে, বৌদ্ধ হয়েছে, মুসলমান হয়েছে, বৈষ্ণব হয়েছে, ক্রিশ্চান হয়েছে, ব্রাহ্ম হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে বাঙালী সেই বাঙালীই থেকে গেছে। ওদের মধ্যে আন্থিকেলে সেই পদিপিসি আছে যে! সে তার জারক রসে সব্বাইকে মোরব্বা বানিয়ে ফেলেছে। ওই পদিপিসির সাংঘাতিক শক্তি। শঙ্করাচার্যের মতো বৈদান্তিকও ওর পাল্লায় পড়ে "প্রভুমীশ মনীষ" আউড়েছে, ছন্দের জল-তরঙ্গ বাজিয়ে গঙ্গার মহিমা-কীর্তন করেছে। ক্রীশ্চান অ্যানটনি কবিয়াল হয়েছে, মুসলমান রাধাকৃষ্ণের গান গেয়েছে, বৈষ্ণবের ধর্ম নেড়া-নেড়ীর ধর্ম হয়েছে, নিরাকারবাদী ব্রাহ্মদের বাড়ির অনেক মেয়েরা দুর্গাপূজার মণ্ডপে ভীড় করেছে শাড়ী-গয়না-খোঁপার বাহার দেখিয়ে, ঠাকুরকে প্রণাম করেছে, মানত করেছে, সিদ্ধি মেনেছে।

তবে এইখানেই তোমার একটা ভুল ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। আমার এই লম্বা বক্তৃতা শুনে তুমি যেন ভেব না যে, আমি খুব একটা আর্যভক্ত। মোটেই তা নয়, আমি বাঙালী and **I am proud of it.** তোমার চিঠিতে 'আর্য' শব্দটা অনেকবার ছিল বলে এই বক্তৃতাটা

দিলুম। আর্যদের চেয়ে আমাদের নিকটতর সম্পর্ক নিগ্রেট, অস্ট্রিক, আর দ্রাবিড়দের সঙ্গে। আমি আর্যদের মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি বই পড়ে, মুগ্ধ হয়েছি তাদের বলিষ্ঠ চরিত্রে, তাদের মানবতার প্রবল প্রকাশে। তারা দেবতা নয়, তারা ভোগী বীর। তারা তাদের দেবতাদেরও নিজেদের ছাঁচে ফেলে তৈরি করেছিল। তাদের দেবতা 'অব্রণং অস্নাবিরং' ব্রহ্ম নয়, তাদের দেবতা তাদেরই মতো শক্তিমান, তাদেরই মতো খোশামোদে তুষ্ট, অপমানে রুষ্ট, তাদেরই মতো কামুক এবং ভোগী। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম এদের কাহিনী কেচ্ছার মতো মনে হয় ভদ্রসমাজে। কিন্তু এদের বলিষ্ঠতায় আমি মুগ্ধ। গ্রীকদের সঙ্গে অনেক মিল আছে এদের। গ্রীক সভ্যতাও মুগ্ধ করেছে আমাকে। ইজিপ্টের অনেক জিনিসও খুব ভালো লেগেছে। চীনেদেরও। কিন্তু আমার যা ভালো লাগে তা আমি হতে পারি না, অনেক সময় হতে চাই-ও না। যুগপৎ আর্য, গ্রীক, মিশরী এবং চীনে হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্‌সকেও খুব ভালো লেগেছে বলে কি শার্লক হোম্‌স হতে পারি? পারি না, হতে চাই-ও না। আমি অতি-বিশুদ্ধ জিনিস খুব পছন্দ করি না। তোমাদের মরাল কোডের অতি-বিশুদ্ধতা থেকে শত-হস্ত দূরে থাকতে চাই। একটা গল্প মনে পড়ল।

বিহারে যখন ছিলুম তখন এক ভোজপুরী ভদ্রলোকের ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। জমিদার লোক তিনি। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে করজোড়ে প্রত্যুদ্‌গমন করে আমাকে এনে বসালেন। ভদ্রলোকের শুধু গা, গলায় হলদে রঙের পৈতে, পায়ে খড়ম, কপালের মাঝখানে, তুই বাহুর উপর, চন্দনের ডোরা-কাটা। আমি যতক্ষণ না বসলুম ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এরকম নির্ভেজাল ভদ্রতা ভালো লাগা উচিত, কিন্তু আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। এর চেয়ে আমাদের বাঙালী ভদ্রতা অনেক নীচু স্তরের। বাড়ির মালিক হয়তো মুচকি হেসে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, বড়জোর বললেন, 'আসুন'। কিম্বা কেউ যদি উচ্ছ্বসিত হন, বলবেন—'আরে আরে আসুন। আজকের কাগজটা দেখেছেন। চা বাগানে কি কাণ্ড!' এই ভালো লাগে কিন্তু। তারপর তাঁরা যখন খেতে দিলেন আমাকে, তখন তো আমার চক্ষুস্থির। ব্রাউন রঙের মোটা মোটা লুচি, তার সঙ্গে দাগড়া-দাগড়া করে কাটা কুমড়োর তরকারি, কাঁচকলার তরকারি, উচ্ছের তরকারি। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা, এক তরকারির সঙ্গে আর এক তরকারি মেশায় না ওরা। তারপর দু'তিন রকমের আচার। তারপর ছালি-সমেত ধোঁয়াগন্ধ একনাদা দই, তার উপর লালচে রঙের দেশী চিনি। একটু পরে টেনিস বলের সাইজের হলদে রঙের লাড্ডুও এল আধ ডজন। এরা যেন আমার দিকে চেয়ে নীরবে চ্যালেঞ্জ করতে লাগল—চলে আয়, দেখি তোর মুরদ। খাওয়া ব্যাপারে আমার মুরদ চিরকালই কম। আমি টুকিটাকি খেয়ে থাকতেই ভালোবাসি। নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রায় বাঁ দিকটা খাই না, ডানদিকের তরকারিগুলো খাই। ভোজপুরী ভদ্রলোকের ভয়ানক আয়োজন দেখে 'থ' হয়ে বসে রইলুম। ভদ্রলোকের ভাইপো কলকাতার কলেজে পড়েন, বাংলাও

বলেন। তিনি আমাকে বললেন, "আপনি খাচ্ছেন না কেন ডাক্তারবাবু। সবই ঘরের জিনিস, একেবারে বিশুদ্ধ। আমাদের জমিতে যে গম হয় তাই ঘরে জাঁতায় পিষিয়ে আমরা আটা করি, তরিতরকারি সবজি সব আমাদের বাগানের, ঘি দুধ দই সব ঘরের, পঁচিশটি মোষ আছে আমাদের, লাড্ডুও ঘরে বানিয়েছি আমরা। খেয়ে দেখুন।"

করুণকণ্ঠে বললুম, "আমি পারব না।"

"পারবেন না! কেন?"—সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেল ছোকরা। তখন তাকে খুলে বলতে হল। বললাম, "আমি যে বাঙালী। বিশুদ্ধ জিনিস বরদাস্ত করতে পারি না। ভেজাল ঘিয়ে-ভাজা ভেজাল কলের ময়দার ধবধবে শাদা ফুরফুরে লুচি আমাদের পছন্দ, কলকাতার দোকানে দোকানে মাটির ভাঁড়ে করে যে দই বিক্রী হয় তাতে আসল মাল কিছু নেই, কিন্তু তাই খেয়েই আমরা মুগ্ধ। খাঁটি জিনিস আমাদের ধাতে সয় না, পেটেও সয় না।"

আর্য-সভ্যতার বিশুদ্ধ বলিষ্ঠতাও আমার সহ্য হয় না, বই পড়ে নকল আর্য হবার বাসনা আমার নেই। ভীম-ভীষ্মকে বাহবা দিতে পারি, কিন্তু আমি একটা ভীম হয়ে দুঃশাসনের রক্তপান করছি বা ভীষ্ম হয়ে অম্বা-অম্বালিকা হরণ করছি একথা কল্পনা করলেও গায়ে জ্বর আসে। না, আমি খাঁটি বাঙালী, খাঁটি বাঙালীই থাকতে চাই। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরনে শান্তিপুরের ধুতি, পায়ে পাম্‌সু, এর চেয়ে জবড়জং পোশাক পছন্দ করি না। কোন শিরস্ত্রাণও নয়, তা সে গান্ধি-ক্যাপই হোক, বা মাড়োয়ারি গোল টুপিই হোক। শিরোভূষণ নিয়ে বাঙালীরা অনেক experiment করেছে, রামমোহন বঙ্কিমের ছবিতেও টুপি দেখতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশের সেরা মানুষ বিদ্যাসাগরের মাথায় টুপি নেই। শুনেছি অমৃতলাল বসু নাকি বলেছিলেন— "We do not want to load our head with anything but intelligence." কথাটা শুনতে ভালো। কিন্তু আমি বলি, আমরা আমাদের মাথা আর আকাশের মাঝখানে কোন পার্টিশন দিতে রাজি নই। খোলা হাওয়ায় আমাদের মাথা, আমাদের প্রতিভা, আমাদের মনের সবুজ শোভা সুস্থ থাকে। বদ্ধ হাওয়ায় মারা যাই আমরা। কোন রকম 'ইজ্‌মে'র খোঁয়াড়ে ঢুকলেই আমাদের মৃত্যু, তা সে ধর্মের 'ইজ্‌ম্'ই হোক বা রাজনীতির 'ইজ্‌ম্'ই হোক। অনেকবার এরকম মরেছি আমরা, আবার কি মন্ত্রবলে জানি না, বেঁচেও উঠেছি অনেকবার। সে মন্ত্রটা কি জানো? বিদ্রোহের মন্ত্র। কারও ভাঁওতায় পড়ে কিছুক্ষণ একটা আড়গড়ায় ঢুকে যখন আমরা হাঁপিয়ে উঠি, তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাই মরীয়া হয়ে, ফ্রাইং প্যান থেকে লাফিয়ে হয়তো 'ফায়ারে' পড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাই অনেকে, তবু লাফাতে ছাড়ি না। ওরই মধ্যে দু'চারজন বেঁচেও যায় আর তারাই শেষে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় সেই অচলায়তনকে। এইরকম করেই আমরা যুগে যুগে বেঁচেছি এবং বাঁচবও। আর এই মন্ত্রের সাধক বলেই আমি বাঙালী, এই অগ্নিকে সযত্নে লালন

করি বলেই আমি সাগ্নিক! মাতৃজঠরে এই আগুন আমার মনে আমার অজ্ঞাতসারে জ্বালিয়ে দিয়েছেন জানি না আমার কোন পূর্বপুরুষ, কিন্তু এটা জানি—চিতার অগ্নি-শিখার সঙ্গে মিলে যাবার পূর্বে এর শিখা নিভবে না, নিভতে দেব না।

কিন্তু দেখ, কি কাণ্ড করছি। পঞ্চকন্যা নিয়ে আলোচনা করব বলে কলম ধরেছিলুম, কিন্তু নিজের কথাই সাতকাহন করে বলে যাচ্ছি। এটাও বাঙালীর একটা বৈশিষ্ট্য।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যম্ মহাপাতকনাশনম্ ॥

এই হচ্ছে শ্লোক। এর একটা অর্থ এ-ও হতে পারে যে, মহাপাতক থেকে যদি বাঁচতে চাও, তাহলে এই পাঁচটি পাজি মেয়ের কথা মনে রেখ। এরা দাগী। এটাকে ব্যাজস্তুতি মনে করলেই বা ক্ষতি কি?

কিন্তু আরও কয়েকটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি। একাধিক পুরুষের সঙ্গে কোনও স্ত্রীলোকের সংস্রব থাকলে সেকালের আর্যরা তেমন কিছু মনে করতেন না। তাঁরা পাপ-পুণ্যের বিচার করতেন তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থেকে। হত্যা করা মহাপাপ, কিন্তু মাংসলোলুপ অতিথির সেবার জন্যে কর্ণ যখন তাঁর ছেলেকে হত্যা করলেন, অমনি বাহবা বাহবা পড়ে গেল। মাংসলোলুপ অতিথি ভগবানে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন, বর দিলেন কর্ণকে। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—এটা আর্যদেরই উক্তি, আবার দেখছি, আর্যদের মহাকাব্য রামায়ণে সূর্যবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন, নর-রূপী নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সতী স্ত্রীকে নিরপরাধিনী জেনেও বনবাসে পাঠাচ্ছেন আর সেজন্য সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করছে। এর কারণ, দেশের যে আইন তখন প্রচলিত ছিল সেই আইন অনুসারে তিনি নিজেও চলেছিলেন, নিজের বেলায় আইনের অপলাপ করেন নি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, তাই সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন বলেই তাঁর কদর আরও বেড়ে গেল। মাতৃহত্যা মহাপাপ। কিন্তু আর্য-সভ্যতায় মাতার চেয়ে পিতার স্থান বেশি উঁচুতে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপ। সেই পিতার আদেশে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন। বংশরক্ষা করা আর্যদের একটা অবশ্য কর্তব্য পুণ্যকর্ম, কিন্তু পিতার সুখের জন্যে ভীষ্মের মতো অত বড একটা তাগড়া পুরুষ চিরকুমার রয়ে গেল, এজন্য তার নিন্দা করে নি কেউ, সাধুবাদই করেছিল। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ খুঁজলে এরকম অনেক উদাহরণ মিলবে। আর্যরা পাপ-পুণ্যের বিচার করতেন শুধু ঘটনাটি দেখে নয়, ঘটনার পিছনের প্রেরণা দেখে। শুধু আর্যরা কেন, সব সভ্যদেশেই বোধহয় এই আইনে পাপ-পুণ্যের বিচার হয়, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল তাই আমাদের চোখে খুনী নয়, শহীদ। এখন এই পটভূমিকায় ওই পঞ্চকন্যার বিচার করা যায়। এ সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত—বৈদিক আর্যদের কাছে দেবতা এবং রূপবতী নারীর সাতখুন মাফ ছিল। অহল্যা ছিলেন পরম রূপবতী এবং অহল্যাকে নষ্ট করেছিলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। আজকাল যেমন ভোটের জোরে কেষ্ট-বিষ্টু হওয়া যায়,

তখন তেমনি তপোবলে ইন্দ্রত্ব লাভ করা যেতো। তাই কোন মানুষ তপোবলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে এ খবর পেলে, দেবকুল, বিশেষ করে ইন্দ্র, একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। ক্রমাগত চেষ্টা করতেন, কিসে লোকটার তপোবল কমিয়ে দেওয়া যায়। সাধারণত স্বর্গের অপ্সরাদের তাঁরা কাজে লাগাতেন। অপ্সরা দেখলেই বেসামাল হয়ে পড়তেন তপস্বীরা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের তপোবল কমে যেত, ইন্দ্র নিশ্চিত হতেন। অহল্যার স্বামী মহর্ষি গৌতমকে কিন্তু অপ্সরা পাঠিয়ে কাবু করা সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর স্ত্রী অহল্যা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। অহল্যাকে দেখে ইন্দ্র নিজেই কামার্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে একদিন গৌতমের ছদ্মবেশে গেলেন তিনি অহল্যার কাছে গৌতমের অনুপস্থিতিতে। তিনি যে আসল গৌতম নন তা অহল্যা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তবু প্রত্যাখ্যান করে নি। এইখানেই তার পাপ। কাজ সেরে নকল গৌতম যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন আসল গৌতমের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তপোবনের প্রান্তে। আসল গৌতম তপোবলে নিমেষে বুঝতে পারলেন কি ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ রেগে অভিশাপ দিয়ে তিনি ইন্দ্রকে করে দিলেন নপুংসক আর অহল্যাকে করে দিলেন ভস্মীভূত, কোনও কোনও পুরাণে আছে পাষাণ। ইন্দ্র একটু বেকায়দায় পড়লেন বটে, কিন্তু তির্যকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেল। রাগলে তপোবল কমে যায়। গৌতম রেগেছিলেন, তাঁর তপোবল কমে গেল। ইন্দ্র ফিরে গিয়ে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের বললেন, আমি মহর্ষি গৌতমের ক্রোধ সমুৎপাদন করে তাঁর তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি। এতে দেবকার্য সাধিত হয়েছে। রেগে অভিশাপ দেওয়াতে মহর্ষির দীর্ঘকালীন তপোবল অপহৃত হয়েছে। কিন্তু এজন্য আমার ও অহল্যার যে দুর্গতি হলো তার ব্যবস্থা করুন আপনারা। দেবকার্য যখন সাধিত হয়েছে তখন আর কথা কি। ইন্দ্রের নপুংসকত্ব মোচনের ব্যবস্থাও তাঁরা করলেন, আর রামচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে অহল্যাকেও পরে উদ্ধার করলেন। যে নারী দেবকার্য সাধনের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছে, তাকে কি তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন? সুতরাং সে যে প্রাতঃস্মরণীয়দের পুরোভাগে স্থান পাবে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! এ যুগেও তো এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। আজকাল দেবতাদের আমরা বরখাস্ত করেছি। তার জায়গায় বসিয়েছি দেশকে, রাজনীতিকে, সাহিত্যকে, আর্টকে, বিজ্ঞানকে। এইসব দেবকার্য সাধনের জন্যে যেসব নারীরা কৃচ্ছ্র-সাধন করেছেন, তাঁদের কি তোমরা সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখনি? তাঁদের কি প্রচলিত সতীত্বের মাপ-কাঠি দিয়ে মাপতে গেছ? অহল্যার বেলাতেই তোমাদের এই শুচি-বাই কেন!

মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র অপূর্ব! অসাধারণ। ওই একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বলে মহাকবি বেদব্যাস নমস্য হয়ে আছেন আমার কাছে। তিনি তাকে আর্যকন্যা করেন নি। দ্রৌপদী যাজ্ঞসেনী, যজ্ঞের অগ্নিশিখা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল সে। অগ্নি-শিখার মতোই তার মহিমা উদ্ভাসিত করে রেখেছে মহাভারত কাব্যকে। তার তুলনা

নেই। ওই কৃষ্ণাঙ্গিনী রূপসী সমস্ত ভারতবর্ষের পুরুষ জাতকে মাতিয়ে তুলেছিল। স্বয়ম্বর সভায় ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরের লোলুপদৃষ্টি পড়েছিল ওই একটি মেয়ের উপর। অর্জুনকে সে বরণ করেছিল, সম্ভবত ভালোও বেসেছিল, কিন্তু অর্জুনের আর চারটি ভাই যে তার সম্বন্ধে নির্বিকার ছিল তা মনে করবার কোন কারণ নেই। মনে রেখ, পঞ্চ পাণ্ডবরা তখন বিপন্ন। অজ্ঞাতবাস করছেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁরা গিয়েছিলেন স্বয়ম্বর সভায়। এ অবস্থায় একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে যদি পাঁচ ভায়ের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগে যেতো তাহলে যে কাণ্ডটা হতো ইংরেজী ভাষায় তার নাম disaster of the first magnitude, বাংলায় বললে বলতে হয় সর্বনাশ। তাই সম্ভবত কুন্তী বলেছিল, তোমরা পাঁচজনেই ওকে ভোগ কর। অর্জুনকেই দ্রৌপদী ভালোবাসত, এর প্রমাণ সুভদ্রাকে দেখে তার ঈর্ষা হয়েছিল। কিন্তু অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের খুব বেশি উদাহরণ মহাভারতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা ভেবে দেখ। সে ভালোবাসে একজনকে, কিন্তু মুখটি বুজে সমানভাবে ঘর করতে হয় তাকে আর চারজনের সঙ্গেও। প্রণয়ের অভিনয় করতে হয়, একজনের সঙ্গে নয়, চারজনের সঙ্গে! আর এটা করতে হচ্ছে কেন? তার নিজের দায়ে নয়, পারিবারিক অশান্তি নিবারণের জন্যে। যে চওড়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, তাকে বাহবা দেবার দরকার নেই, কিন্তু যে দু-হাতে দুটো ছাতা নিয়ে সরু তারের উপর দিয়ে সোজা হেঁটে যাচ্ছে একবারও না পড়ে—তাকে তুমি বাহবা দেবে না?

কৌরবসভায় দুর্যোধন দুঃশাসনরা যখন তাকে উলঙ্গিনী করবার চেষ্টা করছিল, তখন ভ্রাতৃভক্ত স্বামীদের প্রতি তার উক্তি, আলুলায়িত-কুন্তলা থেকে দুঃশাসন-বধে ভীমকে উত্তেজিত করা, কৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে যখন সন্ধির প্রস্তাব করছিলেন, তখন তার তেজোদৃপ্ত প্রত্যাখ্যান—এসব বাদ দিয়েও সে প্রাতঃস্মরণীয়া, কারণ একা মেয়েমানুষ হয়ে পাঁচটা বড় বড় ওয়েলার হর্স জুতে সে বগী হাঁকিয়ে গেছে সবেগে এবং সগৌরবে, একটাও accident না করে। একে তুমি বাহাদুরি দেবে না? স্মরণ করবে না?

কুন্তীর সবচেয়ে বড় বাহাদুরি, সে দুর্বাসার মতো দুর্ধর্ষ শঙ্খচূড়কে বশ করতে পেরেছিল। গল্পটা আশা করি জান। কুন্তীর বাবার নাম শূরসেন। তিনি তাঁর প্রথম সন্তান কুন্তীকে (তখন তার নাম ছিল পৃথা) তাঁর পিসতুতো ভাই কুন্তীভোজকে দিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে। কুন্তীভোজের বাড়িতে মানুষ হয়েছিল বলেই ওর নাম কুন্তী। এই কুন্তীভোজের বাড়িতে মহর্ষি দুর্বাসা একদিন এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কুন্তী তখন তাঁর সেবা করেছিল। যে মহর্ষি শকুন্তলার জীবনকে মরুভূমি করে দিয়েছেন, যাঁর রগ-চটা স্বভাবের কাহিনী ত্রিভুবন-বিদিত, যাঁর পান থেকে সামান্য চুন খসলেই সর্বনাশ, সেই লাইভ ইলেকট্রিক ওআ্যার (live electric wire) মহর্ষিটিকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল ওই কিশোরী কুন্তী। এইটেই তো আমার মনে হয় ওর প্রধান

কৃতিত্ব আর এরই জোরে ও ওর জীবনের পরবর্তী সমস্যাগুলো (ইংরেজীতে যাকে বলে crisis) সমাধান করতে পেরেছে। সন্তুষ্ট হয়ে মহর্ষি ওকে বর দিলেন—"বৎস, আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে এক মহামন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। এই মন্ত্র পাঠ করে তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করবে, তিনিই তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হবেন এবং তোমার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করবেন।"

মহাভারতকার লিখেছেন, কুন্তী প্রথমে ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারে নি। কিন্তু কৌতূহলের বশে মন্ত্রপাঠ করে সূর্যকে আহ্বান করতেই সূর্যদেব সশরীরে এসে হাজির হলেন। সূর্যকে দেখে ভীত হয়ে পড়ল কুন্তী। হাতজোড় করে বলল—"আমাকে ক্ষমা করুন। মহর্ষি দুর্বাসা আমাকে বর দিয়ে এই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, মন্ত্র সফল হয় কিনা জানবার জন্যে আমি আপনাকে আহ্বান করেছি!" এরপর সূর্য যা করেছিলেন তা তোমরা সবাই জানো। কর্ণের জন্ম হল। মহাভারতকার লিখেছেন, সূর্যের সঙ্গে মিলনের সঙ্গে সঙ্গে—তৎক্ষণাৎ কর্ণের জন্ম হল। ঘাবড়ে গিয়ে কুন্তী কর্ণকে ভাসিয়ে দিলে। ব্যাপারটা জানাজানি হল না। এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। রামায়ণ মহাভারতে এরকম অনেক আজগুবি কথা আছে। যাই হোক, কিছুদিন পরে স্বয়ম্বর সভায় কুন্তী পাণ্ডুকে বরণ করলেন। অনেকে সন্দেহ করেন পাণ্ডুর কুষ্ঠ ছিল, কিম্বা ধবল ছিল। সেইজন্যে কুন্তী তাঁর বাহুপাশে ধরা দেননি। দূর থেকে ভক্তি করতেন। কিন্তু বংশরক্ষা হয় কি করে? বংশরক্ষা করা আর্যদের এক মহাকর্তব্য। পাণ্ডুর রোগের কথা সম্ভবত কাছেপিঠে রটে গিয়েছিল, তাই পাণ্ডুর জন্যে হস্তিনাপুরের কাছাকাছি দ্বিতীয় কন্যা আর পাওয়া গেল না। ভীষ্ম হস্তিনাপুর থেকে ছুটলেন মদ্রদেশে। সেখান থেকে মদ্ররাজ শল্যের বোন মাদ্রীকে কিনে নিয়ে এলেন। মাদ্রীকে আনবার জন্যে রথ, গজ, তুরগ. বসন, ভূষণ, মণিমুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শুল্কস্বরূপ দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর মাদ্রীও যখন দেখলেন পাণ্ডুর সাংঘাতিক রোগ আছে, তখন তিনিও পাণ্ডুকে আমোল দিতে চাইলেন না। এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটা গল্প লেখা আছে, পাণ্ডু মৈথুন-রত এক মৃগদম্পতীকে নাকি শরাঘাতে মেরে ফেলেছিলেন। সে মৃগদম্পতী কিন্তু আসলে ছিল ঋষি-দম্পতী। তাদেরই অভিশাপে পাণ্ডু নাকি স্ত্রী-সঙ্গ-বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা শুধু আজগুবি নয়, অসম্ভব। আসলে পাণ্ডু রোগগ্রস্তই ছিলেন। কারণ যাই হোক—সমস্যা দাঁড়াল বংশরক্ষা হবে কি করে! পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজনম্—দু'দুটো ভার্যা মজুত, অথচ পুত্র হবার সম্ভাবনা নেই! তখন ওই কুন্তীই সমস্যার সমাধান করে দিলে। স্বামীকে খুলে বললে সব কথা। পাণ্ডু রাজী হয়ে গেলেন। দুর্বাসা-দত্ত মন্ত্রের জোরে কুন্তী তখন একে একে ধর্মকে, বায়ুকে এবং ইন্দ্রকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনকে সৃষ্টি করলেন। মাদ্রীকেও বঞ্চিত করেন নি তিনি, তাঁর অনুরোধে অশ্বিনীকুমাররা এসে মাদ্রীর গর্ভেও নকুল-সহদেবের জন্মদান করে গেলেন। একটা মেয়ের পক্ষে এটা যে কত বড় কীর্তি (ইংরেজীতে যাকে বলে

achievement), তা কি ভেবে দেখেছ কখনও ? শুধু যে সে সমস্যার সমুদ্র পার হয়ে গেল তা নয়, একেবারে এরোপ্লেনে চড়ে বোঁ করে পার হয়ে গেল। বংশরক্ষার জন্যে ক্ষেত্রজপুত্রের ব্যবস্থা তো অনেকেই করে, কিন্তু তার জন্যে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রকে কাজে লাগাতে পারে ক'জন ? আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা অমন সব হোমরাচোমরা দিব্যকান্তি দেবতাদের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে এসেও তাঁদের প্রতি এতটুকু আসক্তি হয়নি কুন্তীর। তাঁদের ব্যবহার করেছে যন্ত্রের মতো। পাণ্ডুর প্রতি কর্তব্য থেকে একচুল সে নড়েনি। এ মেয়েকে প্রাতঃস্মরণীয়া বলবে না তো আর কাকে বলবে ?

এইবার তারা-মন্দোদরীর কথায় আসা যাক। পুরাণে নামজাদা তারা দু'জন আছে। একটি হলো বালীর স্ত্রী, আর একটি হলো বৃহস্পতির স্ত্রী। বালী অনার্য, বড়জোর কনভারটেড (converted) আর্য, আর বৃহস্পতি হলেন দেবগুরু। দু'টি তারাই মহীয়সী মহিলা। এযুগে ওঁরা বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর সিনেমা-তারাও হতেন।

প্রথমে বালীর স্ত্রীর কথাই বলি। রামচন্দ্র যখন স্বকার্যসাধনের জন্যে সুগ্রীবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গুপ্তভাবে বালীকে মেরে ফেললেন, তখন তারা সুগ্রীবের প্রেয়সী হয়ে পড়ল। তাকে বিয়ে করেছিল কিনা রামায়ণে লেখা নেই। বালীর তুলনায় সুগ্রীব, ঠিক যেমন হিমালয়ের তুলনায় উই-ঢিবি। বালী অনেক আগেই ওকে পিঁপড়ের মতো মেরে ফেলতে পারতো, কেবল ভাই বলেই দয়া করে মারে নি। লোকটা এত অপদার্থ ছিল যে, নিজের স্ত্রী রুমাকে পর্যন্ত বালীর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে নি। বালী ছিল অমিতবিক্রম বীর বানর একটি। অবশ্য মানুষই ছিল সে, বানর ছিল ওদের টোটেম। বাঙালীদের টোটেম ছিল বোধহয় পক্ষী। আর্য-অনার্যদের যখন ভাব হয়ে যায় তখন এই টোটেমগুলো হিন্দু দেব-দেবীদের বাহন হয়ে পড়ে। তাই মহাদেব ষাঁড়ে চড়েছেন, কার্তিক ময়ূরে, লক্ষ্মী পেচকে, সরস্বতী হাঁসে, গণেশ ইঁদুরে। ওই দেখ, আবার আর একটা বক্তৃতার তোড় এসেছে মনে ! এটাকে আর প্রশ্রয় দেব না।

হ্যাঁ, কি বলছিলুম, বালী অমিতবিক্রম বীর ছিল। আধুনিক ভাষায় যাকে হি-ম্যান বলে। দাবড়ে দুনিয়াটা ভোগ করে বেড়াতো। মরালিটির কোন বালাই ছিল না। হি-ম্যানরাই সাধারণত যুবতী স্ত্রীলোকদের হৃদয়-বল্লভ হয়। বালীও তারার হৃদয়-বল্লভ ছিল, বালীর অসংখ্য কুকীর্তি অগ্রাহ্য করে তারা তাকে যে ভালোবেসেছিল এর অনেক বর্ণনা রামায়ণে আছে।

বালী যখন রেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, তখন তার আকুলি-বিকুলি বারণ থেকে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত বালীর বুকের উপর পড়ে তার আকুল কান্না থেকে, হনুমানের সঙ্গে যেভাবে সে বালীর বিষয়ে আলোচনা করেছিল

তার থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সত্যিই সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত বালীকে। বালীর মৃতদেহকে আঁকড়ে সে শেষ পর্যন্ত পড়েছিল। রামকে বারবার বলছিল—"যে শর দিয়ে আপনি আমার স্বামীকে বধ করেছেন, সেই শর দিয়ে আমাকেও বধ করুন। আপনি যেমন সীতার বিরহে কষ্ট পাচ্ছেন, আমার স্বামীও তেমনি স্বর্গে গিয়ে আমার বিরহে কষ্ট পাবেন। স্বর্গের অপ্সরীরাও তাঁর এ বিরহ লাঘব করতে পারবে না। আমাকে বধ করলে স্ত্রীবধজনিত পাপও আপনার হবে না। কারণ, বাইরেই আমি স্ত্রীলোক, আসলে আমি বালীর আত্মা, বালীর কাছেই আমি ফিরে যেতে চাই, আপনি দয়া করে আমাকে বধ করুন। আমি কাঞ্চনমালী, ধীমান, মাতঙ্গগামী বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে ছেড়ে থাকতে পারব না, পারব না।"

এর পরই রামায়ণে তারার যে খবর পাই, তা এই—সুগ্রীব স্বীয় পত্নী রুমা ও স্পৃহনীয়া তারাকে নিয়ে দেবেন্দ্রের ন্যায় দিবারাত্রি বিহার করছেন। অর্থাৎ বালীকে পুড়িয়ে এসে তারা সোজা গিয়ে সুগ্রীবের কোলে উঠে বসেছিল। পরে আরও প্রমাণ পাচ্ছি সুগ্রীবের অন্তঃপুরে তারাই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। সুগ্রীবের কাছে কোনও দরবার করতে হলে আগে তারার চরণ-চন্দনা করতে হয়। রাজ্যলাভ করে সুগ্রীব মদ আর মেয়েমানুষে এত মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, সে রামকে সীতা-উদ্ধারের জন্যে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তার আর মনে ছিল না। বর্ষা পেরিয়ে শরৎ এসে গেল, তখনও সুগ্রীবের কোনও সাড়া নেই দেখে খুবই দমে গেলেন রামচন্দ্র। বর্ষায় সীতার বিরহে খুবই কাবু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হনুমান তাঁর অবস্থা দেখে ভদ্রভাবে সুগ্রীবকে তাগাদা দিলেন দু'একবার। কিন্তু তেমন কোনও ফল হলো না। তখন ক্ষেপে উঠলেন লক্ষ্মণ। ধনুর্বাণ হস্তে ধনুকের জ্যা-তে টঙ্কার দিতে দিতে তিনি গিয়ে হাজির হলেন একেবারে সুগ্রীবের অন্দরমহলের সামনে। ভদ্রতাবশতঃ তিনি অন্দরমহলে ঢুকলেন না, কিন্তু অন্দরমহলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে সিংহনাদে আর্যভাষায় যা বললেন, তাতে সুগ্রীবের নেশা ছুটে গেল, পিলে চমকে উঠল। অন্তঃপুরের দ্বারদেশে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সঙ্গে কে দেখা করলো জান? সুগ্রীব নয়, তারা। সন্নতাঙ্গী, স্খলিতগমনা, মদপান-বিহ্বল-নয়না, সুলক্ষণ-সমন্বিতা তারা স্বীয় কাঞ্চীদাম প্রলম্বিত করে লক্ষ্মণের সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। আর্যযুবকরা, তা তিনি যত বড় হোঁৎকাই হোন, সুন্দরী যুবতী দেখলে বেশ ভদ্র হয়ে পড়তেন। 'শিভাল্‌রি' জিনিসটা এখনকার চেয়ে তখন বেশি ছিল। তারাকে দেখে লক্ষ্মণ মোলায়েম হয়ে গেলেন। তারার যুক্তিও মেনে নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারারই প্ররোচনায় সুগ্রীবও উৎসাহিত হয়ে মন দিলেন বানর-সৈন্য সংগ্রহে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, সীতা-উদ্ধার-রূপ দেবকার্যসাধনে তারা কত সাহায্য করেছিল। অতএব দেবভাষায় রচিত সংস্কৃত শ্লোকে তারা প্রাতঃস্মরণীয়া হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। আর একটা কথাও আমার মনে হয়। যে কবি এই শ্লোকটি

রচনা করেছিলেন, তিনি জানতেন যে, রামচন্দ্র মুখে যতই লম্বা বক্তৃতা দিয়ে থাকুন, আসলে বালীবধ কাজটি অন্যায় হয়েছিল তাঁর। তারা যে বালীকে কত ভালোবাসত তা-ও তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই মৃত সোলজারের বিধবাকে যেমন বকশিশ দেওয়া হয়, তেমনি তারার নামটাও দ্রৌপদী কুন্তীর সঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়ে তার কিছু ক্ষতিপূরণ (compensation) করবার চেষ্টা হয়তো তিনি করেছিলেন। আর একটা কথাও মনে হয়। আর্য-অনার্যদের ঝগড়া যখন মিটে গেল, তখন আর্যদের পংক্তিতে অনার্যদের বসাবার একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল সম্ভবতঃ, এখন যেমন আমরা শিডিউল্‌ড্‌ কাস্ট বা হরিজনদের জন্যে বা কোন কোন জায়গায় মুসলমানদের জন্যে সীট রিজার্ভ করে রাখি—ওঁরাও অনার্যদের জন্যে তেমনি রাখতেন। একটা শ্লোকে প্রাতঃস্মরণীয়া পাঁচটি কন্যার নাম দিতে হবে? আচ্ছা, গোটা দুই অনার্যকন্যার নামও থাক।

কিন্তু তারার এই ব্যবহারের কারণ কি! যে বালীর মতো বীরকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিল সে সুগ্রীবের মতো নপুংসকের মন ভোলাতে গেল কেন? তারার কথা যখন পড়েছিলুম তখন কার কথা মনে হয়েছিল জান? ক্লিওপেট্রার। বালী যখন মারা গেল তখন তারার আর আপনার লোক কেউ রইল না, তার ছেলে অঙ্গদ ছাড়া। ওই অঙ্গদকেই বড় করা, প্রতিষ্ঠিত করা তার জীবনের লক্ষ্য হয়েছিল তখন। কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সুগ্রীবকে খুশি করতে হয়। ক্লিওপেট্রাও অ্যান্‌টনির কাছে গিয়েছিল ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে Antioch শিবিরে, সেখানে অ্যান্‌টনিকে সে বিধিসঙ্গত ভাবে বিয়েও করেছিল, কিন্তু কেন? আমার মনে হয়, সিজারের ঔরসজাত পুত্র সিজারিয়োঁর ভবিষ্যতের জন্যে। বিয়ের যৌতুক হিসেবে রোম সাম্রাজ্যের বেশ বড় একটা অংশও সে আদায় করে নিয়েছিল অ্যান্‌টনির কাছ থেকে। নূরজাহানও ওই রকম কি একটা যেন করেছিল তার প্রথম পক্ষের মেয়ের জন্যে। এরা যদি জগদ্বিখ্যাত হতে পারে, তারাই বা হবে না কেন?

দ্বিতীয় তারা যা করেছিলেন, তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে হেলেন-হরণের। বৃহস্পতির বউ ছিলেন এই তারা। সোম অর্থাৎ চন্দ্রের সঙ্গে ইলোপ্‌ (elope) করেছিলেন তিনি। এ নিয়ে তখনকার স্বর্গীয় সমাজে এমন চাঞ্চল্য হয়েছিল যে, প্রকাণ্ড যুদ্ধই বেধে গিয়েছিল একটা, ট্রয়ের যুদ্ধের মতো। স্বয়ং ব্রহ্মা এসে শেষটা মিটিয়ে দেন সব। তারা আবার বৃহস্পতির ঘরে ফিরে এলেন। বৃহস্পতি একটুও আপত্তি করলেন না, তোমাদের মতো ছুঁই-ছুঁই বাতিক ছিল না দেবতাদের। তারা ফিরে এসে পুত্র প্রসব করলেন একটি। ছেলে কার তা নিয়ে গোলমাল বেধেছিল একটু। বৃহস্পতি বললেন, আমার ছেলে, চন্দ্র বললেন আমার। তারা যা বললেন তাই শেষে গ্রাহ্য হল। তারা বললেন, ছেলে চন্দ্রের। তার নামকরণ হলো বুধ।

আমার মনে হয়, এ তারা স্মরণীয়া পঞ্চ-কন্যাদের কেউ নন। কারণ, ইনি দেবতাদের

বিপদে ফেলেছিলেন, কোনও উপকার করেন নি। উপকার বা খোসামোদ না করলে অনার্স লিস্টে সেকালেও নাম উঠতো না।

রাবণের স্ত্রী এবং মেঘনাদের মা মন্দোদরীকেও স্মরণীয় পঞ্চকন্যাদের মধ্যে ধরা হয়েছে। আমার সন্দেহ হয় ওটা কনসোলেশন্ প্রাইজ। আর একটা সন্দেহও হয়। মন্দোদরী বোধহয় বিভীষণকে ভালোবাসত। কারণ, রাবণের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দোদরী যে লম্বা বক্তৃতা দিয়েছিল তাতে বিভীষণের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা অনেকবার আছে। সীতার সুখ্যাতিও আছে। রাম যে নররূপী ভগবান একথাও সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল তখন। তাছাড়া রাবণ যে-সব দুষ্কৃতি করেছিল, তারও একটা লম্বা লিস্ট দিয়েছিল সে। এইসব কারণেই সম্ভবত সে ওই অনার্স লিস্টে জায়গা পেয়ে গেল। তাছাড়া, বুড়ো বয়সে স্বামীর শত্রু ঘরভেদী বিভীষণকে বিয়ে করে সে আর্য-আধিপত্যকেই মেনে নিলে। এটাও একটা মস্ত কথা।

কিন্তু একটা কথা, বৎস, সর্বদা মনে রেখ। এরকম পঞ্চকন্যা এযুগেও আছে। মোটে পঞ্চ কেন, হয়তো পঞ্চ সহস্র আছে। সব যুগেই ওরা থাকে। আমি আমার ডাক্তারি জীবনে এরকম পাঁচটি কন্যাকে দেখেছি। এই আধুনিক পঞ্চকন্যার পরিচয়ও তোমাকে দিচ্ছি, অবশ্য তাদের নামধাম গোপন করে। আর্যরা যেমন motive থেকে পাপপুণ্যের বিচার করতেন, এদের সম্বন্ধেও তাই যদি কর, তাহলে দেখতে পাবে এরাও কম নয়।

বহুকাল আগে, তখন আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অগ্নিযুগ চলছে, একটি পরিবারের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পরিবারটি ছিল একটু ব্রাহ্ম-ঘেঁষা, তাই অভিভাবকরা বাড়ির প্রত্যেকটি মেয়েদের নামের সঙ্গে একটি করে 'সু' জুড়ে দিয়েছিল। সুমতি, সুনন্দা, সুষমা, সুছন্দা—এই চারটি মেয়ে ছিল ভদ্রলোকের। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা আড়ালে এদের নামকরণ করেছিল—গল-গল, টল-মল, ঢল-ঢল আর জল-জল। সব কটি মেয়েই সুন্দরী, চলনে বলনে হাবভাবে মোহিনীও। প্রথম তিনটি মেয়ের টপটপ করে বিয়ে হয়ে গেল, সব লভ্ ম্যারেজ। হলো না কেবল সুছন্দার, যার ডাকনাম ছেলেরা দিয়েছিল জল-জল। সেই সবচেয়ে বেশি সুন্দরী ছিল। ছিপছিপে গড়ন, ধপধপে ফরসা রং, চোখের তারা মিশ কালো, মনে হতো দু' টুকরো কালো ভেলভেট যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে চোখের ভিতরে। কখনও কারও দিকে চোখ তুলে চাইতো না। যখনই তাকে দেখেছি, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে বই পড়ছে। ভাবতাম, নভেল নাটক পড়ে বুঝি। একদিন তার জর হল, দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি শুয়ে শুয়ে পড়ছে। জিগ্যেস করলুম, কি বই পড়ছো ওটা। মুচকি হেসে বইটা পাশে রেখে দিলে। উলটে দেখলুম, গ্যারিবল্ডির জীবন-চরিত। একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ওই তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভা নবোদ্ভিন্নযৌবনা তন্বীর এ কি মতিচ্ছন্ন! মেয়েটি কলেজে পড়তো। জিগ্যেস করলুম—ইংরেজি পোয়েট্রি কি কি বই বই পড়া হয় তোমাদের। বললে—

শেলী, কীট্‌স আর মিলটন। বললাম, "তাই পড় ভালো করে। ওসব ছেড়ে এই কাঠখোট্টা বই পড়ছ কেন?" মেয়েটি যা উত্তর দিলে তাতে ঘাবড়ে গেলুম। বললে—'এদের জীবনী না পড়লে ওসব কবিতার মানে স্পষ্ট হয় না।' মনে হলো মেয়েটি একেবারে খরে' গেছে। সেকালে নিরামিষ খেয়ে টিকি রেখে একদল কলেজের ছোকরা ধর্ম-ধ্বজী হবার চেষ্টা করতো। কুসংস্কারগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিত। টিকি ইলেক্‌ট্রিসিটির কণ্ডাক্‌টার, পাটের কাপড় পরলে মন্দ লোকের দুষ্ট দৃষ্টির ইলেক্‌ট্রিসিটি সাধনায় ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না, সূর্যগ্রহণের সময় ভাতের হাঁড়িতে ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মায়, এই রকম অনেক কিছু বলতো তারা। এই ধরনের ভুয়ো স্বদেশী ছেলে-মেয়েও হয়েছিল একদল। তারা বাইরে 'পোজ' করতো যেন তারা অনুশীলন সমিতির সভ্য। আমি মনে করলুম, এই মেয়েটি শেষোক্ত দলের। আড়ালে তার বাপ-মাকে বললুম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন। তাঁরা বললেন, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না, কিন্তু মেয়ে যে পছন্দ করছে না কাউকে। সত্যিই দেখলুম তাদের বৈঠকখানায় হরেক রকমের চিড়িয়া আমদানি হচ্ছে, কিছুদিন করে থাকছে, আবার চলে যাচ্ছে। ঢিলে-পাজামা-পরা মোটা কালো এক ভদ্রলোক ছিনেজোঁকের মতো লেগেছিলেন অনেক দিন। তাঁর অগাধ পয়সা, কোলকাতায় বাড়ি, বড় পদস্থ চাকরে একজন—কিন্তু তার দিকে ফিরেও চাইলে না সুছন্দা। তিনি সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত এসে ধরনা দিতেন। সুছন্দা তাঁর দিকে ফিরেও চাইত না। ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বই পড়ে যেত খালি। মাঝে মাঝে বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিত। একটি কথা বলত না, একবার চোখ তুলে চাইত না। ভদ্রলোক হাল ছেড়ে দিলেন শেষে। তারপর এলেন প্যাশনে চশমা-পরা বাবরি-ওলা এক কবি। তারপরে এলো এক গাঁট্টাগোঁট্টা ফুটবল খেলোয়াড়। আধুনিক স্বয়ম্বর সভা বসতে লাগল তাদের বৈঠকখানায় এইভাবে। মেয়েটা পালাল শেষটায় একদিন। খোঁজাখুঁজি হলো, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, যথাবিধি যা যা হওয়া উচিত সবই হলো। কিন্তু সুছন্দা আর ফিরল না। আমিও দিনকতক পরে বদলি হয়ে গেলাম কোলকাতা থেকে।

প্রায় বছর দুই পরে সন্ধ্যার পর একদিন নিজের কোয়ার্টারে বসে আছি, এমন সময় হাসপাতাল থেকে খবর এল, একটি স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে। অনুমতি পেলে সে আমার কোয়ার্টারেই আসবে। অনুমতি দিলুম। কে এল জান? সেই জল-জল। প্রথমটা চিনতে পারিনি। বেশ মোটা হয়েছে, চোখের কোলে কালী। পরনের কাপড়খানা রঙীন যদিও, কিন্তু বেশ ময়লা। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলুম তার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলুম।

"আরে, এ কি সুছন্দা যে—!"

সাধারণ মেয়ে হলে চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত এর পর। কিন্তু সে সন্নত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। তারপর স্থির মৃদুকণ্ঠে বললে—"খুব বিপদে

পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কোথা আছেন তা খুঁজে বার করতেই কিছু সময় গেছে আমার। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?"

"বিপদটা কি শুনি আগে—"

"আমি সন্তান-সম্ভবা।"

"সে কি!"

তখন তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম। পেটের কাছটা একটু উঁচু বলেই মনে হলো।

বললাম, "চল, পরীক্ষা করে দেখি - "

দেখলাম নদ্‌পদে পোয়াতি। মাসখানেকের মধ্যেই ছেলে হবে।

"কি ব্যাপার! কবে বিয়ে হলো তোমার—"

"বিয়ে হয় নি।"

"তবে?"

চোখ নীচু করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো স্বচ্ছন্দা। তারপর বললো, "ধরে নিন ভ্রষ্টা হয়েছি।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "তাই আপনার কাছে এসেছি।"

রোমাঞ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম তার মুখের দিকে চেয়ে। আনন্দে নয়, ভয়ে। বৈঠকখানার সোফায় বসে বলা চলে—'সিংহকে আমি থোড়াই কেয়ার করি'। কিন্তু সত্যি সত্যি সিংহের সম্মুখীন হলে প্রত্যেকের যা অবস্থা হয় আমারও তাই হল।

একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলুম, "আমাকে কি করতে হবে? ছেলেটা প্রসব করিয়ে দেওয়া?"

"তা যদি দিতে পারেন তাহলে ভালোই হয়। কিন্তু আমি সেজন্য আসিনি। আমি অন্য একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি।"

"কি বল—।"

"আমার যদি জ্যান্ত ছেলে হয়, তাহলে সে ছেলের ভার আপনাকে নিতে হবে। আপনার জানাশোনা অনেক অনাথালয় নিশ্চয় আছে। সেইখানে কোথাও দিয়ে দেবেন—।"

"তুমি নিজের ছেলের ভার নেবে না কেন?"

"নেবার উপায় নেই বলে।"

"একথাটা কি আগে ভাবা উচিত ছিল না?"

"ভেবেছিলাম। সাবধানতাও অবলম্বন করেছিলুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিপদে পড়ে গেছি।"

কি বলব, চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ।

তারপর বললুম—"এত লোক থাকতে তুমি আমার কাছে এলে কেন?"

"কারণ আমি আপনাকে চিনি।"

এই বলে চোখ নীচু করে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি করি, মহামুশকিল! জিগ্যেস করলাম—"তোমার বাবার খবর কি—"

"কাগজে দেখেছি তিনি রায়বাহাদুর হয়েছেন। আর কোন খবর জানি না।"

চোখ নীচু করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বললুম—"তুমি আমাকে যে ভার দিতে চাইছ তা যদি না নিতে পারি?"

"আমি জানি আপনি নেবেন। আর নিতান্তই যদি তাড়িয়ে দেন, চলে যাচ্ছি। অন্য কোন হাসপাতালে গিয়ে ভরতি হব। তারপর ছেলে হলে ছেলেটাকে ফেলে পালিয়ে যাব। তাঁরা যা হয় ব্যবস্থা করবেন। ছেলের ভার নেবার আমার উপায় নেই।"

"তাহলে ওকে রক্ষা করবার চেষ্টাই বা করছ কেন?"

সুছন্দা হঠাৎ চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল মুহূর্তকাল। তারপর স্থিরকণ্ঠে বললে,—"কে জানে, ও কর্ণও তো হতে পারে—"

আমি মুখে যদিও বললুম, "কেন, সূর্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল না কি"—কিন্তু মনে মনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম ওর সাহস দেখে।

"তা ঠিক জানি না। হতেও পারে—"

"সব খুলে বল দিকি—"

"আমি কিচ্ছু বলতে পারব না। বানিয়ে মিছে কথা বলতে পারি। কিন্তু আপনার কাছে তা বলব না। আর এমনিতেই মিছে কথা আমি বড় একটা বলি না—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার মুখের দিকে।

"আমার অনুরোধটা রাখবেন না?"—আবার বললে সে।

এরপর আমি আর 'না' বলতে পারলুম না। ভরতি করে নিলাম হাসপাতালে। বেশি ভুগতে হয়নি। দিন কয়েক পরে একটা মরা ছেলে প্রসব করল সে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে গেল কাউকে কিছু না বলে।

অনেকদিন ওর আর কোনও খবর পাইনি। বোধহয় বছর দুই হবে। তখনও আমি সেই হাসপাতালেই আছি। হঠাৎ একদিন দুপুরে একটা রেড-ক্রসের মোটরকার দাঁড়াল এসে হাসপাতালে। তাব থেকে নাবল একটি স্ট্রেচার। স্ট্রেচারে চাদর-ঢাকা-দেওয়া রোগী একটি। আমার এ্যাসিস্টেণ্ট সার্জনই দেখেছিল তাকে প্রথমে। সে এসে আমাকে বললে—রোগীটি স্ত্রীলোক, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। গিয়ে দেখি সুছন্দা। দুটো পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সর্বাঙ্গে ঘা, চোখ দুটো টকটকে লাল। সিফিলিসের ভয়াবহ পরিণাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "সুছন্দা, এ কি কাণ্ড—?"

"আপনার কাছে মরবার জন্যে এসেছি। আমার আর বাঁচবার দরকারও নেই। আমি

আমার জীবন দিয়ে যতটুকু করবার তা করেছি। আপনার কাছে এসেছি আর একটা অনুরোধ নিয়ে। আমার সঙ্গে ছোট একটা স্যুটকেশ আছে। সেটা আপনি আপনার কাছে রেখে দিন। খগেন নামে আমার এক বন্ধু ওটি নিতে আসবে। এলে তাকে দিয়ে দেবেন। তার ডান গালে একটা কালো জড়ুল আছে।—"

যদিও তার অবস্থা দেখে মনে মনে আমি খুব দমে গিয়েছিলুম, কিন্তু সব ডাক্তারের যা করা উচিত আমিও তাই করলুম। মুখে তাকে আশ্বাস দিলুম।

"ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভালো হয়ে যাবে তুমি।"

তার দৃষ্টিতে যেন একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পরে বুঝলাম, ওই স্যুটকেশটা আমার হাতে দেবার জন্যেই সে এসেছিল, চিকিৎসা করাবার জন্যে নয়। চিকিৎসা করবার সুযোগই সে দেয়নি আমাকে। সেই রাত্রেই সায়ানাইড খেয়ে মারা গিয়েছিল।

স্যুটকেশটা অনেকদিন পড়েছিল আমার কাছে। সেটা খুলেও দেখেছিলাম আমি। আশা করেছিলুম রঙীন-কাগজে-লেখা এক বাণ্ডিল প্রেমপত্র পাব। কি পেলুম জান? দুটো রিভলভার। মাস ছয়েক পরে গালে-জড়ুল-ওলা সেই ছোকরা এল। তাকে জিগ্যেস করলুম—

"আপনার নাম কি?"

"খগেন।"

"সুছন্দার স্যুটকেশটা নিতে এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"কী আছে ওতে জানেন?"

"বোধহয় ওর জামা-কাপড় কিছু। ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল—"

"স্যুটকেশের ভিতর দুটো রিভলভার আছে। সব কথা যদি খুলে না বলেন, তাহলে আপনাকে পুলিশে দেব।"

যুবকটি বললে, "ভয় দেখিয়ে আমার কাছে কিছু আদায় করতে পারবেন না, কারণ আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। পুলিশের লোক এসে পৌঁছবার আগেই আমার মৃতদেহটা আপনার মর্গে পৌঁছে যাবে।"

"বেশ, তাহলে ভয় দেখাব না। সুছন্দাকে আমি শ্রদ্ধা করতুম। তাই, ব্যাপারটা কি জানবার খুব কৌতুহল হচ্ছে। তার সম্বন্ধে মনে মনে যে ছবি এঁকে রেখেছিলুম, এ ঘটনাগুলোতে সেটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে গেল। তাই জানতে চাইছি—"

"আপনাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, আপনি একজন গভর্নমেণ্ট অফিসার! সুছন্দা যখন প্রথমে আপনার কাছে এসেছিল, তখন সে নিশ্চয় কিছু বলে নি।"

"না। কিন্তু তার সম্বন্ধে যে কুৎসিৎ ধারণাটা হয়েছে, সেটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলে খুশী হতুম। কিন্তু আপনি যদি না বলেন তাহলে আর উপায় কি। আমি যে গভর্নমেণ্ট অফিসার সে কথাও অস্বীকার করব কি করে। তবে একটা কথা মনে

রাখবেন—**all that glitters is not gold**—আমি আপনাদের মতোই সাধারণ লোক। রাজহংসদের মধ্যে আছি বটে, কিন্তু আমি বক ছাড়া কিছু নই। একটু দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি আপনাকে স্যুটকেশটা। চা খাবেন?"

আমার কথাবার্তা শুনে ছেলেটি যেন একটু নরম হল।

চা খেতে খেতে সে জিজ্ঞেস করল, "সুছন্দার সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছে আপনার?"

"যে ধারণা অনিবার্য তাই হয়েছে। খুব ভদ্রভাষায় বললেও বলতে হয়, মনে হয়েছিল সে অসংযত জীবন যাপন করত—"

"সে দেহ-বিক্রি করে টাকা রোজগার করত। সংযম অসংযমের কোন প্রশ্নই ছিল না। সেই টাকা সে নিজের জন্যে খরচ করত না কখনও, সে টাকা জমিয়ে রিভলভার কিনত চোরাবাজার থেকে। আমি সে রিভলভার নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে আসতাম। তিনি আবার অন্য উপায়ে সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিতেন। ওর কেনা রিভলভারের গুলিতে অনেক নামজাদা সাহেব মারা গেছে। কিন্তু সে কথা কেউ জানে না। জানবেও না। নিজেকে ও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে রাখত। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না এ কথা। ওর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলুম, ওর এ পরিচয় কারো কাছে বলব না। আজ প্রথম আপনার কাছে বললুম—"

"আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় কি সূত্রে হয়েছিল? জানতে পারি কি?"

"আমরা সহপাঠী ছিলাম। ও পড়ত বেথুনে, আমি স্কটিশে। ওর রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, যেচে গিয়ে আলাপ করেছিলাম। তারপর ক্রমশ ওর আসল পরিচয় পেলাম।"

হঠাৎ ছেলেটির চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা। তার পরই টপ করে উঠে পড়ল সে। স্যুটকেশটা নিয়ে চলে গেল। আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

আমি তো এ মেয়েকে দ্রৌপদী কুন্তীর চেয়ে ঢের বেশী উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছি।

দ্বিতীয় যে কন্যাটির কথা মনে পড়ছে, সেটি একটি বাগ্‌দির মেয়ে। আমরা ভদ্রলোকরা যাদের ছোটলোক বলি তাদের মেয়েদের যৌবনোদ্গম লক্ষ্য করেছ কখনও? দেখবার মতো জিনিস একটা। ওরা ধুলোয়-কাদায় রোদে-জলে মোটা খাবার খেয়ে প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়, তাই ওদের রূপও প্রকৃতিদত্ত। সতেজ, সবুজ, প্রাণরসে টল-মল, কিশোরী লতার মতো, বন্য-হরিণীর মতো। ওরা রুজ পাউডার মেখে ওদের রূপের গালিচায় তালি দেবার চেষ্টা করে না। সে দরকারই হয় না ওদের, মত্ত মাতঙ্গদের যেমন দরকার হয় না শুঁড়ির দোকান থেকে মদ কেনবার। এদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেকালের তন্ত্রকারেরা। এই অপরাজিতাদের তাঁরা সাধন-সঙ্গিনী করবারও উপদেশ দিয়েছেন। নীচু-কুলোদ্ভবা বলে ঘৃণা করেন নি। কবি বাণভট্ট তাঁর

কাদম্বরী কাব্যে চণ্ডালকন্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে মনে হয়, এই অনার্য-কন্যারা (যাদের আমরা ছোটলোক বলি) সেকালে আর্যদের সভাতেও মোটেই অপাংক্তেয় ছিল না। বাণভট্ট লিখেছেন—সেই চণ্ডালকন্যার কেশদাম বর্ষার জলভরা মেঘের মতো, চোখ দুটি যেন শরতকালের বিকশিত পুণ্ডরীক, অনঙ্গদেবের মতো তার কটিদেশ মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। তাকে দেখে মনে হয়, নীলপদ্মবনে সন্ধ্যার রক্তরাগ যেন ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যে বাগদির মেয়ে পদ্মাবতীর কথা বলছি, আমার বিশ্বাস, বাণভট্ট তাকে দেখলেও মুগ্ধ হতেন এবং যে ভাষায় তার বর্ণনা করতেন তার উপমা-অলঙ্কার-বিশেষণের জৌলুসও বিদগ্ধ রসিকদের চিত্ত হরণ করত।

পদ্মাবতী আমার কাছে যখন এল তখন তার গণোরিয়া হয়েছে। একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আউটডোরে রোগীর ভীড়ে তার দিকে আমার নজর গিয়েছিল সে অসামান্যা রূপসী বলে। কালো মেয়ের অত রূপ এর আগে চোখে পড়ে নি। মহাভারতের কৃষ্ণাকে কল্পনায় দেখেছিলাম। পদ্মাবতীকে দেখে মনে হল, সেই কৃষ্ণাই সশরীরে এসে হাজির হল নাকি?

ওরকম একটা নারীরত্ন দাগী হয়ে গেছে দেখে কষ্ট হল খুব। সে যুগে গণোরিয়ার সুচিকিৎসা আমার যতটা জানা ছিল তা করলাম। ফলে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল একটু। অর্থাৎ আমি ক্রমশ সেই পর্যায়ে গিয়ে পড়লুম যে পর্যায়ে গেলে মুরুব্বীর মতো উপদেশ দেওয়া চলে।

তাকে একদিন জিগ্যেস করলুম, "এ বিশ্রী রোগ তোমার হল কি করে? তোমার স্বামী কি দুশ্চরিত্র লোক?"

"খুব। দিনরাত তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এ রোগটা ওর কাছ থেকে হয় নি—মিথ্যে কথা বলব না আপনার কাছে ডাক্তারবাবু—"

একটু অবাক হয়ে গেলুম। এমন একটা দুশ্চরিত্র স্বামীর ঘাড়ে দোষটা চাপাবার সুযোগ ও অনায়াসে ত্যাগ করল! আশ্চর্য তো!

"কী করে হল তাহলে—"

ঘাড় নীচু করে মুচকি হেসে বলল, "ওই যে আমাদের জমিদারবাবুর বড়ছেলে শুকদেববাবু, চেনেন না তাঁকে, ওই যে বড় ফিটনে চড়ে রোজ মাছ ধরতে যায়, আপনাদের হাসপাতালের সামনে দিয়েই তো যায়—"

শুধু যে সরলভাবে কথাটা স্বীকার করলে তা-ই নয়, এটা যে খুব একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করেছে সে-বোধও যেন নেই—এইটে আমার মনে হল ওর বলবার ধরণ থেকে। ও যেন লুকিয়ে কারো গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করে খেয়েছে কিম্বা কারো ভাঁড়ার থেকে আচার চুরি করে খেয়েছে—ভাবটা অনেকটা এই রকম। আমি বাঙালী, সুতরাং আমার মধ্যে সেই আদ্যিকেলে পদিপিসি আছে। পিসি উপদেশ দেবার জন্যে খোঁচাতে লাগল আমাকে।

বললাম, "কাজটা খুব খারাপ করেছ। এ কাজ কেন করতে গেলে? টাকার জন্যে?"

"ছি ছিঃ, ওকি বলছেন? আমি বাজারের মেয়েমানুষ নাকি? একটি পয়সা নিই নি ওর কাছে—"

"তাহলে এ পাপ কাজ করতে গেলে কেন। অভাবে পড়ে করলে তবু একটা মানে বোঝা যেতো—"

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করে বসেছিল। ঘাড় হেঁট করেই রইল। আর কিছু বলল না।

কিন্তু আমার অন্তরনিবাসিনী পদিপিসি তখন এর হাঁড়ির খবরটি জানবার জন্যে খুব উৎসুক হয়ে পড়েছেন। সুতরাং আমাকে থামতে দিলেন না। আমি একজন পদস্থ ডাক্তার, আর ও একটা সামান্য বাগ্‌দির মেয়ে একথা ভুলিয়ে দিলেন আমাকে।

জিগ্যেস করলুম, "ওকে ভালোবাস নাকি—"

পদ্মাবতী মাথা নেড়ে জানাল বাসে না।

"তবে?"

হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বললে, "আপনারা কি ভিখিরিকে ভিক্ষে দেন না কখনও?"

এইবার চুপ করে যেতে হল আমাকে। এ উত্তর প্রত্যাশা করি নি।

যতদিন ওখানে ছিলুম, খোঁজ রাখতুম মেয়েটার। যিনি ফিটন হাঁকিয়ে রোজ মাছ ধরতে যেতেন, সেই শুকদেববাবুর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল পরে, তাঁর গণোরিয়া এবং সিফিলিস চিকিৎসা করবার জন্যে। অনেক টাকা কামিয়েছিলুম তাঁর কাছ থেকে। ভাগ্যে এই অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেগুলো আছে তাই আমরা ডাক্তাররা, দুপয়সা করে খাচ্ছি। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর আর দাদের চিকিৎসা করে ক'পয়সা পেতুম। টি-বি হয় খুব গরীবদের। এ দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা তারা করাতে পারে না। বড়লোকরা স্যানাটোরিয়মে চলে যায়। সিফিলিস গণোরিয়াই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। শুকদেবের সঙ্গে যখন অন্তরঙ্গতা হল, তখন তাকে পদ্মাবতীর কথা জিগ্যেস করেছিলুম। বলা বাহুল্য, পদিপিসির ওস্‌কানিতে।

শুকদেব বললেন, "জীবনে ওই একটি মেয়ের কাছেই হাতজোড় করেছিলুম। এখনও হাতজোড় করেই আছি। একবার সে দয়া করেছিল, দ্বিতীয়বার আর করেনি। মনে হয়, আর করবেও না। আমার ধারণা কি জানেন?"

"কি?"

"ও গরীবের ঘরে জন্মালে কি হবে, মেয়েটি সত্যই অসাধারণ। যে স্বামী দুবেলা ঠেঙিয়ে ওর গতর চূর্ণ করে দিচ্ছে, সেই স্বামীর পা আঁকড়ে পড়ে আছে মশাই। শুধু আমি নয়, অনেকেই ওকে রাজরাণী করে রেখে দিতে প্রস্তুত, ও কিন্তু রাজী হয় না। আমার ধারণা, হয় ও কোনও শাপভ্রষ্টা অপ্সরা, কিম্বা খুব গভীর জলের মাছ, আমাদের মতো লোকের জাল সেখানে পৌঁছয় না।"

আর একবার পদ্মাবতীর চূর্ণ-গতর মেরামত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম কিছু দিন পরে। তাকে দেখে মনে হয়েছিল, যেন একটা উন্মত্ত ষাঁড়ে তাকে গুঁতিয়েছে। তার স্বামী বিশু বাগ্‌দিকেও দেখবার সুযোগ হয়েছিল সেই সূত্রে, কারণ পদ্মাবতী তার হাতে কামড়ে দিয়েছিল। কামড়ে না দিলে বিশু বাগ্‌দি সম্ভবত খুনই করে ফেলতো তাকে। কারণ, সে ছিল মনুষ্যরূপী একটি মহিষাসুর। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি জোয়ান, ইয়া গোঁফ, ইয়া জুলফি।

এরপর আমি বদলি হয়ে গেলাম সেখান থেকে। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অবশেষে একটা কুষ্ঠ হাসপাতালে গিয়ে ঠেকলুম প্রায় বছর দশেক পরে। ওপরওলার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল একটু, তিনি আমাকে ওই ভাগাড়ে পাঠিয়ে দিলেন। বছরখানেক সেখানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। একটি পরম লাভ হয়েছিল কিন্তু। পদ্মাবতীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল সেখানে। একদিন আউটডোরে এসে দেখি, একটা একচোখ কানা বুড়ি বসে আছে। পদ্মাবতীকে আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। সে উঠে এসে যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে, তখন জিগ্যেস করলাম, "কে তুমি—"

"চিনতে পারছেন না ডাক্তারবাবু, আমি পদ্ম—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার দিকে। তার যে চোখ দেখে বাণভট্টের সৃষ্টি পুণ্ডরীকনয়নার কথা মনে পড়েছিল, সেই চোখের একটি নেই। যেটা আছে সেটাও বীভৎস হয়ে উঠেছে সঙ্গীহীন হয়ে! বাঁ গালের উপর, কানা চোখটার নীচেই 'স্কার' একটা, গালের মাংসটাকে কুঁচকে দিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। সেই ঢলঢলে মুখের শোভা একটুও নেই।

"একি, এরকম চেহারা কি করে হল তোমার? চোখটা গেল কি করে?"

"ওই ওকে জিগ্যেস করুন। মদের ঝোঁকে আমার মুখের উপর আগুনের নুড়ো চেপে ধরেছিল!"

"কিন্তু এখন যা হয়েছে, তা তো চিকিৎসার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে যদি আসতে—"

"আমি এর জন্যে আসি নি। আমার পায়ের হাঁটু দুটোর যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, সে জন্যেও আসি নি, আমি ওর জন্যেই এসেছি। আপনি ওকেই দেখুন ভালো করে, ওর একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিন। আপনি পুরোনো চেনা লোক, এখানে আছেন ভালোই হয়েছে—ওকে দেখুন একবার—"

বিশু বাগ্‌দি এককোণে গায়ে কাপড়চোপড় ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তখনও ভালো করে দেখিনি তাকে।

"এদিকে এস, দেখি কি হয়েছে—"

তাকে দেখেও চমকে উঠলুম। বন্যমহিষ যেন মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-গাড়ি-টানা মহিষে পরিণত হয়েছে। তার মুখের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝলাম কি হয়েছে তার। কুষ্ঠ। ওই ফোলা-নাক, ফোলা কানের পাতা, ওই সিংহবদন আর কোন রোগে হয় না।

পদ্মাবতী বললে, "আমার গয়নাগাঁটি সব বিক্রি করে চল্লিশটি টাকা জোগাড় করে এনেছি ডাক্তারবাবু। দরকার হলে বাজার থেকেও ওষুধ কিনতে পারব আমি—"

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে মিনিটখানেক লাগল। তারপর ব্যবস্থা করে দিলুম। বেহুলা সাবিত্রী রূপবান চরিত্রবান স্বামীদের যমের কবল থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে অশেষ কৃচ্ছ্র সাধন করেছিলেন বলে তাঁদের আমরা বাহবা দিই। কিন্তু পদ্মাবতীর এই কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত শয়তান পাষণ্ড স্বামীকে বাঁচাবার আকুল আগ্রহ কি ওদের আগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়? তোমার ক্ল্যাসিক্যাল পঞ্চকন্যাদের চেয়ে এ কি কোনও অংশে কম?

এইবার তৃতীয় যে কন্যাটির কথা বলব, তাকে তোমরা সবাই দেখছ, কিন্তু চিনতে পার নি। এ কন্যা মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে ঘরে আছে। এরা অনাহারে বা অর্ধাহারে থেকে, বছরের পর বছর তোমাদের খেয়াল অনুসারে মন যুগিয়ে দিনের পর দিন শরীর পাত করছে, কিন্তু এদের তোমরা চেনও না, শ্রদ্ধাও কর না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ হয়তো সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে হাততালির লোভে ওদের সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছ, কিন্তু ওদের সত্যিকার মর্যাদা তোমরা দাওনি, দেবার সামর্থ্যও তোমাদের নেই। ওই সতী-লক্ষ্মীরা তোমাদের বাড়িতে কুমারী অবস্থাতেও চাকরাণী-রাঁধুনী, সধবা অবস্থাতেও তাই, আর বিধবা হলে তো কথাই নেই। তখন তার খাবারের এক-আধটুকুরো মাছ আর তার কাপড়ের পাড়ের সামান্য রংটুকুও তোমরা মুছে নিয়ে তাকে একবেলা খাইয়ে উপদেশ দাও—'এখন কেবল পতিদেবতার চরণ ধ্যান কর, নির্বিকার হয়ে আমার সংসারের বাসন মাজ, কাপড় কাচ আর রান্না করে যাও। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেল। রূপে, রঙে, গানে, কবিতায় খবরদার মুগ্ধ হয়ো না। অবসর পেলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ শুনতে পার। ওসবেও নানা রকম অশ্লীল গল্প আছে বটে, কিন্তু ধর্মরসে জারিত হয়ে নির্দোষ হয়ে গেছে সে সব। ফর্মালিনে-ডোবানো মরা-গোখরো কামড়ায় না। কাঁচা তেঁতুল খেলেই অসুখ হবার সম্ভাবনা, কিন্তু পুরোনো পোকাধরা তেঁতুল ঔষধ পথ্য দুই-ই। সুতরাং সংসারের কাজকর্ম সেরে বিনা পয়সায় কোথাও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ শোনবার সুযোগ পেলে শুনো।' তাই করছে তারা।

এই স্লেভ ট্রেড (slave trade) তোমরা চালিয়ে যাচ্ছ অনাদি কাল থেকে। কোনও আইন তোমাদের রুখতে পারে নি। কারণ ওই স্লেভরাই স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের চাবুকের তলায় পিঠ পেতে দিচ্ছে। দিচ্ছে, কারণ ওই দেওয়াটাকেই ওরা পুণ্য মনে করছে, বহুকালের সংস্কারের জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা পড়ে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে ওদের স্বাধীন সত্তা, ক্রীতদাসী হয়েই কৃতার্থ ওরা। মানছি, ওদের মধ্যে অনেক খাণ্ডারণী আছে। এ-ও মানছি ওদের ভয়ে অনেক স্বামীও সন্ত্রস্ত। ইতিহাসে এ নজীরও আছে যে ইংরেজরা প্রথম যখন এদেশে আসে, তখন এদের মধ্যে থেকেই একদল তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল যার সারমর্ম হচ্ছে—আমাদের বাঁচাও।

তোমরা শুনেছি সভ্য দেশের লোক, এই পিশাচ পাষণ্ডদের হাত থেকে বাঁচাও আমাদের। সংসারের চাপে নিষ্পিষ্ট হলেও সকলের স্বাধীন সত্তা একেবারে মরে যায় না, নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা। কিন্তু এ-ও ঠিক যে, এখনও ওই মধ্যবিত্ত সংসারেই লক্ষ লক্ষ নারী 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' তোমাদের দাসীবৃত্তি করে চলেছে। আত্মবিলোপ করেই ওদের তৃপ্তি।

আমি একটি মেয়ের কথা জানি। একটা বুড়ো কেরানীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। অপূর্বচন্দ্র আমারই আপিসের কেরানী ছিল। বেগুনপোড়ার মতো মুখটা, তার উপর একজোড়া সাদা ঝোলা গোঁফ। চোখ দুটো ফোলা-ফোলা, ঠোঁটের উপর ধবলের আভাস।

একদিন লক্ষ্য করলুম, লোকটা উপর্যুপরি আপিসে লেট করে আসছে। জবাবদিহি তলব করলুম। সে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, "বড় বিপদে পড়েছি সার। নিজে রান্না করে খেয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে তবে আসি। আমার পরিবারটি অসুখে পড়েছে—"

"কি হয়েছে—"

"বলে তো জর হয়। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বলে বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, মাথায় ব্যথা। ওই নিয়েই কাজ করছিল এতদিন, ক'দিন থেকে শয্যা নিয়েছে। আমাকেই রাঁধতে হচ্ছে। একটা রাঁধুনীর চেষ্টায় আছি—আর লেট হবে না—"

"ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন কিছু?"

হরেন সাণ্ডেলকে খবর দিয়েছি। তিনি আসবেন বলেছেন—"

"এ ব্যক্তিটি কে?"

"হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একজন। খুব হাতযশ—"

তারপর আরও বার দুই হাত কচলে বললে, "আপনাকে বলতে তো ভরসা পাই না। গরীব মানুষ আমি—"

"আচ্ছা, আমি যাব আপনার স্ত্রীকে দেখতে।"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, মানুষ নয়, একটি কঙ্কাল শতছিন্ন একখানা গোলাপী র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছে। মুখের মধ্যে আছে শুধু ভাসা-ভাসা চোখ দুটি, আর সে চোখে কি উৎসুক করুণ দৃষ্টি। বুঝতে দেরি হল না যে কালরোগে ধরেছে—যক্ষ্মা।

বললাম, "ওষুধের চেয়ে এর খাওয়ার দরকার বেশি। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছেন কেন, খুলে দিন। ভালো খাওয়া আর ভালো হাওয়া—এই চাই এখন। জানালা বন্ধ করছেন কেন—"

"মথুর কবরেজ বললেন, কফের অসুখ কিনা, হাওয়া লাগলে বেড়ে যাবে—"

"খুলে দিন।"

লোকটার মুখ দেখে মনে হল খোলবার ওর ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমি ওর মনিব, ত্রস্ত হয়ে খুলতে লাগল। ছিট্‌কিনি টানার কর্কশ আওয়াজ থেকে অনুমান করলাম, এ জানালা জন্মে কখনও খোলা হয় না।

"কি খাচ্ছে ও—"

"জল বার্লি—"

"দুধ টুধ দেন না?"

"আজ্ঞে না। দুধে শুনেছি কফটা বাড়ে—"

ধমকে উঠলুম।

"আপনি তো মহাপণ্ডিত লোক দেখছি! দুধ দেবেন ওকে রোজ সেরখানেক করে। ডিমও দেবেন—"

"হাঁসের ডিম বলছেন? কিন্তু ওর বাঁ হাঁটুটাতে বাতের ব্যথা আছে।"

"বেশ, মুরগীর ডিম দিন তাহলে। একটা করে শুরু করুন প্রথমে—"

"মুরগীর ডিম তো চলবে না সার। গোঁড়া ব্রাহ্মণের বংশ আমাদের—"

"ও। তাহলে ফলটল দিন। কলা, পেঁপে—"

তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়ল, ফরমাস তো করে চলেছি লম্বা লম্বা কিন্তু লোকটার মাইনে যে মাত্র পঁচাত্তর টাকা।

"দুধ কতটা করে নেন আপনারা—ওকে দুধই একটু বেশি দিতে হবে।"

মুখ কাচুমাচু করে অপূর্বচন্দ্র বললেন, "দুধ নিতে পারি না সার। যা দাম—"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এর চিকিৎসা তাহলে কি করে হবে! জল বার্লি খাইয়ে যক্ষ্মারুগী বাঁচানো যায় না। রোক চড়ে গেল, বাঁচাতেই হবে ওকে।

বললুম, "হাসপাতালে যে লোকটা দুধ দেয় তাকে বলবেন, আপনার বাড়িতে যেন রোজ একসের করে দুধ দিয়ে যায়। আর দুধের বিলটা যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর এর ওষুধপত্র যা লাগবে তা হাসপাতাল থেকেই পাবেন, আমি বলে দেব ডাক্তার ঘোষকে—"

"যে আজ্ঞে।"

হাসপাতাল থেকে দামী ওষুধ সাধারণ রোগীদের দেওয়ার নিয়ম ছিল না। তবে স্পেশ্যাল কেস হলে দেওয়া যেতো। ওর নামটা হাসপাতালের খাতায় লিখে সেই বন্দোবস্তই করে দিলাম।

অপূর্বচন্দ্র এসে খবর দিতে লাগল রুগী বেশ ভালোই আছে। পরে বুঝেছিলাম মিথ্যে খবর দিয়েছে।

মাসখানেক পরে একদিন ওদের বাড়ির কাছেই আর একটা রুগী দেখতে গিয়েছিলুম। মনে হল অপূর্বচন্দ্রের স্ত্রী কেমন আছেন একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখলুম, যাকে পই-পই করে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছিলুম, সে বারান্দায় বসে একটা

তোলা উনুনে ক্ষীর করছে। পাশে একটা বাসনে খানিকটা ছানাও কাটানো রয়েছে।

আমি যে এমনভাবে সে সময়ে গিয়ে পড়তে পারি এ কথা ভাবতেই পারে নি সে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়াল।

"কি খবর, কেমন আছ। এ কি, ছানা, ক্ষীর কার জন্যে? শুধু দুধ খেতে ভালো লাগছে না বুঝি—"

মেয়েটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

"ক্ষীর হজম হবে তোমার? ছানাটা অবশ্য চলতে পারে—"

আমি তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে ও ক্ষীর করছে ওর আফিং-খোর স্বামিটার জন্যে, আর ছানা কাটিয়ে রেখেছে ওর ছেলেমেয়েদের সন্দেশ করে দেবে বলে। নিজে একফোঁটা দুধ একদিনও খায়নি।

জেরা করতেই সব বেরিয়ে পড়ল।

বলল, "উনি বুড়োমানুষ সমস্ত দিন খেটেখুটে আসেন, সন্ধেবেলা আফিং খান, একটু ক্ষীর হলে ওঁর শরীরটা ভালো থাকে। আর ছেলেমেয়েগুলো ইস্কুল থেকে এসে রোজই মুড়ি চিবোয়, সন্দেশের উপর ওদের কি যে লোভ, ময়রাটার খোঞ্চা থেকে একদিন ফটিক সন্দেশ চুরি করে কি মারটাই যে খেয়েছিল, তাই ওদের জন্যে দু'চারটে সন্দেশ করে রাখি—"

তখন জানতুম না যে ছেলেমেয়েগুলো ওর একটাও নয়, সব সতীনের।

বললাম, "কিন্তু তুমি রুগী, দুধ তো তোমারই খাওয়া আগে দরকার। তোমার জন্যেই দুধ হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর তুমি ক্ষীর ছানা করে ওদের খাওয়াচ্ছ!"

মেয়েটা ঘাড় ফিরিয়ে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইল।

"হাত দেখি তোমার—"

কঙ্কালসার হাতটা বার করে দিলে। রক্তহীন শির-বার-করা হাত। পাল্‌স্ রেট একশ কুড়ি।

"না, এরকম উপোস করে থাকলে তোমার চিকিৎসা করতে পারব না। হাসপাতাল থেকে দুধ যদি আর একসের করে বাড়িয়ে দিই তাহলে তুমি খাবে?"

ঘাড় নেড়ে জানাল খাবে।

ফিরে গিয়ে আপিসে তার স্বামীকে ডেকে যাচ্ছেতাই বকলুম।

"আপনার অসুস্থ স্ত্রীর জন্যে হাসপাতাল থেকে দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, আর আপনি তাই মেরে ক্ষীর করে খাচ্ছেন, লজ্জা করে না আপনার?"

হাত কচলাতে কচলাতে অপূর্বচন্দ্র বললে, "খুবই করে সার। কিন্তু কি করব, ও যে কিছুতেই খাবে না। বলে দুধ খেলে ওর পেট ভুটভাট করে। দুধ ওর সহ্য হয় না।"

"যাতে হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।"

"তাহলে ওকে হাসপাতালে এনেই রাখুন সার। আমি একটা রাঁধুনীর সন্ধান পেয়েছি।"

হাসপাতালে একটা কেবিন খালি ছিল। পয়সা দিতে হবে বলে সেখানে সাধারণতঃ কোন রুগী জুটত না। মফস্বলের হাসপাতালে সকলেরই ইচ্ছে সম্পূর্ণ চিকিৎসাটা বিনা পয়সায় হোক। সেই কেবিনে এনে ভরতি করলুম সরমাকে। মেয়েটির নাম ছিল সরমা। হাসপাতালে এনে দেখলুম দুধ ওর বেশ হজম হয়। প্রায় সের দেড়েক দুধ অনায়াসে হজম করতে লাগল। দিন সাতেক পরে মেয়েটি একদিন সকাতরে আমাকে বললে, "দুধ আমার মুখে রুচছে না ডাক্তারবাবু। ওরা সবাই বাড়িতে শাকচচ্চড়ি আর ফ্যান-মেশানো কলাইয়ের ডাল খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, আর আমি একলা ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি—এ আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমি যদি মরেই যাই তাতেই বা ক্ষতি কি। আমার চেয়ে ওঁর বাঁচাটা বেশি দরকার। অতগুলো ছেলেমেয়ের বাবা উনি। সমস্তদিন কলম পিষে ক্লান্ত হয়ে পড়েন—উনি একটু দুধ খেতে পান না—আর আপনি আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।"

আমি বললুম, "তোমার পতি-ভক্তির প্রশংসা করছি। কিন্তু তুমি রুগী, আমি ডাক্তার। তোমার রোগ যাতে সারবে আমাকে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। তোমার স্বামী বা ছেলেমেয়েরা কি খাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামালে তো চলবে না। তুমি আগে সেরে ওঠ, তারপর ওসব ভাবা যাবে। অপূর্ববাবু এতদিন যা খেয়ে কাটিয়েছেন, বাকী জীবনটাও তাই খেয়ে বেশ কাটিয়ে দিতে পারবেন। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার যা ব্যবস্থা করেছি সেই মত চলতে হবে তোমাকে—"

এর দিন কয়েক পরে শুনতে পেলুম কেবিনের সামনে হাল্লা উঠেছে একটা। সুহাসিনী নামে ঘোড়ামুখী একটা নার্স ছিল, সে খুব চেঁচামেচি করছে। গেলুম এগিয়ে।

"কি হয়েছে—"

"সরমাকে রোজ যা খেতে দি, তার আদ্ধেকের উপর ও সরিয়ে রেখে দেয়। রুটি, মাখন, ছানা, সব। আর আমরা যখন দুপুরে খেতে চলে যাই, ওই ছেলেটা এসে নিয়ে যায় রোজ—"

দেখলাম, আট-দশ বছরের ফটিক দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝোলা হাতে করে। বমাল সুদ্ধ ধরা পড়েছে। কি আর বলব, ছেড়ে দিলাম। সুহাসিনী গজগজ করতে করতে চলে গেল।

সরমাকে বললাম, "তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলতো? এরকম করলে তো তোমাকে হাসপাতালে রাখা যাবে না—"

সরমা ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, "সেই ভালো, আমি বাড়িই চলে যাই। ওসব একলা আমি খেতে পারব না।"

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম মিনিটখানেক। তারপর বললাম, "আচ্ছা, সুহাসিনীকে বলে দিচ্ছি তোমাকে বেশি বেশি করে দেবে। তুমি পেট ভরে খেয়ে বাকীটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও—"

এরকম সাধারণতঃ হয় না, এরকম করা নিয়মও নয়, কিন্তু আমার রোক চড়ে গিয়েছিল।

দিন পনেরো পরে আর একটা ঘটনা ঘটল। একদিন শুনলাম, ফিটফাট একটি সুদর্শন যুবক ফল-টল নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

সুহাসিনী বলল, "সরমা কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করলে না। ফল-টল ছুঁলেও না। অদ্ভুত মেয়ে বাবা।"

আমি রাউণ্ড দেবার সময় যখন ওর কেবিনে গেলাম, তখন দেখি বসে বসে কাঁদছে।

"কি হল, কে এসেছিল আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে—"

ঘাড় হেঁট করে বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, "কেউ না—"

"অচেনা লোক কখনও ফল-টল নিয়ে দেখা করতে আসে? ভালো ভালো ফল এনেছিল শুনলাম, ফলগুলো ফেরত দিলে কেন?"

উত্তর দিলে না, চুপ করে বসে রইল।

আমার এ্যাসিস্‌টেন্ট সার্জন ডাক্তার ঘোষ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যেও একটু ডিটেক্‌টিভ-ভাব ছিল। তিনিই একদিন ব্যাপারটার রহস্যোদ্ভেদ করলেন। বললেন, "ওই ছেলেটি খুব বড়লোকের ছেলে। সরমার বাপের বাড়ির লোক। সরমাকে খুব ভালো লেগেছিল, বিয়েও করতে চেয়েছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি।"

"কেন, জাতে আটকালো?"

"না। পালটা ঘরই ছিল। আটকালো কুষ্ঠিতে।"

"বল কি। এত খবর তুমি জোগাড় করলে কি করে?"

"ভদ্রলোক আজ আমার আপিসে এসেছিলেন। হাসপাতাল ফাণ্ডে দুশো টাকা দান করে গেছেন, আর আমাকে অনুরোধ করে গেছেন, সরমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি যেন না হয়। আমি বললুম, কোন ত্রুটি হচ্ছে না। ওর জন্যে আপনাকে টাকা দিতে হবে না। তিনি বললেন, না, আমি টাকা দিচ্ছি নিজের তৃপ্তির জন্যে। তারপর গল্প করতে করতে সব কথা বেরিয়ে পড়ল।"

সরমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি। তবু তাকে বাঁচাতে পারিনি। পরে প্রকাশ পেল সে অন্তঃসত্ত্বা। মাস পাঁচ-ছয় পরে একটা মরা ছেলে প্রসব করে সে-ও মারা গেল। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সে খোঁজ নিয়েছে তার স্বামী আর সতীনের ছেলেমেয়েরা তার খাবারের ভাগ পাচ্ছে কি না।

সেই বড়লোকের ছেলেটি মাঝে মাঝে এসে সরমার খোঁজ নিতেন, কিন্তু সরমার ঘরে ঢুকতে সাহস পেতেন না।

সরমার সেই ভাসাভাসা চোখ দুটো আর কঙ্কালসার চেহারাটা এখনও মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে আমার মনে। রাত্রে একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম তাকে। আমাকে যেন বলছে, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, শুনেছি জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ যখন যেখানে হবার তাই হয়। জন্মাবার সময় আমরা কুষ্ঠি দেখে জন্মাই না, মরবার সময়ও আমরা কুষ্ঠি দেখে মরি না, বিয়ের বেলাতেই কুষ্ঠির এত বাড়াবাড়ি করি কেন বলুন তো—"

স্বপ্নের সরমা একথা বলেছিল, কিন্তু বাস্তবের সরমা বোধহয় একথা ভাবতেও পারত না। তবু ওই অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জেদী মেয়েটা আজও আমার কাছে প্রণম্য হয়ে আছে।

চতুর্থ যে কন্যাটির কথা মনে পড়ছে, তার কথা বলব কি না ভাবছি। কারণ তোমরা বাল্যকাল থেকে মনে মনে যে ছক এঁকে রেখেছ, তার সঙ্গে এটা মিলবে না। কারণ মেয়েটি মুসলমানী, তার উপরে বাঈজি। হিন্দুদের ধারণা যা কিছু হিন্দু তাই ভালো, মুসলমানদের ধারণা যা কিছু মুস্‌লিম তাই ভালো। এমনি করে তোমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা খোপ-খোপ করে ভাগ করে ফেলেছ তোমরা। আমার নিজেরও যে এই ধরনের কুসংস্কার নেই তা নয়। ডাক্তারি করতে করতে, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ দোষ খানিকটা কমেছে অবশ্য, এটা বুঝতে পেরেছি যে, শিশির গায়ের লেবেল দেখেই সব সময় ওষুধের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না, যাচাই করে দেখতে হয়। এই সূত্রে একটা গল্প মনে পড়ল। সমর দে নামে আমার এক বন্ধু ছিল। তার বাড়িতে একদিন সন্ধেবেলা বেড়াতে গেছি। ছুরি দিয়ে নখ কাটতে কাটতে হঠাৎ একটা আঙুলে রক্তারক্তি হয়ে গেল। সামনেই একটা সেলফ্‌ ছিল। তাতে দেখলাম টিঞ্চার আইয়োডিন লেবেল দেওয়া একটা শিশি রয়েছে। উঠে গিয়ে সেটা নিয়ে ছিপি খুলতে যাচ্ছি, সমর বললে, "ওটা নিও না। ওতে আইয়োডিন নেই।" তার পাশেই আর একটা শিশি রয়েছে দেখলাম—গায়ে লেবেল ডেটল্‌। বললাম, "তাহলে এইটে নি। একটু জল আনাও।" সমর বললে, "ওটা ডেটল্‌ নয়।" পাশে আর একটা শিশির গায়ে লেখা দেখলাম টিনচার বেনজোইন। সমর বললে, "ওটাও বেনজোইন নয়।" অবাক হয়ে গেলাম। শেলফে আরও নানারকম শিশি ছিল সারি সারি। কোনটাতে লেবেল—সিরাপ হিমোগ্লোবিন, কোনটায় জোয়ানের আরক, কোনটা চিরেতার জল। সমর বললে, "লেবেলে যা লেখা দেখছ, তা একটা শিশিতেও নেই।" জিগ্যেস করলুম, "এতগুলো খালি শিশি রেখেছ কেন?" সমর বললে, "একটিও খালি নয়, প্রত্যেকটিতে ব্র্যাণ্ডি আছে। বাবা মা সর্বদাই এ ঘরে ঢোকেন কি না, প্রকাশ্যে কি করে রাখি বল। তা ছাড়া চণ্ডেটাও আসে প্রায়। ও যদি ব্র্যাণ্ডির বোতলের সন্ধান পায় তাহলে কি আর রক্ষে আছে! তাই এই ফন্দী করেছি।"

সুতরাং লেবেল সব সময় বিশ্বাসযোগ্য নয়। মুসলমান বাঈজি শুনে আমারও নাকটা কুঁচকে গিয়েছিল প্রথমে। সে বহুদূর থেকে আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছে, অনেক টাকা ফি দিয়ে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করাবে—এসব জানা সত্ত্বেও নাকটা কুঁচকেই ছিল। গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ি ছিল, সেইটে ভাড়া নিয়েছিল সে। বেশ জমজমাট ব্যাপার। আট দশটা চাকর, আট দশটা চাকরাণী, আয়া বাবুর্চি মোটরকার শফার।

প্রথম যেদিন তাকে দেখতে গেলুম সেদিন নজরে পড়ল একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে বসে আছে তার বিছানায়। বয়স বছর দশেক আন্দাজ হবে। আমি ঘরে ঢুকতেই বাঈজি ছেলেটিকে বললে, "ডাক্তার সাহেবকে প্রণাম কর—"

ছেলেটি এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। প্রত্যাশা করেছিলুম, মুসলমান যখন, আদাব করবে। তারপর মনে হল বাঈজিদের কোন জাত থাকে না বোধহয়, হিন্দুকে হিন্দুর মতো অভ্যর্থনা করে, মুসলমানকে মুসলমানের মতো। কিন্তু আমার এ থিয়োরি খাটল না, আমি যখন উঠে আসছি তখন সে নিজে আমাকে মুসলমানী কায়দাতেই আদাব করল।

রোজই দেখতে যেতুম তাকে দুবেলা। অপারেশন করবার তেমন তাড়া-হুড়ো ছিল না। পেটে ছুরি বসাবার আগে দেখছিলুম, এমনি চিকিৎসা করে ব্যথাটা যদি কমে যায়, তাহলে পরে ধীরে সুস্থে অপারেশন করে দেব।

একদিন আমার যেতে একটু রাত হয়েছে, দেখি সে গঙ্গার দিকের প্রশস্ত ছাতে বসে সেতারে কি একটা সুর আলাপ করছে। মনে হল কানাড়া। আমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হল। কারণ আমি তাকে শুয়ে থাকতে বলেছিলাম।

"আজ অনেক ভালো আছি। ব্যথা একেবারেই নেই। তাই সেতারটা নিয়ে বসেছি। আপনার জন্যে চা আনতে বলি?"

সাধারণতঃ রুগীর বাড়িতে আমি খাই না, কিন্তু সেদিন আর আপত্তি করলাম না, অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম।

চা-পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর সে আমাকে বললে, "ডাক্তারবাবু, এতদিন তো আপনাকে কেবল রোগের কথাই বলেছি, আজ একটা অন্য কথা বলতে চাই। যদি আপনি এ বিষয়েও আমাকে একটু সাহায্য করেন, তাহলে বড়ই উপকার হয় আমার। শুনবেন কথাটা? এই সময়েই বলা ভালো, কারণ ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে—"

"কি বলুন—"

"আমি ছেলেটার পৈতে দিতে চাই। এখানে কি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

"পৈতে? আমার ধারণা ছিল আপনি মুসলমান।"

"আমি মুসলমান। কিন্তু ছেলেটি ব্রাহ্মণের ছেলে। শুধু ব্রাহ্মণ নয়—খুব উঁচুদরের ব্রাহ্মণের ছেলে—"

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম শুধু। দৃষ্টির প্রশ্ন যখন রসনায় বাঙ্ময় হল, তখন সেটা ঠিক ভব্যতাসূচক হল না। কোন লেডির কাছে এরকম প্রশ্ন করা কায়দা-দস্তুর নয়।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "বাপের খবর পেলুম। কিন্তু মা-টি কে?"

"আমিই ওর মা।"

"তাহলে ও ছেলে কি আর ব্রাহ্মণ আছে?"

"জবালার গর্ভজাত পুত্রকে ঋষি গৌতম তো অব্রাহ্মণ বলেন নি।"

তারপর একটু হেসে বললে, "আমি মুসলমান, কিন্তু আমি রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কিছু কিছু পড়েছি। পড়েছি বলেই জানি হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ বলতে কি বোঝায়। ওর বাবা খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, আমার ইচ্ছে ছেলেও খাঁটি ব্রাহ্মণ হোক। তাই প্রথমে ওর পৈতেটা দিতে চাই। আমি যেখানে থাকি সেখানে দেওয়া সম্ভব হয় নি, কারণ কোনও ভালো ব্রাহ্মণই আমার বাড়িতে এসে পৌরোহিত্য করতে রাজি হন নি। আমার এখানে আসার এ-ও একটা কারণ। ওর পৈতের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? ভালো ব্রাহ্মণ পুরোহিত চাই একটি। যজন-যাজন করেন এরকম ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে তো? সে রকম পেলেই যথেষ্ট। একটিমাত্র আদর্শ ব্রাহ্মণই দেখেছিলাম জীবনে—"

"কে তিনি—"

"ওই ছেলের বাবা।"

আমার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিল, 'ব্রাহ্মণটি তোমার খপ্পরে পড়লেন কি করে,'—কিন্তু সামলে নিলুম।

ভদ্রভাষায় বললুম, "আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কি করে হয়েছিল? বলতে যদি অবশ্য বাধা থাকে, শুনতে চাই না—"

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "বলতে আর বাধা কি। তবে একটা ভয় শুধু হয়, পাছে তাঁকে ভুল বোঝেন। সেইজন্যে গোড়াতেই বলছি দোষটা সম্পূর্ণ আমার।"

তারপর একটু হেসে বললে, "রামায়ণ মহাভারত তো পড়েছেন, স্বর্গের অপ্সরারা এসে বড় বড় মুনি-ঋষিদের তপোভঙ্গ করত। আমার কৃতিত্ব শুধু এইটুকু যে, আমি মর্ত্যের সামান্য মানবী হয়েও তাঁর মতো লোককে ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলাম কিছুদিনের জন্য—"

আমি হেসে বললুম, "আমার তো মনে হয় পোড়-খাওয়া সংসারী লোকদেরই ভোলানো শক্ত। মুনি-ঋষি-জাতীয় লোকরা এত বেশি সরল আর এত বেশি ভাব-প্রবণ যে একটুতেই তাঁরা গলে যান।"

মেয়েটি বলল, "ঠিক বলেছেন, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির সঙ্গেই ওঁর উপমা দেওয়া চলে। আমি ওঁকে অবশ্য সন্দেশ দিয়ে ভোলাই নি, রূপ দিয়েই ভুলিয়েছিলাম। রূপ দেখে মুগ্ধ

হওয়াটা পাপ নয় নিশ্চয়, কারণ দেবতার কাছে আপনারা যে প্রার্থনা করেন তার প্রথমেই আছে রূপং দেহি—"

মেয়েটির কথাবার্তা শুনে ক্রমশই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল না যে আমি একজন মুসলমানী বাঈজির সঙ্গে আলাপ করছি। বরং মনে হচ্ছিল, যেন একজন শিক্ষিত বিদগ্ধ অধ্যাপকের কাছে বসে আছি। কথা কইতে কইতে একবার মনে হয়েছিল গ্রীস দেশের গল্পে যে স্যাফোর কথা পড়েছি সে কি এই রকম ছিল? মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পডছিলুম।

হঠাৎ কানে গেল মেয়েটি বলছে, "রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলে উনিও ক্ষুব্ধ হন নি। রূপের মন্দিরে উনি সরল বিশ্বাসে দেবতাকেই সন্ধান করছিলেন, কিন্তু উনি যখন জানতে পারলেন আমি ওঁকে প্রতারণা করেছি, তখনই ফুরিয়ে গেল সব। সেই মুহূর্তে উনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন।"

"প্রতারণার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না ঠিক—"

"ওঁকে দেখে আমিই প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে একগলা জলে দাঁড়িয়ে উনি সূর্য-অর্ঘ দিচ্ছিলেন। সেই প্রথম ওঁকে দেখি। তারপর ওঁকে দেখবার জন্যে রোজই গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম। উনি চেয়ে থাকতেন সূর্যের দিকে আর আমি চেয়ে থাকতাম ওঁর দিকে। প্রায় দশ পনর দিন আমি ওঁর চোখেই পড়িনি। উনি যখন স্নান করে উঠে যেতেন, আমি ওঁর পিছু পিছু যেতাম। তারপর একদিন হঠাৎ উনি আমাকে দেখতে পেলেন। তখন আমার কিছু রূপ ছিল। ক্রমশঃ এটাও উনি লক্ষ্য করলেন যে, আমি রোজ ঘাটে আসি, রোজ ওঁর পিছু পিছু যাই। একদিন উনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে, কেন ওঁর পিছু পিছু আসি। তখন আমি ওঁকে বলতে পারলাম না আমার সত্য পরিচয় কি। বানিয়ে মিথ্যে একটা গল্প বললাম। বললাম আমি অনাথিনী, গরীব ব্রাহ্মণের কুমারী মেয়ে। বিয়ে দেবার জন্যে বাবা-মা আমাকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা দুজনেই হঠাৎ মারা গেছেন! আমি এখন এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আছি। আমার লেখাপড়া শেখবারও খুব ইচ্ছে। একজন আমাকে বলেছিল, আপনি যদি দয়া করেন, তাহলে আমার লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। সংস্কৃত শেখবার খুব ইচ্ছে আমার। তিনি একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে—।' গেলাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। বুঝতে দেরি হল না যে, আমাকে তাঁর ভালো লেগেছে। একথা বুঝতে দেরি হয় না মেয়েদের, বিশেষত আমাদের মতো মেয়েদের, যারা রূপ নিয়ে ব্যবসা করে। তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, তিনি একটি গলিতে ছোট্ট একটি বাড়ি নিয়ে একাই থাকেন। আমাকে বললেন, এই আমার বাড়ি, তোমার দূর সম্পর্কের যে আত্মীয় আছেন বলছ, তাঁকে নিয়ে এখানে এস, তাঁর সঙ্গে কথা কইব। এক নকল পিসেমশাই খাড়া করা অসম্ভব হল না। কিছু অর্থের বিনিময়ে তিনি বানিয়ে যা বললেন, তা শুনে আমিই অবাক হয়ে

গেলাম। ওঁর বাড়িতে আমি আশ্রয় পেলাম এবং ক্রমশঃ বাড়ির কর্ত্রীই হয়ে উঠলাম। পুরুষরা, বিশেষত প্রতিভাবান পুরুষরা, শিশুর মতো অসহায়। সেবা করে মা যেমন শিশুর হৃদয় অধিকার করে, সেবা করে তেমনি বয়স্ক লোকের হৃদয়ও অধিকার করা খুব সহজ। বস্তুত, ও-ই বোধহয় হৃদয় জয় করবার একমাত্র উপায়। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি খুব মেধাবিনী, তোমাকে আমি পড়াব। কিন্তু তার আগে তোমাকে আমি ধর্ম-পত্নী-রূপে গ্রহণ করতে চাই। তা না হ'লে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। তোমার পিসেমশাইকে বোলো, তিনি যেন এসে তোমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করেন শাস্ত্রবিধি অনুসারে। তোমার আপত্তি নেই তো?' আমার আপত্তি! আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। নকল পিসেমশাই আরও কিছু টাকা খেয়ে নকল বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। ওঁর পক্ষের পুরোহিত উনি নিজেই হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। সংস্কৃত পড়তে শুরু করলাম ওঁর কাছে। মাস ছয়েক কাটল। তারপর একদিন সত্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ল ওঁর কাছে। আমারই এক পুরাতন প্রণয়ী কথাটা ফাঁস করে দিল এসে। লোকটি অনেকদিন থেকেই আমাকে চাইছিল, কিন্তু আমি রাজি হই নি। তারপর আমি যখন ওঁর গৃহিণী হয়ে পড়লাম, তখন আর রাস্তায় বেরুতাম না। খোঁজ নিয়ে অবশেষে সে একদিন হাজির হল এসে। কথাটা শুনে উনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, কথাটা সত্যি কি না। আমি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর সত্যি কথাটাই বললাম। তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আর মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না। আমার কথা শুনে তিনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বেরিয়ে চলে গেলেন। আর ফিরলেন না। আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তার পরদিন আমিও কাশী ছেড়ে চলে গেলাম। অনেক জায়গায় খুঁজেছি তাঁকে। কিন্তু আর তাঁর নাগাল পাই নি। শুনেছিলাম পুষ্করতীর্থে গিয়ে তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। পুষ্করেও গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমি যখন গেলাম, তখন তিনি চলে গেছেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথাটা নাকি সত্যি। খোঁজ নিতে ওরা বললে, 'একটি সাধু নিজের চারিদিকে আগুন জেলে অনাহারে কি একটা কঠোর ব্রত করেছিলেন।' সাধুর চেহারার বর্ণনা থেকে মনে হল, উনিই সেই সাধু—"

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "এখন ওঁর ছেলেকে ওঁর মতো করে মানুষ করাই আমার জীবনের ব্রত হয়েছে—"

"ছেলে কিছু জানে না?"

"না। সে জানে আমি তার মায়ের বন্ধু। মা-বাবা দুজনেই প্লেগে মারা গেছে, আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই, আমি ওকে মানুষ করছি। এও জানে যে ও ব্রাহ্মণের ছেলে, আর আমি মুসলমান।"

"আপনার সঙ্গে থাকতে আপত্তি করে নি কখনও?"

"ও তো আমার সঙ্গে থাকে না। ও কাশীতে থাকে আলাদা বাসায়। ওর জন্যে হিন্দু

চাকর-চাকরাণী, রাঁধুনী সব রেখে দিয়েছি আমি। আমার নিজের দুধও খাওয়াইনি ওকে। ব্রাহ্মণের মেয়ে ওয়েট নার্স ওকে মানুষ করেছে। ওকে আমি আমার ছোঁয়াচ থেকে যতদূর সম্ভব বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। এখন ওর ছুটি, আর আমার অসুখের খবর পেয়েছে, তাই এসেছে। ওর চাকর-রাঁধুনীও সব সঙ্গে এসেছে। এই যে এতগুলো চাকর দেখছেন, এর অর্ধেক ওর বাসার। আমি ওকে একদিনও খাওয়াই নি, খাওয়াতে সাহস হয় নি—"

হঠাৎ তার গলার স্বরটা একটু কেঁপে গেল। আমি চুপ করেই ছিলুম, প্রশ্ন করে গল্পের রসভঙ্গ করিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারলুম না।

"আপনার এত খরচ চলে কি করে? আপনি কি—"

"আমার জাত ব্যবসা আমি বন্ধ করিনি। তিন চারটে বড় বড় স্টেটের বাঁধা গাইয়ে আমি। বাঁধা মাইনে আছে। তাছাড়া উপরি রোজগারও হয়। আপনাদের লাইনে যেমন, আমাদের লাইনেও তেমনি. একবার নাম হয়ে গেলে টাকার অভাব হয় না।"

"কিন্তু—"

আমাকে কথা শেষ করতে দিলে না সে। বললে, "আপনি যা জিগ্যেস করবেন তা বুঝতে পেরেছি। আপনার মনে হচ্ছে, যার জীবনে অত বড় একটা লোকের আবির্ভাব ঘটেছিল. সে আবার কি করে এই জঘন্য ব্যবসা করতে পারে। যদি নিষ্ঠাবতী বিধবার মতো থাকতুম. তাহলে ওঁর ছেলেকে ওঁর মতো করে আমার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে মানুষ করতে পারতুম না। এর জন্যে টাকা চাই। দ্বিতীয় কথা. মনের দিক থেকে আমার আর পতন হবার ভয় নেই। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে গেছে, তাতে আর মরচে লাগবে না।"

সেদিন রাত্রে দুজনেই আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। মাথার উপর অসংখ্য তারা জ্বলছিল, রাত্রির অন্ধকার মুখরিত হয়ে উঠছিল ঝিল্লী রবে। মনে হচ্ছিল, অব্যক্ত যেন ব্যক্তের সীমায় ধরা দেব-দেব করছে।

তার ছেলের পৈতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম। মহাসমারোহ হয়েছিল। সীতারাম স্মৃতিতীর্থ, যিনি পাঁজি দেখে ট্রেনে চড়েন, হাঁচি টিকটিকি কাক-খঞ্জন দেখে দিনটা কেমন যাবে ঠিক করেন. বেরুবার মুখে রজক দেখলে থেমে যান. সেই ভদ্রলোক এক বাঈজির ছেলের উপনয়নে পৌরোহিত্য করতে ইতস্ততঃ করলেন না, যেই শুনলেন দক্ষিণার পরিমাণ হাজার টাকার কম হবে না। শহরসুদ্ধ লোক খেয়েছিল। ধনী দরিদ্র আপামর ভদ্র সবাই।

আমি তার অ্যাপেন্‌ডিক্‌সও কেটে দিয়েছিলাম। বেশ মোটা ফি দিয়েছিল। তারপর যাবার আগে সে আমাকে আরও পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে কি বললে জান?

"ছাত থেকে দাঁড়িয়ে রোজই দেখি, শ্মশানে মড়া নিয়ে যেতে বড় কষ্ট হয় সকলের।

রাস্তাটা খুব খারাপ। বর্ষাকালে নাকি আরও খারাপ হয়ে যায়। ওটা পাকা করিয়ে দিন। যদি আরও টাকা লাগে জানালেই আমি পাঠিয়ে দেব।"

তাঁর নাম ছিল বেগম রৌশন আরা। তার রূপের বর্ণনা আমি করি নি, করবও না। এইটুকু শুধু বলব, ওই মেয়েটি আমার ডাক্তারি জীবনের পরম অভিজ্ঞতা একটি। একথাও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ভাগ্যে ডাক্তার হয়েছিলুম, তাই তো ওর পরিচয় পেয়ে ধন্য হয়েছি।

আমার একটা কথা কি মনে হয় জান? মেয়েদের আমরা যুগে যুগে নানা রকম করে দাবাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি, ওদের কাছে হেরে গেছি। আমাদের অত্যাচারের হিমালয় ঠেলে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছে অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তীরা, দেখা দিয়েছে সরমা-রৌশন আরারা, শুধু দেখা দেয়নি, তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মুখে যাই বলি, মনে মনে স্বীকার করতে হয়েছে, ওই অবস্থায় পড়লে আমরা ঠিক ওরকমটি করতে পারতুম না। সেইজন্যেই শাস্ত্রে ওদের শক্তি বলে পুজো করেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা ওদের এই বিশেষ শক্তিটাকে কাজে লাগাতে পারলুম না। হয় সারাজীবন রাঁধুনী-চাকরাণী করে রাখলুম সতীত্বের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, না হয় পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করিয়ে শ্রমিক করবার চেষ্টা করলুম সংসারের সুবিধে হবে বলে। আমাদের নিজেদের সংসারের কিসে সুবিধে হবে এই নিয়েই আমরা ব্যস্ত, ওদের বিশেষ শক্তিকে ফুটিয়ে তোলবার কোনও চেষ্টা আমাদের নেই, ওদের যে আর কোন শক্তি আছে এ দেখবার চোখও অনেকের নেই, বুদ্ধিও নেই। অর্থনৈতিক সমস্যা? হ্যাঁ জানি, ওইটেই তো তোমাদের বাঁধা বুলি। ওই সমস্যা মেটাবার জন্যে তোমরা বউকে রাঁধুনি করেছ, কেরানী করেছ, ওই সমস্যার সমাধান করবার জন্যে কাপড় ছেড়ে হাফপ্যাণ্ট পরেছ, মিছে কথা বলেছ, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস করে প্রতিবাদ কর নি, এত করেও তবু তোমাদের আর্থিক সমস্যার আর সমাধান হল না। খাবার সময় সেই শাকচচ্চড়ি আর ভাত, আর যেখানে সেখানে এর-ওর-তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নাকিকান্না, এ আর তোমাদের ঘুচল না। ঘুচবেও না। মানুষকে বাসন কাপড় চেয়ার টেবিলের মতো ব্যবহার করলে দুর্দশা বেড়েই চলে, কখনও কমে না। কিন্তু ওই রৌশন আরা-সরমারা তোমাদের নিয়মকানুনের মুখে লাথি মেরে নিজেদের পথে নিজেদের মতো বেঁচে কিম্বা মরে প্রমাণ করে দিয়েছে যে পৃথিবীতে আইনের চেয়ে মানুষ বড়। সেই বৃহত্ত্বে পৌঁছবার জন্যে আইন ভাঙাটাই মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব।

আমার ভয় হচ্ছে, তুমি বোধহয় এতক্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ। মধুর রসের আশায় সম্ভবত পঞ্চকন্যার গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলে (পর্ণোগ্রাফিই যে তোমাদের প্রিয় জিনিস, তা পপুলার কতকগুলো বই আর ফিল্ম থেকেই বোঝা যায়), কিন্তু যে বস্তু আমি তোমাকে গিলিয়ে যাচ্ছি, তা শুগার-কোটেড কুইনিনের বড়ি, মাঝে মাঝে চিনির পলেস্তারাটাও হয়তো উঠে গেছে কোথাও কোথাও।

কিন্তু এখন তো আমার পক্ষে থামা শক্ত। চারটে বড়িই যখন গিলেছ, তখন পঞ্চমটাও দুর্গা বলে গিলে ফেল। হয়তো আখেরে উপকারই হবে।

তখন আমি বিহারের একটা বড় শহরে আছি। কার পরামর্শে এখন ঠিক মনে নেই, একটা পুরোনো মোটরকার কিনে অশেষ দুর্গতি ভোগ করছি। মোটরটা মোটর না হয়ে যদি মানুষ হতো তাহলে ওর খামখেয়ালী ব্যবহারে হয়তো আনন্দ পেতাম। যখন খুশী থামতো, যখন খুশী চলতো। হর্ন যখন বাজবে না, তখন কিছুতেই বাজবে না, আবার বাজতে আরম্ভ করলে থামানো শক্ত। এই মোটরে চড়ে একদিন দুপুরবেলা এক পতিতা পল্লীর ভিতর দিয়ে আসছি, হঠাৎ মোটরটা থেমে গেল। দু'চার জন লোক ডেকে ঠেলাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ কানে গেল—"ওগো মা গো, কোথায় তুমি গো, আমায় বাঁচাও গো, এরা যে আমায় মেরে ফেলছে।" বিহারের এই পাড়ায় এরকম বাংলা কান্না শুনে একটু অবাক হয়ে গেলুম। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলুম—একটা ঘরের সামনে একটা যণ্ডা কাবুলী আর একটা খাণ্ডারনী মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটা হিন্দী ভাষায় অশ্রাব্য গালাগালি দিচ্ছে, তর্জন গর্জন করছে আর শাসাচ্ছে যে, কপাট না খুললে কপাট ভেঙে তারা ঘরে ঢুকবে। কপাটটা ভিতর থেকে বন্ধ।

আমার মাঝে মাঝে মতিচ্ছন্ন হয়। ঠেলাঠেলি করে মোটরটা স্টার্ট নিয়েছিল, আমি সটান চলে গেলেই পারতুম, কিন্তু যেতে পারলুম না। ওই বন্ধ দরজার ওপারে বাংলা ভাষায় এমন বুকফাটা হাহাকার কে করছে, তা জানবার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল। একটা পুলিশ কনেস্টবল, একটু দূরে নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি তখন সেখানে সিভিল সার্জন। সুতরাং আমাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। তার দিকে চাইতেই সে পায়ে পা ঠুকে মিলিটারি কায়দায় সেলাম করলে। তাকে ডাকলাম। বললাম, "দেখ তো এখানে হাল্লা কিসের, ঘরের ভিতর অমন করে কাঁদছে কে।" আমি গিয়ে মোটরে বসলাম। মিনিট দশেক পরে সে এসে বললে, "ওই জবরদস্ত আওরৎটি হচ্ছে বাড়ি-উলী। আর ওই আগা সাহেব হচ্ছে ওর খদ্দের। বাড়ি-উলী আগা সাহেবের কাছ থেকে অগ্রিম একশ টাকা নিয়েছে। এক 'বাঙালীন্' খবসুরৎ লেড়কি বাড়ি-উলীর কাছে এসেছে দিন কয়েক আগে। আগা সাহেবের 'খাইশ' (ইচ্ছে) হয়েছে ওই মেয়েটিকে রাখেন। কিন্তু 'বাঙালীন্' লেড়কিটি কিছুতে রাজী হচ্ছে না। এখন হুজুর আমাকে যা করতে বলেন তাই করব।" বললাম, "তুমি ওই আগা সাহেবকে ভাগিয়ে দাও। বল যে তার টাকা মার যাবে না, আমি তার জিম্মাদারি রইলাম। আর বাড়ি-উলীকে ডেকে নিয়ে এস আমার কাছে।"

আগা সাহেব চলে গেল। তার সুখ-স্বপ্নের মাঝখানে একটা বুড়ো সিভিল-সার্জন ভাঙা ঝরঝরে মোটরে চড়ে এসে হাজির হবে এটা সে ভাবতেই পারে নি। কিন্তু ওরা প্র্যাকটিক্যাল লোক, খামাখা বড়লোক বা 'অফ্‌সর'দের সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। সে আমাকে একটা সেলাম করে চলে গেল এবং একটু দূরে গিয়ে আর

একটা খোলার ঘরে ঢুকে পড়ল। বাড়ি-উলীটি কনেস্টবলের সঙ্গে এসে যখন হাজির হল, তখন তার মুখের চেহারা ভাবভঙ্গী সব বদলে গেছে। একেবারে অন্য লোক যেন। চোখমুখের সে কী সম্ভ্রমাত্মক ভাব, পানের-ছোপ-লাগা ঠোঁটের ফাঁকে মিসি-মাখানো দাঁতে সে কি হাসির ঝলক। খদ্দের হিসেবে আগা সাহেবের চেয়ে যে আমি ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়, একথা সে কিছু না বলেই যেন আমাকে বুঝিয়ে দিলে। বললে, "হুজুর, ফরমাইয়ে, অব্ ক্যা করু" অর্থাৎ ফরমাস করুন এবার কি করব। বললাম, "ওই মেয়েটিকে কপাট খুলতে বল। বল, এখানকার বাঙালী ডাক্তার সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আগা সাহেব চলে গেছে।" বাড়ি-উলী গিয়ে কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলা সত্ত্বেও কপাট খুলল না খানিকক্ষণ। মেয়েটার সম্ভবত সন্দেহ হল যে, একটা মিথ্যে ছুতো করে বাড়ি-উলী কপাট খোলাচ্ছে, কপাট খুললেই ওই কাবুলীওলা ঢুকে পড়বে। তখন আমি নিজেই নামলুম। বন্ধ দ্বারে আঘাত করে চেঁচিয়ে বললুম, "কপাট খোল। তোমার কোন ভয় নেই। কাবুলীওলা চলে গেছে।"

ভাষার যাদু যে কি অদ্ভুত, ভাষা যে আমাদের কি নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রাখে, তা বিদেশে গেলে বোঝা যায়। কারও মুখে বাংলা ভাষা শুনলেই মনে হয়, সে যেন আমার আপনার লোক। আমার কথা শুনে ওই মেয়েটিরও বোধহয় তাই মনে হল। বন্ধ কপাট খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এমনটা যে দেখব, তা কল্পনা করি নি। মনে হল অজন্তার ছবি এমন জীবন্ত হয়ে কি করে অবতীর্ণ হল এখানে! ঠিক সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ, সেই চাহনি,—আমি ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি আমার পা দুটো ধরে বললে, "আপনি আমার বাবা, আমাকে বাঁচান আপনি। এরা আমাকে মেরে ফেলছে। মাত্র সাত দিন এখানে এসেছি—চল্লিশ পঞ্চাশটা নানা জাতের, নানা বয়সের লোক এনে ঘরে ঢুকিয়েছে বাড়ি-উলী। আজ একটা কাব্‌লেকে এনেছে আমাকে রক্ষা করুন আপনি, আমি আর পারছি না।"

আমার পা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গেলুম। ঘড়ি দেখলুম দেড়টা বেজেছে। মনে পড়ল, আমার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী আমার অপেক্ষায় অনাহারে বসে আছেন এখনও, আর বেশি দেরি করলে অনর্থকাণ্ড হবার সম্ভাবনা। জঠরাগ্নির উত্তাপের সঙ্গে সতীত্বের তেজ মিলে যে অগ্নিকাণ্ড হবে, তা নেবাবার ক্ষমতা কোন দমকলেরই নেই! সুতরাং শর্ট-কাট্ ব্যবস্থা করলুম একটা। সেদিন অনেকগুলো 'কল' পেয়েছিলুম। পকেটে কিছু টাকা ছিল মেয়েটিকে পঁচিশ টাকা আর বাড়ি-উলীকে পঁচিশ টাকা দিয়ে বললাম, "এখন তোমরা এই টাকা রাখ। আমি সন্ধের পর আবার আসব। এসে সব শুনে একটা ব্যবস্থা করে দেবো। কিন্তু এর ঘরে এখন আর কোনও লোক যেন না ঢোকে।"

সেই কনেস্টবলকে ডেকে বললুম, "তুমি দেখো, এর উপর কেউ যেন বলাৎকার না করে। আমি এস-পি-কেও খবর পাঠাচ্ছি।"

তখন এস-পি ছিলেন একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি। মনুষ্যরূপী বাঘ একটি। যাকে ছুঁতেন তাকে শুধু আঠারো ঘা নয় অনেক বেশি ঘা দিতেন। এস-পি'র নাম শুনে কনেস্টবল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ল। পায়ে পা ঠুকে আমাকে আর একবার সেলাম করে বলল, "আমি ওর দরোওয়াজায় খাড়া পাহারা থাকব। এক তিতলিকো ভী ঘুসনে নেহি দেউঙ্গা।" তিত্‌লি মানে আমি তখন বুঝেছিলাম পিঁপড়ে, কিন্তু পরে জেনেছি প্রজাপতি। সেদিন ওই ভোজপুরী কনেস্টবল আর আফগানী আগা দুজনেই রস-বোধের পরিচয় দিয়েছিল।

সন্ধের পর খুব জরুরী 'কল' না থাকলে আমি কোথাও বেরুতাম না। সাধারণত সন্ধের পর বড় বড় অফিসাররা ক্লাবে যেতেন। সেকালে সাহেবদেরই প্রাধান্য ছিল। সাহেবরাই ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের পদ অলঙ্কৃত করতেন। আমাদের মতো 'নেটিভ্‌' থাকতো দু'-একজন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লাবেও যেতো সাহেবদের খোশামোদ করবার জন্যে, আবার কেউ কেউ যেতো মদ খাবার লোভে। বাড়িতে বসে মদ খাবার তাগদ অনেকেরই ছিল না সেকালে। একালেও নেই। এই জন্যেই হোটেল আর ক্লাবগুলো টিকে আছে সম্ভবত। আমি ক্লাবে যেতাম না। মাঝে মাঝে দু'এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি খাবার ইচ্ছে হ'লে ঘরে বসেই খেতুম। সন্ধ্যাবেলা আমার একমাত্র কাজ ছিল স্নান করে ভাল এক কাপ চা খেয়ে একটি ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বই পড়া। সেদিন তা না করে গেলুম ওই মেয়েটির কাছে। ফিরে এসেই এস-পি'কে ফোন করেছিলাম, ফোনেই সব কথা খুলে বলেছিলাম তাকে। সে আমাকে বললে, "আমি সেখানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সেখানে গিয়ে দেখলুম, শুধু সে কড়া পাহারারই বন্দোবস্ত করেনি, বাড়ি-উলীকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। কপাটে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করার পর সে কপাট খুলে দিলে। অগাধে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল।

"কি খবর, ঘুমুচ্ছিলে? বেশ। কেউ বিরক্ত করেনি তো।"

তার মুখেই শুনলুম বাড়ী-উলীকে থানার দারোগা এসে ধরে নিয়ে গেছে।

"এইবার তোমার ব্যাপারটা কি! বলতো শুনি—"

মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে যে কাহিনীটি বললে তা যেমন করুণ, তেমনি নিষ্ঠুর।

হুগলী জেলার এক গ্রামে ওর বাড়ী, জাতে কৈবর্ত। বিধবা মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। গ্রামে মেয়েদের একটা স্কুল ছিল, সেই স্কুলে সে পড়তে যেত, অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য মেয়েও পড়ত সে স্কুলে। পড়াশুনা ওর তত ভালো লাগত না। ওর কেবলি মনে হত কবে আমার বিয়ে হবে। কবে আমি মায়ের দুঃখ ঘোচাতে পারব। ছেলে হয় নি বলে তার মায়ের মনে একটা দুঃখ ছিল। প্রায়ই সে এ কথা বলতো। বলতো, 'যদি পেটের একটা ছেলে থাকত তা হলে তার বিয়ে দিতুম, নাতি নাতনিতে

ঘর ভরে যেত। আর মেয়ে তো পরের জন্যেই মানুষ করা। কাকের বাসায় কোকিলের ছানার মতো। বড় হলেই পর হয়ে যাবে। ওর ছেলে-মেয়ে ওর কাছে থাকবে, সে কি আমার ঘর আলো করতে আসবে!' সে তখন তার মাকে আশ্বাস দিয়েছিল, 'আমার প্রথম সন্তান, তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, তোমাকেই দেবো আমি। ঠিক দেবো, দেখো—'

তার সহপাঠিনীদের একে একে বিয়ে হয়ে যেতে লাগল। কি চমৎকার বর তাদের। কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ মাস্টার। আর কি সব চেহারা! দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

তার কিন্তু আর বিয়ে হয় না। ভাল ছেলেই কোথাও পাওয়া গেল না। একটি ভালো ছেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তারা এত টাকা চেয়ে বসল যে সাধ্যে কুলাল না তার মায়ের। বয়স বাড়তে লাগল। চৌদ্দ, পনের, ষোল, তবু তার বিয়ে হল না। স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিল সে। রাস্তায় বেরুতে লজ্জা করতো। পাড়ার বখাটে ছেলেগুলো জ্বালাতন করতো রাস্তায় বেরুলে। ছড়া কাটত, শিস দিত। বাড়ীতেই দিনরাত থাকতে লাগল সে। বাড়ীতে বসে ওই একটি চিন্তাই সে দিনরাত করতো, কবে তার বিয়ে হবে, কবে তার নিজের ঘর হবে, ছেলে হবে, কবে সে মাকে তার একটি ছেলে দিতে পারবে। এইভাবেই দিন কাটছিল, এমন সময় সর্বনাশ হয়ে গেল। তাদের ঘরে সিঁদ কেটে চোরে নিয়ে গেল তাদের যথাসর্বস্ব। তার মায়ের যা দু'-একখানা গয়না ছিল, ভালো কাপড় ছিল, যার উপর নির্ভর করে মা ভেবেছিল তার বিয়ে দেবে, তা সমস্ত চুরি হয়ে গেল। বিয়ের আশা নির্মূল হয়ে গেল একেবারে। বিনা পয়সায় এদেশে মেয়ের বিয়ে হয় কি কখনও? পাশের গাঁয়ে থানা, সেখান থেকে দারোগাবাবু এলেন চুরির তদন্ত করতে। আমাকেই বেশি করে জেরা করতে লাগলেন। আমি কোথায় শুয়েছিলাম, রাত্রে কোন শব্দ শুনেছিলাম কিনা, বাড়ীর আশেপাশে কোন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি কি না, আমাদের বাড়ীতে কারা আসে—এইসব। তারপর থেকে দারোগাবাবু রোজই আসতে লাগলেন, আর আমাকে ডেকে সামনে বসিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। দিনকতক পরে তাঁর আসল মতলবটি বোঝা গেল। তিনি মাকে একদিন বললেন, আমি আপনার স্বজাতি। চুরির কোন কিনারা করতে পারলুম না, তবে আপনার একটি উপকার আমি করতে পারি। আপনার মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি, আমারও বিয়ে হয়নি, আপনার মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, ওকে আমি বিয়ে করতে পারি। আপত্তি? মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। শুধু মা নয়, আমিও। কি সুন্দর সুপুরুষ, তার উপর দারোগা! দারোগাবাবু কিন্তু বললেন যে এখনই তিনি বিয়ে করতে পারবেন না, কারণ তাঁর এক কাকা মারা গেছেন, কালাশৌচ চলছে, সেটা শেষ হয়ে গেলে তবে বিয়ে হবে। খুবই সঙ্গত কথা। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে রইল।

দারোগাবাবু প্রায়ই আসতে লাগলেন এবং আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগলেন যেন আমি তাঁর বউ হয়ে গেছি। রোজই জিনিষ-পত্র পাঠিয়ে দিতেন, মাছ, দই, দুধ, তরিতরকারি।

মাকে টাকাও দিতেন মাঝে মাঝে। আমরা যা কখনও কল্পনাও করিনি তাই ঘটতে লাগল। এইভাবেই চলছিল, কিন্তু মাসখানেক পরে দারোগাবাবু আরো বেশি দাবী করলেন আমার উপর। একদিন একটা পালকি পাঠিয়ে দিলেন। একটা চাকর চিঠিও নিয়ে সঙ্গে এসেছিল। মায়ের নামে চিঠি। মা তো পড়তে জানে না, আমিই পড়লাম। লিখেছেন, 'আমি কদিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি। ওকে যদি পাঠিয়ে দেন ভালো হয়। পালকি পাঠালাম।' মা একটু বিপদে পড়ে গেলেন। যাওয়াটা ভালো দেখায় না। অথচ এতবড় একটা হিতৈষী বন্ধুর এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করাও শক্ত, বিশেষতঃ সে যখন হবু জামাই। আমাদের সৌভাগ্যে পাড়ার লোকেরা হিংসেতে ফেটে পড়ছিল। সুতরাং তাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করতে যাওয়া বৃথা মনে হল।

মা খানিকক্ষণ ভাবলেন, শেষে বললেন, "চল, আমিও তোর সঙ্গে যাই। যদিও সে আমাকে যেতে বলেনি, কিন্তু তোকে একা পাঠাই কি করে?" আমার সঙ্গে মাও গেলেন। আমরা গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাঁর একটু জ্বর হয়েছে। কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি কিছু নয়। দারোগাবাবু মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কেন এলেন কষ্ট করে? তা এসেছেন বেশ করেছেন, থাকুন।"

মা আর আমি দুজনেই তাঁর বাসায় থাকতে লাগলুম। আমার কিন্তু বড় অস্বস্তি লাগতো, কারণ আমাকে আড়ালে পেলেই দারোগাবাবু এমন সব অসভ্য ইঙ্গিত করতেন যে আমার লজ্জাও করতো, খারাপও লাগতো। কিন্তু কি করব, আমরা সঙীন ফাঁদে পা দিয়েছিলুম। পালাবার উপায় ছিল না। শেষকালে দারোগাবাবু মাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমি যদি তাঁর কাছে স্ত্রীর মতো থাকি তা হলেই বা ক্ষতি কি। কিছুদিন পরে শাস্ত্রমতে বিয়ে তো হবেই। মা মত দিয়ে দিলেন এতে। না দিয়ে উপায় ছিল না। গরীব পাড়াগেঁয়ে মূর্খ বিধবা, দারোগার বিষদৃষ্টিতে পড়বে কোন্ সাহসে। একদিন মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কিছু টাকাও নাকি দিয়েছিলেন। টাকা বড় অদ্ভুত জিনিষ ডাক্তারবাবু। টাকার লোভে মাও নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দেয়। মা টাকা পেয়ে চলে গেলেন।

আমি বললুম, "টাকার লোভে তুমিও তো এই নরকে এসেছ।"

"না, আমি টাকার লোভে আসিনি। আমি ঘর বাঁধার আশায় এসেছিলাম। মাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, তাঁর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমাদের সমাজই এমনি, সমাজই আমাকে তুলে দিলে ওই দারোগাটার হাতে। আমরা তো বেশি কিছু চাইনি। ছোট একটি সংসার পাততে চেয়েছিলাম, ছোট একটু বাসা, আর কিছু নয়—"

হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটা লাইন মনে পড়ে গেল—'ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা, করেছিনু আশা।' কিন্তু সে কথা আর তাকে বললুম না। যদিও বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, যা তুমি চেয়েছিলে তা দুর্লভ এদেশে। রবীন্দ্রনাথের মতো লোক যা জোগাড় করতে পারেননি, তা তুমি পারবে কি করে। ছোট বাসা ছোট নয়, অনেক বড়। শান্তিপূর্ণ ছোট একটু বাসা জোগাড় করা অসম্ভব এদেশে। তার চেয়ে তাজমহল হোটেলে ফ্ল্যাট ভাড়া করা সহজ।

"তারপর ?"

"তারপর যা ঘটবার তাই ঘটল। কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলুম পেটে ছেলে এসেছে। তখনও বিয়ে হয়নি।"

"শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল কি ?"

"না, পরে শুনলুম, উনি বিবাহিত। জাতেও কৈবর্ত নন, উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। তিন চারটি ছেলেমেয়ে আছে ওঁর।"

"কি করে খবরটা পেলে ?"

"থানার এক হাবিলদার ছিলেন রমজান আলী। দারোগাসাহেব একদিন টুরে বেরিয়েছিলেন। সেদিন তিনি আমাকে ডেকে সব কথা খুলে বললেন, রমজান আলী অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে আমার উপকার করবার জন্যে একাজ করেননি। তাঁরও লোভ ছিল আমার উপর। তিনি দারোগাবাবুর স্ত্রীর ঠিকানাও এনে দিলেন আমাকে। বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাঁকে চিঠি লিখলেই সব জানতে পারবেন। তিনি অসুস্থ, ধরমপুর স্যানাটোরিয়মে থাকেন।' এ শুনে আমার মনের যে কি অবস্থা হল তা বুঝতেই পারছেন। স্যানাটোরিয়মের ঠিকানায় চিঠি লিখলাম একটা। সব কথা খুলেই লিখলাম। রমজান আলী ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পোষ্ট করে দিয়ে এলেন।

চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি দারোগাবাবুকে আর কিছু বললাম না। ভাবলাম, ঠিক খবর আগে জানা দরকার। আমার মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল খবরটা মিথ্যে হবে। কিন্তু হল না, দারোগাবাবুর স্ত্রী তাঁর তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে নিয়ে সশরীরে এসে পড়লেন একদিন। এসেই তিনি কি করলেন জানেন ? আমাকে ঝাঁটা-পেটা করে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। পেটে এমন লাথি মারলেন যে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

ওই রমজান আলীই শেষে আশ্রয় দিলে আমাকে, হাসপাতালে নিয়ে গেল, অনেক সেবা-শুশ্রূষাও করলে। পেটের ছেলেটা কিন্তু বাঁচল না। মাও খবর পেয়ে হাসপাতালে এল। রোজ আসত। এসে কাঁদত খালি। কোন কথা বলত না, খালি কাঁদত। রমজান আলী আমার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছিল। শেষকালে সে এক কাণ্ড করে বসল। মাকে হাত করে সে এক মোকদ্দমা রুজু করিয়ে দিলে দারোগার নামে। উপরওলার কাছে এক দরখাস্ত করে দিলে মায়ের নাম দিয়ে। উপর থেকে সায়েব এলেন, আমার

সাক্ষী নিলেন, মায়ের সাক্ষী নিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর সাক্ষী নিলেন। ফলে দারোগাবাবুর শুধু চাকরীই গেল না, দু'বছর জেল হয়ে গেল। দারোগাবাবু জেলে যাবার পর আমি পড়লাম রমজান আলীর পাল্লায়। রমজান আলী মাকে বললেন, "দেখ, তোমার মেয়ের চিকিৎসার জন্যে, মোকদ্দমার জন্যে আমার দুহাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমার যা কিছু পুঁজি ছিল সব নিঃশেষ করেছি ওর জন্যে। তোমার মেয়েটি আমাকে দাও। ও এমনিই আমার কাছে থাকতে পারে, কিম্বা যদি বল ওকে বিয়েও করতে পারি। অবশ্য আমার আরও দুটো বিবি আছে, কিন্তু আমাদের সমাজে বহু বিবাহে দোষ নেই। আর এতে যদি তোমরা রাজি না থাক, তোমার মেয়ের জন্যে যে টাকা আমি খরচ করেছি সেটা আমাকে ফেরত দাও।"

মা আমাকে আড়ালে ডেকে জিগ্যেস করলেন, "কি করবি ?"

বললাম, "আমি ওর কাছে থাকব না, বিয়েও করব না, চল বাড়ী ফিরে যাই।"

মা বললেন, "কিন্তু সেখানে কি আর মুখ দেখাবার উপায় আছে ? ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে চতুর্দিকে।"

"তাহলে চল অন্য কোথাও যাই। আমি তোমাকে ভিক্ষে করে খাওয়াব। কিন্তু মুসলমান হ'তে পারব না—"

"মুসলমান হলেই বা ক্ষতি কি। হিন্দুরাই কি তোমাকে মাথায় করে রেখেছে ? না রাখবে ? দুপায়ে তো খালি থ্যাঁৎলাচ্ছে। হিন্দু থেকেই তোমার বিয়ের চেষ্টা করলুম এতদিন, কিন্তু পেলুম কি একটাও ভালো ছেলে ? তোমাকে শেষকালে যে নষ্ট করলে সে-ও হিন্দু। ঝ্যাঁটা মারি এমন হিন্দু সমাজের মুখে—"

আমি কিন্তু তবু রাজি হ'তে পারলাম না। মা শেষে রেগে-মেগে চলে গেল। রমজান আলীকে বলে গেল বটে যে আমি তোমার টাকার জোগাড় করতে যাচ্ছি— কিন্তু সেটা স্তোকবাক্য।

রমজান আলী আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমি কিন্তু কিছুতেই রাজী হলাম না। মাকে যদিও বলেছিলাম যে ও মুসলমান বলে আমার আপত্তি কিন্তু আমার আপত্তি ছিল অন্য জায়গায়। আমি এটা ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে-ঘর আমি বাঁধতে চাইছি, যা আমার জীবনের স্বপ্ন, তা ওকে বিয়ে করলে আমি পাব না। রমজান আলী বললে, "আমাকে বিয়ে যদি না কর আমার টাকা ফেরত দাও। তোমার মা তো পালিয়েছে, আর এও জানি তার কাছে একটি কানা-কড়িও নেই—"

বললুম, "আমি রোজগার করে তোমার টাকা শোধ করে দেব। তুমি কোথাও আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দাও। তুমি যখন আমার জন্যে এতই করেছ—এটাও করে দাও দয়া করে।"

সে বললে, "এখানে চাকরি হবে না তোমার। এখানে কে তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে! আমার সঙ্গে বিদেশে যদি যাও সেখানে কিছু ব্যবস্থা হ'তে পারে।"

আমি রাজি হ'য়ে গেলাম এতে। দিন সাতেক পরে রমজান আলী বললে, "আমি ছুটি নিয়েছি। চল, তোমাকে পশ্চিমের একটা শহরে নিয়ে যাই। সেখানে আমার এক চেনা-শোনা আত্মীয়া আছে, তার কাছে তোমাকে রেখে দেব, সে তোমার রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবে।"

সাতদিন আগে রমজান আলী আমাকে এই বাড়িউলীর হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেছে। তারপর থেকে আমার উপর যা নির্যাতন হচ্ছে তা তো আপনি সব শুনেছেন—

জিগ্যেস করলুম, "রমজান আলীও কি তোমার উপর অত্যাচার করেছিল?"

"করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। আমি চেঁচামেচি করে উঠতেই ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরই এখানে নিয়ে এল—"

বুঝলাম বদমাইস ঘোড়াকে 'ব্রেক' করবার জন্য ঘোড়ার ব্যবসাদাররা যে কৌশল অবলম্বন করে, রমজান আলী তাই করেছে।

জিগ্যেস করলাম, "আমার কাছে তুমি কি চাও? যদি সাধ্যের মধ্যে হয় নিশ্চয়ই করব—"

"আমি একটি ছোট্ট ঘর বাঁধতে চাই ডাক্তারবাবু। আপনি দয়া করে সেই ব্যবস্থা করে দিন। জাতের বিচার আমার আর নেই। যে কোনও লোক ভদ্রভাবে স্ত্রীর মতো যদি আমাকে রাখে আমি তার কাছেই থাকব। সে যদি বিয়ে করে ভালোই, না-ও যদি করে তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু তার বাড়ীতে আমি ভদ্রভাবে থাকতে চাই। আছে এরকম কোনও লোক আপনার জানা? আপনারা তো কত জায়গায় ঘোরেন, এরকম লোক চোখে পড়েনি আপনার? আমাদের দেশে একটাও ভদ্রলোক নেই এ কি হ'তে পারে? দয়া করে দেখুন না একটু চেষ্টা করে —"

তার মিনতিটা যেন কান্নার মতো শোনাতে লাগল। কিন্তু আমি তখন মহাসমস্যায় পড়লুম। এই বিরাট কসাইখানায় জীবন্ত একটি নধর পাঁঠা পাই কোথায়! একটাও তো বেঁচে নেই।

"আচ্ছা, চেষ্টা করব"—বলে সেদিন চলে এলাম। পুলিশ পাহারা ছিল, সুতরাং অন্য কোন ভয়ের কারণ ছিল না। তা ছাড়া বাড়িউলী ছিল হাজতে।

তার পরদিনই আমার কাছে সোহনলাল এল। কাক-তালীয়ই বল, আর যাই বল, এই রকম আকস্মিক অপ্রত্যাশিত যোগাযোগই পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে। টেলিফোন, এক্স্-রে প্রভৃতি এর উদাহরণ। সোহনলালকে দেখেই আমার মনে হল, বিধাতা বোধহয় ওই মেয়েটার এইবার একটা গতি করে দিলেন।

সোহনলালের পরিচয়টা শোন আগে। সোহনলালকে দেখলেই মনে হয় সে একজন 'রইস' অর্থাৎ অভিজাত বংশের ছেলে। পরনে ভালো কাপড়, ভালো জুতো, ভালো পাঞ্জাবী। সিল্কের বা আদ্দির পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কোন পাঞ্জাবী তাকে পরতে দেখিনি কখনও। মাথায় ফুলদার বিহারী-টুপি, একটু বাঁকা করে পরা, গোঁফটি চমৎকার,

সুপালিত, সুলালিত। শুধু কালো নয়, চক্‌চকে কালো, ডগা দুটি ফণার মতো। দোহারা গড়ন, বেশ লম্বা চওড়া। কানে আতরসিক্ত তুলো থাকত সর্বদা। পানও খেত সুগন্ধী জরদা দিয়ে। মাথার সামনের দিকে ঈষৎ টাক ছিল। চোখ ছোট ছোট ছিল, কিন্তু সর্বদা হাসিতে চিকমিক করতো বলে খারাপ দেখাত না।

সে জমিদার বা জমিদারের ছেলে ছিল না। ছিল স্থানীয় মহাবীর প্রেসের হেড মেশিন ম্যান। ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বিলেত যাবে বলে। কিন্তু বিলেত পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। আট্‌কে গিয়েছিল বম্বেতে। সেইখানে এক বিলিতি প্রেসের সাহেব ম্যানেজারের সুনজরে পড়ে প্রেসে ঢুকে মেশিনের কাজ শেখে। নিখুঁতভাবে শিখেছিল কাজটি। মহাবীর প্রেসের সেই ছিল আসল পরিচালক। প্রেসের মালিক মহাবীর ঝুন্‌-ঝুন্‌-ওয়ালা মাসে আড়াই শো টাকা মাইনে দিয়ে ওর কাছে হাত জোড় করে থাকত, কারণ সোহনলাল না থাকলে প্রেস অচল।

সোহনলাল বাস করত চামার পাড়ায়, তাদের সঙ্গেই ওর আত্মীয়তা ছিল বেশী। চামার রোগীদের নিয়ে আমার কাছে আসত বলেই আমার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল।

ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল কয়েকটি। ঘুড়ি ওড়াতো। ঘুড়ি তৈরি করতো, ঘুড়ি আনাতোও নানা জায়গা থেকে নানা রঙের, নানা মাপের। ওর লাটাইটি ছিল দেখবার মতো, চমৎকার কারুকার্যে অলঙ্কৃত। ভালো সুতো, সুতোর মান্‌জা, এই সবের ব্যবস্থা করতো চামারের ছেলেমেয়েগুলো, ওদেরও প্রত্যেককে ঘুড়ি লাটাই কিনে দিয়েছিল সে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজ ঘুড়ি ওড়াতো। ওর আর একদল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শাহসাহেবের ছেলেরা, তারা লক্ষ্মৌ কায়দায় ঘুড়ি ওড়াতো।

ওর দ্বিতীয় শখ ছিল পাখী আর পায়রা পোষার। প্রতি বছর হরিহর-ছত্রের মেলায় গিয়ে পাখী কিনে আনতো। কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, হরেক রকমের। পায়রাও নানা জাতের।

প্রেস থেকে ফিরে এই সব নিয়েই মশগুল হ'য়ে থাকত সোহনলাল। আর ওর সঙ্গী সহচর ছিল ওই চামারগুলো। সন্ধে হলেই মদ নিয়ে বসতো। যতক্ষণ না অজ্ঞান হ'য়ে যেতো ততক্ষণ মদ খেতো বসে। এই ছিল ওর দিবা-রাত্রির কার্যক্রম।

বিয়ে করেছিল। একবার নয়, দু'বার। কিন্তু দুটো বউই পালিয়েছিল। বউরা সাধারণত চায় স্বামীরা স্বপনে জাগরণে সব সময়ে তাদের কথাই ভাবুক, কিন্তু এরকম অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া সোহনলালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঘুড়ি, পায়রা, কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, মদ, আর চামারদের ছেলেমেয়েরা তার মনের অনেকখানি দখল করে রেখেছিল অনেক আগে থেকেই। ওর বউদের এটা ভালো লাগেনি সম্ভবত। বউদের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারে এমন লোকেরও অভাব ঘটে নি, তারা তাদের সঙ্গেই ভেগেছিল। এতে কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল সোহনলালের। আর মনে হয়েছিল, লোকে তাকে হয়তো নপুংসক মনে করছে। তার নিজেরও একটু

সন্দেহ হয়েছিল বোধহয়। কারণ সে আমার কাছে এসে নিজেকে ভালো করে পরীক্ষা করিয়েছিল যে তার পারুষ্যে কোন রকম দুর্বলতা আছে কিনা। আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, নেই। সুযোগ পেলে সে অনায়াসে শতপুত্রের পিতা হ'তে পারে।

সেদিনও সোহনলাল এসেছিল একটি চামার ছোকরাকে নিয়ে। ছোকরা তাড়ি খেয়ে মারামারি করে হাত ভেঙেছে। তার হাতের ব্যবস্থা করে দিয়ে সোহনলালকে বললুম, "তুমি একটু বস, তোমার সঙ্গে কথা আছে একটু।"

সব খুলে বললুম তাকে।

সে বললে, "হুজুর, আমি মেশিন বুঝি, ঘুড়ি বুঝি, চিড়িয়া বুঝি, এই সব চামারদেরও বুঝি, কিন্তু আওরৎকে বুঝি না। দু'বার বোঝবার চেষ্টা করেছি পারিনি। ওরা আজব ধরনের মেশিন। আমাকে মাফ করুন ডাক্তার সাহেব।"

আমি বললুম, "কিন্তু আমার মনে হয় একে তুমি বুঝতে পারবে, কারণ ও নিজেকে বোঝাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। তুমি যদি ওকে ভদ্রভাবে ঘরে স্থান দাও, ও তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। জীবনে ও কেবল অভদ্র লোকেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। তোমার মতো ভদ্র 'রইস্' যদি ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তাহলে বর্তে যাবে ও—"

সোহনলাল দোনো-মোনো হ'য়ে চুপ করে রইলো।

"ও পতিতা বলে আপত্তি করছো?"

"না। জাতের বিচার আমার নেই। আমি জানি ময়লা বাসন ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। আমার মেশিনে তো রোজই ময়লা জমে, রোজই সাফ করতে হয়, তবে ভয় হয়, কোন খারাপ অসুখ টসুখ নেইতো—"

"সে আমি দেখে দেবো। অসুখ থাকলেও তা সারিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়—"

"হ্যাঁ, মেশিনও ভেঙ্গে যায়, সারাতে হয়।"

সোহনলাল মেশিনের উপমা দিয়েই কথাবার্তা চালাতে লাগল।

বললাম, "তুমি আগে তাকে দেখ একবার, যদি পছন্দ হয় ঘরে নিয়ে যেও। ওর কোন অসুখ টসুখ আছে কিনা তা আমি দেখে দেবো।"

"বহুত খুব।"

সেলাম করে চলে গেল সোহনলাল।

সেই দিনই সন্ধের সময় নিয়ে গেলুম তাকে সরস্বতীর কাছে। মেয়েটির নাম ছিল সরস্বতী। তাকে দেখে সোহনলাল আর "না" বলতে পারল না। সত্যই মেয়েটি অপরূপ লাবণ্যময়ী ছিল, বিশেষত যৌবনের অমন প্রবল প্রকাশ ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

সেই দিনই সোহনলাল সরস্বতীকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। প্রতিশ্রুতি মতো সরস্বতীকে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, কোন অসুখের চিহ্ন দেখতে পাই নি। রক্তও পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলুম, কোন দোষ পাওয়া যায় নি।

সোহনলালের সঙ্গে সরস্বতীর বিয়েও হয়েছিল একটু নতুন ধরনের। পুরুত টুরুত ডাকা হয়নি। মন্ত্রও পড়া হয়নি। সোহনলালের বাড়ীর কাছে একটা শিব-মন্দির ছিল। সেই শিব-মন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় হাত রেখে তারা শপথ করেছিল যে, তারা আমরণ পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশী হবে। কেউ কাউকে প্রতারণা করবে না।

এ শপথ রক্ষা করেছিল তারা। শুধু তাই নয়, সোহনলালকেও বদলে দিয়েছিল সরস্বতী। কিছুদিন পরে শুনলাম সোহনলাল মদ ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ের মাসখানেক পরে একদিন তাদের বাড়ি গিয়ে দেখলুম, সোহনলাল পূজো করছে!

সরস্বতী হেসে বললে, "উনি আমাকে ঘুড়ি ওড়াতে শিখিয়েছেন, আমি ওঁকে পূজো করতে শিখিয়েছি। আমরা দুজনেই এখন ঘুড়ি ওড়াই, দুজনেই পূজো করি।"

দেখলুম ঘরের শ্রী-ও ফিরিয়ে ফেলেছে সে। উঠোনে একটি তুলসী গাছ। পাখীর খাঁচাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাঁসার বাসনগুলি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। পরিষ্কার কাপড়গুলি পাট করে আলনায় রাখা। প্রকাণ্ড উঠোনটা আগে শ্রীহীন হয়ে পড়ে থাকতো, এখন গোবর দিয়ে নিকিয়ে তার চেহারাই বদলে দিয়েছে সরস্বতী। উঠোনের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছও দেখলাম। গাঁদা, সন্ধ্যামণি, রজনীগন্ধা। মনে হল— যাক্, সরস্বতী, এবার তার মনের মতো ছোট্ট একটা বাসা পেয়েছে তাহলে।

সোহনলাল একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। দেখলাম সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। জিগ্যেস করলাম, "মদ ছেড়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?"

সে বললে, "দু'চার দিন হয়েছিল। কিন্তু কষ্ট হলই বা! সরস্বতীর জন্যে একটু কষ্ট সইতে যদি না পারলাম, তবে আর কি পারলাম! আমার ওই মেশিনের জন্যে কষ্ট করতে হয় না? এমন দিনও গেছে যখন সমস্ত দিন না খেয়েও সেবা করেছি। যাকে ভালোবাসি তার জন্যে কষ্ট করতে হয় বই কি। কিন্তু আমি যে জন্যে আপনার কাছে এসেছি সেইটে আগে বলি। সরস্বতীর খুব ইচ্ছে কোনও একটা পূজো করে। দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী—আপনি যা বলবেন। সরস্বতী আপনাকেই জিগ্যেস করতে বলেছে।"

বললাম, "দুর্গা কালীর দরকার কি, ওর নাম সরস্বতী, সরস্বতী পূজোই করুক—"

"ঠিক বলেছেন।"

মহাসমারোহে সরস্বতী পূজো হল। শুধু আমি নয়, শহর-সুদ্ধ লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চামার সব।

আরও মাস দুই পরে শুভ সংবাদটি জানতে পারলাম। সরস্বতী অন্তঃস্বত্ত্বা।

যথাসময়ে সুন্দর একটি ছেলে হল। আবার একচোট সবাইকে খাওয়ালে সোহনলাল।

মাস কয়েক পরে বদলি হয়ে গেলাম আমি সেখান থেকে। ওদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার মতো হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়েছিল বেশ। যাবার সময় বলে গেলুম, মাঝে মাঝে তোমাদের খবর দিও।

বছর খানেক পরে হঠাৎ সোহনলাল নিজেই সশরীরে এসে হাজির হল একদিন।

বললে, "সরস্বতীও ভেগেছে।"

"বল কি!"

"হ্যাঁ হুজুর। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলুম, মেয়েমানুষ এক আজব মেশিন।"

"কোথায় গেছে তা জান?"

"কিছু বলে যায়নি কাউকে। ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে।"

"তোমার সঙ্গে ঝগড়া টগড়া হয়েছিল?"

"কিচ্ছু না।"

একটু চুপ করে থেকে বললে, "আপনি কি ওর দেশের ঠিকানা জানেন?"

ঠিকানা সংগ্রহ করবার আমার বাতিক নেই।

বললাম, "না, ঠিকানা তো জানি না।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এইজন্যই বোধহয় অজ্ঞাত-কুলশীলদের সম্বন্ধে আমাদের সবাধান করে গেছেন। কিন্তু সরস্বতী যে এমন দাগা দেবে তা ভাবতে পারিনি।

খানিকক্ষণ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সোহনলাল চলে গেল।

মাস তিনেক পরে সরস্বতীর চিঠি পেলাম একখানা। বানান-ভুলে পরিপূর্ণ বাংলায় লেখা চিঠি। চিঠিতে যা লিখেছিল তা শুদ্ধ করে লিখলে এই দাঁড়ায়।

শ্রীচরণেষু,

না জানি আপনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন। কিন্তু কি হয়েছিল শুনুন। আপনার মনে হয়তো আছে, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমার প্রথম সন্তান মাকে দিয়ে দেবো। আমার ছেলে যখন বড় হতে লাগল তখন বার বার এই প্রতিজ্ঞার কথাটা আমার মনে হ'ত। মায়ের জন্যে মন কেমন করতো খুব, তবে মনকে স্তোক দিতুম যে মা বোধ হয় বেঁচে নেই। কিন্তু স্তোক দেওয়া আর চলল না। হঠাৎ রাস্তায় আমাদের গাঁয়ের নবীন স্যাকরার সঙ্গে দেখা হল একদিন। সে এক বিয়েতে বরযাত্রী এসেছিল। সে বললে, মা বেঁচে আছে, আর আমার জন্যে রোজই নাকি কান্নাকাটি করে।

ওঁকে পাকে-প্রকারে একদিন জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, খোকনকে যদি আমি আমার মায়ের কাছে দিয়ে দি তাহলে তুমি কি আপত্তি করবে? উনি বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন। আমার এও মনে হ'তে লাগল, আমার ছেলে যদি এখানে মানুষ হয় তাহলে ওর সঙ্গী হবে ওই চামারের ছেলেমেয়েগুলো। এই সব ভাবছি এমন সময় আবার একদিন নবীন স্যাকরার সঙ্গে দেখা হল। সে বললে, মা-ই তাকে এবার পাঠিয়েছে। আমি যেন ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসি মায়ের সঙ্গে। উনি তখন বাড়ি ছিলেন না, প্রেসে গিয়েছিলেন। আমি ভাবলুম, উনি ফিরলে ওঁকে জিগ্যেস করে

তবে যাব। কিন্তু আবার ভয় হল উনি যদি যেতে না দেন। নবীন স্যাকরা বললে, 'যাবে তো চল, তিনটের সময় গাড়ি। আমি তোমার মায়ের কাকুতি মিনতিতে একটি দিনের জন্যে এসেছি। যদি না যাও আমি আজই চলে যাব। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।' শেষে চলেই গেলুম ওর সঙ্গে। কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছিল বুঝতে পারছি। কিন্তু যখন কুমারী ছিলাম, তখন মাকে যে কথা দিয়েছিলাম, সেটা যদি না রাখি তাহলে কি সত্যভঙ্গ হয় না? তাছাড়া যে ছেলেকে আমি দশমাস পেটে ধরেছি, বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি, তার উপরে আমার কি কোন অধিকার নেই? সব অধিকার ওঁর? পাকে-প্রকারে একদিনই কথাটা পেড়ে বুঝেছিলাম ওঁর কি মনোভাব। তাই বাড়িতে এসেও তাঁকে ভয়ে আর খবর দিতে পারিনি। যদি এসে হৈ-হল্লা করেন, তাহলে গাঁয়ের ভেতর সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে। একে আমাকে নিয়ে আগে নানা কাণ্ড হয়েছে। আমি আর একটা কথাও ভেবেছিলুম, মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার কাছেই নিয়ে যাব। তাহলে দু-কুলই বজায় থাকবে। কিন্তু তাও হল না। মা বাস্তু ভিটে ছেড়ে আসতে রাজি হল না কিছুতেই। আর আমার ছেলেটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই মা বেশ ভাব করে ফেলেছিল, সে রাত্রে তাঁর কাছে শুতো। মাস-খানেকের মধ্যে খুব ন্যাওটা হ'য়ে পড়ল। তখন আমি ভাবলুম, এইবার ফিরে যাই। উনি হয়তো একটু রাগ টাগ করবেন, কিন্তু পায়ে ধরলে আমার মনের কথাটা বুঝবেন হয়তো। মায়ের কাছে ছেলেকে রেখে একাই ফিরে গেলুম। গিয়ে দেখি আমাদের বাড়িতে আর একজন লোক রয়েছে। চামারের বললে, আমি চলে যাওয়ার দিন পনেরো পরেই উনি প্রেসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সব জিনিসপত্র জলের দামে বিক্রী করে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না। মহা আতান্তরে পড়লুম। কেউ কেউ বললে কলকাতা গেছেন, কেউ বললে বোম্বাই। একবার ভাবলুম বাড়িতে ফিরে যাই আবার। কিন্তু মাসখানেক মায়ের কাছে থেকেই পাড়ার ছোঁড়াগুলোর, বিশেষত জমিদারের নায়েব মশায়ের চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলুম, তাতে মনে হল ওখানে যদি ফিরে যাই তাহলে মাকে আবার নতুন করে বিপদে ফেলা হবে। ইতিমধ্যে পাড়ার চেনা একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল, সে যা খবর দিলে তাতে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। সে কয়েকদিন আগেই কলকাতা গিয়েছিল, বললে, সোহনলাল অপঘাতে মারা গেছে। মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে রাস্তার ধারে পড়েছিল, একটা মোটরলরি এসে তার মাথাটা চুরমার করে দিয়ে চলে গেছে। শুনে যেন পাথর হয়ে গেলুম। চিরকালের মতো যদি পাথর হ'য়ে যেতুম তা হলেই ভালো হ'তো। কিন্তু তা হল না। কপালে তখনও অনেক দুর্গতি লেখা ছিল। কি করি, কোথা যাই, মহা দুশ্চিন্তায় পড়লুম। আমাদের বাড়িতে যিনি নতুন ভাড়াটে এসেছিলেন, তাঁর স্ত্রী আমার দিকে একনজর চেয়ে তাঁর বাড়ীর বারান্দাতেও খানিকক্ষণের জন্যে বসতে দিলেন না, অথচ ওই বারান্দা একদিন আমারই ছিল। ওই বারান্দা কতবার ধুয়েছি, পুঁছেছি, নিকিয়েছি। এখন ওখানে আর আমার বসবার অধিকারও নেই। চামাররা অবশ্য খুব ভদ্র ব্যবহার

করেছিল। বলেছিল, মাইজি তুমি যতদিন খুশী আমাদের কাছে থাকো। কিন্তু চামার-দের সঙ্গে থাকতে আমার প্রবৃত্তি হল না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম, কোথাও যদি চাকরাণী হয়ে বাহাল হতে পারি এই আশায়। এমন সময় সেই বাড়িউলীর সঙ্গে আবার দেখা। সে খুব ভদ্র ব্যবহার করলে আমার সঙ্গে। তার কাছেই শুনলাম, রমজান আলীও নাকি মারা গেছে। যে দারোগাকে ও ষড়যন্ত্র করে জেল দিয়েছিল, তারই পেয়ারের কোন গুণ্ডা নাকি ওকে খুন করেছে। সোহনলালের কথা শুনে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল। বললে, ও রকম দিলদরিয়া লোক দেখা যায় না। আমি ওকে না বলে চলে গিয়েছিলুম বলেই আমাকে বকতে লাগল খুব। তারপর বললে, 'তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও, তোমাকে রাখতে পারি। যদিও তোমাকে রেখে একবার খুবই হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছিল আমাকে।' আমি বললুম, 'আমাকে যদি ভদ্রভাবে রাখ, আমার উপর যদি জোর-জুলুম, জবরদস্তি না কর, তাহলে আমি থাকতে পারি।' বাড়ি-উলী জিব কেটে বলল, 'ছি, ছি, যা হয়ে গেছে তা আর কখনও হবে না। তাছাড়া অত বড় বড় 'অপ্‌সর' তোমার সহায়, আমি কি তোমার উপর আর জবরদস্তি করতে সাহস করি?' আমি ওই বাড়িউলীর কাছে থেকে গেলুম, দেখলুম এ ছাড়া আমার আর পথ নেই।

আপনি রাগ করবেন জানি। তবু আপনাকে বাবা বলে ডেকেছি, আপনার দয়াতেই কিছুদিনের জন্যেও সুখের সংসার পাততে পেরেছিলুম, একথা আমি কোন দিনই ভুলব না। তাই আবার আপনার সাহায্য ভিক্ষে করছি।

যা করছি তা আমার একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু কি করব, বাধ্য হয়েই করছি। যদি আপনি দয়া করে আমাকে অন্য কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে দেন এখুনি চলে যাব। আপনাদের হাসপাতালে শুনেছি, দাই, নার্স, এসব কাজ পাওয়া যায়। জুটিয়ে দিতে পারেন আমাকে একটা? কম মাইনে হলেও যাব। আমার নিজের সাদাসিধে খাওয়া পরার খরচটা চলে গেলেই হল। আপনার কাছে সাহায্য চাইবার আমার আর মুখ নেই তা জানি, তবু চাইছি, কারণ সত্যিই আমি নিরুপায়। আর কি দয়া পাব আপনার? আমার শত কোটি প্রণাম জানবেন। ইতি

আপনার মেয়ে সরস্বতী

চিঠিখানা পড়ে পণ্ডিতেরা যাকে "জুগুপ্সা" বলেন তাই জেগে উঠল আমার মনে। ঠিক করলুম, ওই কালভুজঙ্গিনীর সঙ্গে আর কোন সংশ্রব রাখব না। হাসপাতালের অ্যাপ্রেনটিস নার্স করে ওকে বাহাল করে নিতে পারতুম কিন্তু ক্রোধান্ধ হয়েছিলুম, তাই ওর চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিলাম না।

চিঠি পাওয়ার প্রায় বছর চারেক পরে আর একবার সরস্বতীর দেখা পেয়েছিলুম। তখন আমি আর এক জায়গায় বদলি হয়ে গেছি। দুপুর বেলা, একটা গাঁয়ে গেছি রোগী দেখতে। যাওয়ার সময় নজরে পড়েনি। ফেরবার সময় দেখলুম, গাঁয়ের বাইরে

একটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একটা গেরুয়া ধ্বজা উড়ছে। ধ্বজায় লাল অক্ষর দিয়ে লেখা—'সোহনলাল আশ্রম'। গাড়ী থামালুম। তারপর দেখতে পেলুম, অনেকগুলো ছেলে কাছেই ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। একটু দূরে ছোট্ট একটি মাটির ঘর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘরের পিছনে অনেক উঁচুতে কয়েকটা পায়রার টং। নানা জাতের পায়রাও চরে' বেড়াচ্ছে। নেবে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, মাটির ঘরের দাওয়ায় পাখীর খাঁচাও ঝুলছে কয়েকটা। একটা ময়না বলে উঠল, 'সোহনলাল, সোহনলাল কী জয়'। যে ছোঁড়াগুলো ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল তাদের একজনকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, এখানে কে থাকে। সে বললে, ভৈরবী মাইজি। এমন সময় সরস্বতী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে গেরুয়া। যৌবনের সে উদগ্র-ভাব নেই, তার বদলে একটা শুদ্ধ শান্ত শ্রী বিকীর্ণ হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে। আমাকে এখানে দেখতে পাবে তা সে প্রত্যাশা করেনি। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর চিনতে পেরে একমুখ হেসে এগিয়ে এল আমার দিকে, প্রণামও করলো।

"বাবা! আপনি এখানে কি করে এলেন?"

"কিছুদিন আগে বদলি হয়ে এসেছি। আমার তো জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ানোই চাকরী। তুমি কি করে এখানে এলে তাই বল—"

"আমি বাড়ি-উলীর কাছে কিছুদিন ছিলাম। যখন হাতে কিছু টাকা জমল তখন মনে হল আর পাপের ভোগ করি কেন। একজনের কাছে খবর পেলুম, এখানে বেশ শস্তায় জমি পাওয়া যায়। খানিকটা জমি কিনে ছোট একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছি এইখানেই।"

"কি কর এখানে?"

"তিনি যা ভালোবাসতেন তাই করি। ছেলেদের ঘুড়ি কিনে দি, পায়রা আর পাখীর সেবা করি।"

নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কয়েক সেকেণ্ড।

তারপর জিগ্যেস করলুম, "তোমার ছেলে কোথায়?"

"সে তো মায়ের কাছে। এখন আর নেই।"

"এখন কোথা?"

"মারা গেছে ম্যালেরিয়ায় ভুগে।"

যে ছেলেগুলো ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, তারা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আমাদের। তাদের দেখিয়ে সরস্বতী বললে, "এখন এরাই আমার ছেলে—"

হঠাৎ ইচ্ছে হল ওকে একটা প্রণাম করি। কিন্তু ঝুঁকতে পারলুম না, টাইট প্যাণ্ট পরা ছিল। নিজের প্যাণ্ট নয়, ঝুটো আত্মসম্মানের প্যাণ্ট।

দেখ বৎস, তোমাকে যে এত বড় লম্বা চিঠি লিখলাম, তা তোমাকে গল্প শোনাবার জন্যে নয়। চিঠিটা লিখতে প্রায় পনেরো দিন লেগেছে। রাত জেগে জেগে লিখেছি।

লিখেছি, কারণ তুমি আমার ছাত্র, শুধু তাই নয়, তুমি ডাক্তার হয়েছ অর্থাৎ তুমি সেই সম্প্রদায়ের একজন হয়েছ যারা বিদ্রোহী সভ্য মানবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিদ্রোহী। প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করেই মানুষ সভ্য হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির যেটা সবচেয়ে কড়া নিয়ম, যা অনিবার্য, যা অমোঘ, ডাক্তাররা অস্ত্রধারণ করেছে তারই বিরুদ্ধে। তাদের লড়াই মৃত্যুর সঙ্গে, এই লড়াই করতে করতে ওরা নিজেরাও দলে দলে মরছে, কিন্তু তার পিছনে আসছে আবার একদল। বহুকাল থেকে এই চলছে, তুমিও এবার সেই দলে যোগ দিয়েছ। ডাক্তারদের বাজার দর আজকাল ক্রমশঃ কমছে, কিন্তু তাদের আসল দর কখনও কমবে না, যদি তারা অমানুষ না হয়। মানুষ অসুখে পড়বেই এবং সে আর্ত হ'য়ে তোমার কাছে আসবেই, তখন তুমি যদি তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার কর তাহলে তুমি শুধু যে তাদের রোগ চিনতে পারবে, তা নয়, তাদেরও চিনতে পারবে। ডাক্তাররাই দেশের লোকদের স্বরূপ চিনতে পারে, আর্ত হ'লেই মানুষ তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে ফেলে। কাউকে যখন বাঘে ধরে তখন সে তার বগলের নীচে লুকানো দাদটাকে ঢাকবার চেষ্টা করে না, যে তাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে তার কাছে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতেও তার আপত্তি নেই। সে যখন উলঙ্গ হ'য়ে তোমার কাছে আসবে তখন তার কদর্যতা দেখে নাক সিঁটকো না, তাকে মরাল লেকচার দিতে যেও না, শুধু একটি কথা মনে রেখ সে বিপন্ন মানুষ। ডারবিন আমাদের জীবনটাকে যুদ্ধ বলেছেন। সত্যিই আমরা জন্ম-মুহূর্ত থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘোরাফেরা করি সবাই। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টাই গোলাগুলি চলছে, শুধু অসুখের জীবাণু নয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য এই ছ'টা শত্রুর কারখানায় তৈরি নানা জাতের নানা আকারের গোলাগুলিও। ইন্দীবর নয়নের সলজ্জ কটাক্ষও আমাদের কম ঘায়েল করে না। আর একটি কথাও মনে রেখো, এই যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র দুই শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়, তাদের তোমরা ভাল-মন্দ, ধার্মিক-অধার্মিক, হিন্দু-অহিন্দু, বাঙালী-অবাঙালী এই কায়দায় ভাগ করতে অভ্যস্ত হয়েছো। কিন্তু তাদের ভাগ করা উচিত এইভাবে, (ক) যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছে, (খ) যারা এখনও হয়নি। এই সত্যদৃষ্টি দিয়ে যদি মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হও, তাহলে তাদের ঠিক স্বরূপটি দেখতে পাবে। আর তা না করে, যদি ঠিক করতে যাও ইনি মনুর বিধান মেনে চলে চলেন কিনা, এঁর টিকি আছে কি নেই, মুরগী খান, না কুমড়ো খান, কার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, কংগ্রেসী না মুসলিম-লীগী, আর সেই অনুসারে তোমার মানস-থার্মোমিটারে সহানুভূতির পারা যদি ওঠা-নামা করতে থাকে, তাহলেই তোমার পতন হলো। তাহলেই তুমি আর বিজ্ঞানী ডাক্তার থাকলে না, চণ্ডীমণ্ডপের দা-ঠাকুর হ'য়ে গেলে।

তুমি পঞ্চকন্যার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছিলে, সেই সুযোগে আমিও তোমাকে আমার দেখা পাঁচটি কন্যার কথা বললুম। আমার বক্তব্যটা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে তোমার মনে। আমি বলতে চেয়েছি, ওদের তোমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছ,

ওরা ঠিক তাই নয়। ওদের যদি শুধু অ্যানাটমি বা ফিজিওলজির ফরম্যুলায় ফেল, তোমার ক্ষুধা মেটাবার বা বংশবৃদ্ধি করবার যন্ত্র মাত্র মনে কর, তাহলে ওদের আসল পরিচয়ই পাবে না কখনও। ওরা যন্ত্ররূপেই ধরা দেবে তোমাদের কাছে, যেমন রোজ দিচ্ছে। কিন্তু ওদের সেই শক্তিকে তোমরা কখনও কাজে লাগাতে পারবে না যে শক্তি ওদের বৈশিষ্ট্য, আর যা কাজে লাগাতে পারলে দিগ্বিজয় করা যায়। ওদের সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করবার চোখ নেই তোমাদের। আমি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে তোমার সেই চোখ ফুটিয়ে দিতে চাই। তোমাদের একটা মহদ্দোষ কি জান? শুধু দোষ নয়, নির্বুদ্ধিতা। তোমরা ওদের প্রতি অনুকম্পা কর। মনে কর, আহা ওরা অতি দুর্বল, ওদের ব্রেনের ওজন কম, গায়ের জোর কম, তোমাদের কৃপাকণা না পেলে ওরা বাঁচবে না। তাই ওরা তোমাদের দাসী হয়ে আছে আর তোমরা দয়া করে ওদের প্রভু হয়েছ। কিন্তু, ইউ ফুল্‌স্‌, তোমরা এটা বোঝ না যে প্রতি সংসারে ওরাই আসল কর্ত্রী। মা-রূপে, কন্যারূপে, বধূরূপে, প্রণয়িনীরূপে, নানা রূপে ওরা তোমাদের মতো হাঁদাদের নাকে দড়ি পরিয়ে নাচাচ্ছে? তোমরা যখন হাম্বা-রব করে গর্জন ছাড় "আমরা প্রভু", তখন ওরা মনে মনে হাসে, কারণ ওরা জানে যে আসলে ওরাই শক্তির আধার। তাই চুপ করে থাকে, পূর্ণকুম্ভের মতো। ইচ্ছে করলে ওরা সতী-সাবিত্রীও হ'তে পারে, আবার ক্লিওপেট্রা ক্যাথারিনও হ'তে পারে। ঘর বাঁধতেও জানে, ঘর ভাঙতেও জানে। ঘোমটা টেনে রান্নাঘরের কোণে বসে তোমাকে সুক্তো বেগুন ভাজা খাইয়েও মুগ্ধ করতে পারে, আবার স্টেজে উঠে ওড়না উড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে তোমার মুণ্ডুও ঘুরিয়ে দিতে পারে। সব পারে ওরা। চণ্ডী পড়েছ কখনও? যদি না পড়ে থাক পোড়ো। দেখবে, সেখানে কবি নারীকে কি মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁরা জানতেন যে ইচ্ছে করলে ওই নারীশক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকেও মোহগ্রস্ত করতে পারে।

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রা বশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।

এই তামসী দেবীকে তাঁরা আরাধনা করেছিলেন, মধু ও কৈটভকে মোহগ্রস্ত করবার জন্যে। ওদের মোহগ্রস্ত না করতে পারলে বধ করা যেত না। চণ্ডীতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার মতো আছে। ওঁরা মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভর মতো জাঁদরেল দৈত্যদের মারবার জন্যে কোনও হোমরা-চোমরা পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেন নি। করেছেন নারীকে। অম্বিকা শুম্ভ-নিশুম্ভকেও মোহগ্রস্ত করেছিল। শুম্ভ-নিশুম্ভের দূত যখন তাকে এসে বললে—আপনি স্ত্রী-রত্ন, শুম্ভ-নিশুম্ভও ত্রিলোকজয়ী বীর, আপনি তাঁদেরই ভজনা করুন। এর উত্তরে অম্বিকা শাড়ি গয়না চাননি, বলেছিলেন—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।

"যিনি আমাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারবেন, যিনি আমার দর্পচূর্ণ করবেন, যিনি

জগতে আমার তুল্য বলশালী, তাঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করব। যে দেশে নারীর এই রূপ কল্পনা করেছেন কবিরা, সেই দেশে তোমরা তাদের অবলা দুর্বলা বলে অনুকম্পা কর? তোমাদের স্পর্ধা তো কম নয়। আই বেগ ইওর পার্ডন, এটা স্পর্ধা নয়, বোকামি। তোমরা ওদের চেন না, জান না, জানবার চেষ্টাও কর না। চণ্ডী যদি পড় তাহলে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবে। যে বীর্যবতী মহিয়সী সিংহবাহিনী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তাঁর জন্মকাহিনীটাও ভালো করে পড়ে দেখো। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের তেজ এবং সমস্ত দেবকুলের তেজ একত্রিত হয়ে যে তেজোময়ী নারী সম্ভব হলেন, তাঁকে আরও প্রদীপ্ত করলেন সূর্য-চন্দ্র, দক্ষ প্রজাপতিরা, সমুজ্জ্বল করলেন সন্ধ্যা-দেবীগণ। বরুণ তাঁকে শঙ্খ দিলেন, অগ্নি শক্তি দিলেন, পবন দিলেন ধনুর্বাণ। ইন্দ্র নিজের বজ্র থেকে আর একটা বজ্র তৈরি করে দিলেন, ঐরাবত দিলেন ঘণ্টা, যম দিলেন কালদণ্ড। ক্ষীরোদ সমুদ্র তাঁকে সাজিয়ে দিলেন নানা অলঙ্কারে। তাঁর গলায় দুলিয়ে দিলেন উজ্জ্বল মুক্তাহার, কানে দিব্য কুণ্ডল, মাথায় পরিয়ে দিলেন চূড়ামণি, হস্তে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, পায়ে নূপুর, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়। সমুদ্র দিলেন তাঁকে অম্লান পদ্মের মালা, বিশ্বকর্মা তৈরি করে দিলেন কুঠার—হিমালয় দিলেন সিংহ, বাসুকী দিলেন নাগ-হার। অর্থাৎ ত্রিভুবনের সমস্ত পুরুষ-শক্তি একাগ্র হ'য়ে পুঞ্জীভূত হল ওই তেজোসম্ভবা নারী-শক্তির মধ্যে। তাই তিনি আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠলেন। 'সম্মানিতা, ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।' তাই তাঁর গর্জনে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। 'চুক্ষুভাঃ সকলা লোকাঃ, সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে। চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।' সপ্ত-সমুদ্র কেঁপে উঠল, পাহাড় বিচলিত হল। পুরুষদের তেজ, পুরুষদের আগ্রহ, পুরুষদের প্রতিভা —নারীশক্তির সঙ্গে মিললে তবেই মহিষাসুরকে বধ করা যায়। কোনও পুরুষ বীর মহিষাসুরের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি, কিন্তু যেই তাদের প্রতিভা, প্রেরণা, আগ্রহ নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করল অমনি তা সম্ভব হয়ে গেল। এখনও আমাদের দেশে বহু মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ জন্মাচ্ছে, যুগে যুগে জন্মাবে, তাদের মারবার একমাত্র উপায় ওই চণ্ডীতে লেখা আছে। নারী-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, রিইনফোর্স করতে হবে, সেই নারী-শক্তির উৎস কোথায় সন্ধান করতে হবে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তবেই দুর্দান্ত মহিষাসুরদের বধ করা সম্ভব হবে। অন্য উপায় নৈব নৈব চ।

তুমি ডাক্তার। এই নারী-শক্তির নানা রূপ দেখবার সুযোগ তুমি পাবে। কখনও দেখবে বাল্ব, কখনও দেখবে মোটর, কখনও বা সরু তার শুধু। কিন্তু বিদ্যুতের কথাটা ভুলে যেও না। এটা সর্বদা মনে রেখ, কারেণ্ট পেলেই ওরা সক্রিয় হয়ে ওঠে, এটম্ বম তৈরী করাও অসম্ভব নয় ও:দের শক্তিতে। আর এটাও মনে রেখ মহিষাসুর বধ করতে হবে, আর তা তোমরা একা পারবে না, মেয়েদের শক্তির সাহায্য নিতে হবে।

মনের ভিতর অনেকদিন থেকে অনেক রকম গ্যাস জমেছিল, এই চিঠির সেফ্টি

ভাল্‌ভ্‌ দিয়ে তার অনেকখানি বেরিয়ে গেল। আরাম বোধ করছি। থামবার আগে আবার বলছি, মনে রেখ মহিষাসুর বধ করতে হবে।

আশীর্বাদ জেনো, বিলেত যাচ্ছ নাকি? দেখো, বিলিতি বাঁদর হ'য়ে এসো না যেন। ইতি—শুভার্থী অগ্নীশ্বর।

৫

পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম, কি করিয়াই বা আমি সেখানকার পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিলাম এ সবের বিশদ বিবরণ এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। অবশ্য ইহা কল্পিত কাহিনী নহে, আমার জীবনেরই কাহিনী, কিন্তু কাহিনীর এই অংশটুকু আমার প্রাণদাতা ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-তর্পণ। তাঁহার নিকট আমি যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, অক্ষম লেখনীতে তাঁহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া সে ঋণ যে শোধ করা সম্ভব নয় তাহা আমি জানি, এ প্রয়াসও যে হাস্যকর সে বোধও আমার আছে, কিন্তু আমার দিক হইতে ইহার কৈফিয়ত, ইহা লিখিয়া আমি তৃপ্তি পাইতেছি।

পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও আমি লণ্ডনে পদার্পণ করিতে পারিয়াছিলাম সেই সারেং-এর সহায়তায়। আর সেই ডাক্তারবাবুটি যিনি এফ, আর, সি, এস পড়িতে যাইতেছিলেন, তাঁহার নিকটও আমি অসীম ঋণে ঋণী। তিনি আমাকে তাঁহার দাদার বাসায় লইয়া যান এবং বলেন, আমি দেশ হইতে এই গরীবের ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছি, ভালো রান্না করিতে পারে। যদি কোন সুযোগ পায় এখানে লেখাপড়া বা কোনও কাজকর্ম শিখিবে। আগেই বলিয়াছি তাঁহার দাদা একজন বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন, বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং লইতেছিলেন। খাদ্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আমি তাঁহাকে নানারকম দেশী তরকারি রাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। সুক্তো, শাকের ঘণ্ট, তিতার ডাল, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি লণ্ডনে দুষ্প্রাপ্য তরকারিগুলি খাইয়া তিনি খুবই খুশী হইয়া উঠিলেন। বস্তুত, উদর-পথে প্রবেশ করিয়াই আমি তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিলাম। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সে স্থান হইতে আমি চ্যুত হই নাই। কিছুদিন থাকিবার পর তাঁহার নিকট আমি আমার মনোভাবটি প্রকাশ করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা ব্যবস্থা করিয়া দিব। বিলাতে অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রতিষ্ঠান আছে। এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তার সহিত তাঁহার হৃদ্যতা ছিল। সেইখানেই তিনি আমাকে ঢুকাইয়া দিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে করিতেই আমি আমেরিকা যাইবার সুযোগ পাই। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তারও আমি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম, তাঁহার সুপারিশে সেখানে একটি বৃহত্তর পুলিশ বিভাগে আমার একটি চাকরি জুটিয়া গেল। কিছুদিন

চাকরি করিবার পর বাধিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন যুদ্ধেই আমি গোয়েন্দা বিভাগে কাজ পাইয়া গেলাম। পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিবার সুযোগ পাইলাম। কার্যে শুধু যে দক্ষতা অর্জন করিলাম তাহা নহে, বেশ সুনামও হইল। জঙ্গী বিভাগের বড় বড় অফিসাররা আমার কাজের প্রশংসা করিয়া সার্টিফিকেট দিলেন। এই যুদ্ধের সময়ই ভারতীয় বিপ্লবীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আমাকে ভারতবর্ষে বড় চাকরি দিয়া বদলি করা হইল। আমেরিকান সরকারের সুপারিশেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আমাকে এই চাকুরিটি দিলেন। আমি আসিয়া বিপ্লবীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে সময় আমি কি কি করিয়াছিলাম তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিব না।

বাংলাদেশে ফিরিয়াই আমি ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের খোঁজ করিয়াছিলাম। খোঁজ করিয়া যতটুকু খবর সংগ্রহ করিতে পরিয়াছিলাম তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। তাঁহার শেষ খবর পাইয়াছিলাম তিনি পুত্র-পুত্রবধূকে সংসারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া কোনও হাসপাতালের ডাক্তার হইয়া গিয়াছেন। সেইখানেই নাকি আধুনিক পদ্ধতিতে বাণপ্রস্থ-জীবনযাপন করিবেন। সেইখানেই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু ছুটি পাইতেছিলাম না বলিয়া হইয়া ওঠে নাই।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া গেল।

আমরা অখণ্ড স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, পাইলাম খণ্ডিত স্বাধীনতা। ঠিক তাহার পূর্বেই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের উন্মত্ত তাণ্ডবে দেশের মাটি দেশের লোকের রক্তেই রঞ্জিত ও সিক্ত হইল। আমার পরিচয় ছিল মুসলমান, সুতরাং আমি পূর্ব-পাকিস্তানে নীত হইলাম। ইহাতে আমার দুঃখ হয় নাই। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানকে আমি এখনও বাংলা দেশ বলিয়াই মনে করি। আমার প্রথম যৌবনের লীলা-ক্ষেত্র ওই পূর্ব-বঙ্গ, স্বাধীনতা মন্ত্রে ওইখানেই আমি দীক্ষা লইয়াছিলাম। অশ্বিনী দত্ত, পুলিন দাস, শান্তি দাস, প্রীতি ওয়াদ্দেদার, সূর্য সেন এবং আরো অসংখ্য বিখ্যাত-অখ্যাত আত্মত্যাগী বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের জন্মভূমি যে দেশ, সে দেশকে রাজনৈতিকরা যে নামেই অভিহিত করুন, আমার কাছে তাহা বাংলা দেশ। র‍্যাডক্লিফ দেশের মাটির উপর একটা লাইন টানিয়া দিলেই কি দেশের আত্মা বিভক্ত হইয়া যাইতে পারে? পারে না। পাকিস্তানে গিয়া আমার মনে হইয়াছিল মায়ের কোলেই ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু ডাক্তার অগ্নীশ্বরের নিকট হইতে আমাকে অনেক দূরে চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার হাসপাতালের যে ঠিকানা পাইয়াছিলাম তাহা উত্তর প্রদেশের শেষ সীমান্তে। হিমালয়ের কাছাকাছি।

স্বাধীনতা পাইবার অনেকদিন পরে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইবার সুযোগ হইল। সেখানে পৌঁছিয়া কিন্তু হতাশ হইলাম। শুনিলাম, বছর খানেক পূর্বে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। চলিয়া আসিবার কারণ যাহা শুনিলাম তাহাতে মনে হইল, অগ্নীশ্বরের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। একমাত্র অগ্নীশ্বরই ইহা পারেন।

হাসপাতালটি আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের নামের সহিত যুক্ত। নামটা আমি আর করিব না। সেখানে অগ্নীশ্বর সুখেই ছিলেন। কিন্তু একদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

তিনি একটি গরীব রোগীর অপারেশন করিবেন বলিয়া আগের দিন হইতে তাহাকে ঔষধ এনিমা প্রভৃতি দিয়া একটি আলাদা খালি ঘরে রাখিয়াছিলেন। পরদিন গিয়া দেখেন রোগী সেখানে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথা গেল।" হাসপাতালের ছোট ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মহারাজের আদেশে তাঁহাকে জেনারেল ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।"

"কেন ?"

"হাসপাতালের একজন বড় পেট্রন আসবেন। টেলিগ্রাম করেছেন, তাঁর জন্যে যেন একটা ঘর খালি রাখা হয়। অন্য ঘর ছিল না, তাই ওই রুগীটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—"

অগ্নীশ্বর মহারাজের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপারটা সত্য কিনা, হাসপাতালের যিনি অধ্যক্ষ তাঁহাকে সকলে মহারাজ বলিয়া ডাকিত। মহারাজ বলিলেন, "কি করব বলুন, একে অতবড় লোক, তায় আমাদের একজন পেট্রন। তাঁর অনুরোধ এড়ানো শক্ত। যেখানে আপনার রুগীকে দিয়েছি সে বেডটাও ভালো, বেশ ফাঁকা—"

"ভালো কি মন্দ সেটা আমি ঠিক করব। যাক, আমার এখান থেকেও চাকরিটা গেল তাহলে। এতবড় মহাপুরুষের নামে হাসপাতাল, এখানেও ধনী-দরিদ্রের ভেদ! এখানে আমার থাকা পোষাবে না। কালই আমি চলে যাব।"

মহারাজ তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "দেখুন, অপরের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের চলতে হয়, যাঁরা দাক্ষিণ্য দেখান তাঁরা কিছু সুবিধাও প্রত্যাশা করেন। সুতরাং আমরা নিরুপায়।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন, "তা বুঝতে পারছি। ওদেশে কিন্তু ওরা এমন নিরুপায় হয় না। আমেরিকার মেয়ো ব্রাদার্সে'র ক্লিনিকের ইতিহাস পড়ে দেখবেন। সেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্টও যদি যান, তাঁর জন্যেও কোন পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় না। তিনি চানও না—"

অগ্নীশ্বর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় যে গিয়াছেন তাহা কেহ বলিতে পারিল না। নিকটেই একটা শহরে একটা হোটেলে কিছুদিন ছিলেন শুনিলাম। সেখানে গিয়াও তাঁহাকে পাই নাই। অবশেষে তাঁহার ছেলের নিকট গিয়া হাজির হইলাম একদিন। ছেলে যাহা বলিল তাহা আরও বিস্ময়কর।

সে বলিল, "বছর চারেক বাবার কোনও খবর জানি না। তিনি তাঁর পেন্‌সন্ অর্ধেকটা অগ্রিম নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যে চিঠিটা সেই সঙ্গে লিখেছিলেন সেটা দেখাতে পারি আপনাকে, যদি দেখতে চান।

চিঠিতে লেখা ছিল—

কল্যাণবরেষু,

আমি আর তোমাদের কাছে ফিরব না। চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলুম, তথাকথিত ভদ্রসমাজে কোথাও আমার স্থান নেই। কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলুম না। হতচ্ছাড়া দেশকে গালাগালি দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আবার হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, এই দেশকেই ভালোবাসি এর শত দোষ সত্ত্বেও। এ দেশ ছেড়ে কোথা যাব। তাই ঠিক করেছি, তোমরা যাদের অপাংক্তেয় করে রেখেছ তাদের মধ্যে গিয়েই এবার থাকব। বিদ্যাসাগর মশাই শেষ জীবনে সাঁওতালদের মধ্যে এসে বাস করেছিলেন। তিনি নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন তোমাদের ভালো করতে গিয়ে, আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি কিছু না করেই। তাই ঠিক করেছি, যে কটা দিন বাঁচি ভদ্রসমাজের আওতা থেকে দূরে থাকব। জানি না তুমি কোনও কালোবাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছ কিনা, যদি না হয়ে থাকো আশ্চর্য হব। কালোবাজারের আলকাতরা তো সকলের গায়েই লেগেছে। কালোবাজারের আঁস্তাকুড়ে যাদের কিলবিল করতে দেখি, তারা তো সবাই সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রসন্তান। তাদের তোমরা বয়কট্ কর না, বরং সেলাম কর, কারণ তারা ধনী। গুণীদের নয়, ধনীদের পূজা করাই ভদ্রসমাজের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি দূর থেকে প্রণাম করে সে সমাজ থেকে সরে পড়েছি।

আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না। যে মহাসমুদ্রে এবার গা ভাসিয়ে দিতে চললুম, তার চেয়ে বড় সমুদ্র ভূগোলে নেই। এ সমুদ্রের ঢেউ দীন হীন আর্ত অসহায়েরা। এদের ত্রাণ করবার জন্যেই ভগবান নাকি মাঝে মাঝে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন, তাঁরও খোঁজ করবার ইচ্ছে আছে।

আমার পেন্সনের অর্ধেকটা 'কমিউট্' করে দিয়ে গেলাম তোমাকে। আশীর্বাদ জেনো সকলে। ইতি—

শুভার্থী অগ্নীশ্বর

ইহার বেশী আর কিছুই জানিতে পারি নাই। আসিবার সময় তাঁহার ছেলের নিকট হইতে তাঁহার একটি ফোটো জোগাড় করিয়া আনিয়াছিলাম। সেইটেই আমার শুইবার ঘরের একমাত্র ছবি। সকালে উঠিয়া ছবি দেখি, আবার রাত্রেও সেই ছবি দেখিয়া শুইয়া পড়ি।

অগ্নীশ্বরের কাহিনী শেষ হইল। কিন্তু তিনি আমার কাছে আজও অশেষ। ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন—অগ্নি পরমাত্মার সঙ্কেত, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সে অগ্নির আহুতি। অগ্নি নিজে বলিয়াছেন, 'আমি দেব, যেখানে দেব-ভাব নাই সেখানে আমি থাকি না, যে যজ্ঞস্থল অপবিত্র সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমি শুষ্ক অরণীর মধ্যে আত্মগোপন করি। যে আমাকে প্রার্থনা করে, সেই আমাকে দেখিতে পায়। তাহার নিকটই আমি অমৃতরূপে প্রকাশিত হই। আমি শুধু পৃথিবীতেই নিবদ্ধ থাকি না, দ্যুলোকেও আমি

নিয়ত গমন করি। সেখানে সূর্যই আমার সঙ্গী, তাঁহারই সহিত আমি পৃথিবীকে রূপ হইতে রূপান্তরে লইয়া যাই নানা ঋতুতে। আমি পবিত্র করি, অলঙ্কৃত করি এবং ধ্বংসও করি। যাহা নশ্বর তাহাকে দগ্ধ করিয়াই আমি বিকীর্ণ করি অবিনশ্বর জ্যোতি, যাহা অম্লান, নিষ্কলুষ, চিরদীপ্ত।'

ছবিটির দিকে চাহিয়া আমি অগ্নির এই ভাষা যেন শুনিতে পাই। যেন দেখিতে পাই, তিনি এক জ্যোতির্ময় অনন্ত পথে ঋজুপদবিক্ষেপে চলিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ, তাঁহার মস্তক আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার রূপে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত।

আমি নির্বাক হইয়া চাহিয়া থাকি আর মনে মনে বলি,—

"হে অগ্নীশ্বর, তোমার নাম সার্থক, তোমার কর্ম সার্থক, তোমার জীবন সার্থক। তোমাকে আমি প্রণাম করি।"

সত্য সত্যই তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া আছে, কিন্তু কোথায় তিনি? অনেক খুঁজিয়াছি, কিন্তু কোন সন্ধানই তো পাইলাম না। তিনি মারা গিয়াছেন একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অতবড় একটা আগ্নেয়গিরি সে কি লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষুদ্র প্রদীপের মতো নিবিয়া যাইতে পারে? বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু কোথায় তিনি?

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, পাকিস্তানে কিছুদিন থাকিবার পর আমি হিন্দুস্থানে চলিয়া আসিয়াছিলাম। এ কাহিনী বিহারে বসিয়া লিখিতেছি।

যে বেদের দল ধরা পড়িয়াছিল, জামিনে তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। যে দারোগা সাহেব তাহাদের ধরিয়াছিলেন, তিনি একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন, "ওরা তো কিছুই কবুল করতে চাইছে না। সনাতন উপায় অবলম্বন করব কি?"

"কি উপায়—"

"মারধোর—"

"ওদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেয়েছ কি?"

"না। হাতেনাতে তো ধরা যায়নি। সন্দেহের উপর ধরা হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, সম্প্রতি যে ক'টা খুন হয়েছে তা ওরাই করেছে।"

"এ ধারণা হল কেন তোমার—"

"ওরা যেখানেই গেছে সেখানেই খুন হয়েছে। লালারাম, বিশ্বেশ্বর ঘোষ, রাঘব দালাল, জাফর আলী এদের প্রত্যেকের বাগান বাড়িতে ওই মেয়ে তিনটে নাচগানও করেছে—"

"ক'টা মেয়ে আছে?"

"তিনটে। মানে, তিনটেকে আমরা ধরেছি। কিন্তু শুনছি নাকি ওদের দল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। অদ্ভুত ওদের মোহিনী শক্তি, সার। জেলের ওয়ার্ডার-

গুলোকে সব বশ করে ফেলেছে। আমার মনে হয় বেশীদিন ওদের আটকে রাখা যাবে না, জেল থেকে ঠিক ওরা পালাবে। ওই ওয়ার্ডাররাই ওদের ছেড়ে দেবে। আজ সকালে দেখি সেলের ভিতর একটা মেয়ে গান গাইছে, আর ওয়ার্ডারগুলো বাইরে বসে তাল দিচ্ছে। আমার মনে হয় সনাতন উপায় অবলম্বন না করলে ওদের কাছ থেকে কিছুই বার করা যাবে না—"

সনাতন উপায়ের নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই ছিল, সুতরাং আমি কোন কারণেই কোন কয়েদীর উপর শারীরিক অত্যাচার করিতে দিতাম না।

"না, মারধোর কোরো না। সেটা আইন নয়।"

"কিন্তু এমনিতে ওরা কিছু বলতে চায় না। মেয়ে তিনটি খালি মুচকি মুচকি হাসে, আর ওদের দলপতি খাখা-বাবা বলেন, আমি কিছু বলব না। আমার মনে হয় ওই লোকটাই সমস্ত অর্গানিজেশনের ব্রেন। মেয়ে তিনটে প্রায়ই যেতো ওঁর কাছে।"

"খাখা-বাবা থাকেন কোথা? মুঙ্গেরেই?"

"না, মুঙ্গেরে আমরা ওঁকে ধরেছি, কিন্তু উনি মাত্র সাতদিন আগে সেখানে এসেছেন। মেয়ে তিনটেও ওঁর বাড়িতেই ছিল। তারা বলে, উনি নাকি ওষুধ দেন। যাই হোক, আমরা সবাইকে ধরে এনেছি। প্রমাণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই চারটে খুনের মূলেই ওরা আছে।"

"আচ্ছা, ওদের সঙ্গে আমিই কথা কইব। এইখানেই নিয়ে এস।"

একটু পরেই দারোগা আসিয়া খবর দিলেন, "ওদের এনেছি। পাশের ঘরে বসাব?"

"বসাও।"

আমি বিবাহ করি নাই, প্রকাণ্ড কোয়ার্টারে একাই থাকিতাম। ঘরের অভাব ছিল না। আমার আপিসও আমার কোয়ার্টারেরই একধারে ছিল।

একটা লোডেড্ রিভলভার পকেটে পুরিয়া পাশের ঘরে গেলাম। গিয়া কিন্তু চমকাইয়া উঠিলাম। খা-খা বাবা? এ যে ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়। মেয়ে তিনটিও অপরূপ, যেন তিনটি অপ্সরা। নির্নিমেষে খা-খা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। না, আমার ভুল হয় নাই। এ ছবি যে রোজ দেখি।

দারোগা সাহেবকে বলিলাম, "আমি একে একে এদের সঙ্গে কথা বলব। মেয়ে তিনজনকে অন্য ঘরে বসাও। তুমিও ওদের কাছেই থাক গিয়ে, এখানে কাউকে থাকতে হবে না।"

সকলে চলিয়া গেলে প্রশ্ন করিলাম, "আমাকে চিনতে পারছেন?"

খা-খা বাবা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কই না, আপনাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"আমি কিন্তু আপনাকে চিনেছি। আপনি খা-খা বাবা নন্, আপনি ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়।"

তাঁহার মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "না, আপনার ভুল হয়েছে! চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়। আমি অগ্নীশ্বর নই, আমি খা-খা বাবা।"

"এ রকম অদ্ভুত নাম নিয়েছেন কেন?"

"যে নাম নিয়েছি, সে নামের উপযুক্ত আমি নই। কিন্তু আপনারা রোগা ভীতু ছেলের নামও তো বীরেন্দ্র বা রুস্তম রাখেন। এইটেই রেওয়াজ এদেশে। যার অন্তরে বাইরে ময়লা ঠাসা তার নাম নির্মল, বিমল বা অমল। দিগ্বিজয়ী বীর চেংগীস্ খাঁর নাম ছিল খা-খা খাঁ। আমার বাবা বোধহয় ভেবেছিলেন, আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব তাই ও-নাম রেখেছিলেন।"

"আপনারা কি মুসলমান?"

"না, আমি ব্রাহ্মণ। ও খাঁ শুনে মুসলমান ভাবছেন বুঝি? চেংগীস্ খাঁও মুসলমান ছিলেন না। সেকালে যাযাবার নোম্যাড্‌দের যাঁরা দলপতি হতেন তাঁদের উপাধি হতো খাঁ। কিম্বা খান্। চেংগীস্ খাঁ নামটাও আসলে নাকি ঘেগিংস খাঁ—"

কথা শুনিয়া আমার আর সন্দেহ রহিল না। এ রকম কথা অগ্নীশ্বর ছাড়া আর কেহ বলিতে পারেন না।

বলিলাম, "চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয় তা জানি। কিন্তু অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে চিনতে পারব না, এতবড় ভুল আমার হতে পারে না।"

"আপনার এতবড় আত্মপ্রত্যয়ের হেতুটা কি—"

"তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর ছবি আমার শোবার ঘরে টাঙানো আছে।"

"প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন? কি রকম?"

"সব বলছি। আপনি অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় এ বিশ্বাস যদি আমার দৃঢ় না হতো তাহলে যা বলতে যাচ্ছি তা আপনাকে বলতাম না। কারণ একথা জানাজানি হলে আমার চাকরি যেতে পারে। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, তবু যেতে পারে। কারণ আমি যা করেছি তা প্রতারণা।"

অগ্নীশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে একটা কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। আমি তখন তাঁহাকে অকপটে সব খুলিয়া বলিলাম। শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে তাঁহার চোখের পাতায় কম্পন জাগিল, মুখে মৃদু হাসিও ফুটিল। কিন্তু সব শুনিবার পরও তিনি বলিলেন, "আপনি যার কথা বলছেন, আমি সে লোক নই।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা, আপনার আসল পরিচয় তাহলে জানতে পারি কি? আপনি কি করেন, কোথায় থাকেন, এই দলে কি করে এলেন, পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে যে সব চার্জ এনেছে সে সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে কি না—"

"আমি আমার সম্বন্ধে কিছুই বলব না। সত্য আপনিই বেরিয়ে পড়বে। এইটুকু বলতে পারি, যে মেয়ে তিনটিকে ধরে এনেছেন তারা আমার কন্যাস্থানীয়া।"

"ওদের নিয়ে আপনি বেদের দল গড়েছেন?"

"ধরুন গড়েছি। তাতেই বা ক্ষতি কি?"

"আপনার মতো লোক বেদের দল গড়েছেন একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।"

"কেন, বেদেরা কি হেয়? ওরাই তো সবচেয়ে বেশী স্বাধীন। ওদের কোন বন্ধন নেই। বন্ধনের যে দু'টো প্রধান শিকল 'কর্তব্য' আর 'সম্পত্তি' সে দুটো কথাই নেই ওদের অভিধানে। ওদের সঙ্গে যদি যোগ দিয়ে থাকি অন্যায়টা কি হয়েছে তাতে?"

"আপনাদের চলে কি করে?"

"ওই মেয়ে তিনটি নেচে গেয়ে অনেক টাকা রোজগার করে। ওদের গান শুনবেন?"

"না। কিন্তু আপনি যা বলছেন তা মনে নিচ্ছে না। আপনি যে ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনি যদি বেদের দল গড়েও থাকেন তাহলে তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। হয়তো সেটা ন্যায়সঙ্গত নয়। আপনি আমাকেও অন্যায়ভাবেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পিছনে একটা দেশভক্তির প্রেরণা ছিল। এর পিছনেও নিশ্চয়ই কিছু আছে একটা। সেইটে কি আমি জানতে চাই। বিশ্বাস করুন, আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। কিন্তু সত্যকথাটা আমি শুনতে চাই। যে অগ্নীশ্বরকে আমি মনের মন্দিরে দেবতার মতো সাজিয়ে রেখেছি তাকে এমনভাবে বিসর্জন দিতে পারব না।"

অগ্নীশ্বরের ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত হইল।

"দেবতার মতো সাজিয়ে রেখেছেন? সত্যি?"

"সত্যি। আপনার সত্য পরিচয়টা দিন।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া অগ্নীশ্বর বলিলেন, "একটা জিনিস যদি লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে হয়তো সত্যের কিছু আভাস পেতে পারবেন। যে চারটে লোক খুন হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই দেশের শত্রু, প্রত্যেকেই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার। লক্ষ লক্ষ গরীব লোককে বঞ্চিত করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে ওরা—"

"তাহলে কি—"

"হ্যাঁ, মনে করুন না তাই। আমি বাঙালী, বিদ্রোহ আমার মজ্জাগত। মনে করুন, দেশের শত্রু নিপাতের আমি অভিনব পন্থা বার করেছি। ধরুন আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বাঙালী একদিন ইংরেজের সঙ্গে লড়েছিল এইবার তার দুর্নীতির সঙ্গে লড়া উচিত। যদি দরকার হয় তার জন্য প্রাণ দিক—"

তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "আমি আমার শেষ জীবনে দেশকে শত্রুমুক্ত করবার এই উপায় অবলম্বন করেছি এই ভেবে যদি আপনি তৃপ্তি পান, তাহলে তাই ভাবুন—"

"আমরাও তো আইনের সাহায্যে ওই কাজই করছি। দুর্নীতি দমন আমাদের একটা প্রধান কাজ—"

"তা জানি। কিন্তু এটাও তো মিছে কথা নয় যে. সবাই আপনাদের জালে ধরা পড়ছে না। শুম্ভ-নিশুম্ভ, মহিষাসুর এরাও সাধারণ আইনের জালে ধরা পড়ে নি। তাদের ধ্বংস করবার জন্যে অম্বিকা চণ্ডীর দরকার হয়েছিল। মনে করুন, আধুনিক উপায়ে আমি তাই করছি। ওই বেদের মেয়েদের মধ্যেই অম্বিকা আর চণ্ডীর রূপ প্রত্যক্ষ করেছি আমি—"

"কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ. এই সব নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া কি আপনার সাজে?"

"ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আপনার পুরো ধারণা নেই তাহলে। নৃশংসতার ভয়ে ব্রাহ্মণেরা কোন কালে অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পিছ্‌পা হয় নি। পরশুরামকে কুঠার ধারণ করতে হয়েছিল. চাণক্যকে ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল নন্দবংশ ধ্বংস করবার জন্যে। এদেশে ব্রাহ্মণদের অধঃপতন হয়েছে বলেই এত দুর্দশা চতুর্দিকে। মনু পতিত ব্রাহ্মণদের অপাংক্তেয় করেছিলেন কিন্তু এরাই আজ আসর জাঁকিয়ে বসেছে সব জায়গায়। ধরুন, যদি আমি ভেবে থাকি যে আমাদের স্বাধীনতাকে অম্লান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এদের সরাতে হবে, তা করতে গিয়ে যদি দু'একটা ভালো লোকও মারা পড়ে তাতেও ক্ষতি নেই. ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশনের সময় ওরা রোব্‌সপেয়ার ড্যানটনের মতো লোককেও বলি দিয়েছিল।"

হঠাৎ অগ্নীশ্বর চুপ করিয়া গেলেন।

বলিলাম. "বলুন. শুন্‌তে খুব ভালো লাগছে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে ছেড়ে দেব—"

"দেখুন, জীবনে কখনও কারো কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিনি। আপনার কাছেও করছি না। আমাকে জেলে পুরে রাখলে বা ফাঁসি দিলে যদি আপনার চাকরির সুবিধা হয় তাহলে তাই করুন। ওই বেদের মেয়েদের সঙ্গে আমি নরকে যেতেও রাজি আছি। ওরা নরককেও স্বর্গ করে তুলবে। জিপ্‌সিদের ইতিহাস পড়েছেন? অনেকে বলেন, ওদের আদি নিবাস ছিল ভারতবর্ষ। আমার মনে হয়, ওরাই রামায়ণ মহাভারতের গন্ধর্ব। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রীসে। সেখান থেকে ওরা সারা ইয়োরোপে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি দেশে ওদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তা অবর্ণনীয়। কিন্তু তবু ওরা প্রত্যেক দেশেই টিকে আছে এখনও। শুধু টিকে নেই, নেচে গেয়ে মাত করে রেখেছে প্রত্যেক দেশকে। ওদের রঙ. ওদের রূপ. ওদের শিল্প, ওদের সঙ্গীতনৈপুণ্য আজও অলঙ্কার হয়ে আছে প্রত্যেক দেশের। এই অবহেলিত অবজ্ঞাত কিন্তু দুর্জয়-প্রাণরসে-ভরপুর শিল্পীর দলে যদি ভিড়েই থাকি তাহলে ক্ষতি কি—"

আমার মনে হইল, আসল অগ্নীশ্বরকে এইবার যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। দেখিলাম

তাঁহার চোখের দৃষ্টি হাসিতে ঝলমল করিতেছে। অনেক দিন হইতেই তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবার ইচ্ছা ছিল। উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আমার ভুল ভেঙেছে। আপনার কথায় অবিশ্বাস করেছিলাম বলে আমাকে ক্ষমা করুন।"

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন তিনি।

"একটা বক্তৃতার ধাক্কায় সব বদলে গেল! হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল অতবড় যুক্তির ইমারত? সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস হয়ে গেল, আমি ওই বেদে মেয়েগুলোর সাহায্যে লোক খুন করে বেড়াচ্ছি? উঃ, বক্তৃতার উপর কি ভক্তি, কি ভক্তি। একেবারে গদগদ হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললেন! হা হা হা হা—"

তাঁহার অট্টহাস্যে সমস্ত বাড়িটা যেন কাঁপিতে লাগিল। দারোগা সাহেব পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। সত্যই আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বলিলাম, "আপনার কথায় অবিশ্বাস করিবার শক্তি আমার নেই। আপনার সত্য পরিচয়টা দিন—"

"কি হবে সত্য পরিচয় জেনে? পৃথিবীতে ক'টা জিনিসের সত্য পরিচয় জানেন?"

"না, তবু বলুন।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিছুতেই যখন ছাড়বেন না, তখন শুনুন। আমি মশাই ডাক্তার। মানুষকে বাঁচানোই আমার কাজ, মারা নয়। দুরাত্মা, মহাত্মা, সতী-অসতী যে কেউ আমার কাছে অসুস্থ হয়ে আসবে তাকেই আমি সুস্থ করতে চেষ্টা করব। নেপোলিয়নের সেই গল্পটা মনে আছে? একবার এক যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন খুব বিব্রত হয়েছিলেন কতকগুলি মুমূর্ষু সৈন্য নিয়ে। তাদের খেতে দিতে হচ্ছে, অথচ তারা কোন কাজে লাগছে না। তখন তিনি আর্মি ডাক্তারকে ডেকে বললেন—'ওদের তুমি মেরে ফেল। কি লাভ ওদের বাঁচিয়ে রেখে।' ডাক্তার উত্তর দিয়েছিলেন—'আমার কাজ বাঁচানো, মারা নয়। আপনার হাতে অস্ত্র আছে, নিধন করাই আপনার কাজ, আপনিই মেরে ফেলুন না ওদের। আমি পারব না।' আমি সেই ডাক্তারের সগোত্র। এই হতভাগা দেশের রুগ্ন, খিটখিটে, বদমাইস, বেকারগুলোকে বাঁচিয়ে লাভ নেই জানি, কিন্তু তবু ওদের বাঁচাবারই চেষ্টা করি। ও ছাড়া আর কিছু পারি না, জানি না। ওই জিপ্‌সি মেয়েগুলো আমার রুগী। আমার খগেশ্বর নাম ওদের মুখ দিয়ে বেরোয় না বলে ওরা আমাকে খাগা-বাবা বলতো। সেটা ক্রমশ খা-খা-বাবা হয়ে গেছে। নামটার একটা ঐতিহাসিক মহিমা আছে বলে ও নাম আমি ত্যাগ করিনি। আমি এক জায়গায় থাকি না, নানা শহরে ঘুরে বেড়াই। ওই জিপ্‌সিগুলো কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়ে না। যেখানেই যাই খুঁজে বার করে আমাকে। ওদের নিজের চিকিৎসা ওরা নিজেরাই প্রায় করে নিজেদের ওষুধ দিয়ে। হালে পানি না পেলে আমার কাছে যাওয়া আসা করে বলে আপনার বুদ্ধিমান অফিসারটি আমাকেও ওদের সঙ্গে জড়িয়েছেন। ভক্তিটা হঠাৎ কমে গেল, নয়? চললুম গুড্‌বাই।"

পরে সত্যই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, খগেশ্বর মুখোপাধ্যায় ডাক্তারিই করেন। গরীবের ডাক্তার তিনি। দীন দরিদ্র অসহায় যাহারা, তাহাদেরই তিনি চিকিৎসা করেন। যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করেন। মহত্ত্ব আস্ফালন করিয়া কাহারও ফি ফেরৎ দেন না, জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু আদায়ও করেন না। সত্যই এক শহরে বেশী দিন থাকেন না। এক মাসের বেশী কোথাও না। সারা দেশময় তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। একবেলা খান, স্বপাক। পরনে শাদা থান, লংক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে চটি।

যে ভদ্রসমাজ হইতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, সেই ভদ্রসমাজ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি খগেশ্বর নামের আড়ালে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

এ অজ্ঞাতবাস হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করি নাই। কারণ, বুঝিয়াছি ইহাতে তিনি কষ্ট পাইবেন।

কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে জানি, তিনি খগেশ্বর নহেন, অগ্নীশ্বর। তিনি যেখানে যে নামেই থাকুন না কেন, তিনি পাবক, তিনি পবিত্র, তিনি উজ্জ্বল।

তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করি।

জলতরঙ্গ

উৎসর্গ

অনুজ ডাক্তার শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়
কল্যাণবরেষু

ভাগলপুর
২৩।১।৫৯

প্রথম পর্ব

গল্পের কথক শ্রীসাত্যকি রায়ের নিবেদন

এই কাহিনীটির সম্বন্ধে প্রথমেই একটি কথা আপনাদের বলতে চাই। এ কাহিনী কোনদিনই আমি লিখতাম না, এ লেখার যে বিশেষ কোন সার্থকতা আছে তাও আমি মনে করি না, অবশ্য সার্থকতা কথাটা আমি নিতান্ত স্থূল আধিভৌতিক অর্থেই ব্যবহার করছি, আমার ধারণা এ গল্প বাজারে বিক্রি হবে না। ধনী মাত্রেই পাষণ্ড এবং সুন্দরী যুবতী মাত্রেই বিপথে যাবার জন্যে উৎসুক এই যেখানে অধিকাংশ জনপ্রিয় গল্পের মূল সুর, সেখানে এ গল্প চালু করা শক্ত। তাছাড়া এটা গল্প নয়, সত্য ঘটনা। সত্য ঘটনার গায়ে রং না দিলে তা শিল্প হয়ে ওঠে না। কিন্তু শ্রীমতী বর্ণনা, যার জেদে আমি এই গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছি, নিছক সত্যের বাইরে এক পা-ও যাবার অধিকার দেয়নি আমাকে।

এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা অনেকে এখনও জীবিত। বিশেষ করে ভূষণ চক্রবর্তী বেশ প্রবলভাবেই জীবিত আছেন শুনেছি, এখনও ডাম্বেল মুগুর ভাঁজেন নিয়মিত রূপে। এই গল্পের মধ্যে তিনি তাঁর স্বরূপ আবিষ্কার করে যদি ক্ষেপে ওঠেন তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। সত্যের খাতিরে দু'চারজন তথাকথিত আর্ট-ক্রিটিক, একজন জ্যোতিষী, একজন কামার্ত ধনীর সত্য চরিত্রও এ কাহিনীতে আঁকতে হয়েছে। এঁরাও ইচ্ছে করলে আইনের সাহায্য নিয়ে আমাকে নাস্তানাবুদ করতে পারেন, কারণ টাকার জোর থাকলে এ যুগে একটা ছারপোকাও একটা হাতীকে ওরিএণ্টাল নাচ নাচাতে পারে ;—এ সবই শ্রীমতী বর্ণনাকে বলেছিলাম, কিন্তু তবু সে আমাকে সত্য ঘটনার গায়ে অসত্য কল্পনার রং লাগাবার অনুমতি দেয়নি। সে আমাকে প্রথমে যা করতে বলেছিল তা আরও বিপজ্জনক। সে আমাকে তার বাবার একটা প্রামাণিক জীবন-চরিতই লিখে দিতে অনুরোধ করেছিল। তার জন্যেই সমস্ত মাল-মসলা যোগাড় করে এনেছিল সে, 'সুখপুর-পত্রিকা'র ফাইল তার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি, কিন্তু সব দেখে-শুনে আমি পিছিয়ে গেলাম। বললাম স্বর্গীয় ব্রজেন বাঁড়ুজ্যে বেঁচে থাকলে যা করতে পারতেন সাত্যকি রায় তা পারবে না। আমি এই সব মাল-মসলার সাহায্যে বড়জোর একটা উপন্যাস-জাতীয় কিছু লিখে দিতে পারি, কিন্তু ইতিহাসসম্মত জীবন-চরিত লেখা আমার কর্ম নয়। আর জীবন-চরিত লিখে হবেই বা কি। চৈতন্য-চরিতামৃত বা বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিতই এ দেশের লোক পড়ে না। তোমার বাবা যদি নামজাদা সিনেমা স্টার হতেন তাহলে হয়তো কেউ কেউ পড়ত। একথা ব'লে আমি যেমন একদিকে জীবন-চরিত লেখার দায় থেকে অব্যাহতি পেলাম, অন্যদিকে তেমনি পা দিলাম আর এক ফাঁদে। নিজের মুখেই স্বীকার করে বসলাম এই মাল-মসলার সাহায্যে উপন্যাস-জাতীয় কিছু একটা লিখে দিতে পারব। বর্ণনা শান্তকণ্ঠে বললে, "তবে তাই লেখ। কিন্তু মিথ্যে রং চড়িয়ে একটা আজগুবি কাণ্ড করে ব'স না যেন। কল্পনার রাশ আলগা করলে তোমার তো আর জ্ঞান থাকে না।" কোনও যুবতী স্ত্রীলোককে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র, তার উপর সে যদি রূপসী এবং জেদি হয়, ঘাড় নেড়ে, অলক দুলিয়ে, মুচকি হেসে, ভ্রূভঙ্গী

করে নানা কৌশলে নিজের গোঁ বজায় রাখবার প্রয়াস পায়, তাহলে তাকে বোঝাবার চেষ্টা-রূপ নদী যে বিফলতার মরু-পথে হারিয়ে যাবেই তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তবু আমি চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, "তোমার বাবা আর জ্যাঠামশায়ের চরিত্র যদি হুবহু আঁকি তাহলে সেটাই অবিশ্বাস্য রকম আজগুবি হবে। কোলকাতার কাছেই এক পাড়াগাঁয়ে একজোড়া রোমশ ম্যামথ বাস করত, এ কথা বরং কেউ কেউ বিশ্বাস করতেও পারে, কিন্তু এ যুগেও তোমার বাবা আর জ্যাঠামশায়ের মতো লোক যে থাকতে পারেন এ কথা বিশ্বাসই করবে না কেউ। ভাববে আমি রূপকথা লিখেছি। বল তো কল্পনার সাহায্যে ও দুটি চরিত্রকে একটু স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করি।"

বর্ণনা বলল, "না, তা করতে হবে না তোমাকে। আমি চাই ওঁদের ঠিক স্বরূপটি আঁকা হোক। সেই জন্যেই জীবন-চরিত লিখতে বলেছিলাম। কিন্তু তোমার স্বভাবই হচ্ছে, আমি যে রাস্তায় যেতে বলব, ঠিক তার উল্টো রাস্তায় যাবে তুমি। আমি চাই লোকে জানুক, আমার বাবা জ্যাঠা কি রকম মানুষ ছিলেন। আমি যেমন তাঁদের ফোটো রেখেছি তেমনি তাঁদের চরিত্রের নিখুঁত বর্ণনাও রেখে যেতে চাই। অতি দূর ভবিষ্যতে আমার বংশধরেরা জানবে, কেমন ছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষরা। আমার বিশ্বাস জেনে তারা গর্ব অনুভব করবে।"

স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে এল বর্ণনার চোখের দৃষ্টি। বুঝলাম, ঠিক এই মুহূর্তে এর বিরুদ্ধে আর কিছু বলা সমীচীন নয়।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ বই কি তুমি ছাপাবে?"

"নিশ্চয়।"

"আমার কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে একটা। এ বই কোন প্রকাশক ছাপাতে রাজী হবে কি না সন্দেহ।"

"আমার বাবা জ্যাঠার কাহিনী জানবার পর তুমি ভাবলে কি করে যে আমি কোনও প্রকাশকের দ্বারস্থ হব? আমি তো তাঁদেরই মেয়ে। আমি এটা ছাপাব নিজের খরচে এবং বিতরণ করব বিনামূল্যে"—তারপর হঠাৎ একটু হেসে বলল—"অবশ্য তুমি যদি লিখে দিতে না চাও তাহলে আমি জোর করতে চাই না। অন্য লেখকের শরণাপন্ন হতে হবে আমাকে, আর আমার ভুলটাও ভেঙে যাবে তাহলে।"

"কি ভুল?"

"যে তোমার উপর আমার জোর করবার অধিকার আছে। একটা ভুল বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছি হয়তো—"

বর্ণনার পাতলা ঠোঁট দুটি ঘিরে যদিও হাসি চিকমিক করছিল, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি সহসা বিদ্যুৎ-বর্ষী হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম যুক্তি-টুক্তি বিসর্জন দিয়ে রাজী হতে হবে আমাকে।

"আমি লিখে দেব না, একথা তো একবারও বলিনি। তোমার জন্যে যা যা করেছি

তা তুমি জানো। এ বই বেরুলে বড় জোর আমার না হয় জেল হবে মাস কয়েক, তাতেও আমি পিছপা নই, সেটা খুব বড় একটা ট্র্যাজিডিও হবে না, কিন্তু মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি হবে বইখানার প্রচার যদি আইনের জোরে বন্ধ হয়ে যায়—"

"তা হবার সম্ভাবনা আছে না কি ?"

"খুব আছে। খারাপ লোককেও প্রকাশ্যভাবে খারাপ বললে সে তোমাকে মানহানির দায়ে ফেলতে পারে। আইন তার স্বপক্ষে—"

এ কথা শুনে বর্ণনা মুষড়ে গেল একটু। বরং এ অবস্থায় সাধারণত সে যা করে তাই করতে লাগল, বাঁ কানের উপরের চুলগুলো তিনটে আঙুল দিয়ে টানতে লাগল আস্তে আস্তে, আর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। নাকের সূক্ষ্ম ডগাটাও যেন কেঁপে উঠল দু'একবার। কষ্ট হতে লাগল তাকে দেখে।

"একটা কাজ করলে অবশ্য হতে পারে।"

"কি ?"

"নামগুলো সব যদি বদলে দেওয়া যায়। আমার বিশ্বাস তাহলে কেউ আর ধরতে পারবে না। দু'একটা অবান্তর ঘটনাও অবশ্য ঢোকাতে হবে ওর মধ্যে, যাতে ওদের মনে হয় যে গল্পটা সত্যিই কল্পনা-প্রসূত—"

মুখ গোঁজ করে বসে রইল বর্ণনা কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, "বেশ তাই কর তাহলে—"

সুতরাং এই গল্পের সমস্ত নামগুলিই কাল্পনিক, এমন কি বর্ণনার নামও বর্ণনা নয়, সুখপুরের নামও সুখপুর নয়। বলা বাহুল্য, আমার পরিচয়ও আমি যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রয়াস পেয়েছি। আমার নাম থেকেই সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়, কারণ মহাভারত-যুগের পর কোনও লোকই সম্ভবত নিজের ছেলের নাম সাত্যকি রাখেন নি, আমার বাবা তো একথা ভাবতেই পারতেন না। আর একটা কথাও বলা দরকার, এই বিশেষ কাহিনীর জগতেই যে আমি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছি তা নয়, বাইরের বাস্তব-জগতেও নিজেকে আমি প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেছি বরাবর। ভারী আনন্দ পেয়েছি এতে। অপরিচয়ের বোরখা ঢাকা দিলে জগতের যে রূপ দেখা যায়, স্বরূপে তা দেখা সম্ভব নয় মোটেই। চেনা লোক সর্বদাই আপনার কাছে একটা বিশেষ রূপ নিয়ে আসে, তার বিশেষ রকম হাসি, বিশেষ রকম কথাবার্তা, বিশেষ রকম ব্যবহার ছাড়া তার আর কিছুই আপনি দেখতে পান না! কিন্তু তার কাছে যদি অচেনা হয়ে যান তাহলে তার আর এক রূপ, সম্ভবত তার সত্য রূপই দেখতে পাবেন আপনি, আরব্য উপন্যাসের হারুণ-অল্‌-রশীদ যেমন পেতেন।

গল্পটি দুই পর্বে ভাগ করে আমি বলছি। প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কুড়ি বছর। বর্ণনার জন্মের সঙ্গে প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয়েছে বর্ণনার বয়স যখন কুড়ি বছর।

এক

একটা বিরাট বনস্পতিকে কেউ যদি তার আরণ্য পরিবেশ থেকে উপড়ে এনে একটা টবে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে তাহলে তা যেমন যুগপৎ হাস্যকর এবং করুণ হয়, শ্রীমতী বর্ণনা সুখপুর গ্রামের বনস্পতি মিশ্রকে কোলকাতা শহরের এক ভাড়াটে বাসায় এনে ঠিক তেমনি এক হাস্যকর এবং করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বসল। বনস্পতি আসতে চাননি, বর্ণনাও জানত এলে তাঁর কষ্ট হবে খুব, তবু তাঁকে আসতে হয়েছিল, না এসে উপায় ছিল না।

ব্যাপারটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে পূর্ব ইতিহাস জানতে হয়। বনস্পতির পিতা গৃহপতি মিশ্র সুখপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন একজন। গঙ্গার ধারে ধারে দুশ' বিঘে ধানের জমি ছিল তাঁর। যেবার কম ফলত, সেবারও বিঘে পিছু দশ মণ ধান পেতেন তিনি। সুতরাং লোকে যে তাঁর সংসারকে লক্ষ্মীর সংসার বলত, সেটা অত্যুক্তি নয়। অন্নবস্ত্রের চিন্তা ছিল না বলেই শখও ছিল তাঁর নানারকম। ফুলের বাগান, ফলের বাগান, খাওয়া-খাওয়ানো, গান-বাজনা এই সব নিয়েই জীবন কাটিয়েছিলেন তিনি। চন্দন গাছ, হিং গাছ, কমলালেবুর গাছ, আঙুর-লতা ছিল তাঁর বাগানে। শোনা যায় লবঙ্গ-লতা, এলা-লতা আর সোম-লতা চাষ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে অনেক অর্থ-ব্যয় করেছিলেন তিনি, কিন্তু সফলকাম হননি। বিলিতি ব্যাঞ্জো বাজনাটা শেখবার চেষ্টা করেছিলেন, বাজনাটা নতুন আমদানি হয়েছিল তখন এদেশে, কিন্তু গুরুর অভাবে সেটাকেও আয়ত্তে আনতে পারেননি ভাল করে। লেখাপড়ার শখও ছিল তাঁর। সেকালে যত রকম বাংলা বই বেরুত, সব কিনতেন তিনি। উর্দু বই, সংস্কৃত বইয়েরও ভাল সংগ্রহ ছিল তাঁর। তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল সংস্কৃত উদ্ভট-শ্লোকের প্রতি। অনেক শ্লোক কণ্ঠস্থও ছিল, প্রায়ই আওড়াতেন। আর একটা বিশেষত্বও তাঁর দেখা গিয়েছিল পরে। স্ত্রী-বিয়োগের পর মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। নানারকম গুজব উঠত এ নিয়ে প্রথম প্রথম। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল তিনি বেশি দূরে যান না। তাঁর বাড়ির কাছেই 'বুড়ীর জঙ্গল' ব'লে যে বনকরটা তিনি কিনেছিলেন সেইখানে নির্জন-বাস করেন গিয়ে। কিছুদিন পরে আবিষ্কৃত হল সেখানে একটি ছোট কুঁড়েঘর আছে, কুয়াও আছে একটি। বুড়ীর জঙ্গলের এই কুঁড়ে ঘরে স্বপাক আহার করে একা একা বাণপ্রস্থের মহড়া দিতেন তিনি সম্ভবত।

মোট কথা, খুব খামখেয়ালী এবং শৌখিন লোক ছিলেন তিনি। ধনী তো ছিলেনই। আর একটি গুণ ছিল তাঁর (অনেকে এটাকে দোষ বলেও গণ্য করত) সে যুগে যা অধিকাংশ লোকেরই ছিল না। চরিত্রবান লোক ছিলেন তিনি। একটি মাত্র বিবাহ করেছিলেন। প্রথম যৌবনেই স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল তবু আর বিবাহ করেননি।

দাম্পত্য-জীবনের বাইরে আর কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্পর্কও রাখেননি। যে যুগে একাধিক বিবাহ এবং একাধিক রক্ষিতা-পালনই আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল সে যুগে গৃহপতির এই একনিষ্ঠ আচরণ বিস্ময় উৎপাদন করেছিল অনেকের মনে। অনেকে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত। অনেকে বিদ্রূপও করত। সম্ভবত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর 'পাগলা গিরি' নাম দিয়েছিল এই জন্যেই। গৃহপতি নামটাকেই সংক্ষিপ্ত করে 'গিরি' করে নিয়েছিল তারা। পাগলামির আরও নানারকম পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি জীবনে। বাড়ির হাতায় কোনও গরু বা ছাগল ঢুকলে তাদের তিনি খোঁয়াড়ে তো দিতেনই না, তাড়িয়েও দিতেন না। বরং ভাল করে খাওয়াতেন তাদের। বলতেন, ওরা অতিথি, মানুষ নয় বলেই কি ওদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা উচিত? একবার গ্রামের এক গরীবলোকের বাড়িতে ভূতের উপদ্রব শুরু হল। গভীর রাত্রে তার বাড়ির চারিধারে পাঁঃ, পাঁঃ, পাঃ শব্দ শোনা যেতে লাগল। অনেক সন্ধান করেও কোনও মানুষ, পাখী বা জন্তু-জানোয়ার আবিষ্কার করা গেল না। তখন বাড়ির কর্তা খেতু গৃহপতির কাছে কেঁদে পড়ল এসে। গৃহপতির উপর কিছু দাবিও ছিল তার, কারণ গৃহপতির সহপাঠী ছিল সে পাঠশালায়। গৃহপতি গিয়ে খেতুর বাড়িতে রাত্রিবাস করলেন। পাঁঃ, পাঁঃ শব্দটা শুনলেন স্বকর্ণে। তারপর সকালে খেতুকে বললেন, "তোর ঠাকুরদার প্রেতাত্মা পায়েস খেতে চাইছেন। মনে নেই নিমন্ত্রণ খেতে খেতেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর? পুরো খাওয়াটা শেষ করতে পারেন নি, পায়েসটা বাকি ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষাটা আছে এখনও। ভাল করে পায়েস খাওয়া ওঁকে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" তার পরদিন নিজেই তিনি দু'মণ দুধের পায়েস তৈরি করিয়ে খাওয়ালেন সকলকে। খেতুর বাড়ির চারিদিকে ছোট ছোট খুরিতে করে একশ' খুরি পায়েস রেখে দেওয়া হল। তার পরদিন সকালে দেখা গেল একটি খুরিতেও পায়েস নেই, সব যেন কেউ চেটেপুটে খেয়েছে। এর পর থেকে শব্দটাও থেমে গেল।

গৃহপতির সম্বন্ধে এই ধরনের নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে।

গৃহপতির পত্নী রঙ্গাবতীও অসাধারণ মহিলা ছিলেন। গরীবের ঘরে জন্ম হয়েছিল তাঁর। গৃহপতির পিতা সুরপতি তাঁকে আবিষ্কার করেছিলেন এক গরীব যজমানের গৃহে। সুরপতি যজন-যাজন করতেন। যজন-যাজন করেই প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি সে যুগে। যে দু'শ বিঘে জমি গৃহপতির সংসারে পরে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিল তার অধিকাংশই সুরপতি পেয়েছিলেন ব্রহ্মত্র স্বরূপ। বড় বড় জমিদার এবং ধনীরা সুরপতির যজমান ছিলেন। সুলক্ষণা রঙ্গাবতীকে সুরপতি যখন আবিষ্কার করেছিলেন তখন তার বয়স ন'বছর। গৃহপতির বয়স তখন ষোল। গৃহপতি সুরপতির একমাত্র সন্তান ছিলেন, শৈশবে মাতৃহীনও হয়েছিলেন তিনি। তাই সুরপতি আর কালবিলম্ব না করে রঙ্গাবতীকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন। ভেবেছিলেন তাঁর গৃহে লক্ষ্মীর শূন্য আসন রঙ্গাবতীই সার্থকভাবে পূর্ণ করতে পারবে। তা তিনি পেয়েছিলেন,

সুরপতির আশা সফল হয়েছিল। খুব 'পয়' ছিল রঙ্গাবতীর। যে বছর তাঁর বিয়ে হয় সেই বছরই জমিতে এত ফসল ফলেছিল যে তা বিক্রি করে আরও পঞ্চাশ বিঘে জমি কিনতে পেরেছিলেন সুরপতি। গঙ্গার ধারের এই পঞ্চাশ বিঘে জমির নামই ছিল 'সোনা-ফলানি'। রঙ্গাবতী আসবার পর সুরপতির সংসারে ঐশ্বর্য যেন উথলে পড়েছিল। শেষ-জীবনে সুরপতি যজন-যাজন ছেড়ে দিয়েছিলেন। গৃহপতিকেও ও কাজে তিনি আর উৎসাহিত করেননি। বলতেন, খাঁটি ব্রাহ্মণ না হলে ওসব কাজ ঠিক মতো করা যায় না, আর যা ঠিক মতো করা যায় না তা করাও উচিত নয়। শেষ জীবনে চাষ-বাস নিয়েই থাকতেন তিনি।

গৃহপতিকে গৃহস্থাশ্রমে স্থাপন করে দুটি পৌত্রমুখ দেখে সুরপতি গঙ্গাতারে সজ্ঞানে হরিনাম করতে করতে যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তখন গৃহপতির বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, রঙ্গাবতী তখনও যৌবন-সীমা অতিক্রম করেননি। গৃহপতির বড় ছেলে বকু তখন বারো বছরের, ছোট ছেলে বনু দশ বছরের। এদের নামকরণ সুরপতিই করেছিলেন। বক্ বক্ করতো বলে তিনি বড় নাতির নাম দিয়েছিলেন বকু আর ভাল নাম বাচস্পতি। ছোট নাতিটি ছিল একটু বন্য স্বভাবের, তাই তার ডাক নাম দিয়েছিলেন বনু (মাঝে মাঝে বুনো বলেও ডাকতেন তাকে) আর ভাল নাম বনস্পতি। বনু যখন খুব ছেলেমানুষ তখনই এটা সবাই লক্ষ্য করেছিল যে সে বনে-জঙ্গলে ঘাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ানোটাই পছন্দ করে বেশি। গঙ্গার চরে চরে, গ্রামের বাগানে বাগানে, ঝোপে জঙ্গলে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াত সে। 'বুড়ীর জঙ্গল' বনকরটা যখন কেনা হল তখন প্রায়ই সেখানে চলে যেত। নদীর ধারে আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে বসে থাকতে অনেকে দেখেছে তাকে। বকুর স্বভাব ছিল উল্টো। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত আর প্রত্যেক বাড়ির খবর সংগ্রহ করে এনে সবিস্তারে বর্ণনা করত বাড়িতে। উত্তর জীবনে এরা যা হবে তা তাদের বাল্যকালেই আভাসিত হয়েছিল।

গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিল দু'জনে। গ্রামে মাইনর স্কুল ছিল একটি। সে স্কুল থেকে যখন তারা বেরুল তখন উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্যে তাদের শহরে আর গৃহপতি পাঠালেন না। বললেন, ওরা চাকরি তো করবে না, ডাক্তার উকিলও হবে না। শুধু শুধু মেস-বোর্ডিংয়ের কদন্ন খেয়ে শরীর খারাপ করার দরকার কি তাহলে। তার চেয়ে বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করুক। হিরণ্ময় শিরোমণির কাছে সংস্কৃত পড়ুক বরং কিছুদিন, তারপর বড় হয়ে নিজেদের বিষয়-আশয় দেখুক। রঙ্গাবতীও সায় দিলেন এতে। ছেলে দুটিকে ঘিরেই তাঁর সংসার, তারা চোখের আড়ালে চলে যাবে, কোথায় থাকবে, কি খাবে—এ অনিশ্চয়তার মধ্যে ছেলেদের পাঠাতে রাজী হলেন না তিনি। তাঁর মনে হল ছেলেরাই যদি বাইরে থাকে তাহলে সংসারে তিনি থাকবেন কি নিয়ে? এত দুধ, এত ঘি, তরিতরকারি এসব খাবে কে? বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসব কাদের নিয়ে করবেন?

সুতরাং বাচস্পতি এবং বনস্পতির বিলাতী উচ্চশিক্ষা লাভ করা হল না। তারা হিরণ্ময় শিরোমণির কাছে উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ পড়তে লাগল।

বছর দুই কাটল এইভাবে। বছর দুই পরে শিরোমণি মশায় তাঁর শিষ্যদের বললেন, তোমরা কিছু সংস্কৃত রচনা করে আমাকে দেখাও। রচনার বিষয় তোমরাই নির্বাচন কর।

বাচস্পতি লিখল—'ফাল্গুন মাসি পূর্ণিমা তিথৌ ভট্টাচার্যস্য ধুমসি নাম্নী গাভী একং বিচিত্রবর্ণং বৎসং প্রসবয়ামাস।'…বনস্পতি কিছুই লিখল না দু' একদিন। বলল, কি লিখব ভাবছি। শিরোমণি মশায় তাগাদা দিলেন আবার। তখন সপ্তাহখানেক পরে যা লিখল সে তা কেউ প্রত্যাশা করে নি। লিখল—'বিবিধরাগরঞ্জিতা সন্ধ্যা-গগন-পট-শোভা জাহ্নবী-তরঙ্গ-শীর্ষে অবর্ণনীয়-আলেখ্যং বিস্তারয়ামাস।' কালি দিয়ে লিখল না, হলুদ, চুন আর সিঁদুর দিয়ে লিখল, মনে হতে লাগল যেন সন্ধ্যার মেঘই অক্ষরের রূপ ধরেছে।

শিরোমণি মশায় প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। তিনি গৃহপতিকে বললেন, "তোমার দুটি ছেলেই ভাল, কিন্তু একরকম নয়। তোমার বড় ছেলেটির ঝোঁক দেখছি সংবাদ-সংগ্রহের দিকে। গ্রামের যাবতীয় সংবাদ ওর কাছে পাবে। আমার মনে হয় ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ওকে উৎসাহিত করা উচিত। এই সব গ্রন্থই ওকে পড়াতে হবে। আর তোমার ছোট ছেলেটির প্রবণতা শিল্পের দিকে। উৎসাহ দিলে চিত্রকর হতে পারবে। বড়র মতো ওরও সংবাদ-সংগ্রহ করার ঝোঁক আছে, কিন্তু সে সব সংবাদ সাধারণ মানুষের সংবাদ নয়, আলো বাতাস আকাশ অরণ্য এদের সংবাদ, সে সংবাদ ভাষায় ব্যক্ত হয় না, হয় বর্ণের ব্যঞ্জনায়। ওর বন্ধু কে জান? শীতল কুমোর আর হরি পোটো। ওর প্রতিভা স্ফুরিত হবে চিত্রকলায়—"

গৃহপতি যে এসব দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন তা মনে হয় না। তবে বাধাও দেন নি। ছেলে দুটি আপন আপন খেয়াল-খুশির স্রোতে নিজেদের নৌকা ভাসিয়ে বড় হচ্ছিল। রঞ্জাবতী এই ভেবে খুশি ছিলেন যে এ সব খেয়াল বদ খেয়াল নয়। উৎসাহ দিতেন তিনি তাদের। বাচস্পতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে নানারকম সংবাদ সংগ্রহ করে এনে একটি খাতায় লিখত। তারপর মা-কে পড়ে শোনাত সেগুলি। শুনে অবাক হয়ে যেতেন রঞ্জাবতী। গ্রামের মন্দির, গ্রামের পোড়ো ভিটে, সজনেপাড়ার রতনদীঘির পিছনে যে এত সব ইতিহাস ছিল তা কে জানত। অনেক পুরনো লোকের গল্পও যোগাড় করে আনত বাচস্পতি। যে সব গল্প লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় কখনও কিংবদন্তী রূপে, কখনও রূপকথার আকারে, সেই গল্পগুলিকে সংগ্রহ করে এনে সে লিপিবদ্ধ করত তার 'সুখপুর-পত্রিকায়'। তার খাতাখানার নাম সে দিয়েছিল 'সুখপুর-পত্রিকা'। অতি সাধারণ সর্বজনবিদিত খবরও থাকত তাতে। হারু গাঙ্গুলীর বিধবা কন্যার আত্মহত্যা, চৌধুরী মশায়ের ছেলের উপনয়ন, নাপিতপাড়ায় গোখরো

সাপের উৎপাত—এ ধরনের খবরও সুখপুর-পত্রিকায় লিখত সে অসঙ্কোচে। খবর যোগাড় করে আনা এবং সেটা পরিচ্ছন্ন করে খাতায় লেখা একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল তার। আর মা-ই ছিল তার একমাত্র শ্রোতা। শিরোমণি মশায়ও শুনতেন মাঝে মাঝে এবং সেগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করতে বলতেন। তা-ও করত বাচস্পতি আলাদা একটি খাতায়।

বনস্পতির প্রধান আড্ডা ছিল হরি পোটোর বাড়িতে। শীতল কুমোরের ওখানেও সে প্রায় যেত। তারা যে পদ্ধতিতে যে সব রং দিয়ে বরাবর পট বা মূর্তি করেছে তা শিখে নিতে বেশি সময় লাগেনি বনস্পতির। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি কিন্তু ভালো লাগত না তার। সে চাইত নতুন কিছু করতে। নিজে করবার চেষ্টাও করত। একবার একটা তক্তার উপর আঠা মাখিয়ে, সেই আঠার উপর বালি আর মাটির গুঁড়ো ছড়িয়ে এমন সুন্দর উই-ঢিবি এঁকেছিল সে, যে তাক লেগে গিয়েছিল হরি পোটোর। খড়ির গুঁড়োর সঙ্গে নীল, তিসির তেল আর তার্পিন দিয়ে কেষ্ট ঠাকুরও গড়েছিল সে চমৎকার। মায়ের একটা ছবিও এঁকেছিল অদ্ভুত ধরনের। কাছ থেকে দেখলে মনে হত খাবছা খাবছা কতকগুলো রং লাগানো রয়েছে বুঝি কেবল। সব রকম রংই ছিল ছবিটাতে, এমন কি কালো রং পর্যন্ত।

রঙ্গাবতী ছবিটা দেখে বললেন, "ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া রং লাগিয়ে এ কি করেছিস তুই—"

"দূর থেকে দেখ। বারান্দার ওই দিকে চলে যাও একেবারে—" দূর থেকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন রঙ্গাবতী। চমৎকার রামধনু রঙের শাড়ি পরে পান সাজছেন তিনি নিজেই। মাথাটি হেঁট করে হাসছেনও মুচকি মুচকি। ঠোঁট দুটি টুকটুক করছে, কুচকুচ করছে মাথার চুল, আর ঝলমল করছে শাড়িখানা। হাতের সবুজ পানটা মনে হচ্ছে যেন পান্না। দেখে গৃহপতিও খুশি হলেন খুব। কিছুদিন পরে আর এক কাণ্ড করলে বনু। শিরোমণি মশায়ের একখানা ছবি এঁকে ফেললে কাঠের উপর, আর সেটা বাটালি দিয়ে কেটে এমন করলে যে দেখলে ঠিক মনে হয় জীবন্ত শিরোমণি মশায় বুঝি বসে আছেন। মাথার সামনে টাক, শুক-চঞ্চু নাসা, মুখে মৃদু হাসি, কানে খড়কে গোঁজা, অবিকল শিরোমণি মশায়।

বনস্পতি কালে যে একজন উঁচুদরের শিল্পী হবে সকলেরই মনে এ ধারণা দৃঢ় হল। তা দৃঢ়তর হল যখন সে গৃহপতি আর রঙ্গাবতীর দুটি বড় বড় মূর্তি তৈরি করে ফেললে সিমেণ্ট দিয়ে। গঙ্গার ধারে তাদের যে বাগানটা ছিল সেই বাগানে দুটি প্রকাণ্ড ছত্রের তলায় মূর্তি দুটি যখন স্থাপিত হল তখন মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। এই খবরটা লিপিবদ্ধও হয়েছিল বনুর 'সুখপুর-পত্রিকা'য়। সংবাদটি সে লিখেছিল যে ভাষায় তা-ও রীতিমত পত্রিকার ভাষাই।

"নবীন শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্র কর্তৃক নির্মিত তাহার পিতা-মাতার সিমেণ্ট-মূর্তি সুখপুর গ্রামস্থ সৈকত কাননে মহাসমারোহে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমান বনস্পতির

পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গৃহপতি মিশ্র এবং জননী শ্রীযুক্তা রঙ্গাবতী দেবী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমানকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে একটি বিরাট ভোজেরও আয়োজন হইয়াছিল। সুখপুর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভুরি-ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া শ্রীমানের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা রঙ্গাবতী দেবী স্বহস্তে পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া এবং স্বহস্তে তাহা সকলকে পরিবেশন করিয়া মাতৃস্নেহের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুখপুরের অধিবাসীবৃন্দ সহজে বিস্মৃত হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

'সৈকত-কানন' গৃহপতিরই গঙ্গার ধারের বাগানটার নাম। এইখানেই নানারকম শৌখীন গাছ পুঁতেছিলেন তিনি। একটা বেশ বড় বাড়িও ছিল সৈকত-কাননে।

এরপর গৃহপতির গৃহে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা অসাধারণ কিছু নয়। বকু আর বঙ্কু যথানিয়মে বড় হয়েছে, তাদের বিবাহও দিয়েছেন গৃহপতি খুব ধুমধাম করে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে তীর্থ পর্যটন করে এসেছেন, গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, দান-ধ্যান করেছেন, তারপর যথানিয়মে গঙ্গাতীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন একে একে। রঙ্গাবতী আগে, গৃহপতি তার বছরখানেক পরে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে গৃহপতি আর একটা কাজ করেছিলেন, সেটাকেও অসাধারণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, অন্তত তাঁর পক্ষে এটা অসাধারণ। তিনি ছেলে দুটিকে ডেকে উপদেশ দিয়েছিলেন কিছু, যা তিনি ইতিপূর্বে আর কখনও দেননি তাদের।

বলেছিলেন, "দেখ, আমার এবার যাওয়ার সময় হল। তাই আজ তোমাদের ডেকেছি কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য। আমি জানি উপদেশ দিলে কেউ শোনে না, তাই এর আগে কখনও তোমাদের উপদেশ দিই নি। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হল সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় আমার ঐহিক সম্পত্তি যা কিছু আছে তা যেমন তোমাদের দিয়ে যাব, আমার ঐহিক অভিজ্ঞতাটাও তেমনি দিয়ে যাওয়া উচিত। অভিজ্ঞতায় অভিনবত্ব কিছু নেই, আমাদের দেশের প্রাচীন কথাই আবার বলছি। কোনও কারণে স্বধর্ম ত্যাগ কোরো না। করলে কষ্ট পাবে। আর আত্মসম্মানকে রক্ষা করবে যখের ধনের মতো। ওটা যদি কোনও কারণে বিকিয়ে দাও তাহলে নিজের চোখেই নিজেকে হীন বলে মনে হবে। তার চেয়ে বড় কষ্ট আর নেই। সাধারণত অর্থাভাবে পড়ে লোকে এসব করে। ভগবানের কৃপায় যা রেখে যাচ্ছি তাতে সেরকম অভাব তোমাদের হওয়ার কথা নয়। এর বেশি আর বলবার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আর একটা কথাও মনে হচ্ছে সেটাও বলে যাই। তোমাদের ছেলে-মেয়ে দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হল না, তারা যখন আসবে তাদের আর সাবেক চালে মানুষ কোরো না—তোমাদের যেমন করেছি। কালের গতি বদলেছে, সমাজের চেহারাও বদলে যাচ্ছে, পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে হলে নিজেদেরও বদলাতে হবে। তাদের কোলকাতায় রেখে আধুনিক শিক্ষা দিও। সে শিক্ষা না পেলে তারা ঠিক মানিয়ে চলতে পারবে না সকলের সঙ্গে।"

দুই

বাচস্পতির বিয়ে হয়েছিল এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে। রঙ্গাবতীই পছন্দ করেছিলেন মেয়েটিকে। মেয়ের নামটাও বদলে দিয়েছিলেন তিনি। মেয়ের ভাল নাম ছিল অসীমাসুন্দরী, আর ডাক নাম ছিল সিমু। তিনি ভাল নামটাকে সীমন্তিনী করে দিয়েছিলেন। সীমন্তিনীর রূপ গুণ দুই-ই ছিল। যেদিন সে বুঝল যে গৃহপতির গৃহের বড় বধূ হতে হবে তাকে, সেদিন থেকেই এর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল সে। প্রস্তুতির অধিকাংশটাই অবশ্য হয়েছিল নেপথ্য মানসলোকে। বাইরে একটা জিনিস দেখা গিয়াছিল শুধু, খুব মন দিয়ে সে হাতের লেখা মক্‌শ করতে আরম্ভ করেছে। সে শুনেছিল বাচস্পতি লেখা-পড়া ভালবাসে, রোজ নিজে সুখপুর-পত্রিকা নামে একখানা বই লেখে। তখনই সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সে-ও বিয়ে হবার পর স্বামীকে সাহায্য করবে এ বিষয়ে। পাঠশালার পণ্ডিত হরু ঠাকুরের কাছে বসে রোজ মন দিয়ে হাতের লেখা লিখত। মুক্তোর মতো হাতের লেখা হয়েছিল তার। পরবর্তী জীবনে সিমুর নাম আবার বদলে দিয়েছিল বাচস্পতি। 'ছাপাখানা' বলে ডাকত তাকে। এই 'ছাপাখানা' না থাকলে 'সুখপুর-পত্রিকা' অচল হয়ে যেত। আর তাহলে বাচস্পতিও তার জীবনের অবলম্বন হারিয়ে ফেলত। সীমন্তিনীর কোনও ছেলেপিলে হয়নি, 'সুখপুর-পত্রিকা' তারও জীবনে অপত্যের স্থান অধিকার করেছিল। তাকেই সে সারাজীবন লালন করেছে মাতৃস্নেহে। বাড়িতে অবশ্য পরে সন্তান-সন্ততির অভাব হয়নি। সিমুর দাদা হিমুর সমস্ত পরিবারই এসে আশ্রয় নিয়েছিল বাচস্পতির সংসারে। প্রথম প্রথম সিমুকেই সব ভার পোয়াতে হয়েছিল তাদের। হিমুর স্ত্রী সত্যবতী পৌরাণিক যুগের সত্যবতীর মতোই স্থির-যৌবনা ছিলেন। তাঁকে দেখলে মনে হত না যে তিনি পাঁচটি সন্তানের জননী, বরং মনে হত তাঁর বয়স কুড়ির নীচেই।

বনস্পতির বিয়ে হয় কোলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বনস্পতির স্ত্রী সরস্বতী রূপের জোরেই এসেছিলেন এ সংসারে। যে ঘটক বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন তিনি জোর গলায় বলেছিলেন—আপনার ছেলে শিল্পী, মানে সৃষ্টিকর্তা। তার জন্যে সত্যিই সরস্বতীর খোঁজ এনেছি আমি। এ তল্লাটে ওরকম মেয়ে আর দ্বিতীয় নেই, দেখে আসুন, সত্যিই কুন্দেন্দুবরণা। গৃহপতি দেখতে গিয়েছিলেন এবং দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে একেবারে আশীর্বাদ করে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। আশীর্বাদ করবার মাসখানেক পরই বিয়ের শাঁখ বেজে উঠেছিল বাড়িতে।

বিয়ের পর বনস্পতি মেতে উঠেছিল বউকে নিয়ে। অবশ্য উন্মাদনাটা সীমাবদ্ধ ছিল তার মানসলোকেই, কারণ সে যুগে বউ নিয়ে বাইরে বাড়াবাড়ি করবার উপায় ছিল না।

আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গেই বলে দেওয়া উচিত, তা না হলে আধুনিক যুগের পাঠক-পাঠিকারা হয়তো 'বাড়াবাড়ি' কথাটার ভুল অর্থ করতে পারেন। বিয়ের সময় সরস্বতীর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। বনস্পতির শিল্পী মনই মেতে উঠেছিল এই কুমারী কিশোরীকে নিয়ে। তার যে মন আকাশের অনন্ত রূপে অভিভূত হত, অরণ্যের নিত্য নব শোভাকে বর্ণের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করত, গঙ্গার তীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও যা ক্লান্ত হত না কখনও, তার সেই শিল্পী-মানস-শতদলেই এসে সমারূঢ়া হল রূপসী সরস্বতী। সে সরস্বতীর হাতে যে অদৃশ্য বর্ণের বীণায় অসংখ্য ছবির সুর বাজত তা সাধারণ লোকের শ্রুতিগোচর বা নয়নগোচর হত না। তা বনস্পতিকেই সম্মোহিত করত কেবল অনাস্বাদিত-পূর্ব রসে। ছবির পর ছবি এঁকে যেতে লাগল সে। নানারকমের ছবি, নানারকমের রং। নিজেই সে তৈরি করত নানারকমের রং। হলুদ, শিউলি ফুলের বোঁটা, লোহা, সুরকি-গুঁড়ো, তুঁত, হিরাকস, ফটকিরি প্রভৃতি নানা জিনিস মিলিয়ে মিশিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত রং সৃষ্টি করত সে, আর তাই নিয়ে মেতে থাকত দিনরাত। রঙের এই রাসায়নিক ক্রীড়ায় সব সময় যে সফল হত তা নয়, প্রায়ই বিফল হত, কিন্তু দমত না কখনও, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে মেতে উঠত আবার। বাজারের প্রচলিত রং, রঙের বাক্স, তুলি এ সবই ছিল তার প্রচুর, কিন্তু সে আনন্দ পেত নিজের তৈরি রঙে ছবি এঁকে।

সরস্বতীর অনেক ছবি এঁকেছিল সে। কিন্তু একটি সরস্বতীও প্রচলিত সরস্বতীর মতো হয় নি। কুচকুচে কালো পটভূমিকায় দুলছে একটি ধবধবে সাদা পপি ফুল লম্বা সবুজ বৃন্তের উপর—নীচে নাম লেখা সরস্বতী। একদল শ্বেতহংস খেলা করছে পদ্মবনে, হাঁসগুলো মনে হচ্ছে পদ্মের মতন আর পদ্মগুলোই যেন হাঁস, একটি আধ-ফোটা পদ্ম চেয়ে আছে আকাশের দিকে—নীচে নাম লেখা সরস্বতী। কৃষ্ণমেঘের স্তর ভেদ করে চাঁদ উঠেছে পূর্ণিমার—নীচে নাম লেখা সরস্বতী। এক ঝাঁক অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে সবুজ লতাটিকে আচ্ছন্ন করে—নীচে নাম লেখা নীল সরস্বতী। বিরাট বাঘের থাবার নীচে পড়ে আছে রক্তাক্ত হরিণ ঘাড় মটকে—নীচে নাম লেখা রক্ত সরস্বতী। কত রকমের সরস্বতী যে এঁকেছিল সে তার আর ইয়ত্তা নেই। সৈকত-কাননে বড় হল-ঘর ছিল একটা, সেইখানেই খিল বন্ধ করে অধিকাংশ সময় থাকত সে। নিজেকে নিয়েই থাকত। রত্নাবতী যতদিন বেঁচেছিলেন জোর করে ধরে আনতেন তাকে নাওয়া-খাওয়ার জন্য। না ডাকলে আসত না। একবার ডাকলেও আসত না, অনেকবার ডাকতে হত।

আর একটা জিনিসও হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছিল দুই ভায়েরই। আগেই বলেছি গৃহপতি সবরকম বাংলা বই কিনতেন। দৈনিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক সব রকম সাময়িক পত্রিকারও গ্রাহক ছিলেন তিনি। সুতরাং দুজনেরই

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল ঘনিষ্টভাবে। এর ফলে তুজনের মনেই যে প্রতি-ক্রিয়া হয়েছিল তা-ও স্বাভাবিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা একটু অদ্ভুত। লেখক এবং চিত্রকরদের বাইরের জগতে আত্মপ্রকাশ করবার যে স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে তা বাচস্পতি বনস্পতি তুজনেরই ছিল। তুজনেই তাদের রচনা গোপনে গোপনে পাঠিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের হাটে, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকদের দপ্তরে, কিন্তু পাত্তা পায়নি সেখানে। অনেকদিন কোনও উত্তরই আসেনি। সঙ্গে টিকিট দেওয়া ছিল, ঠিকানা-লেখা খাম দেওয়া ছিল, তবু আসেনি। অনেকবার তাগাদা দেবার পর অমনোনীত হয়ে ফেরত এসেছিল বনস্পতির আঁকা ছবি একখানা। কিন্তু যে অবস্থায় এসেছিল তা দেখলে যে কোন শিল্পীরই বুক ফেটে যাবে। মোড়া, দোমড়ানো, ময়লা—শুদ্ধ ভাষায় ধর্ষিত এবং মর্ষিত হয়ে ফিরেছিল ছবিখানা। কোথাও কোথাও রংও উঠে গিয়েছিল। ছবিখানার দিকে চেয়ে চোখে জল এসে পড়েছিল বনস্পতির। এর কিছুদিন পরে সে হঠাৎ একদিন চমকে গেল তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে। সেখানে তার চোখে পড়ল মেঝেতে একটা খাম পড়ে আছে, তারই নাম-ঠিকানা লেখা খাম, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তার নাম ঠিকানা কেটে লাল কালিতে অপরের ঠিকানা লেখা রয়েছে তাতে! খামটা কুড়িয়ে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলে সে। তারপর তার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করল, এ খাম এখানে এল কি করে? তিনিও বলতে পারলেন না কিছু, তারপর একটু ভেবে বললেন, কাল হোরমিলার কোম্পানির একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনিই ফেলে গেছেন সম্ভবত। খামের ভিতর কোন চিঠি ছিল না।

এই ঘটনার পর বনস্পতি তার ছবি আর কোথাও পাঠায়নি।

বাচস্পতির অভিজ্ঞতা আরও তিক্ত। সাতটি সাময়িক পত্রিকায় সে সুখপুর গ্রামের নানা বিবরণ পাঠিয়েছিল, কিন্তু কোথাও তা প্রকাশিত হয়নি। সাতটি পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে সকলেই যে অভদ্র ছিলেন তা নয়, তিনজন চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করা যাবে না। ভারী দমে গিয়েছিল বাচস্পতি। বিমর্ষ বাচস্পতিকে সিমুই সান্ত্বনা দিয়েছিল।

বলেছিল, "ওরা তোমার লেখার মানেই বুঝতে পারেনি সম্ভবত। শুনেছি বড়লোকের আকাট মুখ্যু ছেলেরা নাকি ওই সব কাগজ চালায়। ওরা তোমার লেখার মর্ম বুঝতে পারে কখনও? শুধু শুধু পয়সা খরচ করে ওই বেনাবনে আর মুক্তো ছড়াতে যেও না তুমি।"

সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা যে সবাই আকাট মুখ্যু বড়লোকের ছেলে এ অত্যুক্তি অবশ্য বাচস্পতি হজম করতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিমু যে যুক্তিটা দিলে তা তার মনে লাগল।

সিমু বললে, "তাছাড়া আমাদের গ্রামের খবর, আমাদের পাড়ার লোকের খবর

আমাদের যত ভালো লাগবে বাইরের লোকের তত লাগবে কেন। বাইরের লোকের কাছে এসব ছড়াবার দরকারই বা কি। এতদিন যেমন ঘরের লোকেদের জন্তে লিখছিলে তেমনি লেখ না। খাতায় না লিখে খবরের কাগজের মতো বড় বড় কাগজেই লেখ। ঠাকুরপো সুন্দর করে বর্ডার দেবে রং দিয়ে, আর আমি খুব ভালো করে টুকে দেব। শুনেছি আজকাল একরকম যন্ত্রও বেরিয়েছে তা দিয়ে অনেকগুলো কপি করা যায়, একবারের বেশি লিখতে হয় না। আমাদের গাঁয়ের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা ওই যন্ত্রে কোশ্চেন ছাপতেন দেখেছি। খোঁজ কর না কত দাম ওই যন্ত্রের। তাতে ছেপে ছেপে 'সুখপুর-পত্রিকা' তাহলে আত্মীয়-স্বজনদেরও পাঠান যাবে।"

সিমুর এ কথাগুলো বেশ লেগেছিল বাচস্পতির।

কিন্তু যতদিন গৃহপতি এবং রঙ্গাবতী বেঁচেছিলেন ততদিন দু'ভায়ের খেয়াল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি। সব একান্নবর্তী পরিবারে যেমন হয়, নগদ টাকা থাকে কর্তার দখলে। তিনি সকলের ভরণ-পোষণ করেন, অনেক সময় ছেলেদের কিছু হাত-খরচও দেন, বনস্পতির ছবি-আঁকার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম গৃহপতি কিনে দিয়েছিলেন, কিন্তু খেয়াল-খুশিমতো টাকা খরচ করবার সুযোগ সে পায়নি। বাচস্পতি সাইক্লোস্টাইলও কিনেছিল গৃহপতির মৃত্যুর পরে।

গৃহপতির মৃত্যুর পরে আর একটা ঘটনাও ঘটেছিল যাতে ওদের পারিবারিক আবহাওয়ার সুরটা বদলে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। সর্বস্বান্ত হয়ে বাচস্পতির শ্যালক হেমন্তকুমার ওরফে হিমু এসে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিল ওদের বাড়িতে। হেমন্তকুমারের পরিবারটাই পরবর্তী কালে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল এদের জীবনে। তাই এ লোকটির পরিচয় একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার।

তিন

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় খুব গুণী লোক ছিলেন। তাঁকে বিবিধ জ্ঞানের আকর বললেও অত্যুক্তি হবে না। এঁর পিতা বসন্তকুমার রায় হেডপণ্ডিত ছিলেন গ্রামের স্কুলে। যদিও তিনি বাংলা ভাষায় বেশ বিদ্বান ছিলেন, সংস্কৃত জানতেন, ইতিহাস-ভূগোল-অঙ্কশাস্ত্রেও বেশ দখল ছিল তার, কিন্তু তবু তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল তিনি বিলিতি উচ্চশিক্ষা পাননি। সেই আক্ষেপটা তিনি মেটাতে চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র হেমন্তকুমারকে কোলকাতার স্কুলে পাঠিয়ে। ছেলে বোর্ডিংয়ে থাকত, তিনি মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন। ছেলে লিখত, 'স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বাইরের বই না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। স্কুলের লাইব্রেরিতে অনেক ভাল বই নেই, আপনি যদি কিছু বেশি টাকা পাঠান—।' বসন্তকুমার পাঠাতেন। ছেলে লিখল, 'কোলকাতার

নানা জায়গায় ভালো ভালো বক্তৃতা হয়, আমি সেগুলি প্রায়ই শুনতে যাই, শুনে অনেক নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু ট্রামে যাতায়াত করতে বড় বেশি সময় নষ্ট হয়ে যায়, একটা যদি সাইকেল থাকত সুবিধা হত। আমি সাইকেল চড়তে শিখেছি। মাত্র একশ' টাকায় সাইকেল পাওয়া যাচ্ছে আজকাল—।' বসন্তকুমার ধার করে ছেলেকে একশ' টাকা পাঠালেন। শোনা যায় দুহিতারাই নাকি দোহন করে, কিন্তু পুত্র হেমন্তকুমার দোহন ব্যাপারে কান কেটে দিয়েছিল তাদের। পুত্রের বিষয়ে অন্ধ ছিলেন বসন্তকুমার। তার কোন আবদার অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। এমন কি সে যখন উপর্যুপরি দু'বার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করল, তখনও তাঁর অন্ধত্ব ঘুচল না। তিনি ছেলেকে এক স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আর এক স্কুলে দিতে লাগলেন। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আলোচনা করতে লাগলেন, 'আজকালকার মাস্টাররা মোটেই ভাল করে পড়ায় না। হিমুর মতো ছেলেকেও যখন তারা পাশ করাতে পারছে না তখন তারা কি দরের মাস্টার বোঝ!' বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নানা জাতের স্কুলে আর বোর্ডিংয়ে ঘুরে ঘুরে বছর কয়েক কাটল হেমন্তকুমারের। সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারলে না যদিও, কিন্তু শিখল নানা বিদ্যা। এক যোগাশ্রমে গিয়ে সে জানল প্রাণায়াম আর কুম্ভকের রহস্য, নানারকম আসনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিখল কি করে কাপড় কাচতে হয়, বাসন মাজতে হয়, রান্না করতে হয়, কি সুরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে মন্ত্র সফল হয়। টিকি রেখে গেরুয়াও পরেছিল দিনকতক, কারণ ওটাই সে আশ্রমের 'ইউনিফর্ম' ছিল। কিন্তু বেশিদিন মন টিকল না সেখানে। এর পর সে চলে এল শান্তিনিকেতনে। বেশ কিছুদিন ছিল সেখানে। নাচ, গান, অভিনয় আর চিত্রকলার জ্ঞানরসে যখন তার চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে গেল তখন আর সেখানে থাকা প্রয়োজন মনে করল না সে। ছুটল গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমের দিকে। সেখানে যদিও তেমন কল্‌কে পায়নি কিন্তু হালও ছাড়েনি সে। কোন এক গুজরাটী পরিবারের সঙ্গে ভাব করে সবরমতীর আশেপাশে কাটিয়েছিল কিছুদিন। গান্ধীতত্ত্বের নির্যাসটুকু হৃদয়ঙ্গম করে তবে ফিরেছিল। তারপর যে স্কুলে গিয়ে জুটল সেখানকার কর্তৃপক্ষদের ধারণা লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা, বক্সিং, কুস্তি, জুজুৎসু এইসব না শিখলে দেশোদ্ধার হবে না। সেখানে গিয়ে এই সবও শিখল সে কিছুদিন। কিন্তু ওসব বিষয়ে তাদৃশ পটুতা ছিল না তার, ভালও লাগত না খুব। এই সময়েই উদীয়মান একজন সাহিত্যিকের সঙ্গলাভ ঘটেছিল তার কপালে কিছুদিন। দু' একজন রাজনৈতিক নেতার তল্পিবাহক হবার সুযোগও পেয়েছিল সে। ম্যাট্রিকুলেশন সে পাশ করতে পারেনি তা ঠিক, কিন্তু কৃষ্টি-লাভ করেছিল সে, এবং ওরই জোরে হয়তো সে শেষ পর্যন্ত একটা কিছু হয়েও পড়ত। আজকাল সুযোগও তো হয়েছে নানারকম। কোনও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের নেতা, কিংবা কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রচার-সচিব, কিংবা কোনও বড় লোকের প্রাইভেট সেক্রেটারি, নিদেনপক্ষে কোনও উঠতি কাগজের সম্পাদক হওয়ার

মতো যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু থাকলে কি হবে, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারল না, বিধি বাম হলেন। হঠাৎ মারা গেলেন বসন্তকুমার। মণি-অর্ডার যোগে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেল। কপর্দকহীন হয়ে বিদেশে থাকা চলে না। বিদেশে থেকে চাকরির চেষ্টা করতে গেলেও টাকা চাই, আর হেমন্তকুমার যে সব চাকরির যোগ্য, তা দরখাস্ত করলে মেলে না, তার জন্যে চাই ভড়ং, বিনা পয়সায় ভড়ং হয় না। জনৈক ঘুন-ধরা রাজকুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়তো হতে পারত সে। "এদেশের পারিষদ আর বিদেশের বাট্লার এই দুই জীবের সমন্বয়ে হয়েছে আধুনিক প্রাইভেট সেক্রেটারি" —একথা হেমন্তকুমারই বলেছিল—"ও কাজ যদি পাই চুটিয়ে করতে পারব।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা পেলই না বেচারা। ভড়ং জাহির করে রাজকুমারের প্রাইভেট পছন্দ-কামরায় ঢোকবার মতো অর্থই জোটাতে পারল না সে।

পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সে যখন বাড়ি এল তখন তাকে দেখে ভড়কে গেল সবাই। পায়ে ছেঁড়া চটি, গায়ে জাপানী কিমোনো। যাঁরা কিমোনো দেখেননি তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে কিমোনো একটা আলখাল্লার মতো জিনিস, গলা থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত ঢাকা থাকে, হাত দুটো অত্যন্ত ঢিলে, আমাদের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবির হাতের পিতামহ, তার ভিতর আবার পকেটও থাকে। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এমন অদ্ভুত পোশাক পরে সে কেন এল তা অনেকে জানতে চাইল। হেমন্তকুমার কিছু না বলে কিমোনোটি খুলে একবার দেখিয়ে দিল শুধু। সকলে সবিস্ময়ে দেখল, তার গায়ে গেঞ্জি পর্যন্ত নেই, পরনে শুধু একটি কৌপীন। হেমন্ত গম্ভীর ভাবে বলল—"বাবা টাকা পাঠাবেন এই আশায় ধার করেছিলাম। আমার যা কিছু ছিল, বই-বাক্স, কাপড়-জামা এমন কি গেঞ্জি পর্যন্ত বিক্রি করে সেই ধার শোধ করতে হল। আমার এক আর্টিস্ট বন্ধু এই কিমোনোটা না দিলে উলঙ্গ হয়ে আসতে হত।"

বসন্তকুমারও ধার করেছিলেন অনেক। হেমন্তকুমারকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্যেই ধার করতে হয়েছিল তাঁকে। কিছু পৈত্রিক জমি ছিল তাঁর। সেই জমি বাঁধা দিয়েই অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তিনি। আশা ছিল হেমন্তকুমার উচ্চশিক্ষা পেয়ে উঁচুদরের চাকরি পাবে, তখন সেই ধার শোধ করবে।

শ্রাদ্ধাদি চুকে যাবার পর দেখা গেল মাত্র দু'বিঘে ধানের জমি অবশিষ্ট আছে, আর নেপথ্যে অপেক্ষা করে আছে স্থিরযৌবনা সত্যবতী, তার মায়ের সইয়ের মেয়ে। সই বেঁচে নেই, তাঁর মৃত্যুশয্যায় হেমন্তর মা তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে সত্যবতীকে তিনি পুত্রবধূ করে ঘরে আনবেন।

কালাশৌচ চুকে যাবার পর সত্যবতীর পাণিপীড়ন করে হেমন্তকুমারকে মাতৃসত্য পালন করতে হল। যে ব্যাপারটা সাধারণত সে যুগে ঘটত না, তা-ও ঘটল। বিয়ের একবছর পরেই সত্যবতী তাঁর প্রথম পুত্র প্রসব করলেন। এর কারণ ছিল। বাগদত্তা

সত্যবতীকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল হেমন্তকুমারের জন্ত। বিয়ের সময়ই তিনি চতুর্দশী ছিলেন।

হেমন্তকুমার কিন্তু ঘাবড়াল না। দু'বিঘে জমি ছাড়াও তার ভদ্রাসনের পাশে জমি ছিল কয়েক কাঠা। তাতে সে মহা উৎসাহে তরিতরকারি লাগাতে লাগল, ছোটখাটো বাগানই করে ফেললে একটা। সে যখন এক মিশনারি স্কুলে ছিল তখন সেই স্কুলের এক সাহেব মিশনারির কাছে 'কিচেন-গার্ডেন' সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছিল। এই বিদ্যেটা সে কাজে লাগিয়ে ফেললে। সাহেবের কাছ থেকে আহরিত আর একটি বিদ্যেও সে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু খুব বেশি সুবিধা হয়নি তাতে। সাহেব বলেছিলেন, "তোমাদের এমন ফসল ফলাবার চেষ্টা করা উচিত যার বাজার দর বেশি। একমণ ধান বা আলু না ফলিয়ে যদি একমণ কালো জিরে বা মেথি বা ঐরকম কোন দামী মশলা ফলাতে পারো, তাহলে অনেক বেশি লাভ করতে পারবে।" হেমন্ত তার দু'বিঘে জমিতে মেথি ফলাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আশানুরূপ মেথি হয়নি। এর একটি ফল হয়েছিল শুধু, ও অঞ্চলে 'মেথি-হেমন্ত' ব'লে প্রসিদ্ধি হয়েছিল তার। বেশি জমি থাকলে হয়তো অর্থাগমও হত কিন্তু তা হল না। ওই দু'বিঘে জমি ভাগে বিলি করে দিয়ে সে মণ চারেক চালের ব্যবস্থা করে ফেলল। উপার্জনের আর একটা পথও পেয়ে গেল সে। যদিও সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারেনি, তবু স্কুলের কর্তৃপক্ষ বসন্তপণ্ডিতের ছেলেকে স্কুলেই কাজ দিয়ে দিলেন একটা। ড্রিল-মাস্টার করে বাহাল করে নিলেন তাকে। একটা স্কুলে থাকতে বয়েজ স্কাউটে ভরতি হয়েছিল সে, সুতরাং ড্রিলের ব্যাপারটা জানত কিছু কিছু। এর থেকে গোটা তিরিশেক টাকা পেত। সব মিলিয়ে সংসারটা তার চলে যাচ্ছিল কোনক্রমে। বছর দুই পরে হঠাৎ ভাগ্য-দেবতা প্রসন্ন হলেন তার উপর। গৃহপতির গৃহিণী রঞ্জাবতীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল ঘটনাচক্রে।

হেমন্তদের বাড়ির কাছেই যে গঙ্গা ঘাটটি, তার নাম উমা-ঘাট। জনশ্রুতি, বহু পূর্বে, কলিকালের গোড়ার দিকে স্বয়ং উমা নাকি এই ঘাটে এসে স্নান করেছিলেন। ঘাটের কাছেই যে বহুপ্রাচীন শিবমন্দিরটি আছে স্নানান্তে উমা নাকি সেই মন্দিরে প্রবেশ করে শিবার্চনাও করেছিলেন। কাছাকাছি যতগুলি ঘাট ছিল তার মধ্যে এই ঘাটটির মাহাত্ম্য ছিল সবচেয়ে বেশি। অনেক দূর থেকে লোকে এই ঘাটে স্নান করতে আসত, বিশেষ করে শিবরাত্রির সময়।

রঞ্জাবতী সেবার খুব ভোরে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল শিবের শেষ প্রহরের পুজোটা তিনি ওই প্রাচীন শিব-মন্দিরেই করবেন। পালকি যখন শিবমন্দিরের কাছে থামল তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। ঘাটে লোকজন কেউ নেই, মন্দিরে কিন্তু আলো জলছে দেখলেন, কপাটটি ভেজানো আছে। রঞ্জাবতী পালকি থেকে নেবে মন্দিরের

দ্বারে এসে দাঁড়ালেন; কপাটটি একটু খুলে দেখলেন ভিতরে কে আছে। দেখেই চমকে উঠলেন তিনি। তাঁর মনে হল স্বয়ং উমাই বসে শিব-পূজা করছে। ফুটফুটে সুন্দরী একটি কিশোরী, হাত জোড় করে চোখ বুজে বসে আছে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে। সিমুকে সেই প্রথম দেখলেন তিনি, আর দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তখনই অবশ্য তাকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা করেননি তিনি। কিন্তু তারপর পরিচয় হল, জানলেন যে ওরা পালটি ঘর, ভাল বংশ, খুব গরীব বলেই বিয়ে হয়নি এতদিন। কিছুদিন পরে ঘটকী পাঠালেন তিনি ওদের বাড়িতে। যথা-বিধি সব হল। বিয়ে হল কিন্তু বছরখানেক পরে। নানা কারণে দেরি হয়ে গেল। সামনে মলমাস ছিল, তারপর পড়ল গৃহপতির পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ, রঙ্গাবতীর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় মারা গেলেন, তাইতে গেল কিছুদিন, তারপর পড়ল জ্যৈষ্ঠ মাস, বড় ছেলের বিয়ে ও-মাসে হয় না। কিন্তু কথা যখন পাকা হয়ে গেছে, বিশেষ করে রঙ্গাবতীর যখন পছন্দ হয়েছে মেয়েটিকে, তখন আটকাল না কিছু, বিয়ে হয়ে গেল। রঙ্গাবতীর পছন্দ হয়েছিল সিমুকে, কিন্তু গৃহপতির পছন্দ হল হিমুকে। মেথি-হেমন্তর কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন, ছোকরার নতুন-কিছু-করবার ঝোঁকটা ভালো লেগেছিল তাঁর। নিজেও তো তিনি একদিন লবঙ্গ-লতা সোমলতার চাষ করবার জন্যে অনেক অর্থব্যয় করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল মেথি-হেমন্তর সঙ্গে আলাপ করবেন একদিন গিয়ে। বিবাহের সূত্রে আলাপ হল এবং আলাপ করে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। লোককে মুগ্ধ করবার শক্তি হেমন্তকুমারের ছিল।

প্রথমেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি তার বড় ছেলের নাম শুনে। ওই একটি মাত্রই ছেলে হয়েছিল তখন তার। ছেলের সে নাম রেখেছিল 'লাঠি'। ছেলের এমন অদ্ভুত নাম কেন রাখা হল গৃহপতি হেসে জানতে চেয়েছিলেন।

"দেখুন",—উত্তরে বলেছিল হেমন্তকুমার—"জীবনযুদ্ধের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র থাকা চাই তো। বড় লোকেদের অস্ত্র টাকা, আর আমাদের অস্ত্র আমাদের ছেলেমেয়েরা। ওরাই নিজেদের শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে, ঠেকিয়ে রাখবে দারিদ্র্য।"

গৃহপতি তর্ক করেননি, মুগ্ধ হয়েছিলেন।

হেমন্তকুমারও তার মত পরিবর্তন করেনি। লাঠি, সোঁটা, বল্লম, কিরিচ, বন্দুক এই সব নাম রেখেছিল ছেলেমেয়েদের। এমন কি দরকার হলে শেষের দিকে ইঁট, পাটকেল, ঝাড়ু, চড়, ঘুঁষি এসব নাম ব্যবহার করতেও আপত্তি ছিল না তার। বম্, এটম্ বম্ প্রভৃতি আধুনিক মারণাস্ত্রের প্রতি তার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। সে বলত, ওসব বড়লোকদের অস্ত্র, গরীবের নয়। শেষের দিকে কিন্তু নাম সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়েছিল তাকে, কারণ প্রতি বছরই তার হয় একটি ছেলে না হয় একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। তার ছেলেমেয়েদের বয়সের ক্রম-অনুসারে সাজিয়ে একসারে দাঁড় করিয়ে দিলে একটি সমকোণী ত্রিভুজের আকার ধারণ করত, আর ত্রিভুজটি ছিল ক্রম-বর্ধমান।

গৃহপতিদের সঙ্গে হেমন্তকুমারের যখন আত্মীয়তা হল তখন তার যে ক'টি ছেলেমেয়ে

ছিল তারা খুব প্রিয় হয়ে উঠল বনস্পতির। এদের নিয়ে মেতে উঠল তার শিল্পী মন। তাদের নানা ভঙ্গীতে বসিয়ে ছবি আঁকতে লাগল সে। শিল্পী মাত্রেরই ফাই-ফরমাশ করবার মতো লোক হাতের কাছে থাকলে সুবিধা হয়। বিবাহের পূর্বে শীতল কুমোর আর হরি পোটোর বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ কাজ করত। বিয়ের কিছুকাল পরে সরস্বতীও করেছিল। কিন্তু হিমু পাকাপাকিভাবে এদের পরিবারভুক্ত হবার আগেই লাঠি-সোঁটা-বল্লম-বন্দুকরা বনস্পতির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ছেলেগুলি যেমন ফুটফুটে, তেমনি চটপটে আর তেমনি বাধ্য। দু'তিনজন সর্বদাই বনস্পতির কাছে থাকত।

সুতরাং তিনদিক দিয়ে হেমন্তকুমারের পরিবারবর্গ অধিকার বিস্তার করল গৃহপতির পরিবারে। হেমন্ত অধিকার করল গৃহপতির হৃদয়, সিমু রঞ্জাবতীর আর ছেলেমেয়েরা বনস্পতির।

হেমন্তকুমার কোলকাতায় যে চাকরিটা পায়নি, সুখপুরে এসে বস্তুত সেই চাকরিটাই পেয়ে গেল। কার্যত গৃহপতির প্রাইভেট সেক্রেটারিই হয়ে উঠল সে। বাড়ির মালিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি হলে যে ধরনের সবিনয় সবজান্তা-ভাব আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় প্রকট রাখা উচিত, আসল মনোভাবটি চেপে রেখে অথচ সোজা-সুজি মিথ্যাভাষণ না করে গেলে কথার সহায়তায় যেভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে যেতে হয় তার শিল্পায়িত কৌশল ভালভাবেই আয়ত্ত ছিল হেমন্তকুমারের। উদারহৃদয় খামখেয়ালী গৃহপতির মনের নৌকাটির হালে এতদিন বসেছিলেন অন্তঃ-পুরচারিণী রঞ্জাবতী। তাঁর পাশে কখন যে হেমন্তকুমার এসে বসল তা কেউ টেরও পেল না। নাই পেয়ে হেমন্তকুমারের অন্তর্নিহিত রূপটি কিন্তু প্রকাশ পেতে লাগল ক্রমশ। যদিও সাংসারিক ব্যাপারে বা পারিবারিক আলোচনায় সে যখন ফোড়ন দিত তখন তা তত অসঙ্গত মনে হত না কারও, কারণ সে সিমুর দাদা, আর সে ফোড়নটাও এমনভাবে দিত যে উগ্র ঝাঁজ লাগত না কারো নাকে। এই ফোড়ন-দেওয়ার মধ্যেই যে পরশ্রী-কাতরতার ছোঁয়াচ-লাগা একটা মুরুব্বিয়ানা প্রচ্ছন্ন থাকত তা অত লক্ষ্যও করেনি কেউ। বরং সে যে প্রত্যেক ব্যাপারের আর একটা দিক দেখতে পায় এজন্য প্রশংসাই করতেন তাকে গৃহপতি। ক্রমশ ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে হিমুকেই সংসারতরণীর কর্ণধার বলে স্বীকার করে নিল সবাই। একটু গোল বেধেছিল অবশ্য বাচস্পতিকে নিয়ে। গৃহপতি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি কখনও, কিন্তু হেমন্তর মনে হল এটা অন্যায় হচ্ছে। এমন অবাধ স্বাধীনতা অনিষ্টকর। তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছিল সে। বলা বাহুল্য, হিতৈষীর মতোই—(ছদ্মবেশে কথাটা বড্ড বেশি রূঢ় হবে বলে সেটা আর ব্যবহার করলাম না) হিতৈষীর মতোই এ চেষ্টা করেছিল।

গৃহপতিকে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিল, "বকু বমু দুজনেই জিনিআস, কিন্তু এই ঘোর পাড়াগাঁয়ে থাকলে ওরা মাটি হয়ে যাবে। ভালো গাছের পক্ষে যেমন উপযুক্ত

পরিবেশ আর সার দরকার, জিনিআসের পক্ষেও তেমনি। বিলেতে কিংবা কন্টিনেন্টে যদি ওদের পাঠাতে পারতেন দেখতেন কি কাণ্ড করত ওরা।"

গৃহপতি শুনে হাসিমুখে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর বললেন, "দেখ, লোক দেখিয়ে পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে কিছু একটা কাণ্ড করা, আর গ্রামে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা দুটো আলাদা জিনিস। ওরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক এইটেই আমরা চেয়েছি। ওদের মা তো ওদের ছেড়ে থাকতে পারে না, তাই ওদের কোলকাতাতেও পাঠাইনি—"

এর একটা জুৎসই জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিল হেমন্তকুমার।

"গুরুদেবের সেই বিখ্যাত কবিতাটা নিশ্চয় পড়েছেন আপনি। যার শেষ দু'লাইন হচ্ছে—

সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে', মানুষ করনি।"

"পড়েছি। কিন্তু কবিতা কবিতাই, যখন পড়া যায় বেশ লাগে। কিন্তু পরের লেখা কবিতা অনুসারে নিজের জীবনকে গড়তে গেলে অনেক সময় মুশকিলে পড়তে হয়। আর কবিরা তো এক কথা বলেন না সব সময়। ওই রবীন্দ্রনাথই তাঁর অনেক লেখায় আবার অন্য কথাও বলেছেন। লোলুপ হয়ে বিদেশের ঐশ্বর্যের দ্বারে মাথা লুটিয়ে দিতে আত্মসম্মানে বেধেছে তাঁর।

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি-বচন
তাই আমাদের দিয়ো
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।"

হেমন্ত তর্ক করতে পারত, কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল গৃহপতি রবীন্দ্রনাথের খানিকটা কবিতা আবৃত্তি করে গেল শুনে। এটা সে প্রত্যাশা করেনি। তার ধারণা ছিল সুখপুর গ্রামে অন্তত রবীন্দ্রকাব্যের সে-ই অদ্বিতীয় সমঝদার। হঠাৎ সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "হার মানছি আপনার কাছে। আপনি যে এত পড়েছেন, এত ভেবেছেন এসব বিষয়ে, তা আমার ধারণা ছিল না।" শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে পড়বার ভান করল হেমন্ত। এতে গৃহপতির মনের দরবারে তার আসন আরও পাকা হয়ে গেল।

এখানে আর একটি কথাও কিন্তু বলা দরকার। গৃহপতির কাছে যদিও সে বাচস্পতি বনস্পতিকে 'জিনিআস' বলে উল্লেখ করত, কিন্তু আসলে মনে মনে তার ধারণা ছিল, দুটি ছেলেই গবেট, বাপের পয়সার শ্রাদ্ধ করছে ঘরে বসে। বাইরের দুনিয়ার কোনও খবর রাখে না, লেখাপড়ারও ধার ধারে না বিশেষ, কেবল বড়লোকের ছেলে বলে এই

নিস্তরু-পাদপ দেশে এরণ্ড দুটি দ্রুম ব'লে চালিয়ে যাচ্ছে নিজেদের। তার অনুকম্পা হত, মনে হত বেচারারা অন্ধ, কি যে করে যাচ্ছে তা তারা জানে না। একজন সুরকি-গুঁড়ো আর হলুদ-গুঁড়ো দিয়ে ছবি আঁকছে, আর একজন সেই খবরটা ঘটা করে হাতের লেখা 'সুখপুর-পত্রিকা'য় লেখাচ্ছে নিজের বউকে দিয়ে। আর তাই নিয়ে বাহবা বাহবা করছে সবাই।

বাচস্পতি-বনস্পতিকেও সে এর হাস্যকর দিকটার সম্বন্ধে সচেতন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয়নি।

"দেখ হিমুদা"—বাচস্পতি বলেছিল—"উপনিষদে ব্রহ্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে এক ঋষি বলেছেন, 'অণোরনীয়ান মহতো মহীয়ান'। যে ব্রহ্ম বিরাটের মধ্যে মহীয়ান, তিনি অণুর মধ্যেও সমান সার্থক। ব্রহ্ম যদি অণুর মধ্যে সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন তাহলে আমরা এই এত বড় গাঁয়ের মধ্যে নিজেদের সার্থক করতে পারব না? কি বলছ তুমি! আর এই বা তোমার কেমন কথা যে ছাপা না হলে লেখার কোন দাম নেই। আমাদের দেশের বড় বড় বই যখন লেখা হয়েছিল তখন দেশে ছাপাখানা ছিল না। কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' ছাপা মাসিকপত্রে বার করেননি বলে কি কোনও ক্ষতি হয়েছে?"

"কেন ক্ষতি হয়নি জানো? ছাপাখানা তখন ছিল না বটে, কিন্তু বিক্রমাদিত্য ছিল যে। বিক্রমাদিত্যের সভা না থাকলে কালিদাসকে চিনত কে?"

"না চিনলেও ক্ষতি ছিল না। কালিদাস তাঁর মেঘদূতের রসিক সমঝদার পেয়ে যেতেনই।"

"আর একটা কথা ভেবে দেখেছ? ছাপাখানা না থাকাতে কত কালিদাস হারিয়ে গেছে—"

"তাতেই বা ক্ষতি কি। হারিয়ে যাওয়াটাই তো পৃথিবীর নিয়ম। এখন তো ছাপাখানার অভাব নেই, কিন্তু সব কালিদাসরাই কি জায়গা পাচ্ছে? আর যারা পাচ্ছে তারা সবাই কি কালিদাস? সত্যিকার প্রতিভার কদর যে রসিক সমাজে সেখানে আসল কালিদাসরা জায়গা পাবেই, তা তাদের লেখা ছাপা হোক বা নাই হোক। বৃহত্তর বেরসিক সমাজে হয়তো তারা পাত্তা পাবে না"—তারপর একটু থেমে বলেছিল—"কে জানে হয়তো তাও পাবে শেষ পর্যন্ত। আমি এ বেশ আছি।"

"এই পাড়াগাঁয়ে তোমার ও হাতের লেখা পত্রিকার মর্যাদা কে দেবে বল। আমার মতে জর্নালিজ্‌ম্ যদি করতে চাও, কোলকাতায় যাও। সেখানে অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, নিখিলদা আছেন, নরেশদা আছেন, তাঁরা তোমায় সাহায্য করবেন। এখানে এই গরুর পালের মধ্যে—"

কথাটা হেমন্ত শেষ করল হাত দুটো উলটে এবং মুরুব্বিয়ানাসূচক হাসি হেসে।

বাচস্পতির কান দুটো লাল হয়ে উঠল এ কথা শুনে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে।

তারপর বলল, "নিজের গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে অতটা হীন ধারণা আমার নেই। আমার 'সুখপুর-পত্রিকা' পড়ে তারা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি ধন্য হয়ে যাব। তাছাড়া, আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন, সুখপুর-পত্রিকার প্রধান পাঠিকা আমার মা। তাঁকে খুশি করবার জন্যেই ছেলেবেলায় ওটা আরম্ভ করেছিলাম। যা তাঁর ভাল লেগেছে তা কোলকাতার কোন সবজান্তা সহকারী সম্পাদকের বা আধুনিক ময়ূরপুচ্ছধারী বায়সদের ভাল লাগল কিনা এ জানবার আমার উৎসাহ নেই—"

হেমন্তকুমার অনুভব করল বাচস্পতি যে রকম উঁচু পরদায় সুর বেঁধেছে তার চেয়ে বেশী চড়াতে গেলে তার ছিঁড়ে যাবে, অর্থাৎ মনোমালিন্য হবে। সেটা করা সমীচীন মনে হল না তার। সুতরাং চেপে গেল।

দিনকয়েক পরে বনস্পতির কাছে আবার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল সে। শুনে বনস্পতি চটে গেল, যা বললে তা অপমানসূচকই, কিন্তু হেমন্ত সেটা গায়ে মাখেনি।

বনস্পতি বলল, "আপনি তো আমাদের কোলকাতা পাঠাতে চাইছেন। কিন্তু নিজে তো এতদিন কোলকাতাতেই ছিলেন, কি কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে এসেছেন বলুন।"

সাধারণ লোক হলে এ কথায় চটে উঠত, কিন্তু হেমন্তকুমার চটল না। তার মনে বরং অনুকম্পা জাগল এই কূপমণ্ডুকের সংকীর্ণ দৃষ্টি-পরিধি দেখে। কিন্তু মুখের কথায় বা চোখের দৃষ্টিতে তার মনোভাব প্রতিফলিত হল না।

সে হেসে বললে, "আমার সঙ্গে কি তোমাদের তুলনা হয়। তোমরা হলে 'জিনিআস', যাকে বাংলা ভাষায় বলে 'প্রতিভা'। সোনা বা হীরে যদি ওস্তাদ স্যাকরার হাতে পড়ে তবেই তা বহুমূল্য অলঙ্কারে পরিণত হতে পারে, লোহার ভাগ্যে তা কি সম্ভব ? আমি লোহা, বড় জোর পিতল—"

বনস্পতি আর কোন উত্তর দেয়নি। সে নূতন একটা সরস্বতী আঁকতে ব্যস্ত ছিল। কেবল দু'খানি পায়ের পাতা আর সেই পাতা দুটি ঘিরে অপরূপ একটি শাড়ির পাড়, মনে হচ্ছিল নক্ষত্র-খচিত এক টুকরো আকাশ যেন ওই পায়ের পাতা দু'টি ঘিরে ধন্য হয়েছে।

হেমন্তকুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর মুচকি হেসে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত তাকে উপলব্ধি করতেই হল এই আধ-পাগলা ছেলে দুটিকে সে যা ভেবেছিল তা তারা নয়। বোলচাল দিয়ে ওদের বিচলিত করা যাবে না, পুকুরে চুনোপুঁটি ছাড়া মাছ নেই এ কথা শতবার বললেও ওরা এই এঁদো পুকুর-পাড় ছেড়ে উঠবে না, দামী ছিপ ফেলে ঠায় বসে থাকবে ফাৎনার দিকে চেয়ে। থাক্— । সে যতক্ষণ আছে যতটা পারে ওদের উপকারের চেষ্টাই করে যাবে। হাজার হোক, আত্মীয় তো!

চার

গৃহপতি আর রঙ্গাবতীর মৃত্যুর পর যখন বাচস্পতি আর বনস্পতি বিষয়ের মালিক হল তখন একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠল সকলের কাছে, যে আইনত ওরা মালিক বটে, কিন্তু কার্যত মালিক সাবু মিত্তির (ভাল নাম, সর্বেশ্বর মিত্র) আর ভূষণ চক্রবর্তী। সাবু মিত্তির গৃহপতির প্রাক্তন কর্মচারী ধনেশ্বর মিত্তিরের একমাত্র ছেলে। ধনেশ্বরের মৃত্যুর পর বাচস্পতি তাকে বাহাল করেছিল বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করবার জন্য। বিষয়ের সমস্ত 'ঝক্কি'টা সাবুকেই পোয়াতে হত। বাচস্পতি ব্যস্ত থাকত 'সুখপুর-পত্রিকা' নিয়ে। সীমন্তিনীরও অন্য দিকে মন দেবার অবসর ছিল না। তাকে সকালে, বিকালে, কখনও-কখনও রাত্রেও 'সুখপুর-পত্রিকা' লিখতে হত। শ্রুতি-লিখনের মতো হত ব্যাপারটা। বাচস্পতি বলে যেত, সীমন্তিনী লিখত। সুখপুর-পত্রিকায় থাকত প্রধানত সুখপুরের এবং আশেপাশের গ্রামের খবর। আর থাকত একটি প্রবন্ধ, কখনও কখনও কবিতা। খবর সংগ্রহের জন্য নিজস্ব সংবাদদাতা ছিল একদল। গ্রামেরই কিশোর ছিল কয়েকটি, ভিন্ন গ্রামেরও ছিল। খবর পিছু এক আনা করে পেত তারা। খবর এনে প্রথমে দিতে হত সাবু মিত্তিরকে। সেই প্রথমে খবর বাছাই করত। সে বাছাই করে যে খবরগুলি বাচস্পতিকে দিত, সেগুলি বাচস্পতি আবার যাচাই করে দেখত অকুস্থলে গিয়ে। এজন্য ছোট একটি টাট্টু ঘোড়া রেখেছিল সে। খবর সত্য হলে সেটি প্রকাশিত হত সুখপুর-পত্রিকায়। সুখপুর-পত্রিকার দু'কপি সীমন্তিনী খুব ভাল করে নিজের হাতে লিখত, আর খান পঞ্চাশেক ছাপা হত সাইক্লোস্টাইলে। ছাপা হবার পর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরিত হত সেগুলি। হাতে হাতে কিছু কিছু পাঠিয়ে দেওয়া হত, কিছু বা ডাকযোগে। সাবু মিত্তির হিসাব করে বলেছিল এর জন্য মাসে প্রায় পঁচিশ টাকা খরচ হয়। কম খরচেও হতে পারত, কিন্তু বাচস্পতি দামী কাগজ ব্যবহার করত বলে তা আর হত না। সাবু এ বিষয়ে বাচস্পতির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে ধমক খেয়েছিল।

"দেখ, যদি তামাক-বিড়ি খেতাম, তাহলেও এ খরচটা হত। তখন কি তুই বলতে আসতিস অম্বুরী তামাক না খেয়ে দা-কাটা তামাক খান তাহলে খরচ কম হবে ? এটা একটা দরকারী জিনিস, এর জন্যে ন্যায্য খরচ করতে হবে বইকি। ওতে কুণ্ঠিত হলে কি চলে ?"

গৃহপতি-রঙ্গাবতী যে বাড়িতে বাস করতেন সেই বাড়িটাই বাচস্পতি নিয়েছিল। বনস্পতি থাকত সৈকত-কাননে, সেখানে যে বাড়িখানা ছিল তাতেই কুলিয়ে গিয়েছিল তার। হেমন্তকুমার যখন সপরিবারে এসে এদের আশ্রয়-প্রার্থী হল তখন একটু সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, কোথায় ওদের থাকতে দেওয়া যায় এই নিয়ে। স্থানাভাবের প্রশ্ন নয়,

কারণ গৃহপতির বাড়ি প্রকাণ্ড বাড়ি, তাতে স্থানাভাব হত না, কিন্তু সীমন্তিনীই রাজী হলেন না।

বললেন, "এখানে পত্রিকার কাজকর্ম নিয়ে তুমি সর্বদাই ব্যস্ত থাক। ছেলেমেয়ের হট্টগোল হয়তো ভাল লাগবে না তোমার, মনে মনে বিরক্ত হবে, অথচ মুখে কিছু বলতে পারবে না। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোলমাল করবেই। তাছাড়া আমাকেও থাকতে হবে তোমাকে নিয়ে, ওদের দেখাশোনাও করতে পারব না। বৌদি হয়তো এতে কিছু মনে করতে পারেন। তার চেয়ে ওদের আলাদা একটা বাড়িতেই ব্যবস্থা করে দাও না। 'জাহ্নবী-নিবাসে'র দোতালাটা তো খালি পড়ে আছে। নীচের তলার একটি মাত্র ঘরে সাবু-ঠাকুরপোর আপিস। ওই বাড়িতেই ওরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। রান্নাঘরও আছে, সামনেই গঙ্গা—"

বাচস্পতি চিন্তা করছিল বিভিন্ন আলোকে।

বলল, "সেটা কি ভালো দেখাবে। আত্মীয় স্থল, নিন্দে করবে না তো লোকে। বাবা মা বেঁচে থাকলে এই বাড়িতেই থাকতে দিতেন ওদের, এক হাঁড়িতেই খাওয়া-দাওয়া হত। সৈকত-কাননে বন্ধু যে বাড়িটাতে আছে সেখানে তো প্রচুর জায়গা, চারিদিকে বাগান, ছেলেগুলো খেলা করে বাঁচবে। ঘরও অনেকগুলো আছে বাড়িটাতে—"

"কিন্তু ঠাকুরপো যে একাই একশ'। কখন যে কোন্ খেয়ালে থাকে ঠিক নেই। ছেলেপিলের 'ঝক্কি' ওর ওপর দেওয়া চলবে কি। তাছাড়া, সরু ছেলেমানুষ এখনও—"

জাহ্নবী-নিবাসেই শেষ পর্যন্ত গেল হেমন্তকুমার। বাচস্পতির জমি থেকে তার সমস্ত পরিবারের জন্য চাল ডাল তেল নুন আটা ঘি তরিতরকারি সবই সরবরাহ হতে লাগল। এমন কি মশলা পর্যন্ত। জাহ্নবী নিবাসের পাশে জমি ছিল এক টুকরো, সেইটেতে হেমন্তকুমার লাগিয়ে ফেলল নানাবিধ তরিতরকারি। কিন্তু অবসর বিনোদনই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। সারের বিবিধ বৈচিত্র্য করে কুলি-বেগুনকে মুক্তোকেশী বেগুন করা সম্ভব কিনা, বড় বড় টমাটোকে ছোট ছোট আঙুরের মতো করা যায় কিনা, হেমন্তকুমার এই সব গবেষণা নিয়ে সময় কাটাতো।

আগেই বলেছি, বাচস্পতি থাকত 'সুখপুর-পত্রিকা' নিয়ে। তার জীবন-ধারা অনেকটা এই রকম ছিল। সকালবেলা উঠে স্নানান্তে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পুজো করত খানিকক্ষণ। তারপর জলখাবার খেয়ে বাচস্পতি সীমুকে ডাকত—"কই এস এবার, বসা যাক—"

"হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি—"

গুছিয়ে বসতে একটু দেরি হত সীমুর। পানের বাটাটি নিয়ে, ভাল শাড়িখানি পড়ে, মাথার চুলটি বাগিয়ে, খয়ের টিপটি কপালের ঠিক মাঝখানটিতে নিপুণভাবে এঁকে তবে সে আসত। তার ছেলে হয়নি, হবার আশাও নেই। জ্যোতিষী, ডাক্তার কেউ আশা

দেয়নি। তার সমস্ত নারী-সত্তা বিকশিত হয়ে উঠেছিল ওই 'সুখপুর-পত্রিকা'কে কেন্দ্র করেই। পুজোর ঘরে ঢোকবার আগে সে যেমন স্নান করে গরদ পরে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে নিত, লেখবার ঘরে ঢোকবার আগেও তেমনি নিজেকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে না নিলে তৃপ্তি হত না তার। তাকে দেখলে মনে হত সে যেন প্রিয়-সম্ভাষণে যাচ্ছে। প্রশস্ত চৌকির উপর একটি গালিচা পাতা, তার উপর সুদৃশ্য একটি কাঠের ডেস্ক। সেই ডেস্কের সামনে এসে বসত সীমন্তিনী কাগজ-পেন্সিল নিয়ে। বালির কাগজের উপর পেন্সিল দিয়েই প্রথমে সে শ্রুতি-লিখন লিখে নিত। বাচস্পতি সংবাদগুলি লিখে রাখত আগের রাত্রে। সামনে একটি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সেইগুলি সে পড়ে যেত, আর সীমন্তিনী শুনে শুনে টুকত সেগুলি। টোকা শেষ হলে বাচস্পতি সেগুলির বানান ভুল সংশোধন করত। বাচস্পতির ভাষা একটু সংস্কৃত-ঘেঁষা ছিল বলে বানান ভুল অনেক হত। বাচস্পতির সংশোধনের পর আবার সেগুলি পরিষ্কার করে টুকতে হত সীমন্তিনীকে। সুখপুর-পত্রিকার একটি সংখ্যা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি।

প্রথমেই বড় অক্ষরে হেডলাইন :—ধর্ম-ষাঁড়ের বিপুল আক্রমণে মোগলপুরের হানিফ মিঞার সংজ্ঞা-লোপ। এর নীচে ছোট ছোট অক্ষরে সংবাদটি দেওয়া হয়েছে।

"বাঘনা গ্রামের হরিহর মণ্ডল পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে বৃষটি উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা এখন একটি বিশালবপু ষণ্ডে পরিণত হইয়াছে। তাহার বিরাট আকার, সু-উচ্চ ককুৎ এবং সুবৃহৎ শৃঙ্গদ্বয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। হানিফ মিঞার ঘন কুঞ্চিত দীর্ঘ শ্মশ্রু আছে, গুম্ফ নাই। তদুপরি তিনি একটি ঘোর রক্তবর্ণ জোব্বা পরিয়া ঈষৎ কুব্জ হইয়া হাঁটেন। তাঁহার আকৃতি এবং পোশাকই সম্ভবত উক্ত ষণ্ডটির ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়াছিল। হানিফের পুত্র ইসমাইল থানায় খবর দেয়। থানার দারোগা মৃত্যুঞ্জয় বসাক মহাশয় কয়েকটি কনেস্টবল লইয়া দুষ্ট ষণ্ডটিকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। দুইটি কনেস্টবলকে জখম করিয়া ষণ্ডটি লাফাইতে লাফাইতে গিয়া যখন 'বুড়ীর জঙ্গলে' আত্মগোপন করিল তখন বসাক মহাশয় হাল ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, হিন্দু হইয়া তিনি ধর্মের ষাঁড়ের উপর গুলি চালাইতে পারেন না। মানুষ হইলে পারিতেন, কিন্তু গরুকে গুলি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মনে হয় তিনি শুধু পরলোকের ভয়েই ভীত নহেন, ইহলোকের ভয়ও তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছে গরুকে গুলি করিয়া মারিলে স্থানীয় হিন্দুরা বিদ্রোহ করিবে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও হইয়া যাইতে পারে। হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁহার চাকুরি লইয়া টানাটানি পড়িবে। তিনি সদরে খবর পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

কল্পনা করছি শ্রীমতী সীমন্তিনী ঠোঁট ফুলিয়ে বলছে—"বড্ড শক্ত শক্ত কথা দিয়ে লিখেছ এটা। ককুৎ মানে কি?"

"ষাঁড়ের পিঠের উপর যে উঁচু ঢিবিটা থাকে তাকে ককুৎ বলে।"

"আজ বোধহয় অনেক বানান ভুল হয়ে গেল। এত সব শক্ত শক্ত কথা আমি লিখতে পারি কি!"

"তুমি লিখে যাওনা, আমি তো সব দেখে দেব আবার।"

এ সংবাদটির শেষের অংশটি আরও কৌতুকপ্রদ।

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কি নির্দেশ দিয়াছেন তাহা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই, কিন্তু একটি অদ্ভুত উপায়ে সমস্যাটির সমাধান হইয়া গিয়াছে। ষাঁড়টি হরি মণ্ডলের দৌহিত্রী খুকুমণির অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আশ্চর্যের বিষয় সে এই দুর্দান্ত ষাঁড়ের নামকরণ করিয়াছিল 'লক্ষ্মীসোনা'। পুলিশের দল যখন চলিয়া গেল তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে খুকুমণি 'বুড়ীর জঙ্গলের' ধারে গিয়া আস্তে আস্তে কয়েকবার ডাক দিল—লক্ষ্মীসোনা, আয়, আয়। একটু পরেই অরণ্য ভেদ করিয়া বিরাটকায় পুঙ্গবটি বাহির হইয়া আসিল। খুকুমণি তাহার জন্য কিছু খাবার আনিয়াছিল, বাধ্য বালকের মতো সেটি সে আহার করিল। খুকুমণি বলিল, "বড় দুষ্টু হয়েছিস তুই। আয় আমার সঙ্গে—" একটি সামান্য দড়ি তাহার গলায় বাঁধিয়া খুকুমণি তাহাকে টানিয়া টানিয়া নিজেদের বাড়িতে লইয়া গিয়া গোহালে বন্দী করিয়াছে। প্রেমই যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ইহা আর একবার প্রমাণিত হইল।"

ইহার পর অন্য একটি সংবাদ।

"ধীবর বিশু দাস তাহার পুষ্করিণীগুলিতে এবার নূতন 'পোনা' ছাড়িয়াছে। গত বৎসর কোনও অজ্ঞাত কারণে তাহার পুষ্করিণীগুলিতে সমস্ত মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। অনেকে মনে করেন গ্রীষ্মাধিক্যই তাহার কারণ ছিল। কিন্তু তাহাই যদি হইত অন্য পুষ্করিণীর মাছগুলি অব্যাহতি পাইল কিরূপে? আমাদের মতে তাহার পুষ্করিণীগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখাও প্রয়োজন, কারণ মন্দ লোকের অভাব নাই।"

আর একটি খবর।

"মহাত্মা নৃপতি পাইনের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ভূপতি পাইনের জলসত্র স্থাপন। মহাত্মা নৃপতি পাইন এ অঞ্চলের একজন আদর্শচরিত্র সাধু ব্যক্তি ছিলেন। দম, শম, শৌচ, ক্ষমা, ধৃতি প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহার চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। চাল, ডাল, লবণ, তৈল, সাধারণ মসলা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া তিনি সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার সামান্য একটি দোকান ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই পরনিন্দাপ্রবণ পল্লীগ্রামেও তাঁহার বিরুদ্ধে একটিও নিন্দাবাক্য কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ভূপতি পাইন লেখাপড়া শিখিয়া দারোগা হইয়াছেন। বিদেশে চাকরি করেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডকে পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহার জন্মভূমি রায়না গ্রামে গ্রীষ্মকালে যেন একটি জলসত্র স্থাপিত হয়। জলসত্রে শীতল জল, কিছু ভিজানো-ছোলা এবং গুড় যে কোনও পিপাসিত ব্যক্তিকে দান করা হইবে। তাঁহাদের বাস্তুভিটার উপরই সত্রটি

স্থাপিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত ভূপতি পাইন প্রকাণ্ড টিনের উপর 'নৃপতি পাইন জলসত্র' এই কথা কয়টি বড় বড় করিয়া লিখাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। তুইটি বংশদণ্ডের উপর সেটি যথাবিধি টাঙানোও হইয়াছে। আমাদের মতে আর একটু উঁচু করিয়া টাঙাইলে সাইন বোর্ডটি দূরবর্তী পিপাসিত পথিকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত। জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমরা শ্রীযুক্ত ভূপতি পাইনের দীর্ঘজীবন কামনা করি।"

আর একটি খবর।

"কাজল দীঘির ঘাটে বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কার। এ অঞ্চলে কাজল দীঘির নাম সকলের নিকট সুপরিচিত। এই দীঘিটার পূর্বঘাটে একটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বহুকালাবধি পড়িয়া ছিল তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রস্তরটির উপর কাপড় কাচা হইত, বালক-বালিকাদের তাহার উপর দাঁড় করাইয়া জননীরা অনেক সময় তাহাদের স্নান করাইতেন। মেয়েরা অনেক সময় তাহার উপর পা ঘষিয়া পা পরিষ্কার করিতেন। এ যাবৎ সকলে উহাকে সামান্য প্রস্তরখণ্ড রূপেই গণ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে হালদার বাড়ির কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান কনককান্তি সকলের এই ধারণাটিকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমান ইতিহাসের ছাত্র, উত্তর-প্রদেশের কোন এক কলেজে প্রাচীন মূর্তি লইয়া গবেষণা করিতেছেন। তিনি শ্বশুরবাড়ি আসিয়া উক্ত কাজল দীঘিতে স্নান করিতে যান। প্রস্তরটিকে দেখিয়াই তাঁহার সন্দেহ হয় যে ইহা সামান্য প্রস্তরখণ্ড নহে। তাঁহার নির্দেশক্রমে এবং কাজল দীঘির বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভূপেন দাঁ মহাশয়ের সম্মতি অনুসারে লোকজন ডাকিয়া পাথরটিকে উল্টাইয়া ফেলা হয়। প্রস্তরটি যে এত গুরুভার তাহা প্রথমে কেহ অনুমান করিতে পারে নাই। পঁচিশটি সমর্থ যুবকের সম্মিলিত চেষ্টায় তবে সেটিকে উল্টানো সম্ভব হইয়াছে। শক্ত মোটা নারিকেল দড়ি বাঁধিয়া উক্ত পঁচিশজন বলিষ্ঠ যুবক সম্মিলিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করিয়া তবে পাথরটির বিপরীত দিক সকলের দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দৃষ্টিগোচর হইবার পরও প্রথমে কিছু বোঝা যায় নাই। শৈবাল, পঙ্ক, গুগলি, শামুক প্রভৃতি জলমগ্ন অংশটিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পরিষ্কার করিবার পর দেখা গেল তাহা চমৎকার একটি বিষ্ণুমূর্তি। শ্রীবিষ্ণুর মুখের স্মিত হাস্যটি সত্যই সুন্দর। কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর বিবিধ কারুকার্যও অপূর্ব। অধ্যাপক কনককান্তি মূর্তিটি নিজের গবেষণাগারে লইয়া গিয়াছেন। গ্রামের মহিলামহলে কিন্তু একটু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। যে সব মহিলা প্রায় প্রত্যহই বিষ্ণু-মূর্তির পৃষ্ঠের উপর পদাঘাত করিতেন তাঁহারা অমঙ্গল আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। বিনু তৈলকারের পুত্রটি সহসা জরাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে আশঙ্কা আরও বাড়িয়াছে। উক্ত বালক নাকি নিয়মিতভাবে বিষ্ণু-মূর্তিটির পৃষ্ঠের উপর মল-মূত্র ত্যাগ করিত। আমাদের মতে ইহাতে আশঙ্কার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অজ্ঞাতসারে পাপ করিলে ভগবান শাস্তি দেন না। পাপকে পাপ জানিয়া তাহাতে যদি কেহ লিপ্ত হয় তবেই তাহা শাস্তিযোগ্য।"

এই নমুনা ক'টি থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন 'সুখপুর-পত্রিকা' কি ধরনের পত্রিকা ছিল। এ পত্রিকার আর যে দোষই থাক এর প্রধান গুণ ছিল যে সংবাদগুলি একটিও মিথ্যা নয়। প্রতিমাসে দু'টি করে সংখ্যা বেরুত। পূর্ণিমা সংখ্যা আর অমাবস্যা সংখ্যা। ঠিক নির্দিষ্ট দিনে বেরুত। আর এই নিষ্ঠার জন্য খাটতে হত দু'জনকেই। সুতরাং বিষয়-সম্পত্তির তদারক করা বাচস্পতির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সাবু মিস্তির যা করত তাই হত।

সাবু মিস্তির রোগা পাতলা লোক, একটু মিনমিনে গোছের, গলার স্বরও সরু, চোখে বেমানান গোছের বড় চশমা। কিন্তু হিসাবপত্রের ব্যাপারে একেবারে নিখুঁত। এই জন্যই বাচস্পতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পেরেছিল তার উপর। তার প্রধান কাজ ছিল বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, কত আয় কত ব্যয় তার হিসাব রাখা এবং নিট্‌ আয়ের অর্ধাংশ বনস্পতির তত্ত্বাবধায়ক ভূষণ চক্রবর্তীর কাছে জমা করে দেওয়া। বাচস্পতি আর বনস্পতি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার সাবু মিস্তিরের উপরেই দিয়েছিল, সে যা করত তাই হত। কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তীর উপর ভার ছিল বনস্পতির আয়ের অংশটুকু বুঝে নেওয়া। অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে 'এক্‌জিকিউটিভ' বলে সাবু মিস্তির ছিল তাই আর ভূষণ চক্রবর্তী ছিল 'অডিট্‌'। ভূষণ চক্রবর্তীকে লোকে আড়ালে 'ভীষণ চক্রবর্তী' বলে ডাকত। রেগে গেলে তার মুখে কিছু আটকাত না। লোকের গায়ে হাত তুলতেও কসুর করত না সে। গায়ে শক্তি ছিল অসুরের মতো। মুগুর ভাঁজত রোজ। এহেন লোকের কাছে হিসাব দাখিল করা ক্ষীণ-প্রাণ সাবু মিস্তিরের পক্ষে সহজ ছিল না। দু'একবারের অভিজ্ঞতার পর সাবু আর তার সামনাসামনি বসে হিসাব বুঝিয়ে দিতে সাহস করত না। ভূষণ চক্রবর্তীর কঠোর নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে বসতেই ভয় করত তার। ভূষণ চক্রবর্তীর চোখ দুটো বড় বড় আর সর্বদাই মনে হত সে দুটো বুঝি এখনই ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। দু'দিকের রগে কুটিল স্ফীত শিরা ছিল, সাবুর মনে হত সেগুলোও যেন মাঝে মাঝে নড়া-চড়া করে, হয়তো হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে চামড়া ফুঁড়ে। কণ্ঠস্বরও কমনীয় ছিল না। ঝাপসা, ধরা-ধরা কর্কশ কণ্ঠে সে যখন কাউকে গালাগালি দিত মনে হত র‍্যাঁদা চালাচ্ছে কেউ খরখরে কাঠের উপর। সাবু মিস্তির পারতপক্ষে তাই এ লোকটির সম্মুখীন হতে চাইত না। সে আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ একটি হিসাব কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিত চক্রবর্তী মশায়ের কাছে। আর পাওনা টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিত স্থানীয় পোস্টাফিসে। বনস্পতির নামে আলাদা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট ছিল সেখানে। ভূষণ চক্রবর্তী প্রায়ই হিসাবের কাগজে লাল কালিতে দাগ দিয়ে দিয়ে জবাবদিহি তলব করত হিসাবের খুঁটিনাটি নিয়ে। সাবু মিস্তির লিখেই জবাব দিত তার।

এই ব্যক্তিটি কি করে বনস্পতির কাছে এসে জুটল তার আসল রহস্য অনেকেই

জানে না। লোকটি এম-এ পাশ, কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি কোথাও বাড়ি, কিছু জমিজমাও আছে নাকি সেখানে, জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে। যদিও জমিজমা এবং বাস্তুভিটের সেই একমাত্র উত্তরাধিকারী, কিন্তু তার থেকে অন্নবস্ত্রের কোনও সংস্থান সে করতে পারেনি। কোলকাতা শহরে এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে, কিন্তু হতাশা ছাড়া আর কিছু জোটেনি। প্রেমে পড়েছিল একটি মেয়ের, কিন্তু পায়নি তাকে। চাকরির চেষ্টা করেছিল অনেক জায়গায়, ভেবেছিল তার যোগ্যতার মর্যাদা সে পাবে। কিন্তু এদেশে যোগ্যতার মর্যাদা আর ক'টা লোকে পায় ? সে-ও আবিষ্কার করেছিল চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার তত দরকার নেই, যত দরকার খোশামোদের। যে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে প্রভুর পায়ে তেল দিতে পারে তারই উন্নতি হয়, সে প্রথম শ্রেণীর এম. এ., না তৃতীয় শ্রেণীর, তাঁর খোঁজ নেওয়ার দরকার মনে করে না কেউ। সাহিত্য এবং শিল্পকলার দিকে ঝোঁক ছিল। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা নিয়ে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেছিল সাহিত্যের বাজারে, কোথাও আমল পায়নি। নূতন লেখকদের কোনও সম্পাদক, কোনও প্রকাশক প্রশ্রয় দেয় না, অনেক সময় তার লেখাটা পড়েও দেখেন না পর্যন্ত, দেখলেও বুঝতে পারেন না অনেক সময়, কারণ ভালো লেখা পড়ে বোঝবার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। তাঁরা মোহিত হয়ে যান বিখ্যাত নাম দেখে।

বনস্পতির ছবিটা যে সম্পাদকের দপ্তরে এসেছিল সেখানকার একজন সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে তার আলাপ ছিল। সেখানেই সে বনস্পতির আঁকা ছবিটা দেখেছিল প্রথমে, সেখান থেকেই সে বনস্পতির ঠিকানাটাও প্রথমে জানতে পারে। ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ভূষণ চক্রবর্তী। কল্পনার অভিনবত্বই বিশেষ করে মুগ্ধ করেছিল তাকে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে চেয়েছিল সে ছবিটার দিকে, এককথায় ছবিটা দেখে তাক্ লেগে গিয়েছিল তার। জ্যোৎস্নালোকিত একটা পথ দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে, আর সেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে একক একটি গাছ, গাছের কালোছায়া পড়েছে পথের উপর, মনে হচ্ছে গাছটাই যেন পা বাড়িয়ে দিয়েছে জ্যোৎস্নালোকিত পথটার উপর, দিয়েই যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গাছের দুটো শাখা উঠে রয়েছে আকাশের দিকে, মনে হচ্ছে যেন দুটো হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ, আরও দুটো শাখা বেরিয়ে আছে দু'পাশ দিয়ে, সে দুটোকেও হাত বলে মনে হচ্ছে। ছবির নীচে নাম লেখা 'মহাকালী'।

এরপর নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্তা হয়েছিল তার সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে।

উচ্ছ্বসিত ভূষণ বলেছিল—"চমৎকার ছবি। কোন্ সংখ্যায় যাচ্ছে এটা ?"

"চমৎকার লাগল ? তোমার আত্মীয় হন নাকি ভদ্রলোক ?"

"আত্মীয়ই মনে হচ্ছে, কিন্তু দেখিনি কখনও এঁকে। ছবি দেখে লোভ হচ্ছে আলাপ করে আসি। কোথায় থাকেন ভদ্রলোক ?"

"সুখপুরে।"

সেই সময় ঠিকানাটা দেখেছিল ভূষণ। টুকে নিয়েছিল।

"কোন সংখ্যায় যাচ্ছে ছবিটা ?"

"ও ছবি ছাপা হবে না। বুলু সেন বলেছে অতি বাজে ছবি। নামজাদা আর্টিস্টদের ছবি প'ড়ে আছে একগাদা, দেখবে ?"

নামজাদা আর্টিস্টদের অনেক ছবি দেখিয়েছিল তাকে। ছবিগুলো ভালই, কিন্তু অধিকাংশই মেয়ের ছবি। ভূষণের মনে হয়েছিল ছবিগুলোতে স্তন এবং নিতম্বের প্রাধান্যও একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি, যেন ওইগুলো দেখিয়েই ইতরজনকে মুগ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা, মাংস দিয়ে কুকুর ভোলাবার চেষ্টা করে যেমন কুকুর-চোরেরা।

ভূষণ তবু বলেছিল, "এঁরা সবাই নামজাদা লোক, এঁদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলা শোভা পায় না। কিন্তু এ কথা আমি বলব বনস্পতি মিশ্রের 'মহাকালী' ছবিখানা এ ছবিগুলোর চেয়ে অনেক ভালো—"

"বুলু সেনের তা মত নয়।"

"বুলু সেন কে ?"

"আমাদের মালিকের দ্বিতীয় পক্ষের শালী।"

"তিনিই ছবি নির্বাচন করেন ? তাঁর সে যোগ্যতা আছে নাকি ?"

"তাঁর তো যোগ্যতার দরকার নেই। তিনি মালিকের দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী শালী, এই তো তাঁর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। তার উপর তিনি ইয়োরোপ বেড়িয়েছেন, প্যারিসে গেছেন, রোমে গেছেন, স্পেনে গেছেন। লণ্ডনে গিয়েছিলেন, আরও সব কোথায় কোথায় যেন গিয়েছিলেন, সুতরাং ছবির ভালোমন্দ সম্বন্ধে তাঁর মতই অকাট্য, অন্তত এই পত্রিকার আপিসে—"

চুপ করে রইল ভূষণ চক্রবর্তী খানিকক্ষণ।

"আমার কবিতাটা ছাপা হবে তো ?"

"সত্যি কথা বলব ? হবে না। কাগজে 'স্পেস্' কই। সিনেমা, খেলাধুলো, রান্না, সবরকম খবরই তো দিতে হয়। জানই তো নিছক সাহিত্য-পত্রিকা বাজারে চলে না আজকাল। 'সবুজপত্র', 'সাধনা' কদিন চলেছিল ? যে কদিন চলেছিল তা লোকসান দিয়ে। তাছাড়া তোমার ও কবিতা অচল আজকালকার যুগে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিতাও ফেরত দিতে হয় আমাদের। ওসব কবিতা সেকেলে, জিষ্ণুবাবুর অন্তত তাই মত।"

"জিষ্ণুবাবু কে ?"

"জনমেজয় বসু। নাম শোননি ? উদীয়মান কবি একজন। আমাদের মালিকের ভাগনে।"

"তিনি বলেছেন আমার কবিতা অচল ?"

"তিনি কি বলেছেন জানি না, কিন্তু অমনোনীত লেখাগুলো সাধারণত তিনি যে ওএস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেন সেইখানে তোমার লেখাটাও ছিল।"

"তিনিই কি কবিতা নির্বাচন করেন নাকি? আমার ধারণা ছিল, সম্পাদক মশাই কিম্বা তুমি কর।"

ম্লান হেসে তিনি জবাব দিলেন, "আমাদের কাজ কি জান? প্রুফ দেখা।"

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সত্যি কথা শুনবে একটা? আজকাল অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই বড়লোকের বাগান বাড়ি। তাঁরা নিজের নিজের শখ অনুসারে সেগুলো সাজান। কোথাও খেমটা নাচ হয়, কোথাও বা কীর্তন। কেউ কেউ ঝুমকো লতা পছন্দ করেন, কেউ আইভি লতা, কেউ ক্রোটন, কেউ বা ক্যাক্‌টাস। আমরা সেই সব বাগান বাড়ির ভৃত্য মাত্র। যে টব যখন যেখানে রাখতে বলেন সেই রকম রাখি। কথাগুলো তোমাকে কন্‌ফিডেন্‌শ্যালি বললাম, বোলো না যেন কাউকে, অন্তত আমাদের মালিকদের কানে যেন না যায়, গেলে চাকরি থাকবে না। আমি তোমার কবিতাটি ঢুকিয়ে দিতে খুব চেষ্টা করব। কোন গল্প বা প্রবন্ধের নীচে যদি 'স্পেস' পাই ঢুকিয়ে দেব। সে ক্ষমতাটা আছে আমাদের হাতে।"

উক্ত আলাপের পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল ভূষণ চক্রবর্তী। হঠাৎ তার চেঙ্গিস্‌ খাঁর কথা মনে পড়েছিল। কৈশোরে পিতৃহীন হয়ে বিবিধ শত্রুপরিবৃত সেই মোঙ্গল বীর বাহুবলে, বুদ্ধিবলে সবেগে তরোয়াল এবং ঘোড়া চালিয়ে যেমন কৃতিত্বের শীর্ষদেশে উপনীত হতে পেরেছিল, সে-ও কি তেমনি পারে না? সে অর্ধেক পৃথিবীর রাজত্ব চায় না, সে চায় অন্তত একটা ভালো কাগজেও তার লেখা সগৌরবে ছাপা হোক। এইটুকু সে পারবে না? ··

কিন্তু পারেনি। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছিল তাকে ভিক্ষুকের মতো। তবু তা ভদ্রভাবে যোগাড় করতে পারেনি সে। বহু ব্যর্থতার পর হঠাৎ একদিন বনস্পতি মিশ্রের কথা মনে পড়ল তার। অসংখ্য ক্ষতের জ্বালায় সে যখন ছটফট করছিল, অপমানের তীব্র হলাহলে তার সমস্ত অন্তঃকরণ যখন আর্তনাদ করছে, সামান্য একটু আশার বাণী বা স্নেহের স্পর্শ পাবার জন্য যখন তার সমস্ত চিত্ত আকুল, তখন হঠাৎ একদিন বনস্পতি মিশ্রের কথা মনে পড়ল তার। মনে হল এই পৃথিবীতে বোধহয় ওই একটিমাত্র লোকই আছে যে তার অন্তর্দাহের মর্ম বুঝতে পারবে, যার মনের সুরের সঙ্গে হয়তো বা তারও মনের সুর মিলবে। কারণ এটা সে লক্ষ্য করেছিল যে তথাকথিত সুধী বা গুণী-সমাজে বনস্পতি মিশ্রের নাম পর্যন্ত কেউ শোনেনি। তার একটি ছবিও ছাপা হয়নি কোনও কাগজে। তার মতো সেও বোধহয় অপমানিত, অবহেলিত। ঠিকানা জানাই ছিল। অনেক ইতঃস্তত করে প্রথমে সে চিঠি লিখলে একখানা।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু শুনে হয়তো বিস্মিত হবেন আপনিই আমার [illegible] আপনার লোক। বহুদিন আগে এক মাসিক পত্রিকার আপিসে আপনার 'মহাকালী' ছবিটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝেছিলাম আপনি কত বড় শিল্পী। উক্ত মাসিক পত্রিকায় আপনার ছবি ছাপা হয়নি, সে পত্রিকাও এখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু আমার মনে মুদ্রিত হয়ে গেছে আপনার ছবিখানি চিরকালের জন্য। এতদিন সাহস পাইনি আপনাকে চিঠি লিখতে, শিল্পীর তপস্যা ভঙ্গ করতে সঙ্কোচ হয়েছিল, আপনি যে এখনও শিল্পসাধনা করছেন এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। আমার কোন বিশেষ পরিচয় নেই, আমি জীবনে সব দিক দিয়েই ব্যর্থ। আমার এই ব্যর্থ অপমানিত পদদলিত জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সহসা আজ মনে হল, আপনার সঙ্গে একবার অন্তত দেখা না হলে আমার মরেও সুখ হবে না। অবশ্য আপনি যদি অনুমতি দেন, তবেই যাব। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।"

চারদিনের মধ্যেই উত্তর এসেছিল ছবির ভাষায়। জোড়-করা দু'টি হাত, নীচে রং দিয়ে লেখা, 'এলে অনুগৃহীত হব, বনস্পতি'। প্রতিটি অক্ষর যেন অবনত হয়ে আছে স-সম্ভ্রমে।

ভূষণ চক্রবর্তী সেই যে এলেন আর ফিরে গেলেন না। লোহা যেন চুম্বকে আটকে গেল।

ভূষণ চক্রবর্তীর আগমন-সংবাদটি সুখপুর-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেইটিই উদ্ধৃত করছি।

"সুখপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূষণ চক্রবর্তীর আগমন। শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের জনৈক গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত ভূষণ চক্রবর্তী এম. এ. মহাশয় গত সপ্তাহে এখানে আসিয়া শিল্পীর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। প্রথম সাক্ষাৎ বড়ই অদ্ভুত ধরনের হইয়াছিল। বনস্পতির সম্মুখীন হইয়া চক্রবর্তী মহাশয় কোনও কথা বলেন নাই, নমস্কার পর্যন্ত করেন নাই, নির্বাক বিস্ময়ে বনস্পতির দিকে চাহিয়াছিলেন। বনস্পতি শিষ্টাচার-সঙ্গত নমস্কারান্তে যখন আলাপ করিতে উদ্যত হইল, তখন চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি এইবার যাইতে চান, অনর্থক বাগবিস্তার করতঃ শিল্পীর অমূল্য সময় নষ্ট করিবার বাসনা তাঁহার নাই। বনস্পতি ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সবিনয়ে তাঁহাকে অন্তত দুই এক দিনের জন্য তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। সে অনুরোধ চক্রবর্তী মহাশয় রক্ষা করিয়াছেন।"

সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল অমাবস্যা-সংখ্যায়। পূর্ণিমা-সংখ্যায় প্রকাশিত আর একটি সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে চক্রবর্তী মশায় শেষ পর্যন্ত বনস্পতি মিশ্রের কাছে পাকাপাকিভাবেই থেকে গেলেন। সংবাদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি।

"শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের অভিনব প্রহরী। শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত ভূষণ চক্রবর্তীর সুখপুরে আগমন-বার্তা বিগত অমাবস্যা-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে মাত্র দুই দিনের জন্য বনস্পতির আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুইদিন আলাপের পর তাঁহার মত বদলাইয়াছে। বনস্পতির শিল্প-কর্মের চমৎকারিত্বে তিনি এতদূর অভিভূত হইয়াছেন যে আজীবন তিনি বনস্পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে, এজন্য তিনি কোন বেতন লইবেন না। তিনি বলিয়াছেন, যে প্রেরণা বশে বৈরাগিনী মীরা একদা গাহিয়াছিল 'ম্যয়নে চাকর রাখো জী' সেই প্রেরণাই তাঁহাকেও শিল্পী বনস্পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সৈকত-কাননের বাড়িতে সামান্য আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেই তিনি সানন্দে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনটা শিল্পীর সেবায় কাটাইয়া দিতে পারিবেন এই কথা বলিয়াছেন। কিভাবে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিবে, অর্থাৎ তাঁহার দৈনিক কার্যক্রম কি হইবে তাহা আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা শ্রীমান ভূপেন দাস জানিতে চাহিয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, শিল্পী বনস্পতিকে প্রহরা দেওয়াই তাঁহার প্রধান কার্য হইবে। তাঁহার মতে ভালো দামী গাছের চারাকে গরু ছাগলের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যেমন কাঁটার বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন, শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের রক্ষা করিতে হইলেও সেইরূপ সমর্থ এবং কড়া প্রহরী চাই। তিনি আরও বলিয়াছেন সভ্য মনুষ্যসমাজেও গরু ছাগল জাতীয় প্রাণীর অভাব নাই, তাহাদেরও একমাত্র কাজ উদীয়মান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মাথাটি মুড়াইয়া খাওয়া। তাঁহার বিবেচনায় ইহা খুবই সুখের এবং সৌভাগ্যের বিষয় যে শ্রীবনস্পতিকে শহরের অর্ধশিক্ষিত স্বার্থপর পরশ্রীকাতর এবং তথাকথিত আলোক-প্রাপ্ত ফড়িয়াদের কবলস্থ হইয়া শিল্পী-জীবন যাপন করিতে হয় নাই। তিনি নির্জনে নিজগৃহে স্বীয় প্রতিভাকে বিকশিত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথের নিকট আর একটি আশঙ্কার কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে বনস্পতি মিশ্রের তপোভঙ্গ করিবার জন্য শহর হইতে বহুবিধ ফড়িয়ার সমাগম হইবে। ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা কলসীর কানা, পুরাতন পট অথবা হাতে-লেখা পুঁথির খোঁজে যাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহারা কালক্রমে বনস্পতির সন্ধান পাইবেনই এবং তখন তাঁহাকে রক্ষা করিবার মতো কোন সমর্থ লোক যদি না থাকে তাহা হইলে যে কি হইবে তাহা কল্পনা করিলেও তাঁহার হৃৎকম্প হয়। তিনি স্থির করিয়াছেন যে অনুমতি পাইলে তিনিই প্রহরীর কাজ করিবেন। চক্রবর্তী মহাশয় বেশ বলিষ্ঠ গঠন ব্যক্তি, প্রত্যহ মুদ্গার চালনা করেন। তিনি স্বল্পাহারী, স্বল্পবাক এবং কৃতবিদ্য। তিনি এই স্বেচ্ছাবৃত প্রহরীর কার্য যে অনায়াসে করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের অনুরোধ তিনিও তাঁহার প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া তুলুন। তিনি কৃতবিদ্য ব্যক্তি, ইচ্ছা করিলে তিনি আমাদের প্রভূত জ্ঞান দান

করিতে পারেন। সুখের বিষয় তিনি 'সুখপুর-পত্রিকা'য় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।"

ভূষণ চক্রবর্তী যে কিরকম কড়া প্রহরী তার প্রথম আভাস পেল হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমার প্রায়ই যেত সৈকত-কাননে, উদ্দেশ্য আনাড়ি বনস্পতিকে আর্ট সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান দান করা। ভাবত—'এদের খাচ্ছি, পরছি, যতটা পারি এদের উপকার করি। যতটা পারি কূপমণ্ডুকটাকে বলে আসি যে তার কূয়োর বাইরে কত বড় বড় আর কি অপরূপ সব সাগর মহাসাগর আছে। শুনেও যদি ওর কিছুটা উন্নতি হয়। এত করে বললাম তবু গ্রাম ছেড়ে তো গেল না কোথাও।' বনস্পতি যখন ছবি আঁকত তখন তার কাছে বসে সে প্রায়ই গিয়ে সমুদ্রের কথা শোনাত। র‍্যাফল, বটিচেলি, এল্ গ্রেকো, ভ্যান গঘ, রুবেন্‌স্, গর্গ্যা, পিকাসো, মিকালেঞ্জেলো, গয়া, দা ভিঞ্চি কত রকম নামই যে করত তার ঠিক নেই। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারেনি, কিন্তু সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিল সে। অনর্গল বলে যেত এদের কথা। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ যে কোথায় কোথায় ভুল করেছেন, কি কি করলে তাঁরা সত্যি বিশ্ববিখ্যাত হতে পারতেন, যামিনী রায় কেন প্রগ্রেসিভ নন, দেবীপ্রসাদের দুর্বলতা কোথায় এসব নিয়েও বেশ বিজ্ঞের মতো বক্তৃতা দিত সে নস্যির টিপটি হাতে ধ'রে। বনস্পতি তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে কি না, মহামূল্য এসব তথ্যে তার চিত্তলোক উদ্দীপ্ত হচ্ছে কিনা তা কিন্তু সব সময়ে বুঝতে পারত না হিমু। কারণ বনস্পতি আপন মনে ছবিই এঁকে যেত, 'হাঁ' 'না' কোনও উত্তরই দিত না, মাথা নাড়ত না, ভুরু কোঁচকাত না, হাসত না। বক্তৃতার মাঝখানে উঠেও যেত মাঝে মাঝে। কিন্তু এসবে দমত না হেমন্তকুমার। সে নস্যির টিপটা টেনে নিয়ে হাসিমুখে বসে থাকত চুপ করে, বনস্পতি ফিরে এলে শুরু করত আবার। আর একটা বিশেষত্বও ছিল হেমন্তকুমারের। বনস্পতির ছবির সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই করেনি কখনও সে, যেন সেগুলো তার নজরেই পড়েনি, যদিও যে ঘরে ব'সে সে বনস্পতির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করত সে ঘরের চারটে দেওয়ালই ভরতি ছিল বনস্পতির আঁকা ছবিতে। তারই ছেলেমেয়ের নানা ছবি সে এঁকেছিল নানা ভঙ্গীতে, কিন্তু সেগুলোর সম্বন্ধেও কোন প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করা দূরে থাক, কোনও মন্তব্য পর্যন্ত করেনি হেমন্তকুমার, যেন ওসব ছেলেমানুষী কাণ্ডগুলোকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনাটা অশোভন তার মতো বিজ্ঞের পক্ষে। বনস্পতি হেমন্তকুমারের ছেলেমেয়ের ছবিগুলো সত্যিই অদ্ভুত করে এঁকেছিল। যার নাম বন্দুক তার হাতে একটা বন্দুক দিয়ে মেয়েটার ভাব-ভঙ্গীতে ফুটিয়েছিল একটা বন্দুক-ভাব—নির্বিকার, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি অগ্নি-গর্ভ। বর্শার মুখখানা এঁকেছিল একটা চকচকে বর্শা-ফলকের উপর। সত্যবতী দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন এই অভিনবত্বে, কিন্তু হেমন্তকুমারের মনে এসব যে কোন রেখাপাত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সে মুখে একটা

সবজান্তা-মার্কা হাসি ফুটিয়ে হয় চুপ করে বসে থাকত, কিম্বা বনস্পতির আত্মিক উন্নতির জন্য বক্তৃতা করত।

ভূষণ চক্রবর্তী মাসখানেক ধরে লক্ষ্য করলেন এসব। হেমন্তকুমারের স্বরূপ আবিষ্কার করতে বিলম্ব হয়নি তাঁর, কিন্তু বাচস্পতির শ্যালক বলে প্রথম প্রথম তাকে কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু একদিন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যখন তিনি আড়াল থেকে শুনতে পেলেন হেমন্তকুমার বলছে—"ও ছবি আঁকবার আগে তোমার লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবন-চরিতটা পড়ে নেওয়া উচিত ছিল, তাহলে বুঝতে পারতে কত বড় প্রতিভা থাকলে তবে ও ছবি আঁকা সম্ভব। তুমি ছবির নাম দিয়েছ 'বিশ্ববিদ্যালয়', কিন্তু বিশ্বের সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা আছে তোমার? সারাজীবন প'ড়ে আছো তো এই অজ পাড়াগাঁয়ে। দা ভিঞ্চি আঠারো উনিশ বছর ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছিলেন শুধু, দুনিয়ার কত কিছু দেখেছিলেন, তবু তিনি ও নাম দিয়ে ছবি আঁকতে সাহস করেননি। বিখ্যাত আর্টিস্টদের জীবনীগুলো অন্তত তোমার পড়া উচিত, কিন্তু মুশকিল হয়েছে তুমি ইংরেজি যে একেবারে জান না, প'ড়ে বসে আছ এক 'ডেড্ ল্যাঙ্গুএজ'—"

ভূষণ চক্রবর্তীর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল এ-কথা শুনে। কিছুদিন আগে 'বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিয়ে বনস্পতি প্রকাণ্ড যে ছবিটা আঁকতে শুরু করেছিল তার পরিকল্পনা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় কোন বড় অট্টালিকা নয়। প্রাচীন এক বট-বৃক্ষ অসংখ্য ঝুরি নাবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট গাম্ভীর্যে, তার গাঁটে গাঁটে সবুজ পাতা আর লাল ফলের সমারোহ, কত রকমের পাখী যে আশ্রয় নিয়েছে তাতে, কত রকমের পতঙ্গ যে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাতায় পাতায়, কত রকমের লতা উঠেছে তার গা বেয়ে তার আর ইয়ত্তা নেই। একধারে এক বুড়ি ডাল নুইয়ে পাতা পাড়ছে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি উন্মুখ বাছুর। আর একধারে দোলনায় দুলছে এক মেয়ে, উড়ছে তার আলুলায়িত চুল, চোখে মুখে উপছে পড়ছে হাসি, মাথার উপর অনন্ত আকাশ, চারিপাশে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। আকাশে উড়ে চলেছে বকের সারি। বটবৃক্ষের পাদমূলে নানারকম পাথরের মূর্তি, প্রত্যেকটিতে সিন্দূর-চন্দন, একটি মেয়ে প্রণতা হয়ে আছে তাদের সামনে, বর্তমান যেন প্রণাম করছে অতীতকে। এছাড়া আরও অনেক বৈচিত্র্য অলঙ্কৃত করছে ছবিখানিকে। কোথাও পাখী নীড় বেঁধেছে, কোথাও আবার পিঁপড়েরা, মাকড়শারা সূক্ষ্ম উর্ণার জাল টাঙিয়ে দখল করে আছে খানিকটা জায়গা, ভাঙা শুকনো শাখার পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে নবীন কিশলয়ের দল। গাছের আর একধারে বুড়িটার পাশে কয়েকটি মেয়ে শুকনো পাতা আর ডাল কুড়িয়ে বোঝা বাঁধছে। একদল শাখা-মৃগও বসে আছে একধারে গাছের উপর। সবাই আনন্দিত, সবাই প্রাণরসে ভরপুর। ভূষণ চক্রবর্তীর মতে এইটি নিঃসন্দেহে বনস্পতির শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি দূর থেকে দাঁড়িয়ে রোজ দেখে যেতেন কতদূর আঁকা হল, নীরবে দেখে যেতেন শুধু, কোন কথা বলতেন না।

এই ছবির সম্বন্ধে হেমন্তকুমারের অভিমত শুনে ক্ষেপে গেলেন ভূষণ চক্রবর্তী। কিন্তু তখনই তখনই এর প্রতিকার করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে, হেমন্তকুমার বাড়ির একজন নিকট আত্মীয়।

হেমন্তকুমার চলে যাবার পর ভূষণ চক্রবর্তী গেলেন বনস্পতির কাছে। বনস্পতি তখন আঁকছেন গাছের মাথার উপরে আটকে গেছে রঙীন একখানা ঘুড়ি।

"একটা কথা বলতে এসেছি আপনাকে।"

বনস্পতি তখনও রং লাগাচ্ছেন ঘুড়িতে। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "ও, আপনি। কি বলবেন বলুন। কেমন লাগছে ছবিখানা?"

"অপূর্ব। আমি আর একটা কথা বলতে এসেছি। আমি নিজেকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করেছি, কিন্তু যা করব বলে এসেছিলাম তা তো করতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি হেমন্তবাবু রোজ আপনাকে এসে বিরক্ত করে যাচ্ছেন, আমার মনে হচ্ছে ওঁকে বাধা দেওয়া উচিত—"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বনস্পতি বললেন, "আমারও মনে হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি?"

"উপায় আছে। আপনি যদি আমাকে লিখিত একটি আদেশ দেন তাহলে আমি কোন বাজে লোককে ঢুকতে দেব না।"

"তাহলে তো বাঁচি। কি লিখতে হবে?"

"লিখতে হবে ভূষণ চক্রবর্তীর বিনা অনুমতিতে কেউ আমার ছবি-আঁকার ঘরে ঢুকতে পাবে না। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলেও ভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আগে দেখা করে সেটা ঠিক করে নিতে হবে। ভূষণ চক্রবর্তীই আমার প্রহরী, কোনও কারণেই তাঁর অমতে আমার কাছে আসা চলবে না।"

"এরকম লিখলে কেউ কিছু মনে করবে না তো!"

"করবে বইকি, নিশ্চয় করবে। কিন্তু ওর ঝুঁকিটা আমি নিজের ঘাড়েই নেব, বদনাম আমারই হবে, আর নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আপনার লেখাটা আমি দেখাব না কাউকে!"

শেষ পর্যন্ত তাই হল। বনস্পতি একটা খাতায় লিখে দিলেন ওই কথাগুলো, লিখে নাম সই করে দিলেন নীচে।

বনস্পতিকে রক্ষা করবার একটা সুবিধা ছিল। বনস্পতির অন্দর মহলে প্রবেশ করবার দ্বার একটি মাত্র। সেই দ্বারের সামনে প্রকাণ্ড একটি বারান্দা। বারান্দার অপর প্রান্তে দুটি ঘর নিয়ে বাস করতেন ভূষণ চক্রবর্তী। সুতরাং তার দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরের কোন লোকেরই অন্দর মহলে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। চাকর-চাকরানী আর হেমন্তকুমার ছাড়া অন্দর-মহলে তখন যেতও না কেউ বিশেষ। কোলকাতা থেকে জনসমাগম পরে আরম্ভ হয়েছিল।

একদিন সকালে হেমন্তকুমার এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখ তুলে

দেখল সদর দরজার উপর বড় বড অক্ষরে নোটিশ ঝুলছে—"ভূষণ চক্রবর্তীর বিনা অনুমতিতে ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।" হেমন্তকুমার নস্যির টিপটি ডান হাতে ধরে আরও ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ নোটিশটার দিকে। মনে ঈষৎ কৌতুক সঞ্চার হল তার। তারপর নস্যির টিপটা সজোরে টেনে নিয়ে ভিতরের দিকে যথারীতি অগ্রসর হল সে।

"শুনছেন ? ভিতরে যাবেন না।"

ভূষণ চক্রবর্তীর বজ্রকণ্ঠ শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হল হেমন্তকুমারকে। চক্রবর্তী মশায় নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অন্দর মহলের দ্বার রোধ করে এসে দাঁড়ালেন।

"এর মানে ?"—প্রশ্ন করলেন হেমন্তকুমার।

"নোটিশটা দেখুন।"

"দেখেছি। কিন্তু ও নোটিশ আমার উপরও খাটবে ? আমি ওর আত্মীয়—"

"আপনি ওঁর আত্মীয় নন, বরং আমার মনে হয় আপনি ওঁর শত্রু। আপনি ওঁর কানের কাছে বকবক করে ওঁর কাজে বাধা দিচ্ছেন। আত্মীয় হলে এটা করতেন না।"

"ওর ভালোর জন্যেই বকবক করি। আর্ট সম্বন্ধে যতটুকু জানি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি—"

"আপনি যা বলেন তা আমি শুনেছি। আর্ট সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান নেই, আজকাল কতকগুলো শস্তা বিলিতি বইয়ের দৌলতে অধিকাংশ লোক যা হয়েছে আপনি তাই।"

"কি—"

"একটি 'ফড়ে'। তাই আমার ইচ্ছে নয় যে আপনি ওঁর কাছে যান।"

"আপনার ইচ্ছে অনুসারে আমাকে চলতে হবে না কি ?"

"বনস্পতি মিশ্রের বাড়িতে চলতে হবে। তিনি এ বিষয়ে লিখিত অনুমতি দিয়েছেন আমাকে—"

মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে হেমন্তকুমার চেয়ে রইল চক্রবর্তীর দিকে। এইটি তার একটি বিশেষত্ব। প্রাণের ভিতর যাই হোক মুখে তা প্রকাশ পায় না কখনও। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে অবশেষে বলল, "আমি যদি জোর করে ঢুকি ?"

"আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আমার সঙ্গে জোরে পারবেন কি ?"

হেমন্তকুমার তাঁর পেশী-সমৃদ্ধ বাহুখানির উপর একবার চোখ বুলিয়ে আর একটু হেসে এমন ভাবে চলে গেল যেন সে একটা ষাঁড়কে দেখে পাশ কাটাচ্ছে।

আশ্চর্যের বিষয়, এ নিয়ে হেমন্তকুমার কোনও হৈ চৈ তো করেইনি, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কাছে কথাটা প্রকাশ পর্যন্ত করেনি। এটাও তার একটা বৈশিষ্ট্য। কিলটি খেয়ে সেটি নিঃশব্দে হজম করবার অদ্ভুত নৈপুণ্য আছে তার। কোথাও অপমানিত হলে

কাক-পক্ষীটি পর্যন্ত সে খবর জানতে পারত না। কোন বয়স্ক ব্যক্তি কোথাও পা পিছলে প'ড়ে গেলে যেমন প্রথমেই চারিদিকে চেয়ে দেখে তার এই অধঃপতন কেউ দেখতে পেয়েছে কি না, অপমানিত হলে হেমন্তকুমারও তেমনি শঙ্কিত হয়ে পড়ত, খবরটা কেউ জানতে পারেনি তো। ছাত্র জীবনে বহু ঘাটের জল খেয়ে এই সত্যটা সে উপলব্ধি করেছিল যে গায়ে একবার কাদা লেগে গেলে তার আর চারা নেই, বুক চাপড়ে লোক জড়ো করলে সে কাদার মলিনতা তো একটুকু কমবেই না, বরং সেটা অনেক লোকের হাসির খোরাক জোগাবে। তার চেয়ে চুপি চুপি আড়ালে গিয়ে কাদাটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর ভবিষ্যতে কাদাটা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করাই উচিত।

হেমন্ত এ ক্ষেত্রেও তাই করল।

কাদার সংস্রব এড়িয়ে গিয়ে বসতে লাগল তালুকদার মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে। বেশ একটি সম্মানের আসনও পেল সে সেখানে। তালুকদার মশায়ের তৃতীয় পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র সহদেবের শ্রদ্ধা সে আগেই আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। সহদেব ফোর্থ-ক্লাস থেকে প্রমোশন পায়নি। তিনবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এই জন্যেই সম্ভবত সহদেবের সম্বন্ধে একটা মমত্ব-বোধ ছিল হিমুর। সহদেবের বাবা শিবু তালুকদার স্বর্গারোহণ করেছিলেন বছর দুই পূর্বে। তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ছিল কিছু, ভাগ করলে প্রতি ভাগে চটকস্থ মাংসের চেয়েও কম পড়ত, কারণ ত্রয়োদশ পুত্রের পিতা ছিলেন তিনি। এক সহদেব ছাড়া অন্য ভাইগুলির বিবাহ এবং সন্তান-সন্ততিও হয়েছিল। সবাই একান্নবর্তী ছিল বলেই মোটা-ভাত মোটা-কাপড় কোনক্রমে জুটছিল সকলের। অন্য ভাইগুলি এদিকে-ওদিকে কিছু রোজগারও করতেন। সহদেবই ছিলেন বেকার। সে সংসারের ফাই-ফরমাশ খাটত, আর সন্ধের পর নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাস খেলত বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে। প্রথমে সে এর নামকরণ করেছিল 'সুখপুর ক্লাব'। কিন্তু হেমন্তকুমার সংশোধন করে দিয়েছিল নামটা। বলেছিল, "কানা পুতের নাম পদ্মলোচন রেখো না। ক্লাব অনেক বড় জিনিস হে, 'বার্' না থাকলে ক্লাব হয় না। কার্ড-ক্লাব রাখতে পার বরং।" লাউ কুমড়োর ডালনা, পুঁই শাকের চচ্চড়ি আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে লাল চালের ভাত ছাড়া শারীরিক পুষ্টি বিধানের জন্য অন্য উপকরণ যদিও সে জোটাতে পারত না, বিদেশী আহার সংগ্রহ করা অসম্ভবই ছিল তার পক্ষে, বিদেশী বিদ্যাও সে আহরণ করতে পারেনি, কিন্তু বিদেশী সভ্যতা সম্বন্ধে মোহের অন্ত ছিল না সহদেবের। এরই প্রকাশ হয়েছিল তার 'ওপন্ ব্রেস্ট' কোটে আর ওই সুখপুর কার্ড ক্লাবে।

হেমন্তকুমার এইখানে এসেই আশ্রয় পেল।

সহদেব একটু কৌতূহলী প্রকৃতির লোক। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি আর বঙ্কুদার ওখানে যান না, আগে তো রোজ যেতেন?"

"না ভাই, আর যাই না। ওখানে যাওয়া ছেড়েছি। আমাদের এক মাস্টার-মশাইয়ের বাড়ি যাওয়া যেমন ছেড়েছিলাম—"

"কি রকম ?"

কৌতূহলী সহদেব আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"কোলকাতায় শেষবার যে স্কুলটাতে ট্রায়াল দিয়েছিলাম সেখানে এক মাস্টার ছিলেন ভানু মিত্তির। লোকটি এমনিতে ভালো, বেশ ভালো। আমাকে স্নেহ করতেন খুব। একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন, তাঁর স্ত্রীটিও দেখলাম খুব ভালো। আমাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়ালেন। মাঝে মাঝে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি যেতামও মাঝে মাঝে, কিন্তু তার এক ল্যালা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছেলের জন্য যাওয়া ছাড়তে হল শেষটা—"

"কেন, কি করত সে ?"

"ডাক্তারের পরামর্শে তাকে ভালো ভালো খাবার খেতে দিতো ওরা। সন্দেশ, রসগোল্লা, সর, মাখন, ডিম—কত কি, কিন্তু ছেলেটা খেত না কিছু, বাঁ হাত দিয়ে চটকাত খালি, আর মুখ দিয়ে নাল গড়িয়ে পড়ত। সে এক বীভৎস দৃশ্য। রোজ রোজ ওই দৃশ্য দেখা পোষাল না আমার, যাওয়া ছেড়ে দিলাম। বন্নুর ওখানে যাওয়াও ছেড়েছি ওই জন্যে। ভাল ভাল কাগজ রং আর তুলি নিয়ে যে সব কাণ্ড ও করছে তা আর বসে দেখা যায় না—"

"কি ছবি আঁকচেন আজকাল বন্নুদা ?"

"ও ছবি আঁকবে কি! মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসী পড়ে তাঁতি, ওর হয়েছে সেই অবস্থা। আস্থা আছে খুব। কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না। একটা ছবির গাল-ভরা নাম দিয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয়'; কিন্তু আঁকছে একটা বটগাছ—"

"তাই না কি! বটগাছের নাম বিশ্ববিদ্যালয় দেবার মানে ?"

"বোঝ—"

এরপর হেমন্তকুমার গাল-ভরা কতকগুলো নাম উচ্চারণ করে সহদেবকে বিস্মিত করে দিলে। র‍্যাফেল, মিকালেঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, গয়া, রুবেন্স প্রভৃতির নামও কখনও শোনেনি বেচারা। হাঁ করে শুনতে লাগল। সহদেবকে বিস্মিত করে দেবার মতো বিদ্যে ছিল হেমন্তকুমারের।

এর দিনকতক পরে 'সুখপুর-পত্রিকা'র এক সংখ্যায় ভূষণ চক্রবর্তীর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধের নাম 'মানুষের সঙ্গ'।

চক্রবর্তী মশায় তাতে লিখলেন—"প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোনও সমর্থ পুরুষ দ্বিতীয় সমর্থ পুরুষের সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারিত না। নারী এবং শিশু পরিবৃত হইয়াই সে বন্য

জীবন যাপন করিত। শিশু-পুত্র যৌবনে উত্তীর্ণ হইলেই পিতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য হইয়া অবশেষে বিতাড়িত হইত। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই নিয়মই মানব-সমাজকে চালিত করিয়াছে। ইহার পর মানুষ সভ্য হইল, সমাজ-স্থাপন করিল, সমাজের পুরুষেরা আর তখন অন্য পুরুষের সঙ্গ বর্জন করিতে পারিল না, বর্জন করিতে চাহিলও না। কারণ তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিল নিজেদের স্বার্থের জন্যই একতা, সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব, সামাজিকতা প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া পরস্পরের প্রতি যে বিরুদ্ধ ভাব তাহারা পোষণ করিয়া আসিয়াছে তাহা সহজে অবলুপ্ত হইল না। ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে—চিতাবাঘ নিজ চর্মের কৃষ্ণ-বৃত্তগুলি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারে না। সংস্কৃত কবিও বলিয়াছেন, অঙ্গারকে শতবার ধৌত করিলেও তাহা মলিনতা-মুক্ত হয় না। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণও বলিতেছেন, আমাদের পাশব প্রবৃত্তিগুলিও লুপ্ত হয় না, অবদমিত হয় মাত্র, মনের গহনে অবচেতন লোকে তাহারা আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং কালক্রমে ভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হইয়া মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি উদাহরণ দিতেছি—মনে করুন, আপাতদৃষ্টিতে 'ক' 'খ'-য়ের বন্ধু। যতদিন তাহাদের অবস্থা সমান থাকে ততদিন তাহাদের বন্ধুত্বে হয়তো ফাটল ধরে না। কিন্তু যে-ই একজনের সৌভাগ্য দেখা দেয়, ধনে-মানে পুত্রে-কলত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যেই একজন আর একজনকে ছাড়াইয়া যায়, তখনই নিম্নস্থ বন্ধুটির মনে ঈর্ষা জাগে। কিন্তু এ ঈর্ষা সে প্রকাশ করে আইনসঙ্গত সভ্য উপায়ে। জঙ্গলের আইন প্রচলিত থাকিলে সে সোজাসুজি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নখদন্ত আয়ুধ প্রহারে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিত। কিন্তু সভ্যসমাজে তাহা করিবার উপায় নাই। তাই তাহারা বাধ্য হইয়া যে সব অস্ত্রের আশ্রয় লয় আপাতদৃষ্টিতে সেগুলিকে অস্ত্র বলিয়া চেনাই যায় না। বর্তমান সভ্যসমাজে তাহারা নানা নামে প্রচলিত আছে। একটি এইরূপ অস্ত্রের নাম করিতেছি। সেটির নাম 'সমালোচনা'। সমালোচনার ভালো দিক যে নাই তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমালোচনা পরশ্রীকাতরতারই প্রকাশ। যিনি আপনার বন্ধু, তিনিই আপনার বড় সমালোচক, প্রকাশ্য সমালোচক নয়, গোপন সমালোচক। তিনি আপনার নিকটে আসিয়া আপনাকে উপদেশ দিবার ছলে আপনার সমালোচনা করেন, আপনার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিবার সময় আসিয়াও আপনার সমালোচনা করেন, তাঁহার অন্তর্নিহিত ঈর্ষানল তাঁহার বাক্যে, ব্যবহারে, হাসিতে বিকীর্ণ হয়। আপনি বিপন্ন হইলে তিনি মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু মনে মনে আনন্দিত হন।

ইহার প্রতিক্রিয়াও হইয়াছে। সম্ভবত, ইহারই ফলে সমাজে আজকাল দুই শ্রেণীর লোক উদ্ভূত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে আছেন সাধু সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত মহাত্মাগণ। ইঁহারা সংসার ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর অরণ্যে, পর্বতে বা মরুভূমিতে একক

জীবন যাপন করাই নিরাপদ মনে করেন। যাঁহারা তাঁহাদের নাগাল পান না তাঁহারা এই সাধু সন্ন্যাসীদের 'এস্‌কেপিস্ট' অর্থাৎ 'পলাতক' আখ্যা দিয়া কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ঈশপের গল্পে শৃগালও দ্রাক্ষাগুচ্ছকে তিক্ত বলিয়াছিল। একথা কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইঁহারা সকলেই গুণী, জ্ঞানী এবং তপস্বী। তথাকথিত সভ্য মানবসমাজের পাশবিকতা এড়াইবার জন্যই মনুষ্যসঙ্গ পরিহার করা তাঁহারা শ্রেয় মনে করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই বটে, কিন্তু সমাজের ভিতর থাকিয়াই তাঁহারা কূর্মের মতো হাত-পা গুটাইয়া বাস করেন। ইঁহারাও ঐশ্বর্যবান। কিন্তু ইঁহারা নিজেদের ঐশ্বর্যের কথা কাহাকেও জানিতে দেন না। টাকা-কড়ি থাকিলে তাহা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখেন। আহারে, বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে সে ধনের অস্তিত্ব বিন্দুমাত্র আভাসিত হয় না। সমাজের নিকট তাঁহারা দরিদ্র রূপেই পরিচিত হইতে চান। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান তাঁহারাও অতি-বিনয়-বশত মূর্খতার ভান করিতে ভালবাসেন, নিজেদের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়া অপরের ঈর্ষাভাজন হইবার বাসনা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা মূর্খতারই ভান করেন। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় স্তরের লোকেরাও যে জ্ঞানী গুণী এবং ধনী হইয়াও সমাজে অতিশয় স-সঙ্কোচে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, আমার বিশ্বাস, তাহা তথাকথিত বন্ধুদের ভয়ে। যে মনোবৃত্তি বশে আমরা বর্ষাকালে পোকার ভয়ে আলো জ্বালি না, ইহা অনেকটা সেইরূপ মনোবৃত্তি। মানুষের সঙ্গ ইঁহাদের নিকট বিরক্তিকর, অনেক সময় ভয়াবহ এবং বিপদসঙ্কুল।

তৃতীয় আর একটি শ্রেণীর উল্লেখ করিব। ইঁহারা মানুষের অনুরাগী, মনুষ্য সমাজেই বাস করেন, মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মানুষের পরিবেশ, বস্তুত মানুষই ইঁহাদের জীবনের প্রেরণা, ইঁহাদের সৃষ্টির উপাদান এবং উপকরণ। ইঁহারা কবি ও শিল্পী। মানুষের সঙ্গ ইঁহাদেরই সর্বাপেক্ষা বেশি বিপন্ন করিয়াছে। নিন্দা, প্রশংসা, তিরস্কার, পুরস্কার, ছদ্মবেশী শত্রু, মতলববাজ চাটুকার, ঈর্ষা-ক্লিষ্ট আত্মীয়-বন্ধু, বেরসিক পৃষ্ঠপোষক, অখ্যাতির হতাশা, অতি-খ্যাতির বিড়ম্বনা প্রভৃতি অনিবার্য-ভাবে আসিয়া ইঁহাদের অনাবিল মানসলোককে আবিল করিয়া তুলিতেছে। ইঁহারা আত্মভোলা লোক, কিন্তু সন্ন্যাসীদের মতো সাত্ত্বিক প্রকৃতির নহেন, রাজসিকতার ইন্দ্রলোকে সমাসীন হইয়া শান্তিতে সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর থাকিতে পারিলেই ইঁহারা সর্বোত্তম সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের সঙ্গই এ পথে তাঁহাদের প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা প্রকৃত রসিকের খোঁজে মানুষদের সহিত মিশিতে বাধ্য হন, কারণ মানুষই তাঁহাদের সৃষ্টির একমাত্র মূল্যদাতা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত মানুষেরা তাঁহাদের চারিদিকে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহা পীড়াদায়ক। ইহাদের চাপে অনেক সময় প্রতিভার মৃত্যু হয়। আমার মতে ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তব্য। কিন্তু আমরা সে কর্তব্য পালন তো করিই না, উপরন্তু উপাধি, পুরস্কার, খোশামোদ, নিন্দা

প্রভৃতির লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া ইঁহাদের বিরক্ত করি, কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে।

সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্য মানুষের সঙ্গ হয়তো কাম্য, অনেক সময় তাহা হিতকরও। কিন্তু যাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি, অবাঞ্ছিত মনুষ্যসঙ্গ তাহাদের পক্ষে বিষবৎ। তাহা সুধাবৎ হইত যদি তাঁহারা প্রকৃত রসিক এবং হিতৈষী লোকের সঙ্গ পাইতেন। কিন্তু সেরূপ লোক সর্বযুগেই বিরল, এ যুগে আরও বিরল।"

এ প্রবন্ধটি বাচস্পতির খুব ভাল লেগেছিল। সম্ভবত এ-ও তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে প্রবন্ধটির লক্ষ্য হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমার যে বনস্পতির ওখানে না গিয়ে সহদেবদের চণ্ডীমণ্ডপে তাস খেলছে এবং সহদেবের সাঙ্গোপাঙ্গদের নতুন নতুন রকম তাস খেলা শেখাচ্ছে এ খবরও তিনি শুনেছিলেন সীমন্তিনীর মুখে। সীমন্তিনী শুনেছিল লাঠির কাছে। লাঠি ছিল একটু গোয়েন্দা-প্রকৃতির। তার বাবা কি করছে, কোথায় যাচ্ছে এসব খবর সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখত আর তার পিসীমার কাছে এসে বলত চুপি চুপি। হেমন্ত যে আর বনস্পতির ওখানে যাচ্ছে না এতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল সীমন্তিনী। তার দাদা যে সপরিবারে এখানে এসে আছে এতেও মনে মনে একটা কুণ্ঠা ছিল তার। অথচ সে মুখে কিছু বলতে পারত না। তার দাদাকেও না, স্বামীকেও না। বাচস্পতি ও সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্যই করতেন না। বহুকাল পূর্বে হেমন্তকুমারের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছিল, তারপর থেকে হেমন্তকুমার তাঁকে এড়িয়ে চলত। তিনিও আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার উৎসাহ পাননি। সুখপুর পত্রিকা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে যে সময়ও পেতেন না। প্রায়ই টাট্টু ঘোড়াটিতে চ'ড়ে তিনি বেরিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে সংবাদের যাথার্থ্য যাচাই করবার জন্যে। ফিরে এসেই আবার বসতেন সে সংবাদটি লিখতে। সুতরাং হেমন্তকুমারকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই পেতেন না তিনি। ভূষণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি পড়ে তিনি বুঝলেন হেমন্তকুমারের সঙ্গে তাঁর একটা সংঘর্ষ হয়ে গেছে সম্ভবত। খুশি হলেন মনে মনে। হেমন্তকুমার সৈকত-কাননে আর যাচ্ছে না শুনে আরও খুশি হলেন।

হেমন্তকুমার সৈকত-কাননে না গেলেও তার ছেলেমেয়েরা সেখানে যেত। বনস্পতি তাদের সঙ্গ পছন্দ করত, তাদের মডেল করে ছবি আঁকত, তাদের নানারকম ফাই-ফরমাশ করত। ভূষণ চক্রবর্তীকে সে বলে দিয়েছিল ওদের আসা-যাওয়া যেন অবারিত থাকে।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভূষণ চক্রবর্তী যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটল। কোলকাতা শহর থেকে সমঝদার জুটতে লাগল। এরা আকৃষ্ট হল অবশ্য ছবির টানে নয়, টাকার গন্ধে। তারা ভেবেছিল বনস্পতি মিশ্র নামক যে অর্ধশিক্ষিত ধনী সন্তানটি ছবির খেয়ালে মেতে আছে তাকে একটু চোমরালে, একটু তাতালে, 'শিল্প জগতে আগামী যুগের অগ্রদূত' বা 'জুলিয়াস সীজার' বা 'নাদির শাহ,' বা ওইরকম কিছু

বলে বর্ণনা করলে তার মাথা ঘুরে যাবেই, আর মাথা ঘোরাতে পারলেই পয়সা টানা যাবে। তারা জানে অনেক বড় লোকের ছেলে মদ-মেয়েমানুষ আর ঘোড়ায় পয়সা ওড়ায়, আবার কেউ কেউ এই-সব খেয়ালেও ওড়ায়। এই সব উড্ডীয়মান পয়সা যে শেষ পর্যন্ত চতুর ব্যক্তিদের ব্যাংকে গিয়ে নীড় বাঁধে এ কথা তো সুবিদিত। চতুর ব্যক্তিগুলি এই আশা নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভূষণ চক্রবর্তীর খবর পাননি।

বনস্পতি যে একজন খেয়ালী শিল্পী এবং ধনী লোক এ খবরটা কোলকাতায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল বনস্পতির শ্বশুরবাড়িতে। জামাইষষ্ঠীর একটি নিমন্ত্রণেও যায়নি সে। সরস্বতী লিখে জানিয়েছিল, "উনি ছবি-আঁকা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে ওঁকে সময়ে খাওয়ানো-নাওয়ানো যায় না। ছবি নিয়েই দিনরাত মেতে আছেন। ওঁকে আর তোমরা যাবার জন্য পীড়াপীড়ি কোরো না। আর ওঁর মতো লোককে নিয়ে গিয়ে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়াই হবে। উনি এখানে একাই চার-পাঁচটা বড় বড় ঘর নিয়ে থাকেন। কোলকাতায় গলির মধ্যে ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ির খুপরি ঘরে গিয়ে থাকা খুবই কষ্টকর হবে ওঁর পক্ষে।..."

সরস্বতীর বাপের বাড়ি থেকে এই খবর পল্লবিত হল। এ কান সে কান হয়ে শেষকালে তা গিয়ে পৌঁছল রৈবতক গাঙুলীর কানে।

হবুচন্দ্র রাজা যখন প্রথম শূকর দেখেছিলেন তখন সবিস্ময়ে তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ আবার কি রকম জানোয়ার। আগে তো দেখিনি কখনও।" গবুচন্দ্রও দেখেননি, কিন্তু নিজের অজ্ঞতা মহারাজের কাছে প্রকাশ না করে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "মহারাজ, এ নতুন কোন জানোয়ার নয়। এর আবির্ভাবের দুটি কারণ আমি অনুমান করছি—হয় গজ-ক্ষয়, না হয় মূষিক-বৃদ্ধি।" শ্রীরৈবতক গাঙুলীর পরিচয় দিতে গিয়ে আমার গবুচন্দ্রের কথা মনে পড়ছে এবং তাঁর উক্তির অনুকরণে বলতে ইচ্ছে করছে—রৈবতক গাঙুলী হয় এন্সাইক্লোপিডিয়া-ব্রিটানিকা-ক্ষয় অথবা হেমন্তকুমার-বৃদ্ধি। রৈবতক গাঙুলীর সামাজিক পরিচয়টাও তুচ্ছ করবার মতো নয়। চাঁছা-ছোলা বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার তিনি, বিনা-বেতনে অধ্যাপনাও করেন একটা বেসরকারি কলেজে। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় সূর্যচন্দ্র-গ্রহতারা নিয়ে লোফালুফি করাটাই তাঁর অভ্যাস, অবসর-বিনোদন করেন 'প্রতিভা' আবিষ্কার করে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা তিনি বিলেত থেকে শিখে এসেছেন। বিলেতে অনেক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ছেলে-মেয়ের 'হবি' নাকি অবহেলিত, অবজ্ঞাত প্রতিভাবানদের আবিষ্কার করে 'পুশ' করা। রৈবতক গাঙুলী বিলেতে গিয়ে এই 'হবি'টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ছেলেবেলায় স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতেন, এখন 'প্রতিভা'-সংগ্রহে মন দিয়েছেন। ইনি যখন সরস্বতীর পিসতুতো ভাইয়ের কলেজ-সঙ্গিনী চম্বীর মুখে বনস্পতি মিশ্রের কথা শোনেন তখন টুকে রেখেছিলেন সেটা নোট-বুকে। তখন আসতে পারেননি, কারণ তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর বাড়িওয়ালার ভাইপো সুগ্রীবকে নিয়ে।

সে একজন উদীয়মান কবি। কোনও তরুণী নাকি তার গ্রীবার প্রশংসা করেছিল, তাই সাহিত্য জগতে সে নিজেকে 'সুগ্রীব' নামে পরিচিত করেছে। সে 'ছাতারে কাব্য' বলে যে কবিতার বইটি লিখেছে রৈবতক গাঙ্গুলী সেটিকে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে মনে করেন। এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি বক্তৃতা করে প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছেন এ কাব্য কোথায় কোথায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-পরিধিকে অতিক্রম করেছে, নাম-জাদা সব লোকদের মুখ দিয়ে কলম দিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত তিনি করিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মনোমত ফল হয়নি, সুগ্রীবের বই বিক্রি হয়নি মোটে। তিনি তাকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে আগামীবারে নোবেল পুরস্কার তাকে পাইয়ে দেবেন, কারণ যাঁদের হাতে বিচারের ভার তাঁরা সবাই নাকি তাঁর বন্ধুলোক। কিন্তু বন্ধু ছোকরার খুড়ো, মানে তাঁর বাড়িওয়ালা, বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসলেন একটা, বাকি ভাড়ার জন্যে নালিশ করে দিলেন তাঁর নামে। এরপর আর সুগ্রীবের কাব্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার উৎসাহ রইল না তাঁর। নিজের প্রেস্টিজ বজায় রাখবার জন্যে বড় রাস্তার উপর বড় একটা বাড়ি নিতে হয়েছিল তাঁকে। সাধ এবং সাধ্যের সামঞ্জস্য করে চলতে যাঁরা উপদেশ দেন এবং যাঁরা সে উপদেশ শুনে গদগদ হয়ে পড়েন রৈবতক গাঙ্গুলী এদের কোনও দলেরই নন। তিনি বলেন, তোমার সাধ অনুসারেই তুমি চলতে চেষ্টা কর, পাথেয় জুটেই যাবে কোন-না-কোন উপায়ে। তিনি সুগ্রীবের কাকার বাড়িভাড়া মিটিয়ে দিতেনই, হয়তো দু'দিন দেরি হত, কিন্তু ভদ্রলোকের তর সইল না, একেবারে কোর্টে ছুটলেন!

সুতরাং আবার তাঁকে নোটবুক খুলে সন্ধান করতে হল, এরপর কোন্ অবহেলিত 'প্রতিভা'র প্রতি তিনি মনোযোগ দিতে পারেন। দেখলেন তিনটি নাম রয়েছে। প্রথম, জটাধারী দাস, উইদিন ব্র্যাকেট, কমরেড্-বৈষ্ণব। ইনি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশের সন্তান, বড় কীর্তনীয়া, কিন্তু এঁর বিশেষত্ব ইনি কীর্তনের সঙ্গে বোম্বাই টপ্পার সুর মিশিয়ে নূতন ধরনের এক সুর সৃষ্টি করেছেন। আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। ঠিকানা লেখা আছে। বাড়ি স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তায় যেতে হয়, গরুর গাড়ি ভিন্ন অন্য যান অচল সে পথে। রৈবতক সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করলেন জটাধারীকে। দ্বিতীয় নামটি জর্জেট মাসী, আসল নাম করুণাময়ী বর্মা। ইনি সূচী-শিল্পী। এঁর বিশেষত্ব ইনি পুরোনো জর্জেট কাপড় দিয়ে কাঁথা, দোলাই, সুজ্নী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। এককালে এঁর স্বামী অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। এখনও এঁর যাঁরা বান্ধবী তাঁরা সবাই ধনী, তাঁরাই এঁকে পুরোনো জর্জেট সরবরাহ করেন। কিন্তু নিজের অবস্থা এঁর শোচনীয়। স্বামী অনেকদিন আগে মারা গেছেন, পূর্ববঙ্গের জমিদারী পাকিস্তানের কবলে। একটি মাত্র ছেলে বগেন লম্বা চুল রেখে বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়, যা রোজগার করে তাতে নিজেরই চলে না তার। জর্জেট মাসীর যা কিছু সঞ্চিত অর্থ গয়না-গাঁটি ছিল তা ওই ছেলের পিছনেই গেছে। জর্জেট মাসী এখন কোলকাতারই এক অভিজাত-পল্লীতে বাস করেন

তাঁর এক খুড়তুতো বিপত্নীক দেওরের বাড়িতে। রৈবতক গাঙ্গুলী তাঁকে 'বঙ্গ-সংস্কৃতি'র আসরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানকার কয়েকটি খদ্দরধারী চাঁইয়ের জন্য পারেননি। তাঁরা বলে বসলেন—জর্জেট বাংলার নয়, মস্‌লিন হলে বিবেচনা করে দেখতাম। শিল্পের ক্ষেত্রে এরকম সঙ্কীর্ণ মনোভাব প্রত্যাশা করেননি রৈবতক গাঙ্গুলী। তিনি জর্জেট মাসীর নামটার দিকে খানিকক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলেন, তারপর স্থির করলেন এঁকে নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তাঁর যে দূর সম্পর্কের দেওরটির কাছে থাকেন, তিনি এ বিষয়ে মোটেই উৎসাহী নন। এঁর সঙ্গে ফোনে এ বিষয়ে একবার আলাপ করেছিলেন তিনি, যদি চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে একটা প্রদর্শনী খোলবার জন্যে কিছু অর্থসাহায্য করতে রাজী হতেন তিনি, তাহলে পাব্‌লিসিটির ব্যবস্থা করা অসম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। কিন্তু তিনি রাজী হননি। অবশেষে বনস্পতি মিশ্রকেই পল্লীগ্রামের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা সাব্যস্ত করলেন তিনি।

সুখপুরে এসে সৈকত-কাননে পৌঁছতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। সুখপুরে রেল স্টেশন নেই। পাঁচ মাইল দূরের জংশন স্টেশন থেকে গো-যানে কিম্বা পদব্রজে আসতে হয়। স্টেশনে নামবামাত্রই তিনি উপলব্ধি করলেন যে বনস্পতি মিশ্র এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। গাড়ির গাড়োয়ান কুলি সবাই চেনে তাঁকে। প্রথমে অবশ্য একটু মুশকিলে পড়লেন নেবেই। নিখুঁত সাহেবী স্যুট পরে এসেছিলেন, গরুর গাড়িতে চড়লে 'ক্রীজ'গুলো নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এ ছাড়া তো অন্য যানও নেই। গাড়িতে আলতোভাবে বসে তিনি নিজে হয়তো যেতে পারবেন, কিন্তু ক্যামেরাটা? বেশ বড় ক্যামেরা তাঁর। ওটাকে গরুর গাড়ির উপর চাপিয়ে নিয়ে যেতে ভয় করছিল, গাড়ির ঝাঁকানিতে ভিতরকার কোনও স্ক্রু আলগা হয়ে যায় যদি?

গাড়ির গাড়োয়ান কিন্তু সমস্যাটার সমাধান করে দিলে। বললে, "আমার ভাই ওটা মাথায় করে নিয়ে যাবে।"

"কত দিতে হবে তোমার ভাইকে এজন্য?"

"কিছু দিতে হবে না সায়েব। আপনি ভদ্দর নোক, বসুবাবুর বাড়িতে যাবেন, এর জন্যে আর আলাদা করে কিছু দিতে হবে না আপনাকে। গাড়ির ভাড়া তো দিচ্ছেনই। ভাইটা গাড়িতে করে আমার সঙ্গে এসেছিল। হেঁটে তো ওকে ফিরতেই হবে সুখপুরে, আপনার সঙ্গে বসে তো আর যেতে পারে না, আপনার জিনিসটা নিয়ে চলুক—"

এই অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন রৈবতক। মনে পড়ল বিলেতের এক কাণ্ট্রি সাইডে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার এক অপরিচিত লোকের কাছে কি সাহায্যই পেয়েছিলেন। সে তাঁকে পোস্টাফিসের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল, কোন্ হোটেলে গেলে ভাল খানা পাওয়া যাবে তাও বলে দিয়েছিল। তার সঙ্গে তুলনীয় লোক যে এদেশের পাড়াগাঁয়েও আছে এ ভেবে বেশ পুলকিত হলেন তিনি। বিস্মিতও হলেন। তাঁর বিস্ময় কিন্তু চরমে পৌঁছল যখন সৈকত-কাননে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি।

সৈকত-কাননের বাড়িটি দেখে ভালো লাগল তাঁর। বনস্পতি যে শাঁসালো ব্যক্তি বাড়িটি দেখেই তা অনুভব করলেন। বারান্দার উপরে উঠতেই দেখা হল বল্লমের সঙ্গে।

"আপনি কে?"

রৈবতক তাঁর কার্ডটি দিলেন তাকে। কার্ডটি উলটে পালটে দেখে বল্লম সেটি ফেরত দিলে।

"আমি ইংরেজি পড়তে জানি না। আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

"কোলকাতা থেকে। শিল্পী বনস্পতি মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"ও। তাহলে আপনি ভূষণ কাকার কাছে যান। ওই ঘরে থাকেন তিনি।"

ভূষণ চক্রবর্তীর ঘরের বন্ধ দ্বারের দিকে দু'এক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন রৈবতক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "বনস্পতিবাবু কোন্ ঘরটায় থাকেন?"

"ভিতরে থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে আগে ভূষণ কাকার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।"

বল্লম তাঁকে সঙ্গে করে ভূষণ চক্রবর্তীর ঘরের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর কপাটটা একটু ফাঁক করে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে বলল, "কোলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন"—বলেই এক ছুটে চলে গেল সে ভিতরে। বেরিয়ে এলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

"কি চান?"

"শিল্পী বনস্পতি মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"তিনি যে শিল্পী সে কথা আপনি জানলেন কি করে? তাঁর ছবি তো কোথাও ছাপা হয়নি!"

অপরূপ একটা হাস্যস্নিগ্ধ ভাব ফুটে উঠল রৈবতক গাঙ্গুলীর মুখে। দুটি প্রচলিত উপমা তিনি ব্যবহার করলেন পর পর।

"আগুন কি কখনও চাপা থাকে? ফুলের গন্ধ কি লুকিয়ে রাখা যায়?"

ভূষণ চক্রবর্তীর ভ্রূ কুঞ্চিত হল একটু।

প্রশ্ন করলেন, "আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

"এই যে—"

কার্ডটি দিলেন। কার্ডে-ছাপা নামটি দেখে তার ভ্রূযুগল আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। এ নাম তো তিনি কাগজে দেখেছেন, তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে মনে বললেন, "ও, এই তাহলে সেই রাস্কেলটা—"

মুখে বললেন, "দেখা হবে না।"

"হবে না! বলেন কি! অতদূর থেকে এসেছি, ক্যামেরা বয়ে এনেছি একটা ছবি তুলব বলে, আর আপনি বলছেন, দেখা হবে না!"

দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ভূষণ চক্রবর্তী—"হবে না।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন রৈবতক।

"আপনি কি ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ?"

"না, আমি ওঁর দারোয়ান।"

"ও।"

রৈবতকের চোখে এক ঝলক সকৌতুক বিস্ময় ফুটে মিলিয়ে গেল।

"দারোয়ান ? কিন্তু আমি তো দারোয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে আসিনি। আমি এসেছি শিল্পীর কাছে। তিনি যদি দেখা না করতে চান, সেটা মানব, কিন্তু দারোয়ানের কথায় ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। আপনি বরং আমার কার্ডটা তাঁকে দিয়ে আসুন, আর আমি কেন এসেছি তাও জানিয়ে দিন তাঁকে। আমি তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখব বলে মাল-মসলা সংগ্রহ করতে এসেছি। তাঁর আর্টের বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই আলোচনা করা দরকার। তাছাড়া তাঁর ছবি তুলব, তাঁর ছবিরও ছবি তুলব—"

ভূষণ চক্রবর্তীর খোঁচা খোঁচা ঘন গোঁফ ছিল। গোঁফের চুলগুলো নড়তে লাগল। নাকের নীচেটাও কেঁপে উঠল, ঠিকরে বেরিয়ে এল চোখ দুটো। মনে হল এখনই বুঝি তিনি রৈবতকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবেন তাঁকে। কিন্তু তা না করে একটু উচ্চকণ্ঠে তিনি বললেন, "ওসব কিছু হবে না, আপনি ফিরে যান।"

রৈবতক এবার চটেছিলেন। কিন্তু বিলেত-ফেরত মার্জিত-রুচির লোক তিনি, মনের ভাব চেপে রাখবার অসীম ক্ষমতা তাঁর। তাই একটু মোলায়েম মুচকি হেসে তিনি বললেন, "আপনার ব্যবহারে সত্যিই আমি আশ্চর্য বোধ করছি। আপনার এই বিরুদ্ধ মনোভাবের হেতুটা জানতে পারি কি ?"

"ঘেয়ো নেড়ী কুকুরকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়ার রেওয়াজ নেই এখানে। বৈঠকখানাতে তাকে ঢুকতে দিই না, হাতাতেও না, সে যদি বিলিতি স্যুট প'রে আসে তাহলেও না।"

রৈবতক এদিক-ওদিক চাইলেন একবার। তাঁর সন্দেহ হল লোকটা পাগল নয় তো! যে ছেলেটি তাঁকে এর কাছে দিয়ে গেল, তারই সন্ধানে তাঁর চোখের দৃষ্টিটা একবার ঘুরে এল চারিদিকে, কিন্তু তাকে দেখতে পেলেন না। পকেট থেকে মুসলমানী-লুঙ্গির টুকরোর মতো একটা রুমাল বার করে কপালটা আর মুখটা মুছে ফেললেন। তারপর ভূষণ চক্রবর্তীর দিকে চেয়ে বললেন, "আমাদের দেশের ঐতিহ্য পাড়াগাঁয়ে বেঁচে আছে আমরা শহুরে মানুষরা এই কথাই শুনে এসেছি বরাবর। স্টেশনে নেবে তার একটু পরিচয়ও পেয়েছিলাম গাড়োয়ানটার কাছে, আশা ছিল তার পরিপূর্ণ রূপটি দেখতে পাব আপনাদের সান্নিধ্যে, যে আতিথেয়তা আমাদের দেশের প্রত্যেক অতিথির শ্লাঘ্য পাওনা সেটুকু থেকে আমাকে অন্তত বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু আপনার ব্যবহারে —"

ভূষণ চক্রবর্তী তাঁকে কথা শেষ করতে দিলেন না।

"অচেনা একটা লোককে অন্দরমহলে নিয়ে বাড়ির কর্তার কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর করতে কেউ দেয় না কখনও। ভুল ধারণা আছে আপনার। ক্যামেরা নিয়ে

ফোটো তুলতেও দেয় না। আর আপনি তো অচেনা অতিথি নন, আপনাকে খুব ভাল করে চিনি আমি। আপনার মতো মতলববাজের সঙ্গে কথা কয়ে আমি যে সময় নষ্ট করেছি এইটেই কি যথেষ্ট নয়?"

মতলববাজ কথাটা চাবুকের মতো আঘাত করল রৈবতক গাঙুলীকে। কিন্তু তবু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

"আপনি আমাকে চেনেন? আমার তো মনে পড়ছে না এর আগে কখনও আপনাকে দেখেছি।"

"না, দেখেননি। আমিও আপনাকে দেখিনি।"

"তবে আমাকে মতলববাজ বলে চিনলেন কি করে?"

"চেহারা দেখে মতলববাজকে চেনা যায় না, চেনা যায় তার চালচলন থেকে। আপনার চালচলনের খবর পেয়েছিলাম খবরের কাগজের কৃপায়। আপনিই তো সেই রৈবতক গাঙুলী যিনি হনুমান, না সুগ্রীব কার ল্যাজে তেল দিয়েছিলেন হাবাতে কাব্য, না ছাতারে কাব্য, না খ্যাকড়া কাব্য নিয়ে? নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন বাংলার সব কবিদের ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে আর ছাপিয়েছিলেন আপনার সেই অমূল্য ভাষণ সম্পাদকের খোশামোদ করে? সেই লোকই তো আপনি। সেই হনুমানটার কাছ থেকে কত টাকা মেরেছিলেন?"

এবার রৈবতক একটু অপ্রতিভ হলেন সত্যি সত্যি। আশ্চর্য, মুখের মার্জিত হাসিটি কিন্তু মলিন হল না। বরং সেটিকে আর একটু মার্জিত করে বললেন, "আপনার মতো রূঢ় অভদ্র ভাষা ব্যবহার করবার শিক্ষা আমার নেই। 'ছাতারে কাব্য' এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে মত আমি ব্যক্ত করেছি সেটা আমার নিজস্ব মত, সে মত ব্যক্ত করবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।"

"আপনার ওই নিজস্ব মতের জন্য আপনাকে আমার এলাকা থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবার অধিকারও আমার নিশ্চয়ই আছে। আপনি চলে যান, আপনাকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাইনে—"

"শিল্পীর সঙ্গে তাহলে দেখা হবে না কিছুতেই।"

"কিছুতেই না।"

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"এখানে কোনও হোটেল আছে?"

"না।"

"তাহলে কোথায় যাই বলুন, খাওয়া দাওয়াই বা করব কোথায়?"

"ওই বেঞ্চিটায় বসুন। আমার কাছে যা খাবার আছে দিচ্ছি। খেয়ে আপনি স্টেশনেই ফিরে যান, একটু পরেই ট্রেন পেয়ে যাবেন।"

ভূষণ চক্রবর্তী ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং একটু পরে একটি মাটির খুরিতে করে

কিছু ছোলা-ভিজে আর গুড় নিয়ে এসে ঠক্ করে নামিয়ে দিলেন সেটা তাঁর পাশে। তারপর ঢুকে গেলেন ঘরে। পর মুহূর্তেই তার ঘরের কপাটটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ভিতর থেকে চীৎকার করে কি যেন বললেন কাকে। একটু পরে একটা চাকর চকচকে কাঁসার ঘটিতে করে এক ঘটি জল দিয়ে গেল।

রৈবতক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর উঠে পড়লেন।

…ঘণ্টা দুই পরে তাঁকে দেখা গেল জাহ্নবী-নিবাসে সাবু মিত্তিরের দপ্তরে। সাবু মিত্তির তাঁর সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করলেন, তাঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিলেন, ভূষণ চক্রবর্তীর হাতে তাঁর লাঞ্ছনার কথা শুনে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে একথা বলতেই হল যে বনস্পতির সঙ্গে দেখা করতে হলে ওই অভদ্র ভূষণ চক্রবর্তীরই মত নিতে হবে। তাঁর অমতে দেখা হবে না।

"শিল্পী বনস্পতি কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হয়ে থাকবেন এ-কথা তো ভাবাই যায় না।"

"বন্ধুদা নিজেই ওঁকে সে অধিকার দিয়েছেন, লিখে দিয়েছেন।"

"বলেন কি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রৈবতক কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "এতদূর থেকে খরচ পত্তর করে এসেছি, একবার দেখা না করে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি গিয়ে ভূষণবাবুকে একটু অনুরোধ করতে পারেন না?"

"না, ওইটি পারব না। আমি তাঁর কাছে পারতপক্ষে যাই না। তবে হিমুদা সৈকত-কাননে যান। তিনি যদি কিছু পারেন দেখি, আপনিও আসুন না।"

হেমন্তকুমারের সঙ্গে ভূষণ চক্রবর্তীর সংঘর্ষের খবরটা সাবু পায়নি। আগেই বলেছি খবরটা হেমন্তকুমার কারো কাছে প্রকাশ করেনি। রৈবতক গাঙুলীকে নিয়ে সাবু যখন গেল তার কাছে তখনও খবরটা ভাঙল না সে। রৈবতককে খুব আদর-যত্ন করে বসাল, নিজের হাতে তৈরি করে 'কফি' খাওয়াল (সুখপুর গ্রামে একমাত্র হেমন্তকুমারই কফি খেত), তারপর একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে, "আমি জানতুম মরুভূমিতেই লোকে মরীচিকা দেখে, শস্যশ্যামল বাংলা দেশের সমতলেও যে ও-জিনিস দেখা যায় তা জানা ছিল না।"

হেমন্তকুমারের বাক্-ভঙ্গীতে খুশি হলেন রৈবতক। তাঁর আহত-আত্মসম্মানের নিদারুণ ক্ষতে একটু যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল এতে।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, "চিরকালই মরীচিকার পিছনেই দৌড়চ্ছি মশাই। মরীচিকার পিছনে দৌড়তে দৌড়তে লণ্ডন প্যারিসেও গিয়েছিলাম, আবার সুখপুরেও এসেছি। কিন্তু এখানে যে রকম ঘা খেলাম, এমনটা আর কোথাও খাইনি।"

"ও, ভূষণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি! ভূষণ একটু কড়া লোক, কিন্তু লোক ভাল—"

"দেখুন না যদি শিল্পীর সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দিতে পারেন।"

"শিল্পী? দামী কাগজে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে রং লাগালেই শিল্পী হয় না কি! যাই হোক চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে নেওয়াই ভালো—"

"কিন্তু আপনি সাহায্য না করলে সেটা তো হবে না।"

"দেখি।"

হেমন্তকুমার সেই যে বেরিয়ে গেল আর ফিরল না।

তার ছেলে সড়কি একটু পরে এসে খবর দিলে—"বাবা একটা জরুরি দরকারে শিয়ালমারিতে চলে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।"

সমস্ত দিন অপেক্ষা করে রৈবতক গাঙ্গুলীকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হল অবশেষে।

রৈবতক গাঙ্গুলী ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু নিরস্ত হলেন না।

পত্রযোগে হানা দিলেন বনস্পতির কাছে। তাঁর আশা ছিল এইবার তিনি ভূষণ চক্রবর্তী-রূপ ঘোড়া ডিঙিয়ে বনস্পতি-রূপ ঘাসটি খেতে পারবেন। কিন্তু এবারও হতাশ হতে হল তাঁকে। কারণ বনস্পতি তাঁর চিঠিটি ভূষণ চক্রবর্তীর কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছিল উত্তর দেবার জন্য। ভূষণ চক্রবর্তী সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দিলেন—"সবিনয় নিবেদন, আপনি শ্রীবনস্পতি মিশ্রকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার উত্তরে জানাইতেছি যে তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। এ সম্পর্কে আর পত্রালাপ করিতেও তিনি ইচ্ছুক নহেন। ইতি—"

রৈবতক গাঙ্গুলী একটি মাত্র নমুনা। বাইরে থেকে আরও অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু তারা কেউ ভূষণ চক্রবর্তীকে কায়দা করতে পারেনি। দশ বছর ধরে মূর্তিমান নিষেধের মতো তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বনস্পতির দরজার সামনে। অবশ্য সবাইকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি, বনস্পতির শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কিত কিছু কিছু সমঝদার ঢুকে পড়েছিল অন্দরমহলে। কিন্তু তারা খুব বেশি ক্ষতি করতে পারেনি। কারণ একটু বেগতিক দেখলেই বনস্পতি স্বয়ং ডেকে পাঠাতেন ভূষণ চক্রবর্তীকে, আর বলতেন, "ভূষণ, ইনি তোমার বৌদির পিসতুতো ভাই, খুব রসিক লোক, শিবু ময়রার দোকান থেকে কিছু ভালো রসগোল্লা আনাও দিকি"—এটি ছিল তার ইঙ্গিত। ভূষণ চক্রবর্তী রসগোল্লা আনাতেন এবং আড়ালে সরস্বতীকে বলে আসতেন, "বৌদি, দেখবেন আপনার ভাইটি মত্ত মাতঙ্গের মতো শিল্পীর কমল বনে যেন ঢুকে না পড়েন।" সরস্বতীও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন খুব। তাঁর বাপের বাড়ির

লোকেরা যাতে বনস্পতিকে বিরক্ত না করে সে বিষয়ে কড়া নজর ছিল তার। আর তারা আসতও ক্বচিৎ।

পাঁচ

…এই ভাবেই চলছিল।

কিছুদিন পরে এদের পারিবারিক জীবনে প্রধান ঘটনা ঘটল একটি। বনস্পতির একটি কন্যাসন্তান হল। বাচস্পতির কোন ছেলে-মেয়ে হয়নি, তিনি খুব মেতে উঠলেন এতে। ধূমধাম করে খাওয়া-দাওয়া তো হলই, 'সুখপুর-পত্রিকা'র একটি বিশেষ সংখ্যাই বের করে ফেললেন তিনি। তার থেকে সংবাদটি উদ্ধৃত করছি।

"গত বৈশাখী পূর্ণিমার শুভলগ্নে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় শ্রীমান বনস্পতির একটি সুলক্ষণা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মিশ্র পরিবারের সকলে যে অবিমিশ্র আনন্দলাভ করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। শ্রদ্ধেয় শিরোমণি মহাশয় কন্যাটির ঠিকুজি দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে কন্যার তুঙ্গী সূর্য, তুলা লগ্ন এবং তুলা রাশি হওয়াতে কন্যার সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। বৈশাখী পূর্ণিমা ভগবান বুদ্ধদেবেরও জন্মদিন। ইহাও অনেকে বলিতেছেন যে আমাদের স্বর্গগতা জননীর মুখাবয়বের সহিত শিশুকন্যার মুখাবয়বের নাকি সাদৃশ্য আছে। ইহাও অনেকের অনুমান তিনিই নাকি বনস্পতির কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা কঠিন। কন্যার নামকরণ লইয়া একটু মতদ্বৈধ হইয়াছে। বনস্পতির ইচ্ছা কন্যার নাম 'বর্ণ' হউক। শ্রীমান শিল্পী, সুতরাং বর্ণই তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সেদিক দিয়া নামকরণ ঠিকই হইয়াছিল, কিন্তু শ্রদ্ধেয় শিরোমণি মহাশয় ইহাতে ব্যাকরণের অসঙ্গতি দেখিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন সংস্কৃত ভাষায় 'বর্ণ' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। বাংলা ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগে কোন কোনস্থলে তাহা পুংলিঙ্গ রূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন ভাষাতেই 'বর্ণ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং কন্যার নাম 'বর্ণ' দিলে তাহা ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইবে না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে 'বর্ণ' শব্দটির প্রতি বনস্পতির যদি পক্ষপাতিত্ব থাকে তাহা হইলে নামটিকে আর একটু দীর্ঘ করিয়া 'বর্ণ-বতী' করা যাইতে পারে। তাহা হইলে উভয় দিকই রক্ষিত হইবে। শ্রীমান বনস্পতি কিন্তু অত দীর্ঘ নাম পছন্দ করিতেছে না। আমরা প্রস্তাব করিতেছি ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে মধ্যপথ অবলম্বন করিলে কেমন হয়, তিন অক্ষরের 'বর্ণনা' নামটি রাখিলে ক্ষতি কি? শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং ইহার আভিধানিক অর্থ দীপন, রঞ্জন প্রভৃতি। রঞ্জাবতীর পৌত্রীর পক্ষে এ নাম বেমানান হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

এর পর সুখপুরের মিশ্র-পরিবারে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে অসাধারণত্ব কিছু নেই। তা সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনাপুঞ্জের আবর্তন এবং পুনরাবর্তন মাত্র। এই কাহিনীর

পক্ষে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাগুলি ঘটেছে 'সুখখুর-পত্রিকা'র প্রায় কুড়ি বছরের ফাইল ঘেঁটে তা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করছি, প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করবার জন্য।

"শ্রীমতী বর্ণনার কলিকাতা যাত্রা। শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বর্ণনা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য গতকল্য কলিকাতা গিয়াছে। শ্রীমতীর বয়স মাত্র দশ বৎসর। এতদিন গৃহেই সে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেছিল, কিন্তু শিরোমণি মহাশয় অতি-বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি এমন কি চলচ্ছক্তিও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। শারীরিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি উৎসাহের সহিত শ্রীমতীর অধ্যাপনা করিতেছিলেন, কিন্তু বনস্পতির মতে এ বয়েসে তাঁহার উপর আর চাপ দেওয়া উচিত নহে। তাছাড়া আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের নির্দেশ ছিল যে আমরা যেন আমাদের বংশধরদের কলিকাতায় পাঠাইয়া আধুনিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করি। পিতৃদেবের অন্তিমকালীন এ উপদেশ অমান্য করা অনুচিত মনে হওয়াতে আমরা শ্রীমতীর শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতাতেই করিয়াছি। সে কলিকাতায় 'কন্ভেন্ট' নামক বিদ্যালয়ে ভরতি হইবে এবং সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্রীনিবাসে থাকিবে। শ্রীমতীর মাতুলালয়ও কলিকাতায়। সেখানে থাকিয়াও সে পড়িতে পারিত, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। তাহার মাতামহ মাতামহী উভয়েই কিছুকাল পূর্বে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাহার একমাত্র মাতুল একটি ধনী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া ইংলণ্ডে সস্ত্রীক প্রবাস-জীবন যাপন করিতেছে। জনশ্রুতি সেইখানেই সে নাকি উপার্জনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এদেশে আর ফিরিবে না। কলিকাতায় তাহাদের বাসাও আর নাই, কারণ তাহারা ভাড়াটিয়া বাসাতে বাস করিত। সুতরাং ছাত্রী-নিবাসেই শ্রীমতীর থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ ও নাগরিক জীবন যাপন করিয়া শ্রীমতী যেন ভারতীয় নারীত্বের মর্যাদাকে নূতন অলঙ্কারে ভূষিত করিতে সমর্থ হয়।"

দ্বিতীয় খবরটি সাত বছর পরের।

"কলিকাতার বিদ্যালয়ে শ্রীমতী বর্ণনার কৃতিত্ব। শ্রীমতী বর্ণনা এবার প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজি, বাংলা এবং সংস্কৃতে সম্মানসূচক অক্ষর (লেটার) লাভ করিয়াছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ আশা করেন শ্রীমতী হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভও করিবে। এ সংবাদ আমাদের সকলের পক্ষেই নিঃসন্দেহে আনন্দজনক, কিন্তু সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনা ঘটাতে সে আনন্দ কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর হইতেই গঙ্গার ধারা সুখপুর গ্রামের কোল ঘেঁষিয়া বহিতেছিল, এবার বর্ষায় তাহা উদ্দাম হইয়া আমাদের গঙ্গাতীরস্থ 'জাহ্নবী-নিবাস' নামক অট্টালিকাটিকে গ্রাস

করিয়াছে। এ পারের অনেক স্থানেই ভাঙন ধরিয়াছে, অনেকের জমি কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের জমিও রক্ষা পায় নাই। গঙ্গার এ-কূলবাসী অনেকের মনেই ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, হইবারই কথা, কারণ সর্বনাশ আসন্ন। মা গঙ্গার গতি যদি এইরূপই থাকে এবং জননী যদি তাঁহার সংহারিণী প্রবৃত্তি সংবরণ না করেন, তাহা হইলে এ অঞ্চলের বহু পরিবার উৎসন্ন হইবে। 'জাহ্নবী-নিবাস' গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হওয়াতে সর্বাপেক্ষা বেশি বিব্রত হইয়াছেন হেমন্তকুমার। তিনি তাঁহার একাদশটি পুত্রকন্যা লইয়া জাহ্নবী-নিবাসে বাস করিতেন। জাহ্নবী-নিবাসের চারিপাশে তিনি একটি সুন্দর সব্‌জিবাগও করিয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের ইটালীদেশীয় বাঁধা-কপির অপরূপ বর্ণ-বৈশিষ্ট্য ও সুস্বাদ এ গ্রামের অনেকেরই হৃদয় হরণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, মা গঙ্গা সবই গ্রাস করিলেন। ভগবানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। গ্রামে অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসংকীর্তন এবং দৈনিক গঙ্গা-পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

তৃতীয় খবর আরও তিন বছর পরের।

"মিশ্র পরিবারের কলিকাতা যাত্রা। বিগত কয়েক সংখ্যায় মিশ্র-পরিবারের বৈষয়িক সর্বনাশের কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গঙ্গার তীরে তীরে আমাদের যত ধানের জমি ছিল মা-গঙ্গা সবই একে একে গ্রাস করিয়াছেন। সৈকত-কাননও রক্ষা পায় নাই। শিল্পী বনস্পতি তাহার পিতামাতার যে সিমেন্ট মূর্তিগুলি নির্মাণ করিয়াছিল সে দুইটিও গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব যে সকল দুর্লভ বৃক্ষলতাদি সৈকত-কাননে রোপণ করিয়াছিলেন সেগুলিও আর নাই। গত সপ্তাহে গঙ্গার ধারা সৈকত-কাননের মনোরম সৌধটির অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়াতে বনস্পতি মিশ্র সপরিবারে তাহার অঙ্কিত দুই শতাধিক চিত্রসহ তাহার পুরাতন বসতবাটিতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। হেমন্তকুমার পূর্ব হইতেই সেখানে আসিয়াছিল ; তাহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা, কয়েকটি বেশ বড় হইয়াছে। সুতরাং পুরাতন বসতবাটিতেও স্থানাভাব ঘটিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে অন্নাভাব ঘটিবারও সম্ভাবনা। কারণ যে জমি আমাদের অন্ন সরবরাহ করিত তাহা আর নাই। পোস্টাফিসে যৎসামান্য যাহা সঞ্চিত আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কোনক্রমে কালাতিপাত করিতেছিলাম, কিন্তু গত পরশ্ব হইতে গঙ্গার আবর্তসংকুল ভয়ঙ্করী ধারা আমাদের পুরাতন বসতবাটির দিকেও অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং সুখপুর হইতে এবার আমাদের বাস উঠিল। শ্রীমতী বর্ণনা কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়াছে, সেইখানেই আমাদের চলিয়া যাইতে হইবে। শ্রীমতী বর্ণনা বলিল পরিবারের লোকসংখ্যা অল্প হইলে একটি ছোট পাকা বাড়িতেই সংকুলান হইয়া যাইত। মাসিক ষাট টাকা ভাড়ায় সে একটি বাড়ি যোগাড়ও করিয়াছিল, কিন্তু হেমন্তকুমারের পরিবারবর্গকে লইয়া সেখানে কুলাইবে না। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে নবীনগঞ্জে হেমন্তকুমারের মাতুলালয়। সে

সেখানে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিত। কিন্তু শ্রীমান বনস্পতির তাহা ইচ্ছা নয়। বনস্পতি বলিয়াছে আমরা যেখানেই থাকি একসঙ্গে থাকিব। দুঃখে পড়িয়াছি বলিয়া নিজেদের হস্তপদাদি আমরা যেমন বিসর্জন দিই না, যাহাদের সহিত এতকাল একসঙ্গে বাস করিয়াছি সেই আত্মীয়-স্বজনদেরও তেমনি বিসর্জন দিব না। হেমন্তকুমারের ছেলে-মেয়েগুলি বনস্পতির খুব প্রিয়। সুতরাং শিল্পীর ইচ্ছা অনুসারে বর্ণনা এক বস্তিতে চারিটি বড় বড় খোলার ঘর ভাড়া করিয়াছে। আগামীকল্য আমরা সেইখানেই যাইব। পিতৃ পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে খুবই কষ্ট হইতেছে কিন্তু ইহা ছাড়া গত্যন্তরও তো নাই। সবই যে গঙ্গাগর্ভে চলিয়া গেল। থাকিবার মধ্যে রহিল কেবল আমাদের ‘বুড়ির জঙ্গল’ বনকরটা, সেটা গঙ্গার তীর হইতে কিছু দূরে। পুরাতন সুখপুরের অস্তিত্ব লোপ পাইল, দেখা যাক নূতন কোন সুখপুরের সন্ধান পাওয়া যায় কি না।”

দ্বিতীয় পর্ব

এক

সেদিন খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নবনী রায়ের। নবনী রায় কোনও ভাঙা জিনিসকেই জোড়া লাগাবার চেষ্টা করে না, ভাঙা ঘুমও নয়। সে বিছানায় উঠে বসল, মাথার দিকের জানলাটা ভাল করে খুলে দিলে, তারপর সিগারেটটি ধরিয়ে চীৎকার করে উঠল—"প্রহ্লাদ—"। সকালে উঠেই এইটি তার প্রথম কাজ, ঠাকুর-দেবতার নাম করা নয়। খোলা জানলাটির সামনে বিছানায় বসে সামনের রাস্তাটির দিকে চেয়ে সে ধীরে ধীরে সিগারেটটিতে টান দিতে থাকে যতক্ষণ না প্রহ্লাদ চা দিয়ে যায়। সিগারেটটি নিঃশেষ হওয়ার পরও যদি চা না এসে পৌঁছয় তাহলে দ্বিতীয় আর একটি সিগারেট ধরিয়ে দ্বিতীয় আর একটি ডাক দেয় সে। তৃতীয় সিগারেট ধরাবার বা তৃতীয় ডাক দেবার দরকার প্রায়ই হয় না, চায়ের পেয়ালা নিয়ে প্রহ্লাদ এসে পড়ে।

প্রহ্লাদ ব্যক্তিটি দুর্বোধ্য। তাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে নবনী যখন বাসায় থাকে না তখন সে লুকিয়ে ডাক্তার সুকুমার সামন্তের জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকে প্রৌঢ়া নার্স সুবাসিনীর কাজ-কর্ম ক'রে দিয়ে আসে, বোঝবার উপায় নেই যে তার বয়স যাটের কাছাকাছি, বোঝবার উপায় নেই যে সে বিহারী। প্রহ্লাদের একটি চুলও পাকেনি, একটি দাঁতও পড়েনি, চমৎকার বাংলা বলে। জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকে সে যে কখন যায় তা নবনী জানতেও পারে না, কারণ বাসায় ফিরে সে প্রহ্লাদকে অনুপস্থিত দেখেনি কখনও। এটা অবশ্য সম্ভব হয়েছিল বিশেষ কোনও গুণের জন্য নয়, ডাক্তার সামন্তর ক্লিনিকটি নবনীর বাসার খুব কাছে বলে নবনী বাসায় ঢুকলেই প্রহ্লাদ ক্লিনিকের জানলা থেকে স্পষ্ট দেখতে পেত সেটা।

…সেদিন সকালে জানলা খুলেই নবনী দেখতে পেল যে কুয়াশা হয়েছে, পাতলা মসলিনে যেন চারদিক ঢাকা। নবনী কবিতা লেখে না, কিন্তু কবি-প্রকৃতির। তাই তার মনে হল আকাশলোক থেকে কোনও অশরীরিনী অভিসারিকা নিশীথ রাত্রে হয়তো এসেছিল এখানে, এখনও ফিরে যেতে পারেনি, অপ্রত্যাশিতভাবে ভোর হয়ে গেছে, নিজের ওড়নার আড়ালে হয়তো এখনও সে লুকিয়ে আছে, কিম্বা নেই, হয়তো আলোর পথেই সে ফিরে গেছে আকাশে…হঠাৎ সে দেখতে পেলে তার বাসার ঠিক সামনেই রাস্তার ওধারে কালো স্তূপের মতো কি একটা যেন রয়েছে। সিগারেটে ধীরে ধীরে টান দিতে দিতে অসম্ভব রকম একটা কল্পনা করে বসল সে। ওটা ওই আকাশচারিনী অভিসারিকার বিরহবেদনার স্তূপ নয় তো? হয়তো সে আর বইতে পারছিল না বিরহ-বেদনার গুরুভার, তাই সেটা নামিয়ে দিয়েছে পথের ধুলোর উপরই, অতিশয় সসঙ্কোচে কিন্তু নিরুপায় হয়ে। খুব আস্তে আস্তে সিগারেটে টান দিতে দিতে সে কল্পনায় আরও রং চড়াতে যাচ্ছিল এমন সময় কুয়াশাটা কেটে গেল, দেখা গেল, ওটা স্তূপীকৃত বিরহ-বেদনা নয়, তিরপল ঢাকা প্রকাণ্ড একখানা 'মোটর লরি'।

ঠিক এই সময় প্রহ্লাদ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নবনী তার দিকে ফিরে বলল, "প্রহ্লাদ, তুই যদি আমার চোখের সামনে দেখতে দেখতে এখুনি ইঁদুর কিংবা ব্যাং হয়ে যাস তাহলে কি রকম হয় সেটা ?"

প্রহ্লাদ তার মনিবটিকে চেনে তাই মাত্র মুচকি হাসিটুকু হেসে চলে গেল, কোন মন্তব্য করা নিরাপদ মনে করল না। তার চক্ষে নবনী রহস্যময় ইলেকৃট্রিক্ যন্ত্রের মতো, ঠিক ভাবে নাড়াচাড়া করলে চমৎকার, কিন্তু একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই 'শক্' খাবার ভয় আছে।

নবনী চায়ের কাপে একটা লম্বা গোছের চুমুক দিয়ে তিরপল-ঢাকা লরিটার দিকেই চেয়েছিল, ফলে, পরের চুমুকটা দিতে একটু দেরি হল তার। তিরপল-ঢাকা লরির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল বর্ণনা। বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল সে, তারপর হাত তুলে থামাল একটা চলন্ত রিক্শাকে। রিক্শাওলাটার সঙ্গে কি কথা হল তার, তারপর সেই রিক্শাওলাটাই আরও খানকয়েক রিক্শা ডেকে নিয়ে এল। এরপর দুজন ময়লা হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরা লোক আবির্ভূত হল কোথা থেকে। লরিরই ড্রাইভার এবং ক্লিনার সম্ভবত। তারা তিরপল খুলতে লাগল। তারপর এল লাঠি আর বল্লম। নবনী রায় এদের কাউকেই চিনত না, কিন্তু সেটা তার কাছে খুব বড় বাধা বলে মনে হল না। কারণ সে জানে পৃথিবীতে কেউ কাউকে চেনে না, সবাই সবাইকে চেনার ভান করে এবং তার মধ্যে থেকেই কিছু আনন্দ, কিছু রোমান্স, কিছু দুঃখ, কিছু হতাশা ভোগ করে যে যার নিজের পথে চলে যায়, কিন্তু যেটা তার কাছে অসুবিধাজনক বাধা বলে মনে হচ্ছিল সেটা হচ্ছে এই যে সে আলাপের কোনও যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছিল না। সে ঠিকই করে ফেলেছিল এদের সঙ্গে আলাপ করে এদের নিয়েই আজ দিনটা শুরু করবে। যে ব্যাপার নিয়ে সে এতদিন নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল তা শেষ হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। কন্যাদায়গ্রস্ত নীলাম্বরবাবুর কন্যাটির শুভ-বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেছে। যে মাদ্রাজী বন্ধুটির ফটোগ্রাফের দোকান-ঘর ঠিক করে দেবে বলেছিল তাও হয়ে গেছে, তার জন্যে বড় রাস্তার উপর ভাল ঘরই পেয়েছে সে একটা। এখন তার হাতে আর কাজ নেই, একটা যোগাড় করবার জন্য সে চা খেয়ে বেরুবে ঠিক করছিল, এমন সময় ঠিক তার বাসার সামনেই এই কাণ্ড। প্রথমেই কুয়াশার ওড়না গায়ে আকাশচারিনী অভিসারিকার আবির্ভাব ও তিরোভাব, তারপরই এই লরি, লরির পাশে রূপসী একটি মেয়ে, খানকয়েক রিক্শা, দুটি ছোকরা, মেয়েটির মুখে একটু বিষণ্ণ বিব্রত ভাব—হঠাৎ নবনী রায়ের কল্পনাকে সজীব করে তুলল। কি সূত্রে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়বে হঠাৎ সেইটেই ঠিক করতে পারছিল না সে। একটা রিক্শাওলাকে দেখে সেটাও ঠিক হয়ে গেল। এক নিশ্বাসে চা-টা শেষ করে নেবে গেল সে। রিক্শাওলা ঝকস্থ তার চেনা লোক, এই পাড়াতেই থাকে, অনেকবার সে তার রিক্শায় চড়েছে। বন্ধুত্ব আছে ওর সঙ্গে।

তাকে ডেকে বললে—"চল্ গড়পারে পৌঁছে দে আমাকে।"

"আমি তো বাবু ভাড়া গছে নিয়েছি।"

নবনী তখন বর্ণনাকে নমস্কার করে বললে, "ও, আপনি ভাড়া করেছেন বুঝি এটা? সবগুলোই ভাড়া করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারা তো মাত্র তিনজন দেখছি। কিন্তু রিক্‌শা তো দেখছি আটটা—"

"ওতেও কুলুবে না। রিক্‌শাতে আমরা কেউ যাব না, ছবি যাবে। এক লরি সব ছবি।"

"বলেন কি! নীলামের ব্যাপার নাকি কোনও?"

"না। আমার বাবার আঁকা ছবি। তিনি দেশে থাকতেন, সম্প্রতি এখানে এসেছেন—"

ও, আপনার বাবার আঁকা!"

সম্ভ্রম ফুটে উঠল নবনী রায়ের চোখে মুখে।

"কোথায় এসে উঠেছেন তিনি?"

একটু ইতস্তত করে বর্ণনা বললে, "বাসা এখনও ঠিক হয়নি, এক আত্মীয়ের বাড়িতে আছি আমরা।"

এই মিথ্যাভাষণটুকু করে বর্ণনা ছবি নামাতে আরম্ভ করল লাঠি আর বল্লমের সহায়তায়। নবনী রায় দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট, অবাক হয়ে গেল দু'একটা ছবি দেখে। সে ছবির খুব সমঝদার নয়, কিন্তু ছবিগুলি যে সাধারণ পর্যায়ের নয়, তা বুঝতে দেরি হল না তার। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা যে অশোভন হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছিল, কিন্তু তবু সে সরতে পারছিল না সেখান থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরতেই হল, কারণ আর একটা রিক্‌শা এসে পড়ল এবং তাতে চড়তেই হল তাকে। না চড়লে বর্ণনার সন্দেহ হত। রিকশা চড়ে সোজা চলে গেল কিছুদূর, একটা চায়ের দোকানে নেমে আর একবার চা খেলে, তারপর বাড়িতেই ফিরে এল আবার। এসে দেখলে তখনও লরি থেকে ছবি নামানো চলছে। সে সোজা উঠে চলে গেল তার তেতলার ঘরটিতে। আর একটি সিগারেট ধরিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল মেয়েটির কার্যকলাপ।

নবনী রায়ের উক্ত আচরণ থেকে যদি আপনাদের মনে এই ধারণা হয় যে লোকটি আধুনিক যুগের সেই শ্রেণীর লোক যারা যুবতী তরুণী দেখলেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হয় কবিতা লেখে, না হয় পিছু নেয়, না হয় প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করবার জন্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে নাচতে থাকে—তাহলে আপনাদের সে ধারণাটা বদলাতে হবে। নবনী রায় বর্ণনাকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল সত্য, কিন্তু এর আগে সে আকৃষ্ট হয়েছিল হ্যুব্জদেহ নীলাম্বরবাবুকে দেখে যার পঞ্চম কন্যার পাত্র জোটাবার জন্যে সে সমস্ত কোলকাতা শহর চষে ফেলেছিল।

তার আগে সে আকৃষ্ট হয়েছিল এক দরিদ্র কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত পরিবারের প্রতি, তার আগে এক চানাচুর ফেরিওয়ালাকে নিয়ে কাটিয়েছিল কিছুদিন, এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে। নবনীর জীবন-চরিত যদি কেউ কখনও লেখে বা অনুধাবন করে তাহলে এই কথাটাই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে যদিও সে অবিবাহিত, যদিও তার কল্পনাশক্তি এবং ভাব-প্রবণতার অভাব নেই, তবু মেয়েমানুষ সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে সে যথাসাধ্য নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে এ যাবৎ। "নারী নরকের দ্বার" অথবা "অপ্সরী না হলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করব না"—এ ধরনের কোনও আজগুবি খেয়ালের বশে সে যে একাজ করছে তা ঠিক নয়। করেছে কারণ সে প্রকৃত স্বাধীনতাকামী। ইংরেজিতে যাকে 'এস্‌কেপিস্ট' বলে তাও ঠিক নয় সে, কারণ দুনিয়ার ঝামেলা থেকে গা বাঁচিয়ে সে সরে পড়েনি কখনও, বরং অপরের ঝামেলা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন বরাবর। এই 'স্বেচ্ছা' কথাটার মধ্যেই নিহিত আছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সে জানে নারী-নিগড়ে বাঁধা পড়লে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এমন অনেক কাজ করতে হয় যা কোনও ভদ্রলোকের করা উচিত নয়। সে সন্ন্যাসী হতে পারত, কিন্তু সন্ন্যাসী হতে হলে যে-সব গুণ থাকা দরকার তাও তার ছিল না। ষড়রিপুর মধ্যে প্রথম চারটি রিপুর কবলমুক্ত হতে পারেনি সে, হবার তেমন আগ্রহও ছিল না, যদিও ওই রিপুগুলির প্রকোপে পড়ে পাঁকেও লুটিয়ে পড়েনি সে কখনও। সুতরাং সংসারী না হয়েও সংসারে থাকবার কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছিল তাকে। বাবা-মা অথবা ভাই-বোন থাকলে বিয়ে না করেও হয়তো সংসারী হয়ে থাকতে হত তাকে কিছুদিন। কিন্তু সে সব তার কিছুই ছিল না। বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন তার ভাল করে জ্ঞান হবার পূর্বেই, ভাই-বোনও হয়নি। তাকে মানুষ করেছিলেন তার বাবার এক অবাঙালী বন্ধু, টাকার বিনিময়ে। মিলিটারি কণ্ট্রাক্টার ছিলেন তার বাবা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে আবিষ্কৃত হল দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা করে গেছেন তিনি। নবনীর জন্মের বছরখানেক পরেই তার মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা 'পেইং গেস্ট' হয়ে তাঁর অবাঙালী বন্ধুটির বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর মৃত্যু সেই বাড়িতেই হয় আরও বছর দুই পরে। মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি একটি উইল করে গেছেন। উইলে তিনি তাঁর অবাঙ্গালী বন্ধুটিকে তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। ছেলেকে ভালভাবে মানুষ করার জন্য তিনি প্রতি মাসে তিনশ' টাকা পাবেন উইলে এ নির্দেশও ছিল। একথাও উল্লিখিত ছিল তাঁর বন্ধু যদি অভিভাবক হতে রাজী না হন তাহলে তাঁর উকিল গভর্নমেন্টের হাতে সে ভার দেবেন। তার দরকার অবশ্য হয়নি, অবাঙালী বন্ধুটিই নাবালক নবনীর ভার নিয়েছিলেন। অর্থাৎ সে একটু বড় হতেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভালো একটি বোর্ডিং হাউসে। বস্তুত বোর্ডিংয়ে বোর্ডিংয়েই কেটেছে তার নাবালক জীবনটা। ঠিক বাইশ বছর বয়সে সে এম-এ পাশ করল সসম্মানে। এরপর সে নাকি বছর দুই তিন বিলেতেও ছিল।

সেখানকার কোন এক নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দামী একটা ডিগ্রীও অর্জন করেছিল নাকি। এ বিষয়ে বর্ণনার ধারণাটা অবশ্য ধোঁয়াটে। কারণ নবনী নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেনি বর্ণনাকে। আর আমি যা লিখছি তার উৎস বর্ণনাই। নবনী যে এম-এ পাশ এ খবরও বর্ণনা জানতে পারত না, হঠাৎ জেনে ফেলেছিল তারই কলেজের এক প্রফেসারের কাছ থেকে।

নবনী যেদিন বর্ণনাকে প্রথম দেখেছিল সেইদিনই তার সঙ্গে আলাপ হয়নি। সেদিন সে তার তেতলার ঘর থেকে বর্ণনাকে লক্ষ্যই করছিল কেবল, অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল, নিরপেক্ষভাবে দেখবার চেষ্টা করছিল, আলাপ করেনি, আলাপ করবার কথা মনেও হয়নি অনেকক্ষণ, তার ছবি-নামানোও চলছিল অনেকক্ষণ ধরে, তাই দেখেই সে আলাপের সুখটা অনুভব করছিল মনে মনে। তারপর শেষ রিকৃশাটি যখন ছবি-বোঝাই হয়ে চলতে শুরু করল, তখন তার মনে হল যে আর একটু দেরি করলেই ওরা হয়তো হারিয়ে যাবে এই কোলকাতা শহরের ঘূর্ণাবর্তে, যে ঘূর্ণাবর্তে সকলেই সকলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অথচ কেউ কাউকে চেনে না, যে ঘূর্ণাবর্তে একই সময়ে একই বাড়ির এক ফ্ল্যাট থেকে মড়া বেরোয়, আর এক ফ্ল্যাট থেকে বর, যেখানে মানুষের ঠিকানা নম্বর দিয়ে নির্ণীত হয়, যেখানে আসক্তি-অনাসক্তির মায়া-বৈরাগ্যের আপাত-মিলন হয়েছে স্বার্থের তাড়নায়, যেখানে—

আর কালবিলম্ব না করে নেবে পড়েছিল নবনী। কারণ এটা সে বুঝেছিল, (কি করে বুঝেছিল তা সে-ই জানে, এ বিষয়ে সম্ভবত সহজাত একটা দূরদৃষ্টি ছিল তার পশুদের মতো)—যে ওই মেয়েটি আর ওই এক লরি ছবির সমন্বয় এই কোলকাতা শহরে এমন অদ্ভুত যে ওদের কেন্দ্র করেই তাকে কাটাতে হবে এখন কিছুদিন। যে সহজাত প্রকৃতি মধুপকে নিয়ে যায় ফুলের কাছে, তৃষিত পশুপক্ষীকে চালিত করে লুক্কায়িত ঝরণাধারার দিকে, সেই সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সেও নেবে পড়ল। কারণ একটা মনোমত-কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকা মস্ত বড় অপরিহার্য প্রয়োজন তার জীবনে। ওই তার ধর্ম এবং কর্ম, একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনে নূতন সুর, নূতন বর্ণ-বৈচিত্র্য, নিত্য নব আস্বাদ সৃজন করবার একমাত্র উপায়। সাধারণত শিক্ষিত যুবকেরা যে কর্মে লিপ্ত থাকে,—যেমন চাকরি অথবা ব্যবসা তা করবার দরকারই ছিল না তার, ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে যা সুদ পেত তাতেই তার স্বচ্ছন্দে চলে যেত। অনর্থক আরও টাকা রোজগার করবার লালসায় নিজেকে অবনত করবার ইচ্ছাই তার হয়নি কোনদিন। কারণ, এই ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে মনুষ্যত্ব বজায় রেখে এদেশে অন্তত চাকরি বা ব্যবসা কিছুই করা সম্ভব নয়। রাজনীতিকে সে ঘৃণা করত, ধর্মেও মতি ছিল না, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা, সাহিত্য-চর্চা এসবেরও বাতিক ছিল না কোনও। সে বই পড়ত কিনে এবং পড়া হয়ে গেলেই সেটা বিক্রি করে কিনত আর একখানা বই। লাইব্রেরি করবার শখও ছিল না

তার, থাকলে তাই নিয়ে খানিকটা সময় কাটত। এককালে খবরের কাগজের নানারকম বিজ্ঞাপন এবং সংবাদ সংগ্রহের দিকে ঝোঁক ছিল, অনেক সংগৃহীত বিজ্ঞাপন আর 'কাটিং' পড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে একটা বাক্সে। এখন আর ওসবে রুচি নেই। এখন কোনও সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ধার দিয়েও সে যায় না। সংসারের বন্ধনটা যথাসম্ভব আলগা করে রাখবার দিকেই যেন তার ঝোঁক হয়েছে ইদানীং। এমন কি যে ফ্ল্যাটটা সে ভাড়া নিয়েছিল সেখানে রান্নার ব্যবস্থাও করেনি। হোটেলে খেত নগদ পয়সা দিয়ে। চা জলখাবার আসত পাশের একটা দোকান থেকে। নিজের বাসার সঙ্গেও কোন বন্ধনের সম্পর্ক সে রাখেনি। সকালবেলা স্নান করে বেরিয়ে যেত, ফিরত রাত্রে একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে। প্রহ্লাদের কাজ ছিল ফাই-ফরমাশ খাটা, বাড়ি পাহারা দেওয়া আর বাড়ি পরিচ্ছন্ন করে রাখা। যে ঘরটি নবনী ব্যবহার করত সেইটি সে পরিষ্কার করত রোজ। বাকি তিনটে ঘর তালা-দেওয়াই থাকত। মাঝে মাঝে নবনীর দু'একজন বিদেশী বন্ধু এসে আশ্রয় নিতো সেখানে দু'একদিনের জন্য। কখনও কোন সাহেব, কখনও পাঞ্জাবী, কখনও মাদ্রাজী, ক্বচিৎ দু'একজন বাঙালী। দু'একদিনই থাকত তারা। কোলকাতায় বিশেষ কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনি সে, পাছে বন্ধুত্বের দায়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। সে ভালবাসত অচেনা জগতে অচেনা পথ চিনে চিনে ঘুরে বেড়াতে, অচেনা জগত চেনা হয়ে গেলেই সে সরে পড়বার চেষ্টা করত সেখান থেকে। বিশাল কোলকাতা শহরে অসম্ভব হত না সেটা। তার যদিও একটা বাসা ছিল কিন্তু সে বাসাটাকে সরাইখানার মতো ব্যবহার করেই বেশি আনন্দ পেত সে। সুতরাং প্রহ্লাদের প্রচুর অবসর ছিল, জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকের সুবাসিনীর কর্ম-ভার লাঘব করেই এ অবসর বিনোদন করত সে, একথা আগেই বলেছি।

নবনী প্রায়ই বাড়িতে থাকত না, নিজের কাজে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াত। এই কাজ সংগ্রহ করাই ছিল তার জীবনের প্রধান প্রেরণা এবং সমস্যা। একটা কাজ শেষ হয়ে গেলেই আর একটা কাজের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে হত তাকে। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতেই কাজ পেয়ে যেত সে। নীলাম্বর সেনকে সে আবিষ্কার করেছিল পথেই। পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। নবনী যখন খোঁজ নিয়ে জানল যে কন্যাদায়ের জন্যই ভদ্রলোক ঋণজালে জড়িত হয়ে শেষকালে পুলিসের কবলে পড়েছেন, তখনই সে অনুভব করল তার কাজ জুটে গেছে। একটু অনুসন্ধান করতেই জানা গেল যে মাত্র পাঁচ হাজার টাকার জন্যে নীলাম্বরের উত্তমর্ণ একজন আত্মীয় আক্রোশ-বশে তাঁকে সিভিল জেলে পাঠাবার আয়োজন করেছেন। আর একটু অনুসন্ধানের পর প্রকাশ হয়ে পড়ল আক্রোশটা টাকার জন্য নয়, নীলাম্বরের পঞ্চম কন্যা চুণীর জন্য। চুণীর সঙ্গে তিনি তাঁর এক মাতাল শালার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, নীলাম্বর সেন রাজী হননি। জেদ চড়ে গেল নবনীর। এক একজন গণিতজ্ঞের স্বভাব অঙ্ক যত কঠিন হয় ততই তিনি মেতে ওঠেন তা নিয়ে। নবনীর স্বভাবও অনেকটা সেই

রকম। পঞ্চকন্যার পিতা নীলাম্বর সেনের কঠিন জীবন-সমস্যা মাতিয়ে রেখেছিল তাকে বেশ কিছুদিন, সমস্যার সমাধানও করেছিল সে শেষ পর্যন্ত। একথা শুনে নবনীকে অনেকে হয়তো ভুল বুঝবেন। রূপকথায় যে-সব ছদ্মবেশী দেবদূতের কথা শোনা যায় নবনী রায়কে সে-রকম কেউ যদি মনে করেন তাহলে সেটা ঠিক হবে না। সে যে পরোপকার করব বলে এসব করে বেড়াত তা নয়, করে বেড়াত নিজের প্রয়োজনে, সময় কাটাবার জন্য। আরও দু'একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কিছুদিন সে কাটিয়েছিল একটা খাতায় ভিখারী-ভিখারিনীদের সত্য জীবনকাহিনী সংগ্রহ করে। পার্কে পার্কে রাস্তায় রাস্তায় অনেকদিন সে ঘুরে বেড়িয়েছে এজন্য। এই সময়ই তার আলাপ হয় চানাচুরওলা মহেন্দ্রের সঙ্গে। কুচকুচে কালো কষ্টিপাথরে-কোঁদা মহেন্দ্রকে দেখে তার মনে হয়েছিল অজন্তার কোন নারীমূর্তিই বোধহয় পুরুষের রূপ ধরে নেমে এসেছে কোলকাতা শহরে আর ম্যাডক্স স্কোয়ারের কোণে দাঁড়িয়ে চানাচুর বিক্রি করছে, মহেন্দ্রের পাকা গোঁফ এবং কাঁচাপাকা কোঁকড়ানো চুল থাকা সত্ত্বেও একথা মনে হয়েছিল তার। প্রায়ই গিয়ে চানাচুর কিনত তার কাছে। চমৎকার চানাচুর তৈরি করত মহেন্দ্র। নিরামিষ চানাচুর, ছোলা, চিনাবাদাম, মুগ মটর দিয়ে সাধারণত যা তৈরি হয় তাই। প্রথম দিন দেখেই নবনীর মনে হয়েছিল লোকটা শিল্পী।

একদিন তাকে জিগ্যেস করল—"মাংসের ঘুগনি করতে পার?"

"রোজই করি, কিন্তু বিক্রি করি না।"

"নিজে খাও?"

"আজ্ঞে না। আমার ওস্তাদের জন্য করি।"

"ওস্তাদ? কিসের ওস্তাদ?"

"সারেঙ্গীর।"

"তুমি সারেঙ্গী বাজাও নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিয়েছিল চানাচুরওলা।

এরপর থেকে নবনী তার সমস্ত চানাচুর কিনে নিত এবং তারপর তার বাড়ি গিয়ে সারেঙ্গী শুনত তার কাছ থেকে। অপূর্ব বাজাত লোকটা। তার ওস্তাদের বাড়িতেও গিয়েছিল সে। গরীব লোক, খোলার ঘরে থাকে, কিন্তু থাকে যেন বাদশার মতো। নবনীও তার জন্যে ভাল ভাল হোটেল থেকে মাংসের নানারকম খাবার কিনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত তাকে, আর বাজনা শুনত। অর্থাৎ এই নিয়েই সে কাটিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন। এর মধ্যে পরোপকারের কোন প্রশ্ন ছিল না।

যে মাদ্রাজী বন্ধুটির জন্যে ফোটোগ্রাফের দোকান-ঘর *ঠিক* করে দিয়েছিল তার সঙ্গে বরং এই ধরনের একটা সম্পর্ক ছিল। শ্রীনাথনের বাবা তার দর্শনশাস্ত্রের

অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর চিঠি পেয়ে এ কাজ করতে হয়েছিল তাকে। কাজটা খুব মনোরম মনে হয়নি, কিন্তু পিতৃতুল্য অধ্যাপকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না।

সময় কাটাবার জন্য এই ধরনের নানা কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হত তাকে। তবে সে চেষ্টা করত কাজটা যাতে মনোমত হয়।

সেদিন সে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমেই যদি একটা ট্যাক্সি না পেত তাহলে বর্ণনার নাগালই আর সে পেত না সম্ভবত। বর্ণনা অনেক দূর চলে গিয়েছিল। রিক্‌শাটা যখন একটা গলির মধ্যে ঢুকল তখন ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সে-ও ঢুকল। ঢুকেই দেখা হয়ে গেল তার সেই চেনা রিক্‌শাওলাটার সঙ্গে। তার কাছেই জানতে পারল অত ছবি কোন্ ঠিকানায় রেখে এল তারা। অবাক হয়ে গেল শুনে। অত ছবি নাকি রাখা হয়েছে একটা খোলার ঘরে। রিকশাওলা চলে যাবার পর একটি সিগারেট ধরিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখে এল ঘরগুলো। সারি সারি চারটে খোলার ঘর। রাস্তার পাশেই, বাড়িগুলোর সামনা-সামনি একটা কল, কলে নানাজাতের ছেলে-মেয়ের ভিড়, চীৎকার, গালাগালি, কলহ। সেই ভিড়েরই একপাশে বালতি-হাতে বাচস্পতি দাঁড়িয়ে ছিলেন, নবনী রায় তখন তাঁকে চিনত না। আশেপাশে দু'-একটা পাকা বাড়ি আছে, কিন্তু তাদের চেহারাও শ্রীহীন। অনতিদূরে একটা আটা-পেষাই কল, তার পাশে একটা বেকারি। খোলার ঘরের চাল ভেদ করে উঠেছে একটা কুৎসিত টিনের চোঙ, তার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চারপাশে ময়লা আর জঞ্জাল, একটা মরচে-ধরা ফাটা ডাস্টবিন থেকে উপচে পড়েছে আরও ময়লা আর জঞ্জাল, তার উপর চড়ে কলরব করছে কতকগুলো মুরগী। আর একটু দূরে একটা দাঁড়কাক একটা মরা ইঁদুরকে দুপায়ে চেপে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর একটু দূরে কলরব করছে কতকগুলো ছোঁড়া একটা ঘুড়ি নিয়ে। কাছেই একটা খোলার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে দুটি নারীর কাংস্য-কণ্ঠ, ঝগড়া করছে তারা। পাশেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে, তাতে বাঁধা রয়েছে তিনটে মোষ, তাদের ঘিরে কাদা গোবর আর চোনার নরককুণ্ড। গলির দুধারের কাঁচা ড্রেনগুলোও নরককুণ্ড, এত দুর্গন্ধ যে কাছে দাঁড়ানো মুশকিল বেশিক্ষণ ...নবনী চমকে উঠল। সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে এসে আঙুলে ছ্যাঁকা দিয়েছিল। সেটা ফেলে দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখতে পেলে বর্ণনা বেরুল একটা খোলার ঘর থেকে, বগলে বই-খাতা। পাঁক থেকে পদ্ম ফুটল এ-কথা তার মনে হল না, মনে হল একটা জীর্ণ মলিন খাপ থেকে যেন বেরিয়ে এল একটা চকচকে তলোয়ার। একটা বাড়ির পিছনে একটু গা-ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে রইল নবনী। একটু আগেই যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার সামনে এখনই পড়াটা অশোভন হবে মনে হল

তার। বর্ণনা গলিটা পার হয়ে যখন চলে গেল, তখন আর একটি সিগারেট ধরিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে।

এদের ঘিরে যে একটা রহস্যলোক আছে তার আভাস সে পাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে সে রহস্যলোকের চাবি কি করে পাওয়া যায় তাই সে ঠিক করতে পারছিল না। সে জানত তাড়া হুড়ো করে যেমন ফুল ফোটানো যায় না, তেমনি ভাব করাও যায় না। সবুর করতে না জানলে আনন্দের মেওয়া পাওয়া অসম্ভব···

আবার তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। সে দেখতে পেল গেরুয়ার আলখাল্লা-পরা, রুদ্রাক্ষধারী, কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়িওলা, কালো চশমা চোখে একটি লোক বেরিয়ে এল ওই চারটি খোলার ঘরের একটি থেকে। হেমন্তকুমার। ভেক বদলেছিল সে। নবনী রায়ের দিকে এক নজর চেয়ে সে প্রশ্ন করল, "আপনি খুঁজছেন কাউকে?"

একটা প্রেরণা-প্রবাহ বয়ে গেল নবনী রায়ের মস্তিষ্কের ভিতর।

"শুনেছি এ পাড়ায় একজন ভাল তান্ত্রিক সাধু এসেছেন বাইরে থেকে। তাঁর নাম ঠিক জানি না—"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

হেমন্তকুমারকে অনুসরণ করে নবনী রায় বেরিয়ে গেল গলি থেকে।

দুই

কোলকাতায় এসে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল সকলেরই।

বাচস্পতি আর বনস্পতি যে এমন নির্বিকারভাবে নূতন পারিপার্শ্বিকের কদর্যতাটা মেনে নিতে পারবে বর্ণনা তা আশা করেনি। তারা দুজনেই বাইরে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা যে কষ্ট পাচ্ছে তা বর্ণনা বুঝতে পারত। খাওয়ারই কষ্ট হত। প্রধান সমস্যা হয়েছিল অর্থের। পোস্টাফিসে তাদের সঞ্চিত অর্থ ছিল মাত্র পাঁচ হাজার। বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করে আরও হাজার দুই টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া সীমন্তিনী, সরস্বতী আর বর্ণনার গহনাও ছিল কিছু, কিন্তু সেগুলো বর্ণনা ব্যাংকে রেখে দিয়েছিল, বিক্রি করেনি।

বর্ণনাই এদের সকলের ভার নিয়েছিল, সে-ই বাচস্পতি-বনস্পতিকে আশ্বাস দিয়েছিল যে চিন্তার কোনও কারণ নেই। বলেছিল, "আপনারা সুখপুরে যেমন সুখপুর-পত্রিকা আর ছবি-আঁকা নিয়ে ছিলেন এখানেও তেমনি থাকুন, সংসারের ভার আমি নিলুম।"

মুখে সে আশ্বাস দিয়েছিল বটে কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল মনে মনে। বাড়িতে খাওয়ার লোক আঠারো জন, কিন্তু উপার্জনক্ষম একজনও নয়। ডাল ভাত আর

নিরামিষ একটা তরকারি খেয়ে থাকলেও দৈনিক অন্তত পাঁচ টাকার দরকার। তাছাড়া চারটে খোলার ঘরের ভাড়া মাসে ষাট টাকা, কাপড়-চোপড় আছে, সুখপুর-পত্রিকার জন্য, ছবি আঁকার জন্য কিছু কিছু খরচ আছে, সাবান মাজন তেল প্রভৃতির জন্যও টুকিটাকি খরচ আছে রোজই। বাচস্পতি-বনস্পতির জন্য কিছু দুধের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, তার খরচও কম নয়, প্রায় বাড়িভাড়ার সমান। সাধু মিস্তির অবশ্য মাঝে মাঝে এসে চাল-ডাল দিয়ে যেত পুরোনো প্রজাদের কাছ থেকে যোগাড় করে। সাশ্রয় হত তাতে কিছু। তবু বর্ণনা হিসেব করে দেখেছিল মাসে অন্ততপক্ষে সাড়ে তিন শ টাকা আয় না হলে ওই নরককুণ্ডে থেকেও সংসার চালানো অসম্ভব। ভাগ্যক্রমে একটা চাকরি জুটে গিয়েছিল তার। ভাল চাকরি, মাইনে দু' শ টাকা, কাজও কম। একজন বড়-লোকের স্ত্রীকে গান-বাজনা শেখাতে হবে রোজ সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা করে। চাকরি হিসাবে খুবই ভাল, কলেজও কামাই হবে না, অথচ ভাল রোজগার হবে। যেদিন সে 'লরি' করে তার বাবার ছবিগুলো নিয়ে এল ঠিক তার দিন সাতেক আগে চাকরিটা পেয়েছিল সে। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিল, এমনি একটা দরখাস্ত করে দিয়েছিল, আশা করেনি যে হয়ে যাবে। ইন্‌টারভিউ করবার জন্যে যখন চিঠি এল তখন অবাক হয়ে গেল। কোলকাতা শহরে তার চেয়ে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ নিশ্চয়ই আছে এই তার ধারণা ছিল। ইন্‌টারভিউ দিতে গিয়ে আরও অবাক হল সে। স্থূলকায় প্রৌঢ়া একটি মহিলাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং সেতার শেখাতে হবে। এতদিন কি করছিলেন ভদ্রমহিলা? তাঁর স্বামী সুখময়বাবুরই আগ্রহ বেশি মনে হল। খানিকক্ষণ আলাপের পর তিনি বললেন, "আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি ঠিক পারবেন। গান-বাজনা শেখবার ওর দরকার নেই তত, আসল দরকার সহচরীর। আমরা এতদিন পাঞ্জাব-প্রবাসী ছিলাম, ব্যবসা উপলক্ষে কিছুদিন আগে এখানে এসেছি, এখানে থাকতেও হবে এখন বেশ কিছুদিন। এখানে আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। ছেলেপিলেও হয়নি, বাইরের কাজ নিয়ে আমার সময়টা কেটে যায়, কিন্তু মুশকিল হয়েছে অঞ্জনার। আপনি এখন ওর ভার নিন। ছেলেবেলায় ওর গান-বাজনার শখ ছিল, অনেকদিন চর্চা নেই, দেখুন আবার যদি ওকে শেখাতে পারেন।" সুখময়বাবু যতক্ষণ কথা বলছিলেন ততক্ষণ অঞ্জনা দেবী হাসছিলেন মুখে কাপড় দিয়ে ফিকফিক করে। যদিও বয়স হয়েছে তবু বর্ণনার মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলা যেন একটু খুকী প্রকৃতির। যাই হোক, চাকরিটা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে।

অপ্রত্যাশিত রকম পরিবর্তন হয়েছিল বাচস্পতি-বনস্পতির।

বর্ণনার আশঙ্কা হয়েছিল দুজনেই মুষড়ে পড়বে। কিন্তু ঠিক উল্টো হল। তারা দুজনেই যেন একটু বেশি রকম উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বিধাতার এই পরিহাসটাকে পরিহাসরূপে গ্রহণ করে তা উপভোগ করবার জন্যে যেন তৈরি হয়ে পড়ল তারা।

তাদের মুখে বিষাদের ছায়াপাত হওয়া দূরে থাক, এমন একটা সজীবতার ভাব দেখা গেল যা খুব নতুন ঠেকল বর্ণনার চোখে। ভাবটা—জীবন-যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে তাদের যে এইবার ডাক পড়েছে এতে তারা ভীত বা ম্রিয়মান তো নয়ই বরং যেন কৃতার্থ, তারা যে-কোনও কাজ করতে রাজী, যে-কোন কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য প্রস্তুত।

বাচস্পতি নিজের ঘর নিজেই ঝাড়ু দিতে শুরু করে দিল, নিজের কাপড় নিজেই কাচতে লাগল। সীমন্তিনী বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

"তুমি তোমার নিজের কাপড়-জামাগুলো কাচ তাহলেই যথেষ্ট হবে। তা করে সময় পাও তো তোমার বউদিকে সাহায্য কর গিয়ে রান্নাঘরে।"

সত্যবতী রান্নার ভার নিয়েছিল। বাচস্পতি নিজেই থলি হাতে বাজার করে আনত রোজ। বর্ণনাকে পাই-পয়সা হিসেব বুঝিয়ে দিত।

বর্ণনা বলল, "লেখাপড়া ছেড়ে তুমি এসব কি আরম্ভ করেছ?"

"বেশ লাগছে। তুই আমার জন্যে একটা টিউশনি যোগাড় করে দিতে পারিস? সংস্কৃতটা পড়িয়ে দিতে পারব। বি-এ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীকেও পারব।"

"আচ্ছা।"

বনস্পতিও স্বাবলম্বী হয়ে উঠল। যে লোক কোনদিন কুটোটি নাড়েনি, সে-ও নিজের কাজ নিজে করতে লাগল। সত্যবতীকে গিয়ে বললে, "দিদি, তুমি যদি আপত্তি না কর আমি তোমাকেও সাহায্য করতে পারি। এমন ছবির মতো তরকারি কুটে দেব যে, আলু পটল কুমড়োর টুকরোকে ফুল বলে মনে হবে।"

সত্যবতী কেমন যেন গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল।

ম্লান হেসে বললে, "না থাক—"

বর্ণনাকে একদিন আড়ালে ডেকে বললে, "তোর টাকার যদি টানাটানি হয় আমার ছবিগুলো বিক্রি করে দে না হয়। যদিও তোর মা রাজী হবে কিনা সন্দেহ। বেচতে আমারও কষ্ট হবে, কিন্তু কি করা যাবে, উপায় কি? দেখিস চেষ্টা করে, তোর তো অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে—"

"আচ্ছা।"

বর্ণনা দুজনকেই 'আচ্ছা' বললে বটে, কিন্তু সে জানত কোনটাই সহজ-সাধ্য কাজ নয়। সংস্কৃত শেখবার জন্যে কেউ সংস্কৃত পড়ে না আজকাল, পড়ে পরীক্ষা পাশ করবার জন্যে। আর বই কিনে পড়ার অভ্যাসই যে দেশে নেই, সে দেশে ছবি কিনবে কে? তবু সে চেষ্টা করবে, কিছু আয় বাড়াতেই হবে। অনেক বড়লোকের ছেলে-মেয়ে পড়ে তার সঙ্গে, তাদের বলবে, যদি কেউ কেনে।

খুব বড় রকম পরিবর্তন হল হেমন্তকুমারের।

সে প্রথমেই এসে পরিস্থিতিটা যাকে বলে 'পর্যবেক্ষণ' তাই করলে। সব চেয়ে যে

ঘরটা বড় সেইটেই দেওয়া হয়েছিল তাকে, কিন্তু তবু তার পছন্দ হল না। পছন্দ না হওয়ার কারণটা সে বাচস্পতি, বনস্পতি বা বর্ণনা কারও কাছে ভাঙলে না, ভাঙলে সোজা গিয়ে বাড়িওলার কাছে।

বললে, "মশাই একটু দয়া করতে হবে।"

"কি বলুন।"

"আমার ঘরটায় একটা পার্টিশন করিয়ে দিতে হবে। দরমার পার্টিশন হলেও চলবে।"

"পার্টিশন করতে চাইছেন কেন?"

"ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের সামনে কি বউ-এর সঙ্গে শোয়া যায়? অথচ অনেক দিনের অভ্যাস বউ-এর কাছে না শুলে ঘুম আসে না। আপনি ছোট-খাটো একটা পার্টিশন করে দিন দয়া করে। একপাশে একটা বিছানা করবার মতো জায়গা হলেই হবে আমার।"

বাড়িওলা একটু রসিক-প্রকৃতির লোক। প্রশ্ন করলেন, "কটি ছেলে-মেয়ে আপনার?"

"তা বলতে নেই, মা ষষ্ঠীর কৃপা আছে। ডজন পুরব পুরব হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচ ছ'জন বেশ বড় বড়, বাকীগুলো ছোট।"

"ওরে ঘরে কি কুলুবে সকলের?"

"কুলিয়ে নিতেই হবে, উপায় কি। আপনি একটা পার্টিশনের ব্যবস্থা করিয়ে দিন শুধু।"

"আচ্ছা।"

বাড়িওলার লোক যখন পার্টিশন তৈরি করতে এল তখনই সর্বনাশের স্বরূপটা যেন সহসা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল সকলের কাছে। গঙ্গা কূল ভাঙতে ভাঙতে একদিন যেমন বাড়ির বারান্দার নীচে হাজির হয়েছিল, অনেকটা তেমনি। অবস্থা যখন সচ্ছল ছিল তখন এ প্রশ্ন কারো মনে ওঠেনি, কিন্তু এখন সহসা সকলে যেন উপলব্ধি করল যে হেমন্তকুমারের বংশবৃদ্ধি রোধ করতে না পারলে দ্বিতীয়বার ভরা-ডুবি হবে। কিন্তু এ বিষয়ে হেমন্তকুমারকে সামনাসামনি কোন কিছু বলা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সম্পর্কে সে বাড়ির বড় বউয়ের দাদা, সুতরাং অগ্রগণ্য গুরুজন।

তবু বাচস্পতি সসঙ্কোচে তাকে আড়ালে ডেকে বললে, "তোমার বয়স কত হল হিমুদা?"

"একান্ন চলছে। হঠাৎ বয়স জানতে চাইছ কেন?"

"আমি বলছি পার্টিশন না করে আর একটা কাজ করলে হয় না।"

"কি?"

"সংযম।"

কথাটা শুনে হেমন্তকুমারের ভ্রূযুগল উত্তোলিত হল এবং সেই অবস্থাতেই রইল কয়েক মুহূর্ত!

"এ রকম আজগুবি কথা তোমার মনে হল কেন?"

"আজগুবি নয়, সমীচীন। আমাদের আয়ের পথ যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ব্যয়সঙ্কোচ না করলে চলবে কেন?"

"ব্যয়সঙ্কোচ কর কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাবীকে তো একেবারে অগ্রাহ্য করা যাবে না। আয়ের পুরোনো পথ বন্ধ হয়েছে, নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে। সে চেষ্টায় আছি আমি।"

তারপর আর একটু থেমে একটু মুচকি হেসে বললে, "আমার পরিবারের খরচ আমি রোজগার করে ফেলব কোনরকমে। সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না।"

হেমন্তকুমার আর সেখানে দাঁড়াল না, বাইরে চলে গেল।

অপ্রতিভ হয়ে পড়ল বাচস্পতি।

এর দিন দুই পরেই দেখা গেল হেমন্তকুমার তার কাপড়-জামা এমন কি কেড্‌স্ জুতো জোড়াকে পর্যন্ত গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে ফেলেছে। হেমন্তকুমারের একাদশটি পুত্রকন্যার মধ্যে ছ'জন বেশ বড় হয়েছিল। ছ'টির মধ্যে অবশ্য চারটি কন্যা, বন্দুক, কিরিচ, কাটারি আর ছোরা। বয়স যথাক্রমে বাইশ, কুড়ি, সতরো আর তেরো। দুটি ছেলে লাঠি আর সোঁটা, বয়স যথাক্রমে আটাশ আর পঁচিশ। এর পরের ছেলে বল্লমের বয়স এগারো। বয়সের দিক থেকে নাবালক হলেও বুদ্ধির দিক দিয়ে সে কম পরিপক্ক ছিল না।

নিজের কাপড়-চোপড় গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে হেমন্তকুমার তার সাতটি পুত্রকন্যাকে ডেকে নিয়ে গেল একদিন হাওড়া স্টেশনে। কোনও পার্কে যেতে পারত কিন্তু সে ভেবে দেখলে পার্কে তার এতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে সমবেত হলে ভিড় জমে যাবে। হাওড়া স্টেশনের প্রকাণ্ড চত্বরের এক কোণে জটলা করলে সে সম্ভাবনা নেই। সকলেই মনে করবে ওরা যাত্রী। একদিন দুপুরে ট্রাম-যোগে সকলেই হাজির হল সেখানে। হেমন্তকুমার সকলকেই এক কাপ করে চা আর একটা করে 'কেক্' খাওয়ালে। তারপর বললে, "চল এইবার ওদিকের কোণটায় গিয়ে বসা যাক, ফাঁকা আছে জায়গাটা।"

সকলে সমবেত হলে হেমন্তকুমার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল একটি, যার সারমর্ম হচ্ছে —"দেখ, আজ একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করবার জন্যে তোমাদের ডেকেছি। জীবন-মরণ সমস্যা। আমাদের প্রত্যেককে এখন রোজগার করতে হবে। তোমাদের পিসেমশাইরা এতদিন আমাদের খাইয়েছে পরিয়েছে, এইবার আমরা তাদের খাওয়াব পরাব। তা যদি নাও পারি আমাদের নিজেদের খরচটা রোজগার করতেই হবে। তোমরা সবাই বড় হয়েছ, উপযুক্ত হয়েছ, তোমরা সবাই মিলে যদি লেগে পড় তাহলে আর ভাবনা কি।"

লাঠি বলল, "কিন্তু আমরা যে লেখাপড়া শিখিনি—"

"সেইটেই তো তোমাদের স্থবিধে, তোমরা মুটে মজুর হতে পার আবার অনেক উঁচুতেও উঠতে পার। যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা সব রকম কাজ করতে পারে না, কিন্তু তোমরা পারবে। কাল থেকেই লেগে পড় তোমরা। কোলকাতার মতো শহরে কাজের অভাব নেই। আমি নিজে ঠিক করেছি জ্যোতিষীর ব্যবসা করব, কিছু কিছু কবচও বেচব। হস্তরেখা বিচারের বই পড়েছি দু'চারখানা, পাঁজিটাও পড়ি ভাল করে, কিছু রোজগার হবেই ওসব থেকে। ঠিক করেছি ফুটপাথে কিংবা পার্কে বসব। আমি একটা খাবারওলার সঙ্গে কথা বলেছি, সে বলেছে কিছু টাকা জমা দিলে ফেরি করবার জন্যে খাবার সে দেবে। ওই কাজটাতে কাল থেকেই লেগে পড়তে পার কেউ—"

"দোকানটা কোথা ?" লাঠি জিগ্যেস করল।

"বড়বাজারে। তুমি যদি কর তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। গোটা পঞ্চাশেক টাকা জমা দিতে হবে, যে খাবার আর বাসন-পত্তর তুমি নিয়ে যাবে তারই জামিন স্বরূপ লাগবে টাকাটা, তা আমি দিতে পারব। কিছু টাকা আমার আছে।"

"বেশ, করব।"

"ইংরেজদের একটা ফ্যাক্টারি আছে আমাদের বাড়ির কাছেই। সেখানেও একটা চাকরি জুটতে পারে কারও, সোটা বা বল্লম সেখানে খোঁজ করতে পার, ওরা মাইনে ভাল দেয় শুনেছি।"

"আর আমরা কি করব ?"—মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে কিরিচ।

"কি করবে তা তোমরাই ঠিক কর। আমিও চেষ্টায় থাকব। মোট কথা, টাকা রোজগার করতে হবে, যেমন করে হোক করতে হবে। আর কিছু না পার বাড়িতে যা করছ বাইরে তা করলেও দু'পয়সা ঘরে আসবে।"

"বাড়িতে কি আর করছি !"

"কাপড় কাচছ, বাসন মাজছ, মশলা পিষছ, ঘর ঝাট দিচ্ছ, রান্না করছ, সবই তো করছ।"

"তার মানে বাইরে দাসীবৃত্তি করতে বলছেন ?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে উঠল বন্দুকের।

"দাসীবৃত্তি কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু কাজটা খারাপ নয়। যারা বড় বড় চাকরে তারাও তো দাস-দাসী। দাস-দাসীরাই তো দুনিয়া চালাচ্ছে। তুই ভুরু কোঁচকাচ্ছিস কেন ?"

"কিন্তু লোকে যদি খারাপ বলে ?"

"কিচ্ছু এসে যায় না তাতে! দারিদ্র্যের চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। আর এই কোলকাতা শহরে কে কাকে চেনে ? এরা চেনে শুধু টাকা। কাল তুমি টাকা রোজগার করে মোটর হাঁকিয়ে বেড়াও সবাই তোমাকে সেলাম করবে, কি করে সে টাকা

রোজগার করেছ তার হিসেবও নেবে না কেউ। যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা রোজগার করতে হবে এ শহরে।"

বল্লম হঠাৎ বলল, "এক ঠ্যালাওলার সঙ্গে ভাব হয়েছে আমার। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব ?"

"সে কিছু দেবে কি ?"

"তা জানি না, জিগ্যেস করব কাল।"

"কোরো। মোট কথা সবাইকে কিছু কিছু রোজগার করতে হবে রোজ।"

এই ধরনের আলাপ আলোচনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে উঠে পড়ল তারা।

"একটা সিনেমা দেখাও না বাবা আজকে।"

"বেশ, চল।"

ছ'আনার সীটে গাদাগাদি করে বসতে হল, কারণ তার বেশি খরচ করার সামর্থ্য ছিল না হেমন্তকুমারের।

পরদিন থেকেই কাজের চেষ্টায় হেমন্তকুমারের ছেলে-মেয়েরা ঘুরতে লাগল।

সুখপুরে মিশ্র-পরিবারের আর একজন পরিজন ছিলেন ভূষণ চক্রবর্তী। এঁর খবর বনস্পতি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। যখন এদের সুখপুর ছেড়ে কোলকাতায় আসা অনিবার্য হয়ে উঠল তখনই বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, কোলকাতায় আবার দেখা করবেন। কিন্তু প্রায় ছ'মাস কেটে যাওয়ার পরও তাঁর কোনও খবর পাওয়া গেল না।

তিন

সেদিন কিছুক্ষণ নীরবতার পর হেমন্তকুমার অনুসরণকারী নবনী রায়কে অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, "তান্ত্রিক সাধুর কাছে কি দরকার আপনার ? মারণ, উচাটন, বশীকরণ জাতীয় কিছু না কি ? না অন্য কিছু ?"

"হাতে কোনও কাজ নেই। বেকার বসে আছি। কাজকর্ম কিছু জুটবে কি না, কি রকম জুটবে—এই সব জানতে চাই আর কি।"

"সে তো যে-কোনও জ্যোতিষী আপনাকে ব'লে দিতে পারত। এর জন্যে তান্ত্রিক সাধু খুঁজছেন কেন ?"

"তান্ত্রিক সাধুরা এর প্রতিকারও করে দিতে পারেন শুনেছি।"

"তা পারেন। মন্ত্রসহ মহাকালী কবচ, মহানবগ্রহ কবচ—এসব ধারণ করলে ফল পাবেন। আরও নানারকম কবচ আছে। বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে ভালো ফল হয় না। আপনার জন্মকালীন গ্রহ সংস্থান অনুসারে তৈরি করলে সুফল ফলবে। আপনাকে কে খবর দিলে যে এই গলিতে তান্ত্রিক সাধু আছে ?"

"ট্রামে যেতে যেতে কানে এল দু'জনে বলাবলি করছিল,—তিনি যে গ্রাম থেকে এসেছেন সে গ্রামের নামটিও বলছিল, নামটি ঠিক মনে পড়ছে না আমার।"

নবীন রায় ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যেতে চাইল না।

"সুখপুর কি?"

"হ্যা, হ্যা সুখপুরই।"

"তাহলে আমার কথাই বলছিল সম্ভবতঃ। ও গলিতে গেরুয়াধারী তো এক আমিই আছি।"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই হল। আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন তাহলে। আপনি কোথায় বসেন?"

"আপাতত ফুটপাথে কিংবা পার্কে বসছি। ঘর-টর কোথাও পাইনি, খোলার ঘরে এসে মাথা গুঁজেছি দিনকতক আগে।"

"সুখপুর থেকে চলে এলেন কেন?"

"মা গঙ্গা থাকতে দিলেন না। বাড়ি-ঘর জমি-জমা সবই কেড়ে নিলেন। এ রকম ভাঙন বহুদিন হয়নি।"

"ও। তাহলে তো মহা মুশকিলে পড়েছেন।"

"মুশকিল বইকি। তবে সবই মায়ের ইচ্ছা। তিনি যা করবেন তাই হবে।"

"আপনি কোনও কবচ ধারণ করেননি?" মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে নবনী।

"করেছি বইকি। ডান-হাতে, গলায়, কোথাও বাকি রাখিনি। একটু যেন ফল হয়েছে মনে হচ্ছে। দেখা যাক।"

দেশবন্ধু পার্কের কাছাকাছি এসে পড়েছিল তারা।

"চলুন পার্কটায় ঢোকা যাক। আপনার হাতটা আগে দেখি। কুষ্ঠি আছে আপনার?"

"আজ্ঞে না।"

"জন্ম সময়?"

"তাও নেই।"

"হাত থেকেও খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। চলুন দেখি—"

পার্কের একটা বেঞ্চে বসে নবনীর দুটি হাতই ভাল করে দেখলে সে। হাত-দেখার দু'একখানা বই পড়া ছিল, সেই বিদ্যের জোরে সে বলল, "কোন চাকরি বা ব্যবসার চিহ্ন তো দেখছি না আপনার হাতে। তবে দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করতে হবে না আপনাকে। আপনার ভাগ্য রেখা খুব জোরালো।"

"কবচ নিলে কাজ জুটবে?"

"জোটা তো উচিত।"

"কি রকম খরচ পড়বে?"

"যেমন খরচ করবেন। কবচ দু'চার টাকাতেও হয়, আবার ভাল করে করলে শ-খানেক টাকাও লাগে।"

"ভাল করেই করুন আপনি। কিছু অগ্রিম দিতে হবে কি?"

"দিলে ভাল হয়। বুঝতেই পারছেন, বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত হয়ে এসেছি। নিজের সংসার তো আছেই, তাছাড়া আছে এক ভগ্নীপতি আর তার ভাইয়ের সংসার।"

উৎকর্ণ হয়ে উঠল নবনী। এই সব খবরই তো সে শুনতে চাইছিল।

"ও, তাই নাকি। ওঁরা কি করেন?"

"কিছুই করেন না। করবার যোগ্যতাও নেই। দুটোই পাগল। একজন ঘরে বসে হাতে-লেখা পত্রিকা নিয়ে সময় কাটায়, আর একজন আঁকে ছবি। বাপ-ঠাকুর্দার বিষয়-আশয় ছিল তো, খেটে খাবার দরকার হয়নি, ওই সব আজগুবি খেয়াল নিয়ে থাকত। এখন মুশকিলে পড়েছে।"

"প্রত্যেকেরই ছেলেপিলে আছে তো?"

"ওইটি ভগবান রক্ষা করেছেন। বনস্পতির কেবল মেয়ে আছে একটা। সে লেখা-পড়া শিখেছে, চাকরিও করছে একটা। ভালো মেয়েটা, তবে বড্ড বেশি আপ-টু-ডেট্।"

"ও।"

বর্ণনার ছবিটা ভেসে উঠল নবনী রায়ের মনে। তার বুঝতে দেরি হল না 'লরি'র পাশে একেই সে দেখেছিল। ভাবতে লাগল, কি করে ভদ্রভাবে ওই আপ-টু-ডেট্ মেয়েটার নাগাল পেতে পারবে। যদিও শেষ পর্যন্ত উপকারী বন্ধু হিসাবেই তার সঙ্গে পরিচয় করতে হয়েছিল, কিন্তু সে তা চায়নি। কারণ সে জানত হিতৈষী বন্ধু হওয়ার শেষ পরিণাম শত্রুতা। ওই নীলাম্বর সেনই নাকি তার নিন্দে করে বেড়াচ্ছে। বিদ্যাসাগরের মতো লোকও পরোপকার করতে গিয়েই অনেক শত্রু-সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এটাও সে অনুভব করছিল যে ওর সঙ্গে আলাপ করতে হবেই, কেমন যেন একটা রহস্য ঘিরে আছে ওর চারদিকে, আর সেইটেই সব চেয়ে বড় আকর্ষণ, মেয়েটা তত নয়। কুয়াশা কেটে গেলে স্তূপীকৃত বিরহ-বেদনা হয়তো তিরপল-ঢাকা 'লরি'-রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। 'লরি'টার ভিতর কিন্তু ছবি ছিল অনেক। এর ভিতরও আছে কি?

"কবচটা কি তাহলে করব?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দেখি আমার কাছে এখন কত আছে।"

পকেট থেকে ব্যাগটা বার ক'রে দেখল কত টাকা আছে। সাধারণত বেশি টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করে না সে।

"গোটা পঁচিশেক টাকা দিলে চলবে?"

"তাই দিন।"

টাকা ক'টি গেরুয়া ঝোলাটার ভিতর পুরে হেমন্তকুমার হাসিমুখে চেয়ে রইল

নবনীর দিকে, তারপর বলল, "দিন সাতেক পরে কবচ পাবেন। কোথায় থাকেন আপনি. ঠিকানা কি ?"

নবনীর মনে হল ঠিকানাটা দেওয়া ঠিক হবে না।

"আমি কোলকাতার বাইরে থাকি। সাতদিন পরে আমিই না হয় আপনার কাছে যাব। ওই গলির কত নম্বরে আপনি থাকেন ?"

"না, ওখানে যাবেন না। আমি যে এসব নিয়ে ব্যবসা করছি সেটা বাড়ির লোকের কাছে গোপন রাখতে চাই। ওরা শুনলে ভয় পেয়ে যাবে। তন্ত্র নিয়ে ব্যবসা করাটা একটু বিপজ্জনক তো। ওরা জানে আমি রোজ বেরিয়ে যাই কালীঘাটে পুজো করবো বলে—"

"অ, আচ্ছা বেশ, আমি সাতদিন পরে এইখানেই তাহলে দেখা করব আপনার সঙ্গে। ক'টার সময় আসব বলুন ?"

"এগারোটা নাগাদ।"

"বেশ।"

নবনী রায় সেদিন যখন বাড়ি ফিরল তখন একটি দুঃসংবাদ দিলে প্রহ্লাদ। তার প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুকটায় নাকি উই লেগেছে। ভিতরের কাগজপত্রও নষ্ট করেছে কিছু।

"বলিস কি রে ?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমি ভাল করে দেখেছি।"

গুম হয়ে রইল নবনী খানিকক্ষণ। অতীতের কথা মনে পড়ল। অনেক ভিখারী-ভিখারিনীর জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করেছিল সে। অনেক বিজ্ঞাপন, অনেক বিচিত্র, বিস্ময়কর, কৌতুকপ্রদ সংবাদ সংগ্রহ করেছিল দেশী-বিদেশী নানা কাগজ থেকে। তাছাড়া ওই সিন্দুকে আছে চিঠি. অনেক চিঠি। ওই সিন্দুকের তলায় তার অতীত জীবনের অনেকখানি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সিন্দুকটাও একটা স্মৃতি। ওটা তার মায়ের ছিল, মা বাসন রাখতেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে খুলে দেখলে। নীচের তক্তা খানিকটা জখম হয়েছে। কাগজপত্রও খেয়েছে কিছু কিছু। সিন্দুকটা মিস্ত্রীকে দিয়ে ঠিক করিয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু এত কাগজপত্র ? সব ফেলে দেবে ? এতদিনের কর্মফল বিসর্জন দিতে হবে রাস্তার 'ডাস্টবিনে' ? আবার ট্রাংকে রাখলে কেমন হয় নতুন খাতায়। কিন্তু কে টুকবে এত ? ওদের কেন্দ্র করে অতীত জীবনে যে উৎসাহ জেগেছিল তা আর নেই, কিন্তু ওদের একেবারে বিসর্জন দেবারও ইচ্ছে হল না। হঠাৎ তখুনি ঠিক করতে পারলে না কি করবে।

"ন্যাপথলিনের গুলি আছে বাড়িতে ?"

"বেশি নেই, দু'চারটে আছে।"

"আরও কিছু কিনে নিয়ে আয়। আজ ন্যাপথলিন দিয়ে রেখে দে, পরে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

তার পরদিন একাধিক খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল। "কেরানির কাজ করিবার জন্য একজন লোক চাই। ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকা দরকার। যোগ্যতা অনুসারে বেতন নির্দিষ্ট হইবে।...নং পোস্টবক্সে আবেদন করুন।"

ভূষণ চক্রবর্তী যেদিন সুখপুর ত্যাগ ক'রে কোলকাতায় এসে হাজির হলেন সেদিন তাঁর চেহারাটা অন্তত ভদ্রলোকের মতো ছিল। কিন্তু মাস দুই কোলকাতার ধর্মশালায় ধর্মশালায় থেকে, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে আর পোর্টিকোর তলায় কাটিয়ে, অনাহারে-অর্ধাহারে টালিগঞ্জ থেকে বেলগাছিয়া এবং শিয়ালদহ থেকে হাওড়া পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে তাঁর যা চেহারা হল তা কদর্য, কিম্ভূতকিমাকার, প্রায় অবর্ণনীয়। বড় বড় রুক্ষ চুল, একমুখ গোঁফদাড়ি, ছিন্নমলিন জামা-কাপড়, কপালে মুখে বলি-রেখা, কোলা-গাল চুপসে গেছে, উঁচু হয়ে উঠেছে দু পাশের হাড় দুটো, অস্থিসার প্রকাণ্ড নাকটা খাঁড়ার মতো আরও উগ্র হয়ে উঠেছে, আরও কণ্টকিত হয়ে উঠেছে শুঁয়োপোকার মতো ভুরু দুটো, চোখের দৃষ্টিতে জ্বলছে হুতাশন।

একটি লক্ষ্য স্থির রেখেই সুখপুর থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি,—যেমন করে হোক কোলকাতার কদর্যতা থেকে রক্ষা করতে হবে শিল্পী বনস্পতি মিশ্রকে। কিন্তু এই 'যেমন করে হোক'টা কেমন করে হবে, আগে থাকতে সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনও পন্থা ঠিক করেন নি তিনি, ঠিক করা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। এ-ও তিনি তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে কলিকাতা নামক বিরাট শহরটি পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই বিরাট নরক-কুণ্ড, যেখানে সৎপথে থেকে কোন সচ্চরিত্র লোক সসম্মানে জীবিকা অর্জন করতে পারে না, যেখানে সদ্‌গুণের চেয়ে বদ্‌গুণেরই কদর বেশি, যেখানে গুণ্ডামি দিয়ে রাজনীতি চালাতে হয়, ভণ্ডামি দিয়ে ধর্ম, যেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদের ভয়ে ভীত, যেখানে তাঁরা নোট বেচে সকলের পায়ে তেল দিয়ে সভয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, যেখানে সাহিত্যিকরা পর্যন্ত হয় মতলববাজ ব্যবসাদার না হয় ভিখারী, শুধু অন্নের ভিখারী নয় সম্মানেরও ভিখারী, যেখানে ফুটপাথে লোক শুকিয়ে মারা যায় তিলে তিলে, কেউ ফিরে দেখে না পর্যন্ত, তারই পাশ দিয়ে মোটরের সারি চলে, সামনেই সিনেমা হয় থিএটার হয় আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে, যেখানে গণিকারা ভদ্রমহিলা হয়েছে এবং ভদ্রমহিলারা গণিকা হবার চেষ্টা করছে, যেখানে অবিচার আর অন্যায়ের নূতন নামকরণ হয়েছে গণতন্ত্র স্বাধীনতা—এসবই তিনি জানতেন, কিন্তু তবু তিনি এসেছিলেন, কারণ না এসে উপায় ছিল না। শিল্পী বনস্পতি মিশ্রকে যখন বাধ্য হয়ে কোলকাতায় আসতে হয়েছে, তিনি দূরে সরে থাকবেন কি করে। তিনি পণ করে বেরিয়েছেন এই নরককুণ্ডেই তিনি যেমন করে হোক রক্ষা করবেন বনস্পতিকে। বর্ণনার হস্টেলের ঠিকানা তিনি জানতেন, তিনি স্থির করেছিলেন কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই বর্ণনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। একটা জিনিস নিঃসংশয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে বনস্পতিকে আলাদা একটা পাকা বাড়িতে স্থানান্তরিত

না করতে পারলে তাঁকে রক্ষা করতে পারা যাবে না। কিন্তু আলাদা একটা পাকা বাড়ি মানেই টাকা, অনেক টাকা, আর সে টাকা তাকেই রোজগার করতে হবে। যেমন করে হোক করতে হবে।

সামান্য কিছু টাকা ছিল তাঁর হাতে, তাই সম্বল করেই তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন! আগেকার তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সম্ভবত ভবভূতির মতো একটা ক্ষীণ আশা ছিল তাঁর মনে—কাল নিরবধি এবং পৃথ্বীও বিপুলা, হয়তো সমান-ধর্মা কোনও লোকের দেখা মিলবে এবং সে হয়তো তাঁর মনের কথা বুঝবে। তিনি প্রথমে এসে উঠলেন এক ধর্মশালায়। সেখানে তিনি রাত্রে শুতেন খালি, তাও বারান্দার এক কোণে। তাঁর আসল কাজ হল ফ্রি রিডিংরুমে গিয়ে খবরের কাগজগুলো থেকে কর্মখালির বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দরখাস্ত করা, আর আপিসে-আপিসে দোকানে-দোকানে কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো। খেতেন চা আর ছাতু, তাতেও পাঁচ-ছ' আনা লেগে যেত। যদিও তিনি বারান্দার এক কোণে শুয়ে থাকতেন, তবু এক ধর্মশালায় বেশি দিন থাকতে দিত না তাঁকে। আর এক ধর্মশালায়, কিম্বা কোন বড় বাড়ির পোর্টিকোর তলায় তখন আশ্রয় নিতে হত। এত মিতব্যয়িতা সত্ত্বেও কিছুদিন পরে তাঁর সম্বল ফুরিয়ে গেল। তখন ফিরে গেলেন তিনি তাঁর গ্রামে, সেখানে বাস্তুভিটা আর সামান্য জমি যা ছিল তা বিক্রি করে আবার ফিরে এলেন কোলকাতায়, আবার শুরু করলেন কাজ খুঁজতে।

এ যেন নতুন রকম এক অদ্ভুত তপস্যা।

সত্যিকার তপস্যা কখনও নিষ্ফল হয় না। সমান-ধর্মা লোকের নাগাল পেলেন তিনি অবশেষে। নবনী রায়ের দেওয়া বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল তাঁর।

দুদিন বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে নবনী রায় সবসুদ্ধ দু শ তেষট্টিখানা দরখাস্ত পেয়েছিল। অধিকাংশই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, কিছু আই-এ, আই-এস-সি ছিল, গ্র্যাজুএট ছিল, কুড়িজন এবং এম-এ পাশ চারজন। নবনী ঠিক করল প্রথমে এম-এ পাশ প্রার্থীদের সঙ্গেই দেখা করবে।

প্রহ্লাদ এসে খবর দিলে, "একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু লোকটাকে পাগল বলে মনে হচ্ছে, নিয়ে আসব উপরে?"

"পাগল? কি করে বুঝলি?"

"চেহারাটা দেখে ওই রকমই লাগছে।"

"আচ্ছা, নিয়ে আয়।"

ভূষণ চক্রবর্তীর চেহারা দেখে নবনীরও সন্দেহ হল।

"আপনি কি চান?"

"চাকরি। আপনি আমাকে আজ দেখা করবার জন্যে ডেকেছিলেন, তাই এসেছি।"

নবনী ডায়েরী উল্টে দেখল।

"ও, আপনিই ভূষণ চক্রবর্তী? আসুন, বসুন।"

ভূষণ চক্রবর্তীকে দেখে হঠাৎ ভালো লেগে গেল নবনীর, তাঁর অদ্ভুত খাপছাড়া চেহারার জন্যেই ভালো লেগে গেল। এর আগের দিন সাহেবি পোশাক-পরা ছিমছাম ক্লিন-শেভড্ যে ছোকরাটি এসেছিল তাকে তত ভালো লাগেনি। মানে, তাক্ লাগেনি। মনে হয়েছিল এ যুগের গতানুগতিকতার ঐক্যতানে সুর মিলিয়েছে ছেলেটি, গড্ডালিকা-প্রবাহের বৈশিষ্ট্যহীন মেষ একটি। ভূষণ চক্রবর্তীকে দেখে নবনী চমৎকৃত হয়ে গেল, এ যুগের বিরুদ্ধে মূর্ত একটা প্রতিবাদ যেন, অথচ বাংলা ইংরেজি দুটো বিষয়েই এম-এ ডিগ্রী আছে!

ভূষণ চক্রবর্তী চেআরে বসেই জিগ্যেস করলেন, "আপনার আপিস আছে? কেরানীর কাজ করতে হবে সেখানে?"

"আপিস নেই। আমার পুরোনো কিছু কাগজপত্তর আছে, সেগুলোতে উই ধরেছে, আমি সেগুলো টুকিয়ে রাখতে চাই নতুন খাতায় পরিষ্কার করে।"

"কত কাগজ আছে আপনার? টুকতে কতদিন আন্দাজ লাগবে?"

"মাস তিন চার লাগা উচিত।"

"তারপর আমার চাকরি শেষ হয়ে যাবে?"

আগের দিন যে ছিমছাম যুবকটি এসেছিল তাকে নবনী বলেছিল 'যাবে', কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তীর মুখের দিকে চেয়ে সে কথা সে আর বলতে পারল না। তার মনে হল একাধিক বজ্রাঘাতে বিধ্বস্ত এই মহীরুহ আর একটা বজ্রাঘাতের জন্য যেন প্রস্তুত হচ্ছে। আর একটা বজ্রাঘাত হয়তো সে সহ্য করতেও পারবে, কিন্তু বজ্রটা হানতে ইচ্ছা হল না নবনীর।

"না, চাকরি শেষ হবে কেন। নানারকম খবর সংগ্রহ করার বাতিকই যে আছে আমার, সেগুলো আপনি যদি সাজিয়ে পরিচ্ছন্ন করে বরাবর টুকে দেন তাহলে বরাবরই কাজ থাকবে আপনার।"

"রোজ কতক্ষণ করে কাজ করতে হবে, মাইনে কত দেবেন?"

"আপনিই সেটা বলুন। কাজ আপনার মরজি মতন করবেন। কারণ তাড়া তো কিছু নেই, কাজটা সুন্দর করে করতে হবে কেবল। কড়াক্কড়ি নিয়ম বেঁধে যে তা করা যায় না, তা আমি জানি। মাইনে কি রকম চান?"

"মাইনে আমি চাই না, কি চাই সেটা বলছি—।"

বলবার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভূষণ চক্রবর্তী, যা বলবেন তার হাস্যকর দিকটা তাঁর কাছেও ক্ষণকালের জন্য প্রকট হয়ে উঠল।

"কি বলুন—"

"একটা ভালো বড় বাড়ি আমি ভাড়া করতে চাই। তার যা ভাড়া লাগে সেইটে

আপনি দিয়ে দেবেন। আর আমাকে নগদ গোটা তিরিশেক টাকা দিলেই চলবে, পঁচিশ টাকা হলেও চলবে।"

এইবার নবনী রায়েরও মনে হল লোকটি সত্যই বোধহয় পাগল।

"বড় বাড়ি চান ? খুব বড় পরিবার বুঝি আপনার ?"

"আমার পরিবার নেই, কেউ নেই। আমি বাড়িটা চাই শিল্পী বনস্পতি মিশ্রের জন্য।"

"বনস্পতি মিশ্র ?"

একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেন স্পর্শ করে গেল নবনীকে! বনস্পতি? এই অদ্ভুত নামটা তো সে শুনেছিল সেই জ্যোতিষীর কাছে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাঁর বাড়িভাড়া আপনি দেবেন কেন ? কে হন তিনি আপনার ?"

"রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু তিনিই আমার সব। এই সর্বনাশা যুগের করাল কবল থেকে তাঁকে বাঁচাব এই আমার পণ, প্রাণ পণ করেছি এই জন্যে, এ পণ রক্ষা করবার জন্যে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি দু'মাস থেকে। আমি—"

হঠাৎ রুদ্ধবাক হয়ে গেলেন ভূষণ চক্রবর্তী! টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল তাঁর চোখ থেকে।

নবনী রায়ও রুদ্ধবাক হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিল এ কি অদ্ভুত যোগাযোগ! আর একটু ভাল করে জানবার জন্যে সে জিগ্যেস করল, "শিল্পী বনস্পতির নাম তো শুনিনি কখনও"—

গর্জন করে উঠলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

"বাজারে নাম জাহির করতে হলে নিজেকে যতটা নীচু করতে হয় বনস্পতি ততটা নীচু হতে পারেন না। সত্যিই বনস্পতি তিনি, আকাশচুম্বী তাঁর শির, সে শির মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেব না আমি। প্রচণ্ড একটা ঝড় এসেছে তা ঠিক, সে ঝড় তাঁর গায়ে আমি লাগতে দেব না। তাই পাগলের মতো একাই আমি তার বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছি। হয়তো আমি পারব না, হয়তো বনস্পতির মৃত্যু হবে, হয়তো সমূলে উৎপাটিত হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে সে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ব, আমার প্রাণ থাকতে আমি মাথা নোয়াতে দেব না তাঁকে—"

"কোথা থাকেন তিনি ?"

"আগে সুখপুরে থাকতেন, সুখের সংসার ছিল তাঁদের, কিন্তু গঙ্গার ভাঙনে ভেঙে গেল সব, ভেসে গেল। গঙ্গা দেবী নয়, রাক্ষসী। এখন ওঁরা কোলকাতার এক এঁদো গলিতে এসে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। আমি তাঁকে আর তাঁর মেয়ে বর্ণনাকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে চাই।"

নিঃসংশয় হল নবনী রায়।

"বেশ, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ভাল বাড়ি দেখুন আপনি, যা ভাড়া লাগে আমি দেব। কিন্তু একটি শর্তে।"

"কি শর্তে বলুন।"

"আমি যে বাড়ির ভাড়াটা দিচ্ছি, একথা তৃতীয় ব্যক্তি যেন জানতে না পারে। বাড়ি খুঁজুন আপনি। বনস্পতি মিশ্রের সম্বন্ধে আরও জানতে কৌতূহল হচ্ছে, আপত্তি যদি না থাকে, তাহলে তাঁর ইতিহাসটা বলুন—"

ভূষণ চক্রবর্তী গোড়া থেকে সব বলতে লাগলেন।

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল নবনী রায়। শুনতে শুনতে আর একটা কথাও তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। শুধু বনস্পতি নয়, বর্ণনার জন্যেও প্রাণ কাঁদছে ভূষণ চক্রবর্তীর।

পাঁচ

এইখানে একটা কথা বলে নিতে চাই। এই কাহিনীর ঘটনাগুলো আমি পর-পর যে ভাবে বর্ণনা করে যাচ্ছি তাতে হয়তো মনে হবে যে ওগুলোর মধ্যে বুঝি কোন সময়ের ব্যবধান ছিল না। সময়ের ব্যবধান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কোন্ ঘটনার কতদিন পরে আর একটা ঘটনা ঘটেছে তা আমার ঠিক মনে নেই। বর্ণনারও নেই। অনেকদিন পরে অনেকদূর থেকে ওগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ওদের যে পাশাপাশি-ঘেঁষাঘেঁষি রূপ আমরা দেখেছি সেটা ওদের সত্য রূপ নয়, ওদের মধ্যে অনেক ফাঁক, অনেক সময়ের ব্যবধান আছে। আকাশের নক্ষত্রদেরও আমরা পাশাপাশি দেখি, কিন্তু আসলে একটা নক্ষত্র আর একটা নক্ষত্র থেকে বহু কোটি যোজন দূরে থাকে। এ-ও অনেকটা তেমনি।

হেমন্তকুমার আর তার ছেলে-মেয়েরা রোজগার করতে শুরু করল সবাই। চারটি মেয়েই বাহাল হয়ে গেল ঝি-গিরিতে। এর চেয়ে ভাল কাজ তাদের জুটল না, জোটা সম্ভবও ছিল না। লাঠি খাবার ফেরি করতে লাগল, সোঁটা বাহাল হয়ে গেল এক কবিরাজের দোকানে, সেখানে ওষুধ বাটা, গুঁড়ো করা, বাছা—এই সব কাজ করতে হত তাকে। বল্লম অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত, কিন্তু রোজই রোজগার করত কিছু কিছু, বলত মুটেগিরি করি। হেমন্তকুমারও গেরুয়া-কাপড় আর বুলির জোরে রোজগার করত মন্দ নয়। সবাই মিলে গড়ে প্রায় সাত আট টাকা রোজগার করত রোজ প্রথম-প্রথম। আর্থিক সমস্যা অনেকটা সমাধান হল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে আর এক সমস্যা দেখা দিল।

হেমন্তকুমার সকালে বেরিয়ে যেত, খাবার জন্য ফিরে আসত দুপুরে। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে চারটে নাগাদ আবার বেরুত, ফিরে আসত রাত নটার পর।

একদিন সে দুপুরে ফিরে এসে দেখল রান্না হয়নি। আসন্ন-প্রসবা সত্যবতী আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের চারদিকে ভাঙা কাপ ডিশ ছড়ানো।

"কি ব্যাপার, অমন করে শুয়ে আছ যে? শরীর খারাপ নাকি?"

সত্যবতী নিরুত্তর।

"ঘুমুচ্ছ নাকি?"

কোনও উত্তর নেই। মড়ার মতো শুয়ে আছে সত্যবতী।

"হল কি তোমার?"

গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিলে হেমন্তকুমার বার দুই। তবু উত্তর নেই।

"আরে ব্যাপার কি—?"

ন'বছরের ছেলে সড়কি বাচস্পতির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "মায়ের অসুখ করেছে। ডাক্তার এসেছিল ইন্‌জেকশন দিয়ে গেছে।"

"তাই নাকি?"

তারপর সীমন্তিনী এল, তার কাছে থেকে সব বোঝা গেল। সকালে হেমন্তকুমার আর ছেলে-মেয়েরা কাজে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই সত্যবতীর এই ভাবান্তর।

"প্রথমে বিড়বিড় করে কি বলছিল। তারপর চেঁচিয়ে উঠে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল, কাপ ডিশগুলো আছড়াতে লাগল মেঝের উপর। শেষকালে আগুনের একটা নুড়ো জেলে ওই পার্টিশনটায় আগুন ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল, ভাগ্যে বর্ণনা দেখে ফেললে, তা নাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত। উনি বললেন, এ তো পাগলামির লক্ষণ মনে হচ্ছে, ডাক্তার ডাকতে পাঠাও। বর্ণনা কলেজ যাচ্ছিল, সে বললে আমি এখুনি ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি। বর্ণনা চলে যাবার পর আরও বাড়াবাড়ি হল। নিজের পেটে গুম গুম করে কিল মারতে লাগল বৌদি। খন্তাটার চুলের ঝুটি ধরে মুখ ঘষতে লাগল মেঝেতে, বেচারীর কপালের ছাল উঠে গেছে খানিকটা। সে এক কাণ্ড! উনি, ঠাকুরপো, সবাই শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সরু ওকে ধরতে গিয়েছিল, এক চড় মেরে সরিয়ে দিলে তাকে। বাড়িতে বড় ছেলে-মেয়ে কেউ নেই, শেষকালে বাড়িওলাকে ডাকতে হল। তিনি আরও দু'তিনজনকে ডেকে এনে ধরে বেঁধে ফেললেন ওকে। সে কী চীৎকার! একটু পরে ডাক্তার এলেন, তিনি এসে ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তোমাকে বলেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এই তাঁর ঠিকানা—"

কার্ডখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হেমন্তকুমার।

সীমন্তিনী বলল, "তোমার খাবার আমি করে রেখেছি। খাবে চল। ছেলে-মেয়েদেরও খাইয়ে দিয়েছি। বৌদি এখন ঘুমুক। ঘুম ভাঙলে একটু দুধ খাইয়ে দেব। চল—"

হেমন্তকুমাররা সপরিবারে রোজগার আরম্ভ করেই আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করেছিল।

একটা অজুহাতও ছিল তাদের। তারা পছন্দ করত ঝাল-মসলা-পেঁয়াজ-রসুন দেওয়া গরগরে রান্না। বনস্পতি-বাচস্পতির সহ্য হত না ওসব। তাই বর্ণনা একটা ইক্‌মিক কুকার আর স্টোভ কিনে আলাদা ব্যবস্থা করেছিল নিজেদের।

খাওয়া-দাওয়ার পর হেমন্তকুমার ডাক্তারের কাছে গেলেন।

ডাক্তার চক্রবর্তী বর্ণনাদের হস্টেলের ডাক্তার। তিনি হেমন্তকুমারের গৈরিক বাস দেখে আশ্চর্য হলেন একটু।

"বর্ণনা আমাকে পাঠিয়েছিল কি আপনারই স্ত্রীকে দেখতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর কি হয়েছে বলুন তো?"

"মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।"

"এর কারণটা কি?"

"কারণ আপনি।"

"আমি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্তানের বোঝা আপনার স্ত্রী আর বইতে পারছেন না। কিন্তু সেদিকে আপনার লক্ষ্য নেই, আপনি বোঝা চাপিয়েই যাচ্ছেন—"

"দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা কি করে রোধ করি বলুন।"

মৃদু হেসে ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন, "আপনি গেরুয়া পরেছেন, আপনার মুখে ওকথা সাজে না।"

"ওইখানে ভুল করলেন সার। এটা আমার ব্যবসার ইউনিফর্ম, আপিসের পোশাক। পুলিসের, রেল-কর্মচারীদের, ট্রাম কণ্ডাকটারদের যেমন থাকে, এ-ও তেমনি। আমি ঊর্ধ্ব-রেতা সন্ন্যাসী নই, হতেও চাই না। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব মতামত আছে—"

"তা থাক, কিন্তু আপনার ওই এনিমিক স্ত্রীর যদি এইভাবে ছেলেপিলে হতে থাকে তাহলে উনি আর বাঁচবেন না, যদিও বাঁচেন, দেহে মনে পঙ্গু হয়ে থাকবেন।"

"কিন্তু এর উপায়টা কি বলুন। আপনারা সংযম-সংযম করেন, কিন্তু সংযম করলেই কি কিছু হবে? বছরে যদি একদিনও সংযমের বাঁধ ভাঙে, ব্যস্, তাহলেই তো হয়ে গেল। তাছাড়া সংযম করবই বা কেন। মন্ত্রে কি আছে তা জানেন?"

"না জানি না। তবে এইটে জানি যে জানোয়ারের মতো এই ভাবে যদি বংশ-বৃদ্ধি করতে থাকেন, অসীম দুর্গতি ভোগ করতে হবে। আপনার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। আপনি বরং ডাক্তার সামন্তের কাছে যান, তার একটা বার্থ-কন্ট্রোল-ক্লিনিক আছে। সে আপনার মন্ত্র টন্ত্র মন দিয়ে শুনবে, আপনার সঙ্গে তর্ক করতেও পারবে, ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে। তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

তিনি প্যাড টেনে চিঠি লিখতে লাগলেন। তারপর চিঠিটা খামে পুরে তার উপর ঠিকানা লিখে দিয়ে দিলেন হেমন্তকুমারকে।

"এখন আমার স্ত্রীর কি চিকিৎসা চলবে?"

"আমি বর্ণনাকে একটা প্রেসক্রিপশান লিখে দিয়েছি। ওই ওষুধটাই ছ ঘণ্টা অন্তর চলুক আপাতত। আজ আর ইন্‌জেকশন দেবার দরকার নেই, দরকার হলে পরে দেখা যাবে।"

"আপনার ফী-টা—"

ডাক্তার চক্রবর্তী হেসে বললেন, "আপনি তো আমাকে কল্ দেননি, কল্ দিয়েছিল বর্ণনা। ফী-য়ের কথা তার সঙ্গে হয়ে গেছে। আপনি যত শিগ্‌গির পারেন সামন্তর সঙ্গে দেখা করুন, সে আপনার কাছে ফী চাইবে না, লিখে দিয়েছি।"

"কিন্তু আমি বিনা ফী-য়ে কাউকে দিয়ে কিছু করাতে চাই না।"

"বেশ তাহলে দেবেন। আচ্ছা, আসুন এখন, নমস্কার।"

ডাক্তার চক্রবর্তী ঘণ্টা টিপলেন।

আর একটি রোগী এসে হাজির হল দ্বারপ্রান্তে। হেমন্তকুমারকে উঠে পড়তে হল চেআর ছেড়ে।

ছয়

বর্ণনার আশা হয়েছিল হেমন্তকুমার সপরিবারে উপার্জন করে যখন নিজেদের খরচ চালিয়ে নিতে পারছে তখন এইবার একটু সচ্ছলতার মুখ দেখা যাবে বোধহয়। সুখময়-বাবু ঠিক নিয়মিতভাবে মাইনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, বাচস্পতিরও ছাত্রী জুটেছিল একটি। তারই এক বন্ধু, সুদেষ্ণা। সুদেষ্ণা তার চেয়ে বছরখানেকের সিনিআর, এম-এ পাশ করে পাণিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধে গবেষণা করছে। বাচস্পতি সংস্কৃতে পণ্ডিত শুনে আলাপ করতে এসেছিল। আলাপ করে প্রথম দিনই মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে। তিনি তাকে গবেষণার একটা নূতন পথও নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেখ মা, পাণিনি শুধু ব্যাকরণ নয়, পাণিনি আর্য সংস্কৃতির প্রতীক। ভাল করে পাণিনি পড়লে বোঝা যায় আর্য সভ্যতার চেহারা কি রকম ছিল, আদর্শ কি রকম ছিল। তাই পাণিনি আগে বারো বছর ধরে পড়তে হত, শুধু একটা ব্যাকরণ হলে অতদিন লাগবার কথা নয়। ভট্টি যেমন শুধু কাব্য নয় ব্যাকরণও, পাণিনিও তেমনি শুধু ব্যাকরণ নয়, ওর মধ্যে অনেক কিছু আছে। তুমি তোমার গবেষণাটা যদি এই ধারায় চালাও, তাহলে এ যুগের পক্ষে একটা নতুন জিনিস হবে। আমার যতটুকু বিদ্যে আছে তা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব নিশ্চয়ই।" সুদেষ্ণা সপ্তাহে তিন দিন তাঁর কাছে আসত, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিত।

বনস্পতিরই রোজগারের কোনও রাস্তা আবিষ্কৃত হয়নি তখনও পর্যন্ত। যদিও বর্ণনা ভাবছিল তাঁর ছবিগুলো একে একে বিক্রি করে ফেলতে পারলে ঘরটাও খালি হয়ে যায়

আর কিছু টাকাও আসে—কিন্তু কথাটা সে পাড়তে পারেনি বনস্পতির কাছে ভালোভাবে। বনস্পতি যদিও তাকে বলেছিল ছবি বিক্রি করতে, কিন্তু সেটা তার মনের কথা যে নয় তা সে বুঝেছিল। এখানে এসে বাবা মা দুজনেরই যেন ছবিগুলোর প্রতি মমতা আরও বেড়ে গেছে তার মনে হচ্ছিল। যদিও নূতন কোন ছবি আর আঁকা হয়নি, কিন্তু ছবির জগতেই যেন বাস করছে ওরা দুজনে। প্রতিটি ছবিকে রোজ ঝাড়ছে, মুছছে, পুবদিকের যে জানলাটা দিয়ে আলো আসে তার সামনে এক-একদিন এক-একটি ছবি রেখে নূতন করে যেন আলাপ করছে তাদের সঙ্গে। বর্ণনার মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই ছবিগুলোই ওদের সন্তান-সন্ততি। ওগুলোর সঙ্গে তার বাবা-মার প্রাণের যোগ যত গভীর তারও সঙ্গে বোধহয় ততটা নয়। ইদানীং ওই পুরোনো ছবিগুলো নাড়া-চাড়া করেই সময় কাটছে তাঁদের। এখানে এসেই বনস্পতি একটা নূতন ছবিতে হাত দিয়েছিল, কিন্তু সেটার কাজ অগ্রসর হল না। ক্যানভাসটার সামনে তুলি নিয়ে চুপ করে বসে-বসেই সময় কেটে গেল অনেকক্ষণ, দিনের পর দিন কাটল, ছবি হল না।

"আচ্ছা, ভূষণের কোনও খবর পাওয়া গেল না? সে এখানকার ঠিকানা জানে তো?"

বনস্পতি মাঝে মাঝে খোঁজ করে। তার বোধহয় মনে হয় ভূষণ কাছাকাছি থাকলে তার ছবি আঁকবার প্রেরণা ফিরে আসবে আবার।

"ভূষণ কাকা এখানকার ঠিকানা জানেন না, আমার হস্টেলের ঠিকানা জানেন, হস্টেলে তো আমি রোজই যাই, তিনি এলে খবর পাব নিশ্চয়।"

"হয়তো তোকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেছে—"

"না দারোয়ানকে বলা আছে আমার খোঁজে কেউ এলে যেন তার নাম ঠিকানা লিখে রাখে। উনি আসেননি এখনও।"

বনস্পতি প্রতিবাদ করে না, কিন্তু কথাটা কেমন যেন বিশ্বাস হয় না তার। ভূষণ এতদিন ছেড়ে থাকবে তাকে?

ভূষণ চক্রবর্তী বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

নবনী রায়ের বাড়িতে ঘণ্টা দুই কাজ করে তিনি বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। মনোমত বাড়ি কিছুতেই পাচ্ছিলেন না। কোলকাতা শহরে টাকা ফেললেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি পাওয়া যায় না। নবনী রায়ও বাড়ির চেষ্টায় ছিল। বনস্পতিকে একটা ভাল পরিবেশে স্থাপন করবার আগ্রহ তারও কম ছিল না। কিন্তু কিছুতেই পছন্দমতো বাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না।

এইভাবেই চলছিল।

এমন সময় বর্ণনার একদিন মনে হল ভাগ্যদেবতা সহসা বুঝি প্রসন্ন হলেন। অঞ্জনা দেবীকে কাফির একটা গৎ শেখাচ্ছিল সে, পাশের ঘরেই সুখময়বাবু ছিলেন, এমন সময় নীচে থেকে চাকর ছাই কাগজে মোড়া একটি বড় প্যাকেট নিয়ে এল।

অঞ্জনা বললেন, "বাবু ওঘরে আছেন, ওখানেই নিয়ে যাও।"

হীরু চলে গেল। বর্ণনা জিজ্ঞেস করলে, "কি ওটা, ছবি, না আয়না ?"

"ছবি। ওঁর নানারকম ছবি কেনার বাতিক আছে যে।"

কথাটা বলেই মুখ ফিরিয়ে হাসলেন অঞ্জনা, মুখে আঁচল দিয়ে। বর্ণনা ঠিক বুঝতে পারল না এতে হাসির কি আছে।

"ও, তাতো জানতুম না। জানলে আমার বাবার ছবিগুলো দেখাতাম ওঁকে। কিন্তু কই, আপনাদের ঘরে তো ছবি দেখি না তেমন। ছবি কিনে উনি রাখেন কোথা ?"

"আলমারিতে।"

"ছবি তো দেখবার জন্যে। আলমারিতে পুরে রেখে লাভ কি ?"

"সবাইকে দেখান না। আপনাকে হয়তো দেখাতে পারেন একদিন।"

এমন সময় সুখময়বাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

"কাফির গৎটা বন্ধ হয়ে গেল কেন ? বেশ লাগছিল, চমৎকার হাত আপনার।"

"উনি তোমার ছবিগুলো দেখতে চাইছেন।"

অঞ্জনা দেবী মুচকি হেসে চোখ-মুখের এমন একটা ভঙ্গী করলেন যে অদ্ভুত মনে হল বর্ণনার।

"ছবির সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল আছে নাকি ?"

"আছে বইকি, আমার বাবা যে একজন আর্টিস্ট।"

"সত্যি ? এ কথা তো আগে বলেননি। আপনার বাবার নাম কি ?"

"বনস্পতি মিশ্র। তবে তাঁর নাম আপনারা কেউ শোনেননি। দেশের বাড়িতেই তো বরাবর কাটিয়েছেন, আর ছবি-ছাপানোর দিকে তার ঝোঁক ছিল না কখনও। বিস্তর ছবি জমে আছে বাড়িতে। ভাবছি তেমন খরিদ্দার যদি পাই, বেচে দেব।"

"আমিই কিনতে পারি। ছবিগুলো দেখান আমাকে।"

"বেশ, দেখাব। কাল নিয়ে আসব একখানা। কোনও বন্ধুকে দেখাতে যাচ্ছি বলে নিয়ে আসতে হবে, বাবা হয়তো বিক্রি করতে রাজী হবেন না। তবে আপনার যদি পছন্দ হয় তাঁকে রাজী করাতে পারব।"

"বেশ, কাল নিয়ে আসবেন। আর আমাকে আপনি বন্ধু বলেই মনে করতে পারেন।"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন অঞ্জনা দেবী। বর্ণনার মনে হল যখন তখন হাসি মেয়েটির রোগ নাকি !

তার পরদিন 'মহাকালী' ছবিখানাই নিয়ে এল সে। বাবা-মার চোখের দৃষ্টি কিন্তু এড়াতে পারেনি।

শঙ্কিত কণ্ঠে বনস্পতি জিগ্যেস করল, "কোথা নিয়ে যাচ্ছিস ওটা ?"

"আমার এক বন্ধুকে দেখাব।"

"দাঁড়া তাহলে, আমি ঠিক করে বেঁধে দি কাগজ দিয়ে। দেখিস ছবির মাঝখানে যেন ঘষা না লাগে।"

বনস্পতি নিজে হাতে নিপুণভাবে প্যাক করে দিলেন ছবিখানা।

ছবিখানা দেখে যে সুখময়বাবু এমনভাবে মুগ্ধ হয়ে যাবেন তা বর্ণনা কল্পনা করেনি।…

"বা বা বা বাঃ—এ তো অদ্ভুত ভালো ছবি। ইনি তো একজন জিনিআস দেখছি, বিরাট জিনিআস!"

ম্লান হেসে বর্ণনা বললে, "অনেকে একথা বলেছে। কিন্তু আত্মপ্রচার আর আত্ম-বিক্রয় না করলে জিনিআসদের কদর হয় না এদেশে। নিজের ঢোল নিজেই পেটাতে হয়। বাবা সেটা করতে রাজী নন। তাই খোলার ঘরে বাস করে অতি কষ্টে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁকে—"

"বলেন কি! খোলার ঘরে থাকেন আপনারা?"

"মাত্র দু শ' টাকা আয় যে। জ্যাঠামশাই সম্প্রতি একটা পঞ্চাশ টাকার টিউশনি পেয়েছেন। মাত্র আড়াই শ' টাকা আয়ে ভালো বাড়িতে থাকা যায় না। দেশে আমাদের পাকা বাড়ি জমি সব ছিল, কিন্তু গঙ্গায় সব কেটে গেছে। এখানে খোলার ঘরে আছি। বাবার ছবিগুলোর জন্যেই আলাদা একটা ঘর ভাড়া করতে হয়েছে।"

"সেটাও খোলার ঘর?"

"হ্যাঁ, পাকাঘর ভাড়া করবার পয়সা এখনও রোজগার করতে পারছি কই!"

"আপনার যা গুণ, আপনার পয়সা রোজগারের ভাবনা কি! ছবিগুলোর জন্য অন্তত একটা পাকা ঘর ভাড়া করুন, তা নাহলে ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।"

"কাছাকাছি তেমন পাকা ঘরও নেই। আর বাবা-মা দুজনেই ছবিঅন্ত প্রাণ। ছবিগুলো চোখের আড়াল করতে চান না। আমি চেষ্টা করছি ওঁদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ছবিগুলো আস্তে আস্তে বিক্রি করে দেব। আপনি কি এটা কিনতে চান?"

"নিশ্চয়ই—"

"কি রকম দাম দেবেন?"

স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন সুখময়বাবু।

তারপর বললেন, "এসব অমূল্য জিনিস, টাকা দিয়ে এসবের দাম দেওয়া যায় না। আপনি যা বলবেন তাই দেবার চেষ্টা করব, অবশ্য যদি সামর্থ্যে কুলোয়।"

"আমি কিছুই বলব না।"

সুখময়বাবু চেক-বই বার করে এক হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন একটা। বর্ণনা এতটা প্রত্যাশা করেনি। তার দেহে মনে পুলক শিহরণ বয়ে গেল। তবু বললে, "আপনি চেকটা এখন রাখুন। বাবা যদি বিক্রি করতে রাজী হন তাহলে ওটা নিয়ে যাব।"

"না, আপনি চেকটা নিয়ে যান, ছবিটাও নিয়ে যান। আপনার বাবা যদি রাজী হন ছবিটা দিয়ে যাবেন আমাকে।"

একটু ইতস্তত করে বর্ণনা বললে, "আচ্ছা, ছবিটা থাক আপনার কাছে।"

বাড়ি ফিরে এসে বর্ণনা বনস্পতির দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো ?"

"কি কথা—"

"আমার বন্ধুর খুব ভালো লেগেছে 'মহাকালী' ছবিটা। সে ওটা রাখতে চাইছে।"

আনন্দে জলজল করে উঠল বনস্পতির চোখ দুটো।

"খুব ভালো লেগেছে ? রাখতে চাইছে ? তোর মায়ের যদি আপত্তি না থাকে, থাক না হয় ওটা ওর কাছে। তোর খুব বন্ধু বুঝি ?"

"হ্যাঁ—। সে কিন্তু অমনি নেবে না, এক হাজার টাকার চেক দিয়েছে একটা।"

"সে কি ! বন্ধুর কাছ থেকে দাম নিবি ?"

"সে কিন্তু অমনি নেবে না।"

বনস্পতি এ-কথা শুনে একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"নেবে না ? আমাদের দারিদ্র্যের কথা টের পেয়েছে না কি ? আমাদের দুরবস্থার কথা বলেছিস তাকে ?"

"বলেছি বইকি। লুকুতে যাব কেন ?"

"তাই সে তোর উপহার নিতে চাইছে না। ছবি কেনার ছুতো করে সাহায্য করছে। দাম দেওয়ার ছলে ভিক্ষে দিচ্ছে।"

"বাঃ, তা কেন, ছবি বিক্রি করে সব শিল্পীই দাম নেয়। এটা একটা পেশা তো—"

"তা জানি। কিন্তু আমি তো পেশাদার শিল্পী নই। ছেলেবেলা থেকে নিজের খেয়ালেই ছবি আঁকছি। দাম-টামের কথা তো ভাবিনি কখনও।"

"কিন্তু এবার ভাবতে হবে। এমন কষ্ট করে তুমি আছ, এ আমি দেখতে পারি না।"

হঠাৎ বর্ণনার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। এ কাঁপার অর্থ কি তা বনস্পতি জানতেন। শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, তোর যা খুশি কর।"

বর্ণনার চোখ দিয়ে সত্যিই টপ টপ করে জল পড়ল। আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলে সে।

"এই দেখ, দেখ, কি ছেলেমানুষী দেখ। বললুম তো, তোর যা খুশি কর। ছবি বেচে তোর যদি সাশ্রয় হয়, তাই কর।"

এমন সময় সরস্বতী এসে ঘরে ঢুকল। স্নান করতে গিয়েছিল সে।

"কি হয়েছে ?"

তারপর সমস্ত শুনে বললে, "ও ছবিখানা কাউকে দেব না। আমি মহাকালী পুজো করব ঠিক করেছি, ওই ছবিখানাই পুজো করব। অন্য ছবি তুমি তোমার বন্ধুকে দিতে পার।"

পরদিন আর একখানা ছবি নিয়ে গেল বর্ণনা। এটা আরও পছন্দ হল সুখময়বাবুর। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন, তাঁর তেতলার ঘরে তিনি খানকতক ছবি এনে রাখতে চান। দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলে ভালও থাকবে, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ক্রেতাও জুটবে।

বললেন, "বেশি ছবি যদি আনেন সেগুলো আলমারিতে রেখে দেবার ব্যবস্থাও করতে পারি। বড় বড় দুটো খালি আলমারিও আছে আমার। আমি আরও দু'একখানা কিনতেও পারি।"

আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও বর্ণনা এত খুশি হত না।

কিন্তু এতে বনস্পতি সরস্বতী কেউ রাজী হয়নি প্রথমে। যে ছবিকে তারা কখনও চোখের আড়াল করেনি তা অপরের বাড়িতে নিয়ে যাবে? তারা ঠিক মতো রাখবে কিনা, ঝাড়বে কিনা, এসব নানা কথা মনে হচ্ছিল তাদের। অথচ তারা সোজাসুজি 'না'-ও বলতে পারছিল না। কারণ এই বেদনাদায়ক সত্যটা ক্রমশ তাদের উপলব্ধি করতে হচ্ছিল যে ছবি বিক্রি না করলে চলবে না। এত টানাটানির মধ্যে বেশি দিন থাকা যাবে না। তবু তারা ইতস্তত করছিল। বর্ণনার জেদাজেদিতে শেষ পর্যন্ত পাঁচখানা ছবি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। এ ছবিগুলো দেখেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সুখময়বাবু। বললেন, আরও দু'খানা তিনিই নেবেন, বাকি তিনখানার খদ্দেরও যোগাড় করে দেবেন।

এইভাবে কাটল দিন কতক। বর্ণনার কল্পনা স্বপ্নে রঙীন হয়ে উঠল। তার মনে হল সত্যিই যদি বাবার ছবিগুলো বিক্রি হয়ে যায়, তাহলে তো তাদের ছোটোখাটো একটা বাড়িও হয়ে যেতে পারে। তার বান্ধবী আকাশ-পরী এম-এ পাশ করেই নাকি বিলেত যাবে। তারও বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে। বাবার এত ছবি, সত্যিই যদি ভাল দামে বিক্রি হয়ে যায়, তাহলে টাকার ভাবনা কি।

কিন্তু স্বপ্নসৌধ-শীর্ষে বজ্রপাত হল একদিন।

বর্ণনার সাহায্যে সেই তেতলার ঘরটিতে ছবি পাঁচখানি টাঙাচ্ছিলেন সুখময়বাবু। টাঙানো হয়ে যাবার পর সুখময়বাবু হঠাৎ বললেন, "বাইরের খদ্দের আসবার আগে আমি আমার ছবি দু'খানা বেছে নিয়ে 'সোল্ড' লিখে দি।"

"বেশ তো নিন। কোন্ দু'খানা নেবেন আপনি?"

সুখময়বাবু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। দেখবার পর হঠাৎ তিনি বর্ণনার সামনে এসে বললেন, "আমার মতে কোন্ ছবিখানা সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন?"

"কোন্‌খানা ?"

"এইটি ।"—এই বলে মৃদু হেসে তিনি বর্ণনার থুত্‌নিটি নেড়ে দিলেন ।

বর্ণনা পেছিয়ে গেল, তারপর আগুন জলে উঠল তার দৃষ্টিতে ।

এর মানে !"

খিক্ খিক্ হাসির শব্দ শুনে বর্ণনা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দালানে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছে ! হাসছে ? নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না বর্ণনার । স্বামীর এই ব্যবহার দেখে তার স্ত্রী হাসছে খিক্ খিক্ করে !

নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন সুখময়বাবু । ঢোঁড়া ভেবে যাকে নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলেন, দেখলেন তা ঢোঁড়া নয়, গোখ্‌রো !

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কিছু মনে করবেন না বর্ণনা দেবী, ওটা এমনি একটু রসিকতা করলুম । আমি 'শ্রীরাধা' আর 'রজনী' এই ছবি দুটো নেব । চেকটা এখুনি লিখে দি ?"

"না—"

রূঢ় কদর্য সত্যটা সহসা প্রতিভাত হয়ে উঠল তার মনে । সে আর কোন কথা না বলে নেবে গেল, সোজা নেবে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল একেবারে, তারপর হাঁটতে লাগল ।

…অনির্দিষ্ট ভাবে হন হন করে খানিকক্ষণ হাঁটবার পর সে একটা পার্কে গিয়ে ঢুকল ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখবার জন্যে । একটা কথা গোড়া থেকেই তার মনে হচ্ছিল, ওখানে আর যাওয়া যাবে না । কিন্তু এই কোলকাতা শহরে তাহলে চলবে কি করে ? হঠাৎ মনে পড়ল সুদেষ্ণা বলেছিল সে বনস্পতিকে ছোটোখাটো আঁকার কাজ যোগাড় করে দিতে পারে । তার এক দাদা বিজ্ঞাপনের এজেন্ট, অনেক আর্টিস্টকে ছবির কাজ দেন ! বর্ণনা তখনই উঠে পড়ল ।

সুদেষ্ণার দাদা সুবন্ধু সেন বাড়িতেই ছিলেন ।

বর্ণনার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন ।

"তিনটে কাজ এখনই দিতে পারি আপনার বাবাকে । একটা ছবি জুতোর কালির বিজ্ঞাপনের জন্য, একটা ছবি দেশলাই বাক্সর জন্য, আর তৃতীয়টা একটা বইয়ের প্রচ্ছদপট । বইটার নাম 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' । ছবি পছন্দ হলে তবে টাকা পাবেন । আমার কাজ ছবি যোগাড় করে আনা, পছন্দ করবেন ব্যবসার মালিকরা ।"

"পছন্দ হলে কি রকম টাকা পাওয়া যাবে ?"

"ছবি পিছু পঁচিশ টাকা । অনেক আর্টিস্ট ওর চেয়েও কম নেন, কিন্তু আমি আপনার বাবাকে পঁচিশ টাকাই পাইয়ে দেব । এসব ছবি আঁকতে ওঁর কতক্ষণই বা লাগবে । আসলে আইডিআটারই দাম ।"

বর্ণনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটু আগেই তার বাবার এক একটা ছবির জন্ম হাজার টাকা দিতে চাইছিল একজন, আর ইনি পাঁচিশ টাকাও যেন অনুগ্রহ করে দিচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ অবশ্য তার মনে হল সুখময়বাবু কি কেবল ছবির জন্যই অত টাকা দিচ্ছিলেন ?

"আপনার আপিসটা কোথায় ? ছবি-আঁকা হলে কোথায় নিয়ে যাব ? এখানেই আনব ?"

"এখানে আনতে পারেন, কিন্তু আপিসে যাওয়াই ভালো। আপনার বাবাকেই পাঠিয়ে দেবেন।"

"বাবা এখানকার পথ-ঘাট তেমন চেনেন না। আমিই গিয়ে দিয়ে আসব। আপনার আপিসের ঠিকানাটা দিন।"

ঠিকানাটা নিয়ে চলে এল বর্ণনা, কিন্তু বাড়ি গেল না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভাবতে লাগল, বিচার করতে লাগল। একটা কথা বার বার তার মনে হচ্ছিল আর একটা চাকরি পাবার আগে এ চাকরিটা ছাড়বে কিনা। লোকটা যে পাষণ্ড তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে নিজে যদি সংযত থাকে কি করবে ও ? জীবন-যুদ্ধে যখন নাবতেই হয়েছে তখন অত স্পর্শকাতর হলে চলবে কেন ? এই যে রোজ রাস্তা দিয়ে সে হাঁটে একাধিক পশুর লুব্ধদৃষ্টি কি তার সর্বাঙ্গ লেহন করে না ? তাই বলে সে কি রাস্তায় হাঁটা ছেড়ে দেবে, না বোরখা পরে বেরুবে। বাবার ছবিগুলো উদ্ধার করে আনবার জন্যেও তো তার কাছে যাওয়া দরকার। আর সত্যিই যদি সে দু'হাজার টাকা দিয়ে ছবিগুলো কেনে, তাহলে বিক্রিই বা করবে না কেন ? ক্রেতার চরিত্র নির্ণয় করে ছবি বেচে না কেউ। যদি চাকরি ছেড়েই দিতে হয় ওই টাকাগুলোই তখন সম্বল হবে···

হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল, একটা ট্যাক্সি নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তার পাশে। আর ট্যাক্সির ভিতর থেকে মিষ্টি সুরে ভেসে এল—"বোর্নিও, বোর্নিও—"

আকাশ-পরীর গলা।

"বোর্নিও, তুই চিত্রাঙ্গদা দেখতে যাসনি ?"

"না ভাই যাওয়া হয়নি। কেমন হল ?"

"চমৎকার। অনেক লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছি। কোথা যাচ্ছিস ?"

"বাড়ি।"

"চল্ তোকে পৌঁছে দি—"

ট্যাক্সিতে উঠল বর্ণনা। তার মনেই ছিল না যে ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা আজ 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় করছিল 'এম্পায়ার' থিএটারে। আকাশ-পরী 'চিত্রাঙ্গদা' সেজেছিল।

"তুই এত মনমরা হয়ে আছিস কেন বল্ তো ?"

ম্লান হেসে বর্ণনা বললো, "এমনি—"

আকাশ-পরী বড়লোকের মেয়ে, কিছুদিন পরে বড়লোকের বউ হবে, হবু স্বামী একজন বড় মিলিটারি অফিসার। যদিও আকাশ-পরী বর্ণনার খুব বন্ধু, তবু নিজের দৈন্যের কথা সে কোনদিন বলেনি তাকে। বলতে লজ্জা করত। বর্ণনাকে নাবিয়ে দিয়ে আকাশ-পরী চলে গেল। যাবার আগে দু লাইন কবিতা বলে গেল—

"সখি, আবরি রেখ না হিয়া
মরা মনটিরে জিয়াইয়া তোল প্রেমবারি সিঞ্চিয়া—"

কথায় কথায় গান আর কবিতা তৈরি করতে পারত সে।

বর্ণনা বাড়িতে ঢুকে দেখলে বাবা চিন্তিত হয়ে বসে আছে তার অপেক্ষায়।

"এত রাত হল যে তোর?"

মিথ্যে কথা বললে বর্ণনা।

"আজ কলেজে থিএটার ছিল। আচ্ছা বাবা, তুমি বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকবে? সামান্য কাজ, অথচ ছবি-পিছু পঁচিশ টাকা করে দেবে।"

"কি রকম ছবি?"

"সে কিছুই নয় তোমার পক্ষে। পরে বলব তোমাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা বনস্পতিকে বলতে পারল না যে জুতোর কালির আর দেশলাই বাক্সের জন্য ছবি আঁকতে হবে।

"মা কোথা?"

"হিমুদার ওখানে গেছে। ওদিকে আবার এক কাণ্ড হয়েছে।"

"আবার কি হল?"

"বন্দুক কিরিচ কেউ ফেরেনি এখনও। বৌদি আরও ক্ষেপে গেছে। ক্রমাগত চীৎকার করছে আমার মেয়েদের ফিরিয়ে এনে দাও। হিমুদা ফিরে আসতেই হাতা ছুঁড়ে মেরেছে তাকে। লাঠি সোঁটা বল্লম কেউ বাড়িতে নেই। তুইও তো ছিলি না। হিমুদাই গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন, তিনি আবার একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে গেছেন।"

সরস্বতী এসে ঘরে ঢুকলেন।

"তুমি চলে এলে যে?"

"কে একজন ভদ্রলোক কুষ্ঠি নিয়ে এসেছেন দাদার কাছে। বর্ণনা তুই একবার যা ওখানে, ওষুধ আনতে হবে।"

ঘর থেকে বেরুতেই দেখা হয়ে গেল সাবু মিস্তিরের সঙ্গে।

বুড়ির জঙ্গল বনকরটা বেঁচে গিয়েছিল। তারই খানিকটা বন্দোবস্ত করে কিছু চাল-ডাল সংগ্রহ করে এনেছিল সে।

"সাবুদা তুমি কি ওষুধ আনতে যাচ্ছ?"

"না, আমি বাসায় ফিরে যাচ্ছি। এখন না গেলে ট্রাম পাব না আর। টালিগঞ্জে যেতে হবে তো।"

"ও আচ্ছা।"

সাবু চলে গেল।

হেমন্তকুমারের ঘরে ঢুকে বর্ণনা দেখল নবনী রায় হেমন্তকুমারের সঙ্গে কথা কইছে। নবনী ইদানীং প্রায় কোন-না-কোন ছুতো নিয়ে হেমন্তকুমারের কাছে আসে বর্ণনার দেখা পাবে বলে। আজ তার সে আশা সফল হল। হেমন্তকুমারের মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে বর্ণনা জিগ্যেস করলে, "তোমার মাথায় কি হল মামাবাবু?"

"গলিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। অন্ধকার তো গলিটা। তোর মামীমারও আবার অসুখ করেছে।"

আসল ব্যাপারটা বাইরের লোকের কাছে ভাঙল না হেমন্তকুমার।

নবনী রায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। নমস্কার করে বর্ণনাকে বললে, "চিনতে পারছেন?"

বর্ণনা চিনতে পারলে না।

"আপনি সেদিন যখন 'লরি' থেকে ছবি নাবাচ্ছিলেন তখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, প্রায় মাস তিনেক আগে।"

এইবার মনে পড়ল বর্ণনার।

"এখানে এসেছেন কেন?"

"স্বামীজির কাছে একখানা কুষ্ঠি নিয়ে এসেছিলাম। উনি আমাকে একটা কবচ করে দিয়েছিলেন, খুব ভালো ফল পেয়েছি।"

'স্বামীজি' কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকে গেল বর্ণনার।

হেমন্তকুমার বললে, "নবনীবাবু, আজ আর কুষ্ঠি বিচার করতে পারব না। কপালটা কেটে গেছে, তার উপর বাড়িতেও অসুখ। আপনি দিন সাতেক পরে আসবেন।"

"বেশ। টাকাটা দিয়ে যাই।"

দু'খানি দশ টাকার নোট বার করে দিল নবনী রায়।

হেমন্তকুমার তখন বর্ণনার দিকে ফিরে বলল, "তোর মামীমার জন্যে ডাক্তার চক্রবর্তী একটা প্রেসক্রপশান লিখে দিয়ে গেছেন, তুই এনে দিতে পারবি?"

"শ্যামবাজারে যেতে হবে তো। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। তবে, 'বাস' হয়তো পেতে পারি। দাও, দেখি—"

নবনী রায় বললে, "আমি ট্যাক্সি করে এসেছি। আপনাকে 'লিফ্‌ট' দিয়ে দিতে পারি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"বাইরে তো কোন ট্যাক্সি দেখলুম না।"

"বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।"

"চলুন তাহলে—"

গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নবনী রায় বলল, "স্বামীজি যে আপনার মামা তা জানতাম না।"

বর্ণনাও জানত না যে হেমন্তকুমার স্বামীজি সেজে পয়সা রোজগার করছেন। বর্ণনার মজা লাগল একটু। কিন্তু পরমুহূর্তেই লজ্জা হল। একটু আগেই সে সুখময়বাবুর মুখোসের অন্তরালে যে পশুকে দেখেছিল হেমন্তকুমারের মধ্যেও যেন সেই পশুর আর এক রূপ দেখতে পেল সে।

"আপনার বাবার আঁকা ছবিগুলো কি এইখানেই এনে রেখেছেন?"

নবনী রায়ের প্রশ্নে একটু বিস্মিত হল বর্ণনা, এই ছবির কথাই এখনি ভাবছিল সে।

"আর কোথা রাখব বলুন। কিছু বিক্রি করে দিতে চাই, কিন্তু খরিদ্দার পাচ্ছি না। কোথাও এক্‌জিবিট্‌ করতে পারলে হত, কিন্তু জানাশোনা সে রকম জায়গা তো নেই। একজনকে দিয়েছিলাম কয়েকখানা, কিন্তু সেখানে রাখা চলবে না।"

"কেন, কি হল? একটাও বিক্রি হয়নি?"

"তিনি একখানা কিনেছেন আরও কিনতে চান, কিন্তু—"

হঠাৎ থেমে গেল বর্ণনা।

"কিন্তু কি?"

"সেখানে পোষালো না ঠিক।"

এই সময় বড় রাস্তায় এসে পড়ল তারা। আলো পড়লো বর্ণনার মুখে। নবনী রায় দেখতে পেল সে একটু অপ্রতিভ আর লজ্জিত হয়ে পড়েছে।

নবনী তখন বলল, "আমার একটি ফোটোগ্রাফার বন্ধু আছে, তার ভাল 'শো-কেস'ও আছে। লোকটি মাদ্রাজী, খুবই ভদ্রলোক। আপনি যদি চান তার 'শো-কেসে' দু'একটা ছবি রাখিয়ে দিতে পারি। অনেক লোক আসে তার দোকানে, বিক্রি হয়ে যেতে পারে।"

"যদি করে দিতে পারেন, খুব উপকৃত হব।"

উপকারী বন্ধুর ভূমিকায় নাবতে ইচ্ছা ছিল না নবনীর, কিন্তু নাবতে হল। সে মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিল কি করবে, এখন ধরা দিতে হল বটে, কিন্তু আর দেবে না।

"ছবিগুলো কি আপনার বাড়িতে দিয়ে আসব? আপনার ঠিকানা কি?"

"আমি বাইরে থাকি। যাঁর কাছে ছবিগুলি আছে তাঁর কাছে যদি একটা চিঠি লিখে দেন আনিয়ে নিতে পারি। কিম্বা এখানে যদি এনে রাখেন, আমার সেই বন্ধুটি এখান থেকেও নিয়ে যেতে পারেন।"

"বেশ। কাল আপনি আসবেন কি? তাহলে আপনাকে সঙ্গে করে না হয় নিয়ে যাব তাঁর কাছে।"

"আসব। কোথায় দেখা হবে আপনার সঙ্গে? এইখানেই?"

"আপনি যদি আমাদের হস্টেলে যান তাহলে আমার সুবিধা হয়।"

"হস্টেল? কোথায় সেটা?"

"হস্টেল বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয়। আমরা জনকয়েক পোস্টগ্র্যাজুএট মেয়ে একটা বাড়িভাড়া করে থাকি। কলেজ রো-তে। ঠিকানাটা লিখে দেব আপনাকে?"

"বেশ যাব। পাঁচটা নাগাদ থাকবেন সেখানে?"

"থাকব।"

ওষুধের দোকানে নেবে বর্ণনা হস্টেলের ঠিকানাটা নবনী রায়কে লিখে দিলে।

ওষুধ নিয়ে বর্ণনা যখন ফিরল তখনও বন্দুক কিরিচ ফেরেনি। লাঠি ফিরেছে, কিন্তু মত্ত অবস্থায়। বর্ণনা এসে দেখলে সোঁটা তার মাথায় জল ঢালছে আর বল্লম জোর করে তার মাথাটা হেঁট করে রেখেছে। বাকী ছেলে-মেয়েগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দেখছে। হেমন্তকুমার নেই।

"মামাবাবু কোথায় গেলেন?"

জবাব দিল কাটারি—"বাবা দিদিদের খুঁজতে বেরিয়েছে।"

ছোরা আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল, সে মুখটা খুলে বললে, "ওরা খিদিরপুরে সেকেণ্ড শোয়ে 'নাগিন' দেখতে গেছে। বাবাকে বললুম কিন্তু বাবা শুনলে না।"

বর্ণনা পার্টিশনের ওপারে উঁকি মেরে দেখলে ইন্‌জেকশনের ঘোরে সত্যবতী মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে। তার মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করছে বনস্পতি, তার দুটি চক্ষুই বিস্ফারিত।

বর্ণনাকে দেখে বনস্পতি বললে, "ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার তো ঘুম হয় না, তাই আমিই বসলুম এসে।"

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বর্ণনা।

সাত

হেমন্তকুমার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ঠিক মেয়েদের খোঁজবার জন্যেই বেরোয়নি, সে যেন আর কিছু খুঁজছিল, কিন্তু সেটা যে কি তাও ঠিক করতে পারছিল না। জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকের ডাক্তার সামন্তর সঙ্গে তার যে আলাপ হয়েছিল সেইটেই মনে পড়ছিল বারবার। সেদিন যা ঘটেছিল তা সংক্ষেপে এই।

ডাক্তার সামন্ত খুব ভদ্র এবং বিনয়ী লোক। ডাক্তার চক্রবর্তীর চিঠি পেয়ে তিনি আরও ভদ্র, আরও বিনয়ী হয়ে পড়লেন। বললেন, "আপনার জন্য যথাসাধ্য আমি করব। আপনার ব্যাপারটা কি আগে শুনি।"

সব শুনে বললেন, "আমার মনে হয় আপনার স্ত্রীর পেটে যে সন্তানটি এখন আছে সেটি সম্ভবত নষ্ট হয়ে যাবে। সে যা হবার হোক, কিন্তু এরপর আপনাকে বার্থ-কণ্ট্রোল করতে হবে।"

"ওইটেতেই আমার ঘোর আপত্তি। আমি গরীব লোক, বংশবৃদ্ধি করলে নিজেই ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ব তাও বুঝতে পারছি, কিন্তু খোদার উপর খোদকারি করবার সাহস আমার নেই। খোদা বলতে আমি প্রকৃতি মিন্ করছি। আপনারাই তো বলেন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায়।"

"কোন কোন ক্ষেত্রে তা বলি বটে, কিন্তু মানব-সভ্যতার মূল কথাটা ভুলে যাবেন না। উপনিষদ পড়া আছে কি আপনার ?"

"কিছু কিছু পড়েছি—"

"বৃহদারণ্যকে আছে বুদ্ধিমান মানুষ শ্রেয়কে আশ্রয় করে থাকেন, যা মঙ্গলজনক তাই তিনি বরণ করেন। কি মঙ্গলজনক এইটেই মানুষের কাছে সব চেয়ে শক্ত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য বহু শতাব্দী পূর্বে মানুষ জ্ঞানের পথে যাত্রা করেছে, কিন্তু সে উত্তর পুরোপুরি মেলেনি, তার সন্ধানও শেষ হয়নি। একটা কথা কিন্তু ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে সভ্য মানুষ প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান, বিদ্রোহী হয়েই সে সভ্য হয়েছে। যে তপস্বী হিমালয়ের নির্জনতায় নিদারুণ ঠাণ্ডায় তপস্যা করছেন তিনিও প্রকৃতির নিয়ম মানেননি, আবার যিনি গগল্স্ পরে এরোপ্লেনে চড়ে ছ'মাসের পথ ছ'দিনে অতিক্রম করছেন তিনিও প্রকৃতির নিয়ম মানেননি। যে মানুষ কাঁচা মাংস আর শাক-সব্জিকে সুখাদ্য ব্যঞ্জনে পরিণত করেছে, উলঙ্গ শরীরকে নানারকম বেশ-বাসে ঢেকেছে, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, পঞ্চইন্দ্রিয়ের সমস্ত শক্তির সীমানা ক্রমাগত বাড়িয়েছে, ওষুধের পর ওষুধ বার করে যে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে অবিরাম, ভোগ-তৃষ্ণা কমিয়ে বাড়িয়ে নানারকম করে সে ক্রমাগত জানতে চাইছে—আমাদের শ্রেয় কিসে, যে মানুষ একদিন হারেম বানিয়েছিল, বহু বিবাহ করে অজস্র সন্তান সৃষ্টি করেছিল সেই মানুষই আজ নূতন সমস্যার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবীতে আর স্থান নেই, খাদ্য নেই। পৃথিবীর আয়তনের একটা সীমা আছে, উৎপাদন শক্তিরও একটা সীমা আছে, আমরাও যদি সন্তানের সংখ্যা সীমাবদ্ধ না করি তাহলে বিপদ অনিবার্য—"

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল হেমন্তকুমার।

"বাঃ, আপনার সার ডাক্তার না হয়ে অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল। চমৎকার বলবার ক্ষমতা আপনার। কিন্তু এ বিষয়ে আমারও একটু বক্তব্য আছে, শুনবেন কি ?"

"নিশ্চয় শুনব।"

"আপনি সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করছেন। আমি আমাদের মতো সামান্য লোকের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলছি। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের দিনমজুরী করে খেটে খেতে হয়, সেজন্য আমাদের মতো লোকের পক্ষে পরিবারে বড়

লোক বৃদ্ধি হবে ততই সুবিধে নয় কি ? প্রত্যেকেই আর্নিং মেম্বার হবে। সেদিন একটা মেথরকে জিগ্যেস করেছিলাম, সে বললে তাদের মাসিক রোজগার মাসে তিন শ' টাকা। সে নিজে, তার বউ, তার ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধূ সবাই রোজগার করে। এর আর একটা দিকও আছে। আমাদের গণতন্ত্র হয়েছে আজকাল, সুতরাং যারা সংখ্যায় বেশি, শাসন-ব্যাপারে তাদেরই আধিপত্য থাকবে। আপনারা যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে ভদ্রলোকদের সংখ্যা কমিয়ে দেন আর ওই অশিক্ষিত মুচি মেথররা যদি ক্রমাগত সংখ্যায় বেড়ে যায়, বাড়বেই, কারণ তারা আপনাদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপদেশ শুনবে না, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওদেরই রাজত্ব হবে, আমরা জীবন-যুদ্ধে হেরে যাব ওদের কাছে। সেটা কি ঠিক হবে ?"

ডাঃ সামন্ত হাসিমুখে কথাগুলি শুনলেন। তারপর বললেন, "দেখুন, যাঁরা সংখ্যায় বেশি তারাই যে সব সময়ে জয়ী হয় তা নয়। আমাদের দেশেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, তিনি বাবার এক ছেলে। সিংহের সন্তান-সংখ্যা খুব কম, কিন্তু সিংহই পশুরাজ। আমাদের কবিও বলে গেছেন, একশ্চন্দ্র তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি। যারা সংখ্যায় বেশি তারাই সব সময়ে জয়ী হয় না, তারাও শেষ পর্যন্ত গুণী শক্তিমানদের আধিপত্য মেনে নেয়। গুণী আর শক্তিমান হওয়াটাই আসল কথা। আর আপনি রোজগারের কথা যা বললেন তা আপাতদৃষ্টিতে চমৎকার মনে হতে পারে কিন্তু একটু তলিয়ে যদি দেখেন এর গলদ ধরা পড়বে। আপনার এতে খুব লাভ হবে না শেষ পর্যন্ত। পশু-পক্ষীদের সন্তান-সন্ততিরা একটু বড় হয়েই নিজেরা চরে খায়। কিন্তু তারা তাদের বাপ-মায়ের ভাই-বোনের কথা কি ভাবে কখনও ? তারা যেই সমর্থ হয় অমনি পর হয়ে যায়। যে সব মুচি মেথরদের কথা আপনি বললেন তাদের পারিবারিক জীবনের খবর নিয়েছেন কখনও ? যদি নেন, আপনার মত বদলে যাবে। ওদের ছেলে-মেয়েরা কেউ বাপ-মাকে মানে না, বুড়ো বাপ-মাকে বসিয়ে খেতে দেয় না কেউ, তারা যখন অসমর্থ হয় তখন ভিক্ষাবৃত্তিই তাদের একমাত্র গতি, ছেলে-মেয়ে কেউ ফিরেও চেয়ে দেখে না তাদের দিকে। আপনি কি এই রকম ছেলে-মেয়ে চান ? ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত, কর্তব্যপরায়ণ, শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তুলতে না পারলে তারা আপনার কোন কাজেই আসবে না। সাধারণত অশিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা যেই টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করে অমনি সে স্বাধীন হয়ে পড়ে, নিজের খুশিমতো স্বোপার্জিত টাকা খরচ করতে চায়, ছোট ভাই-বোনদেরও দায়িত্ব নিতে চায় না। আমি একজন তথাকথিত শিক্ষিত ছোকরাকে বলতে শুনেছি, ভাই-বোনদের দায়িত্ব নিতে আমি বাধ্য নই, বাবা তাদের জন্ম দিয়েছেন, বাবা তাদের মানুষ করবেন। ছোকরা স্কুলে কলেজে পড়েছে বটে, কবিতা-টবিতাও লেখে, কিন্তু শিক্ষিত হয়নি। ছেলে-মেয়েরা যদি পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, তাহলে তারা রোজগার করলেও বাবা-মার আর্থিক সুবিধা হয় না। তাদের শ্রদ্ধাশীল, কর্তব্যপরায়ণ করতে হলে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে, তাদের দেহের

স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য দুইই ভালো করতে হবে, তাহলেই তারা সুপুত্র সুকন্যা হবে। একপাল ছেলে-মেয়েকে এভাবে মানুষ করা সম্ভব কি? ভেবে দেখুন কথাটা।"

হেমন্তকুমার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "জন্মনিরোধ করতে হলে কি করতে হবে?"

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার সামন্ত।

"এই যে, আসুন না, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। পাশের ঘরটায় চলুন।"

ডাক্তার সামন্ত বই বার করে, ছবি এঁকে, নানারকম ছবি দেখিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

হেমন্ত মন দিয়ে শুনল সব, তারপর হেসে বলল, "দেখুন ডাক্তারবাবু, অনেকদিন আগে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল মেরুদণ্ড সোজা করে, পদ্মাসনে বসে, চোখ বুঁজে, দুই ভ্রূর মাঝখানে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করে যদি প্রাণায়াম করতে পারি, তাহলে কপালের মাঝখানে আলো দেখতে পাব, আসন ছেড়ে শূন্যে উঠতে পারব, ফলে যে আনন্দ পাব, তাই স্বর্গ-সুখ। আমি মেরুদণ্ডটা কোনক্রমে সোজা করেছিলাম, কিন্তু পদ্মাসনে বসতে পারলুম না, একটা পায়ের উপর আর একটা পা ওঠাতেই পারলুম না। অনেক কষ্টে একবার উঠিয়েছিলাম, কিন্তু ছিটকে বেরিয়ে গেল। তাই স্বর্গ-সুখ ভোগ করা আর হল না। জন্মনিরোধের যে সব বখেড়া দেখছি ওসব আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, এখন উঠি, দরকার হলে আবার আসব। কত দক্ষিণা দিতে হবে আপনাকে?"

"আমাকে কিছু দিতে হবে না।"

"না, সে হয় না, এতক্ষণ সময় নষ্ট করলুম আপনার, সামান্য কিছু নিতে হবে।"

গোটা পাঁচেক টাকা ডাক্তার সামন্তর হাতে গুঁজে দিয়ে চলে এসেছিল সেদিন হেমন্তকুমার।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি হেমন্তকুমার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাতাল লাঠির কথাগুলো তখনও তার কানে বাজছিল, "শ্লা, গেরুয়া মারিয়েছে—!"

ডাক্তার সামন্তর কথাগুলো তার মনে পড়ল, "আপনি কি এইরকম ছেলে-মেয়ে চান?"

আট

'সুখপুর-পত্রিকা' বন্ধ হয়নি।

বাচস্পতি-সীমন্তিনী যেন আরও বেশি নিষ্ঠাভরে সেটাকে আঁকড়ে ধরেছিল। সুদেষ্ণাকে গবেষণায় সাহায্য করবার জন্যে বাচস্পতিকে রোজ খানিকক্ষণ পড়াশোনা

করতে হত, বর্ণনা দরকার মতো তাকে বই এনে দিত ইউনিভার্সিটি থেকে, সীমন্তিনীও কাঁথা সেলাই করে কিছু রোজগার করতে আরম্ভ করেছিল—কিন্তু এসবের জন্যে 'সুখপুর-পত্রিকা'র কাজ বন্ধ হয়নি, তা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। খবর সংগ্রহের জন্য বাচস্পতিকে আর টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যেতে হত না, ওই গলিতে তার চোখের সামনেই যে সব ঘটনা ঘটত তাই লিপিবদ্ধ করে আনন্দ পেত সে। আর একটা জিনিসও হয়েছিল, কোলকাতায় এসে খবরের কাগজের সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামতও গড়ে উঠেছিল। কোলকাতায় প্রকাশিত 'সুখপুর-পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকেই সেটা বেশ বোঝা যায়। উদ্ধৃত করছি।

"সুখপুর-পত্রিকার আদর্শ। আমরা সুখপুর ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি বটে, কিন্তু সুখপুরের আদর্শ, সুখপুরের স্মৃতি আমাদের মনে অক্ষুণ্ণ আছে। আশা করি বরাবর থাকিবে। মহৎ মানবতার আদর্শ এবং স্মৃতিই সুখপুর-পত্রিকা সম্পাদনায় আমাদিগকে চালিত করিবে। ইতিপূর্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির সহিত আমাদের তেমন পরিচয় ছিল না। এখানে আসিয়া পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু সে পরিচয় লাভ করিয়া সুখী হই নাই, আতঙ্কিত হইয়াছি। এই পত্রিকাগুলির প্রথম পৃষ্ঠাতেই যে ভয়ঙ্কর খবরগুলি বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয় তাহা পড়িয়া মনে হয় না যে আমরা সভ্য মানব-জাতির সংবাদ পাঠ করিতেছি। বরং এই কথাই মনে হয়, আমরা সভ্য নহি, আমরা বর্বর, আমরা পশু। কিন্তু ইহা সত্য নহে, উচ্চ প্রেরণামূলক গৌরবজনক খবর অনেক আছে, কিন্তু সেগুলি ছাপা হয় না। এই অতি ঘৃণ্য দুঃসংবাদ-গুলি একত্রিত করিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করিয়া প্রদর্শন করার তাৎপর্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সংবাদগুলি সত্য হইলেও গৌরবজনক নহে, সেগুলি যদি ছাপিতেই হয় পিছনের দিকে ছোট অক্ষরে সসঙ্কোচে ছাপা উচিত। নক্কারজনক ডাস্টবিনকে কেহ বৈঠকখানার টেবিলের উপর স্থাপন করেন না। কিন্তু এই সংবাদপত্র-গুলি প্রতিদিন তাহাই করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাই মনে পড়ে। এ সকল সংবাদ পাঠ করিয়া কেহ যে বিশেষ উপকৃত হন তাহা মনে হয় না। কেহ উত্তেজিত হন, কেহ কেহ বা হয়তো একটা পাশবিক আনন্দ তির্যকভাবে উপভোগ করেন। কতকগুলি বেকার যুবক-যুবতী এসব খবর লইয়া চায়ের দোকানে বসিয়া গুলতানি করেন শুনিয়াছি। মনে হয় এসব খবর এমন বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করার পিছনে কোনও রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে। কোনও একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল বিপক্ষ দলকে অপ্রস্তুত বা নিষ্প্রভ করিবার জন্য এগুলি হয়তো ছাপে। এক দলের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করাই নাকি ইহাদের উদ্দেশ্য। হায়রে জনমত, কতটুকু তাহার পরমায়ু!

মানব-সভ্যতার গৌরবজনক খবরগুলি এসব পত্রিকায় কচিৎ ছাপা হয়, হইলেও

সেগুলিকে মোটেই প্রাধান্য দেওয়া হয় না, যদি না সেগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকে। সাধারণত দেখি বীরত্ব, মহত্ত্ব, প্রতিভা, পৌরুষের খবরগুলিকে পাশবিক খবরগুলির অনুবর্তী বা পদপ্রান্তলীন করিয়া ছাপা হয়। মানবজাতির অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এ-কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, এ মনোভাব অত্যন্ত হীন অবাঞ্ছনীয় পশুর মনোভাব। 'সুখপুর-পত্রিকা' যদিও ক্ষুদ্র তবু মানবতার আদর্শকেই সে প্রাধান্য দিবে। অদ্যকার খবরের কাগজগুলিতে বহু ভয়াবহ পাশবিক খবর ছাপা হইয়াছে, কিন্তু আমরা নিম্নলিখিত খবরটিকেই প্রাধান্য দিলাম। নাশের, ক্রুশ্চেভ, চু-এন্-লাইয়ের খবর, আমাদের বিবেচনায়, ইহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই একটি দরিদ্র পরিবার বাস করে। তাহাদের একমাত্র কন্যা মিণ্টুর কালাজ্বর হইয়াছে। মিণ্টুর বাবা বলিতেছিলেন অর্থাভাবে মেয়েটির চিকিৎসা হইতেছে না। দাতব্য চিকিৎসাগুলিতেও পয়সা খরচ না করিলে সুচিকিৎসা হয় না। মেয়ের রোগের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি কথায় কথায় বলিলেন যে মিণ্টুর খাদ্যদ্রব্যে নাকি খুব লোভ, উহা নাকি কালাজ্বর ব্যাধির একটি লক্ষণ। কিন্তু সকালে জলখাবার হিসাবে মাত্র দুইখানি বিস্কুটের বেশি তিনি তাহাকে দিতে পারেন না, দিতে ভয়ও হয়, পয়সাও নাই। গতকল্য কিন্তু একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলাম। আমাদের গলিতে মিণ্টুদের বাড়ির সম্মুখে একটি ছিন্নবসনা ভিখারিণী তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল, আমাকে দয়া করিয়া কিছু খাইতে দাও, ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে পারি না। কেহই তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতেছিল না। সহসা দেখিলাম কঙ্কালসার লোভী মিণ্টু তাহার রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিল এবং তাহার বরাদ্দ দুইখানি বিস্কুটের একখানি ওই ক্ষুধার্ত ভিখারিণীটিকে দান করিল। আমাদের বিবেচনায় এই খবরটিই অদ্য আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে সর্বাগ্রে বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। চিত্রতারকাদের ছবির পরিবর্তে মিণ্টুর ছবিই সর্বাগ্রে বড করিয়া ছাপা উচিত। কারণ ওই মিণ্টুরাই মানব-সভ্যতার ধারক এবং বাহক। উহার আচরণ দেখিয়া বহুকাল পরে প্রাতঃস্মরণীয় রাজা শিবিকে মনে পড়িল। কৃতার্থ হইয়া গেলাম।"

এই ধরনের খবরই 'সুখপুর পত্রিকা'য় প্রকাশিত হত। রিক্‌শাওলার কর্তব্যবোধ, দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালাদের অসাধুতা, গাভীর প্রতি অকথ্য নিষ্ঠুরতা এবং তার কারণ, শহরের কলতলা ও পল্লীর পুকুর-ঘাটের তুলনামূলক আলোচনা, রাস্তায় ঘাটে বাঙালীদের তুলনায় অবাঙালীদের ভিড়, অবাঙালীদের পোশাক-পরিচ্ছদ নকল করার দিকে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের প্রবণতা, ধারের ভারে পাড়ার মুদিটির ব্যবসায়-নৌকাটি কেন ডুবু-ডুবু, পথের ধারে যে মুচিটি বসে' জুতো সেলাই করে আধুনিক জুতো সম্বন্ধে তার অভিমত, জনৈক গরীব বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে অভিজাতবংশীয় একটি অ্যালশেসিআন কুকুর-ছানার দুর্দশা,—সুখপুর-পত্রিকার ফাইল ঘাঁটলে এরকম অনেক কৌতুকজনক সংবাদ এবং সে সম্বন্ধে বাচস্পতির সরস মন্তব্য পাওয়া যাবে।

পারিবারিক খবরও থাকত কিছু কিছু। এই কাহিনীর যোগসূত্র হিসাবে নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করছি।

"শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমারের বর্তমান জীবন-দর্শন। আমাদের নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমারের জীবনে উল্লেখযোগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে। এই বিপর্যয়ের হেতু নির্ণয় করা সহজ নহে, কিন্তু যদি কেহ ইহাকে কেবলমাত্র অর্থ-সঙ্কটের সহিতই যুক্ত করেন, আমাদের মতে হেতুর স্বরূপটি তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইবে না। অর্থ-সঙ্কটকে আপাত-কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের মতে প্রকৃত কারণ নিহিত আছে স্বভাবে, সংস্কারে এবং জীবন-দর্শনে। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাউক, গোমাংস-ভক্ষণ ব্যতীত ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই, এমত অবস্থায় পতিত হইলে সকলেই কি গোমাংস-ভক্ষণ করিবে? আমাদের মনে হয় সকলে করিবে না, যুক্তিযুক্ত হইলেও করিবে না, অনেকে গোমাংস-ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু-বরণই শ্রেয় মনে করিবে। মানুষের স্বভাব, সংস্কার এবং জীবন-দর্শনই তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাহার আচরণের অনুকূল যুক্তিও সে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় এবং তজ্জন্য যে কোনও কৃচ্ছ্র সাধন করিতেও সে প্রস্তুত থাকে। জীবনরক্ষার জন্য গোমাংস-ভক্ষণ করাও অনুচিত নহে ইহাই যদি কাহারও জীবন-নীতি হয় তাহা হইলে গোমাংস-ভক্ষণ-জনিত সামাজিক ও দৈহিক অসুবিধাগুলিও সহ্য করিবার জন্য তাহার প্রস্তুত থাকা উচিত। হেমন্তকুমার যতদিন স্বচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন ততদিন তাঁর স্বভাবের বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সহিত জীবন-নীতির কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু অর্থোপার্জন করিতে হইবে – এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি গৈরিক বেশ পরিধান করতঃ জ্যোতিষাচার্যের ভূমিকায় অবতরণ করিয়াছিলেন, ছেলেমেয়েদেরও ইতরজনোচিত কর্মে নিয়োগ করিতে ইতস্তত করেন নাই। যাঁহারা মনে করেন কর্মজগতে জাতিভেদ নাই, যে কোনও কর্মই ভালো কর্ম, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি। কর্মের প্রভাব চরিত্রের উপর পড়িবেই, যদি না সে চরিত্র পদ্মপত্রবৎ নির্বিকার হয়। হেমন্তকুমারের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহই এরূপ চরিত্রবান বা চরিত্রবতী নহে। ফলে কুসঙ্গে মিশিয়া তাহারা বিপথে গিয়াছে। বড মেয়ে বন্দুক এবং বড় ছেলে লাঠি এখন আয়ত্তের বাহিরে। দ্বিতীয় পুত্র সোঁটা, তিনটি কন্যা কিরিচ, ছোরা, কাটারি এবং সপ্তম পুত্র বল্লমও যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যথেচ্ছ রোজগার, যথেচ্ছ খরচও করে। হেমন্তকুমারের স্ত্রী সত্যবতী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে। সে আসন্নপ্রসবা ছিল, কয়েকদিন পূর্বে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া তাহার অবস্থা যাহা হইয়াছিল তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। মহামতি ডাক্তার হরিভূষণ সামন্ত মহাশয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পাগলামি বাড়িয়াছে। সে ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে, আমার ছেলে-মেয়েদের ফিরাইয়া দাও। চিকিৎসায় পাগলামির কোন উপশম হইতেছে না। হেমন্তকুমার নিজেই এবার চিকিৎসার ভার লইয়াছেন। তিনি পুনরায় পার্টিশন করাইয়াছেন। তাঁহার মতে স্ত্রীর সহিত পূর্ববৎ

একত্র শয়ন করিলে তাহার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। ডাক্তার সামন্ত তাহা মনে করেন না। তিনি বলিতেছেন একত্রে শয়ন করিবার পূর্বে জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা করা উচিত। ডাক্তার চক্রবর্তী পরামর্শ দিয়াছেন শ্রীমতী সত্যবতীকে আপাতত কোনও পাগলা-গারদে স্থানান্তরিত করা হউক। বর্ণনা এ বিষয়ে খোঁজ করিয়াছে, কিন্তু পাগলা-গারদেও স্থানাভাব। হেমন্তকুমারের বাকী সন্তান কয়টি—কোদাল, কুড়ুল, সড়কি আর খন্তা আমাদের নিকট আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আমরা তাহাদের যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু মনে হয় তাহাদের সুখী করিতে পারি নাই। তাহারা হাসে না, কথা বলে না, অকারণে কোন একটা ছুতা করিয়া কান্নাকাটি করে। মনে হয় হেমন্তকুমারও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জীবন-দর্শনের সহিত তাঁহার আচরণের মিল হয় নাই। তিনি যে পথে চলিতে চাহিয়াছিলেন সে পথের বিপদের কথা তাঁহার জানা ছিল না, সেজন্য তিনি প্রস্তুতও ছিলেন না। তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ আর্তনাদ করিতেছে, কিন্তু তিনি জেদী লোক, বাহিরে নিজের জেদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অতিশয় মর্মন্তুদ ব্যাপার। গত রাত্রে তাঁহার স্ত্রীর চীৎকার শুনিয়া বুঝিলাম সকলের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া হঠকারীর মতো আচরণ করিবার শৌর্যও তাঁহার আছে। তাঁহার স্ত্রী চীৎকার করিতেছিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, তুমি দূর হইয়া যাও, দূর হইয়া যাও।

হেমন্তকুমারের মতো আমরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি।"

নয়

বর্ণনাই সবচেয়ে বেশি বিব্রত হয়েছিল হেমন্তকুমারের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে। কারণ তা ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছিল এবং বর্ণনাকেই চেষ্টা করতে হচ্ছিল সে জট ছাড়াবার। বন্দুক বাড়িতে আসা বন্ধ করেছিল। কিরিচের মুখে শোনা গেল সে এক বড়লোকের বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যেই বাহাল হয়েছে। ভাল মাইনে দিচ্ছে তারা। মাসে পঁচিশ টাকা, তাছাড়া খাওয়া পরা। কিরিচের হাতে সে কিছু টাকা পাঠিয়েছিল হেমন্তকুমারকে। কিরিচও প্রায়ই বাড়িতে থাকত না। সে যেখানে কাজ করত তারাও খাওয়া পরা দিত, কিন্তু সেখান থেকে ফিরতে অনেক রাত হত তার। সে-বাড়ির কর্তা নাকি আপিস থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে গিন্নীকে নিয়ে রোজ সেকেণ্ড শো'তে সিনেমা যান। কিরিচ তাদের ছেলে-মেয়েদের পাহারা দেয়। ছোরা আর কাটারিও ঠিকে-ঝি-গিরিতেই বাহাল হয়েছিল, তারাই সত্যবতীর কিছু সেবা করত বটে, কিন্তু আর্থিক সাহায্য তেমন করত না, বিলাসী হয়ে পড়েছিল। লাঠি মিষ্টান্ন ফেরি করা ছেড়ে দিয়ে বাহাল হয়েছিল একটা মোটরের ওআর্কশপে। রাতদুপুরে কালি-ঝুলি মেখে বাড়ি ফিরত ঈষৎ মত্ত অবস্থায়। পয়সা-কড়ি যা রোজগার করত তা মদেই যেত।

হেমন্তকুমার পারতপক্ষে তার সম্মুখীন হবার চেষ্টা করতেন না। সোঁটাও কবিরাজি দোকানের চাকরি ছেড়ে ঢুকেছিল একটা সাইকেল তৈরির কারখানায়। সেখানে ভালো মাইনেই পাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমশ তার ধারণা হল তার মাইনে আরও ভালো হওয়া উচিত। মালিকরা বেশি মুনাফাখোর বলে মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছে না। চাপ দিলে দিতে বাধ্য হবে। তারই নেতৃত্বে স্ট্রাইক হল একদিন। তারপর ক্রমশ মারামারি, পুলিশ, কাঁদুনে গ্যাস এবং জেল। সোঁটা জেলে আছে। বর্ণনা অনেক চেষ্টা করেও তাকে জামিনে খালাস করতে পারেনি। সত্যবতীর পাগলামি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এর ঝক্কিও বর্ণনাকেই পোয়াতে হচ্ছিল। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, পাগলা গারদে সীটের জন্য ঘোরাঘুরি করা সব সে-ই করছিল। হেমন্তকুমার রোজগারের চেষ্টায় সমস্ত দিন পার্কে পার্কে ফুটপাথে ঘুরে বেড়াত। নবনী রায়ের মতো শাঁসালো মক্কেল তার আর জোটেনি। সমস্ত দিন ঘুরে হাত দেখে আর মাদুলী বেচে কোনদিন এক টাকা, কোনদিন দেড় টাকা, কোনদিন দু'টাকার বেশি সে পেত না প্রায়। যা পেত তা বর্ণনার হাতেই এনে দিত। বাচস্পতিকে দিতে গিয়েছিল, সে নিতে চায়নি। বনস্পতিও চায়নি।

বনস্পতি আর সরস্বতী দুজনে ছবির জগতেই বাস করছিল। বর্ণনা বনস্পতিকে বিজ্ঞাপনের যে ছবি আঁকবার ফরমাশ দিয়েছিল, তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিল তারা। তিনটে ছবিই আঁকা হয়েছিল, এবং তিনটে ছবিই সরস্বতীর এত ভাল লেগেছিল যে তাইতেই চরিতার্থ হয়ে গিয়েছিল বনস্পতি। সে ছবির দাম পাওয়া যাবে কি যাবে না সেদিকে খেয়াল ছিল না। জুতোর কালির বিজ্ঞাপনটি সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। কয়েকরকম জুতো, জুতোর কালির কৌটো, শিশি আর বুরুশ এমনভাবে সাজিয়ে ছবিখানি এঁকেছিল বনস্পতি যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় একসাজি ফুল বুঝি কেউ রেখে গেছে একজোড়া পায়ের কাছে। দেশলাই বাক্সের ছবিটা আরও পছন্দ হয়েছিল বর্ণনার। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির শিখার ভিতর আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে একটি সহাস্য মানুষের মুখ। সে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে আছে, যেন বলছে, তুমি চলে যাচ্ছ বটে, কিন্তু আমি অন্ধকারকে আলোকিত করব। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' ছবিটিই সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সরস্বতীর। আকাশে ঘন মেঘ, কদম্ব বনে শিহরণ জেগেছে কদমের ফুলে ফুলে, কদম্বের ডালে দোলনায় দুলছে একটি মেয়ে, সামনে ময়ূর নাচছে। বর্ণনার মনে হচ্ছিল বাবা যদি এইভাবে আঁকতে পারেন তাহলে সত্যিই তাদের আর অর্থকষ্ট থাকবে না। মাসে তিন চার শ' টাকা অনায়াসেই রোজগার করতে পারবেন।···হঠাৎ তার মনে পড়ল মামার কাছে যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে সে দেখা করবে বলেছিল হস্টেলে। তিনদিন সে হেমন্তকুমারের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে কোথাও যেতে পারেনি, কলেজেও না, হস্টেলেও না, সুখময়বাবুর বাড়িতেও না। কথাটা মনে হওয়ামাত্র সে বেরিয়ে পড়ল। তার মনে হল হস্টেলে যাবার আগে সুখময়বাবুর বাড়িতে গিয়ে ছবিগুলো নেবার ব্যবস্থা করা আগে দরকার। অন্তত এ

কথাটা তাঁকে জানানো দরকার যে সে অন্যত্র ছবি-বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। হয় সে নিজে এসে ছবিগুলো নিয়ে যাবে, না হয় তার চিঠি নিয়ে কোন লোক আসবে নিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলো যদি পেয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই। চাকরিতে ইস্তফা দেবে কিনা তা সে তখনও ঠিক করতে পারেনি। সে ভেবে রেখেছিল সুখময়বাবু যদি তাঁর কাষ্ঠ-রসিকতাটির জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চান, আর ভবিষ্যতে কখনও এরকম অশোভন ব্যবহার করবেন না প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে সে হট্ করে চাকরিটা ছাড়বে না। এ সিদ্ধান্তে সে উপনীত হয়েছিল অনেক ভেবেচিন্তে, এর জন্যে মনে মনে তার কুণ্ঠারও অন্ত ছিল না, এমন কি আত্মধিক্কারও হচ্ছিল মাঝে মাঝে। কিন্তু কি করবে। নিদারুণ কোলকাতা শহরে টাকা ছাড়া এক পা চলবার উপায় নেই। সুখময়বাবু যে হাজার টাকার চেকটা দিয়েছিলেন সেটা ভাঙাতে হয়েছে সোঁটাকে জেল থেকে বাঁচানোর জন্য। সোঁটা বাঁচল না, কিন্তু টাকাটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। মামীমার ছোট ছেলেমেয়ে-গুলোরও ভার নিতে হয়েছে, মামীমার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের ফী লাগছে না বটে, কিন্তু ওষুধ কিনতেই জিভ বেরিয়ে পড়ছে। হেমন্তকুমার, লাঠি, সোঁটা মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেয়, কিন্তু তাতে কুলোয় না। ছোরা আর কাটারি যা রোজগার করে তার সবটাই প্রায় খরচ করে নিজেদের স্নো পাউডার সাবান শাড়ি ব্লাউজ কিনে, বলে নোংরা হয়ে থাকাটা তাদের মনিবরা পছন্দ করে না। কাটারি ধার করে শাড়ি কিনেছে সেদিন। বাবার ছবিগুলো বিক্রি হয়ে গেলে কিছু টাকা পাওয়ার আশা আছে। ওই ভদ্রলোক যদি বিক্রি করে দিতে পারেন খুব ভালো হয়। কিন্তু তিনি যদি না পারেন? সুখময়বাবু দু'খানা ছবি কিনতে চেয়েছিলেন সে দু'খানা তাঁকে দিলে ক্ষতি কি। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভূষণ কাকার কথা মনে পড়ল তার। তিনি থাকলে কি ছবি বিক্রি করতে দিতেন?

সুখময়বাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। সেদিন সুখময়বাবুর চোখের দৃষ্টিতে সে যা প্রত্যক্ষ করেছিল তার দ্বিতীয় কোনও অর্থ তো হয় না। একা ও-বাড়িতে ঢোকাটা কি সমীচীন? কিন্তু ঢুকতেই হবে, উপায় কি।

কড়া নাড়তেই সুখন চাকর এসে কপাট খুলে দিলে।

"বাবু বাড়ি নেই।"

নিশ্চিন্ত হল বর্ণনা।

"মাইজি?"

"মাইজি আছেন।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা করব একটু খবর দাও।"

একটু পরেই সুখন এসে নিয়ে গেল তাকে। উপরে উঠে বর্ণনা দেখলে একটি রূপসী মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছেন অঞ্জনা দেবী।

"ও, আপনি এসেছেন? আসুন, আসুন।"

বর্ণনা আসাতে দ্বিতীয় মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।

"আমি তাহলে এখন উঠি। কাল থেকে আসব তো?"

"আমি খবর পাঠাব।"

নমস্কার করে এবং বর্ণনার দিকে অপাঙ্গে একটি দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

"একেবারে ডুব মেরেছিলেন কেন বলুন তো? কোনও খবরও তো দেননি। উনি শেষে এই মেয়েটিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এ-ও বেশ ভাল শেখায়, ওঁর আপিসের স্টেনো—"

বর্ণনা নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল নির্নিমেষে।

মুচকি হেসে অঞ্জনা দেবী বললেন, "কিন্তু আপনাকেই ওঁর বেশি পছন্দ।"

হঠাৎ বর্ণনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সব খুলে বলবেন দয়া করে?"

"কি বলব বলুন।"

"সত্যিই কি আপনাকে গান-বাজনা শেখাতে হবে, না এটা একটা ফাঁদ।"

মুখে কাপড় ঢেকে হাসতে লাগলেন অঞ্জনা দেবী মাথাটা ঘুরিয়ে। তাঁর দোলানো বেণীটা দেখে পুরাতন উপমাটা মনে পড়ে গেল বর্ণনার, ঠিক যেন সাপ!

বর্ণনা আবার বললে, "সত্যি কথাটা বলুন আমাকে খুলে।"

মুখে কাপড় ঢেকে অঞ্জনা বললেন, "বুঝতেই পারছেন তো!"

আবার ঘাড় হেঁট করে হাসতে লাগলেন। তাঁর স্থূল মেদবহুল দেহটা হাসির বেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

"সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না, আপনি স্ত্রী হয়ে কি করে এসব সহ্য করছেন।"

"আমি ওঁর স্ত্রী নই, রক্ষিতা"—মৃদুকণ্ঠে বলে ঘাড় হেঁট করে রইলেন অঞ্জনা।

বর্ণনা এর পর কি যে বলবে তা ভেবে পেল না।

অঞ্জনা দেবীই আবার কথা কইলেন।

"আমার বয়স হয়েছে তো, আমি এবার রিটায়ার করব। চাকরি করলেই রিটায়ার করতে হয়। আমায় জায়গায় তাই নতুন লোক খোঁজা হচ্ছে।"

বজ্রাহতবৎ বসে রইল বর্ণনা। অঞ্জনা দেবীও তার দিকে পিছু ফিরে ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন।

"রিটায়ার করে কোথা যাবেন আপনি?"

মিনিটখানেক পরে জিজ্ঞাসা করল বর্ণনা। সহসা কৌতূহলী হয়ে উঠল সে।

"বাবা বিশ্বনাথের চরণে। আমাদের মতো অভাগিনীর তিনিই তো একমাত্র আশ্রয়।"

"সেখানে থাকবেন কোথা?"

"সেখানে আমাকে বাড়ি করে দিয়েছেন। যথেষ্ট টাকাও দিয়েছেন, সেদিক দিয়ে কোনও অসুবিধা হবে না।"

অঞ্জনা দেবী ঘাড় ফিরিয়েই কথা বলছিলেন, ক্রমশ তাঁর ঘাডটা যেন আরও নীচু হয়ে গেল। বর্ণনার মনে হল কাঁদছে!

হঠাৎ তার মনে পড়ল বান্ধবী আকাশ-পরীকে। যেমন সুন্দরী, তেমনি ডানপিটে, গানে বাজনায় অভিনয়ে কবিতা লেখায় চৌকোশ একেবারে। তার মতো মেয়ের পাল্লায় পড়লে জব্দ হয়ে যেত শয়তানটা। নিতান্ত ভালো মানুষ অঞ্জনার জন্য কষ্ট হতে লাগল তার।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বর্ণনা বলল, "আমি চললুম। আর আসব না। ওঁর কাছে যে পাঁচখানা ছবি দিয়েছিলাম, সেগুলো কোথা?"

"ওপরের ঘরে আছে।"

"ওগুলো আমি নিয়ে যেতে চাই।"

"আর একদিন এসে নিয়ে যাবেন। উনি তো এখন নেই—"

"না, আমি আর আসব না। এখুনি নিয়ে যাচ্ছি, ওঁকে বলে দেবেন।" তরতর করে উপরের ঘরে উঠে গেল সে। গিয়ে দেখলে দেওয়ালে একখানি ছবিও নেই। বড় বড় আলমারি রয়েছে কয়েকটা। একটা আলমারির কপাট টানতেই খুলে গেল। ভিতরে দেখল ছবি রয়েছে অনেকগুলো, কিন্তু সেগুলো দেখেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল তার, তার বাবার ছবি নয়, কতকগুলো অশ্লীল বীভৎস ছবি। দড়াম করে আলমারির কপাটটা বন্ধ করে আবার নেমে এলো সে।

"আমি লোক পাঠিয়ে দেব, তার হাতে দিয়ে দেবেন ছবিগুলো।"

দ্রুতপদে নেমে গেল সে।

হস্টেলে পৌঁছেই তার দেখা হয়ে গেল আকাশ-পরীর সঙ্গে। আকাশ-পরীর নামটিও যেমন অপরূপ, চেহারাটিও তেমনি। চোখের কালো তারায় আছে একটু নীলের আমেজ, কালো চুলে সোনার, গায়ের বাদামী রঙও দুধে-আলতার। ওর ভারতীয় রূপের অন্তরালে লুকিয়ে আছে ইয়োরোপীয় শ্রী। চোখ দুটি খুশির আলোয় ঝলমল। মাথার চুল বব্ করা, নাইনলের নীল শাড়ি লুটিয়ে পড়েছে স্যাণ্ডালের লাল-মখমলের উপর। স্যাণ্ডালের স্ট্র্যাপের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কিউটেক্স-রঞ্জিত পায়ের নখগুলি। হাতের নখেও কিউটেক্স। বর্ণনা উপর্যুপরি তিনদিন না আসাতে উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল সে। বর্ণনাকে দেখতে পেয়েই টেনে নিয়ে গেল সে আড়ালে, নিজের ঘরে। গিয়েই ঘরে খিল বন্ধ করে বর্ণনার থুত্‌নিতে হাত দিয়ে গান ধরে দিলে মুচকি হেসে—

"কহ কহ লো বারতা কি
তিনটি দিবস ব'য়ে যে গেল

দেখাবে না উদারতা কি
বঁধুয়ার জুতো ক্ষয়ে যে গেল।"

মুখে মুখে কবিতা তৈরি করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আকাশ-পরীর।

"ছাড়।"

"তুই মাদ্রাজীর প্রেমে পড়লি শেষকালে!"

"মাদ্রাজী ? মানে!"

"মানে তুমিই জানো। কুচকুচে কালো লম্বা সাহেবি-স্যুট-পরা একটি মাদ্রাজী রোজ বিকেলে এসে ধন্না দিচ্ছে তোমার জন্যে। তিনদিন এসেছে, আজও আসবে হয়তো।"

"মাদ্রাজী ?"

"হ্যাঁ গো, মিস্টার শ্রীনাথন।"

"ও, বুঝেছি। ফোটোগ্রাফার। আমি আশা করেছিলাম বাঙালী ভদ্রলোকটিই আসবেন বোধহয়।"

"হয়তো মাদ্রাজীর ছদ্মবেশে তিনিই আসছেন, কিছু বলা যায় না"—বলেই আবার গান ধরলে সে—

"প্রেমের কতই লীলা কত কারসাজি গো
বাঙালী বঁধুয়া এল সাজি' মাদরাজি গো।"

"চুপ কর। আমি এদিকে মহা মুশকিলে পড়েছি। তুই যদি আমাকে উদ্ধার করতে পারিস।"

"করিব করিব সখি নিশ্চয় করিব
শাহারায় তোর লাগি মদ্গুর ধরিব।"

"সব শোন আগে। বস ভাল করে।"

সুখময়ের সমস্ত কাহিনীটি আদ্যোপান্ত বললে তাকে।

"এখন ওর কাছ থেকে ছবিগুলি উদ্ধার করি কি করে বল্ তো ?"

"অনায়াসে পারি। কিন্তু আমি যা করতে চাচ্ছি তা করবার আগে হবু প্রাণনাথটির সঙ্গে ষড় করতে হবে। সে যদি রাজী হয় তাহলে অনায়াসে কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।"

"তিনি তো মীরাটে—"

"এখানে এসেছে পরশু। তোর সঙ্গে আলাপ করবে বলে এসেছিল কাল। কিন্তু তুই এলি না, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেল।"

"কোথা আছেন।"

"গ্র্যাণ্ডে।"

"ফোন কর। যদি থাকে, এখ্খুনি গিয়ে আলাপ করে আসি। তিনি তো একাই এক শ'।"

"শুধু এক শ' ? এক শ' ইন্‌টু এক শ' ইন্‌টু এক শ' ইন্‌টু এক শ' যতক্ষণ দম থাকে ততক্ষণ ইন্‌টু এক শ' প্লাস এক্‌স্। এক্‌সের যত ইচ্ছে ভ্যালু বসাতে পার।"

দুয়ারে টোকা পড়ল।

কপাট খুলে দেখা গেল হস্টেলের বালক ভৃত্যটি একটি কার্ড এনেছে।

"সেই ভদ্রলোক আজও এসেছেন। বর্ণনা দিদির সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

আকাশ-পরী মুচকি হেসে বললে, "সেই তিনি, যাও দেখা করে এস। আমি ততক্ষণ ফোন করি।"

বর্ণনা কমনরুমে ঢুকতেই দাঁড়িয়ে উঠলেন শ্রীনাথন।

"মিস্ বর্ণনা মিত্র ?"

"হ্যাঁ।"

"মিস্টার রায় আপনাকে এই চিঠিটি দিয়েছেন।"

একটি বড় চৌকো সাদা খামের ভিতর থেকে ছোট্ট চিঠি বেরুল একটি।

সুচরিতাসু,

নিজে যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত। বন্ধু শ্রীনাথন নিজেই যাচ্ছে। ছবির বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইবেন। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আপনি ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। দরকার হলে ওর দোকানেই আমাকে খবর দেবেন, তখন দেখা করব। আশা করি ওই সব করে দিতে পারবে। নমস্কার। ইতি—

ভবদীয়
নবনী রায়

শ্রীনাথনের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথাবার্তা হচ্ছিল।

শ্রীনাথন বললেন, "আমি তিন দিন ঘুরে গেছি। মিস্টার রায় বলে দিয়েছিলেন, যতদিন না আপনার সঙ্গে দেখা হয় ততদিন যেন রোজ আসি। আমি তাঁর আদেশ পালন করেছি। আপনার বাবার আঁকা ছবি আমি আমার শো-কেসে ভালভাবে ডিস্‌প্লে করব। ছবিগুলির দাম কি রকম হবে তা কি ছবির সঙ্গে লেখা থাকবে ?"

"একটা ছবি হাজার টাকায় বিক্রি করেছিলাম। সব ছবি হয়তো অত টাকায় বিক্রি হবে না। দাম আপনি যেমন ভাল বুঝবেন তেমনি রাখবেন।"

"ছবিগুলো কি এখানে আছে ?"

"না। সে আমি আপনার দোকানে পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনাকে এত কষ্ট দিলাম, সে জন্য দুঃখিত।"

"না না না, ও কিছু নয়। আমার কোন কষ্ট হয়নি। আপনার সেবায় লাগতে পেরেছি বলে আমি সো গ্ল্যাড।"

ইত্যাকার বিনয় বাচন করে শ্রীনাথন চলে গেলেন।

বর্ণনা আকাশ-পরীর ঘরে চলে গেল। একটু পরেই আকাশ-পরী ফিরে এসে গান ধরে দিলে।

"ফ্যান-সমীরে ত্রিতল-কুটীরে গ্র্যাণ্ডে বসতি বনমালী
স্যুট্-বুট্-মণ্ডিত সে প্রণয়-মণ্ডিত সমর্থ ভুজ যুগ শালী।
ঝন-ঝন-ফোন-যোগে ভেজিল নিমন্ত্রণ—আও লো সখীরে লয়ে আও
চৈনিক তৈজসে অধর পরশ করি চাহা-পানি পান করি যা-ও।"

তারপর সুর বদলে—

"শোন গো মিনতি শোন
আমার নিধিটি আঁচলে বাঁধিয়া
চলিয়া এস না যেন।
সখি, আমারও দিকটা দেখিও খানিক,
ওই যে আমার সব সম্বল
সাতসাগরের একটি মাণিক।"

বর্ণনা তাকে ছোট্ট একটি চাপড় মেরে বললে, "কি পাগলামি করছিস। চল্ বেরিয়ে পড়ি।"

…একটু পরে দুজনে বেরিয়ে পড়ল হোটেলের উদ্দেশে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে মেজর মুখার্জী উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা জানালেন বর্ণনাকে।

"আকাশের কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনাকে দেখবার জন্যে আপনাদের হস্টেলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, দেখা হয়নি। আপনি যে দয়া করে এসেছেন এতে কি যে আনন্দ পেলাম তা আর কি বলব। আকাশ সাধারণত সব কথাই বাড়িয়ে বলে, কিন্তু আপনার বেলায় দেখছি কমিয়েই বলেছে।"

আকাশ-পরী বর্ণনার দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে বললে, "শুনলি তো। তোকে বলিনি? দেখা হলেই খোশামোদ আরম্ভ করবে। কী যে হ্যাংলা লোকটা—"

মেজর মুখার্জী দরাজ গলায় হেসে বললেন, "খোশামোদ করাই তো আমাদের পেশা। এক বুল-ডগ্‌মুখো সাহেবের খোশামোদ করছি, এমন সুন্দর মুখের করব না? আর সম্বন্ধটা কত মধুর, ভাবী পত্নীর প্রিয়তমা বান্ধবী—"

"কিন্তু উনি আর মধুর রসের চর্চা করতে ভরসা পাবেন কিনা সন্দেহ। একটি ষাঁড় ক্ষেপেছে, তুমি মাথা ঠিক রাখ। পারো তো ষাঁড়টাকে শিক্ষা দিয়ে দাও। সঙীন ব্যাপার। তুই গুছিয়ে বলতে পারবি, না আমিই বলব।"

"তুই বল্—"

চা এসে হাজির হল। চা খেতে খেতে সুখময়ের কাহিনী শুনতে লাগলেন তিনি আকাশ-পরীর কাছ থেকে। সব শুনে বর্ণনাকে বললেন, "ছবি আপনি কালই পেয়ে

যাবেন। আপনি শুধু সুখময়বাবুর নামে একটা চিঠি লিখে দিন আমাকে যে আমার পাঁচটি ছবি এই পত্রবাহককে দিয়ে দেবেন। আর কিছু করতে হবে না, আমি লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেব। কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছে নবনী রায় নামটা শুনে। যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন অক্সফোর্ডের এক নবনী রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, অদ্ভুত খেয়ালী ছেলে, আমাদের সকলের কানের মাপ নিয়ে কি একটা চার্ট না গ্রাফ করেছিল। এ কি সে-ই লোক?"

"আমি ঠিক জানি না। মাত্র একদিনের আলাপ, তা-ও হঠাৎ—"

মেজর মুখার্জী হেসে বললেন, "একদিনের আলাপেই ভদ্রলোক আপনার সম্বন্ধে এতটা ইন্‌টারেস্ট নিচ্ছেন! অবশ্য সেই নবনী যদি হয় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এই ধরনেরই খেয়ালী লোক সে-ও।"

আকাশ-পরী কবিতায় বললে—

"রূপের আগুনে পুড়িল লঙ্কা, জীবন্ত হল মৃত
ধ্বংস হইল ট্রয়
রূপের আগুনে নবনী গলিয়া হয়েছে গব্য ঘৃত
এতে কিবা বিস্ময়।"

"ব্রেভো"—ছাদ কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন মেজর মুখার্জী।

"আপনি আমাকে চিঠিটা তাহলে লিখে দিন। আমি লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি—"

দশ

হেমন্তকুমার ক্রমশ দমে যাচ্ছিল, বিশেষ কিছু রোজগার করতে পারছিল না সে। এক পার্ক থেকে আর এক পার্কে গিয়ে, ফুটপাথের পর ফুটপাথ বদলে কোনই ফল হচ্ছিল না। রোদে ঠায় বসে থাকাও কষ্টকর হয়ে উঠছিল ক্রমশ। বাধ্য হয়ে বড় দেখে ছাতা কিনেছিল একটা, আর সেটা যাতে পিছন দিকে আপনা-আপনি খাড়া থাকে, তার ব্যবস্থাও করেছিল। গেরুয়া-কাপড় দিয়ে মুড়েও ছিল সেটাকে, বেশ একটা দৃশ্য হয়েছিল, কিন্তু ফল হচ্ছিল না। তার সবচেয়ে বিপদ হয়েছিল সময় নিয়ে। চুপচাপ বসে বসে সময় যেন কাটতেই চায় না। সামনে দিয়ে অবিরাম জনস্রোত বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে কেউ তার সামনে থামলে উৎসুক দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখে তার দিকে, কিন্তু সে আবার চলে যায়। দু'একজন কটু মন্তব্যও করে, ব্যঙ্গও করে কেউ কেউ। "গায়ের চামড়া আর গোঁফ দাড়িও গেরুয়া করে ফেল চাঁদ"—কে একজন বলেছিল। এসব সত্ত্বেও মুখ বুঁজে বসে থাকতে হয়। সামনের ফুটপাথে পুরাতন-পুস্তকের একটি দোকান ছিল। সেই দোকানী একদিন এসে হাত দেখিয়ে মাদুলী নিয়ে আট আনা পয়সা দিতে

গিয়েছিল, হেমন্ত নেয়নি। বলেছিল, তুমি বরং মাঝে মাঝে আমাকে বই পড়তে দিও। বই পড়ে সময় কাটত কিছুটা। নানারকম ডিটেকৃটিভ উপন্যাস আর প্রেমের গল্প। মন্দ লাগত না নেহাত। হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের বই হাতে এসে গেল তার। বইওলাই দিলে তাকে।

"ঠাকুরমশাই, এই বইটা পড়ুন, হয়তো আপনার কাজে লাগবে। ওটা আপনি রাখতেও পারেন। সের দরে কিনেছিলাম।"

হেমন্ত উল্টে দেখলে বইয়ের নাম 'তন্ত্রসার'। সামনে পিছনে পাতা নেই। দশমহা-বিদ্যার ছবি রয়েছে। পড়তে শুরু করে দিলে। ক্রমশ তন্ত্রসার উর্বর করে তুলল তার মস্তিষ্ককে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল, তার ছাতার উপরে, ঠিক মাঝখানে একটি চৌকোনা পিস্‌বোর্ড আটকানো রয়েছে আর তাতে বড বড় লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে —বশীকরণ, উচাটন। এর পর থেকে সামনে দিয়ে যে জনস্রোত রোজ বইত তার গতি যেন একটু মন্থর হল, মাঝে মাঝে দু'একজন দাঁড়াতেও লাগল। অবশেষে এক বাবরিওলা ছোকরা একদিন বসে পড়ল তার সামনে।

"আচ্ছা ঠাকুরমশাই, বশীকরণ, উচাটন এসব কি সত্যি হয়?"

তার বিকশিত হলদে দাঁতগুলোর দিকে চেয়ে খুব চটে গেল হেমন্তকুমার মনে মনে। উপর্যুপরি কয়েকদিন কোন রোজগার না হওয়াতে তিরিক্ষে হয়ে পড়েছিল সে।

"হয় বইকি। তবে গোড়াতেই একটা কথা শুনে রাখ বাপু। এসব বিষয়ে পরামর্শ নিতে গেলে গোড়াতেই দুটি টাকা প্রণামী দিতে হয়। অনর্থক বকবক করতে পারব না।"

ছোকরা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর বলল, "বেশ, নিন।" দুটি টাকা বার করে দিলে, প্রণামও করলে। হেমন্তকুমার এবার পুলকিত হল। ভক্তিমান মক্কেল!

"এইবার বল কি দরকার তোমার? কিছু গোপন কোর না, খোলসা করে খুলে বল সব। যদি খরচ করতে পার তোমার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ হবে। তুমি কি জাত?"

"মুচি। জুতোর দোকান আছে আমার। এসব করতে কত খরচ পড়বে?"

"আগে শুনি কি করতে হবে।"

একটু ইতস্তত করে বার দুই গলা-খাঁকারি দিয়ে অবশেষে ছোকরা অকপটে মনের বোঝা নামিয়ে ফেললে হেমন্তকুমারের কাছে। পাড়ার একটি মেয়েকে সে ভালবেসেছে। কিন্তু মেয়েটি তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। না তাকাবার কারণ আর একটি বড়লোকের ছেলে মেয়েটিকে টাকার লোভ (সে বললে, নলকানি) দেখাচ্ছে, টাকার লোভে অন্ধ হয়ে মেয়েটি তার পবিত্র প্রেমের মহিমা দেখতে পাচ্ছে না। তাই সে স্থির করেছে দৈব করবে কিছু। এক্ষেত্রে কি করা উচিত?

হেমন্ত বলল, "তিন রকমই করতে হবে—"

"তিন রকম? মানে?"

"বিদ্বেষকরণ, উচাটন, বশীকরণ।"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"বিদ্বেষকরণ করলে ওই বড়লোকের ছোকরা আর ওই মেয়েটির মধ্যে ঝগড়া হয়ে শেষ পর্যন্ত মনান্তর হয়ে যাবে। তারপর করতে হবে উচাটন। এর ফলে মেয়েটির তোমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা হবে, আগ্রহ হবে। তারপর তাকে আকর্ষণ করে বশীকরণ করতে হবে। খরচ পড়বে পঁচাত্তর টাকা।"

"পঁচাত্তর টাকা!"

"তাতো লাগবেই। খুব কম করে বলেছি আমি। জিনিসপত্তর সংগ্রহ করতে হবে কত। সব যোগাড় করতে মাস তিনেক সময়ই লেগে যাবে আমার, ঘুরতে ঘুরতে পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে—"

"খুব দামী দামী জিনিস লাগে বুঝি?"

"দামী খুব নয়, বিদঘুটে। ষাঁড়ে-ষাঁড়ে যেখানে লড়াই করছে সেখানকার মাটি, শ্মশানের আগুন, পলাশ ফুল, পাটল ফুল, গোরোচনা, কাকের পালক, কাকের বাসা, কাকের বিষ্ঠা, মহিষের গোবর, ঘোড়ার লাদি, তা ছাড়া ধুপ ধুনো কুঙ্কুম চন্দন এসব তো আছেই। চট্‌করে এসব সংগ্রহ করাও মুশকিল। ঘুরতে হবে, তক্কে তক্কে থাকতে হবে। মাস তিনেক মেহনত করলে তবে জোটাতে পারব। মজুরি না পোষালে অত হাঙ্গামা করবে কে।—"

"চট করে অত টাকা যোগাড় করা শক্ত আমার পক্ষে। বাবা দোকানে বসেন কি না।"

খেঁকিয়ে উঠল হেমন্তকুমার।

"শিরদাঁড়ার জোর নেই ডন ফেলবার শখ কেন তাহলে?"

ছোকরা তবু বসে রইল খানিকক্ষণ।

"ওই তিন রকম করলে সোনামণি আমার বশে আসবে?"

"নির্ঘাত।"

"দুবারে টাকাটা দিলে হবে না?"

"হবে না কেন, দেরি হবে। পুরো টাকাটা হাতে না পেলে কাজ আরম্ভ করা যায় না তো।"

"কাল অর্ধেক টাকা দিয়ে যাব—"

"কাল? কালই এস। কাল সোমবার, মেয়েটির নামও সোনামণি, দুটোই দন্ত্য 'স'। কালই এস। তোমার নামটি কি?"

"আজ্ঞে, শশাঙ্ক দাস।"

"শশাঙ্ক কি বানান লেখ?"

"তালব্য 'শ' তালব্য শয়ে আকার আর ঙ-য়ে ক-য়ে।"

"এবার থেকে দন্ত্য 'স' লিখবে। দাস দন্ত্য 'স' আছেই, শশাঙ্কতে ডবল দন্ত্য 'স' হলে তিনগুণ জোর হবে!"

"যে আজ্ঞে।"

"কাল সোমবার হয়ে আর একটা সুবিধেও হয়েছে। সোমবার হচ্ছে চাঁদের বার। আর চাঁদ হচ্ছেন মনের কারক। আর এসব তান্ত্রিক ক্রিয়া মনের উপরই তো কাজ করবে।"

"যে আজ্ঞে, কাল আমি নিশ্চয় আসব।"

পুনরায় প্রণাম করে ছোকরা চলে গেল।

হেমন্তকুমার নিশ্চিন্ত হল খানিকটা। বর্ণনা চাকরিটা ছাড়ার পর খুবই অর্থকষ্ট চলছে। ধার জমে গেছে চারদিকে।

বাড়ি ফিরে আরও খুশি হল সে। অনেকদিন পরে বন্দুক এসেছে মাকে দেখতে। ফল-টল এনেছে, কাপড়-চোপড়ও এনেছে। যাবার সময় পঁচিশটা টাকাও দিয়ে গেল। হঠাৎ তার দুই ছেলের কথা মনে পড়ল। লাঠি অনেক দিন আসেনি, সোঁটা জেলে। তারপর মনে হল বল্লমটা আজ এখনও ফিরছে না কেন। এ সময় তো রোজই ফিরে আসে। রোজই রোজগার করে আনে কিছু। বয়স যদিও কম, কিন্তু খুব করিতকর্মা হয়েছে ছেলেটা। ...একটু পরেই ছোরা গলির মোড় থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বাবা গো, শিগগির চলো, মেজদাকে মেরে ফেললে—"

"কে?"

"রাস্তার লোকে। শিগ্গির এস। খুব মারছে—"

হেমন্তকুমারও ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন বড় রাস্তার উপর ভিড় জমে গেছে। বাঁ চোখটা ফুলে উঠেছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে নাক দিয়ে। তবু মারছে!

"কি হল, কি হল, মারছ কেন ওকে?"

"মারব না? শালা পকেটমার! এই দেখুন কাঁচি দিয়ে আমার পকেট কাটছিল, হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি শালাকে। খুন করে ফেলব—"

আবার মার চলতে লাগল, কিল চড় লাথি ঘুঁষি জুতো ছাতা। হেমন্তকুমার লাফিয়ে পড়ল ভিড়ের মধ্যে, ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল বল্লমকে ওদের হাত থেকে, কিন্তু পারল না। শেষে নাটকীয় ভঙ্গীতে চীৎকার করে উঠল সে—"আমাকেই মার তোমরা, আমাকেই মার, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে আর মেরো না, দোহাই তোমাদের, আমাকে মার, আমি ওর বাবা, আমিই ওর জন্যে দায়ী, ওকে ছেড়ে আমাকে মার—"

ছোরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তার ভয় হল বাবাও পাগল হয়ে গেল নাকি!

এগারো

মেজর মুখার্জীর চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু সুখময়বাবুর কবল থেকে ছবিগুলি উদ্ধার করা গেল না। তিনি তাঁর আরদালিকে কয়েকবারই পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সে যখনই গেছে সুখময়বাবুর দেখা পায়নি। উপর থেকে খবর এসেছে তিনি বাড়ি নেই, কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। এই করতে করতে মেজর সাহেবের ছুটি ক্রমশ ফুরিয়ে এল। হঠাৎ একটা জরুরী টেলিগ্রামও এসে গেল, অবিলম্বে চলে এস।

যেদিন মেজর মুখার্জী চলে যাবেন সেদিন তাঁকে স্টেশনে তুলে দেবে বলে আকাশ-পরী গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়েছিল।

সে বললে, "বর্ণনার বাবার ছবিগুলোর তো কিছুই হল না—"

"আমি ওখান থেকে সাণ্ডেলকে চিঠি লিখে দেব। সে এইখানেই পুলিশে বড় চাকরি করে। সে ব্যবস্থা করে দেবে ঠিক।"

আকাশ-পরী মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

"হাসছ যে?"

"একটা কবিতা মনে হচ্ছে। বলব?"

"বল।"

"বাঘের ভয়েতে কাঁপে বাইসন হাতি,
নেংটি ইঁদুর গ্রাহ্য করে না তাকে
চুপটি করিয়া গর্তে লুকায়ে থাকে ;
বল যদি ফাঁদ পাতি।"

"কি রকম ফাঁদ?"

"ঠিক কি রকম তা ভাবিনি এখনও। তবে সরল ভাষায় তার কাছে গিয়ে তার মুণ্ডুটি ঘুরিয়ে দিয়ে ছবিগুলি নিয়ে চলে আসব। তুমি বরং তোমার বন্ধু সাণ্ডেলকে বলতে পার আমাকে যেন একটু সাহায্য করেন।"

"অতটা বাড়াবাড়ি করবে?"

"পশুদের সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি করতে হয়। ওদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে বেশ লাগে। তবে তোমার যদি আপত্তি থাকে তাহলে—"

চুপ করে গেল আকাশ-পরী। তারপর অপাঙ্গে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, "তোমার কি ভয় হচ্ছে আমি লোকটার প্রেমে পড়ে যাব, না, সে আমাকে গপ্ করে গিলে ফেলবে।"

"এসব ব্যাপারে একটু 'রিস্ক্' আছে বইকি।"

"থাকলেই বা। নো রিস্ক্, নো গেন্। এই যে তুমি রোজ প্লেনে প্লেনে ঘুরে বেড়াচ্ছ সেটা কি রিস্কি নয়? আমি তো তোমাকে রিস্ক্ নিতে দিয়েছি। বেশ, তোমার যখন

আপত্তি তখন থাক। যতই তোমরা লেখাপড়া শেখ তোমাদের প্রাগৈতিহাসিক চেহারা এখনও বদলায়নি।"

মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন মেজর মুখার্জী।

তারপর হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা, অনুমতি দিলুম। কিন্তু দেখো কেলেঙ্কারিটা যেন খুব বেশি দূর না গড়ায়।"

আকাশ-পরী লাফিয়ে উঠল চেআর থেকে। তারপর দু'হাত তুলে ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু করে দিলে গান গাইতে গাইতে।

মনে পিয়ানো বাজে
টিরি টিং, টুং টাং, টিং টিং
ডার্লিং, ডার্লিং, ডার্লিং
ও ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং।

অদ্ভুত মেয়ে আকাশ-পরী।

বারো

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল বর্ণনা। প্রায় কপর্দকহীন হয়ে পড়েছিল সে। চারদিকে ধার অথচ হাতে একটি পয়সা নেই। হেমন্ত বশীকরণের জন্য শশাঙ্ক দাসের কাছ থেকে যে টাকাটা পেয়েছিল সেটা খরচ হয়ে যাচ্ছিল আদালতে, বল্লমকে জেলের কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে। পুলিশ বেশ ঘোরালো করে কেস সাজিয়েছিল তার বিরুদ্ধে। সোঁটা জেল থেকে খবর পাঠিয়েছিল, 'ওকে জেল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ কেন। জেলই ভালো। আমি রাজসুখে আছি : তোমরা সব্বাই জেলে চলে এস।' হেমন্তকুমার তবু বাঁচাবার চেষ্টা করছিল ওকে। বর্ণনাকে কিচ্ছু দিতে পারেনি সে ইদানীং।

সুখময়বাবুর কাছ থেকে ছবিগুলো আনতেও যায়নি বর্ণনা, সে নির্ভর করছিল আকাশ-পরীর উপর। ইতিমধ্যে সে আর এক কাজ করেছিল। বনস্পতির আঁকা বিজ্ঞাপনের ছবি তিনখানা দিয়ে এসেছিল সুবন্ধু সেনের আপিসে। তাঁরা খবর পাঠাবেন বলেছিলেন, কিন্তু কোনও খবর আসেনি। সে একবার গিয়েছিল তবু খবর পায়নি। সুদেষ্ণা বাচস্পতিকে যে টাকাটা দিচ্ছিল সেটাও পাওয়া যায়নি এমাসে। সুদেষ্ণা আজকাল আসছে না। গুজব রটেছে তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, পাণিনির গবেষণা পাণিপীড়নে পর্যবসিত হবে নাকি শেষ পর্যন্ত। আর্থিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে নগদ তরকারিও কেনা যাচ্ছে না। ছোরা কাটারি কিছু রোজগার করে কিন্তু তাদের কাছে হাত পাততে প্রবৃত্তি হয় না বর্ণনার। তাছাড়া তারা তাদের মায়ের জন্য খরচও তো করছে। ফল-মূল, ওষুধ-বিষুধ নানারকম লেগেই আছে রোজ। বন্দুক কিরিচ আসেই না। সত্যবতীর অবস্থা একটু ভালো হয়েছিল, কিন্তু আবার খারাপের দিকে যাচ্ছে।

ডাক্তার চক্রবর্তী বলেছেন এমনি করে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবে। জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা ছোট ছেলেমেয়েগুলোর ভার নিয়েছেন, নিজেদের দুধ ওদেরই খাওয়াচ্ছেন। বর্ণনাকে বাধ্য হয়ে দুধের বরাদ্দ বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু মাসের শেষে সে টাকা দেবে কোথা থেকে? জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা দুজনেই অদ্ভুত রকমের শান্ত আছেন। সব কাজকর্ম সেরে অনেক রাত্রে শোন। আবার ওঠেন খুব ভোরে। উঠেই 'সুখপুর-পত্রিকা' লিখতে শুরু করেন। ওই যেন ওঁদের পুজো করা। জ্যাঠাইমা তাঁর সর্বদা-পরার ভারী হারটা তাকে দিয়েছেন বিক্রি করে টাকা যোগাড় করবার জন্যে। খুব নির্বিকার ভাবে বললেন, "ভাবছিস কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এইটে বেচে কিছু টাকা যোগাড় করে ফেল আপাতত।" বর্ণনা এখনও হারটা বিক্রি করেনি। ভাবছে বাবার বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো যদি চলে তাহলে বিক্রি করবার দরকার হবে না হয়তো। বনস্পতি একেবারে নীরব হয়ে গেছে। বর্ণনা বুঝতে পারে বাবা মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ছবি আঁকবার জন্যে রোজই ক্যানভাসটার কাছে গিয়ে বসে, কিন্তু ছবি এগোয় না, বসে থাকে কেবল।

একদিন জিগ্যেস করেছিল, "আমার সেই ছবি পাঁচখানার কি হল? কেউ বোধহয় শেষ পর্যন্ত কিনলে না, নয়? বিক্রির জন্যে তো ওসব আঁকিনি। কেউ না কেনে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। একটা ছবি তো হাজার টাকা নিয়ে দিয়েছিলি তোর বন্ধুকে। চেকটা ভাঙিয়েছিস?"

"ভাঙিয়েছি তো। সোঁটার মকদ্দমায় খরচ হল, দুধের টাকা, বাড়িভাড়ার টাকা, সব ওই থেকেই তো দিলাম। সে টাকা ফুরিয়ে গেছে।"

"ও, তাই বুঝি। তা বেশ হয়েছে! বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো কি হল?"

"এখনও খবর পাইনি। খবর পাব শিগ্‌গির।"

"আচ্ছা, সে হবে এখন, ব্যস্ত কি।"

বর্ণনা কিন্তু বুঝতে পারছিল, বাবা ব্যস্তই হয়েছেন। কিন্তু কি করবে, উপায় তো নেই কিছু।

সেদিন হস্টেলে যেতেই আকাশ-পরী বললে, "সব মাটি হয়ে গেল।"

"কি মাটি হল?"

"আমার প্ল্যানটা। আমি দরখাস্ত করেছিলাম যে সঙ্গীতানুরাগিণী অঞ্জনা দেবীকে আমি সব রকম গান-বাজনা শিখিয়ে দেব। সুখময়বাবু আমাকে পরশু দিন ডেকেওছেন, কি শাড়ি পরে কি এসেন্স মেখে তাঁর কাছে যাব তাও ঠিক করে রেখেছি, এমন সময় পুলিশ অফিসার সাণ্ডেল এসে আমার মনের বেলুনটিতে আলপিন ফুটিয়ে চলে গেলেন।"

"তার মানে!"

"তিনি নিজে গিয়ে ছবিগুলি নিয়ে এসেছেন। আমার আর কিছু করবার রইল না। কি কাণ্ড বল দিকি, আমি কত কি ভেবে রেখেছিলাম।"

"ভালোই হয়েছে।"

"ভালোই হয়েছে! এমন একটা স্পোর্ট মাটি হয়ে গেল। আচ্ছা, পুরুষগুলো আমাদের কি মনে করে বল দেখি, আমরা এতই ঠুনকো যে ক্রমাগত সামলে সামলে বেড়াতে হবে।"

হাসিমুখে ক্ষণকাল চেয়ে রইল বর্ণনার মুখের দিকে। তারপর গান ধরে দিলে—

চতুর পুরুষগুলো—
করিয়া নানান্ ছলনা ফন্দী
আঙুরের মতো করেছে বন্দী
উপরে নীচেতে তুলো।

"ছবিগুলো কোথা?"

"ওপরে আছে।"

"আমাকে গোটা দশেক টাকা দিতে পারিস? ছবিগুলো তাহলে পৌঁছে দিয়ে আসি ফোটোগ্রাফারের দোকানে।"

"বেশ, চল, দুজনেই যাই, একটা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠা।"

ছবি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে বর্ণনা দেখল বনস্পতি বাড়িতে নেই। সরস্বতী চিন্তিত হয়ে ঘর-বার করছে।

"উনি বাইরে বেরিয়ে গেছেন, এখনও ফেরেননি।"

"কোথা গেছেন?"

"কিছু তো বলে যাননি। খাওয়া-দাওয়ার পর কখন বেরিয়ে গেছেন টেরও পাইনি। আমি দিদির ঘরে ছিলাম।"

"কেউ সঙ্গে গেছে?"

"কে আর যাবে?"

চিন্তিত হয়ে পড়ল বর্ণনা।

"মহা মুশকিল তো। বাবা তো কখনও বেরোয়নি এর আগে, পথঘাট জানা নেই। জ্যাঠামশাই শুনেছেন?"

"না। সড়কি আর খন্তা দুজনেরই খুব কেঁপে জ্বর এসেছে। ওদের নিয়েই ব্যস্ত আছেন। এ খবর শুনলে আরও ব্যস্ত হবেন, তাই আর বলিনি। তুই একবার দেখ নাহয়।"

বর্ণনা বেরিয়ে গেল।

তেরো

বনস্পতি কোলকাতার রাস্তায় কখনও একা বেরোয়নি। একা একা বেরোবার একটা গোপন লোভ অনেকদিন থেকেই তার মনে ছিল। যে বন্য স্বভাব তাকে সুখপুরের বনে জঙ্গলে গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত সেই স্বভাব তাকে এখানেও প্রলুব্ধ করেছিল অনেকদিন থেকে। এসে থেকে একটা মনের মতো ছবি আঁকতে পারেনি, গলির ভিতর ওই ঘুপচি ঘরে কোনও প্রেরণাই সে পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল রাস্তায় বেরুলে সত্যিকার কোলকাতার রূপ ধরা দেবে তার চোখে। ওই খোলার ঘরের অন্ধকূপে দেবে না। তাছাড়া হেমন্তকুমারের ছেলে-মেয়েদের নিত্য নতুন ঝামেলা, উন্মাদিনী সত্যবতীর আর্তনাদ, আর্থিক অনটন, বর্ণনার শুকনো মুখ, সরস্বতীর সপ্রতিভ থাকবার ব্যর্থ চেষ্টা, দাদা-বৌদির কৃচ্ছ্র সাধন—এ সবই যেন নিষ্প্রভ করে দিচ্ছিল তার মনের আলোকে। তার আশঙ্কা হচ্ছিল আমি কি নিভে যাচ্ছি? কিন্তু তার অন্তরতম শিল্পী একথা মানতে চাইছিল না, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই টালটা সামলে গেলেই গুমোটটা কেটে যাবে, অন্ধকার থাকবে না, হাওয়া বইবে, চাঁদ উঠবে, ফুল ফুটবে, ছবি আসবে। তার এ-ও মনে হচ্ছিল কোলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় সে যদি একা ঘুরে বেড়াতে পারে তাহলেও ছবি আসবে মনে। কোলকাতার রূপ সে দেখতে পাচ্ছে না। এই খাঁচা থেকে না বেরুতে পারলে পাবে না। একা একা বাইরে বেরিয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষাটা অনেক দিন থেকেই জাগছিল তার মনে। সেদিন একটা উপলক্ষ জুটে গেল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া ঢুকল ঘরে, বর্ণনার টেবিলের কাগজ-পত্র ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

ঘরে আর কেউ ছিল না, বনস্পতি নিজেই কাগজগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল, গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একটা ঠিকানা চোখে পড়ল তার, ঠিকানাটার নীচে লেখা রয়েছে, বাবার বিজ্ঞাপনের ছবি তিনটে এই ঠিকানায় দেওয়া হল। পড়েই পাখা মেলে উড়ল বনস্পতির কল্পনা। খাওয়া-দাওয়ার পর চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল সে।

দেখাই যাক না···।

রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটবার পর মনে পড়ল সঙ্গে একটি পয়সা নেই, রিকশা নেওয়া যাবে না। রাস্তার পথিকদের জিগ্যেস করে করে হাঁটতেই লাগল সে। হাঁটতে খারাপ লাগছিল না। মাঝে মাঝে থেমে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, বাঃ, চমৎকার তো। কোলকাতার বড় বড় রাস্তাগুলোর যে বিশেষ একটা রূপ আছে তা অভিভূত করে দিল তার শিল্পী মনকে। সে মনে মনে ছবি আঁকতে আঁকতে চলেছিল। ভাবছিল···অনেক কিছুই ভাবছিল সে।

অনেক ঘুরে, অনেকবার পথ ভুল করে অবশেষে সে যখন সুবন্ধু সেনের আপিসে এসে পৌঁছল, তখন সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ির দারোয়ান বললে, তিনতলার একটি ঘরে আপিস। অনেক সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে। খাড়া সিঁড়িগুলোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর কপালের ঘামটা মুছে ওপরে উঠতে লাগল।

"সুবন্ধুবাবুর সঙ্গে দেখা হবে কি ?"

"হবে। আসুন ভিতরে। কি দরকার আপনার ?"

বনস্পতির দিকে না চেয়েই বুশ-সার্ট-পরা সুবন্ধু সেন রিভলভিং চেআরে বসে আপিসের কাজ করে যেতে লাগলেন।

"আমি আমার ছবি তিনটের খবর নিতে এসেছি।"

এইবার সুবন্ধু চাইলেন তার দিকে।

"আপনার ছবি ? কবে ছবি দিয়েছিলেন আপনি ?"

"আমার মেয়ে বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিল।"

এই শুনে সুবন্ধু সেনের দৃষ্টির ভাষা বদলে গেল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নমস্কারও করলেন।—"ও, আপনি বর্ণনা দেবীর বাবা ? বসুন বসুন।"

সামনের চেআরটায় বসল বনস্পতি।

সুবন্ধু সেন আবার তাঁর কাজে মন দিলেন। বোধহয় চিঠি লিখছিলেন। সেটা শেষ করে ব্লট করে খামে পুরে, ঠিকানা লিখে আবার ব্লট করে চাইলেন তিনি বনস্পতির দিকে। ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন কিছু না বলে। তারপর মন-স্থির করে ফেললেন। বাঁ দিকের ড্রআরটা টেনে বড় খাম বার করলেন একটা।

"এই নিন—"

"কি ওটা ?"

"আপনার ছবি তিনখানা। প্রোপ্রাইটারদের পছন্দ হয়নি।"

খামটা হাতে নিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল বনস্পতি। তারপর বলল, "কোন্ ছবিগুলো ওঁদের পছন্দ হয়েছে তা দেখতে পারি কি ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। এই যে দেখাচ্ছি—"

তিনখানা ছবিই বার করে দিলেন। জুতোর কালির বিজ্ঞাপনের ছবিতে জনৈক পীনোন্নত-পয়োধরা যুবতী কবলার্স স্ট্যাণ্ডের উপর পা তুলে দিয়ে জুতো বুরুশ করাচ্ছে, তার দু'হাত কোমরে, চোখে মুখে একটা দৃপ্ত হাসি যেন কি মহৎ কাজ করাচ্ছে। মুচিটাও হাসছে। দেশলাই বাক্সর ছবিতেও এক জোড়া তরুণ-তরুণীর মুখ, তরুণটির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, সে একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে তরুণীর মুখের সিগারেটটি ধরিয়ে দিচ্ছে। দুজনেরই চোখে মুখে হাসি। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' বইটির প্রচ্ছদপটেও একটি মেয়ের ছবি, তার এক পা মাটিতে আর এক পা আকাশে। সম্ভবত নাচছে। মুখে হাসি।

বনস্পতি গম্ভীরভাবে ছবি তিনখানি ফেরত দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আমি চললুম। নমস্কার।"

"নমস্কার। পার্সোনালি কিন্তু আপনার ছবি তিনটে আমার খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু কি করব বলুন। আচ্ছা, মিস্টার গাঙ্গুলীর সঙ্গে কি আপনার আলাপ আছে?"

"কারো সঙ্গেই আমার আলাপ নেই।"

"চলুন না, পাশের ঘরেই আছেন তিনি। মস্ত বড় একজন আর্ট ক্রিটিক, তিনি যদি আপনাকে ব্যাক করতে রাজী হন, হু হু করে আপনার ছবি বাজারে চলবে। এই তিনটি ছবিই তরুণ শিল্পীদের আঁকা। উনিই রেকমেণ্ড করেছিলেন। বাজারে ওঁর রেকমেণ্ডেশনের খুব দাম। গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত খাতির করেন, অনেক জায়গায় উনি জজ্ হন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করুন। আমি এই স্লিপটা লিখে দিচ্ছি, বেয়ারার হাত দিয়ে এইটে ভিতরে পাঠিয়ে দিলেই দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। এদিকে খুব পলিস্‌ড্ লোক।—"

বনস্পতির কৌতূহল হল, দেখেই আসি কি রকম লোকটা। তবু কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল।

"আচ্ছা, চলুন, আমিই আপনাকে ইনট্রোডিউস করে দিচ্ছি।"

সুবন্ধু সেন নিয়ে গেলেন তাকে পাশের ঘরে।

"মিস্টার গাঙ্গুলী, ইনি শ্রীবনস্পতি মিশ্র, আমাদের জন্যে গোটা তিনেক বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু সেগুলো মালিকদের পছন্দ হয়নি। আপনি যে ছবিগুলো রেকমেণ্ড করেছিলেন সেইগুলোই নিয়েছেন ওঁরা। সুদেষ্ণার বান্ধবীর বাবা ইনি। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"

তারপর বনস্পতিকে নিম্নকণ্ঠে বললেন, "আলাপ করুন।"

বনস্পতি রৈবতক গাঙ্গুলীকে দেখেনি। দেখলেও চিনতে পারত কিনা সন্দেহ, কারণ তাঁর চেহারা খুব বদলে গিয়েছিল। শুধু চেহারা নয়, বেশ-বাসও। আগে সাহেবী স্যুট পরতেন, এখন খদ্দর পরেন, খুব দামী মিহি খদ্দর। বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে, চোখের কোণে, চিবুকের নীচে, গলার কাছে জরার ছাপ পড়েছিল, যদিও তাঁর নীলাভ রিমলেস চশমাটা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল এই বার্ধক্যের বিরুদ্ধে। বনস্পতি নামটা শুনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন তিনি। বহুকাল আগেকার ক্ষতটা তখনও শুকোয়নি।

"বনস্পতি মিশ্র? সুখপুরে বাড়ি কি আপনার?"

বনস্পতি শুধু মাথা নাড়ল।

"বহুকাল আগে আমি আপনার বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলাম। আপনার দারোয়ান ভূষণ চক্রবর্তী আমাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে কথা মনে আছে আপনার?"

"ভূষণ অনেককেই তাড়িয়েছিল। কাকে তাড়াতো আমি জানতেও পারতাম না। আপনার কথা আমার মনে পড়ছে না।"

রৈবতক গাঙ্গুলীর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল, তারপর ঠোঁট দুটো এবং থুতনিটাও। খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন বনস্পতির দিকে।

তারপর বললেন, "তা বলে আপনার উপর আমার রাগ নেই। আপনি যদি আমার পরিচয় পেতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন—"

"আপনার পরিচয় আমি পেয়েছি।"

"পেয়েছেন ? কে বললে, সুবন্ধু ?"

"না। আপনি যে ছবি তিনটি রেকমেণ্ড করেছেন তা দেখেছি। তারাই আপনার পরিচয় দিয়েছে। আপনাকে দেখবার কৌতূহল হল তাই এসেছিলাম। আচ্ছা, চলি নমস্কার।"

উঠে পড়ল বনস্পতি।

"শুনুন বনস্পতিবাবু, আপনার তিনটি ছবিও আমার ভালো লেগেছে। আপনি যে গুণী লোক তাতে আমার সন্দেহ নেই, আপনার অন্য ছবিগুলো যদি আনেন একদিন—"

স্মিত হাস্য করে বনস্পতি বললে, "না, দ্বিতীয়বার ভুল আমি আর করব না—"

রৈবতক গাঙ্গুলীকে অবাক করে দিয়ে বনস্পতি বেরিয়ে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে অনেক রাত্রে বর্ণনা বাড়ি ফিরে এসে দেখলে বনস্পতি সরস্বতী দুজনেই গুম হয়ে বসে আছে। বনস্পতি অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর।

"বাবা, কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?"

বনস্পতি কোন জবাব দিল না। তারপর হঠাৎ বলল, "আমার সেই ছবি পাঁচখানা নিয়ে এস। আমি ছবি বিক্রি করব না।"

এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না বর্ণনা। বাবা-মার অনুমতি নিয়েই সে ছবি বিক্রি করতে দিয়েছে।

"সেগুলো একটা ছবির দোকানে দিয়েছি।"

"কালই গিয়ে নিয়ে এস, ছবি বিক্রি করতে হবে না।"

বনস্পতির এরকম রুক্ষ কণ্ঠ বর্ণনা আগে কখনও শোনেনি। নিজের পক্ষ সমর্থন করে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, সরস্বতী চোখের ইশারায় বারণ করাতে থেমে গেল।

চোদ্দ

নবনী রায়ের অনেকক্ষণ খবর পাওয়া যায়নি।

নেপথ্য-বিলাসী নবনী রায় নেপথ্যেই ছিল বরাবর, নেপথ্যে থেকেই যা করবার করে যাচ্ছিল, যারা কাঠ-পুতলীর নাচ দেখায় অনেকটা তাদেরই মতো। শেষ পর্যন্ত নেপথ্য থেকেই হয়তো বর্ণনাদের সমস্যাটার সমাধান করে নেপথ্যেই বিলীন হয়ে যেত সে, কিন্তু তা হল না। পাদ-প্রদীপের সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে হল অবশেষে।

বর্ণনার সম্পর্কে নবনীর মনোভাবটা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রণিধানযোগ্য। নবনী যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল বর্ণনার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে, আপাত-দৃষ্টিতে সে এড়িয়ে চলছিলও। জ্ঞাতসারে সে কখনও বর্ণনাকে প্রিয়-রূপে কল্পনা তো করেইনি, পাছে বর্ণনা সন্দেহ করে যে সে করছে তাই সে বর্ণনার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবার চেষ্টা করেনি কোনদিন। কিন্তু গোপনে গোপনে বর্ণনার জন্য সে যা করছিল তা নির্বিকার নিঃস্বার্থ-ভাবে কেউ যে করতে পারে একথা কোনও বিজ্ঞানী মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষে মানা শক্ত। তাঁরা সন্দেহ করবেন প্রেমই অবদমিত হয়ে ওকে ওইরকম ভাবে ঘোরাচ্ছে। কিন্তু আগেই আমি বলেছি ওইরকম ভাবে ঘোরাটাই ওর স্বভাব। নীলমণি সেন, মহেন্দ্র, নগেন হাজরা, ঝকমু বা কমলাক্ষের জন্যেও সে ওইরকম ভাবে ঘুরেছে। যাই হোক বর্ণনার জন্যে সে যা যা করেছে তা সংক্ষেপে বলছি। এর থেকে আপনারা যে যা অনুমান করতে চান করুন।

বর্ণনার সঙ্গে যেদিন তার প্রথম পরিচয় হল সেদিন থেকে বর্ণনার গতিবিধির সমস্ত খবর রাখছিল সে। বর্ণনা কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, কোথা কোথা যায়, কবে সে সুখময়বাবুর চাকরি ছাড়ল, কেন ছাড়ল—কোন খবর তার অবিদিত ছিল না। রিক্শা বা ট্যাক্সি চড়ে নিজেই সে অনুসরণ করেছে বর্ণনাকে অনেকদিন, ইংরেজি ভাষায় যাকে 'ফলো' করা বলে। কিন্তু কখনও তার সামনে পড়বার চেষ্টা করেনি। সুখময়বাবুর খবর জানবার জন্যে সে এক মেয়ে-গোয়েন্দাই বাহাল করে ফেলেছিল। এই সূত্রে তার পুরাতন ভৃত্য প্রহ্লাদের চরিত্রেরও একটা বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়ে পড়ল তার কাছে। প্রহ্লাদ যে তার নাকের সামনে এই কাণ্ড করেছে তা ঘুণাক্ষরে সে জানত না। প্রহ্লাদকে সে একদিন সুখময়বাবুর বাড়িটা দেখিয়ে বলল, "দেখ, তুই এই বাড়ির চাকরদের সঙ্গে ভাব করে খবর নে তো ও-বাড়িতে কি সব কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে। প্রহ্লাদ মনে মনে একটু অবাক হল, কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করল না। তারপর বর্ণনাকে ও বাড়ি থেকে ঢুকতে-বেরুতে দেখে সে নিজস্ব একটা থিয়োরি খাড়া করে প্রভুর আদেশ পালন করতে লাগল। দিন কতক পরে এসে সে খবর দিলে, "ও-বাড়ির ভিতরে অনেক খবর আছে বাবু। কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পারছি না, অন্দরমহলে তো

ঢুকতে পারি না। কাল শুনলাম ওদের বাড়িতে একটা ঝি দরকার। যদি বলেন সুবাসিনীকে ওইখানে লাগিয়ে দি। ওর আজকাল চাকরি নেই।"

"সুবাসিনী কে?"

কথাটা এতদিন গোপনই রেখেছিল প্রহ্লাদ, এইবার মরিয়া হয়ে বলেই ফেললে।

"আমার পরিবার হুজুর।"

"তোর পরিবার! তোর যে পরিবার আছে তা তো জানতাম না। কোথা থাকে সে?"

"আগে সামন্ত ডাক্তারের ওখানে নার্সের কাজ করত। উনি এখন পাশ-করা নার্স বাহাল করেছেন, ওর চাকরি নেই। যদি বলেন তো ওকে ঢুকিয়ে দি সুখময়বাবুর বাড়িতে।"

"দে। কিন্তু তুই এই বয়সে বিয়ে করে ভরাডুবি হবি যে—"

মাথা চুলকে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে প্রহ্লাদ বললে, "যাতে না হই ডাক্তার সামন্ত সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

সুবাসিনী এসে বর্ণনার সম্বন্ধে যে খবর দিলে তা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল নবনী। বর্ণনার যতই পরিচয় পেতে লাগল, ততই সে মুগ্ধ হতে লাগল উত্তরোত্তর। এর আর একটা কারণও ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে এদেশের সনাতনপন্থীদের সঙ্গে সে ঠিক একমত ছিল না। শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা রোজগার করতে নাবলে বিপথে যাবেই—সনাতনপন্থীদের এই মনোভাবের সঙ্গে সে সায় দিতে পারেনি কোনদিন। কিন্তু নিজের মতটাকে সে যেন আর টিকিয়ে রাখতে পারছিল না। পথে-ঘাটে, আপিসে-হাসপাতালে, সিনেমায়-থিএটারে, এমন কি স্কুল-কলেজেও রোজগেরে মেয়েদের যে চেহারা সে রোজ দেখতে পাচ্ছিল তাতে সত্যিই দমে যাচ্ছিল সে। তার মনে হচ্ছিল সনাতনপন্থীদের কথাই ঠিক তাহলে নাকি। বেলেল্লাগিরিতে পুরুষদেরও উপর টেক্কা দিতে পারে এরকম মেয়ে রোজই যে চোখে পড়ছে তার। যে শাস্ত্রকে ওরা উপহাস করে সেই শাস্ত্রবাক্যের যাথার্থ্যই যে প্রমাণ করছে এই সব ঘৃতকুম্ভের দল আগুনের সংস্পর্শে আসামাত্রই গলগল করে গলে গড়িয়ে পড়ছে একেবারে! তার বাইরের মনটা দমে যাচ্ছিল সত্যি, কিন্তু তার অন্তরের নিভৃতলোকে যে আদর্শবাদী কল্পনাবিলাসীটি বাস করত সে দমেনি। সে জানত, যাদের দেখছি তারা এ যুগের প্রতীক নয়। তারা আধুনিক বেশ-বাসে নিজেদের সজ্জিত করে, আধুনিক ফ্যাসান আর মুদ্রাদোষগুলো আস্ফালন ক'রে রাস্তায় ঘাটে ট্রামে-বাসে হৈ-হুল্লোড় করছে বটে, কিন্তু তারা আধুনিক-আধুনিকা নয়, তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন্য বর্বরের দল। ভোলটা শুধু বদলেছে। কিন্তু এও সে জানত ওই বর্বরের ভিড়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সত্যিকার আধুনিক-সত্তা, সংখ্যায় কম বলে তাদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা আছেই। চানাচুরওলা মহেন্দ্রের মধ্যে যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল সঙ্গীত-রসিক, কন্যাদায়গ্রস্ত নীলমণি সেনের মধ্যে যেমন ছিল তেজস্বী পিতা, কুষ্ঠ-

ব্যাধিগ্রস্ত নগেন হাজরার মধ্যে যেমন সে বিবেকী নাগরিককে দেখতে পেয়েছিল, গরীব রিক্‌শাওলা ঝকুমুর মধ্যে আবিষ্কার করেছিল নির্লোভ সচ্চরিত্র ভারতীয় কর্মীকে, গরীবের ছেলে কমলাক্ষের মধ্যে পেয়েছিল আত্মত্যাগী বীরকে, তেমনি সত্যিকারের আধুনিকাকেও সে একদিন আবিষ্কার করবে এই হ্যাংলা ভিড়ের মধ্যে এ আশা তার ছিল। যে শুধু আধুনিকা নয়, সুচরিতা, সুশোভনা, সুশিক্ষিতা, অপ্রগল্‌ভা, যে আত্মসম্মানী, যে সত্যি স্বাধীন। বর্ণনাকে প্রথম দিনই সেই লবির পাশে দেখে তার মনে হয়েছিল এ মেয়েটি অসামান্যা, একে ঘিরে যে গম্ভীর কমনীয় প্রভাময় পরিবেশ দ্যুতিমান হয়ে আছে, তা সচরাচর দেখা যায় না। এ রহস্যময়, সুদূর এবং সুন্দর। এই রহস্যের যবনিকা তুলতে গিয়ে সে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল, পুলকিত হয়ে উঠল তার অন্তরনিবাসী কল্পনাবিলাসী কবি, বলে উঠল,—এই তো, এই তো সে। আধুনিকতার মুখোশ পরা বর্বরদের ভিড়ের একপাশে এই তো সে দাঁড়িয়ে আছে, সসঙ্কোচে নয়, সসম্মানে। এই তো সেই মহিমময়ী আধুনিকা যে বিপন্ন পরিবারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সমর্থ ছেলের মতো, তুলে নিয়েছে কর্তব্য-বোধে, শোভন শালীনতা সহকারে যে নিদারুণ দারিদ্র্য সত্ত্বেও অনায়াসে উপেক্ষা করতে পেরেছে লম্পট সুখময়ের লালসা-ক্লিন্ন প্রস্তাব, যে অপরের সহানুভূতির জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘোরেনি, আত্মবিক্রয় করেনি, হতাশায় ভেঙে পড়েনি, কামনায় বেঁকে যায়নি। মেয়েটি যে কত বড় বংশের, কত বড় মর্যাদার, কত বড় মহিমার উত্তরাধিকারিণী এ খবরও সে পেয়েছিল ভূষণ চক্রবর্তীর কাছে। সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে, ঠিক করে ফেলেছিল একে সে সাহায্য করবেই। ব্যাংকে তার যে টাকা জমছিল তার কিছুটা না হয় খরচ হয়ে যাবে এই মহৎ কর্মের জন্য। তা যাক। টাকার সম্বন্ধে তার মোহ নেই। কিন্তু এও সে ঠিক করেছিল, যা করবে খুব গোপনে নেপথ্যে থেকেই করবে। বর্ণনা যেন বুঝতে না পারে তার টাকাতেই এসব অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। ঘর-পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেও মনে করবে আবার বুঝি আগুন লাগল। বন্ধু শ্রীনাথনের কাছেও কিচ্ছু ভাঙেনি সে, পাছে তার মনে হয় মেয়েটির প্রেমে পড়েই মিস্টার রায় এসব করেছেন।

মিস্টার নাথন পাঁচখানা ছবিই একসঙ্গে সাজিয়ে রেখেছিল তার 'শো-কেসে' পাশাপাশি। ছবিগুলো তার নিজেরও খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু ছ'মাসের আগে যে বিক্রি হয়ে যাবে এ আশা সে করেনি। প্রত্যেক ছবির দাম হাজার টাকা করেই রেখেছিল সে, ভেবেছিল খরিদ্দার এলে একটু দর-দস্তুর করবেই, তখন না হয় কিছু কমানো যাবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল যখন সাতদিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেল সব ছবিগুলো। পাঁচজন অচেনা খরিদ্দার এসে এক হাজার টাকা করে দাম দিয়েই কিনে নিয়ে গেল সেগুলো একে একে। চানাচুরওলা মহেন্দ্র, কন্যাদায়গ্রস্ত নীলমণি সেন, কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত নগেন হাজরা, রিক্‌শাওলা ঝকুমু, প্রফেসার কমলাক্ষ সিংহ এদের

কাউকেই চিনত না শ্রীনাথন। শিল্পীর জাত বলে বাঙালীদের সম্বন্ধে শ্রীনাথনের আগে থাকতেই শ্রদ্ধা ছিল, সে শ্রদ্ধা আরও বাড়ল। ঝকৃমু আর কমলাক্ষকে আপনারাও চেনেন না। ঝকৃমুকে নবনী একদিন অন্ধকারে ভুল করে এক টাকার বদলে দু'টাকার নোট দিয়েছিল ভাড়া হিসেবে। ঝকৃমু তার পরদিন টাকাটা ফেরত দিয়ে যায়। সেই থেকে ঝকৃমু নবনী রায়ের বন্ধু। কমলাক্ষের সঙ্গে নবনী আলাপ করেছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবরের কাগজ পড়ে আর খবরের কাগজে তার ছবি দেখে। কমলাক্ষ তখন স্কুলে পড়ত। এক অন্ধ বুড়ীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে চাপা পড়েছিল এক মোটরের তলায়। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। খবরটা কাগজে পড়েই নবনী খোঁজ নিয়েছিল গিয়ে হাসপাতালে। রোগা পাতলা ছেলে একটা, কণ্ঠার বুকের হাড় বেরিয়ে আছে। খোঁজ নিয়ে খবর পেল, গরীব মায়ের একমাত্র ছেলে। দুবেলা ভাল করে খেতেও পায় না। তারপর থেকে নবনী আর তাকে ছাড়েনি। নবনীর অর্থানুকূল্যেই বরাবর পড়াশোনা করে এখন সে প্রফেসার হয়েছে।

ছবিগুলো শ্রীনাথনের দোকানে পৌঁছে গেছে এ খবর পেয়েই নবনী এদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে ছবি কিনতে পাঠিয়েছিল। নিজে কেন গিয়ে কিনছে না তার একটা মনগড়া কাহিনীও বলেছিল প্রত্যেককে। আর বলেছিল, খবরদার কথাটা যেন প্রকাশ না পায়।

ছবিগুলি সংগ্রহ করে নিজের বাড়ির একটা ঘরেই তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছিল সে ভূষণ চক্রবর্তীর অজ্ঞাতসারে। এর জন্যে বেশি বেগ পেতে হয়নি তাকে। ভূষণ চক্রবর্তী সমস্ত দিনই বাড়ির খোঁজে বাইরে বাইরে থাকতেন। তাঁকে একটা ঘর দিয়েছিল নবনী। সেই ঘরে তিনি কাজও করতেন, থাকতেনও।

এই ভূষণ চক্রবর্তীই শেষকালে বিপদে ফেলে দিলেন তাকে। অসুখে পড়ে গেলেন তিনি। অসুখে যে পড়বেন তা নবনী আশঙ্কাই করেছিল। নিজের খাওয়া খরচের জন্য নগদ পঁচিশ টাকার বেশি নিতেন না তিনি, নবনী রায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও নেননি। ওই পঁচিশ টাকাতে একটা সস্তা হোটেলে জঘন্য খাবার খেয়ে বাড়ির খোঁজে সমস্ত দিন রোদে রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন। কিছুতেই ভাল বাড়ি পাচ্ছিলেন না। শেষে নবনী রায়ই তাঁকে দমদমের দিকে ভাল একটা কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ির খবর দেন। বাড়িটা দেখে খুব ভালো লাগে তাঁর। অনেকখানি কম্পাউণ্ড, বড় একটা গেট, গেট বন্ধ করে দিলে কেউ আর ঢুকতে পারবে না। বাড়িতে মালিকের একটি কর্মচারী ছিলেন, তাঁর সঙ্গেই পাকা কথা ক'য়ে ঠিক করে ফেললেন সব। মাসে পাঁচ শ' টাকা করে ভাড়া। আনন্দে উত্তেজনায় হন হন করে ফিরে আসছিলেন তিনি নবনী রায়কে খবরটা দেবার জন্যে। হেঁটেই ফিরছিলেন। কিন্তু এত উত্তেজনা সহ্য হল না তাঁর। বাড়িতে ফিরে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি অজ্ঞান হয়ে। নবনী তখন বাড়িতে ছিল না। প্রহ্লাদ গিয়ে ডেকে নিয়ে এল ডাক্তার সামন্তকে। তিনি এসে যা করবার

করলেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি, কিন্তু অসুখের কোন উপশম দেখা গেল না, জ্বর উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। রক্ত পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তার সামন্ত বললেন টাইফএড হয়েছে। এর নূতন যে ওষুধ বেরিয়েছে তা দিয়ে জ্বরটা কমল বটে, কিন্তু ভূঁষণ চক্রবর্তী সুস্থ হলেন না। আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকতেন আর প্রলাপ বকতেন।

প্রলাপে বলতেন—"কে, কে যাচ্ছেন ঘরের মধ্যে, যাবেন না। না, আমি যেতে দেব না। খবরদার। হ্যাঁ, হ্যাঁ তপস্যাই, আপনি ওখানে ঘুজ ঘুজ করছেন কেন, বাইরে যান। কি বললেন, মাসিক পত্রের সম্পাদক, ওঁকে চুমরে বিনা পয়সায় ছবি নিতে এসেছেন? হবে না, বেরিয়ে যান।"

আবার খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। তারপর আবার—"বর্ণনা কোথা। বর্ণনার বিয়ের পাত্র আমি নিজে খুঁজব। রূপকথার রাজপুত্র চাই, শিল্পী বনস্পতির উপযুক্ত জামাই চাই। একটা স্বর্ণগর্দভ হলে চলবে না।"

তারপর আবার—"কে হে? ছবি কিনবে? এটা ছবির দোকান নয়। অন্যত্র যাও।" আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর—"বর্ণনা, বর্ণনা কোথা? এদিকে আয়। অমন শুকনো মুখ কেন মা তোর। তোর তো ফুলের মতো ফুটে থাকা উচিত। কত বড় শিল্পীর মেয়ে তুই। তোদের জন্যে খুব ভালো একটা বাড়ি খুঁজে বার করেছি, জানিস? আমার একটা কর্তব্য শেষ হয়েছে"—আবার খানিকক্ষণ পরে—"আর একটা কর্তব্য বাকী আছে। তোর জন্যে একটা ভাল বর খুঁজে বার করতে হবে। বার করবোই।"

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ—"বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে, এটা বেশ্যা বাড়ি নয় যে মজলিশ করবে। না, না, উনি কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। এই দারোয়ান—" আবার চুপচাপ।

তারপর—"বর্ণনা, বর্ণনা কোথা গেলি। ও বর্ণনা, সরে আয় না এদিকে, তোর মুখটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না।"

শেষে প্রলাপের ঘোরে ভূষণ চক্রবর্তী ক্রমাগতই বর্ণনাকে খুঁজতে লাগলেন, এত অস্থির হয়ে পড়লেন যে বিছানায় উঠে উঠে বসতে লাগলেন।

"বর্ণনা আসছে না কেন, কি হয়েছে ওর, নিশ্চয় রাগ হয়েছে, খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলছে ওকে সবাই, ও কি অত খাটতে পারে, কচি মেয়ে, রাজার দুলালী। বর্ণনা, বর্ণনা—" চীৎকার শুরু করলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

নবনী তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তার সামন্তকে ডেকে নিয়ে এল। নবনী, প্রহ্লাদ আর সুবাসিনী এরা তিনজনই পালা করে সেবা করছিল, রাত জাগছিল।

ডাক্তার সামন্ত বললেন, "বর্ণনা দেবীকে বরং খবর দিন। তাঁকে দেখলে হয়তো একটু শান্ত হবেন।"

শান্ত হবার একটা ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। ওষুধে কিন্তু ফল হল না। বর্ণনার

জন্যে ক্ষেপে গেলেন তিনি যেন। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, "আমি বর্ণনার কাছে যাব, তার হস্টেলে যাব, সে অভিমান করেছে—"

নবনী রায়কে আবার যেতে হল ডাক্তার সামন্তর কাছে। ওএটিংরুমে ঢুকেই বুঝতে পারল, ভিতরে লোক রয়েছে। ডাক্তার সামন্ত কাকে যেন বলছেন, "আজ্ঞে না, আপনাদের এখন জন্ম-নিরোধ করবার দরকার নেই। দু'একটা ছেলে-মেয়ে হোক না, তখন আসবেন।"

নবনী রায় শুনতে পেল মৃদুকণ্ঠে একটি মেয়ে বলছে, "না, ছেলে-মেয়ের বড় ঝঞ্ঝাট। ও আমরা চাই না!"

"দেখুন, জন্ম-নিরোধ করে আপনাদের যথেচ্ছাচার করবার সুবিধে করে দেব তেমন লোক আমি নই। আয় এবং স্বাস্থ্য অনুসারে সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই আমার কাজ। যখন দরকার হবে আমি নিজেই সে কথা বলব আপনাদের। এখন থেকেই ও-কথা ভাবছেন কেন? অন্তত একটা ছেলে হোক, তখন আসবেন—"

একটি বরসা-ধরা পুরুষ কণ্ঠ বলল, "যদি একটু বিবেচনা করে দেখতেন। শ' খানেক টাকা দিতে রাজী আছি আমি।"

"সব জায়গায় ঘুষ চলে না। আচ্ছা, আসুন এখন।"

বাহারে শাড়ি-পরা আধ ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়ে এবং একটি ছোকরা বেরিয়ে গেল।

নবনীর মুখে সব শুনে ডাক্তার সামন্ত বললেন, "বর্ণনা দেবীকেই আনিয়ে নিন। ঠিকানাটা জানেন তো?"

"জানি।"

"একটা খবর দিয়ে দিন তাহলে।"

নবনী রায়কে পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতে হল এইবার।

পনেরো

বর্ণনাদের বাড়িতে এদিকে তুমুল তাণ্ডব চলছিল। পুলিশের এবং মৃত্যুর। উপর্যুপরি কয়েকদিন সে কলেজে যেতে পারেনি। হস্টেলেও যায়নি, ছবির খবরও নিতে পারেনি। প্রচণ্ড দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে বনস্পতিও আর তোলেনি ছবির কথা।

বিপদ কখনও একা আসে না, বিধাতার রোষ যার উপর পড়ে তাকে একেবারে ছারখার করে দেয়—এই সব প্রবাদ বাক্য হেমন্তকুমারকে দেখেই যেন রচিত হয়েছিল। যে কটি রঙীন বুদ্বুদ সে কোলকাতার রাস্তায় উড়িয়েছিল তার সব কটিই ফেটে গেল।

ছোরা আত্মহত্যা করেছিল। একটা কাগজে লিখে গিয়েছিল, "স্বেচ্ছায় গলায় দড়ি দিলুম। কেন দিলুম তা জেলে গিয়ে মেজদাকে জিগ্যেস করো। আমি তা লিখতে

পারবো না।" কাটারি পালিয়ে গিয়েছিল কিরিচের কাছে। তার ভয় করত। সে নাকি ছোরাকে দুদিন দেখতে পেয়েছিল দরজার পাশে, তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। এর উপর আর এক বিপদ। যে চারটি ছেলেমেয়ে বাচস্পতির কাছে ছিল তাদের প্রত্যেকেরই বসন্ত হয়েছে। আসল বসন্ত। কারো টিকে দেওয়া ছিল না।

একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু। সত্যবতী হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যে ভোরে আড়কাটা থেকে দোদুল্যমান ছোরাকে দেখে চীৎকার করে উঠেছিলেন তিনি, সেই ভোর থেকেই তাঁর পাগলামি সেরে গিয়েছিল। একটা দমকা হাওয়ায় কুয়াশাটা যেন উড়ে গেল। সবাই ঘুমিয়ে পড়বার পর ছোরা গভীর রাত্রে গলায় দড়ি দিয়েছিল। ভোরবেলা সত্যবতীই তাকে প্রথম দেখতে পান। তাঁর যে গগন-বিদারী আর্ত হাহাকার পাড়ার সবাইকে জাগিয়ে তুলেছিল সেই হাহাকারই নাকি জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর আচ্ছন্ন সত্তাকে, তীব্র বেদনার তাড়নায় পাগলামি সেরে গিয়েছিল। ডাক্তার চক্রবর্তীর এই মত।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর চোখে মুখে একটা অপ্রতিভ কুণ্ঠিত ভাবও ফুটে উঠেছে, এতদিন কর্তব্য-কর্মে মন দিতে পারেন নি বলে তিনি লজ্জিত। লাঠি সোঁটা বল্লম বন্দুক কিরিচ ছোরা এদের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি, এদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেন নি। অত্যন্ত শান্ত ভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। বর্ণনার মনে হচ্ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিক হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে আবার যেন 'ডিউটি'তে ফিরে এসেছে অনেকদিন পরে।

একদিন শুধু কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "উনি তো নিজে সংসারের জন্যেই দিনরাত মেহনত করছেন, সংসারের উপকার হবে বলে ছেলে-মেয়েদেরও কাজে লাগিয়েছিলেন, এমনটা যে হবে কে জানত। আমিই মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না বলে এসব হল। আমি ঠিক থাকলে এমন হত না। হালে মাঝি না থাকলে নৌকো তো বানচাল হবেই।"

এই বলে হেসেছিলেন একটু। করুণ বিষণ্ণ হাসি।

এই নিদারুণ দুঃখের পটভূমিকায় বাচস্পতি-সীমন্তিনীরও নূতন রূপ ফুটে উঠেছিল। বাচস্পতি যে বাড়ির বড় ছেলে এবং সীমন্তিনী যে বাড়ির বড় বউ সেটা এইবার যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এত বিপদেও দুজনেই অবিচলিত, দুজনেই হাসিমুখ, যেন কিছুই হয়নি। সীমন্তিনী সত্যবতীকে রোজ বলেন, "উনি বলছিলেন আমরা যতক্ষণ আছি তোমাদের কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবানকে ডাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বাচস্পতি বর্ণনাকে বললেন, "তোমার বড়মার গয়নাগুলো ব্যাংক থেকে বার করে বিক্রী করে দাও। তোমার আর তোমার মায়ের গয়না এখন থাক। তোমার বড়মার গয়না বিক্রি করলে অন্তত হাজার পাঁচ ছয় টাকা হবে। ও টাকাটা শেষ হয়ে যাবার পর যদি দরকার হয় তখন তোমাদের গয়নায় হাত দেব।"

জ্যাঠামশায়ের আদেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না বর্ণনার পক্ষে। বড়মার গয়না বিক্রি করে সাড়ে ছ' হাজার টাকা পাওয়া গেল। সেটা ব্যাংকে জমা করে পাশ বুকটা বাচস্পতিকে এনে দিলে সে।

"ওটা তোর কাছেই রাখ। তোকেই তো বার করতে হবে ব্যাংকে গিয়ে। এখন কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তুমি হস্টেলে গিয়ে পড়াশোনায় মন দাও এবার। ভাল করে এম. এ-টা পাশ করা চাই। হ্যাঁ, আর তোর বন্ধু স্নদেষ্ণার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে দেখেছিস? তাকে ভাল একখানা বেনারসী শাড়ি কিনে পাঠিয়ে দে। খেলো জিনিস দিস নি। দেড় শ' দু শ' টাকায় ভাল শাড়ি হবে না? তাই দিস। আর তোর বাবাকে বল্ সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করুক এবার। মন-স্থির করে বসলেই পারবে। আর আমি যখন রয়েছি ওর অত ভাবনা কি—"

বাচস্পতির মনোভাবটা আরও স্পষ্ট হয়েছে 'সুখপুর-পত্রিকা'র একটি সংবাদে। উদ্ধৃত করছি।

"ঘরের খবর। আমাদের আত্মীয় হেমন্তকুমারকে ভগবান শাস্তি দিতেছেন। এ শাস্তি তাহার প্রাপ্য কিনা, শাস্তি অত্যন্ত বেশি কঠোর কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। এইটুকু শুধু বলিতে পারি এক্ষেত্রে আমরা ভগবানের বিরুদ্ধাচারণ করিব। যতক্ষণ আমাদের দেহে ও মনে শক্তি থাকিবে ততক্ষণ আমরা হেমন্তকুমার ও তাহার পরিবারবর্গকে ভগবানের শাস্তি হইতে বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব। ফল কি হইবে তাহা জানি না। সে সম্বন্ধে চিন্তাও করিব না। কারণ স্বয়ং ভগবানই গীতায় বলিয়াছেন, কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে, সুতরাং ফল লইয়া মাথা ঘামাইও না।

উপর্যুপরি বিপৎপাতে শ্রীমান বনস্পতিও বেশ বিচলিত হইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া অবধি সে জল-চ্যুত মীনের মতো ম্রিয়মান হইয়া ছিল, একটিও ছবি আঁকিতে পারে নাই, সর্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া থাকিত। সম্প্রতি সে আরও যেন দমিয়া গিয়াছে। নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য ঘরের কাজে মন দিয়াছে। রাস্তার কল হইতে জল আনে, ঘর ঝাঁট দেয়, এমন কি কাপড় কাচে। শ্রীমতী সরস্বতী রান্নার যাবতীয় ভার বহন করিতেছে। যাহারা স্বপ্নের জগতে বাস করিয়া বিবিধ বর্ণের বেলুনে উড়িয়া বেড়াইত, ভগবান তাহাদের রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন করিয়া সম্ভবত মজা দেখিতেছেন। ভগবান তাঁহার লীলা-বিলাসে মত্ত থাকুন, আমরা আমাদের কর্তব্য হইতে বিমুখ হইব না। আমি অদ্য বনস্পতিকে শাসন করিয়া দিয়াছি। বলিয়াছি, 'দেখ, শাণিত ক্ষুর দিয়া কেহ কখনও বৃক্ষশাখা ছেদন করে না। তুমি শিল্পী, তুমি ছবি আঁক। জল-আনা, কাপড়-কাচার জন্য আমি একটি দাসী নিযুক্ত করিয়া দিতেছি। সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না। সেজন্য আমি আছি। বধূমাতারও রান্নাঘরে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। একটি পাচিকা বা পাচক ঠিক

করিয়া দিতেছি। বধূমাতা তোমাকে যেমন ছবি আঁকায় সাহায্য করিত তেমনি করুক। এখনও তো আমরা একেবারে নিঃস্ব হই নাই, তোমার ভাবনা কি। তুমি ছবি আঁক।' আমার কথায় সে ছবি আঁকিতে বসিয়াছিল কিন্তু কিছুই আঁকিতে পারে নাই। সম্ভবত এ পরিবেশই তাহার ছবি আঁকার অনুকূল নহে। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, সে-ই বোধহয় সর্বাপেক্ষা বেশি বিপন্ন। কিন্তু রাত্রে আমার এ ভুল ভাঙিল, বুঝিলাম হেমন্তকুমারই সব চেয়ে বেশী দুঃখী। গত রাত্রে রাস্তায় ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখিলাম পথের উপর নর্দমার পাশে বসিয়া হেমন্তকুমার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। হেমন্তকুমারকে ইতিপূর্বে কখনও কাঁদিতে দেখি নাই। সে সর্বদাই সপ্রতিভ। তাহাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাহার পাশে বসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলাম।

বলিলাম, 'ভাই, ভাঙিয়া পড়িও না। বিপদে ধৈর্যই বল। কর্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। তুমি উদ্যমশীল কর্মী লোক। একটি দিনও অলসভাবে বসিয়া থাক না। কিন্তু যদি রাগ না কর একটি কথা তোমাকে বলিব। তুমি গৈরিক বাস পরিত্যাগ কর। গৈরিক ধারণ করিবার যোগ্যতা আমাদের কাহারও নাই। খুব কম লোকেরই সে যোগ্যতা থাকে। জ্যোতিষীর ব্যবসাও আমার মতে ভালো ব্যবসা নহে, সাধারণত উহা ভণ্ডামি এবং মিথ্যাচারের নামান্তর মাত্র। আমার মতে এইটিও তুমি পরিত্যাগ কর। সুবিধা মতো অন্য কোন কাজ যোগাড় করিয়া লও। যদি যোগাড় করিতে না পার, ঘরেই বসিয়া থাক। আমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি, তোমার কোন চিন্তা নাই।'

হেমন্তকুমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—'চিরকাল আমরা তোমাদেরই খাইয়া পরিয়া মানুষ হইয়াছি। কিন্তু দুর্দিনে আর তোমাদের ভার বাড়াইতে চাহি না। যেমন করিয়া পারি, যতটুকু পারি তোমাদের সাহায্য করিব। জ্যোতিষী ব্যবসায় যে জুয়াচুরির নামান্তর তাহা আমি জানি, কিন্তু যে সমাজে, যে শাসন ব্যবস্থায় সর্বত্রই অন্যায় অবিচার ও জুয়াচুরি সেখানে আমি সৎ থাকিব কেমন করিয়া? আমি ইচ্ছা করিয়াই জুয়াচুরি করিতেছি, সমাজের উপর প্রতিশোধ লইতেছি, বোকা অথচ পাজি লোকগুলার কান মলিয়া টাকা আদায় করিতেছি। আমাকে তুমি বাধা দিও না। অন্য কোন্ কাজ করিব বল? আমার কোন যোগ্যতাই যে নাই।'

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।"

ষোল

হেমন্তকুমার বাচস্পতির অনুরোধ শোনেনি। গেরুয়া পরেই রোজ বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। সমস্ত দিন বাইরে বাইরেই থাকত। রোজগারের চেষ্টায় হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায়। দিনের বেলা বাইরেই খেয়ে নিত কিছু, কিম্বা কিছুই খেত না। বাড়ি ফিরত রাত এগারোটা বারোটার পর।

একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সহদেবের। সেই সহদেব, যে 'সুখপুর কার্ড ক্লাব' স্থাপন করেছিল। সে গৈরিকধারী হেমন্তকে দেখে অবাক হয়ে গেল। "হিমুদা, এ কি কাণ্ড ?"

হেমন্ত কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল তার দিকে গম্ভীর ভাবে।

তারপর সংক্ষেপে বলল—"পেটকা ওয়াস্তে। তুই কি করছিস ?"

"আমি এক গুজরাটি বিড়ির দোকানে চাকরি করি।"

"যাক চাকরি একটা পেয়েছিস তাহলে—"

"অতি কষ্টে। বাঙালীকে আজকাল কেউ চাকরি দিতেই চায় না হিমুদা। বলে তোমরা ফ্যাক্টারিতে ঢুকলেই স্ট্রাইক করাবে। তোমাদের চাকরি দেব না। এই গুজরাটির হাতে-পায়ে ধরে অনেক কষ্টে চাকরিটি পেয়েছি। বকুদা বনুদা কেমন আছেন ?"

"টিকে আছেন কোন রকমে।"

"তোমার এ ব্যবসা কেমন চলছে ?"

"এক রকম। তবে তুই যদি একটু সাহায্য করিস আরও ভাল ভাবে চলবে। তোকে কিছু কমিশনও দেব।"

"বল কি করতে হবে। নিশ্চয় করব সম্ভব হলে—"

"একটু অভিনয় করতে হবে। তুই রোজ আমার কাছে হাতজোড় করে এসে বসবি, আর যেই কেউ কাছাকাছি আসবে অমনি গদগদকণ্ঠে একটু জোরে জোরে বলবি, ঠাকুর মশাই ধন্য আপনার গণনা। আপনার কথা অনুসারে চলে রেসে বিস্তর টাকা পেয়েছি। কোনদিন বা বলবি, ধন্য আপনার মাদুলি, হাঁপানি একদম সেরে গেছে। কোনদিন বলবি, ধন্য আপনার কবচ, চাকরি পেয়ে গেছি। কোনদিন বলবি, কি বশীকরণই করেছিলেন, অদ্ভুত ফল হয়েছে। এখন মেয়েটা আমার পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। ধন্য আপনার গণনা, ধন্য আপনার তান্ত্রিক ক্রিয়া, আপনি মহাপুরুষ, আপনি দেবতা—"

চীৎকার করতে লাগল হেমন্ত। সহদেব ভয় পেয়ে গেল। প্রলাপ বকছে নাকি হিমুদা। চোখ দুটো কেমন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, রগের শিরগুলো ফুলে উঠেছে।

"এই উপকারটি করতে পারবি ?"

"তা পারব না কেন—"

"ওই একটা লোক আসছে। বল তাহলে জোরে জোরে—"

বিস্মিত সহদেব হাতজোড় করে বলতে লাগল—"ঠাকুর মশাই, ধন্য আপনার মাদুলী, হাঁপানি একদম সেরে গেছে—ধন্য আপনার গণনা—"

লোকটা এল, চলে গেল, দাঁড়ালো না।

এইভাবে চলল কিছুদিন। সে কবে কোন্ পার্কে বা কোন্ রাস্তায় বসবে তা আগে থাকতে সহদেবকে বলে দিত। সহদেব ঠিক আসত। এতে তার রোজগার বেড়েছিল কিছু। সহদেবকে টেন্ পারসেণ্ট দিয়েও কিছু বাঁচত তার।

হঠাৎ একদিন আর এক কাণ্ড হল। সেই বাবরি-চুলওলা শশাঙ্ক দাস তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আরে, ঠাকুর মশাই, আপনি এখানে বসছেন নাকি আজকাল! এদিকে আমি আপনার খোঁজে সারা কোলকাতা শহর চষে বেড়াচ্ছি। আপনার বশীকরণে কি অদ্ভুত ফলই যে ফলেছে তা কি আর বলব। সোনামণি একেবারে আমার হাতের মুঠোয় এখন। অবশ্য এক ছড়া ভারী বিছে হার গড়িয়ে দিতে হয়েছিল, কিন্তু আপনার ক্রিয়ায় কাজ যে হয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। খুব কাজ হয়েছে। তিন আইনের জোরে বিয়েও করে ফেলেছি তাকে। ন্যাটা চুকিয়ে দিয়েছি। আপনি চলুন, আশীর্বাদ করে আসবেন।" শশাঙ্ক দাস প্রণাম করে নগদ পঁচিশটি টাকা দিলে।

"আপনার জন্যে এক জোড়া কাপড় আর একটি মখমলের চাদরও গেরুয়ায় ছুপিয়ে রেখে দিয়েছি। বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়লে সেখানেই দেব। যাবেন এখন? রিক্‌শা ডাকব?"

"ডাক।"

রিক্‌শায় যেতে যেতে শশাঙ্ক দাস বললে, "আর একটি কাজও করে দিতে হবে ঠাকুর মশাই। যাতে ছেলেপিলে না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে দিন। ছেলেপিলে হতে আরম্ভ করলেই শরীরের বাঁধুনিটা চলে যায়, বুঝলেন না। ছেলেপিলে চাই না। একজনের কথায় ডাক্তার সামন্তর জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকে গেসলাম কিন্তু লোকটা একটু ইয়ে গোছের, এক শ' টাকাতেও রাজী হল না। হয়তো দু শ' পাঁচ শ' দিলে হত, কিন্তু অত টাকা এখন হাতে নেই। বাবা দোকানে বসে কিনা। আপনি তন্ত্র মন্ত্র কিছু একটা করে দিন। তন্ত্রে মন্ত্রে হবে কিছু?"

"হবে। ওই এক শ' টাকাতেই হবে।"

"বেশ, ব্যবস্থা করে ফেলুন তাহলে।"

তারপর হেমন্তকুমারকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বললে, "আর একটা বিয়েও পাকছে। সোনামণির একটা বোন আছে, আমার এক মাসতুতো ভাই তাকে দেখে ক্ষেপেছে। ক্ষেপবার কথাই, ডব্‌কা ছুঁড়ি যাকে বলে। এর বিয়েটা চটপট দিয়ে দিতে হবে। মেয়েটা রাজী হয়েছে"—তারপর চুপি চুপি—"সাধে হয়েছে? পোয়াতি হয়ে গেছে ছুঁড়ি। এই রোকো, রোকো—" রিক্‌শা একটা খোলার বাড়ির সামনে থামল।

"কই সোনামণি, কপাট খোল, কপাট খোল। ঠাকুর মশাইকে পাকড়াও করে এনেছি।"

এইবার ভগবান আর একটি বজ্র হানলেন হেমন্তর মাথায়। কপাট খুলে বেরিয়ে এল বন্দুক, আর তার পিছনে কিরিচ আর কাটারি।

হেমন্তকুমার হঠাৎ ঘুরে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল গলি থেকে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শশাঙ্ক দাস।

সতেরো

পর পর তিনদিন গিয়েও বর্ণনার দেখা পেল না নবনী। হেমন্তকুমার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াতে আবার তাকে ঘুরতে হচ্ছিল থানায় থানায়, হাসপাতালে হাসপাতালে। তাছাড়া আর এক বিপদ হয়েছিল। কোদাল কুড়ুল খন্তা তিনজনই মারা গিয়েছিল। সড়কি শুষছিল। বর্ণনা বাড়িতে বসতে পারছিল না এক মুহূর্ত। সব ব্যবস্থা তাকেই করতে হচ্ছিল, সব ভার তার উপর।

কয়েকদিন পরে হেমন্তকুমারের এক ঠিকানাহীন চিঠি আসতে পারিবারিক আবহাওয়া কিছু যেন শান্ত হল। হেমন্তকুমার লিখেছে—আমি ভাল আছি। আমার জন্যে তোমরা চিন্তা কোরো না। যথাসময়ে গিয়ে হাজির হব। নতুন কাজ শিখছি একটা। কয়েকদিন দেরি হতে পারে।

ভূষণ চক্রবর্তী অনেকটা সামলেছিলেন। জ্বর ছিল না, কিন্তু বর্ণনাকে দেখবার জেদ কমে নি। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে নবনীকে আর একবার বর্ণনার খোঁজে বেরুতে হল। যাবার আগে সে ভেবে নিয়েছিল কি করবে। একটা কথা সে বুঝতে পেরেছিল যে বর্ণনার সঙ্গে যে ছলনা সে এতদিন করেছে তা আর চালানো যাবে না। সে বর্ণনাকে বলেছিল সে কোলকাতার বাইরে থাকে, হেমন্তকুমারকেও বলেছিল সে কথা। কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে বর্ণনার দেখা হলেই তো সব ফাঁস হয়ে যাবে। আরও কতকগুলো মিথ্যা কাহিনী রচনা করে এ ব্যাপারটাকেও অন্য রঙে রাঙিয়ে দেবার মতো কল্পনা-শক্তি তার যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তা করতে তার আর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। কারণ সে জানত সত্য একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করবেই, আর যখন করবে তখন বর্ণনার কাছে অত্যন্ত খেলো হয়ে যেতে হবে তাকে। বর্ণনা নিঃসন্দেহে তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলে মনে করবে। হয়তো এ-ও ভাববে যে এ সবের পিছনে নিশ্চয় তার একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, হয়তো তাকে সুখময়বাবুরই নূতন সংস্করণ মনে করবে। বর্ণনার মনে এ ধরনের সন্দেহ যাতে না হয় সেই জন্যই তো সে গোপনতার আশ্রয় নিয়েছিল। বর্ণনাকে টাকা দিয়ে প্রলুব্ধ করে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার আকাঙ্ক্ষা তার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না, এখনও নেই। বর্ণনার মতো মেয়ে, বনস্পতির মতো শিল্পী, ভূষণ চক্রবর্তীর মতো আদর্শবাদী এই বর্বর সভ্যতার স্টিম-রোলারের তলায় চাপা প'ড়ে আর একটু হলে মারা যাচ্ছিল, সে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। কর্তব্যবোধেই করেছে।

এই জন্যে সে কোন বাহবাও প্রত্যাশা করে না, এর পিছনে তার কোন উদ্দেশ্যই নেই। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল কি করবে।

বর্ণনার সঙ্গে বাড়িতে দেখা হল না। তার হস্টেলে যেতে হল। বাচস্পতি বর্ণনাকে জোর করে আবার হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কমন-রুমে বসে একটা স্লিপে নিজের নাম লিখে পাঠিয়ে দিতেই বর্ণনা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, "আপনি এসেছেন? আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি মনে মনে।"

"কেন?"

"কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে। আপনি কি উপকার যে করেছেন আমার। বাবার পাঁচখানা ছবিই বিক্রি করে দিয়েছেন আপনার বন্ধু। আর প্রত্যেকটা এক হাজার টাকা করে। এটা সত্যি প্রত্যাশা করিনি। আমি ওঁকে কিছু কমিশন দিতে চাইলাম, কিন্তু উনি নিতে চাইলেন না। আপনি একটু বলবেন তো ওঁকে—"

"ও আমার কাছ থেকে কমিশন নেবে না।"

"কিন্তু আপনার কাজ তো করেন নি, করেছেন আমার কাজ।"

"আমার অনুরোধেই করেছে। টাকাটা পেয়ে গেছেন তো?"

"হ্যাঁ—"

"এইবার আরও খানকয়েক ছবি দিন ওকে। সে পরে দেবেন এখন। আপাতত একটি দুঃসংবাদ শোনবার জন্য প্রস্তুত হোন—"

"কি দুঃসংবাদ?"

"ভূষণ চক্রবর্তী বলে আপনার বাবার একজন ভক্ত তাঁর জন্যে একটা ভালো বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আমার বাসায়। আপনাকে দেখতে চাইছেন। আপনি চলুন একবার।"

"আপনার বাসায়? আপনি তো কোলকাতার বাইরে থাকেন বললেন সেদিন। কোথা যেতে হবে আমাকে?"

"এখানেও আমার একটা ছোট বাসা আছে। সেইখানেই আছেন তিনি।"

"সেখানে এলেন তিনি কি করে?"

"সব বলব। চলুন।"

"এখনই যেতে হবে?"

"এখনই যাওয়াই তো ভালো। বড্ড অস্থির হয়েছেন আপনার জন্যে।"

"একটু অপেক্ষা করুন তাহলে। কাপড়টা বদলে আসি।"

ভিতরে ঢুকেই আকাশ-পরীর সঙ্গে দেখা হল বর্ণনার।

"আকাশ, আমি একটু বেরুচ্ছি।"

"আগেই জানতাম।"

"কি করে জানলি ?"

"ভদ্রলোক এসেছেন দেখে আড়ি পাতছিলাম। আজ মাদ্রাজীর ছদ্মবেশ ছেড়ে এসেছেন দেখছি। চমৎকার দেখতে ভদ্রলোক। তোরা দুজনে যখন পাশাপাশি কথা বলছিলি এমন সুন্দর লাগছিল।"

বলেই সে কবিতা আওড়াতে লাগল।

"সোনার সঙ্গে সোহাগা যেন রে
মালার সঙ্গে গলা
কমল-নয়নে কাজলের রেখা
ফলারেতে পাকা কলা।
(আহা) মানিয়েছে ভালো, মানিয়েছে খাসা
পান্নার পাশে চুণী
তপোবন মাঝে অপ্সরা হেরি
বিব্রত যেন মুনি।"

"ফাজিল কোথাকার ! ওই এক চিন্তা খালি—"

বর্ণনা কাপড় বদলাবার জন্যে ঘরে ঢুকল। আকাশ-পরীও ঢুকল তার পিছু পিছু কীর্তনের সুরে গাইতে গাইতে—

"কহিছে শ্রীরাধা কোথা শ্রীকৃষ্ণ
কোথা তুমি বনমালী
কোথা শ্রীবৎস কোথা শ্রীবৎস
কহিছে চিন্তা খালি।
সখি, কেন কর মুখে এ কপটতা—
গাহিবার মতো এই তো রাগিণী
কহিবার মতো এই তো কথা।"

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল একটু পরেই।

নবনী রায় বললে, "এইবার আমি চললাম।"

"কোথা যাবেন ?"

"আমি এবার বিদায় নিতে চাই। আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না"—তারপর ব্যাগ থেকে একটি কাগজ বের করে দিয়ে বললেন, "এটা ভূষণবাবুকে দিয়ে দেবেন। দমদমের বাড়িভাড়ার রসিদ। এক বছরের বাড়িভাড়া দেওয়া আছে।"

"কোথা যাচ্ছেন এখন ?"

"হিমালয়ের দিকে যাব"—তারপর হেসে বললে—"আবার ভেসে ভেসে বেড়াব আর কি, যেখানে গিয়ে ঠেকি—"

বর্ণনা তার মুখের দিকে চকিতে চেয়ে দেখল একবার।

"ভূষণ কাকার সঙ্গে দেখা করবেন না ?"

"না। তাঁকে এত বেশি শ্রদ্ধা করি যে তিনি যদি যেতে মানা করেন আমাকে থেকে যেতে হবে। কিন্তু আমার আর থাকবার ইচ্ছে নেই। উনি অনেকটা সেরে উঠেছেন, এবার আপনি ওঁর ভার নিন। আমাকে ছুটি দিন।"

"কিন্তু কোনও কারণে আপনাকে যদি আবার দরকার হয়। কি করে খবর দেব আপনাকে ?"

"চান যদি আমার ঠিকানাটা দিতে পারি। আপাতত সিমলা যাচ্ছি, সেখানে একটা হোটেলে উঠব। সেই ঠিকানাটাই রাখুন।"

একটা কার্ডের পিছনে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে, ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে হাসিমুখে নমস্কার করে চলে গেল নবনী রায়।

বর্ণনা তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নবনী রায় দেখতে দেখতে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

বর্ণনাকে দেখেই বিছানায় উঠে বসলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

"বর্ণনা এসেছিস ? আয়, এইখানটায় বোস। তোকে দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। কেমন আছিস, তোর বাবা কেমন আছে ?"

ভূষণ কাকার জরাজীর্ণ চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল বর্ণনা। তাঁর শরীরটা ভেঙে পড়েছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁকে বলবার সাহস হল না তার।

বললে, "ভালই আছি আমরা।"

"তোর বাবা নতুন কোন ছবি এঁকেছে আর ?"

"না। অত ভিড়ে গোলমালে কি ছবি আঁকা হয় !"

"হয় কি ? হবে না জানতাম। কিন্তু এবার হবে। খুব ভালো বাড়ি ঠিক করেছি তোদের জন্য একটা। সেখানে গেলে দেখবি ছবির পর ছবি হবে। কি বড় বড় ঘর, প্রকাণ্ড হাতা, চমৎকার বাগান, কোলকাতাতেও যে দোয়েল থাকতে পারে তা ওইখানেই প্রথম দেখলুম। চমৎকার বাড়ি—"

"নবনীবাবুর কাছে শুনলাম। তিনি এই রসিদটা তোমাকে দিয়ে গেলেন। বাড়িটার এক বছরের অগ্রিম ভাড়া দেওয়া হয়েছে। টাকাটা কি নবনীবাবু দিলেন ?"

"হ্যাঁ, সেই তো কথা ছিল। নবনীবাবু কোথা ?"

"তিনি তো চলে গেলেন।"

"চলে গেলেন। কোথা চলে গেলেন ?"

"বললেন হিমালয়ে যাচ্ছি।"

"হিমালয়ে!" নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন, "হিমালয়ে চলে গেলেন! সে যে অনেক দূর। আমি যে এদিকে মনে মনে—" আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি।

"কি ?"

"হিমালয়ে কোথায় গেছে জানিস ?"

"একটা ঠিকানা দিয়ে গেছেন।"

ভূষণ চক্রবর্তীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "ও, ঠিকানা দিয়ে গেছেন ? এখুনি চিঠি লেখ। লেখ, আপনি চিঠি পেয়েই চলে আসুন।"

"আসতে বলছেন কেন ?"

"না বললে আর আসবে না। নির্বিকার মহাপুরুষ লোক। এ রকম লোক আমি আর দেখিনি। স্বয়ং শিব। লেখ লেখ, এখুনি লেখ—ফিরে আসুন, আপনি ফিরে আসুন। ওই টেবিলে কাগজ, কলম, খাম সব আছে। এখুনি লেখ, আমার সামনে বসে লেখ।"

ভূষণ কাকার আগ্রহাতিশয্যে লিখতে হল চিঠিটা। তারও যে খুব একটা অনিচ্ছা ছিল তা নয়, তারও খুব ভালো লেগেছিল লোকটিকে।

কিন্তু চিঠি লিখতে লজ্জা করছিল তার।

যতদূর সম্ভব সংযত ভাষায় সে লিখলে—

প্রিয় নবনীবাবু,

আপনি হঠাৎ চলে যাওয়াতে ভূষণ কাকা ভারী অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাঁর খুব ইচ্ছা আপনি আবার ফিরে আসুন। কিছুদিন পরে না হয় আবার যাবেন। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছাও যুক্ত করলাম। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

ইতি—বর্ণনা

চিঠিটা হস্তগত করে ভূষণ চক্রবর্তী হাঁক দিলেন—"প্রহ্লাদ।"

প্রহ্লাদ পাশেই ছিল, এসে হাজির হল।

"এই চিঠিটা এক্ষুনি ডাকে দিয়ে এস। তোমার বাবু হঠাৎ হিমালয়ে চলে গেলেন কেন ?"

"উনি মাঝে মাঝে ওই রকম চলে যান। আবার ফিরে আসবেন দিন কতক পরে।"

"উনি না থাকলে এখানকার খরচ-পত্র চলে কি করে ?"

"সে ব্যাঙ্কে সব বলা আছে। আমি গেলেই টাকা পাই। আর বাড়িভাড়া প্রতি মাসে বাড়িওলার কাছে চলে যায়। সেজন্যে কিছু আটকায় না।"

চিঠি নিয়ে চলে গেল প্রহ্লাদ। নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ভূষণ চক্রবর্তী। তারপর ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"মহার্ঘ শয্যাপরিবর্তন-চ্যুতৈঃ স্বকেশ পুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে
অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবল।

দামী বিছানায় পাশ ফিরবার সময় চুল থেকে যে ফুল খসে পড়ত তার স্পর্শেও যিনি কাতর হতেন সেই উমা এখন হাতে মাথা রেখে মাটিতে শুয়ে থাকেন, মাটিতেই বসে থাকেন।"

"কি বলছ ভূষণ কাকা ওসব!"

"কালিদাসের কুমার-সম্ভবে উমার তপস্যার যে বর্ণনা আছে তা এখন মনে পড়ল হঠাৎ। উমা অনেক তপস্যা করেছিল তাই মহাদেবকে পেয়েছিল। তোকেও করতে হবে। তোরা সবাই তো উমা—"

বর্ণনার কান এবং গালের খানিকটা লাল হয়ে উঠল। কথার মোড়টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল, "আমরা নতুন বাড়িতে কবে যাব?"

"আমি আর একটু জোর পাই। বাড়িটা পরিষ্কার করাই, সাজাই, তখন যাস। তোর বাবাকে এখন কিছু বলিস না যেন। তাকে একটা 'সারপ্রাইজ' দেব আমরা।"

"হ্যাঁ, সেই বেশ হবে।"

একটু পরেই প্রহ্লাদ এসে জিজ্ঞাসা করল, "উনি ছবিগুলোর কথা কিছু বলে গেছেন কি?"

"কোন্ ছবিগুলো?"

"উনি পাঁচখানা ছবি কিনে রেখে গেছেন পাশের ঘরে। সেগুলো কি ওখানেই থাকবে?"

"দেখি কি ছবি।"

পাশের ঘরে গিয়ে বর্ণনা ছবিগুলো দেখে অবাক হয়ে গেল।

তারপর সে ভূষণ কাকার কাছে শুনল দমদমের বাড়িভাড়া করার কাহিনী। তারও মনে হল এরকম লোক কি সম্ভব এ যুগে?

এ যে কল্পনাতীত!

আঠারো

আরও দিন দশেক ভুগে সড়কিও মারা গেল।

কান্নার রোল পড়ে গেল বাড়িতে। বাচস্পতি বালকের মতো লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। সীমন্তিনী মূর্ছা গেল। সরস্বতীর চোখ দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল নীরব অশ্রুধারা। সে সাধারণত নীরব প্রকৃতির, শোকেও নীরব রইল। স্থির প্রস্তরমূর্তিবৎ বসে রইলেন সত্যবতী, তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল নেই, মুখে একটি কথা নেই। বনস্পতিরও না। কাঁদতে পারলে সে খানিকটা হালকা হত। কিন্তু সে কিছুতেই কাঁদতে পারল না, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার সারা বুকটাকে মুচড়ে মুচড়ে দিতে লাগল কিন্তু সে কাঁদতে পারল না। মাথা হেঁট করে গলির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল শুধু।

বর্ণনা হতবাক হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হস্টেলে চলে গেল।

আরও দিন কয়েক পরে, শোকের তীব্রতাটা যখন কিছু কমেছে, তখন হেমন্তকুমার এসে হাজির হল হঠাৎ একটা রিক্‌শা টানতে টানতে। পরনে ছেঁড়া ময়লা হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট, মাথায় একটা পাগড়ি। গৈরিক নয়, ময়লা খাকি।

বাচস্পতির দিকে চেয়ে বলল, "তোমার উপদেশ শুনেছি বন্ধু। গেরুয়া জ্যোতিষ সব ছেড়ে দিয়েছি। একটা খাটালে রিক্‌শা টানা শিখছিলাম। এখন থেকে আমি রিক্‌শাই টানব।"

বাচস্পতির চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। তার বাকী চারটি সন্তানও আর বেঁচে নেই একথা শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল হেমন্ত। তারপর বলল, "মরে বেঁচেছে। বেঁচে থাকলে হয় বেশ্যা হত, না হয় জেলে যেত।"

সত্যবতী নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন, সত্যিই যেন তিনি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীর এই পরিবর্তনে তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। সমস্ত অনুভূতির অতীত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি যেন। তাঁর মুখে একটি ভাবই কেবল ফুটে ছিল, তিনি লজ্জিত, কুণ্ঠিত, অপ্রতিভ। তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল হেমন্ত।

তারপর বলল, "সব তো ফুরিয়ে গেল। এস আমার সঙ্গে—"

"কোথা যাব?"

"এস না।"

সত্যবতী যন্ত্রচালিতবৎ গিয়ে রিক্‌শাতে উঠে বসলেন।

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল সে হাজির হয়েছে ডাক্তার সামন্তর জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকের সামনে।

ডাক্তার সামন্ত তখন ক্লিনিকে ছিলেন।

সব শুনে বললেন, "খুবই দুঃখিত হলাম সত্যি। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে এই জিনিসই নানা আকারে রোজই দেখছি। সেই জন্যেই তো আমরা চেষ্টা করছি একটা প্ল্যান করে ছেলে-মেয়ে হোক—এদেশে আইডিআটা নতুন, কিন্তু ও ছাড়া বাঁচবার পথ নেই।"

হেমন্ত বলল, "আমরাও নতুন করে জীবন আরম্ভ করছি আবার। আপনি ব্যবস্থা করে দিন যাতে আর ছেলে-মেয়ে না হয়।"

"তা কেন। আপনার নতুন জীবনে নতুন মানুষ অমুক না আবার দু'একটা, এখন তো একটাও সন্তান নেই বলছেন। আবার নতুন সন্তান হোক। সে সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলুন এবার।"

"না, না, না। আর সন্তান চাই না। আমার মতো দরিদ্রের পিতা হবার যোগ্যতা নেই, এ লক্ষ্মীছাড়া সমাজে কোনও সন্তান মানুষ হবে না, মরুভূমিতে গাছ বাঁচে না। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন একটা, আমি নির্বংশই থাকব, আমার বংশে বাতি দিতে হবে না কাউকে। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।"

হঠাৎ ডাক্তার সামন্তের পা দুটো জড়িয়ে কাঁদতে লাগল সে।

উনিশ

দিন পনরো পরে একদিন বিকেল বেলায় ভূষণ চক্রবর্তী বনস্পতিকে দমদমের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে এলেন। বর্ণনা পরীক্ষা দিচ্ছিল, সে আসতে পারেনি। একটা ভালো বাড়ি পাওয়া গেছে শুনে বাচস্পতি আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু বললেন, "বসু আর বউমা খুব ভোরে উঠে কোথা যে চলে গেছে, বুঝতে পারছি না। বর্ণনা তো কদিন থেকে আসেনি, হস্টেলেই আছে। ওরা যে কোথা গেল বুঝতে পারছি না। কোলকাতায় নেই। কোলকাতায় থাকলে এতক্ষণ ফিরে আসত—"

ভূষণ চক্রবর্তী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বাড়িখানি সাজিয়ে গুছিয়ে অনেক আশা করে এসেছিলেন, কিন্তু এ কি হল!

বনস্পতি আর সরস্বতী দুজনেই হাঁটছিল। সুখপুরে ফিরে যাচ্ছিল তারা। কোলকাতায় আর তারা একদণ্ড থাকতে পারছিল না। কয়েকদিন আগে সাবু এসেছিল। সে খবর দিয়েছিল বুড়ির জঙ্গলে অনায়াসে বাস করা যেতে পারে। গৃহপতি যে ঘরটা করেছিলেন সেটা এখনও আছে। সেইখানে ফিরে যাচ্ছিল তারা। হেঁটে যাচ্ছিল কারণ তাদের কাছে একটিও পয়সা ছিল না। পয়সা চাইলেই অবশ্য পেত, কিন্তু চায়নি। তাদের আশঙ্কা ছিল শুনলে বাচস্পতি হয়তো যেতে দেবেন না।

খবর পেয়েই ভূষণ চক্রবর্তী গিয়ে হাজির হল সেখানে।

বুড়ির জঙ্গলে সে আগে কখনও যায়নি। গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিরাট অরণ্য। তার মাঝখানে বনস্পতি মহানন্দে ছবি এঁকে চলেছে।

"আমি আবার ফিরে এলাম—"

"আরে, ভূষণ না কি! আমি রোজই তোমার কথা ভাবি। যাক এসে গেছ বাঁচলাম—" দুজনে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হল।

বনস্পতি বললে, "আর তোমাকে কোথাও যেতে দেব না ভূষণ।"

ভূষণ চক্রবর্তী ছবিটার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে ছিলেন।

বনস্পতি বললে, "ওটার নাম দিয়েছি 'শিল্পী ও দারিদ্র্য রাক্ষসী'।"

একটা বিরাট কুৎসিত তাড়কার মতো রাক্ষসী। শিল্পী তার গায়ে মুখে পেটে বুকে নানারকম রং লাগাচ্ছে তুলি দিয়ে, আর রাক্ষসীটা খিল খিল করে হাসছে, বোধহয় তার কাতুকুতু লাগছে।

সরস্বতী এক বাটি ক্ষীর আর মুড়ি নিয়ে এল।

"সাবু একটা গাই ঠিক করে দিয়েছে। খুব মিষ্টি দুধ। তোমার চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, তুমি কিছুদিন খাওয়া-দাওয়া কর, ভাল করে খাও। আমি ততক্ষণ এটাতে রং দি—"

আবার তন্ময় হয়ে গেল সে ছবিতে।

সুখপুর-পত্রিকার একটি খবর।

"বনস্পতি সরস্বতী বুড়ির জঙ্গলে গিয়া বাস করিতেছে। সাবু বলিল সেখানে ভূষণ চক্রবর্তীও গিয়াছেন। বনস্পতি আজকাল রোজই নাকি ছবি আঁকিতেছে। আমিও সেখানে ফিরিয়া যাইতাম, কিন্তু হেমন্তকুমারকে এখানে একা ফেলিয়া যাইতে পারি না। তাহাকে বারবার বলিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে চল। গঙ্গার গতি পরিবর্তন হইয়াছে। আমাদের জমি আবার হয়তো উঠিবে। আবার হয়তো আমরা সুখের মুখ দেখিতে পাইব। কিন্তু সে বলে—'আমি এ মুখ আর সুখপুরে দেখাইতে পারিব না।' সে না গেলে আমি কি করিয়া ফিরিয়া যাই। মহা সমস্যায় পড়িয়াছি।"

কুড়ি

নবনী রায় আর ফেরেনি।

প্রায় মাস তিনেক পরে তার চিঠি এল একটা। বর্ণনাকে লিখেছে।

সুচরিতাসু,

আমি আর ফিরতে পারলাম না। পৃথিবী গোল, আবার কোনদিন কোথাও দেখা হবে হয়তো। একটা সুযোগ ঘটেছে, আপনি যদি রাজী হন তাহলে হয়তো দেখা

হবে। দিল্লীতে আপনার বান্ধবী আকাশ-পরী আর তাঁর স্বামী মেজর মুখার্জীর সঙ্গে আলাপ হল। দুজনেই চমৎকার লোক। তাঁদের খুব ইচ্ছে আপনার বাবার ছবিগুলোর একটা প্রদর্শনী করা। এজন্য তাঁরা দিল্লীতে একটা হলও ভাড়া করেছেন। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে ছবিগুলো নিয়ে চলে আসুন। শ্রীমতী আকাশ-পরীও হয়তো আপনাকে চিঠি লিখবেন। তাঁরই অনুরোধে এ চিঠি আপনাকে লিখছি। ভূষণবাবু এবং আপনাদের বাড়ির সকলে আশা করি ভালো আছেন। চিঠির উপরে যে ঠিকানা রয়েছে সেখানে আমি একমাস থাকব। প্রীতি ও নমস্কার নিন। ইতি—

ভবদীয়—নবনী রায়

আকাশ-পরীর চিঠি এল ছোট একটি কবিতায়।

রোহিত মৎস্য থাকে গভীর জলে
তাহারে ধরিতে হয় নানান ছলে।
ফেলেছি অনেক চার
দেরি করিও না আর
লইয়া ছবির জাল
এস গো চলে।

বর্ণনার ভয় ছিল ভূষণ কাকা তাকে ছবি নিয়ে যেতে দেবেন কিনা। কিন্তু নবনী রায়ের চিঠি দেখে তিনি আপত্তি করলেন না। বরং বললেন, "ভালই হয়েছে। তুমি চলে যাও তার কাছে।"

ছবিগুলো দমদমের বাড়িতে বন্ধ ছিল। ছবিগুলো নিয়ে বর্ণনা একদিন দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীযুক্ত সাত্যকি রায়ের জবানীতে যে কাহিনীটি আপনাদের শোনালাম সেটির পাণ্ডুলিপিটি আমি পেয়েছিলাম মিস্টার রায়ের কাছ থেকে। তিনি পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখে দিতে বলেছিলেন। এ-ও বলেছিলেন, যদি আমার ভাল লাগে আমি ওটা ব্যবহার করতে পারি। মিস্টার রায়ের আসল নাম কি আমি জানি না। একদিন ট্রেনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। গল্পটি ব্যবহার করতে গিয়ে দু'এক জায়গায় একটু আধটু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করলাম। একথা তাঁকে লেখাতে তিনি আমাকে নীলগিরি থেকে একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠিটি এই—

"আমার কোলকাতার বাসায় আমার পুরোনো ডায়েরিগুলো আছে। তার থেকে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় খবরগুলি পাবেন। আমার ঠিক মনে নেই। আপনাকে

খাটতে হবে একটু। এলোমেলো নানারকম খবরের মধ্যে ছড়ানো আছে ওগুলো। যে কোনও খবর আপনি ব্যবহার করতে পারেন। শুধু একটি অনুরোধ, আমার আসল নামটি কোথাও প্রকাশ করবেন না। মিস্টার রায় নামেই আমি চেনা-মহলে পরিচিত। আপনি মিস্টার রায় নামেই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি ঠিক পৌঁচেছে। আমার চাকর প্রহ্লাদ সস্ত্রীক কোলকাতার বাসায় থাকে। তাকেও চিঠি লিখে দিলাম। আপনি গেলে সে আপনাকে আমার পুরোনো ডায়েরিগুলো দেবে। আমার শেষ ডায়েরিটাও ওইখানে আছে। দরকার হলে ও বাড়িতে আপনি থাকতেও পারেন দু'চারদিন। কোন অসুবিধা হবে না। নমস্কার নিন। ইতি—

ভবদীয়—মিস্টার রায়

তাঁর ডায়েরিগুলো খুলে সবিস্ময়ে দেখলাম তাঁর পদবী রায় নয়, মুখোপাধ্যায়।

ডায়েরি ঘেঁটে অনেক নূতন খবর পেয়েছি এবং এই কাহিনীতে তা ব্যবহার করেছি। একটি খবর ব্যবহার করিনি সেটা এখন জানাচ্ছি আপনাদের। তাঁর শেষ ডায়েরিটিতে এক জায়গায় আছে—"একজনের অনুরোধে আজ থেকে একটা অব্যাপারে লিপ্ত হলাম। অনুরোধ এড়াবার উপায় ছিল না, কারণ, অনুরোধকারিণী আমার সদ্য-বিবাহিতা পত্নী। তার পারিবারিক কাহিনী অবলম্বন করে একটা উপন্যাস ফেঁদে বসেছি। কাহিনীতে তার নাম দিয়েছি যদিও বর্ণনা, কিন্তু তার আসল নাম অন্য এবং তা বর্ণনার ঠিক উল্‌টো। অর্থাৎ সে অবর্ণনীয়া। আমার একটা ভয় হচ্ছে কিন্তু। ছেলেবেলায় একটা সংস্কৃত গল্পে পড়েছিলাম এক বানর চেরা কাঠের গুঁড়ির ভিতরকার কীলক নিয়ে খেলা করতে গিয়ে মহা বিপদে পড়েছিল। আমারও সেই কীলোৎপাটীর বানরের দশা না হয়!"

ওরা সব পারে

মা

'শুচিতাকেই আমি প্রথম দেখেছিলাম, চৌরঙ্গীতে। আমিই তাকে উদ্ধার করেছিলাম জট-পাকানো জনতার ঝামেলা থেকে। প্রথমে মনে হয়েছিল কোনও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে বুঝি। তারপর মনে হয়েছিল কোনও সার্কাস গার্ল বোধহয়। সে সময় একটা সার্কাসও হচ্ছিল শহরে। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বলে একবারও মনে হয়নি। মনে হবার কথাও নয়। যে মেয়ের পরনে ব্রিচেস, যার মাথার চুল বব করা, যে মেয়ে একটা সায়েব সার্জেণ্টকে প্রকাশ্য দিবালোকে চড় মেরেছে সে যে সাধারণ একটা বাঙালী ঘরের ডাল-ভাত-চচ্চড়ি-খেকো মেয়ে তা ভাবতে পারিনি। তাছাড়া যাচ্ছিল সে একটা টকটকে লাল রঙের মোটর-বাইক করে। শুচিতা সুন্দরী। সুতরাং দৃশ্যটা মনোহর হয়েছিল বেশ। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টটি তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে দৃশ্যটা আর একটু উপভোগ করছিল মুচকি হাসতে হাসতে। একবার নাকি বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে একটু শিস দিয়ে বলেছিল, ও মাই লাভ্‌লি সুইটি। পরমুহূর্তেই কিন্তু তাকে উপলব্ধি করতে হয়েছিল যে সে গোখরো সাপের ল্যাজে পা দিয়েছে। শুচিতা তড়াক করে মোটর-বাইক থেকে নেবে লাফিয়ে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল তার কোঁচকানো চোখের ওপর। তারপরই হৈ হৈ, হল্লা, জনতা এবং ট্র্যাফিক জ্যাম। আমার গাড়িও আটকে পড়েছিল। স্টিয়ারিংটি ধরে বিরক্তমুখে চুপ করে বসেছিলাম, এমন সময় কানে এল—সাংঘাতিক মেয়ে বাবা, অমন জাঁদরেল সাহেবটাকে চড়িয়ে দিলে! কথাটা শুনে কৌতূহল হ'ল। গাড়িটি লক্‌ করে নেবে পড়লাম। ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি সার্জেণ্ট-পুঙ্গব ক্ষেপে গেছেন এবং মেয়েটিকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যাবার আয়োজন করছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে। সে তখন খুলে বলল কেন সে ওকে চড় মেরেছে। তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে অবাক হ'য়ে গেলাম। সার্জেণ্টকে তখন বললাম, আমি একজন অ্যাডভোকেট। মেয়েটি আমার আত্মীয়া। এ বলছে, তুমি ওকে অপমান করেছ বলেই ও তোমাকে কিঞ্চিৎ সহবৎ শিক্ষা দিয়েছে। তুমি যদি একে থানায় নিয়ে যাও তাহলে কিন্তু ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। আমরা সহজে ছেড়ে দেব না। এখানে অন্তত পঞ্চাশটা প্রত্যক্ষদর্শী লোক পাব যারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। তোমার পক্ষে খুব সুবিধের হবে না সেটা। আর ওকে যদি ছেড়ে দাও, তাহলে উই আর কুইট্‌স্, শোধবোধ হয়ে গেছে, আমরা আর কিছু বলব না। সার্জেণ্ট কয়েক সেকেণ্ড গুম্‌ হ'য়ে রইল, তারপর বলল, ওয়েল, গো অন। ভিড় থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার নাম কি ?"

"শুচিতা মুখোপাধ্যায়—"

"শুচিতা মুখোপাধ্যায় ? পরশুদিন কাগজে কি তোমারই ছবি বেরিয়েছিল ? হাইজাম্পে তুমিই ফার্স্ট হয়েছিলে কি ?"

সলজ্জ হেসে শুচিতা বললে, "হ্যাঁ। আপনি কে—"

"আমি হারানচন্দ্র ভৌমিক, অ্যাডভোকেট।"

"অনেক ধন্যবাদ। আপনি না এসে পড়লে লোকটা আমাকে বিপদে ফেলত।"

"খুব খুশী হয়েছি তোমাকে দেখে। জীবনে অন্যায়কে সহ্য কোরো না কখনও।" '

শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র ভৌমিক মশায়ের একটা বাতিক ছিল। তিনি প্রত্যহ শুতে যাবার আগে ডায়েরি লিখতেন। উক্ত ঘটনাটি তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। এ গল্পের অনেক উপকরণ আমি ভৌমিক মশায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। ভৌমিক মশায় বিজয় মল্লিকের উকিল। তাদের পারিবারিক অনেক খবর তিনি জানেন। গল্পের নায়িকা শুচিতার পরিচয় পেয়েই তিনি একটা গল্প লিখে আমাকে শোনাতে এসেছিলেন। লেখক হবার ইচ্ছে অনেকেরই মনে জাগে। হয়তো কোন কোন বাঘ-ভাল্লুকেরও ইচ্ছে হয় পাখী হবার। ভৌমিক মশায় কিন্তু উক্ত সার্জেণ্টঘটিত ব্যাপারটি নিয়ে যে রোমাণ্টিক গল্পটি ফেঁদেছিলেন তা কৌতুকজনক। সারগর্ভও। কারণ তাতে অবচেতন মনের অনেক বিস্তারিত খবর দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গল্পটি তেমন রসোত্তীর্ণ হয়নি। মনে হচ্ছিল কোনও খবরের কাগজের ঘটনার সঙ্গে তিনি জোরালো প্রবন্ধ জুড়ে দিয়েছেন একটা। একথা শুধু আমি নয়, তিনি বললেন, আরও দু'একজন বলেছেন তাঁকে।

আমার মন্তব্য শুনে তিনি বললেন, অল রাইট, তাহলে ওটাকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিচ্ছি। ও সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নেই। আপনি যদি পারেন লিখুন।

বলেছিলুম, চেষ্টা করব। তা দিতে হবে কিছুদিন।

ভৌমিক মশায় (সম্ভবত আমার কল্পনা বিহঙ্গমের পেটের নীচে ডিমগুলি ভাল করে সাজিয়ে দেবার জন্য) বললেন, ওই শুচিতা অদ্ভুত মেয়ে মশাই। ছোরা খেলতে পারে, বক্সিং করতে পারে, টেনিস দু'দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মোটর-বাইক রেসেও ফার্স্ট। অথচ ও কোন পুরুষকে আমোল দিয়েছে বলে শুনি নি আজও। ওর সঙ্গে প্রেম করবার তাগদ অবশ্য খুব কম বাঙালীর ছেলের আছে। বিজয় মল্লিকের ছেলে অজয়কে ওর সঙ্গে ওর মোটর বাইকের সাইড কারে মাঝে মাঝে দেখেছি। কিন্তু অজয় ছেলেটা কেমন যেন গুডি গুডি মেনিমুখো। শুচিতার প্রণয়ী হবার মতো ওর যোগ্যতা আছে বলে মনে হয় না। টু গুড্ এ বয়। ওর বাপ বিজয় মল্লিক অবশ্য তুখোড় প্রণয়ী একটি। ঘুঘু লোক। না, ভুল বললাম। পশু-পক্ষীর সঙ্গে ও লোকটির উপমা দেওয়া যায় না। কারণ পশু-পক্ষীরা তাদের পশু-প্রবৃত্তি বা পক্ষী-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে নিজেদের সহজাত সংস্কারের সাহায্যে। তার সঙ্গে অ্যাকোয়ার্ড কোনরকম কুসংস্কার মেশায় না।

কোনও বাঘ যে পথে যে সময়ে রোজ শিকার ধরতে বেরোয় সে পথে সে সময়ে যদি টিকটিকি ডাকে বা সন্ধ্যাটা যদি ত্র্যহস্পর্শ দূষিত হয় তাহলে বাঘ থামে না। কিন্তু বিজয় মল্লিক থেমে যাবে। ও বেশ্যাবাড়ি যাবার সময়ও পাঁজি দেখে যায়। ভেরি ইন্‌টারেস্টিং ক্যারেকটার। ওর জীবনের দু'চারটে বেশ মজার ঘটনা জানা আছে আমার। পরে বলব একদিন।

ভৌমিক মশায়ের কাছ থেকে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো ভাবে আমি শুচিতার, বিজয় মল্লিকের, শুচিতার মায়ের এবং আনুষঙ্গিক অনেক খবর শুনেছি।

সেই সব খবরের পলি পড়ে পড়ে আমার মনে এই কাহিনী যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার সঙ্গে সত্যিকারের খবরগুলোর হয়তো বাইরের চেহারার মিল নেই—ভৌমিক মশাই কাহিনীটি শুনে বলেছিলেন, এ যে আপনি একেবারে বদলে দিয়েছেন মশাই—কিন্তু উপকরণগুলির যথার্থ মূল্য আমি কোথাও কমাই নি। চরিত্র হিসেবে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে বিজয় মল্লিককে। অনেকে তাঁকে হয়তো দুরাত্মা মনে করবেন—লোকটা দুরাত্মাই—কিন্তু ওই ভৌমিক মশাই যা বলেছেন—ভারি ইন্‌টারেস্টিং।

কল্পনা করুন কোনও বাঘ কোনও মহিষীকে জখম করে যেই শুনল যে তার একটি সন্তান আছে অমনি তার মনে পড়ল গুরুদেবের কথা, বৎস, কোনও জননীকে নষ্ট কোরো না। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে মহিষীকে বলল, তোমার নধর চেহারা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম বটে, কিন্তু তখন জানতাম না যে তুমি সন্তানবতী। না জেনে যা করেছি তার তো আর চারা নেই, কিন্তু জানবার পর আর গুরুবাক্য অমান্য করতে পারি না, অতএব তুমি বাড়ি ফিরে যাও, তোমার যা ক্ষতি করেছি তার জন্যে খেসারত দিতে প্রস্তুত আছি। বাঘের এ রকম মতিগতি আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। কিন্তু উক্ত চতুষ্পদ শ্বাপদকে মনুষ্যে রূপান্তরিত করুন, দেখবেন সব খাপ খেয়ে যাবে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ওইখানেই, মানুষ সব পারে।

বিজয় মল্লিকের বাইরের চেহারাটি ভালো। ফরসা রং, টানা টানা চোখ, সুললিত দেহ, দেহের ব্যঞ্জনা শুধু সুঠাম নয়, বলিষ্ঠও। সুহাসিনীকে মুগ্ধ করবার মতো দেহ-সৌষ্ঠব যৌবনে সত্যিই ছিল বিজয় মল্লিকের। শুধু সুহাসিনীর নয়, অনেকেরই মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যৌবনকালে। বিজয় মল্লিকের বন্ধু এবং সুহাসিনীর দূর-সম্পর্কের ভাই বিশ্বপতি বলতেন, "বিজয় আসলে মদন, নর-দেহ-ধারণ করে মর্তে এসেছে রতিকে খুঁজতে। রতি নাকি স্বর্গ থেকে পালিয়ে এসে সিনেমায় নেবেছে। তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমার বন্ধু।" বিজয় মল্লিকের সামনেই এ সব কথা বলতেন বিশ্বপতি। কারণ আজকাল বন্ধু মানে হয় চাটুকার, না হয় স্বার্থসিদ্ধিদাতা গণেশ। বিশ্বপতি দুই-ই ছিলেন। বিজয় মল্লিক আর সুহাসিনীর সম্পর্কে আমার একটা ঐতিহাসিক

উপমাও মনে জাগে মাঝে মাঝে। সেলিম আর মেহেরুন্নিসা। প্রেমে পড়বার পূর্বে এদের দু'জনেরও বিয়ে হয়েছিল, মেহেরুন্নিসার মেয়েও ছিল একটা। অবশ্য সেলিম-মেহেরুন্নিসার ব্যাপারটা ঘটেছিল রাজকীয় পরিবেশে, তাই সম্ভবত শের আফগানকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। সুহাসিনীর বেলা ততটা হয় নি ; হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না।

গল্পটা গোড়া থেকেই বলি তাহলে।

বিজয় মল্লিকের কুলগুরু অতুলানন্দ (ওরফে অতুল চক্রবর্তী) সেদিন এসেছিলেন বিজয় মল্লিকের বাড়ীতে। বিজয় মল্লিক চিঠি লিখে আনিয়েছিলেন তাঁকে। সামান্য সামান্য ব্যাপারের জন্যও কুলগুরুকে ডেকে পাঠাতেন তিনি। প্রচুর দক্ষিণা এবং সিধে দিতেন বলে অতুলানন্দ আপত্তি করতেন না, খুশীই হতেন বরং। সঙ্গে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র মেধোকেও নিয়ে এসেছিলেন। মেধো তখনও মাধবানন্দ হয়নি। বড় বড় রাজাদের বংশে যেমন এক একটা প্রথা থাকে, মেধোদের বংশেও তেমনি একটা প্রথা বহুকাল থেকে চলে আসছিল, পিতা বর্তমানে কেউ নামের শেষে 'আনন্দ' জুড়তে পারবে না। কাউকে মন্ত্র দিতেও পারবে না। অতুলানন্দ মন্ত্র দিয়েছিলেন বিজয় মল্লিকের বাবা সঞ্জয় মল্লিককে। বিজয় মল্লিককে মন্ত্র দেননি তিনি। বিজয় মল্লিক জেয়ানো ছিল মেধোর জন্য। মেধোকে কিন্তু তিনি তাঁর সব শিষ্যের বাড়ি নিয়ে যেতেন। সম্ভবত ট্রেনিং দেবার জন্যে।

সেদিন অতুলানন্দ মেধোকে ডেকে বললেন, "বিজয় ইছাপুরের হাট থেকে লক্ষ্মীর সিন্দুকটা আনতে যাবে। একটা শুভলগ্ন দেখ তো। ও কালই যেতো, কিন্তু যাবার মুখে কে যেন পিছু ডাকল বলে আর গেল না। আজ দিন ভালো। বুদ্ধ পূর্ণিমা। দুপুরের পর অমৃতযোগ, মাহেন্দ্রযোগ, কখন আছে দেখ—"

পাঁজি খুলে মেধো বললে, "সারা বিকেলটাই অমৃতযোগ আছে। দুপুরে দেড়টা থেকে পৌনে তিনটে পর্যন্ত, তারপর আবার সাড়ে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত—"

"শুভকর্ম কি কি আছে—"

"অনেক আছে। দেব গৃহারম্ভ, দেব গৃহ-প্রবেশ, দেবতা প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা, শিব প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, ধান্যচ্ছেদন—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা আতরের শিশি হাতে করে প্রবেশ করলেন বিজয় মল্লিক।

"ঠাকুর, আপনার চাদরটা বাড়িয়ে দিন তো—একটু আতর লাগিয়ে দিই। ভাল আতর, খুব শুভলগ্নে কিনেছিলাম—"

"তুমি আতর-টাতরও শুভলগ্ন দেখে কেনো নাকি ?

"আমি পাঁজি ছাড়া এক পাও চলি না। চলবার মানে হয় না। পাঁজি হাতের কাছে থাকেই, একবার উল্টে দেখে নিতে ক্ষতি কি !"

"ঠিক, ঠিকই। কিন্তু তোমার মতো ধর্মে মতি ক'টা লোকের আছে বল এ যুগে।"

গেরুয়ার চাদরে আতর মেখে এবং আতরের তারিফ করে অতুলানন্দ বললেন,

"অতি চমৎকার। হবেই তো, একে গোলাপী আতর, তায় শুভলগ্নে কেনা। সোনায় সোহাগা হয়েছে। বাঃ, খুব খুশী হলাম। আমার বাবা বলতেন সমস্ত সুগন্ধ ফুলই শুভলগ্নে ফোটে। যেগুলোর শুভলগ্নে ফোটবার সুযোগ হয় না, সেগুলো ঝরে যায়।"

"তাই নাকি!"—অবাক হয়ে গেলেন বিজয় মল্লিক। তারপর বললেন, "ফুলের কথা জানতুম না, কিন্তু পাখীর কথা জানি। কুলগ্নে একবার একটা ভালো পাহাড়ী ময়না কিনেছিলুম। তখন অত ভাবিনি, কিন্তু কিছুদিন পরেই ফলটি ফলল। মাথায় টাক পড়তে লাগল পাখীটার। কত হলুদ জলে চান করানো, চন্দনের জলে চান করানো, কালোজিরের জলে চান করানো, কোনও ফল হল না, স্বস্ত্যেনও করালুম মধু পুরুতকে ডেকে, তাতেও কিছু হল না। অমন সুন্দর ময়না দেখতে দেখতে শকুনির মতো হয়ে গেল। পুরন্দর দিনরাত ওকে পড়াতো, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ নাম কিছুতেই ওর মুখ দিয়ে বার করতে পারল না। কিছুদিন পরে কাক ডাকতে আরম্ভ করলে। তারপর শালা শালা করতে লাগল। শেষকালে উড়িয়ে দিতে হল পাখীটাকে।"

অতুলানন্দ হাই তুলে তিনটি টুসকি মেরে বললেন, "হরি হে, সবই তোমারি ইচ্ছে। হ্যাঁ শোন, দিন দেখলুম, আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব প্রতিষ্ঠার পক্ষে খুবই শুভ দিন। দুপুরের পর দেড়টা থেকে পৌনে তিনটে পর্যন্ত, তারপর সাড়ে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত অমৃতযোগ আছে। আমার মনে হয় আজই তুমি দেড়টার সময় বেরিয়ে সিন্দুকটা নিয়ে এস। সিন্দুক কি পাঁচু মিস্ত্রি করছে?"

"হ্যাঁ, আজ তার হাটে নিয়ে আসবার কথা। আমার যদি পছন্দ না হয় হাটে বেচে দেবে—অবশ্য অত বড় সিন্দুক কিনবে কে সে-ও এক সমস্যা—"

"কত বড় সিন্দুক করতে দিয়েছ—"

"এক মানুষ উঁচু, মানে ছ' ফুট উঁচু, বারো ফুট লম্বা, ছ' ফুট চওড়া। সামনে একটা কারুকার্য করা কপাট থাকবে, আর সিন্দুকের ভিতর চন্দনকাঠের বেদী, তার উপর মা লক্ষ্মীকে বসানো হবে।"

"পেল্লয় কাণ্ড করেছ দেখছি। আগে যেমন ছোট সিন্দুক ছিল তেমনি একটা করালেই পারতে—"

"আমার বিশ্বাস ওতে মা লক্ষ্মী হাঁপিয়ে উঠতেন। তাই তাড়াতাড়ি ওটাতে ঘুণ ধরিয়ে দিলেন—"

"তা হ'তে পারে। মায়ের লীলাখেলার কি অন্ত আছে। ভালই করেছ, কিন্তু অত বড় সিন্দুক আনবে কি করে!"

"টুকরো টুকরো করে গরুর গাড়িতে আনতে হবে, গোটা আনা যাবে না। খুলে আনা অবশ্য শক্ত হবে না, সবই প্যাঁচের ওপর করতে বলেছি—"

"ও—"

বলা বাহুল্য প্রিয়বয়স্য বিশ্বপতিও বিজয় মল্লিকের সঙ্গে হাটে গেলেন। সে সময়

বিজয় মল্লিক আর বিশ্বপতি মাণিক-জোড়ের মতো ঘুরে বেড়াতেন। যে আঠায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে আঠাটাই সাংঘাতিক রকম জোরালো ছিল যে। মেয়েমানুষ। বিশ্বপতি ছিলেন সংগ্রাহক আর বিজয় মল্লিক ছিলেন ভোক্তা। এই ঘটকালি করেই বিশ্বপতি বিজয় মল্লিকের কাছ থেকে যা পেতেন তাতে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যেত তাঁর। সে ভোগের প্রসাদও যে বিশ্বপতি না পেতেন তা নয়। কিছুদিন বিশ্বপতি বেশ আরামেই ছিলেন বিজয় মল্লিকের কাছে। বিজয় মল্লিক যখন যাকে অনুগ্রহ করতেন তখন অকৃপণভাবেই করতেন।

সেদিন হাটে গিয়ে বিজয় মল্লিক আলমারি তো দেখলেনই, সুহাসিনীকেও দেখলেন। বস্তুত তাকে না দেখে উপায় ছিল না, সমস্ত হাট আলো করে বসেছিল সে একটা শাড়ির দোকানে। আপামর ভদ্র সবারই দৃষ্টি একবার না একবার পড়েছিল তার ওপর। শুধু দুধে-আলতা রং-ই নয়, অমন মুখ চোখের গড়ন, অমন মিষ্টি হাসি, অমন চোখের দৃষ্টি, অমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যের প্রকাশ সচরাচর দেখা যায় না তো। বিজয় মল্লিক এক নজর মাত্র দেখেছিলেন। হ্যাংলার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন নি। কিন্তু তিনি জহুরী লোক, এক নজর চেয়েই বুঝতে পেরেছিলেন এ নারী নারী-রত্ন। আপাতদৃষ্টিতে মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতো যদিও ও ডাঙার ওপর হাটের মাঝখানে বসে আছে, কিন্তু আসলে ও আছে গভীর সমুদ্রের অথৈ জলের তলায়। ওকে সংগ্রহ করতে হ'লে হয় সমুদ্র-মন্থন করতে হবে, না হয় সুদক্ষ ডুবুরি নাবাতে হবে। এ-ও মনে মনে ভাবলেন তিনি, বিশু এতদিন ক্যাওড়া বাগ্‌দির মেয়ে নিয়ে কারবার করেছে, ও কি একে বাগাতে পারবে। একটা উপমাও মনে এল তাঁর। সামান্য কাচের পুঁতি নিয়ে কেনা-বেচা করে যে, তাকে হীরে মুক্তোর কারবারে নাবানো সমীচীন হবে কি। তখনও তিনি জানতেন না যে সুহাসিনী বিশ্বপতির দূর-সম্পর্কের বোন। একটা নাটকীয় কাণ্ড কিন্তু করে বসলেন তিনি। যে কাপড়ের দোকানে সুহাসিনী বসে শাড়ি কিনছিল সেই কাপড়ের দোকানের মালিককে ইঙ্গিতে ডেকে তিনি বললেন, "ষষ্টিচরণ, তোমার দোকানে কত টাকার কাপড় আছে?"

"শ' তিনেক টাকার হবে। কেন বলুন তো?"

"তাহলে আর বিক্রি করো না তুমি। শাড়ি কাপড় যা আছে সব আমার বাড়িতেই পাঠিয়ে দাও। লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠার দিন অনেককে কাপড় দিতে হবে। তুমিও যেও সেদিন—"

"যে আজ্ঞে।"

ষষ্টিচরণ যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বিজয় মল্লিকের প্রজা সে। খাতকও। সুহাসিনীর দিকে ফিরে সে বলল, "মা ঠাকরুন, হুজুর তো আমার দোকানের সব কাপড়ই কিনে নিলেন, আপনি তাহলে বিপিন চৌধুরীর দোকান থেকে কিনুন, আমি বলে দিচ্ছি—"

বিজয় মল্লিক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "না, না—উনি যে ক'খানা শাড়ি নিতে চান নিন। বাকিগুলো আমার জন্তে রেখে দাও। আমার সঙ্গে এস তুমি।"

ষষ্টিচরণকে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে তিনি পকেট থেকে একশ টাকার নোট একখানা বার করে বললেন, "এইটে এখন রাখ। আর ওই মেয়েটি যে শাড়ি কিনবেন তার দাম নিও না। বোলো, বাবু দাম নিতে বারণ করেছেন। মা লক্ষ্মীর নামে যে কাপড় কেনা হয়েছে তা বিক্রি করা চলে না।"

"যে আজ্ঞে। কিন্তু যদি না নেন—"

"না নেন নেবেন না।"

বিজয় মল্লিক যে নারী-রত্নের একজন বড় জহুরী, একথা অবিদিত ছিল না ও অঞ্চলে। ষষ্টিচরণ তাই গোপনে একটু মুচকি হেসে আবার বললে, "যে আজ্ঞে।"

বিজয় মল্লিক ঘড়িটা বার করে সময়টা টুকে নিলেন তাঁর পকেট বুকে।

বিশ্বপতি সিন্দুকটা বোঝাই করাচ্ছিল গরুর গাড়িতে। বিজয় মল্লিক এসে বললেন, "বিশু, ষষ্টিচরণের দোকানের কাপড়গুলো কিনেছি। ওগুলোও নিয়ে যেতে হবে। আর একটা গাড়ি ভাড়া কর না হয়। জিনিসপত্র নিয়ে তুমি সোজা বাড়ি চলে যাও। আমি জিরে গাঁয়ে যাচ্ছি, সেখান থেকে বাড়ি যাব।"

"জিরে গাঁয়ে কেন? হরু ঠাকুরের কাছে?"

"হ্যাঁ।"

হরু ঠাকুর জ্যোতিষী। বেশ বড় জ্যোতিষী। ইতিপূর্বে বিজয় মল্লিকের অনেক অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি। অনেক উত্তর হুবহু মিলে গেছে। তাই বিজয় মল্লিকের খুব বিশ্বাস তাঁর উপর। বিজয় মল্লিক দক্ষিণাও ভাল দেন। তাই তিনি এলে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন দরিদ্র হরু ঠাকুর। সেদিনও হলেন।

"আসুন আসুন বিজয়বাবু। খবর সব ভালো তো?"

"ভালই। আপনি ভালো আছেন?"

"আমাদের আর ভালো-মন্দ। দিন চলে যাচ্ছে কোন রকমে। আপনাদের অনুগ্রহই আমাদের সম্বল। বসুন, কোন প্রয়োজন আছে নাকি? না এমনিই এসেছেন?"

"হাটে এসেছিলাম। লক্ষ্মীর জন্যে সিন্দুক কিনতে। হাটে ঘুরতে ঘুরতে মনে একটা বাসনা জেগেছে, সে বাসনা পূর্ণ হবে কিনা তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি—"

হরু পণ্ডিত সামনের দেওয়ালের কুলুঙ্গির দিকে চাইলেন। সেখানে ঘড়ি ছিল একটা। সময়টা টুকে নিলেন।

"আমার মনে যখন বাসনাটা জাগে তখন আমিও ঘড়ি দেখে সময়টা টুকে রেখেছিলাম।"

"ও, তাহলে তো পাকা কাজ করেছেন। কই দেখি।"

বিজয় মল্লিক নোটবুকটা এগিয়ে দিলেন। সেটাও টুকে নিয়ে হরু ঠাকুর বললেন, "বাসনটা কি জাতীয় তা জানতে পারি কি?"

"জানাটা কি নিতান্তই দরকার?"

"জানলে সুবিধে হয়।"

হাস্যদীপ্ত দুই চক্ষু হরু ঠাকুরের মুখের উপর স্থাপিত করে বিজয় মল্লিক বললেন, "নারীঘটিত।"

আরও হাস্যপ্রদীপ্ত হ'ল হরু ঠাকুরের চোখ।

"বসুন, বসুন। একটু ভালো করে দেখতে হবে তাহলে। ওই মোড়াতেই বসুন। আমাদের গরীবের ঘরে আপনাদের মতো লোকের উপযুক্ত আসন তো নেই। ওতেই কষ্ট করে বসুন একটু। বেশী দেরি হবে না আমার।"

"না না, কোন কষ্ট হবে না আমার। বেশ বসেছি।"

বিজয় মল্লিক মোড়াতে উপবেশন করলেন। হরু ঠাকুর পাঁজি দেখে একটি ছক কাটলেন এবং তার উপরই নিবদ্ধ-দৃষ্টি হয়ে বসে রইলেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে। বিজয় মল্লিকের ভ্রূও কুঞ্চিত হ'তে লাগল ক্রমশ। একটু পরে হরু ঠাকুরের নীচের ঠোঁটটাও কামড়াতে হ'ল। ঠোঁট কামড়েই বসে রইলেন তিনি মিনিট খানেক। তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কলমটা তুলে বললেন, "বাসনা পূর্ণ হবে। মিলন হবে আপনাদের! কিন্তু মিলনের ফল হবে মিশ্রিত। সুখ দুঃখ দুই-ই পেতে হবে এজন্যে। শুক্রের সঙ্গে কেতুটা জুটেছে কিনা।"

"মিলনের ফল যে সুখ দুঃখ দুই-ই, তা তো যে কোন নবেল পড়লেই বোঝা যায়। আপনার বৈষ্ণব পদাবলীতেও আছে।"

"আছে। বড় উচ্চাঙ্গের দামী কথা বলেছেন আপনি। শুনে খুব সুখী হলাম।"

বিজয় মল্লিক পঁচিশটি টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন হরু ঠাকুরকে।

তার পরদিন বিজয় মল্লিককে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হ'ল। আঘাত ঠিক যে এইভাবে আসবে তা তিনি প্রত্যাশা করেন নি। বিশ্বপতি একটি ছোট পুলিন্দা বগলে করে তাঁর কাছে এলেন। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, "এই নাও—"

"কি?"

"সুহাসিনী তোমার কাপড় ফিরিয়ে দিয়েছে—"

"সুহাসিনী কে!"

"যাকে তুমি ষষ্ঠিচরণের দোকানে কাল দেখেছিলে। সে তোমার উপহার নেয়নি।"

কথাটা শুনে মনে মনে একটু ধাক্কা খেলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করলেন না বিজয় মল্লিক। বরং হাসিমুখে বললেন, "তোমার সঙ্গে তার দেখা হ'ল কোথা? ভাব আছে নাকি?"

"ও আমার বোন হয়।"

"বোন! কি রকম বোন?"

"দূর-সম্পর্কের অবশ্য। আমার ছোটমাসির জায়ের মেয়ে।"

"তোমার ছোটমাসির জা এখানে থাকেন নাকি?"

"থাকেন না। বেড়াতে এসেছেন ননদের বাড়ি। নগেন মাস্টার ওর ভগ্নিপতি—"

"ও, আমাদের নগা?"

"হ্যাঁ।"

শুনে গুম হয়ে রইলেন বিজয় মল্লিক।

তারপর বললেন, "কাপড়গুলো তুমিই নিয়ে যাও তাহলে। কোনও কাজে লাগিয়ে দিও। ও আর আমি ফিরে নিয়ে কি করব।"

বিশ্বপতি মনে মনে খুশী হলেন কিন্তু বাইরে বললেন, "নেওয়াটা কি ঠিক হবে? অবশ্য তোমারই খাচ্ছি পরছি, কিন্তু এগুলো একটি বিশেষ লোকের জন্যে কিনেছিলে তুমি, সে যদি টের পায়—"

"পেলেই বা! এক রকমের কাপড় হাজার হাজার জোড়া তৈরি হচ্ছে আজকাল। তোমার পছন্দ আর তার পছন্দ যদি এক রকমই হয় তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে। না না, ওগুলো তুমিই নিয়ে যাও। এখনি যেও না, বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

অ্যাড্‌ভোকেট হারানচন্দ্র ভৌমিক মশায়ের কাছ থেকে সুহাসিনীর কয়েকটি চিঠি আমি পেয়েছিলাম। সেইগুলিই হুবহু টুকে দিচ্ছি। চিঠিগুলি থেকেই বুঝতে পারা যাবে ঘটনাগুলো কি ভাবে ঘটেছিল। সুহাসিনীর সঙ্গে বিজয় মল্লিকের যখন মোকদ্দমা বাধবার উপক্রম হয় তখন বিজয় মল্লিকের উকিল হিসেবে তিনি মধ্যস্থতা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় সুহাসিনী ভৌমিক মশায়কে এই চিঠিগুলি লিখেছিল। চিঠি পড়ে মনে হয় সুহাসিনীর লেখবার ক্ষমতাও কম নয়।

প্রথম চিঠি

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনি জানিয়েছেন আপনাকে সব কথা খুলে লিখতে। খুলে লেখবার চেষ্টা করব। কিন্তু কলঙ্কের কথা সব কি খুলে লেখা যায়? তবে যা লেখা যাবে না তার কাহিনী আপনার অবিদিত নয়, অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ঘরেই বুকের রক্ত দিয়ে এই কাহিনী লিখছে মেয়েরা। তা আপনার চোখেও নিশ্চয় পড়েছে, আপনার অনেক অভাগিনী মক্কেলের কাছেও এসব কথা নিশ্চয় শুনেছেন। আমাদের এই মর্মন্তুদ লজ্জার কাহিনীর কথা খবরের কাগজে রোজ বেরোয়, সমাজের ভদ্র নর-নারীরা তা পড়ে। কেউ গালে হাত দেয়, কেউ মুখ টিপে হাসে, কেউ টিট্‌কারি দেয়, কেউ বক্তৃতা দেয়।

কারো মনে সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা জাগে, কেউ পতিতা নারীদের নিয়ে কেচ্ছা লেখেন, কারও বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগে, কেউ কেউ আবার সমবেদনায় গলে পড়েন।

মেয়েরা কেন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় সে গবেষণা আপনারা করুন, সে ক্ষমতা আমার নেই। সব মেয়ের মনের কথাও আমি জানি না। নিজের কথাই বলতে পারি। কিন্তু নিজের কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে নিজের কথাই কি সব জানি! যে সুহাসিনী মোহে অন্ধ হ'য়ে গৃহত্যাগ করেছিল তার হয়তো সেই মুহূর্তেই মৃত্যুও হয়েছিল। পরমুহূর্তে যে সুহাসিনীর জন্ম হয়েছিল সে অন্য লোক। এই জন্মেই অনেকবার জন্ম আর মৃত্যু হয়েছে আমার। তাই সব কথা স্পষ্টভাবে মনে নেই। যতটুকু মনে আছে তাই বলবারই চেষ্টা করব। কয়েকটা জিনিস মনে দাগ কেটে বসে গেছে, সেই কথাই আগে বলব। প্রথম হচ্ছে দারিদ্র্য, নিদারুণ দারিদ্র্য। সমাজের সকলের কাছে দু'হাত পেতে হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত আমাদের। বাবা ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন। দু'বিঘে ধেনো জমি ছিল, কিন্তু তার খাজনা দেওয়ারও সামর্থ্য ছিল না আমাদের। ওই যে বললুম, সকলের কাছে হ্যাংলার মতো দু'হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। সাধারণত পয়সা আধলাই জুটত, কিন্তু সেই পয়সা আধলার ভিড়ে যখন চকচকে একটা টাকা পড়ে গেল একদিন, তখন মাথা ঘুরে গিয়েছিল বই কি! আমার চেয়ে বেশি ঘুরে গিয়েছিল মায়ের। একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না। আমাদের দেশের গরীব অবিবাহিতা মেয়েদের মায়েরা যখন লক্ষ্য করেন যে কোনও ধনীর দুলালের দৃষ্টি তাঁর কুমারী মেয়েটির উপর পড়েছে, তখন রাগ না করে তাঁরা অনেক সময় খুশীই হন। এটা যেন তাঁর মেয়ের একটা বিশেষ কৃতিত্ব বলে গণ্য করেন। আর ধনীর দুলালটি পালটি ঘরের হ'লে তো কথাই নেই, হামড়ে পড়েন একেবারে। বিজয় মল্লিক আমাদের পালটি ঘর। ওদের মল্লিক উপাধিটা মুসলমানী নবাবদের দেওয়া। আসলে ওরা বাঁড়ুয্যে। মায়ের মাথা সুতরাং ঘুরে গেল। তিনি ভুলে গেলেন যে বিজয় মল্লিকের বিয়ে হয়েছে, ছেলেও হয়েছে। ঠিক ভুলে যান নি, কিন্তু ওটাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। একাধিক বিয়ে সেকালে কে না করত, বিশেষত বড়লোকেরা। আমি যদি বেঁকে না দাড়াতুম তাহলে হয়তো ওই সতীনের উপরই মা বিজয়বাবুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতেন আমার। টাকার গন্ধ পেলে অনেক মেয়ের মায়েদেরই মাথা ঘুরে যায়। বড়লোক মায়েদেরই যায়, আমার মা তো গরীব ছিলেন। কিন্তু এখন এ-ও আমার মনে হয়, বিয়ে যদি হয়ে যেত ভালই হ'ত একরকম। সতীন নিয়ে খুঁত-খুঁত করাটা একটা রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সমাজে। কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে ও জিনিসটা মেনে নেওয়াই উচিত। একাধিক নারীসঙ্গ লাভ করবার জন্যে পুরুষেরা উন্মুখ হয়ে থাকবেই। সেকালের রামায়ণ মহাভারত আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি অমর গ্রন্থে এর অজস্র উদাহরণ। ইতিহাসের পাতাতেও উদাহরণের অভাব নেই। পুরুষরা লোভী, শিশুর মতো লোভী, এ কথাটা মেনে নেওয়াই ভালো।

মেনে নিয়ে ওদের ওই মনোবৃত্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেই বরং জীবনে খানিকটা সুখের আশা করা যায়। স্বামীদের একনিষ্ঠতা দাবী করার মূলে আছে নিজেদের অহঙ্কার এ কথা তো একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আমি হেন রূপসী বা আমি হেন গুণবতীর দিকে একদৃষ্টে সারা জীবন চেয়ে না থেকে ও-লোকটা অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে এত বড় স্পর্ধা!—এই তো হ'ল আমাদের সত্যিকার মনোভাব। এ মনোভাব যে প্রশংসনীয় নয়, তা সবাই বলবে। কিন্তু একটা কথা কি জানেন ভৌমিক মশাই, এই অহঙ্কারটুকু নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি। ওইটুকুই তো আমাদের একমাত্র সম্বল, ওই অহঙ্কারটুকু আঁকড়ে আছি বলেই তো জীবনের স্বাদ পাই। যাঁরা তৃণের মতো সুনীচ এবং তরুর মতো সহিষ্ণু হবার উপদেশ দেন তাঁরা মহাজ্ঞানী মহাজন, কিন্তু তাঁরা যে-অমৃতের আস্বাদ পেয়ে ওকথা বলতে পেরেছেন সে-অমৃতের আভাষও তো নেই আমাদের জীবনে। আমাদের পাড়ার মিঠুয়া মেথরের কথা মনে পড়ল। লোকটা এদিকে খুব ভালো ছিল। কিন্তু তার প্রধান দোষ কি ছিল জানেন? রোজ বিকেলে মদ খেয়ে খানিকক্ষণ মাতলামি করত, তারপর পড়ে থাকত নর্দমায়। বিশ্বপতিদাদা তখন খদ্দরের লংকোট আর মাথায় গান্ধিটুপি পরে মদের দোকানে পিকেটিং করতেন। মিঠুয়াকে মদ ছাড়তে বলায় সে বলেছিল, মদ ছাড়লে কি নিয়ে থাকব বাবু। আপনাদের গান্ধিজী আছেন, ভলান্টিয়ার-দিদিরা আছেন, মিটিন্ আছেন, বক্তৃতা আছেন, আপনারা তাই নিয়ে সময় কাটাতে পারেন, কিন্তু আমাদের সন্ধেবেলা ওই মদটুকু ছাড়া আর কি আছে বলুন। ওটুকুও যদি কেড়ে নেন কি নিয়ে থাকব আমরা। আমাদেরও ওই অহঙ্কারটুকুই সম্বল। অহঙ্কার জিনিসটা খারাপ জানি, কিন্তু ওছাড়া আমাদের যে আর কিছু নেই। আমাদের মনের কথা রবীন্দ্রনাথ বলে দিয়েছেন তাঁর মালঞ্চ গল্পে নীরজার মুখ দিয়ে—'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না'—'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব। পালা পালা পালা এখুনি।' কবি কিনা তাই তাঁর দৃষ্টিতে সত্যটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা' যাঁরা আওড়ান তাঁদের দৃষ্টি অনেক সময় স্বচ্ছ নয়। তাঁদেরও ধরণধারন অনেকটা মদের দোকানে যারা পিকেটিং করে তাদের মতো। বিশ্বপতির স্বরূপ পরে টের পেয়েছি, সে যে শুধু মদ খায় তা নয়, জেনেছি মদের আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলিতেও সে বেশ সুদক্ষ, ওর তুলনায় মিঠুয়া দেবতা। শ্লোক-আওড়ানো পণ্ডিতদের মধ্যেও অহঙ্কারের যে নমুনা দেখেছি তার তুলনায় আমাদের অহঙ্কার গোখরোর কাছে হেলে।

যাই হোক, ওই অহঙ্কারের জোরেই আমি সেদিন অমন সুন্দর শাড়িগুলো ফেরত দিতে পেরেছিলুম। শাড়ি ফেরত দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন ওঁর কাছে। বিশুদাই শাড়িগুলো নিয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। সেদিন হাটে আমার জন্যেই যে মল্লিক মশাই শাড়ির সমস্ত দোকানটাই কিনে ফেলেছিলেন একথাও বিশুদা আমাকে

বলতে ভোলেন নি। তবু আমি ফেরত দিয়েছিলুম, অন্তরালবর্তিনী একজন সতীন ছিল বলে। শুনেছি তিনি ভালো লোক ছিলেন। কিন্তু হলে কি হবে? সতীন তো কাঁটা। বেলগাছের কাঁটাও কাঁটা, গোলাপ গাছের কাঁটাও কাঁটা। দুই-ই সমান বেঁধে। কিন্তু একটা কথা অকপটে আপনাকে বলব ভৌমিক মশাই। আপনি যখন আমাদের মধ্যে মিটমাট করে দেবার জন্যে মধ্যস্থতা করছেন তখন কোনও কথা গোপন করাও উচিত নয়। সেদিন আমি সতীনের কাঁটাটা এড়িয়েছিলুম বটে, কিন্তু আর একটা কাঁটা এড়াতে পারিনি। সেটা তীরের মতো এসে সোজা বুকের মাঝখানে বিঁধেছিল। আজও বিঁধে আছে। মল্লিক মশাইকে প্রথম দর্শনেই আমি ভালোবেসেছিলুম, আজও বাসি। আজ এই পর্যন্ত থাক। এখন আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। পরের চিঠিতে আবার খানিকটা লিখব। তবে একটা কথা বলে রাখছি। আপনি মিটমাট করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু মিটবে না। মানে মন থেকে মিটবে না। মন ভেঙে গেলে সে মন আর জোড়া যায় না। বাইরে থেকে আপনি মেরামত করবার চেষ্টা করছেন সামাজিক শোভনতা রক্ষা করবার জন্য। সেটা হয়তো হবে। আমি সাহায্যও করব। কিন্তু আসল ভাঙনটা থেকেই যাবে তালির আড়ালে। আজ থামলুম। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণতা
সুহাসিনী

দ্বিতীয় চিঠি

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনাকে আগের চিঠিতে কতদূর পর্যন্ত লিখেছিলুম মনে নেই। বিয়ের কথা লিখেছিলুম কি? বোধহয় লিখিনি। বিয়ে আমার হয়েছিল। আজকালই দেখি প্রাপ্ত-বয়স্কা মেয়েদের বিয়ে হয় না, শহরে গিয়ে তারা ভদ্রভাবে উপার্জনেরও চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের কালে তা হবার উপায় ছিল না। বিশেষত পাড়াগাঁয়ে। এখনও পাড়াগাঁয়ে অনেকটা সেই অবস্থা আছে। মেয়ের কৈশোর পার হলেই সামাল সামাল রব পড়ে যায় সেখানে। তাকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত সমস্ত হিতৈষীরা শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে চণ্ডী-মণ্ডপের দাওয়ায় বসে থাকেন কপাল কুঁচকে। আজকাল সব মেয়েদের ভিড় তাই শহরে! সেখানে হিতৈষীদের সংখ্যা কম, কেউ কাউকে চেনেও না বিশেষ। সবাই নিজেদের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত। তাই সেখানে মেয়েরা নিজের নিজের যাহোক একটা হিল্লে করে নেয়। যারা পাড়াগাঁ ছেড়ে পালাতে পারে না, তারা মা-বাপের মনে দুশ্চিন্তার তুষানল জেলে আর হিতৈষীবর্গের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে ওই আঁস্তাকুড়েই পড়ে থাকে যতক্ষণ না কোন কৃপাময় দয়া করে উদ্ধার করেন তাদের। এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা কথাটা প্রচলিত আছে। কিন্তু কথাটা হওয়া উচিত 'সাফ করা'। আবর্জনার মতো

আমরা। যিনি আমাদের একটা আঁস্তাকুড় থেকে তুলে আর একটা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেন তিনি দয়াময় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁকে মেথর না বলে আমাদের সমাজে বর বলা হয়। কন্যা বরয়তে রূপম্—সংস্কৃত শ্লোকে আছে। কিন্তু আমি যা বরণ করেছিলাম তার তুলনা একমাত্র আমাদের দেশেই মেলে। বাঁ গালের নীচে বড় আব একটা, পিঠে কুঁজ, চলতে গেলে বাঁ দিকে হেলে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন। রংটা অবশ্য ফরসা ছিল। কিন্তু ভগবান সঙ্গতি রক্ষা করবার জন্যেই তাঁর মুখে বুকে কপালে কি একটা চর্মরোগ দিয়েছিলেন, আর সেটা সারাবার জন্যে তিনি আলকাতরা দিয়ে তৈরি কি একটা মলম সারা মুখে বুকে মেখে বসে থাকতেন। চর্মরোগ তাঁর সারেনি, মলমও তিনি সারা জীবন ছাড়েন নি। শুভদৃষ্টির সময় তাঁর গালে কপালে ওই মলম দেখেছিলুম। শুনেছি তাঁর ভাগে চিতায় যখন তাঁর মুখাগ্নি করে তখনও ওই মলম ছিল। আমি অবশ্য সে দৃশ্য দেখিনি। কাশীতে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয়েছিল। আমি তখন গ্রামের বাড়িতে তাঁর ঘর-দোর আর গাই সামলাচ্ছিলুম। এতক্ষণ স্বামী-নিন্দা করলুম, কিন্তু তাঁর ভালো দিকও একটা ছিল বই কি। প্রচণ্ড বিদ্বান লোক ছিলেন না কি। টোলের অনেকগুলো 'তীর্থ'ই পার হয়েছিলেন, 'রত্ন' এবং 'অলঙ্কার'ও ছিলেন দুটো একটা বিষয়ে। কিন্তু তাঁর বিদ্যার গভীরতা মাপবার সামর্থ্য আমার ছিল না। আমি পাড়াগাঁয়ের পাঠশালায়-পড়া মুখ্যু মেয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অবশ্য পড়েছিলুম লুকিয়ে লুকিয়ে বিশুদার কাছ থেকে। মল্লিক মশায়ের লাইব্রেরী থেকে বিশুদা আনতেন সে সব। মল্লিক মশায়ের সব রকম বই কেনার বাতিক ছিল। তাঁর নিজের ঝোঁক ছিল অবশ্য ডিটেক্‌টিভ নভেলের দিকে। হাত-দেখার বই, নেপোলিয়নের বুক অফ ফেট, ভূতের গল্প এ সবও খুব পড়তেন। আর এক রকম বইও পড়তেন যাকে আপনারা বলেন পর্ণোগ্রাফি। তিনি কিনতেন কিন্তু সব রকম বই। নামজাদা নভেল তো কিনতেনই, কিন্তু কবিতার বই, দর্শনের বই, এমন কি বিজ্ঞানের বইও তাঁর লাইব্রেরীতে অনেক ছিল। এখনও আছে বোধ হয়। বড়লোকেরা আসবাব হিসেবেই অনেক সময় ভালো-বাঁধানো বই দামী দামী আলমারীতে সাজিয়ে রাখতে ভালোবাসেন তো। হ্যাঁ, আমার স্বামীর কথা বলছিলুম কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েছি। আমার স্বামী ভালো লোক ছিলেন কি মন্দ লোক ছিলেন তা আমি আজও জানি না, যেমন জানি না পাথরের তৈরী ঠাকুর ভালো না মন্দ। পাথরের তৈরী ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়েও অনেকে তাঁকে বিচলিত করতে পারেন না। একজন ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণ তা না পেরে কালাপাহাড় হয়েছিলেন। আমার স্বামীর পায়ে প্রকাশ্যত অবশ্য আমি মাথা খুঁড়িনি কখনও, যিনি আমাকে দয়া করে বংশরক্ষা করবার জন্যে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছেন, তাঁর প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা আমার এতটুকুও হয়নি। আরও একটা কারণ ছিল। যে সতীনের জন্যে আমি মল্লিক মশাইকে আমল দিইনি, বিয়ের পর শুনলুম সেই সতীন এখানেও বর্তমান। অবশ্য ইহলোকে নয়, পরলোকে।

উনি প্রথম যৌবনে একটি বিয়ে করেছিলেন। সে স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় না কি আত্মহত্যা করেছিল বছর পাঁচেক পরে। তারপর উনি স্থির করেছিলেন আর বিয়ে করবেন না। মনে বৈরাগ্য এসেছিল। কিন্তু বুড়ো বয়সে শাস্ত্র পাঠ করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল বংশরক্ষার ব্যবস্থা না করে যাওয়াটা অনুচিত হচ্ছে। পুন্নম-নরক-বাস ঘটবে হয়তো। পিণ্ডের ব্যবস্থা না করলে বৈতরণী পার হবার অনুমতিই হয়তো মিলবে না। অন্ধকার অনিশ্চিত বৈতরণী তীরের সম্ভাব্য দুর্দশার কথা ভেবেই তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে আর একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাগ্নে সংকীর্তনও (আমরা তাকে সংক্ষেপে সং বলতুম) এ বিষয়ে উৎসাহ দিলে তাঁকে। বললে সে-ই যোগাযোগ ঘটাবে। এই সংকীর্তন আমাদের গ্রামেই প্রায় থাকত। ওর কে যেন একজন বউদিদি ছিল চাটুজ্যে পাড়ায়। আমাদের বাড়ির আশে পাশেই ঘোরাফেরা করত ছোঁড়াটা। আর এ ধরনের ছোঁড়ার যে রকম মতি-গতি প্রত্যাশিত তা-ও তার ছিল। সামনে পড়ে গেলেই বাঁ চোখটা কুঁচকে মুচকি হেসে প্রায়ই কিছু একটা বলবার চেষ্টা করত। বলবার সুযোগ অবশ্য কখনও দিইনি আমি, কিন্তু বক্তব্যটা অস্পষ্ট থাকত না। যখন পথে-ঘাটে আমার দেখা পেত না তখন আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে শিস দিত। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী তো সকলের হাতে থাকে না, আর তখন আমার মনোভাব শ্রীরাধার মতোও হয়নি, তাই সংকে কিছুদিন পরে নিঃসংশয় হ'তে হ'ল যে সোজা পথে আমাকে পাবার কোনও আশাই তার নেই। কিন্তু পৃথিবীতে বাঁকা পথও আছে। তখন আন্দাজও করতে পারিনি যে সেই পথে এসে সং আমার সংসর্গ লাভ করবার চেষ্টা করবে। দিনকতক পরে লক্ষ্য করলুম সং উধাও হয়েছে। মাস তিনেক তার কোনও সাড়াশব্দ পেলুম না। ভাবলুম আপদ গেছে, বাঁচা গেল। কিন্তু আমাদের দেশে রূপযৌবনসম্পন্না কোনও মেয়ের আপদ সহজে কাটতে চায় কি, বিশেষত তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার মতো শক্ত সমর্থ বাপ মা যদি তার না থাকে ? আমার বাবা বহুদিন আগে মারা গিয়েছিলেন। আর মা ছিলেন অশিক্ষিতা, অসমর্থা, কুসংস্কারাচ্ছন্না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কি করে আমার একটা 'গতি' হয়, তা সে সুগতি দুর্গতি যাই হোক। তাই কেউ আমার প্রতি একটু সুনজর দিলে মা শঙ্কিত না হয়ে আনন্দিত হ'য়ে পড়তেন। তাই সং চলে যাবার পর যখন চৌধুরী বাড়ির সদ্য বি.-এ. পাস-করা একটা ছোঁড়া একদিন পুকুরঘাটে আমার হাত ধরে টানাটানি করল এবং আমি সেটা যখন মাকে বললুম মা তার প্রতিবাদ তো করলেনই না বরং খুশী হলেন। তিনি কি করলেন জানেন ? ওই চৌধুরী বাড়ি গিয়ে একে তাকে ধরে চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে আমার ওই অসভ্য ছোঁড়াটার সঙ্গে বিয়ে হয়। আমি ঠিক নিজের চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি তিনি না কি ওই ছেলের মায়ের পা পর্যন্ত জড়িয়ে ধরেছিলেন। ব্যাপারটা যুগপৎ করুণ এবং হাস্যকর, অনেকে হেসেও ছিল, কিন্তু চোখের জল কেউ ফেলেনি ! আমাদের দুঃখে চোখের জল ফেলবার লোক বেশী নেই এদেশে।

অনাথবাবুর বাড়ির লোকেরা মায়ের এই স্পর্ধা দেখে হেসে উঠেছিলেন শুনেছি। এই সময়ই একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে আপনাকে। এই সব কারণেই ছেলেবেলা থেকে ঐশ্বর্য সম্বন্ধে একটা মোহ জেগেছিল মনে। ভেবেছিলুম এ যুগে অর্থই পরমার্থ, ওটা প্রচুর পরিমাণে হাতে থাকলে কোথাও কিছুতে আটকায় না, জীবনের চাকা গড়গড় করে চলে যায়। তাই ছেলেবেলা থেকে একটি জিনিসই কামনা করেছিলুম—যেন আমার অনেক টাকা হয়। ভগবানকে চাইনি, টাকা চেয়েছিলুম। যার যেমন ভাবনা তার সিদ্ধিও তেমনি হয়, টাকা পেয়েছিলুম জীবনে, কিন্তু একটু তির্যক পথে। আমার বিশ্বাস সোজা সহজ সরল পথে এদেশে টাকা উপার্জন করা শক্ত। এদেশে টাকায় যারা বড়লোক তাদের দু'চারজনের জীবন-কাহিনী শোনবার সুযোগ পেয়েছি। কেউ নোট জাল করেছেন, কেউ করেছেন কালোবাজারে চোরা কারবার। কেউ বা এমন কিছু করেছেন যা লিখতে লজ্জা হয়। এঁরা সবাই বিখ্যাত ধনী। আমিও জাল করে ধনী হয়েছিলুম, কিন্তু সে কথা পরে বলব। চৌধুরী বাড়ির ঘটনার পরে, বোধহয় মাস খানেক পরে সং একদিন এসে হাজির হ'ল মায়ের কাছে। বললে, "আমার মামা কাশীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। কাশী ছেড়ে সম্প্রতি তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে এসেছেন। সেখানে তাঁর কিছু জমি আছে, পাকা বাড়িও আছে। ছেলেবেলায় তাঁর বিয়ে হয়েছিল, দু'বছর পরে সে স্ত্রী মারা যায়। কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি। তাই তিনি ঠিক করেছেন আবার বিয়ে করবেন। আপনাদের পালটি ঘর তিনি। সুহাসিনীর কথা বলেছি তাঁকে। তাঁর আপত্তি নেই। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সামনের বৈশাখেই বিয়ে হতে পারে।" বলা বাহুল্য মায়ের আপত্তি হ'ল না। আমার এক কাকা গেলেন কথাবার্তা কইতে। আমার নিজের কাকা ছিল না, দূর-সম্পর্কের সিধু কাকা গেলেন। তিনি বললেন, পাত্রটি দেখতে খারাপ, কিন্তু রূপই কি সব? অতবড় বিদ্বান, জমি-জমা, পাকা বাড়ি আছে, পণ লাগবে না, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। খবর পেয়ে পাড়ার অন্যান্য অবিবাহিতা মেয়েরা এবং তাদের মায়েরা হিংসেয় ফেটে পড়তে লাগল। আমার বরের চেহারা তারা যদি দেখত তাহলে হয়তো আনন্দে ফেটে পড়ত। কিন্তু সে আনন্দ ভোগ করবার সুযোগ আমরা তাদের দিই নি। সিধু কাকা আর সং ঠিক করলে যে বিয়ে আমাদের গ্রাম থেকে হবে না, হবে আমার স্বামীর গ্রাম থেকে। তাঁর বাড়ির কাছেই তাঁর ভাগ্নে সংকীর্তনের বাড়ি, সে বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। সেখানে আমরা যদি চলে যাই, সব দিক দিয়েই সুবিধে হবে। এ প্রস্তাব মা যে শুধু গ্রহণ করলেন তাই নয়, লুফে নিলেন। হবু জামাইয়ের মহত্ত্ব এবং তাঁর ভাগ্নে সংকীর্তনের উদারতায় গদগদ হয়ে পড়লেন তিনি। আমার মনের অবস্থার জটিলতা বর্ণনা করে আপনাকে ক্লান্ত করব না। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলতে পারি তখন আমি জালবদ্ধ পশু হয়ে গিয়েছিলুম। যে শিকারীর তীর সত্যি আমাকে আহত করেছিল সে যে আমার নাগাল আর কখনও পাবে না এই চিন্তায়

অভিভূত হ'য়ে আমি যেন পাষাণী হয়ে গিয়েছিলুম, এ-ও আমার মনে হয়েছিল বিজয় মল্লিক সত্যি যদি এসে এ বিবাহে বাধা দেন এবং জোর করে আমাকে কেড়ে নিয়ে যান তাহলে হয়তো পাষাণীর ভিতর থেকে অহল্যা বেরিয়ে আসবে, যার কাছে সতীনের চেয়ে প্রেম বড়। কিন্তু কিছুই হ'ল না, বিজয় মল্লিক একবার খবরও নিলেন না। জালবদ্ধ পশুটা নীত হ'ল কশাইখানায়। বিয়ে হ'য়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এ বিয়েতেও উলুধ্বনি হল, শাঁখ বাজল, শানাইয়ের সুরে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ। সংকীর্তনই শানাইটা যোগাড় করে এনেছিল, কারণ তারই আনন্দ সবচেয়ে বেশী হয়েছিল কি না। তারই জালে তো অসহায় হরিণীটা ধরা পড়েছিল। চিঠিটা বড় বেশী লম্বা হ'য়ে গেল, আজ আর থাক। পরে বাকিটা লিখব। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

প্রণতা
সুহাসিনী

তৃতীয় চিঠি

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

মহাভারতে জতুগৃহের কথা আছে। রামায়ণে আছে অগ্নিপরীক্ষার কথা। আমাকে যদিও দ্রৌপদীর মতো পাচটা স্বামী নিয়ে ঘর করতে হয়নি, সীতার মতো সতী সাধ্বীও আমি নই, কিন্তু আমার কপালে জতুগৃহ এবং অগ্নিপরীক্ষা দুই-ই এসেছিল বিভিন্ন মূর্তিতে। সব মেয়ের কপালেই আসে বোধহয়। এই কথাটাই রামায়ণ-মহাভারতে রূপক করে লেখা আছে। আমাদের রূপ-যৌবনই আমাদের জতুগৃহ। তার মধ্যে আমাদের যে 'আমি'টা বাস করে তাকে সর্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয় কখন কোথা থেকে কোন্ স্ফুলিঙ্গ পড়ে জ্বলে ওঠে সব। স্ফুলিঙ্গ তো চারদিকেই উড়ছে। আমি অবশ্য সশঙ্কিত হ'য়ে ছিলুম না, কারণ আমার জতুগৃহে আগেই আগুন লেগে গিয়েছিল বিজয় মল্লিকের চাহনির স্ফুলিঙ্গে। আমি দাউ দাউ করে জ্বলছিলাম, যদিও বাইরে থেকে তা টের পাচ্ছিল না কেউ। সংকীর্তনও একটি স্ফুলিঙ্গ এবং সে স্ফুলিঙ্গ সবেগে বার বার এসে পড়ছিল আমার উপর, কিন্তু জ্বলন্ত জিনিসে আর নতুন করে আগুন লাগানো যায় না। কিন্তু বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল। বস্তুত, বিয়ে হবার পর আমি প্রায় পুরোপুরি সংকীর্তনের কবলে পড়ে গেলুম। নিজের ভাগ্নেকে কখনও এড়ানো যায়! যখন তখন 'মামী' 'মামী' বলে আসত, জল দাও, পান দাও, পিঠটা চুলকে দাও বলে ফরমাশ করত, একলা পেলে হাত ধরে টানাটানি করতেও ছাড়ত না। একদিন বললে,

মামী পুরাণের খবর রাখ? শ্রীরাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামী। আর একদিন বললে, মাদ্রাজে নাকি মামীর সঙ্গে ভাগ্নের সম্পর্কটা বড় মিষ্টি। বাংলাদেশের লোকেরা এত জিনিসের নকল করে এত জিনিস চালু করেছে এদেশে, এইটেই পারছে না কেন? আর একদিন বললে, মামীর সঙ্গে কিসের মিল হয় বল তো? তারপর নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'আমি', আর একটা ভাল মিলও আছে 'স্বামী'। এই ধরনের নরকযন্ত্রণা দিনকতক ভোগ করবার পর আমি একটা উপায় আবিষ্কার করলুম। শুভদৃষ্টির সময় যে স্বামীর মুখ দেখে আমি আঁতকে উঠেছিলুম সেই স্বামীর কাছেই আমি সর্বক্ষণ থাকতে লাগলুম। আমার স্বামী সংস্কৃত সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই লেখাতেই তিনি তন্ময় হ'য়ে থাকতেন। তবু আমি তাঁর আশে পাশে ঘুর ঘুর করতুম। তাঁর নতুন-কেনা গাড়ুটাও একটা লাল-গামছার টোপর পরে তাঁর কাছেই বসানো থাকতো। গাড়ু তাঁর গভীর মনোযোগ টলাতে পারেনি, আমিও পারিনি। কেবল প্রয়োজনের সময় আমাদের ব্যবহার করতেন তিনি। জ্ঞানী লোকেদের ওই রকমই ধরনধারণ। মাঝে মাঝে মনে হ'ত আত্মহত্যা করে ফেলি। হয়তো করেও ফেলতুম। বাড়ির পিছনেই পুকুর ছিল, কলসী দড়িরও অভাব হ'তো না। কিন্তু করিনি। মনের কোণে কেমন যেন একটা ক্ষীণ আশা ছিল আবার তাঁকে দেখতে পাব, হয়তো কাছেও পাব। কেন যে এ আশা মনে লুকিয়ে ছিল, এর মূল কেন যে কামনার গহনস্তরে নিবদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল তা জানি না। কিন্তু এই জন্যেই আমি আত্মহত্যা করিনি। আমি সর্বদা আশা করতাম বিশুদা হয়তো একদিন আসবে. তাঁর সঙ্গে গ্রামে ফিরে যাব, মায়ের সঙ্গে দেখা হবে, ওঁর সঙ্গেও হবে নিশ্চয়। আর একটা কারণেও খানিকটা স্বস্তি পেয়ে গেলুম। সংকীর্তনের বিয়ে হ'য়ে গেল। বউটি সুন্দরী হওয়াতে আমার যন্ত্রণা খানিকটা কমল। অবশ্য পুরোপুরি কমে নি, কারণ সংকীর্তন প্রায়ই এসে বলত, মামী, তোমার তুলনায় তারা কিছুই নয়, সূর্যের কাছে তারার মতো। বলত বটে, কিন্তু তার মুখের গদগদ ভাবটা ঢাকতে পারত না। নূতনত্বের মোহ সবারই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আমি অনেকটা নির্ভয় হলুম। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলব? একটু হিংসেও হয়েছিল মনে মনে। আশ্চর্য মানুষের মন। সংকীর্তন যখন আমার কানের কাছে আমার গুণকীর্তন করত, তখন আমি যে বিরক্ত হতুম না তা নয়, কিন্তু আমার আর একটা সত্ত্বা যে খুশীও হ'ত তার প্রমাণ পেলুম সংকীর্তনের যখন বিয়ে হ'য়ে গেল। একই মানুষের মধ্যে যে কত রকম জীবই বাস করে! কিছুদিন পরে আর একটা ঘটনাও ঘটল যার জন্যে আমার আর আত্মহত্যা করা হ'ল না। খুকু পেটে এল। আমার স্বামী দেবতাও একটু প্রসন্ন হলেন আমার উপর, তাঁর আশা হ'ল শেষ বয়সে ভগবান বোধহয় তাঁর অন্ধকার ঘরের প্রদীপটি আমার হাত দিয়ে পাঠাচ্ছেন। সত্যি তিনি মনে মনে বিশ্বাস করেছিলেন যে আমার ছেলে হবে। নামও ঠিক করে রেখেছিলেন একটা, 'কুলতিলক'। এই বিশ্বাস তাঁকে যেন

বদলে দিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। সংস্কৃত বই থেকে চোখ তুলে মাঝে মাঝে চেয়ে থাকতেন আমার দিকে, তাঁর কুৎসিত মুখেও আনন্দের আলো ঝলমল করত, আমার মধ্যে তিনি তাঁর অনাগত বংশধরকে যেন প্রত্যক্ষ করতেন এবং আমি সেই বংশধরের জননী বলে আমাকেও বোধহয় সম্ভ্রম করতেন একটু। তাঁর এই সম্ভ্রম যদি বরাবর বজায় থাকত তাহলে হয়তো আমি তাঁকে ত্যাগ করতুম না। সম্ভ্রম জিনিসটা প্রেমেরই আর একটা রূপ। প্রেম দিয়ে জন্তু-জানোয়ারকেও বশ করা যায়। ছেলেবেলায় আমি একটা শালিক পাখীর ছানা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, দিন কতক সেটাকে ছাতু আর ফড়িং খাইয়ে মানুষও করেছিলুম। যখন খুব ছোট্ট ছিল তখন কাকের আর বাজের কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে খাঁচায় পুরে রাখতুম। একটু বড় হ'লে ছেড়ে দিয়েছিলুম। সে উড়ে চলে গেল বটে, কিন্তু বারবার ফিরে আসত আমার কাছে। রাস্তায় যাচ্ছি হঠাৎ উড়ে এসে কাঁধের উপর বসল। খেতে বসেছি, হঠাৎ সামনে এসে ঘাড় নেড়ে নেড়ে আলাপ শুরু করে দিল। তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলুম। সে এখন মরে গেছে বোধহয়, কিন্তু আমার কাছে সে অমর। প্রেমের অমরাবতীতে সে অক্ষয় হ'য়ে আছে আমার মনে। যখন ছোট ছিল, যখন হাঁ করলে তাঁর ক্ষুধার্ত মুখ-বিবরের রক্তিমাভা ফুটে বেরুত, তখনকার ছবিটিও মোছেনি মন থেকে। এই প্রেমের সুধা আমার স্বামীর কাছ থেকে পাইনি কখনও। তিনি ভালোবেসেছিলেন তাঁর গ্রন্থকে, তাঁর বিদ্যাকে, তাঁর জ্ঞানের অহঙ্কারকে। আমাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন বংশধর পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমাকে পাবার, আমাকে জয় করবার, আমার চক্ষে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করবার বিন্দুমাত্র তাগিদ ছিল না তাঁর। তাই আমার যখন ছেলে না হ'য়ে মেয়ে হ'ল তখন তাঁর বীভৎস পাথরের মতো মুখ আরও কঠিন হ'য়ে গেল। তিনি মেয়ের মুখ দর্শন করলেন না, আঁতুড় ঘরের দরজাতে পর্যন্ত একবার এসে দাঁড়ালেন না। বইখাতা গুটিয়ে আবার চলে গেলেন কাশীতে, বাকী জীবনটা বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণাশ্রয়ে কাটাবেন বলে। আমাকে রেখে গেলেন তাঁর গুণধর ভাগ্নে সংকীর্তনের কাছে। আগেই বলেছি সংকীর্তনের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে হবার পরের মাসেই পোয়াতি হ'ল তার বউ। আমি যখন আঁতুড় থেকে বেরুলুম তখন সংকীর্তনের বউ তারা সাতমাস অন্তঃসত্ত্বা। সংকীর্তনের পরিচয় আগেই দিয়েছি আপনাকে। স্বামী কাশী চলে যাওয়ার পর আমি আবার তার কবলে পড়লুম। সে যে কি কবল, কি দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা, তা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই, রৌরব কুম্ভীপাক তার কাছে ছেলেমানুষ। আপনি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোক, আপনি সবই বুঝতে পারছেন। প্রায় ছ'সাত মাস এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল আমাকে। এর সঙ্গে আর একটা যন্ত্রণাও ভোগ করেছিলাম, সেটা শারীরিক। তলপেটে অসহ্য একটা ব্যথা হচ্ছিল। সংকীর্তন একটা কবিরাজী পাঁচন এনে দিয়েছিল, নিজে বই দেখে হোমিওপ্যাথী ওষুধও দিয়েছিল দু'চার ফোঁটা। আরও সদয় হয়েছিল সে, স্বহস্তে সেক দিতে উদ্যত হয়েছিল আমার তলপেটে, স্বহস্তে

গরম জল করে এবং সেই গরম-জলে ডোবান তপ্ত তোয়ালে নিংড়ে। আমি ঘোর আপত্তি করেছিলুম, কিন্তু আমার আপত্তি টেকেনি। অসহায় নারী যখন পুরুষের কবলে পড়ে তখন আর কোনও আপত্তি টেকে কি? কেলেঙ্কারীর ভয়ে তারা জোরে প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারে না, পাছে কেউ শুনতে পায়। আমার স্বামী কাশী থেকে সংকীর্তনকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সে যেন আমাদের দেখাশোনা করে। চিঠি আসার আগেই মনোযোগ সহকারে এ ভার সে নিয়েছিল। মনোযোগ কিঞ্চিৎ বিচলিত হ'ল যখন তার বউ আঁতুড়ে ঢুকল। তারারও ছেলে হ'ল একটি। কিন্তু মাসখানেক পরে সে ছেলে মারা গেল। সবাই বললে পেঁচোয় পেয়েছে। কিন্তু আসলে হয়েছিল তার ধনুষ্টঙ্কার। এই রকম যখন পরিস্থিতি তখন বিশুদা এসে হাজির হলেন একদিন। তাঁর সেদিনকার সেই আবির্ভাবই যুগান্তর নিয়ে এল আমার জীবনে। অনেক পরে বুঝেছিলুম তিনি এসেছিলেন বিজয় মল্লিকের চর হয়ে। কিন্তু প্রথম যখন এলেন তখন ঠিক দাদার মতোই এলেন।

"কিরে কেমন আছিস। অনেকদিন তোর খবর পাইনি। এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম খবরটা নিয়ে যাই। জামাইবাবু কোথা—"

"তিনি কাশী চলে গেছেন।"

"ও—"

"কেমন মেয়ে হয়েছে দেখি।"

মেয়েকে এনে দেখালুম।

"বাঃ, এ যে চমৎকার মেয়ে হয়েছে! তোর চেয়েও বেশী রূপসী হবে।"

তারপর একথা সেকথার পর পেটের ব্যথার কথাটাও বললুম। এত সহজে আমাকে গাঁথতে পারবেন তা বোধহয় নিজেও তিনি ভাবেন নি। চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তাঁর।

"অসুখ হয়েছে বললে পাড়াগাঁয়ে তো কিছু করা যাবে না। তুই এক কাজ কর। চল আমার সঙ্গে কোলকাতায়। সেখানে বড় ডাক্তার দেখিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করে দেব'খন।"

"কিন্তু তাতে যে অনেক খরচ দাদা। আমরা গরীব, কোলকাতার বড় ডাক্তার দেখাবার সামর্থ্য আমাদের তো নেই।"

"টাকার কথা তুই ভাবছিস কেন। সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"সেখানে থাকবো কোথা?"

"সেখানে বাসা আছে আমার। বিজয় মল্লিকের গালার ব্যবসা দেখাশোনা করতে হয় যে আমাকে। তবে একটি মুশকিল আছে, তোমার ওই কচি মেয়েকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। বিজয়ও মাঝে মাঝে আসে সেখানে, এখন অবশ্য এসেছে কিনা জানি না। সে ছোট ছেলেমেয়ের ছোঁয়াচ সহ্য করতে পারে না। তার নিজের একমাত্র ছেলে অজয়কে তাই সে বোর্ডিংয়ে রেখে দিয়েছে। সে যদি এসে পড়ে আর দেখে যে আমি একটা

কচি মেয়ে জুটিয়েছি বাসায়, তাহলে আমার ওপর চটে যাবে। মনিব তো হাজার হোক, তাকে চটাতে সাহস পাই না। অথচ তুই ওই কচি মেয়েকে ফেলে যাবিই বা কি করে।"

বিজয় মল্লিক নামটা শুনেই আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ ব'য়ে গিয়েছিল। যে বাসায় বিজয় মল্লিক আসেন সেখানে যাবার জন্যে সারা হৃদয় উন্মুখ হ'য়ে উঠল যেন নিমেষের মধ্যে। পেটের ব্যথার চিকিৎসার জন্য যাচ্ছি, সেইটেই যে মুখ্য, সেটা ভুলে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য, গৌণ হয়ে গেল সেটা। বিজয় মল্লিকের বাসায় যাচ্ছি, সেখানে তিনি হয়তো আছেন, এই কথাটাই আমার সমস্ত চেতনাকে যেন গ্রাস করে রইল।

বললাম, "খুকুকে এখানে রেখে যেতে পারি। তারার ছেলেটি তো মারা গেছে। তারা ওকে রোজ দুধ খাওয়ায়। আমার দুধ শুকিয়ে গেছে। ও অনায়াসে খুকুকে রাখতে পারবে।"

"তাহলে তো ঝঞ্ঝাট মিটেই গেল। আজই চল—"

সংকীর্তন একটু আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিল।

বলেছিল, "মামাকে খবর না দিয়ে এ ভাবে চলে গেলে তিনি যদি রাগ করেন?"

"করেন করবেন। তিনি রাগ করবেন বলে আমি আমার অসুস্থ বোন্‌কে তো ফেলে যেতে পারি না। তিনি যদি স্বামীর কর্তব্য পালন করতেন তাহলে আমাকে এ দায় ঘাড়ে করতে হ'ত না। শ'দুই টাকার ধাক্কায় পড়ে যাব, কিন্তু উপায় কি—"

সংকীর্তন দমে গেল। আমার এ রকম একজন দরদ দেখাবার মতো জাঁদরেল দাদা যে বিশুদার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তা সে কল্পনা করতে পারেনি। বিশুদাকে সে আগে চিনত, কিন্তু তার এ পরিচয় সে কখনও পায়নি। আমিও পাইনি। বিশুদার মহত্ত্বে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমার সারা মন জুড়ে একটি কথাই ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—যেখানে যাচ্ছি সেখানে বিজয় মল্লিক হয়তো থাকতে পারেন। সেই বিজয় মল্লিক যিনি আমার জন্যে একটা গোটা কাপড়ের দোকানই কিনে ফেলেছিলেন।

সংকীর্তন বললে, "তাহলে আপনি মামার নামে একটা চিঠি লিখে রেখে যান। তাহলে আমার আর কোনও দায়িত্ব থাকিবে না।"

বিশুদার তাতে আপত্তি ছিল না।

চিঠিখানা লিখে বিশুদা আমাকে সেটা দেখতে দিয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—সুহাসিনীর পেটে দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে। এসে দেখলাম পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এখানে সুচিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই ওকে কোলকাতায় নিয়ে চললাম। ভাগ্যে এসে পড়েছিলাম তা' না হলে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হ'ত ওর। কোলকাতায় কতদিন থাকতে হবে তা ডাক্তাররা ঠিক করবেন যদি কিছু দেরিও

হয় আপনি চিন্তিত হবেন না। চিকিৎসার সব খরচ আমিই বহন করব। প্রণাম নেবেন। ইতি—

বিশুদার সঙ্গে সেইদিনই কোলকাতায় চলে গেলাম। একটা কথা আপনাকে লিখতে ভুলে গেছি। আমার বিয়ে দিয়ে সামাজিক দিক থেকে মা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বটে, কি জামাইয়ের চেহারা আর বয়স দেখে সুখী হননি। একটা অদৃশ্য তুষানলে দিনরাত দগ্ধ হচ্ছিলেন তিনি। আমার বিয়ের মাস তিনেক পরে সে তুষানলের অবসান হয়েছিল চিতানলে। খবরটা লোকমুখে শুনেছিলাম। বিয়ের পর তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হওয়ার সুযোগ হয়নি। পৃথিবীতে আমার একমাত্র আপন লোক ছিলেন আমার মা। তাই সম্ভবত কোলকাতা যাওয়ার আগে তাঁর মুখখানা স্পষ্ট জেগে উঠেছিল মনে। অনুভব করেছিলাম তিনি যেন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন। মনে হয়েছিল কি যেন বলবেন। কিন্তু তখন আনন্দের মদিরায় আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন। মায়ের সে দৃষ্টির অর্থ বোঝবার মতো স্বচ্ছ মন আমার ছিল না তখন। সেদিন ট্রেনে যখন উঠলাম তখন সেটা ট্রেন বলেই মনে হয়েছিল, বুঝতে পারিনি যে সেটা একটা ছোট নৌকো, যে নৌকো অকূল পাথারে পাড়ি দেবে বলে তীরের আশ্রয় ত্যাগ করছে। সানন্দে তাতেই আমি চড়ে বসলাম সেদিন।

আজ আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। পরের ঘটনাগুলো আর একদিন লিখব। সে সব ঘটনার অধিকাংশই বোধহয় আপনার জানা। বিজয়বাবু অনেক কথাই আপনাকে বলেছেন নিশ্চয়। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

প্রণতা
সুহাসিনী

চতুর্থ চিঠি

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

সেদিন ট্যাক্সিটা যে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। অত বড় বাড়ি যে বিশুদার বাসা তা কল্পনা করতে পারিনি। ও বাড়িটা যে বিজয় মল্লিকের নিজস্ব তা-ও তখন জানতুম না। কড়া নাড়তেই একটা দারোয়ান-গোছের লোক এসে কপাট খুলে দিল। বিশুদা নিম্নকণ্ঠে তাকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "বিজয় এখানেই আছে।" শুনে প্রথমে আমার ভয় হ'ল। মনে হ'ল যদি বাড়িতে ঢুকতে না দেন। আমি একদিন অহঙ্কার করে তাঁর দেওয়া শাড়িগুলো ফেরত দিয়েছিলাম, আজ যদি তার শোধ তোলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা

আনন্দের আবেগে আমার দেহ মন কেঁপে উঠল। বিজয় মল্লিক এই বাড়িতে আছেন, একটু পরেই হয়তো তাঁকে দেখতে পাব এই সত্যটা আমাকে যেন ঘিরে ধরল, দোলা দিতে লাগল। মনে হ'ল আমি যেন সমুদ্রে অবগাহন করছি। বিশুদা ওঁপরে উঠে গেলেন। একটু পরেই এসে বললেন, "চল ওপরে।"

মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্রথমেই বেশ বড় একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দরজার সামনেই প্রকাণ্ড একটা অয়েল-পেন্টিং ছিল। ছবিতে স্বামী বিবেকানন্দের ভঙ্গীতে একটি রোগা গোছের সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে মৃদু হাসি, পরনে গেরুয়ার জোব্বা, মাথায় গেরুয়ার পাগড়ি, পেছনে হাত দিয়ে ঠিক বিবেকানন্দের মতো করে চেয়ে আছেন তিনি।

বিশুদা বললেন, "ইনি মাধবানন্দ। বিজয়ের কুলগুরু। প্রণাম কর এঁকে।"

বিজয় মল্লিকের গুরু শুনে যন্ত্র-চালিতবৎ এগিয়ে গিয়ে একটা প্রণাম করলাম। আমার সমস্ত মনটা তখন বিজয়-মল্লিক-ময় হয়েছিল, যা করছিলাম তা ভালো, মন্দ, না হাস্যকর তা ভেবে দেখবারও ক্ষমতা ছিল না। ওই নকল বিবেকানন্দকে দেখে আমার হেসে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু হাসিনি। সে কথা মনেও হয়নি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল।

"বিশুদা, আমি যে অসুখের চিকিৎসার জন্য এসেছি এ কথা বিজয়বাবুকে বোলো না। কেমন ? হয়তো কি মনে করবেন।"

"কেন, বললে ক্ষতি কি। বললে হয়তো চিকিৎসার সমস্ত ভারটা ওই নেবে। তোকে খুব ভালবাসে তো।"

"আমাকে ? আমার সঙ্গে আলাপই তো নেই !"

"তা নেই বটে, কিন্তু তোর কথা প্রায়ই বলে। হাটে কাপড়ের দোকানে সেই যে দেখেছিল, তোকে কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল, মনে নেই ? সেই থেকে তোকে আর ভোলেনি। তোর অসুখের কথা শুনলে এখুনি বড় বড় ডাক্তারকে 'কল' দেবে।"

"না, না, না, আমার অসুখের কথা ঘুণাক্ষরে বোলো না ওঁকে ! এখন আমার পেটে কোনও ব্যথা নেই।"

বিজয় মল্লিকের কাছে নিজেকে রুগ্ন অসুস্থ বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর অনুকম্পার পাত্রী হবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না। আমি তাঁকে জয় করতে এসেছিলাম, তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে আসিনি।

বিশুদা আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, "বেশ, তাহলে অসুখের কথা চাপা থাক এখন। যদি দরকার হয় তোকে লুকিয়ে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। বিজয়কে কিছু জানাব না।"

সেদিন বিজয়বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল না। তিনি ওই বাড়িতেই ছিলেন, তবু দেখা হয়নি। কারণটা পরে শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন পাঁজিতে

নাকি মিলনের শুভলগ্ন ছিল না। পাঁজি আর গুরুবাক্য এই দুটি যে বিজয় মল্লিকের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, আজকালকার দিনে তা কল্পনা করাও শক্ত ছিল আমার পক্ষে। আমি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলুম যদি কোনও ফাঁকে একবার দেখা পাই।

একটু পরে একটি প্রবীণা ঝি খানকয়েক দামী শাড়ি সেমিজ সায়া তোয়ালে সাবান স্নো পাউডার একশিশি এসেন্স একশিশি আতর এনে আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, "এগুলো বাথরুমের আলমারিতে গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি। যদি গা ধুতে চান ধুয়ে নিন। খাবার তৈরি হয়ে গেছে।"

আমার সঙ্গে পুঁটলিতে বাঁধা খান দুই আধময়লা শাড়ি আর পপলিনের সেমিজ ছিল। সায়া ছিল না, কারণ সায়ার চলনই ছিল না আমাদের বাড়িতে। আমার জন্য এই সজ্জা-সম্ভারের আড়ম্বর দেখে আমি একটু হকচকিয়ে গেলুম। বিশুদা যে আমার জন্যে এত করেছেন, বা করতে পারেন, তা বিশ্বাস হ'ল না। বিজয়বাবুই কি করেছেন তাহলে? কেন! তিনি কি জানতেন আমি আসব? কি করে জানলেন? জানবার তো কথা নয়! বিশুদা হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে অসুখের কথা শুনে তো আমাকে কোলকাতায় নিয়ে এলেন। তাতে এত শাড়ি সেমিজ স্নো পাউডারের ব্যবস্থা হ'ল কি করে! নির্বাক হ'য়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। অন্তর্যামী মন নিমেষের মধ্যে সত্যটা টের পেয়ে গেল। বুঝতে পারলাম বিশুদা হঠাৎ যাননি আমাদের বাড়িতে। বিজয়বাবুই পাঠিয়ে ছিলেন তাঁকে দূতরূপে। আমার অসুখের খবরটা পেয়ে সুবিধেই হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাড়াতাড়ি আমাকে এখানে এনে ফেলতে পারলেন।

আমার সত্তা যেন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক ভাগ অপমানের কশাঘাতে ছটফট করতে লাগল, আর এক ভাগ আসন্ন মিলনের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রইল আর তৃতীয় ভাগটা নির্বিকার হ'য়ে দেখতে লাগল এই দুই পরস্পর-বিরোধী লীলাকে।

একটু পরে বিশুদা আবার এলেন।

"কি এখনও চুপ করে বসে আছিস যে। চান-টান করে নে। খাবার তৈরি। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড় সকাল সকাল। সমস্ত দিন ট্রেনে যে ধকল গেছে –"

আমি এসব কথার জবাব না দিয়ে ব্যাপারটার মর্মস্থলে গিয়ে হাজির হলাম একেবারে।

"বিশুদা, আমি সব বুঝতে পেরেছি। এ তুমি কি করলে!"

মুখে এ কথা বললাম বটে কিন্তু মন আমার কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ছিল বিশুদার এই কুকর্মের জন্য। যে কন্দর্পকান্তি বিজয় মল্লিককে এতকাল স্বপ্নলোকের রাজপুত্র বলে মনে মনে পুজো করেছি, সারা দেহ মন দিয়ে চেয়েছি, আজ তার কাছে তার বাড়িতে যে আমাকে এনে দিয়েছে তার উপর কি রাগ করতে পারি? সত্যিই আমার মন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, অথচ আর একদিকে আমি অপমানে ক্ষোভে জ্বলছিলুম। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বর্ণনা করতে পারব না।

বিশুদা চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, "আমি যা করেছি তা তোর ভালোর জন্যেই করেছি। তোর স্বামী যদি তোকে নিয়ে থাকত তাহলেও বা একটা কথা ছিল। সে তো তোকে ত্যাগ করে চলে গেছে। ওই অজ পাড়াগাঁয়ে ওই শয়তান ভাগ্নেটার খপ্পরে পড়ে তোকে কি জীবন কাটাতে হ'ত ভেবে দেখ দিকি। তার চেয়ে এ ঢের ভালো। বিজয় সত্যিই তোর জন্যে পাগল। তোকে রাজরাণীর মতো সুখে রাখবে। তোর বিয়ে হয়ে গেছে শুনে সত্যিই ও ক্ষেপে গিয়েছিল। আমাকে কেবলই বলত, যেমন করে পারিস ওকে নিয়ে আয়। টাকার জন্যে ভাবিস না, যত টাকা লাগে আমি খরচ করব।"

হঠাৎ আমি জিগ্যেস করলাম, "আমার যে একটা মেয়ে হয়েছে সে কথা কি উনি জানেন?"

"না জানে না। আমিই জানতুম না।"

শুনে আমি চুপ করে রইলাম। একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছিলুম না। জানি না কেমন করে আমার মনের কথাটা টের পেয়ে গেলেন বিশুদা।

বললেন, "সেকথা বিজয়কে জানাবার দরকার কি। আমি বলিনি, বলবও না। আচ্ছা, তুই এখন চান-টান করে নে।"

"বিজয়বাবু কোথায় এখন?"

"ওপরের ঘরে বসে ছটফট করছে। পাঁজিতে এখন নাকি শুভলগ্ন নেই। ও পাঁজি ছাড়া তো এক পা চলবে না। অদ্ভুত লোক। এ দেশের সমস্ত রকম কুসংস্কার ওর মনে একেবারে রেকৃতার গাঁথুনিতে গেঁথে গেছে। হাতে ছ'সাত রকম পাথরের ছ'সাত রকম আংটি, গলায় তাবিজ, হাতে তাবিজ। কুষ্ঠি, পাঁজি, গ্রহ-স্বস্ত্যয়ন, লক্ষ্মীপুজো সবেতেই ওর অগাধ বিশ্বাস। ওর বাড়িতে এক অদ্ভুত ধরনের লক্ষ্মী আছেন, তিনি সিন্দুকের ভিতর থাকেন, সেইখানেই তাঁর পুজো হয়। ওর কোন এক পূর্বপুরুষ নাকি লক্ষ্মীমূর্তিটি এক সিন্দুকের ভিতর পেয়েছিলেন এবং স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন সিন্দুকের ভিতরে রেখেই তাঁর যেন পুজো করা হয়। পুরোনো সিন্দুক ঘুণ ধরে পচে গেছে, নতুন আর একটা সিন্দুক করিয়েছে বিজয়। সেই সিন্দুক হাট থেকে আনতে গিয়েই তো তোকে দেখতে পায়। অদ্ভুত চরিত্রের লোক ও। একদিকে বেপরোয়া, আর একদিকে আবদ্ধ। ওকে দেখলে রবিঠাকুরের সেই গানটা মনে পড়ে—জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে! আচ্ছা চলি এখন, আমি এখানে থাকি না, আমার আলাদা একটা বাসা আছে বড় বাজারে! সেইখানে যাব।"

বিশুদা চলে গেল।

আমি চুপ করে বসে রইলাম দু'এক মিনিট। তারপর স্নানের ঘরে ঢুকলাম।

এর পর যে সব ঘটনা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। আমি

কবি হ'লে তা নিয়ে কাব্য লিখতুম এবং আমার বিশ্বাস সে কাব্য মহৎ কাব্য হ'ত। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব মহতী প্রেম-কথা লেখা আছে আমাদের কথা তাদের কারও চেয়ে কম সুন্দর হ'ত না। রূঢ় বাস্তবের আঘাতে রুক্ষ মর্ত-লোকের কঙ্কর ধূলিতে অবশ্য নেমে আসতে হয়েছিল আমাকে, কিন্তু যে সুখ-স্বর্গলোকে ওই ক'মাস বাস করেছিলুম তার তুলনা হয় না। পৃথিবীর কোন্ প্রণয়িনীর স্বপ্নভঙ্গ হয়নি? সকলেরই হয়েছিল। সেজন্য আমার দুঃখ নেই। ওই স্মৃতিটাই আমার কাছে অক্ষয় সম্পদ হ'য়ে থাকবে। ওই স্মৃতির একটা বাস্তব প্রমাণও আছে বুকের ওপর আঁকা। হয়তো আপনি শুনে হাসবেন, কিন্তু সত্যি ঘটেছিল ব্যাপারটা! বিজয়বাবুর উদ্ভট কল্পনায় সত্যিই এ খেয়াল জেগেছিল এবং আমি তার সে খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে হাসিমুখে ছুঁচের খোঁচা সহ্য করেছিলাম মুখ বুজে। তিনি একদিন আমার জন্য প্রায় আড়াই-ইঞ্চি-চওড়া পাথর বসানো একটা দামী হার কিনে নিয়ে এলেন প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ করে। এসে বললেন, "এটা কিনেছি কেন জান? তোমার আসল পরিচয়টি এতে ঢাকা থাকবে বলে।"

"হেঁয়ালি ভেঙে বল, বুঝতে পারছি না!"

"বুকের উপর উলকি দিয়ে লেখা থাকবে 'বিজয়িনী' আর সেই লেখার উপর থাকবে এই হারটি।"

"বুকের উপর উলকি দিয়ে লিখবে কে। পুরুষমানুষকে দিয়ে আমি লেখাতে পারব না!"

"পুরুষমানুষকে আমিই বা কোন্ সাহসে তোমার কাছে ঘেঁষতে দেব? মালা এসে উলকি দিয়ে দেবে। চমৎকার মেয়ে। হাতের কাজও পরিষ্কার!"

সে উলকি এখনও আমার বুকে আঁকা আছে।

বসন্ত আসে, কিন্তু চিরকাল থাকে না। ফুল ফোটে কিন্তু ঝরেও যায়। আমারও সুখের দিন এসেছিল, কিন্তু ফুরিয়ে গেল। খবর পেলাম এক তরুণী সিনেমা-অভিনেত্রী ওঁর হৃদয় হরণ করেছে। তাকে নাকি নতুন গাড়ি কিনে দিয়েছেন একটা! যে স্যাকরা আর শাড়ি-ওয়ালারা এতদিন আমার বাড়িতে ভিড় করত তারা এখন ছুটতে লাগল তার বাড়িতে। বুঝলাম, শিশু ভোলানাথ নতুন খেলনা নিয়ে মেতেছে আবার। আমার দিন ফুরোল। আমার স্বর্গ থেকে আসন্ন পতনের মর্মান্তিক ট্রাজেডিটা আমি হাসিমুখেই বহন করছিলাম। শেষ আঘাতটার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম মনে মনে। মনে পড়ছিল সেই গরবিনীকে যে একদিন বিজয় মল্লিকের দেওয়া শাড়িগুলো ফেরত দিয়েছিল, বিজয় মল্লিকের বউ আছে শুনে তাকে বিয়ে করতে চায়নি। কোথায় রইল তার গর্ব? সতীন থাকা সত্ত্বেও কেন আবার এসে ধরা দিলাম? ধরা কেন দিয়েছিলাম তা আমি জানি। ধরা দিয়েছিলাম ওকে ভালবেসেছিলাম বলে। আমার সে ভালবাসা প্রমত্তা পদ্মানদীর

মতো সর্বগ্রাসিনী—আমার কুল, মান, অহঙ্কার, লজ্জা সব ভেসে গিয়েছিল তার প্রবল তোড়ে। ওই ভালবাসাটুকুই আমার একমাত্র সম্বল। সেই সম্বলটুকু অবলম্বন করেই আমি হয়তো মানে মানে সরে যেতুম। কিন্তু ঘটনাচক্রে যা ঘটল, যে অপমানের লাঞ্ছনা আমার আত্মসম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে দিলে তার প্রতিবাদ করবার জন্যেই বিশুদাকে দিয়ে আমি এই মকদ্দমা দায়ের করেছি। টাকার জন্যে নয়, অন্য কিছুর জন্যেও নয়, ভূলুণ্ঠিত আত্মসম্মানকে তুলে ধরবার জন্যে। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

ঘটনাটা কি হয়েছিল এইবার বলি। অনেকদিন পরে আমার পেটের সেই ব্যথাটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠল একদিন। এমন জোরে ব্যথা হ'ল যে আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম। উনি ডাক্তার ডাকলেন একজন। বেশ বড় ডাক্তার। তিনি পরীক্ষা করে আমাকে জিগ্যেস করলেন, "আপনার কতদিন আগে ছেলে হয়েছিল ?"

কথাটা এতদিন গোপন ছিল, কিন্তু আর গোপন রইল না। ডাক্তারবাবু ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেলেন। ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর তাঁর যে মূর্তি দেখলাম সে মূর্তি আর কখনও দেখিনি। রাগে যেন দাউ দাউ করে জ্বলছেন মশালের মতো।

"এ কথা আমার কাছে এতদিন গোপন রেখেছিলে কেন ?"

"প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন তো হয়নি এতদিন। আজ প্রয়োজন হয়েছে বলে প্রকাশ করলাম।"

"জান, তুমি আমার কি সর্বনাশ করেছ ?"

"কি সর্বনাশ করলাম !"

"গুরুদেবের মানা আছে আমি যেন কোনও মায়ের গায়ে হাত না দিই। দিলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ কি করলে তুমি, এ কি করলে তুমি—"

দু'হাতে চুল ছিঁড়তে লাগলেন, বুক চাপড়াতে লাগলেন। তাঁর বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে গেল, দাঁতে দাঁত ঘষে চীৎকার করে উঠলেন তিনি— "এক্ষুণি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—"

আমি মুচকি হেসে বললাম, "নতুন লোক এসেছে সে খবর পেয়েছি। সিনেমা তারকার সঙ্গে পাল্লা দেবার আমার ক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই ! ভদ্রভাবে আমাকে বিদেয় করলেই পারতে, এ সব থিয়েটারি অভিনয়ের কোনও দরকার ছিল না !"

"এক্ষুণি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। যদি না যাও চাবকে বার করে দেব।"

এক কাপড়ে বেরিয়ে চলে গেলাম। বিশুদার বাসার ঠিকানাটা জানা ছিল। তার সঙ্গে একদিন সে বাসাতে গিয়েও ছিলাম। সেইখানেই সোজা গিয়ে নামলাম ট্যাক্সি থেকে। বিশুদা ট্যাক্সির ভাড়াটা দিয়ে দিলেন।

পরের দিন বিশুদা গিয়ে আমার গয়নাপত্তর কাপড়চোপড় যা ছিল নিয়ে এলেন। গয়নাপত্তর বেচে কিছু টাকাও হ'ল। সেই টাকার জোরেই মকদ্দমা করেছি। কেন করেছি তা তো আগেই বলেছি আপনাকে। আপনি মধ্যস্থতা করতে চাইছেন, তা'তেও

আমার আপত্তি নেই, আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে যদি মিটমাট করে দিতে পারেন, করে দিন।

আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রণতা
সুহাসিনী

পঞ্চম চিঠি

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়েছি। বিজয়বাবুর এক মুহুরী কাল আমার কাছে একটা ফর্ম নিয়ে এসেছিল **specimen signature** করাবার জন্যে। আজ সেই লোকটাই ব্যাঙ্কের একটা পাস বুক আমাকে দিয়ে গেল! দেখলাম তাতে আমার নামে দশহাজার টাকা জমা করা আছে। টাকা দিয়ে মানহানির ক্ষতিপূরণ হয় না। কিন্তু এই যখন জগতের রীতি এবং আপনার মত বিজ্ঞ লোকের তাই যখন ইচ্ছে—তখন আমি আর আপত্তি করলাম না, মেনে নিলাম আপনার অনুরোধ।

আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রণতা
সুহাসিনী

সুহাসিনী গ্রামে ফিরে গেল।

দিনকয়েক পরে তার স্বামীর চিঠি এল একটি। স্বামী লিখেছেন—

কল্যাণীয়াসু,

আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে কয়েকটি কথা বলিয়া যাইতে চাই। সংকীর্তনের পত্রে জানিলাম তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ। তোমার সব খবরই আমি পাইয়াছি। চিকিৎসা করাইবার ছুতায় বিশ্বপতির সঙ্গে গিয়া তুমি যে একটি লম্পট জমিদারের উপপত্নী হইয়াছিলে তাহা আমার অবিদিত নাই। কিন্তু এবিষয়ে তোমার উপর দোষারোপ করিয়া তোমাকে আমি শাস্তি দিতে চাই না কিংবা আমার গৃহ বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতও করিতে চাই না। কারণ ইহা আমি অনুভব করিয়াছি যে, তোমার মতো রূপসীকে বিবাহ করিয়া আমি তোমার প্রতি সুবিচার করি নাই। তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম পুত্রার্থে। কিন্তু ভগবান তাহাতেও বাদ সাধিলেন। তুমি যে পাপ করিয়াছ ভগবানই তাহার শাস্তি দিবেন, আমি বিচারকের আসনে বসিয়া তোমাকে কোনও শাস্তি দিতে চাই না। আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দিয়া

গেলাম। যদি পার বাকী জীবনটা ভদ্রভাবে কাটাইয়া কন্যাকে ভালভাবে মানুষ করিও। বাবা বিশ্বনাথ তোমাকে সুমতি দান করুন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীহেরম্বপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চিঠি আসবার সাতদিন পরেই হেরম্বপ্রসাদের মৃত্যু-সংবাদও এল। কাশীতে গিয়েই শ্রাদ্ধাদি করল সুহাসিনী। তারপর দেশে ফিরে এসে বাড়ি, জমি, হেরম্বপ্রসাদের গ্রন্থাগার বিক্রি করে হাজার দশেক টাকা যোগাড় করে ফেলল। তারপর চলে গেল কোলকাতায়। সেখানে ছোট একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে বিধবার বেশে রাঁধুনীগিরি করতে লাগল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল মেয়েকে মানুষ করা। মেয়ের নাম রাখল শুচিতা।

মেয়ে

কুড়ি বছর পরে।

…যে শুচিতাকে নিয়ে সুহাসিনী কোলকাতায় এসেছিল, অদ্ভুত বিবর্তন হয়েছে তার। কলেজে সে এখন নামজাদা মেয়ে একজন। যেমন রূপ তেমনি গুণ। লেখাপড়ায় ভালো, খেলাধুলোয় ভালো, অভিনয়েও ভালো। অভিনয়ে মেয়েদের ভূমিকাতে তো ভাল অভিনয় করেই, ছেলেদের ভূমিকাতেও তাক লাগিয়ে দেয়। বিসর্জনে জয়সিংহের ভূমিকায় এমন অভিনয় করেছিল যে পেশাদার অভিনেতারাও চমৎকৃত হ'য়ে গিয়েছিলেন। খেলাধুলোতেও সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল সে। পিংপং থেকে শুরু করে ব্যাডমিণ্টন টেনিস এমন কি ফুটবল-হকি, কিছু সে বাদ দিত না। স্পোর্টে প্রতি বছরই মেডেল কাপ পেত। দুটো আলমারি বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। সুহাসিনী প্রথমে ছোট একটি খোলার ঘরে ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে দীনহীনা বিধবার বেশে আরম্ভ করেছিল অতিশয় সঙ্কুচিত জীবন। প্রথম প্রথম রাঁধুনীগিরি করত একজনের বাড়িতে।

বাড়িতে ইনসিওরেন্স আপিসের একজন লোক থাকতেন। খুব স্নেহের চোখে দেখতেন তিনি সুহাসিনীকে। তাঁরই উৎসাহে এবং অনুগ্রহে সুহাসিনী ইন্‌সিওরেন্সের দালালি শুরু করে কিছু কিছু। সুহাসিনীর চেহারা এবং আলাপের অনন্যতায় অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। বিশেষত যে নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ায় সে আশ্রয় পেয়েছিল সে পাড়ার সকলেই তাকে ভালবাসত। সে ভালবাসায় কোনও লালসা বা গ্লানি ছিল না। দু' একজন যে এই রূপসী বিধবার কৃপাপ্রার্থী হয়নি তা নয়, কিন্তু সুহাসিনী আমল দেয় নি কাউকে। ক্রমশ সকলের ধারণা পাকা হয়ে গেল, সুহাসিনী সে প্রকৃতির মেয়ে নয়।

সে কারো সঙ্গে রূঢ় বা অভদ্র আচরণ করেনি। ভদ্রভাবে এড়িয়ে গেছে। মেয়েরা প্রশ্রয় না দিলে পুরুষরা অগ্রসর হতে সাহস পায় না। ক্রমশ সে পাড়ার সকলের মনে যে আসন অধিকার করেছিল তা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আসন। সুতরাং ইন্‌সিওরেন্সের খদ্দের জুটতে লাগল তার ধীরে ধীরে। আয় বাড়তে লাগল। টাকা জমিয়ে সেলাইয়ের কল কিনল একটা। তার থেকেও আয় হতে লাগল কিছু কিছু। ক্রমশ খোলার বাড়ি থেকে পাকা বাড়িতে উঠে গেল সে। শুচিতা একটু বড় হতেই স্কুলে ভর্তি করে দিলে। স্কুলে মাত্র একবছর মাইনে গুনতে হয়েছিল তাকে। পরের বছরে শুচিতা সব বিষয়ে ফার্স্ট হ'ল। স্কুলের মাইনে তো মকুব হয়ে গেলই, বৃত্তিও পেল ছোটখাটো একটা। এক ধনী ভদ্রলোক ওই স্কুলে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, নিচু ক্লাস থেকে উপর ক্লাস পর্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসের সেরা ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হ'ত সেই টাকার সুদ থেকে, গরীব ছাত্রীদের বই-খাতাও কিনে দেওয়া হ'ত। শুচিতা বরাবর এই বৃত্তি পেয়েছিল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সুহাসিনী গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় এসেছিল—শুচিতাকে লেখাপড়া শেখানো—তা ভালভাবেই সিদ্ধ হ'ল বটে, কিন্তু তবু সুহাসিনীর মনে প্রশান্তি ফিরে এল না। সে বাইরে মুখে হাসি ফুটিয়ে ঘুরে বেড়াতো, কাজকর্ম করত, কিন্তু তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে বসে যে অভাগিনী লজ্জায় মুখ ঢেকে নীরবে রোদন করছিল তার কান্না থামেনি। বিজয় মল্লিককে এক মুহূর্তের জন্যে ভোলেনি সে। বিজয় মল্লিক তাকে যে অপমান করেছিল তা-ও সে ভোলেনি। এই অপমানের কি করে সে জবাব দেবে, উদ্ধত বিজয় মল্লিককে কি করে সমুচিত শিক্ষা দেবে—এ-ও সে নানাভাবে ভেবেছে এই কুড়ি বছর ধরে। তার কোলকাতায় আসার এ-ও একটা উদ্দেশ্য। বিজয় মল্লিক তাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিল, কি করে এই অপমানের শোধ তুলবে? ঠিক কি করলে মনের ঝাল মেটে? একটা কাল্পনিক ছবি সে মনের চিত্রশালায় টাঙিয়ে রেখেছিল—বিজয় মল্লিক যেন সকাতরে কর-জোড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন ধরে এই ছবিতেই রঙ সে ফলিয়েছে নানা ভাবে অহরহ কিন্তু এই কল্পনা-বিলাস বাস্তবে কি করে রূপ পরিগ্রহ করবে, কখনও করবে কি? অসহায়া এক বিধবা কি করে জব্দ করবে অমন প্রতাপশালী জমিদারকে। যে একদিন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তার কাছে আবার সে যাবে কি করে, আর সে-ই বা তার কাছে আসবে কেন, এ সমস্যার জটিলতা সে ভেদ করতে পারেনি। তবু মনে মনে এতেই রঙ ফলিয়ে, কল্পনাতেই বিজয় মল্লিককে পদানত করে তির্যকভাবে খানিকটা তৃপ্তিলাভ করবার চেষ্টা করত সুহাসিনী। চেষ্টা কিন্তু সফল হ'ত না। ওই একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে অন্তর্লোকে বারবার ঘুরে বেড়াত তবু সে। এই সুহাসিনীকে তার মেয়ে বা পাড়াপড়শীরা কেউ জানত না, সুহাসিনীর এ রকম যে একটা অতীত ইতিহাস থাকতে পারে তা কল্পনাও করত না কেউ। পাড়ার লোকের কাছে তার পরিচয় বামুন ঠাকরুন, আর শুচিতার কাছে সে মা।

হঠাৎ কিন্তু অদ্ভুত যোগাযোগ হ'য়ে গেল একটা অপ্রত্যাশিত ভাবে। চাকাটা ঘুরে গেল হঠাৎ। যা অসম্ভব মনে হচ্ছিল তা সম্ভাব্যের সীমায় এসে গেল। শুচিতা তখন বি-এ ক্লাসে পড়ছে। সে একদিন এসে বললে, "মা, এক ভদ্রলোককে রাত্রে আজ খেতে বলেছি। ভালো কিছু রান্না কর।"

শুনে একটু বিস্মিত হ'ল সুহাসিনী। শুচিতার কলেজের অনেক মেয়েবন্ধু এসে খেয়ে গেছে, সেদিন মিস্ হার্ডস্টোন, যার কাছে শুচিতা বক্সিং শিখছে, সে-ও এসেছিল, কিন্তু কোনও পুরুষ-বন্ধুকে তো এ পর্যন্ত আমল দেয়নি শুচিতা। ভদ্রলোক? কোথাকার ভদ্রলোক? শুধু বিস্ময় নয়, একটু ভয়ও হ'ল সুহাসিনীর।

"কাকে আবার খেতে বললি?"

শুচিতা হেসে বললে, "আমাদের কলেজের লেকচারার একজন। যেমন চেহারা, তেমনি বিদ্বান। আজ তাঁর জন্মদিন। কলেজের ছেলেমেয়েরা তাঁকে চাঁদা করে একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছে। আমি তাঁকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করেছি, মানে করতে বাধ্য হয়েছি।"

"বাধ্য হয়েছিস মানে?"

"আমরা যে ক্যামেরাটা দিয়েছি সেটা দিয়ে তিনি একটা গ্রুপ ফোটো তুললেন আমাদের। তারপর বললেন, একটা সিংগল ছবি তুলব। কার তুলব বল। লটারি করা হ'ল। আমার নাম উঠল। তিনি আমার ফোটো তুললেন। আর একটা মজার কথা বলব? আমাদের কলেজে কিছুদিন আগে একটা ফুটবল ম্যাচ হয়েছিল, টিচার্স ভার্সাস স্টুডেন্টস্। উনি টিচারদের দিকে ছিলেন গোলকীপার আর আমি স্টুডেন্টদের দিকে ছিলাম সেণ্টার ফরোয়ার্ড। আমিই দু'গোল ঠুকে দিয়েছিলাম, উনি আটকাতে পারেন নি। তাই আমার ফোটো তোলবার সময় মুচকি হেসে বললেন, দুর্ধর্ষ বিজয়িনীকে আজ ক্যামেরায় বন্দী করা গেল। তারপর কলেজ থেকে বেরিয়ে আবার দেখা হ'ল তাঁর সঙ্গে রাস্তায়। কথায় কথায় বললেন, 'আজ আমার মাকে মনে পড়ছে। আমি ছোটবেলা থেকে বোর্ডিংয়ে বোর্ডিংয়ে মানুষ, কিন্তু জন্মদিনটিতে আমাকে বাড়ি যেতে হ'ত। মা নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন। অনেকদিন আগে মারা গেছেন তিনি, তখন আমি এম-এ ক্লাসে সবে জয়েন করেছি। কিন্তু ঠিক এই দিনটিতে তাঁকে এতো মনে পড়ে।' তখন আমি বললাম, 'আপনি আজ আমাদের বাড়িতে এসে আমার মায়ের হাতে রান্না খাবেন?—আসুন না। মা খুব খুশী হবেন।' ও কথা শোনার পর নিমন্ত্রণ না করাটা কি ভালো দেখায়!"

"বেশ করেছিস—"

"এলে দেখো না, কি রকম ছেলেমানুষ। মনেই হয় না যে ওই মানুষ এম-এ, পি. এইচ-ডি।"

শুচিতার প্রফেসারকে দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল সুহাসিনী। রাজপুত্র যেন

খেতে খেতে আলাপ শুরু হ'ল। প্রথমে সাধারণভাবে, মামুলি ভদ্রতার ভূমিকা দিয়ে।

"আজ তোমার জন্মদিনে তোমার এই অচেনা মায়ের বাড়িতে খেতে এসেছ তুমি, এতে যে কি আনন্দ আর গর্ব অনুভব করছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আশীর্বাদ করছি দীর্ঘজীবী হ'য়ে বাপের মুখ উজ্জ্বল কর। তোমার নামটি কি বাবা?"

"অজয় মল্লিক—"

"কোথায় বাড়ি তোমাদের?"

"কোলকাতায় গ্রে স্ট্রীটে আমাদের বাড়ি আছে। দেশ আমাদের বর্ধমান জেলায় কাসুন্দি গাঁয়ে।"

"তোমার বাবার নাম কি বলতো?"

"বিজয় মল্লিক।"

রোমাঞ্চিত হয়ে বসে রইল সুহাসিনী অজয়ের দিকে চেয়ে। এ কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

"তোমার বাবাও কি এখানে থাকেন?"

"না। তিনি দেশের বাড়িতেই থাকেন, পুজোটুজো করেই বেশীর ভাগ সময় কাটান। কোলকাতায় ভালো লাগে না তাঁর। তবে তাঁর গুরুদেব স্বামী মাধবানন্দ এখানে আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসেন মাঝে মাঝে।"

"স্বামী মাধবানন্দের নাম আমিও শুনেছি। বড় সিদ্ধপুরুষ নাকি। কোথায় থাকেন এখানে?"

"গোয়াবাগানে। নম্বরটা ঠিক মনে নেই। ঢুকেই কিছুদূর গিয়ে বাঁ-হাতি। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড দেওয়া আছে—"

"তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না বাবা। কিচ্ছু ফেলতে পাবে না কিন্তু—"

"ওই অত বড় মুড়োটা আমি খেতে পারব না। পায়েসও একটু কমিয়ে দিন—"

"সে কি হয়!"

শুচিতা স্মিতমুখে একধারে বসেছিল, একটি কথাও বলেনি।

খাওয়া শেষ হবার পর বললে, "মাস্টার মশাই, কাল আপনার টিউটোরিয়ল ক্লাসটায় যেতে পারব না বলে দুঃখ হচ্ছে। আপনি এমন সুন্দর পড়ান। কিন্তু উপায় নেই—"

"কেন, কি করবে তখন—"

"সুইমিং কম্‌পিটিশনে নেমেছি যে। কাল আপনারা যখন ক্লাসে তখন আমি হেদোর জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।"

"ও। তুমি স্পোর্টসের কিছু বাদ দাও না দেখছি।"

সুহাসিনী বললে, "না বাবা, ও কিচ্ছু বাদ দেয় না। ওই যে এন-সি-সি না কি আছে তোমাদের, তাতেও নাম লিখিয়েছে। গরীব বিধবার মেয়ে কিন্তু ঝান্সীর রাণী

হবার শখ ওর। বলছে, তলোয়ার খেলা শিখব, ঘোড়ায় চড়া শিখব। গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ের কি এসব সাজে বাবা, তুমিই বল। আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের মোটর-বাইক ছিল, সেইটেতেই চড়ে চড়ে রপ্ত করে, শেষে এক রেসে জিতে, একটা কাপ পেয়েছে। আমাকে বলছে মোটর-বাইক কিনে দাও একটা। আমি কোথায় পাই বল দেখি অত টাকা—"

শুচিতা বললে, "আমি কি তোমাকে আজই কিনে দিতে বলছি নাকি! কি হবে অত সব কাপ আর মেডেল রেখে। বিক্রি করে দাও না ওগুলো। ওগুলো তো কোন কাজে লাগবে না। একটা মোটর-বাইক থাকলে অনেক সুবিধে হয় কাজের। হয় না মাস্টার মশাই?"

"তা হয়। আচ্ছা আমি এবার চলি—"

"এখুনি যাবে? আর একটু বস। শুচিতা তোর বাজনা শোনা না একটু মাস্টার মশাইকে—"

"মাস্টার মশায়ের কি ভাল লাগবে?"

"কি বাজাও তুমি?"

"স্বরোদ।"

"স্বরোদ আমার খুব প্রিয় যন্ত্র। বাজাও শুনি—"

শুচিতা স্বরোদ বাজাতে লাগল এবং খানিকক্ষণ পরেই জমিয়ে ফেললে। অভিভূত হ'য়ে শুনতে লাগল অজয়।

যথানিয়মে অজয়-শুচিতার ঘনিষ্ঠতা দু'তিন মাসের মধ্যে যে অবস্থায় গিয়ে পাকা হ'ল তাকে প্রেমে-পড়া বললে খারাপ শোনায়, কিন্তু মিথ্যাভাষণ হয় না। অজয় শুচিতাদের বাসায় প্রায়ই আসত। সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল তার শুচিতাকে। লাগবারই কথা। শুচিতার মতো মেয়ে সত্যিই দুর্লভ। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। লেখাপড়া, গানবাজনা, অভিনয়, খেলাধুলো—শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রায় সর্বক্ষেত্রে তার উজ্জ্বল মহিমা। সাধারণত এ রকম মেয়ে একটু পুরুষভাবাপন্ন হয়। কিন্তু শুচিতার বেলায় তা একটুও হয়নি। দু সেট তিন সেট টেনিস সে প্রায় রোজই খেলত কলেজে—(অজয়কে হারিয়েও দিত প্রায়), কিন্তু এজন্যে তার দেহের পেলবতা বা মুখের কমনীয়তা একটুও নষ্ট হয়নি। বরং খেলোয়াড়দের মুখে যে সরল বলিষ্ঠ সপ্রতিভভাব, স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্য ফুটে ওঠে তা শুচিতার মুখেও পরিস্ফুট হ'য়ে তার রূপকে আরও অনবদ্য করেছিল। তাকে দেখলেই মনে হত এ মেয়ে নীচতা, লুকোচুরি বা ছলনার অনেক উর্ধ্বে বাস করে। এ যা করবে সোজাসুজি করবে, যা বলবে তা সোজা মুখের ওপর বলবে, লুকিয়ে চুরিয়ে আড়ালে-আবডালে ছিঁচকেমি করবে না। যদি আঘাত করে সে আঘাত হবে সম্মুখ সমরের বীরোচিত আঘাত। তাই অজয়ের উদ্ভট এবং হাস্যকর প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হয়নি সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হ'তে হয়েছিল,

কিন্তু ঠিক অজয়ের জন্য নয়, তার মায়ের জন্য, মায়ের জিদ বজায় রাখবার জন্য, মায়ের স্বপ্ন সফল করবার জন্য। এটা পরের ঘটনা, যথাস্থানে বলব। হঁ্যা, যে কথা বলছিলুম, ওরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেল। প্রথমে ব্যাপারটা উভয়েরই মনের নেপথ্য-আকাশে নীহারিকার মতো প্রচ্ছন্ন ছিল। সেটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আত্মপ্রকাশ করল যখন শুচিতার জন্মদিনে লাল রঙের একটা দামী মোটর-বাইক এসে হাজির হ'ল একটা দোকান থেকে এবং তার সঙ্গে অজয়ের ছোট্ট একটা চিঠি—'তোমার জন্মদিনের উপহার, অজয়'। শুধু মোটর-বাইক নয়, তার সঙ্গে একটা সাইড-কারও। এরপর অজয়ের সঙ্গে যখন দেখা হ'ল তখন শুচিতা বলল, "এ আপনি করেছেন কি এত টাকা খরচ করে? ভারী অন্যায় কিন্তু। টাকা জমিয়ে আমি এর দাম শোধ করে দেব আপনাকে।"

অজয় গম্ভীরভাবে বলল, "বেশ, দিও। সে টাকা দিয়ে আবার কিছু একটা কিনে দেওয়া যাবে।"

বিকেলের দিকে এই মোটর-বাইক চড়ে সে প্রায়ই যেত গড়ের মাঠের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করত অজয়। সেখান থেকে নানা জায়গায় যেত তারা। কখনও বেহালা, কখনও বোটানিকাল গার্ডেন, কখনও চিড়িয়াখানা, কখনও যাদুঘর। প্রতিদিন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে পরস্পর পরস্পরকে যাচিয়ে নিত নিজেদের মনের কষ্টিপাথরে। যে স্বর্ণরেখা পড়ত সে পাথরের গায়ে, তা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠল ক্রমশ। অবশেষে অজয় মুখ ফুটে বললে একদিন শুচিতাকে।

শুচিতা হেসে উত্তর দিলে, "বিয়ে করতেই হবে তার কি মানে আছে। যে ভাবে চলছে, চলুক না। বন্ধুত্ব জিনিসটা কি মূল্যহীন?"

"খুবই মূল্যবান। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের দলিলটাকে সমাজের দরবারে পাকা করে না নিলে তা বাতিল হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা। আমাদের জীবনে আরও তো অনেক বন্ধু এসেছে, কিন্তু আজ কোথায় তারা? একখানা চিঠি দিয়ে খবর পর্যন্ত নেয় না। বন্ধুত্ব জিনিসটার সঙ্গে পরস্পরের স্বার্থ জড়িত না হ'লে তা প্রায়ই টেকে না। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব পৃথিবীতে বিরল। স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্ব আরও কোমল, আইনের বেড়া দিয়ে ঘিরে তাকে সযত্নে রক্ষা না করলে তা শুকিয়ে যাবে। আর একটা কারণেও আইনের দরকার। স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের তিনটি স্তর আছে। প্রথমটা মানসিক, তৃতীয়টাও বোধ-হয় মানসিক, কিন্তু দ্বিতীয়টা দৈহিক। না, না, এতে লজ্জা পাবার কি আছে। এই দৈহিক সম্পর্ক অনিবার্য যে। সেটা যাতে বিপজ্জনক উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত না হয় তার জন্যেই আইনের দরকার।"

মুচকি হেসে শুচিতা বললে, 'কেন, আমরা দু'জন কি ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারি না? কি আর এমন শক্ত, এত লোক যখন পারছে, তখন আমরাও পারব না কেন। আমি তো নিশ্চয়ই পারি। আপনি পারেন না?"

"আমিও পারি। ওটা যদি পরীক্ষার বিষয় হ'ত নিশ্চয়ই সসম্মানে পাশ করে

যেতাম। কিন্তু কাটখোট্টা ব্রহ্মচর্যে তেমন রুচি নেই। গৃহস্থজীবনের যে ব্রহ্মচর্য আমি তাই পালন করতে চাই। আমি বনে যাব না, মঠে-আশ্রমেও যাব না। আমি সংসার পাতব, সেখানে ছেলে চাই, মেয়ে চাই—"

এর উত্তরে কলকণ্ঠে হেসে উঠলো শুচিতা।

অজয় বলল, "তাছাড়া আমাকে বিয়ে করতেই হবে। আমি বাবার এক ছেলে, তিনি আমার বিয়ে দেবেনই। হয়তো এতদিনে সম্বন্ধ করছেন কোথাও। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তোমার মাকে বলি—"

মাথা হেঁট করে রইল শুচিতা।

এ প্রস্তাব যে আসবে তা সুহাসিনী মনে মনে প্রত্যাশা করেছিল। অনেক কিছু ভেবে রেখেছিল সে। যে বিজয় মল্লিক এতদিন তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল সে যে আবার নাগালের মধ্যে এসেছে এই আনন্দেই দিনরাত কাটছিল তার। একটি কথাই কেবল ভাবছিল সে—যে ছবিটি আমি মনে মনে রোজ দেখি—সেটি কি বাস্তবে রূপান্তরিত হবে? হওয়া কি সম্ভব! বিজয় মল্লিক কি কখনও হাতজোড় করে দাঁড়াবে তার দরজায়, দাঁড়িয়ে বলবে তোমার মেয়েটিকে দাও, আমি পুত্রবধূ করব। তোমার ওপর যে অন্যায় করেছি তার জন্যে ক্ষমা কর আমাকে—এই অসম্ভব ব্যাপার কি সম্ভব হবে কোন দিন!

অজয়ের কথা শুনে সে বলল, "তোমার মতো জামাই পেলে আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পাব। কিন্তু এত সুখ কি আমার কপালে লিখেছেন ভগবান? তোমার বাবা যদি দয়া করেন তাহলে হয়তো হবে। তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর মতটা জান আগে।"

সেই দিনই অজয় চিঠি লিখল বাবাকে।

বিজয় মল্লিকের উত্তর এল দিন সাতেক পরে। সাংঘাতিক উত্তর। বিজয় মল্লিক লিখেছেন—

"তোমার চিঠি পেলাম। তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, ভালো চাকরিও করছ। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবার যোগ্যতা তোমার হয়েছে, সংসার প্রতিপালন করবার সামর্থ্যও হয়েছে। তবু তুমি বিবাহ বিষয়ে আমার পরামর্শ ও অনুমতি চেয়েছ, এতে খুব আনন্দিত হয়েছি, কারণ এতে সুপুত্রসুলভ শিষ্টাচার প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা লিখছি তা হয়তো তোমার মনোমত হবে না। তবু আমার মত যখন চেয়েছ, আমার মতই তোমাকে জানাতে হবে। তোমার মন-রাখা কথা বললে ভণ্ডামি হবে সেটা। আমার মতে বিবাহ ব্যাপারটা একটা সামাজিক কর্ম এবং 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই প্রাচীন উক্তিটি মূল্যবান উক্তি। যে পুত্র বংশের মর্যাদার ধারক ও বাহক হবে, বংশের সংস্কৃতিকে যে উজ্জ্বলতর করবে, সে পুত্রের জননীকে যেখান-সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা চলে না। অপরিণত-বুদ্ধি যুবকদের হাতেও সে নির্বাচন-ভার অর্পণ করা সুবুদ্ধির

কাজ নয়। কারণ যুবকরা যে-কোনও যুবতী মেয়েকে দেখেই সাধারণত মুগ্ধ হয়। তাই ঠিক করেছি আমার পুত্রবধূকে আমি নিজেই নির্বাচন করব তার কুল কুষ্ঠি বংশ-মর্যাদা, রূপ স্বাস্থ্য সব দেখে। যে ঠাকুর ঘরে পুজোর আসনে তোমার মা-ঠাকুমা বসে পুজো করে গেছেন সে ঠাকুর ঘরে যাকে-তাকে আমি ঢুকতে দেব না। তোমার চিঠির ভাব থেকে মনে হচ্ছে কোন বিশেষ মেয়েকে হয়তো তোমার ভালো লেগেছে। এ বিষয়েও আমার স্পষ্ট মতামত আছে। যদি কোন মেয়েকে তোমার ভালো লেগে থাকে, থাকো না তাকে নিয়ে দিনকতক, তার জন্যে যদি কিছু খরচ করতে চাও কর, তাতে আমি আপত্তি করব না। তোমার বাল্যে এবং কৈশোরে তোমাকে অনেক রকম খেলনা কিনে দিয়েছি, যৌবনেও কিনে দিতে আপত্তি নেই। নায়েব মশাই জানিয়েছেন তুমি কোলকাতার অ্যাকাউণ্ট থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা ড্র করেছ একটা মোটর-বাইক কিনবে বলে। আমি খেলনা কেনায় আপত্তি করিনি, করবও না। করব যদি খেলনাটাকে বিয়ে করতে চাও। আমি নিজেও নানা-রকম নারীর সংস্পর্শে এসেছি জীবনে, তা তোমাদের কারও অবিদিত নেই। কিন্তু তাদের বিয়ে করে গৃহিণী করবার প্রবৃত্তি আমার কখনও হয়নি। বিলাস-সঙ্গিনীরা গৃহস্থালীর বাইরেই মানানসই, তাদের গৃহলক্ষ্মী করার চেষ্টা করা হাস্যকর, এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল। আমার এই সেকেলে মতামত হয়তো তোমাদের কাছে কুসংস্কার বা ভাল্‌গার মনে হবে। তা হোক। বাকী জীবনটা ওই কুসংস্কারকেই আঁকড়ে থাকব আমি। তুমি তো জানই, নানারকম কুসংস্কার আছে আমার। পাঁজি মানি, কুষ্ঠি মানি, গুরু মানি। আমাদের পূর্বপুরুষ ভার্গব মল্লিক সেকালে কোলকাতা থেকে কাঁঠাল কাঠের যে সিন্দুকটা এনেছিলেন এবং যার ভিতর রহস্যময়ভাবে একটি পিতলের লক্ষ্মীমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেই লক্ষ্মীমূর্তিটিকে আমি আমাদের বংশের উন্নতির কারণ বলে মানি। আজও সেই সিন্দুক-বাহিনী লক্ষ্মীর পুজো আমি সাড়ম্বরে করি। অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকে সিন্দুক থেকে বার করে ঠাকুর ঘরে স্থাপন করতে। পুরোনো সিন্দুকটায় যখন ঘুণ লেগে গেল তখন সে সুযোগও একটা এসেছিল। কিন্তু আমি সাহস পাইনি, আমার পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছি। নতুন বড় সিন্দুক করিয়েছি আবার। আমার এ সব কুসংস্কারের কথা তুমি জান, এ সব জেনেও তুমি এতকাল আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে এসেছ! বিবাহ-প্রসঙ্গে আমার মতামত তোমাকে জানালাম, আশা করি এটাও তুমি বরদাস্ত করতে পারবে।

আমি তোমার চিঠি পেয়ে নিজেই হয়তো কোলকাতা চলে যেতাম। কিন্তু সম্প্রতি এখানে ডাকাতের বড় উপদ্রব শুরু হয়েছে। তাই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না। আর একটা মুশকিল, আমাদের বন্দুকটা একটু খারাপ হয়েছে। নায়েবমশাই সেটা কোলকাতায় সারাতে নিয়ে গেছেন। কিন্তু আজ তাঁর চিঠি পেলাম বিলিতি মাল এখনও এসে পৌঁছয় নি তাই সারাতে দেরি হচ্ছে।

আশা করি ভাল আছ। আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

চিঠিটা বজ্রাঘাতের মতো এসে পড়ল ওদের স্বপ্নসৌধ-শীর্ষে। রাত্রি ন'টার পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চাতালে বসে শুচিতা আর অজয়ের যে কথাবার্তা হ'ল তা এইরকম। যেন কিছুই হয়নি এইরকম একটা সপ্রতিভ ভাব শুচিতা মুখে ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল। সে একটু মুচকি হেসে বললে, "কি আর করা যাবে বলুন। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, সেকালের সঙ্গে একালের একটা চিরন্তন লড়াই চলছে। এতে আমাদের হার হবে না জিত হবে, সেটা নির্ভর করবে আমাদের শক্তির ওপর। আমরা যতক্ষণ সেকালের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল হ'য়ে থাকব ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নেই, ততক্ষণ ওদের হুকুম মেনে আমাদের চলতেই হবে।"

"তাহলে তুমি কি বলছ ? বাবার অমতে তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে তোমাকে বিয়ে করব ? আমার আপত্তি নেই, তোমার যদি না আপত্তি থাকে।"

"আমার আপত্তি থাকবে কেন ? আপনার মতো লোকের সহধর্মিণী হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ! এ সুযোগ কি কেউ ছাড়ে ?"

শুচিতার চোখে হাসি চিকচিক করতে লাগল।

"না, না, ঠাট্টা করছ তুমি। ভাল করে ভেবে বল—"

"ভাববার কথা তো আপনার। একটা কথা অবশ্য ভেবে রেখেছি, আপনার বড়লোক বাবা তাঁর একমাত্র পুত্রকে যে খেলনা কিনে দিতে চেয়েছেন আমি সে খেলনা কখনও হব না।"

"তা কি আমি হ'তে বলছি ? আমি আমার পরিবার থেকে, সম্পত্তি থেকে যদি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ করি তাহলে তুমি আমাকে প্রসন্ন মনে নিতে পারবে কি না। এই কথাটাই ভেবে দেখতে বলছি তোমাকে—"

"কেন পারব না, আমি তো রাঁধুনীর মেয়ে, আপনাকে পাওয়াটাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? আপনার সঙ্গে আমার যখন আলাপ হয়েছিল তখন আপনার সম্পত্তির কথা, আপনার বাবার কথা আমি জানতাম না। আমি ভক্তি করি অধ্যাপক অজয় মল্লিককে, জমিদার বিজয় মল্লিকের ছেলেকে নয়।"

"বেশ, তাহলে চল, কালই রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে ফেলা যাক। তোমার মায়ের আশা করি অমত হবে না।"

শুচিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "মায়ের অমত হবে না। কিন্তু এইবার সত্যি কথাটা বলছি, আমার অমত আছে। আপনি এই যে ইতস্তত করছেন এর থেকেই বুঝতে পারছি বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে আপনার কষ্ট হবে। তাছাড়া যে বিলাসে আপনি ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত তার সব উপকরণ আপনি মাইনে থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন না। যে বড় বাড়িতে এখন আপনি বাস করেন সে বাড়ি ছেড়ে ছোট একটা ফ্ল্যাটে থাকতে আপনার কষ্ট হবে। আপনি অবশ্য বলবেন—হবে না, কিন্তু আমি বুঝতে

পারছি হবে। আপনাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে নিজের সুখ-সুবিধে করে নেব এত বড় স্বার্থপর আমি নই। নাই-বা হ'ল বিয়ে ? আমরা বন্ধুর মতোই থাকব।"

"বাবা কিন্তু আমার বিয়ে দেবেনই।"

"বিয়ে করুন। বিয়ে করলেও আমাদের বন্ধুত্ব লোপ পাবে না।"

চুপ করে রইল অজয় মল্লিক। সত্যি তার যা মনে হচ্ছিল তা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিল না, চাইছিলও না। শুচিতা যা বলছে এক হিসেবে তা ঠিক, কিন্তু হিসেব মেনে চলাটাই কি জীবনের সব ?

"চুপ করে আছেন যে ? চলুন বাড়ি যাই। রাত অনেক হ'ল।"

তবু অজয় চুপ করে বসে রইল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে।

"কোন কথা বলছেন না কেন ?"

"সত্যটাকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। এ কষ্টের ভাষা নেই তাই চুপ করে আছি।"

"কি সত্য ?"

"তোমার কথা থেকে বুঝতে পারলুম তুমি আমাকে ভালবাসো না। ভালবাসলে নিক্তি নিয়ে যুক্তি ওজন করতে না। আমি যে আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি তুমি সে আবর্তে পড়নি! তুমি তীর থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ। আমি এতদিন অন্যরকম ভেবেছিলুম।"

"আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনার ভালো-মন্দ সুখ-অসুখ বিচার করবার অধিকার আমার হয়েছে কিসের জোরে ?"

হঠাৎ শুচিতার কণ্ঠস্বর আবদার-তরল হ'য়ে উঠল, "না আপনি ওসব কথা বলবেন না। আপনি আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। ওদিকে চেয়ে আছেন কেন, আমার দিকে ফিরে চান—"

তবু অজয় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

মুখ ফিরিয়ে থেকেই হঠাৎ নতুন ধরনের প্রশ্ন করল একটা।

"আর একটা কথার উত্তর দাও। বাবা যে সব কুসংস্কারে অন্ধ হয়ে আছেন তুমি কি চাও না যে আমরা সেটা দূর করি। ওটাকে মেনে নেওয়া মানেই তো সেই কুসংস্কারের আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া। তাঁর মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করেই আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি। এ-ও এক রকম যুদ্ধ। এ যুদ্ধ-ঘোষণা করলে হয়তো আমাদের কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে, অনেক রকম কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, সে তো হবেই, এই সহ্য করাটাই তো পৌরুষ। এতে তুমি বাধা দিতে চাইছ কেন ?"

"বাধা দিতে চাইনি। আমি শুধু এর আর একটা দিক দেখিয়ে দিতে চাইছি। আপনার বাবার কুসংস্কার-মোচনের ব্যাপারে এতদিন তো আপনি উদাসীন ছিলেন, হঠাৎ আমাকে দেখে আপনার সে প্রবৃত্তি জাগল এটা একটু দৃষ্টিকটু নয় ? সবাই বলবে কুসংস্কার-মোচনটা উপলক্ষ, আসল লক্ষ্য আমি। সেটা কি খারাপ লাগবে না ? আর

একটা কথাও আছে। আপনার বাবার কুসংস্কার তাঁর পরিবারেই নিবদ্ধ, তিনি যে পথে বিশ্বাস করেন সেই পথে চলতে চান, স্বাধীন ভারতে সে অধিকার সকলেরই আছে। তিনি যদি বাড়াবাড়ি করেন পুলিসই তাঁকে পাগলা-গারদে নিয়ে যাবে। আমরা ওর মধ্যে নিজেদের জড়াতে যাই কেন!"

"জড়াতে চাই, কারণ আমাদের স্বার্থ যে ওর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। না, তুমি মত দাও, কালই চল বিয়েটা সেরে ফেলি, মত দাও, প্লীজ—"

অজয় আবেগভরে শুচিতার হাত দুটো চেপে ধরল। ঠিক এই মুহূর্তে অঘটন ঘটে গেল একটা। পিছনের অন্ধকার থেকে রূঢ় কর্কশ কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল, "এই কেয়া করতা হ্যায়, চলো, থানা মে চলো।"

দুজনেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দুশমনের মতো চেহারা একটা গুণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে। অজয়ের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল সে ক্ষণকালের জন্য। শুচিতা কিন্তু দমল না।

"আপনা রাস্তা দেখো তুম। চলা যাও হিঁয়াসে।"

"যো বোলনা হ্যায় থানামে যাকে বোলিয়ে গা।"

"কভি নেহি যায়েঙ্গে।"

"জরুর যানা পড়েগা।"

অজয়ের হাতটা ধরল সে। ব্যাঘ্রিনীর মতো মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল শুচিতা এবং তার থুত্‌নির নিচে এমন একটি ঘুষি মারল যে শুয়ে পড়তে হ'ল তাকে। পরমুহূর্তেই শুচিতার হাতে চকচক করে উঠল একটা ছোরা। একটা ছোরা সর্বদা গোঁজা থাকত তার কোমরে।

"জলদি ভাগো, নেহি তো জান লে লেঙ্গে।"

গুণ্ডাটা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল।

"চল বাড়ি যাই—"

মোটর-বাইকটা কাছেই ছিল, দু'জনে সেই দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। অতি ভদ্র, এত বড় বিদ্বান অথচ অত্যন্ত অসহায় এই প্রফেসারটির ওপর অসীম অনুকম্পা জাগল শুচিতার। আহা নিতান্তই ভালো মানুষ। তারই সঙ্গলোভে এই অন্ধকারে এই অস্থানে এসেছিল। হঠাৎ শুচিতাও সেই আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল যে আবর্তের কথা একটু আগে অজয় বলেছিল। তার বারবার মনে হ'তে লাগল, এ লোক আমাকে ছেড়ে থাকবে কি করে? আমিও কি পারবো?

"কাল থেকে সন্ধের পর আর এ জায়গায় আসব না"—শুচিতা বললে।

"কিন্তু এসব জায়গায় না এলে যে নির্জনে তোমাকে পাওয়া যায় না!"

"চলুন, বিয়েটাই তাহলে সেরে ফেলা যাক তাড়াতাড়ি। তবে তার আগে মায়ের মতটা একবার নিতে হবে, তিনি আবার রেজেস্ট্রি-ম্যারেজ শুনে ঝগড়া না লাগান।"

অজয় আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। যা করে বসল তা ওই রকম প্রকাশ্য স্থানে কোনও অধ্যাপকের পক্ষে করা অশোভন।

সুহাসিনী কিন্তু এতে রাজী হ'ল না। অজয় যে টোপ গিলেচে এবং সে যে আর পালাতে পারবে না এ সম্বন্ধে সে নিঃসংশয় হয়েছিল। এ-ও সে বুঝেছিল যে তাড়াহুড়ো না করে যদি ধীরে-সুস্থে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা যায় তাহলে বিজয় মল্লিকের বিষয়-সম্পত্তিও হয়তো বেহাত হবে না।

অজয়কে সে বললে, "তুমি চিঠি লিখেছ বলেই তোমার বাবা ও রকম উত্তর দিয়েছেন। তুমি আমার হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। আমিই তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাব। এতে তিনি হয়তো আপত্তি না-ও করতে পারেন। শুচিতা বড় বংশের মেয়ে, ওর বাবা নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন কাশীতে। সব পরিচয় নিয়ে তাঁর কাছে নিজেই যাব আমি।"

অজয়কে বলতে হ'ল, "বেশ, যা ভাল বোঝেন করুন।"

সুহাসিনী দিন দুই ভাবল। তারপর ঠিক করল প্ল্যানটা। ঠিক করল যে তার পূর্ব পরিচয়টা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দিতে হবে। পাড়ায় তার সুহাসিনী নাম কেউ জানত না। শুচুর মা বলে তাকে ডাকত সবাই। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল থেকে অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সে। কেউ তার খবর রাখত না। তার ভাগে সংকীর্তনই মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর করত তার। ঠিকানা যোগাড় করে একদিন এসেওছিল। কিন্তু সে-ও কিছুদিন আগে মারা গেছে, তার বউও। পূর্ব-জীবনের আর কোনও বন্ধন ছিল না তার। তবু দু'একজন যে আত্মীয় ছিল, তাদের সম্বন্ধেও সে নিশ্চিন্ত হ'ল মিথ্যা চিঠির সাহায্যে। কল্পিত এক হারাধন বসুর স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাদের জানিয়ে দিলে যে সুহাসিনী আর তার মেয়ে কলেরায় মারা গেছে। সুহাসিনীর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে সুহাসিনীর শেষ ইচ্ছার মর্যাদা রাখবার জন্যে স্বাক্ষরকারী তাদের এই সংবাদটি জানাচ্ছে। চিঠিতে কোনও ঠিকানা ছিল না, সুতরাং কোথাও কোনও উত্তর এল না। এরপর আর একটি কাজ করল সুহাসিনী। তাদের প্রতিবেশী চতুরবাবু (পুরো নাম চতুর্মুখ সিংহ) সপরিবারে বিজয় মল্লিকের কুল-গুরু শ্রীমাধবানন্দজীর কাছে মন্ত্র নিয়েছিলেন। মাধবানন্দ যে কোলকাতাতেই আছেন এ খবর অজয়ের কাছে আগেই শুনেছিল সুহাসিনী। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিলে কেমন হয়? মাধবানন্দকে সে যদি নিজের দলে টানতে পারে, মাধবানন্দের কাছ থেকে সে যদি বিজয় মল্লিকের নামে একখানা চিঠি যোগাড় করতে পারে, তাহলে কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। বিজয় মল্লিক গুরুবাক্য অবহেলা করতে পারবে না। চতুরবাবু সুহাসিনীর প্রতিবেশী, তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়াও ছিল তার। চতুরবাবুর স্ত্রীর কাছেই সুহাসিনী একদিন

প্রস্তাব করলে যে সে-ও মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিতে চায়। শুনে চতুরবাবু খুব খুশী হলেন। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাকে। মাধবানন্দও আপত্তি করলেন না। পার্বতী এই নামের আড়ালে আত্মগোপন করে মাধবানন্দের কাছে দীক্ষা নিলে সুহাসিনী। এই সব প্রবঞ্চনা বা ছলনার জন্য এতটুকু ক্ষোভ বা গ্লানি হচ্ছিল না তার। যে বিজয় মল্লিক তাকে একদিন অপমান করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল, যেমন করে হোক তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতেই হবে, তার ছেলের সঙ্গে শুচিতার বিয়ে দিতে হবে, শুচিতাকে তার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করতে হবে। এই হ'ল তার লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে কোনও প্রতারণা প্রবঞ্চনা করতে প্রস্তুত সে। ভগবান যখন তার ছেলে অজয়কে এমন আপনজন করে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের মাঝে, তখন এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাঁর। অজয় আসার আগে পর্যন্ত সবই তো অন্ধকার, অনিশ্চিত ছিল। এখন তো কুল দেখা যাচ্ছে, এখন যেমন করে হোক তীরে তরী ভিড়াতেই হবে।

দিন কয়েক কেটে যাবার পর সুহাসিনী আসল কথাটি পাড়লো মাধবানন্দের কাছে।

"গুরুদেব, সংসারে একটি বন্ধন আমার ওই মেয়েটি। সৎপাত্রে তাকে যদি সম্প্রদান করতে পারি তাহলে আপনার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবার আর বাধা থাকবে না আমার। আপনি একটু কৃপাদৃষ্টি করলে হয়তো আমার দায়টি উদ্ধার হয়—"

মাধবানন্দ স্বল্পবুদ্ধি এবং মূর্খ হলেও লোক খারাপ ছিলেন না। সুহাসিনীর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে বললে, "আমার দ্বারা যদি কিছু সাহায্য হয় তা আমি নিশ্চয় করব। কি করতে হবে বল—"

সুহাসিনী স-সংকোচে বললে, "কাসুন্দি গ্রামের বিজয় মল্লিক শুনেছি আপনার শিষ্য। তাঁর একটি চমৎকার ছেলে আছে। ওঁরা আমাদের পালটি ঘর। আপনি যদি অনুরোধ করে চিঠি লিখে দেন তাহলে তিনি আপনার কথা ফেলতে পারবেন না। গরীব বিধবার একটা বড় দায় উদ্ধার হয় তাহলে—"

মাধবানন্দ বললেন, "চিঠি লিখে দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এসব ব্যাপারে কেবল চিঠি লিখে কাজ হয় না। যেতে হবে সেখানে।"

সুহাসিনী চুপ করে রইল ক্ষণকাল।

"আমার তো পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমিই যাব। ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে আর আপত্তি কি। তবে আপনি চিঠিটি একটু ভাল করে লিখে দেবেন।"

"তা দেব।"

মাধবানন্দের কাছ থেকে চিঠিখানি সে সংগ্রহ করে রাখলো বটে কিন্তু কল্পনায় আর

একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল তাকে। বিজয় মল্লিকের বাড়ি গিয়ে সে নিজে অবশ্য ঘোমটার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকতে পারবে, কিন্তু তার নিজের বংশ-পরিচয় তো দিতে হবে একটা। অজ্ঞাতকুলশীলার মেয়ের সঙ্গে তো বিজয় মল্লিক ছেলের বিয়ে দেবেন না। শুচিতাকে দেখে তাঁর পছন্দ হবেই, একটা মিথ্যে কুষ্ঠি তৈরি করানোও অসম্ভব হবে না, কিন্তু বংশ পরিচয়? এ যুগে টাকা দিয়ে প্রতিপত্তি, যশ, সতীত্ব সবই কেনা যায়, বংশ-পরিচয়ও হয়তো যায়, কিন্তু বিক্রেতা কোথায়? শুচিতার সত্যিকার বংশ-পরিচয় ভালোই, কিন্তু সে পরিচয় দিলে অনিবার্যভাবে তার নামও বেরিয়ে পড়বে, তখন? আমার মেয়ে জেনে কি বিজয় মল্লিক প্রসন্ন মনে তাকে নিতে পারবে? ওই মেয়ের জন্যই একদিন সুহাসিনীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সে।

সুহাসিনীর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গিয়েছিল। প্রেমের জন্য অনেক দুঃখ সে ভোগ করেছিল, যে মূল্য সে দিয়েছিল ভাগ্যবিধাতা সেটা যেন সুদসুদ্ধ উশুল করে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। তাই বোধহয় আর একটা যোগাযোগ ঘটল।

শুচিতার কলেজে 'রক্তকরবী' অভিনয় হচ্ছিল। নন্দিনীর ভূমিকায় নামবে শুচিতা। হৈ হৈ পড়ে গেছে চারদিকে। শুচিতা মায়ের জন্য কম্‌প্লিমেনটারি কার্ড এনেছিল একটা। সুহাসিনী এ রকম কার্ড প্রায় পায়। কিন্তু কোথাও যেতে তেমন উৎসাহ হয় না তার। সেদিন অজয় বিশেষ করে অনুরোধ করাতে গেল দেখতে। চারিদিকে কি ভিড়! কত রকমের লোক, কত রকমের পোশাক, কত রকমের ভদ্রতা, কত রকমের বেয়াদপি। এই ভিড়টাই তো একটা দেখবার মতো জিনিস। থিয়েটার আরম্ভ হ'তে তখনও খানিকটা দেরি ছিল। সুহাসিনী বসে বসে ভিড়টাই দেখছিল তন্ময় হয়ে। হঠাৎ সে চমকে উঠল। ওই সামনে বাঁ-ধার ঘেঁষে বিশ্বপতি বসে আছে না? তার বিশুদা? বুড়ো হয়ে গেছে, চেহারা বদলে গেছে অনেক, তবু বিশুদাকে চিনতে কষ্ট হ'ল না তার। বিশুদাই। কি করছে বিশুদা এখন, কোথায় আছে? মনে পড়ল এই বিশুদাই একদিন টাকার লোভে তাকে চিকিৎসা করাবার ছুতোয় নিয়ে গিয়ে বিজয় মল্লিকের হাতে সঁপে দিয়েছিল। বিজয় মল্লিকের সঙ্গে বিশুদার সে হৃদ্যতা কি এখনও আছে? আগে তো সে বিজয় মল্লিকের দক্ষিণ হস্ত ছিল। এখনও আছে কি? নানারকম চিন্তা তার মাথায় খেলতে লাগল। তারপর থিয়েটার শুরু হয়ে গেল। শুচিতার অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল সুহাসিনী। একি অদ্ভুত অভিনয় করছে মেয়েটা! গর্বে আনন্দে তার মন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল, খানিকক্ষণের জন্য সে সব ভুলে গেল।

এরপর একটা ড্রপ পড়ল যখন তখন অজয় এল।

"চলুন না গ্রীন রুমে। একটু চা কিংবা শরবত খাওয়া যা'ক।"

চা কিংবা শরবত খাওয়ার তত ইচ্ছে ছিল না তার। বিশ্বপতির খবরটা জানবার জন্যেই উৎসুক হয়ে উঠেছিল সে। তার মনে হ'ল অজয় হয়তো কিছু খবর জানতে

পারে। অজয়ের সঙ্গে গ্রীন রুমে গেল। শুচিতার মাকে দেখে ঘিরে ধরল কলেজের ছেলেমেয়েরা, দু'চার জন তরুণ অধ্যাপকও। শুচিতার কৃতিত্বে সবাই আনন্দিত। ইচ্ছে না থাকলেও কিছু খেতে হ'ল সকলের সঙ্গে।

একটু আড়াল পেয়ে সুহাসিনী অজয়কে একধারে ডেকে জিগ্যেস করলে, "বিশ্বপতিবাবু এসেছেন দেখছি। আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। চেন তুমি ওঁকে—"

"বাঃ, বিশুকাকাকে আমি চিনি না? বাবার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন যে এককালে। ছেলেবেলায় কতবার ওঁর কোলে-কাঁধে চড়েছি। খুব ভালোবাসতেন আমাকে। আমিই তো ওঁকে কম্‌প্লিমেনটারি কার্ড পাঠিয়েছিলাম একটা। আজকাল বড় কষ্টে আছেন বিশুকাকা। আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে—?"

"আছে। আমার দূর সম্পর্কের ভাইও হ'ন উনি যে। আমার স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বও ছিল। অনেকদিন দেখাশোনা নেই, এখন কি আর চিনতে পারবেন? এখানে কোথায় থাকেন?"

"সুকিয়া স্ট্রীটে। চুয়াত্তর নম্বর। বড কষ্টে আছেন। বাবাই তো ওঁকে টাকাকড়ি দিতেন বরাবর, হঠাৎ বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হ'য়ে গেছে, বাবা রগচটা মানুষ তো—"

"কি করেন উনি আজকাল?"

"কিসের যেন দালালি করেন। বিশেষ কিছু হয় না। আমি মাঝে মাঝে কিছু কিছু করে দিই।"

"ছেলেমেয়ে আছে?"

"না, সংসার বড নয়, সেইটেই বাঁচোয়া। স্ত্রী একটি মেয়ে রেখে অনেকদিন আগে মারা গেছেন। মেয়েটি তার মাসির কাছে মানুষ হচ্ছিল, সে-ও মারা গেছে কিছুদিন আগে। উনি এখন একা—"

এই সব দুঃসংবাদ সুহাসিনীর কাছে সুসংবাদ বলে মনে হ'ল, সে যেন আলো দেখতে পেল অন্ধকারে। ঠিক করলে নিজেই দেখা করবে গিয়ে। তিনি যদি তার প্রস্তাব মতো তাকে সাহায্য করতে রাজী হন তাহলে বিজয় মল্লিকের কাছে কথাটা অনায়াসে পাড়া যাবে। মস্ত সুবিধে, বিশুদাও বিজয় মল্লিকের ঠিক পালটি ঘর।

সুহাসিনী আর বিলম্ব করল না। পরদিন সকালেই কালীঘাট যাওয়ার নাম করে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে এবং খুঁজে খুঁজে বিশ্বপতির ঠিকানায় গিয়ে হাজির হ'ল। দেখল একটা তিনতলা বাড়ির নীচের একটি ঘরে তিনি থাকেন। কড়া-নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। সুহাসিনী এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

"আমাকে চিনতে পারো দাদা?—"

বিশ্বপতির চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন সুহাসিনীর দিকে।

"না, কে—চিনতে পারছি না তো ?"

"আমি সুহাসিনী।"

"ও, সুহাস!"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বপতি। হঠাৎ তার সমস্ত মনে পড়ে গেল। টাকার লোভে একদা তিনি সুহাসিনীর কত বড় সর্বনাশ করেছিলেন তার পুরো ইতিহাস যেন বিদ্যুতের অক্ষরে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে। নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সুহাসিনীও দাঁড়িয়ে রইল তার মুখের দিকে চেয়ে। তারপর সে-ই কথা কইলে প্রথমে, "চল, ভিতরে চল। তোমার সঙ্গে কথা আছে একটু।"

"এস, এস।"

ভিতরে গিয়ে বিছানাপত্রের অবস্থা দেখে সুহাসিনীর বুঝতে দেরি হ'ল না যে বিশ্বপতির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। নিজেই সে কথা ব্যক্ত করলেন তিনি।

"এই একখানি ঘর নিয়ে কোন রকমে আছি। অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। বস, ওই খাটেই বস। আমি মোড়াটায় বসছি।"

একটা জীর্ণ মোড়া ঘরের কোণ থেকে টেনে নিয়ে বসলেন তিনি। সুহাসিনী প্রশ্ন করল, "এমন দুরবস্থা কেন হ'ল তোমার?"

"ভগবান বলে একজন আছেন তো। তাঁর বিচারে কখনও ভুল হয় কি? অনেক পাপ করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি। তারপর তুমি হঠাৎ কি মনে করে—"

"তোমার সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি। তুমি যদি সাহায্য করো তাহলে আমার কন্যাদায় উদ্ধার হয়।"

বিস্মিত হলেন বিশ্বপতি।

"আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে? আমি নিজেই তো সহায় সম্বলহীন!"

"বিজয়বাবুর সঙ্গে এখন তোমার সম্পর্কটা কি রকম?"

"খুব খারাপ। সম্পর্ক নেই বললেও চলে। অনেককাল দেখাশোনা নেই, আগে দু'একটা চিঠিপত্র লিখতাম, আজকাল তা-ও আর লিখি না।"

"অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলে তোমরা, হঠাৎ এ রকম হ'য়ে গেল কেন?"

"আর খোশামোদ করতে পারলাম না। ওর খেয়াল মেটাবার জন্যে অনেক কু-কাজ করেছি জীবনে। শেষটা আর পারলাম না। ধিক্কার এসে গেল জীবনে। তুমি এসব কথা জানতে চাইছ কেন, তার কাছে আবার ফিরে যাবার মতলব আছে নাকি? তোমার স্বামী তো মারা গেছেন শুনেছি—"

"ফিরে যাবারই মতলব আছে, কিন্তু ভিন্ন পথে। ওর ছেলে অজয় যে কলেজের প্রফেসার, আমার মেয়ে শুচিতা সেই কলেজে বি-এ পড়ে। ওদের দুজনার ভাব হয়েছে খুব। আমি অজয়ের সঙ্গে শুচিতার বিয়ে দিতে চাই। তাতে কোন দোষ হবে

না। আমার পদস্খলন হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে পদস্খলনের প্রভাব আমার মেয়ের মনে বা দেহে নেই, তাই ওর নাম রেখেছি আমি শুচিতা। আমার দুর্মতি হবার আগেই যে ওর জন্ম হয়েছিল তা তুমি জানো, আমার স্বামী যে একজন বিশুদ্ধ চরিত্র বিদ্বান ব্রাহ্মণ ছিলেন তা-ও তোমার অবিদিত নেই। আমার কলঙ্ক আমারই, মেয়ের নয়। অজয় তার বাবাকে চিঠি লিখেছিল বিয়ের প্রস্তাব করে, তার উত্তর তিনি এই দিয়েছেন—।"

অজয়ের কাছ থেকে বিজয় মল্লিকের চিঠিখানি সংগ্রহ করে রেখেছিল সুহাসিনী। আসবার সময় সঙ্গে করেও এনেছিল।

চিঠি পড়ে বিশ্বপতি বললেন, "এ চিঠির পর আর কথা কওয়া শক্ত! তোমার মেয়ে দেখতে কেমন?"

"কাল ওদের কলেজের চ্যারিটি শো'তে তুমি তো গিয়েছিলে। শুচিতাই 'নন্দিনী' সেজেছিল।"

"ও, সে তো রূপসী!"

"বি-এ পড়ছে। গান, খেলাধুলো, অভিনয়, বাজনা সব বিষয়ে ভালো।"

"আটকাবে কিন্তু বংশ-পরিচয়ে।"

"ওর বংশ-পরিচয়ে কোন দোষ নেই। সে সদ্বংশের মেয়ে, ওর বাবার সঙ্গে আমার অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে হয়েছিল।"

"কিন্তু তার মায়ের পরিচয় ঢাকবে কি করে? বিজয়ের কাছে অন্তত সেটা লুকানো যাবে না।"

"যাবে, যদি তুমি সাহায্য করো। আমি যে শুচিতার মা এ কথা বিজয়বাবুর কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে। তোমার একমাত্র মেয়েটি তোমার শালীর কাছে মানুষ হচ্ছিল, সে মারা গেছে শুনেছি। বিজয়বাবুও কি শুনেছেন এ কথা?"

"না, সে শোনেনি, তার সঙ্গে চিঠিপত্র অনেক কাল বন্ধ হয়েছে। সে-ও আমার খোঁজ রাখে না, আমিও রাখি না।"

"তুমি শুচিতাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দাও তাহলে। আমি হই তার মাসি। বিজয়বাবুর কুলগুরুর কাছে আমি মন্ত্র নিয়েছি, আমার আসল নাম গোপন করে। তিনি জানেন আমার নাম পার্বতী। তিনি বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠিও দিয়েছেন। তুমি যেন নিজের মেয়ের সঙ্গে অজয়ের সম্বন্ধ করছো এই ভাবে একটা চিঠি লেখো না। তুমি ওঁর বন্ধু, পালটি ঘরও, কিছু বেমানান হবে না।"

"আমি তা পারবো না। এতক্ষণ বলিনি, সে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে একদিন। তার দ্বারস্থ আর হতে পারব না।"

"তাহলে আমি নিজেই যাব গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। ঘোমটা দিয়ে থাকব, আমাকে তিনি চিনতে পারবেন না। কিন্তু শুচিতার পরিচয় দেব তোমার মেয়ে বলে। তাতে আপত্তি আছে কি তোমার?"

বিশ্বপতি চুপ করে রইলেন।

তার ইতস্তত ভাব দেখে সুহাসিনী বলল, "একটি কথা শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি তোমাকে। আমার যে কলঙ্ক আজ আমার নিষ্পাপ মেয়ের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে তুলেছে, তার জন্যে আমিই দায়ী, আমার দোষ আমি ঢাকতে চাইছি না। আমি বিজয়কে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম, এখনও বাসি। কিন্তু এ বিষয়ে তোমারও দোষ কম নয়, তুমি যদি যোগাযোগ না ঘটিয়ে দিতে তাহলে হয়তো বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে যেতাম না। এতে যদি পাপ হয়ে থাকে, তোমারও পাপ কম হয়নি। আমি আজ তোমাকে যা করতে বলছি তা কিন্তু পুণ্যকর্ম। অজয়ের সঙ্গে শুচিতার যদি বিয়ে দিতে পারো তাহলে সেটা ন্যায় বিচারই হবে। ভেবে দেখ ভালো করে। আর একটা কথাও আছে। ওরা দুজনেই বড় হয়েছে এখন, আইনের সাহায্য নিয়ে অনায়াসেই বিয়ে করতে পারে। তাই করতে চাইছেও। আমি বাধা দিয়েছি। অজয় বড়লোকের সুখী ছেলে, ওর বাবা যদি ওকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন সারাজীবন হয়তো কষ্টে কাটবে ওর। হয়তো অনুতাপ হবে শেষজীবনে। তাই আমি চেষ্টা করছি যাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে। তুমি সাহায্য করলে তা অসম্ভব হবে না। ভেবে দেখ ভালো করে। অমত করো না। আর একটা কথা। এ বিয়ে যদি হয় অজয় তোমাকে ভুলে থাকবে না, তোমার ভার নেবে সে।"

বিশ্বপতি বললেন, "বেশ। কিন্তু আমি তাকে চিঠি লিখতে পারবো না। বড্ড অপমান করেছিল আমাকে। বিজয় যদি আমাকে চিঠি লেখে তাহলে জানিয়ে দেব শুচিতা আমারই মেয়ে। কিন্তু শুচিতা-অজয় কি এই প্রবঞ্চনায় সায় দেবে?"

"ওদের এখন জানাবই না। পরে যদি জানতে পারে, তখন সব কথা খুলে বললেই হবে। সব শোনার পর আমার মনে হয় ওরা আপত্তি করবে না। আমি তাহলে চেষ্টা করে দেখি—?"

"দেখ। কিন্তু আমার মনে হয় হবে না।"

বিশ্বপতির বাসা থেকে বেরিয়ে সুহাসিনী আবার গুরুদেবের কাছে গেল। তাঁকে গিয়ে বলল, "চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে শুচিতা আমারই মেয়ে, কিন্তু আসলে ও আমার বোনের মেয়ে। আমার বোন মারা গেছে অনেকদিন আগে, আমিই ওকে মানুষ করেছি। সেই কথাটাই লিখে দিন খুলে। আমি সেদিন আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম।"

মাধবানন্দ তাই লিখে দিলেন।

সুহাসিনী বিজয় মল্লিকের বাড়ির কাছে যখন পৌঁছল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। দূর থেকে দেখতে পেল বিজয় মল্লিকের প্রকাণ্ড বাড়িটা, বিরাট একটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন। খানিকক্ষণ চুপ করে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। আশঙ্কা হ'ল ঢুকতে গেলে কেউ যদি বাধা দেয়। বিশাল সিংহদরজাটার

দিকে চেয়ে ভয় করতে লাগল তার। তারপর ঘোমটা টেনে অগ্রসর হ'ল ধীরে ধীরে। কেউ বাধা দিল না। গেটে দারোয়ান ছিল, দু'একটা চাকর-বাকরও আনাগোনা করছিল কিন্তু মেয়েমানুষ বলেই সম্ভবত কেউ তাকে আটকাল না। আলোকিত বৈঠকখানার সামনে এসে অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। বারান্দায় দু'চারজন লোক ছিল, ঘরের ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কারা যেন খুব উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা বলছে।

সুহাসিনী ঘোমটা আর একটু টেনে এগিয়ে গেল এবং মৃদুস্বরে একজনকে বলল, "আমি কোলকাতা থেকে এসেছি। বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠি আছে।"

লোকটি বিজয়বাবুর গোমস্তা একজন।

"বসুন আপনি এখানে। চিঠিটা দিন আমাকে। বাবু বাইরেই আছেন। কাল বাড়িতে একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, তাই বড় ব্যস্ত আছেন। চিঠিটা তাঁর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আমি। আপনি বসুন।"

বারান্দার উপর লোহার যে প্রকাণ্ড বেঞ্চিটি ছিল তার উপরই বসল সুহাসিনী। বসেই বিজয় মল্লিকের গলা শুনতে পেল সে :

"লক্ষ্মীর মূর্তিটা কোন রকমে বার করে দিন দারোগাবাবু। আমার পূর্বপুরুষ ভার্গব মল্লিক ওই পিতলের মূর্তিটা একটা সিন্দুকের ভিতর পেয়েছিলেন। ওটা পিতলের মূর্তি। সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলাম সেটাকে। নতুন যে সিন্দুকটা করিয়েছিলাম সেটাতেও রূপোর কাজ করিয়েছিলাম। সোনা-রূপোর লোভেই ডাকাতরা সিন্দুকটাকে চেলিয়ে টুকরো টুকরো করেছে তা বুঝতে পারছি। সিন্দুকটা যাক্, সোনারূপো যাক্— ও সব বাজারে পাওয়া যাবে। কিন্তু ওই মূর্তিটা আমার চাই। ও মূর্তি না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার।"

অজয়ের চিঠিতে এই সিন্দুকের কথা সুহাসিনী পড়েছিল। যিনি এরপর কথা বললেন তিনি সম্ভবত পুলিশের লোক।

"আমার লোকজনেরা তো খুঁজেছে অনেক, এখনও খুঁজছে। কাছেপিঠের বন-জঙ্গলে কোথাও পাওয়া যায়নি। পুকুর দুটোতে জাল ফেলতে বলেছি। যদি সোনার পাতগুলো খুলে নিয়ে সেখানেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকে। দেখি যদি পাওয়া যায়—"

"পেতেই হবে, যেমন করে হোক পেতে হবে। আমার যাবতীয় উন্নতির মূল ওই লক্ষ্মীপ্রতিমা, ওকে না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার—"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, দেখি কতদূর কি করতে পারি—"

"দেখুন, দেখুন প্লীজ—"

দারোগাবাবু বেরিয়ে এলেন এবং চলে গেলেন।

সুহাসিনী হতাশ হয়ে গেলেন একটু। তার মনে হ'ল বড় অসময়ে এসেছি।

গোমস্তা চিঠি নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

"একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। এই চিঠিখানি এনেছেন কোলকাতা থেকে।"

"স্ত্রীলোক ? কোলকাতা থেকে চিঠি এনেছেন ? কি চিঠি দেখি—"

একটু পরে।

"ও গুরুদেবের চিঠি দেখছি ! আচ্ছা, ওঁকে ভিতরে পিসিমার কাছে নিয়ে যাও, আমি পরে ওঁর সঙ্গে কথা বলব। এখন আমার মাথার কিছু ঠিক নেই।"

বিজয় মল্লিকের অন্তঃপুরে কর্ত্রী ছিলেন এক স্থবিরা পিসিমা। তিনি সুহাসিনীর আগমনের হেতু শুনে পুলকিত হয়ে উঠলেন। অজয়ের বিবাহের জন্য তিনি বহুকাল থেকে উৎসুক। কত ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু বিজয় মল্লিক কাউকে পছন্দ করেন নি। প্রত্যেকেরই একটা-না-একটা খুঁত বেরিয়ে পড়েছে। সেই সবেরই বিবরণ বলতে লাগলেন তিনি সুহাসিনীকে। শেষে বললেন, "তোমার মেয়ে যখন সুন্দরী, আর ওর বন্ধুর মেয়ে, গুরুদেবও পছন্দ করেছেন বলছো, তখন হয়তো হয়ে যেতে পারে।"

কিন্তু হ'ল না। সেইদিনই খাওয়া-দাওয়ার পর বিজয় মল্লিক স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, "বিশুর মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না ! ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, মাপ করবেন আমাকে।"

সুহাসিনী এতদিন ধরে এত কৌশল করে যে ফাঁদটি পেতেছিলেন সে ফাঁদে বিজয় মল্লিক ধরা দিলেন না। পরের দিন ভোরের ট্রেনেই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হ'ল তাকে।

সুহাসিনী অজয় আর শুচিতাকে বলেই গিয়েছিল যে সে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে বিজয় মল্লিকের কাছে যাচ্ছে বিবাহের প্রস্তাব করতে।

হৃদয় বিদারক দুঃসংবাদটা নিয়ে যখন সে ফিরে এল, তখন শুচিতা হেসে উঠল হো হো করে।

"কেমন, হ'ল ত ? তোমাকে আমি বলিনি ও-পথে কোনও আশা নেই ! আইনের সোজা পথ যখন খোলা রয়েছে তখন তুমি ওই বাঁকা পথে যেতে চাইছ কেন ? আশ্চর্য লোক তুমি !"

ঠিক এই সময়ে অজয় ঢুকল।

শুচিতা তার দিকে চেয়ে হেসে বলল, "মা ফিরে এসেছেন। একেবারে কলকে পান নি সেখানে।"

সুহাসিনী হাসিমুখে চুপ করে রইল।

তারপর বলল, "আমি একটা খারাপ সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম। তার আগের দিন তোমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। তারা তোমাদের সেই লক্ষ্মীর সিন্দুক ভেঙে তার থেকে লক্ষ্মীর মূর্তিটি বার করে নিয়ে গেছে। তোমার বাবার মাথার একটুও ঠিক নেই। আমি যদি তাঁর হারানো লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিতে পারতাম তাহলে হয়তো তিনি

আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন। তাঁর মনের ওই অবস্থা দেখে আমি আর রইলুম না, পরে কোন এক সময়ে আর একবার চেষ্টা করে দেখব।"

বললে বটে কিন্তু সুহাসিনী মনে মনে জানত সোজা আঙুল দিয়ে ঘি বার করবার আর কোনও আশা নেই। শেষ পর্যন্ত হয়তো আইনের বিয়েতেই মত দিতে হবে।

তার দিন দুই পরে খুব সকালেই অজয় এল আবার।

"বাবা জগন্নাথ গোমস্তার হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন অবিলম্বে তেমনি বড় একটা সিন্দুক আর একটা তেমনি পিতলের লক্ষ্মী পাঠাতে। সিন্দুকের যা মাপ পাঠিয়েছেন তা তো ভয়ানক। অতবড় সিন্দুক তৈরি পাওয়া শক্ত। ফরমাশ দিয়ে করাতে হবে। ট্রেনেও অতবড় সিন্দুক যাবে না। লরী করে পাঠাতে হবে। জগন্নাথ গোমস্তার মারফত এই সব খবর লিখে পাঠিয়ে দিলুম। আপনাদের এখানে আসতে আসতে একটা আজগুবি কল্পনা মনে এল—যদিও তা বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। শুচিতা রাজী হবে না নিশ্চয়—কিন্তু যদি হ'ত ভারি মজা হ'ত তাহলে। হয়তো বাবা বিয়েতে রাজী হয়ে যেতেন —"

"কি কল্পনা—"

"না, সে আর শুনে দরকার নেই। শুচিতা শুনলে চটে যাবে—"

পাশের ঘরে ছিল শুচিতা। বেরিয়ে এল।

"কি শুনলে চটে যাব? আপনি আমার চটার ভারি তো তোয়াক্কা করেন। কাল কি বলে ওই রগরগে রঙের রুমালটা কিনলেন, অত মানা করলুম—"

"রঙটা একটু রগরগে, কিন্তু সিল্কটা ভালো। অতবড় রুমাল মুঠোর মধ্যে মোড়া যায়। অন্য রঙ ছিল না যে।"

"এখন নতুন কল্পনাটা কি শুনি?"

অজয় শুচিতার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"রাগ করবে না তো? এটা অবশ্য কল্পনা, পিওর ইম্যাজিনেশন। তুমি অবশ্য ইচ্ছে করলে এটাকে বাস্তবে পরিণত করতে পার, একমাত্র তুমিই পার, কিন্তু এ-ও আমি জানি তুমি করবে না। You will not stoop so low even to conquer."

"আহা শুনিই না আগে ব্যাপারটা কি—"

"ঠিক মতো যদি অভিনয় করতে পার তাহলে বাবার কুসংস্কারের রন্ধ্র দিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকে যেতে পার। মস্ত বড় চান্স এটা—"

"খুলেই বলুন না—"

"বাবা লিখেছেন আগামী বৃহস্পতিবারের আগেই ওই সিন্দুক আর পিতলের লক্ষ্মী আমাদের বাড়িতে পৌঁছান চাই। সিন্দুকের অর্ডার দিয়েছি, মঙ্গলবারে পাব। একটা লরী ঠিক করেছি, তার ড্রাইভার হচ্ছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু একজন। কলেজের সহপাঠী। মা সেদিন বলছিলেন না আমি যদি তোমার বাবার লক্ষ্মীমূর্তি ফিরিয়ে দিতে পারতাম

তাহলে তিনি হয়তো আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন। আমার মনে হ'ল পিতলের লক্ষ্মীর বদলে জীবন্ত লক্ষ্মীপ্রতিমা বাবা পেয়ে যাবেন, শুচিতা যদি ঠিকমত অভিনয় করতে পারে।"

"অর্থাৎ কি করতে হবে আমাকে?" ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করল শুচিতা।

"তোমাকে ওই সিন্দুকের সঙ্গে যেতে হবে এবং আমাদের গ্রামে লরী ঢোকবার আগেই ঢুকে পড়তে হবে ওই সিন্দুকে। বাবা সিন্দুক খুলে পিতলের লক্ষ্মীর বদলে তোমাকে দেখতে পাবেন—"

হো হো করে হেসে লুটিয়ে পড়ল শুচিতা।

"আপনার কল্পনার দৌড় আছে বটে! তারপর আপনার বাবাকে কি বলব আমি—"

"সে সব ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হবে। তুমি যদি রাজী হও সে সব ঠিক করে দেব আমি। রিহার্স্যালও দিইয়ে দেব। এখনও সময় আছে। রাজী আছ?"

"পাগল না কি! আমি স্পোর্ট ভালবাসি। কিন্তু ও সব ভণ্ডামি আমার দ্বারা হবে না।"

"জানতুম! আচ্ছা, চলি এখন।"

সুহাসিনী বললে, "সিন্দুকের ভিতর দম বন্ধ হয়ে যাবে যে বাবা।"

"সে কি যে-সে সিন্দুক, সে একখানা ঘরের মতো। শুচিতা যদি রাজী হয় তাতে হাওয়া ঢোকবারও ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়। এখনও বল, রাজী আছ?"

শুচিতা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললে, "পাগল না কি—!"

সুহাসিনীর কল্পনাশক্তিও অজয়ের চেয়ে কিছু কম নয়। অজয়ের আজগুবি কল্পনার হাওয়ায় তার মনে আবার নতুন স্বপ্ন জাগল। মনে হ'তে লাগল শুচিতা যদি রাজী হয় আর ঠিক মতো অভিনয় করতে পারে তাহলে বিয়ে তো হবেই, তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই কল্পনা-চিত্রটাও হয়তো জীবন্ত হয়ে উঠবে—বিজয় মল্লিক, অসহায় বিজয় মল্লিক যেন তার কাছে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি করে এ অঘটন ঘটবে তার নাটকটাও মনে মনে ছকে ফেলেছিল সে। তার অন্তর্যামী মন ক্রমাগত বলছিল—এ হবে, হবে,—হবেই। এখন শুচিতা রাজী হলেই হয়। শুচিতা কিন্তু কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। বার বার বলছে, "আমাকে এমন একটা হাস্যকর পরিস্থিতিতে কেন ফেলতে চাইছ তুমি। অনুমতি দাও কালই আমাদের বিয়ে হয়ে যাক। তার জন্যে সিন্দুকের ভিতর আমাকে ঢোকাতে চাইছ কেন?"

সুহাসিনী বললে, "বিয়ে ছাড়াও আমি আরও কিছু চাই।"

"বিজয় মল্লিকের বিষয়? বিষয়ের লোভে তুমি আমাকে ওই মিথ্যে অভিনয় করতে বলছ? তুমি যে এত লোভী তা তো জানতুম না! আমার ধারণা ছিল—"

"না, বিজয় মল্লিকের বিষয়ের উপর আমার লোভ নেই। আমি বিজয় মল্লিককে চাই।"

অবাক হয়ে গেল শুচিতা।

"বিজয় মল্লিককে! কি করবে তাকে নিয়ে?"

"দরকার আছে।"

"কি দরকারটা শুনি না—"

সুহাসিনী মেয়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

"বলতে আমার আপত্তি নেই। কেবল একটা ভয় আছে সব শুনে তুই যদি আমাকে ছেড়ে যাস। ছেড়ে যাবি না বল, ঘৃণা করবি না বল। তুই আমার একমাত্র সন্তান, আমার অপমানের জবাব তুই ছাড়া আর কে দেবে? আমার তো আর কেউ নেই—"

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল সুহাসিনী।

আরও অবাক হয়ে গেল শুচিতা। মা এ সব কি বলছে!

"খুলে বল না সব। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না!"

সুহাসিনী সব কথা খুলে বললে শুচিতাকে। একটুও গোপন করল না কিছু। রাত্রির অন্ধকারে ঘরে খিল দিয়ে বসে নিজের সমস্ত অতীতকে উজাড় করে দিল মেয়ের কাছে। দিয়ে যেন হালকা হ'ল মনটা!

"সেই লোকের ছেলে অজয় যে আবার আমার কাছে আসবে, তোকে বিয়ে করতে চাইবে, এ সব স্বপ্নেও ভাবিনি কখনও। আমার মনে হচ্ছে এ অসম্ভব যখন সম্ভব হতে চলেছে তাহলে আমার অসম্ভব কল্পনাটাই বা সম্ভব হবে না কেন? যে আমাকে একদিন অত অপমান করেছিল সেই বা আমার কাছে হাতজোড় করে দাঁড়াবে না কেন! তুই যদি রাজী হ'স নিশ্চয়ই সফল হবে সে স্বপ্ন—"

"কি করে হবে তা বুঝতে পারছি না।"

"সে আমি বুঝিয়ে বলে দেব তোকে। তুই সেখানে গিয়ে শুধু চলে আসবি, আর কিছু করতে হবে না তোকে। বিজয় মল্লিক তোর পিছু পিছু ছুটে আসবে। তুই রাজী আছিস কি না বল—"

মায়ের অশ্রুসিক্ত অপমানিত মুখের দিকে চেয়ে রইল শুচিতা খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আছি।"

সেই রাত্রেই সুহাসিনী অজয়কে খবরটা দিয়ে এল।

পরদিন সকালে অজয় এসে হাজির। তার চোখ-মুখ আনন্দে উত্তেজনায় উদ্ভাসিত।

"আমি সিন্দুকটার একধারে ছোট একটা স্লাইডিং জানালাও করতে দিয়ে এলাম। শুচিতার কিছু কষ্ট হবে না। প্রকাণ্ড সিন্দুক। তার পার্টটাও লিখে এনেছি, কোথায় সে?"

"পাশের ঘরেই আছে।"

এক মুখ হেসে বেরিয়ে এল শুচিতা।

"দেখি, কি করতে হবে আমাকে।"

"কিছুই যেন জান না, কিছুই যেন বুঝতে পারছ না এই অভিনয় করতে হবে।"

সুহাসিনীর দিকে ফিরে অজয় তারপর বললে, "আপনাদের কিন্তু এ ঠিকানায় থাকা চলবে না।"

"কেন ?"

"আপনি যে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছিলেন। গুরুদেব কি বাসার ঠিকানা জানেন ?"

"জানেন বোধহয়।"

"তিনি ঠিকানা জানলে চলবে না। আমার এক বন্ধু ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে। তার বাসার চাবিটা আমি নিয়েছি। সেইখানে চলুন আপনারা। কারণ, বাবা যদি আসেন গুরুদেবের কাছে যাবেনই, তিনি আপনার কথা বলবেন, তাহলে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।"

"তা বটে ! তাহলে সেই ব্যবস্থাই কর।"

অপূর্ব অভিনয় করল শুচিতা।

তালা-বন্ধ বিরাট সিন্দুকটি নামিয়ে বিজয় মল্লিকের হাতে চাবিটি দিয়ে চলে গেল লরী ড্রাইভার নিখিল বোস। তারপর সেই সিন্দুককে ধরাধরি করে ঘরের ভিতরে আনা হ'ল। বিজয় মল্লিক বন্ধ সিন্দুককেই একবার প্রণাম করলেন। তারপর শঙ্কিত হৃদয়ে স্বহস্তে খুললেন চাবিটা। তারপর ডালা খুলেই চমকে উঠলেন।

"এ কি, সিন্দুকের ভিতর এ কে !"

শুচিতা চোখ বুজে নিঃশব্দে শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে।

বিজয় মল্লিকের হাঁক-ডাকে আরও অনেকে এসে জুটে গেল।

শুচিতা সচকিতা হরিণীর মতো উঠে বসল।

"আমি কোথায় এসেছি ! এ কি ! কে আপনারা ?"

তারপর উঠে দাঁড়াল।

বিজয় মল্লিক হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। স-সম্ভ্রমে সরে গেলেন। যারা ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছিল তারাও পিছিয়ে গেল একটু। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্ম প্রস্তুত ছিলেন না কেউ।

"আমাকে বার করে দিন সিন্দুক থেকে। এর ভিতর কি করে এলাম আমি ? আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। আমাকে বার করে দিন এখান থেকে, কি করে বার হব আমি—"

একটি হাইজাম্পে সে অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারত। কিন্তু তা না করে অসহায়ের মতো মিনতি করতে লাগল, "দয়া করে বার করে দিন আমাকে।"

বিজয় মল্লিক শশব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে এলেন হাত বাড়িয়ে।

পিছিয়ে গেল শুচিতা।

"না না, আমাকে ছোঁবেন না। একটা টুল, না হয় চেয়ার এগিয়ে দিন, আমি নিজেই বেরুতে পারব। কি আশ্চর্য, আমি কি করে এলাম এর মধ্যে।"

একটা উঁচু টুলের সহায়তায় শুচিতা বেরিয়ে পড়ল সিন্দুক থেকে। তারপর ঘরের কোণে যে চেয়ারটা ছিল হঠাৎ তার উপর বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

বিজয় মল্লিক ঘাবড়ে গেলেন।

"কাঁদছেন কেন, কি হয়েছে খুলেই বলুন না।"

"কিছু বুঝতে পারছি না! কাল রাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কি করে যে এই সিন্দুকের মধ্যে এলাম তা বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোন ভৌতিক কাণ্ড। আমি এখুনি ফিরে যাব। মা হয়তো কান্নাকাটি করছেন।"

"কি স্বপ্ন দেখেছিলেন?"—তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলেন বিজয় মল্লিক। উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন তিনি।

"স্বপ্নে দেখলাম, টকটকে লাল-পাড় শাড়ি-পরা একটি অপরূপ সুন্দরী এসে বলছেন, 'মা, এইবার তুমি নিজের ঘরে চল।' আমি উঠে দাঁড়ালাম, তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন, তারপরই ঘুমটা ভেঙে গেল।"

অজয়ের মায়ের বিরাট অয়েল পেন্টিংটা সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। সেটা দেখে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠে দাঁড়াল শুচিতা।

"এই যে তিনি, এই যে তিনি!—কার ছবি এটা?"

"আমার স্ত্রীর।"

"কোথায় তিনি?"

"তিনি অনেকদিন আগে মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন—!"

অবাক হয়ে রইল শুচিতা কয়েক মুহূর্ত। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, "তাহলে এটা ভৌতিক কাণ্ড। আমি আর থাকব না এখানে, চললুম। বড় ভয় করছে আমার। এখান থেকে স্টেশন কত দূর, কোলকাতার ট্রেন ক'টায়—" উত্তরের অপেক্ষা না করেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল শুচিতা। বিজয় মল্লিকও পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন।

"হেঁটে যাচ্ছেন কেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

শুচিতা তখন রাস্তায় ছুটতে আরম্ভ করেছে। বিজয় মল্লিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে

দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "সুজিৎ সিং, মোটর নিকালো, জলদি—"

অর্ধপথেই তিনি ধরে ফেললেন শুচিতাকে।

"চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।"

"স্টেশন কতদূর এখান থেকে? আমি হেঁটেই চলে যাব। আপনি আর কেন কষ্ট করছেন?"

"আমি একেবারে আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেব। আসুন—" একটু ইতস্তত করে শেষে মোটরে উঠে বসল সে।

যতক্ষণ মোটরে ছিল চুপ করে বসেছিল একধারে জড়সড় হয়ে। আর মাঝে মাঝে কাঁদছিল।

"কাঁদছ কেন? কি হয়েছে, ভয় কি—"

শুচিতা কোনও উত্তর দেয়নি, মাথা নীচু করে ঘাড় ফিরিয়ে বসেছিল নীরবে। বিজয় মল্লিক বিস্মিত এবং বিব্রত তো হয়েছিলেনই, শুচিতার সান্নিধ্যে খানিকক্ষণ থেকে এবং তার নম্র-নত ভদ্রভাব লক্ষ্য করে মুগ্ধও হ'য়ে গেলেন। চমৎকার মেয়েটি, তাঁর মনে হ'ল। সত্যিই লক্ষ্মীর মতো চেহারা। ফিকে সবুজ শাড়িটিতে কি সুন্দরই না মানিয়েছে।

কোলকাতার কাছাকাছি এসে শুচিতা হঠাৎ বললে, "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"নিশ্চয়ই রাখব। কি করতে হবে বল?"

"এই ঘটনার কথা কাউকে বলবেন না। আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, একথা শুনলে হয়তো ভেঙ্গে যাবে।"

"ও—। আচ্ছা।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বিজয় মল্লিক।

তারপর প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি জাত?"

"আমরা ব্রাহ্মণ।—মুখোপাধ্যায় আমাদের উপাধি।"

"তাই না কি? তাহলে তো আমাদের পালটি ঘর।"

শুচিতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

কোলকাতায় যখন গাড়ি এসে পড়ল তখন বিজয় মল্লিক জিগ্যেস করলেন, "তোমাদের বাড়িটা কোন্ পাড়ায়—"

"বাদুড় বাগানে।"

অজয়ের পরামর্শে সুহাসিনী আগেই বাসা-বদল করেছিল। সেই ঠিকানায় বিজয় মল্লিক শুচিতাকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন। বাড়ির ঝি-টা আনন্দে চীৎকার করে উঠল, "ওমা, এই যে দিদিমণি গো! মিছিমিছি থানায় খবর দেওয়া হ'ল।"

নেমেই সোজা বাড়ির ভেতর চলে গেল শুচিতা।

বিজয় মল্লিক ঝিকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

"কি হয়েছিল বল তো—"

"তাই কি আমরা জানি। রাত্রে মেয়ে খেয়ে-দেয়ে শুল, তারপর কোথায় যেন উপে গেল বিছানা থেকে। ঘরের খিল বন্ধ, সদর দরজার খিল বন্ধ, অথচ দিদিমণি নেই। সমস্তদিন শহর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি আমরা। আপনি কোথায় পেলেন ওঁকে—?"

বিজয় মল্লিক শুচিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কথাটা ভাঙলেন না ঝিয়ের কাছে। আর একটা প্রশ্ন করলেন।

"বাড়িতে পুরুষ মানুষ কে আছে?"

"কেউ নেই। মেয়ের বিধবা মা আছে।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?"

"দেখি জিগ্যেস করি।"

ঝি ভিতরে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল, "না, উনি দেখা করবেন না।"

ঝি-টিকে অজয় এনে দিয়েছিল শুচিতা রওনা হয়ে যাবার পর। সে এসে বাড়িতে যা যা শুনেছে তাই বলল বিজয় মল্লিককে।

শুচিতা চলে যাবার পর বাড়িতে একটা খোঁজ-খোঁজ রব অজয়ই এসে তুলেছিল। ঝি তারই প্রতিধ্বনি করল। আসল কথা সে জানতই না।

বিজয় মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর সোজা চলে গেলেন গুরুদেবের কাছে। তাঁর মনে হ'ল তিনি ছাড়া এই জটিল রহস্যের সমাধান আর কেউ করতে পারবেন না। এখন তাঁরই উপদেশ অনুসারে চলাই একমাত্র উপায়। এ-ও তাঁর মনে হ'ল সিন্দুকের ভিতর পিতলের লক্ষ্মীপ্রতিমার জায়গায় রহস্যময়ভাবে যে সুন্দরী ঘুমন্ত মেয়েটিকে পাওয়া গেল তাকে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত?

শ্রীমাধবানন্দ অতিশয় ভক্তিমান পুরুষ। তাঁর বিশ্বাসপ্রবণতা অসাধারণ। বিজয় মল্লিকের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং বারবার হাতজোড় করে প্রণাম করতে লাগলেন, কাকে তা ঠিক বোঝা গেল না। তারপর চোখ বুজে দুলতে লাগলেন ধীরে ধীরে। বিজয় মল্লিক অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন মনে মনে। গুরুদেবের এই অবস্থা দেখে তাঁর ভয় হতে লাগল উনি যদি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন তাহলে দু'তিন ঘণ্টার আগে চোখ খুলবেন না।

"গুরুদেব, মনটা বড় অস্থির হয়েছে। এখন আমার কি কর্তব্য সেইটে বলে দিন আগে।"

গুরুদেব চোখ খুলে বললেন, "ও মেয়েকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।"

"সেটা কি করে সম্ভব? পরের মেয়ে। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনলাম, বিয়ে হ'য়ে গেলে পরের বউ হবে। আমার বাড়িতে নিয়ে যাব কি করে?"

"কিন্তু না নিয়ে গেলে অমঙ্গল হবে মনে হচ্ছে। এর মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না?"

"পাচ্ছি। কিন্তু কি করে সম্ভব হবে সেটা? আচ্ছা, এক কাজ করলে কি রকম হয়, ওরা শুনলুম আমাদের পালটি ঘর, অজয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব করি?"

"কর। তাই কর। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। মহাশক্তি নানারূপে ভক্তের কাছে আসেন। কখনও মা হ'য়ে, কখনও মেয়ে হ'য়ে, কখনও প্রিয়া হ'য়ে। পুরাণে এর অনেক উদাহরণ আছে। আমার মনে হয় বিয়ের চেষ্টাই কর তুমি। ও মেয়েকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে—"

মাধবানন্দের চোখ দুটি ভক্তি গদগদ হ'য়ে আবার বুজে এল। বিজয় মল্লিক উঠে পড়লেন। কিন্তু তখনই আর একটি কথা মনে পড়ল তাঁর। বিশ্বপতির শালী তাঁর কাছে গিয়েছিল গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেন করেছেন সে কথাটা গুরুদেবকে বলে যাওয়া উচিত তাঁর মনে হ'ল।

"গুরুদেব, আর একটা কথা। আপনার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে বিশ্বপতির শালী আমার কাছে গিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বপতিকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। অত্যন্ত খারাপ লোক সে, তার মেয়ের সঙ্গে আমি অজয়ের বিয়ে দেব না। আশা করি এতে আপনি রাগ করবেন না—"

"না, না, রাগ করব কেন। ওই মেয়েটিও কিছুদিন আগে আমার কাছে মন্ত্র নিয়েছে, এসে ধরলে তাই লিখে দিলাম চিঠিখানা। কারও অনুরোধ তো এড়াতে পারি না। এখন তো মনে হচ্ছে সবই মহামায়ার খেলা। তুমি যদি রাজী হ'য়ে যেতে তাহলেই সব ভেস্তে যেত। বুঝতে পারছ ইঙ্গিতটা?"

"আমি তাহলে ওইখানেই সম্বন্ধ করবার চেষ্টা করি। আগে অজয়ের কাছে যাই, তার মতটা নি, কি বলেন?"

"তাই যাও। সে অমত করবে না। ছেলে তোমার খুব ভালো।"

বিজয় মল্লিক বেরিয়ে পড়লেন অজয়ের উদ্দেশ্যে।

অজয়ও খুব ভাল অভিনয় করল।

সে সন্দেহ করতে লাগল এর ভিতর কোনও 'ফাউল প্লে' আছে। সে বিজয় মল্লিককে নিয়ে গেল লরী ড্রাইভার নিখিলের কাছে। নিখিল বলল, সে তো কিছুই বুঝতে পারেনি। সিন্দুকের ভিতর কোনও মানুষ ঢোকা তো ইম্‌পসিব্‌ল্। সিন্দুকে তালা দেওয়া ছিল। সে মোটর ছেড়ে কোথাও যায়নি, কোথাও থামেনি পর্যন্ত। সে-ও খুব বিস্মিত হ'ল শুনে।—খুব ভাল অভিনয় করল।

"সিন্দুকের ভিতর পিতলের লক্ষ্মী মূর্তিটা ছিল তো?"

"না। ছিল ওই মেয়েটি!"

"আশ্চর্য কাণ্ড!"

বাবাকে নিয়ে অজয় যখন বাসায় ফিরে এল তখন বিজয় মল্লিক বললেন, "তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ, কিন্তু গুরুদেব আশ্চর্য হননি। তিনি বললেন, পুরাণে এরকম অজস্র উদাহরণ আছে। আচ্ছা তুমি যে মেয়েটির কথা লিখেছিলে তার কি হ'ল—"

"কি আবার হবে। আপনার চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম তাদের। তারা আর আসেনি তারপর।"

"ভালই হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে—"

একটু ইতস্তত করে থেমে গেলেন বিজয় মল্লিক।

"কি?"

"মনে হচ্ছে এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করি। গুরুদেবও তাই বলছেন—"

ভ্রূ-যুগল উৎক্ষিপ্ত করে অজয় এমন ভাবে চেয়ে রইল যেন এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

বিজয় মল্লিক বললেন, "মেয়েটি দেখতে চমৎকার। আমাদের পালটি ঘর। মেয়েটি যে স্বপ্ন দেখেছে এবং তারপর যে সব অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছে সে সব যদি মানতে হয়, উনি যদি সত্যই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী হ'ন তাহলে ওকে বরণ করে নিয়ে যাওয়াই উচিত। গুরুদেবেরও এই মত। তিনি বলছেন মহামায়ার এ ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করলে সারাজীবন পস্তাতে হবে—"

অজয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বলল, "আমি আর কি বলব। আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন।"

"আমি তাহলে মেয়ের মায়ের কাছে কথাটা পাড়ি গিয়ে।"

—সোৎসাহে বেরিয়ে পড়লেন বিজয় মল্লিক বাদুড় বাগানের উদ্দেশ্যে।

সুহাসিনী এইবার সুযোগ পেলেন।

যে ছবিটিকে তিনি মনের নিভৃত চিত্রশালায় এতদিন টাঙিয়ে রেখেছিলেন সেই ছবিটি সত্যই এবার জীবন্ত হয়ে ওঠবার উপক্রম করল। সুহাসিনী বিজয় মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন না; বলে পাঠালেন পর্দার আড়াল থেকে তিনি কথাবার্তা কইবেন।

বিজয় মল্লিক যখন খোঁজ নিলেন তাঁর মেয়ের যে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল সেটা কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তখন সুহাসিনী মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। আমার মেয়ের জন্মের পর আমার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। বছর কয়েক আগে হরিদ্বারে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তিনি যাবার আগে মেয়ের বিয়ের কয়েকটি শর্ত

দিয়ে গিয়েছিলেন। সে সব শর্ত এ যুগে আমাদের সমাজে কেউ মানবে না। তিনি এ-ও বলে গেছেন, মেয়ের বিয়ে যদি না হয় তাহলে দীক্ষা দিয়ে কোনও ভাল মঠে পাঠিয়ে দিতে।"

"কি কি শর্ত দিয়ে গেছেন তিনি ?"

"প্রথমে—আমার কাছে হাতজোড় করে মেয়েটিকে চাইতে হবে, দ্বিতীয়—বিয়ের আগে আমাদের বংশ-পরিচয় জানতে চাইবেন না, তৃতীয়—কোন পণ চাইবেন না। তারপর এই যে অলৌকিক ঘটনাটা ঘটল তা যদি জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে তো—"

"না তা জানাজানি হবে না। আচ্ছা, এখন উঠি, পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব আবার।"

"আবার দেখা করতে চাইছেন কেন ?"

"সে তখনই বলব—"

বিজয় মল্লিক বেশ একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। ছেলের বিয়েতে মোটা পণ নেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। পণ না হয় চাইবেন না। কিন্তু আর দুটো শর্ত যে ভয়ঙ্কর। হাতজোড় করে মেয়ে চাইতে হবে! বংশ-পরিচয় জানা যাবে না! বংশ-পরিচয় না জেনে ছেলের বিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে! একমাত্র ছেলে তাঁর। কোন্ 'হা-ঘরে' ঘরের মেয়ে হয়তো। ভেবে-চিন্তে শেষে ঠিক করলেন বিয়ে দেবেন না। যেমন ছিল তেমনি একটি লক্ষ্মী প্রতিমাই কিনে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন সিন্দুকের ভিতর। কিন্তু এই ব্যাপারটার অলৌকিকত্বের বিস্ময় কিছুতেই তাঁর মন থেকে কাটছিল না। এমন সময় আর একটা কাণ্ডও হ'ল। বাজে একটা ব্যাঙ্কে তাঁর হাজার কয়েক টাকা ছিল, সেই ব্যাঙ্কটা ফেল করল হঠাৎ। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি। আবার ছুটে গেলেন গুরুদেবের কাছে।

সব শুনে গুরুদেব বললেন, "ওই মেয়েকেই বরণ করে নিয়ে যাও তুমি। আর দ্বিমত কোরো না।"

"কিন্তু শর্তগুলি তো শুনলেন !"

"শর্ত শুনেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে ও মেয়ে সাধারণ মেয়ে নয়। ওর বাবা সে কথা জানতেন, তাই হাতজোড় করে চাইবার আদেশ দিয়ে গেছেন। দেবীকে হাতজোড় করেই চাইতে হয়। ওকে যদি লক্ষ্মী বলেই মনে কর তাহলে হাতজোড় করতে আপত্তি কেন তোমার। আর বংশ-পরিচয় ? দেবীর কখনও বংশ-পরিচয় থাকে ? আর কার বংশের কতটুকু পরিচয় তুমি পেতে পার ? ও মানুষ, এইটেই কি ওর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয় ? 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—চণ্ডীদাসের এ উক্তি কি তুমি শোন নি ?"

"শুনেছি। কিন্তু—"

"আর কিন্তু কোরো না। আমার মনে হচ্ছে তোমার সিন্দুক চুরির ব্যাপারটাও

মা লক্ষ্মীর লীলা একটা। এর ভিতরেও নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে হয়তো। তা না হ'লে অত বড় সিন্দুক চুরি করা সহজ ব্যাপার? তুমি আর ইতস্তত কোরো না।"

বাসায় ফিরে বিজয় মল্লিক আর একটি দুঃসংবাদ পেলেন। জমিদারিতে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে। নায়েব মশাইকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে। খুবই ঘাবড়ে গেলেন শুনে। তাঁর মনে হতে লাগল অপমানিতা লক্ষ্মীর অভিশাপেই এই সব হচ্ছে। আর বেশি দেরি করলে হয়তো সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। তিনি স্থির করলেন শর্তগুলির কথা অজয়কে জানাবেন না। আজকালকার ছেলে, হয়তো বলে বসবে ও শর্তে আমি বিয়ে করব না।

গোপনেই তিনি পরদিন সুহাসিনীর বাসায় গেলেন। ঝি-কে দিয়ে খবর পাঠালেন। পর্দার আড়ালে সুহাসিনী এসে দাঁড়াল আবার।

"ও আপনি এসেছেন—"

"হ্যাঁ আমিই।"—গলা খাকারি দিয়ে তারপর বিজয় মল্লিক বললেন, "আমার একমাত্র ছেলে অজয়ের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমার ছেলে এম-এ, পি-এইচ-ডি, প্রফেসারি করে। আমারও বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে। পণের কোনও দাবি নেই আমার। অন্য দুটি শর্তও আমি পালন করব। তবে ঝি-টাকে বাইরে যেতে বলুন—"

সুহাসিনী ঝি-কে বাজারে পাঠিয়ে দিলে।

বিজয় মল্লিক তখন করজোড়ে বললেন, "আপনার মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করছি। আপনি অনুগ্রহ করে সে প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। আপনার বংশ-পরিচয় এখন জানতে চাই না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পরও সেটা কি জানাবেন না?"

"জানাব। কিন্তু কেবল আপনাকে।"

"বেশ।"

এক সপ্তাহের মধ্যে মহা-সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু নাটকটা জমল বিয়ের গোলমাল চুকে যাবার পর। এক নির্জন দুপুরে বিজয় মল্লিক এসে বংশ-পরিচয়টা জানতে চাইলেন সুহাসিনীর কাছে। সুহাসিনী এতদিন আত্মপ্রকাশ করেনি, আড়ালে আড়ালেই ছিল। হঠাৎ সে সামনে এসে দাঁড়াল।

"বংশ-পরিচয় জানতে চাইছেন? এই দেখুন।"

বুকের কাপড়টা সরিয়ে দেখাল। বিজয় মল্লিকের নামটা জ্বলজ্বল করছে সেখানে উল্‌কির অক্ষরে।

"পণও আমি দেব। আপনি আমাকে যে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে একটি পয়সাও আমি খরচ করিনি। চেকবুক আর পাশবুক যেমনকার তেমনি আছে। ব্যাঙ্কের চিঠিও আছে কতকগুলো। এই নিন।"

বিজয় মল্লিক প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।

কল্যাষু

উৎসর্গ

নব বৈবাহিক

শ্রীযুক্ত তুলসীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মান্যবরেষু—

মেয়ের বয়স যখন কুড়ি পেরিয়ে গেল তখন ব্রজেন্দ্রবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর স্ত্রী হরমোহিনী তাঁকে স্থির থাকতে দিলেন না। ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত লোক, একটি গেঞ্জির মিল আছে তাঁর। দেশের সবাই তাঁর নাম জানে। ছোট বড় নানা কাগজে তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়। লোকে জানে তিনি খুব ধনী লোক। কিন্তু ধনী বলে যতটা তাঁর নাম-ডাক ব্যাঙ্কে তত টাকা তাঁর নেই। অধিকাংশ টাকাই ব্যবসাতে খাটছে। তবে অবশ্য টাকার অভাবেই যে তাঁর মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল না তা নয়। কোথায় মনোমত সৎপাত্র আছে তা তিনি ঠিক খবর পাচ্ছিলেন না। মাঝে মাঝে পেলেও যোগাযোগ হচ্ছিল না ঠিক। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখেছিলেন অনেকগুলো। কোনও ফল হয়নি। কয়েকখানা চিঠি লিখে তাঁর এই ধারণা হ'ল যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যে সব পাত্রের জন্য সাধারণতঃ পাত্রী খোঁজা হয় সে সব পাত্র ঠিক সুপাত্র নয়। কোনও না কোনও গলদ আছে তাদের মধ্যে। হয় বয়স বেশী, না হয় চেহারায় বা বংশে খুঁত আছে। অর্থাৎ নিজেদের পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁরা পাত্রী সংগ্রহ করতে না পেরে বিজ্ঞাপনের শরণাপন্ন হয়েছেন। বিজ্ঞাপন-দেনে-ওলাদের মধ্যে আর এক ধরনের লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন ব্রজেনবাবু। এঁরা সাধারণতঃ অবসরপ্রাপ্ত গভর্নমেণ্ট অফিসার। চাকুরি-জীবনে হোমরা-চোমরা ছিলেন। বিজ্ঞাপন দিয়ে আপিসে লোক নিতেন এবং দরখাস্তকারীদের প্রতি যতটা সম্ভব সুবিচার করতেন। এঁদের ধারণা বধূ-নির্বাচনও অনেকটা কেরানী-নির্বাচনের মতো ব্যাপার। ছেলেদের চাকুরি-লাভ আর মেয়েদের স্বামী-লাভ এঁদের চক্ষে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। সুতরাং তাঁরা যতগুলি সম্ভব পাত্রীকে চান্স দিতে চান এবং নিক্তির ওজনে যোগ্যতা বিচার করতে চান তাদের। ব্রজেনবাবু কলকাতার বাইরে থাকেন, সুতরাং ঘটক-সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তাঁর তেমন যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। যে দু' একটি পেশাদারী ঘটক-কোম্পানী নিজেদের যোগ্যতার কথা কাগজে বিজ্ঞাপিত করে থাকেন তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন তিনি। পত্রালাপ করেই বুঝতে পারলেন যে এঁদের দ্বারা তাঁর কাজ হবে না। কারণ এঁরা আগেই টাকা চেয়ে বসলেন। টাকা অর্থাৎ পারিশ্রমিক দিতে ব্রজেনবাবুর আপত্তি ছিল না, কিন্তু চিঠির ধরন-ধারণ দেখে তাঁর সন্দেহ হ'ল কেমন। ও পথে তিনি আর অগ্রসর হলেন না।

অথচ এদিকে মেয়ের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। হরমোহিনীর রাত্রির নিদ্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্রজেনবাবু শেষে ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। তিনি শিক্ষিত লোক, তিনি জানেন যে মেয়ের বিয়েটা এমন একটা কিছু ব্যাপার নয় যার জন্যে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতে হবে। মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে, গানবাজনাও শেখাচ্ছেন তাকে। যথাসময়ে কোথাও না কোথাও বিয়ে হবেই তার। তার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে লাভ নেই।

কিন্তু তবু তিনি ব্যস্ত হ'তে লাগলেন। হরমোহিনীর প্ররোচনায় এলোপাতাড়ি চিঠি লিখতে লাগলেন। শুধু চিঠি নয়, যার সঙ্গে দেখা হ'তে লাগল, তাকেই বলতে লাগলেন —ভাই, আমার মেয়ের জন্য সৎপাত্র দেখে দাও একটি। খবর আসতে লাগল নানারকম। প্রথম খবর এল দূর-সম্পর্কের ভাই হরিমোহনের কাছ থেকে। হরিমোহন একটু তড়বড়ে লোক। তার চিঠি থেকেই সেটা বোঝা যায়। তাড়াতাড়ি ভাব প্রকাশ করার দিকেই ঝোঁক বেশী, বাক্য সম্পূর্ণ নাই বা হ'ল। তার চিঠিখানি এই।

পূজনীয় ব্রজেনদা,

আশা করি বৌদি ও আপনি ভালই। আমি কথা দিয়েছি তাই পাত্রের সন্ধান দিতেছি। মাঝে মাঝে আরও দেব, সন্ধান পেলেই।

এ ছোকরাটি দামোদর ভ্যালি প্রোজেক্টে কাজ করে। বেশ চনমনে। বি. ই. পাশ। নাম হরিশঙ্কর চক্রবর্তী। এস. ডি ও. পদে অধিষ্ঠান করছেন। বয়স সাতাশ। পিতা জীবিত। কলকাতায় নিজ-বাটীতে থাকেন। আদি বাড়ি পূর্ববঙ্গ। ঠিকানা সঙ্গীয় চিরকুটে দিলাম। দাদা, আপনি পাত্রের বাবা জয়শঙ্কর চক্রবর্তীকে পত্র দিন। পাত্রটি মধ্যম পুত্র। বড় ছেলেও একজন বড় ইন্‌জিনিয়ার, বিয়ে হ'য়ে গেছে। পত্রপাঠ ব্যবস্থা করুন এবং আমাকেও পত্র দিন। পাত্রটির রং গৌরবর্ণ, নাক মুখ চোখা। ছেলেমেয়েদের স্নেহাশীষ দেবেন। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

শ্রীহরিমোহন চট্টো

H. T. C. (Head Ticket Collector)

জামালপুর স্টেশন, জামালপুর।

ব্রজেনবাবু 'আশীষ' বানানটার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন। তাঁর ধারণা ছিল হরিমোহন বাংলাটা অন্ততঃ ভালো জানে। 'আশীষ' বানানটা দেখে তাঁর সে ভ্রম দূর হ'ল।

হরমোহিনী বললেন, "বাঙালদের ঘরে আমি মেয়ে দেব না। আমি নিজে বাঙালের মেয়ে, বাঙালদের হালচাল আমার জানা আছে। খাটতে খাটতে আমার মেয়ের হাড় কালি হ'য়ে যাবে।"

হরমোহিনী অবশ্য নামে বাঙাল। তাঁর মা বাবা দু'জনেই পূর্ববঙ্গের। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছেন তাঁরা বহুপূর্বে। হরমোহিনীর বাল্যকালটা কেটেছিল ফরিদপুরে। বাঙাল ভাষাটা পর্যন্ত তিনি ভুলে গেছেন। বাঙালদের কেউ গাল দিলে তাঁর গায়ে লাগে, কিন্তু নিজের মেয়েকে বাঙালদের বাড়িতে দিতে রাজী নন।

ব্রজেন্দ্রবাবু মৃদু হেসে বললেন, "অত ভাবলে কি চলে। আজকাল অসবর্ণ বিয়েও তো হচ্ছে। একটা চিঠি লিখে দেখতে ক্ষতি কি—। পাত্রটি ভালো। আমার তো যতগুলি বন্ধু আছে তাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের লোকই বেশি। ওরা খুব সিন্‌সিয়ার লোক হয়—।"

হরমোহিনী দেবীর স্বামীকে ভৎ´সনা করবার একটা বিশেষ স্টাইল আছে। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে চোখ বড় বড় করে নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন স্বামীর দিয়ে কয়েক মুহূর্ত, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে স্থানত্যাগ করেন। এবারও তাই করলেন। অন্য সময়ে এতে বেশ কাজ হয়, কিন্তু এবার হ'ল না। ব্রজেন্দ্রবাবু অনুভব করলেন যে পরিবারের এই খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করলে মেয়ের বিয়ে হবে না। আমাদের সমাজে সৎপাত্র খোঁজা মানে রাবিশের স্তূপ থেকে স্বর্ণকণিকা আহরণ করা। রাবিশের স্তূপ ঘাঁটতেই হবে। বিখ্যাত কবিতাটার দু'চরণ মনে পড়ল।—যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

সুতরাং তিনি চিঠি লিখলেন একটি। তিনি অনেক চিঠি লিখেছিলেন এই ব্যাপারে, একটি নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করছি :

প্রীতিভাজনেষু—

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। খবর পাইলাম আপনার মধ্যম পুত্রটির এখনও বিবাহ দেন নাই। আমার কন্যার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া তাই এই পত্র লিখিতেছি। আমার কন্যার বয়স কুড়ি বৎসর। সে এবার বি. এ. পরীক্ষা দিবে। রং খুব ফর্সা না হইলেও কালো নয়। সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবতী। লম্বা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ভালো সেতার বাজাইতে পারে। শিল্পকর্মও কিছু কিছু জানে। খুব ভালো আলপনা দেয়। রন্ধনাদিতেও নিপুণ। আমাদের আদি নিবাস হুগলি জেলায়। ত্রিবেণীর সন্নিকটে একটি গ্রামে। সেখানে পূর্বপুরুষদের ভিটা পড়িয়া আছে। কেহই আর সেখানে বসবাস করে না। আমরা তিন ভাই কর্মোপলক্ষ্যে তিন জায়গায় থাকি। আমার তিন ছেলে। একজন অধ্যাপক, একজন ডাক্তার এবং একজন ইন্‌জিনিয়ার। তিনজনেরই বিবাহ দিয়াছি, তিনজনই কর্মে নিযুক্ত। কন্যাটিই কনিষ্ঠা। আমরা অধ্যাপকের বংশ। আমাদের পূর্বপুরুষদের টোল ছিল, সেখানে তাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন। আমি এম. এ. পাস করিয়া কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও পথ পরিত্যাগ করিতে হইল, কারণ বেতন স্বরূপ যাহা পাইতাম তাহাতে কুলাইত না। আমার এক মাড়োয়ারি ছাত্র আমার বিশেষ ভক্ত ছিল। তাহারই পরামর্শে এবং অর্থানুকূল্যে গেঞ্জির ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছি। সুন্দর গেঞ্জি মিলের নাম হয়তো আপনি শুনিয়া থাকিবেন। সেই মিলের অর্ধেক অংশ আমার। আপনি যদি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহা হইলে আমাদের বিস্তৃততর পরিচয় আপনাকে জানাইব। মেয়ের ঠিকুজির নকল এই সঙ্গে পাঠাইলাম। যদি ইচ্ছা হয় মিলাইয়া দেখিবেন। আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গৃহিণীকে না জানিয়েই চিঠিটি পোস্ট করে দিলেন তিনি।

দুই

জয়শঙ্কর চক্রবর্তী লম্বা সুঁটকো লোক। গায়ের রং কুচকুচে কালো। থেলো হুঁকোয় হরদম তামাক খান বলে সাদা গোঁফে লালচে ছোপ ধরেছে। যখন বাইরে বেরোন তখন বিড়ি খান। অন্য কিছু পছন্দ নয় তাঁর। ব্রজেনবাবুর চিঠি যখন এল তখন তিনি ন'হাতি একটি কাপড় পরে' উবু হ'য়ে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। কাজে বেরুবার আগে এইটেই তাঁর দৈনন্দিন কর্ম এবং বিলাস। আগে সরকারী ইন্‌জিনিয়ার ছিলেন এবং সেই সময় কলিকাতার অভিজাত পল্লীতে একটি চারতলা বাড়ি করিয়েছেন। নিজে চারতলায় থাকেন, বাকি তিন তলা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়া থেকেই মাসে হাজার দেড়েক টাকা আসে। তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন বটে কিন্তু পেন্সনটির উপর নির্ভর করে বসে নেই। উদ্যোগী পুরুষ। কন্ট্রাকটারি করেন। দালালিও করেন। তাছাড়া ফাটকা খেলেন, শেয়ার-মার্কেটে গতিবিধি আছে। টাকার অভাব নেই। অভাব সুখের। একটি মেয়ে বিধবা হয়েছে। কিন্তু সে বিধবার মতো থাকে না। রঙীন শাড়ি পরে, হোটেলে মাছ মাংস খায়। সংস্কৃতির নামে বেলেল্লাগিরি করে বেড়ায়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গোঁড়া হিন্দু, সুতরাং সেখানে তার স্থান হয়নি। মেয়েটি জয়শঙ্করের স্কন্ধারূঢ়া হ'য়ে আছে।

জয়শঙ্কর তাকে কিছু বলতে সাহস করেন না। তাঁর ভয় হয় কিছু বললে হয় আত্ম-হত্যা করবে না হয় পালিয়ে যাবে। এম. এ. পাস মেয়ে, মুখের উপর কিছু বলাও শক্ত। গিন্নীর ভয়েও চুপ করে থাকতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় গিন্নীই মেয়েকে যথেচ্ছাচার করবার অবাধ অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি সহজ এবং জোরালো। সামাজিক পথে তাঁর মেয়ের যখন সাধ-আহ্লাদ মিটল না, তখন স্বাভাবিক পথেই তা মিটুক। টাকার জোর থাকলে সমাজে কিছুই যখন আটকায় না, তখন আর ভাবনা কি। মেয়ে সেজেগুজে চারতলার ঘরে বসে যতক্ষণ পিয়ানো বাজাতে চায় বাজাক। যত বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আড্ডা দিতে চায় দিক। যত সংস্কৃতি-সভা করতে চায় করুক। কন্যার বৈধব্যের জন্য জয়শঙ্করবাবুকেই দায়ী করেছেন তাঁর গৃহিণী। বিয়ের সময় নাকি ঠিকুজি মেলানো হয় নি। বিয়ের পর দেখা গেল কন্যার রাক্ষসগণ আর বরের নরগণ। সুতরাং কন্যার প্রসঙ্গ উঠলেই জয়শঙ্করবাবু বাইরে একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়েন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে তিনি খুবই চটে যান সেটা বোঝা যায় তাঁর থেলো হুঁকোর ভড়াক ভড়াক শব্দ শুনলে।

ছেলেদের নিয়েও সুখ নেই তাঁর। বড় ছেলে বিলেত থেকে ইন্‌জিনিয়ার হ'য়ে এসেছে। কিন্তু বিলেত থেকে সে শুধু ডিগ্রিই আনেনি, একটি মেমসাহেব বউও এনেছে। চৌরঙ্গী অঞ্চলে আলাদা বাড়িতে থাকে। একটি ছেলে হয়েছে। মেম মা ছেলের নাম রেখেছে চার্লি।

মধ্যম পুত্রটি বাধ্য, কিন্তু বাবার বাধ্য নয়, মায়ের বাধ্য। সে বলেছে মা যে মেয়েকে পছন্দ করবে তাকেই বিয়ে করবে সে। মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে অনেক। কিন্তু ভদ্রমহিলা পছন্দের যে ফরম্যুলা বানিয়েছেন তা কোন মেয়েকেই ফিট্ করছে না। ডানাকাটা পরী তিনি চান না, অথচ শ্যামবর্ণ মেয়েও পছন্দ নয়, মেয়ে মূর্খ হ'লে চলবে না, অথচ আই. এ. পাস অনেকগুলি মেয়েকে অপছন্দ করেছেন তিনি। বি. এ. পাস মেয়ে তো চলবেই না, কারণ তাঁর মতে বি. এ. পাস মানে বুড়ী। মেয়ের বাপ মা-রা মেয়ের যে বয়স বলেন তা তাঁর বিশ্বাস হয় না।

জয়শঙ্কর তামাক খেতে খেতে ব্রজেনবাবুর চিঠিটি পড়লেন। তারপর গৃহিণীকে ডেকে দিলেন চিঠিখানি। তাঁর মতামতই এ বিষয়ে চূড়ান্ত, তিনি যে রকম উত্তর লিখতে বলবেন তাই তিনি লিখে দেবেন। চিঠিখানি দিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকলেন। আধঘণ্টা পরে যখন বেরুলেন তখন গৃহিণী বললেন, "ঘটির লগে কাম করুম্ না।" তখন জয়শঙ্কর-বাবুর মনে পড়ল বিক্রমপুরের মেয়ে ছাড়া অন্য মেয়ে চান না তিনি।

সুতরাং জয়শঙ্কর ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠির উত্তর দেওয়ার আর প্রয়োজন বোধ করলেন না। একটা পোস্টকার্ড মানেই পাঁচ নয়া পয়সা। অনর্থক অর্থব্যয়ের তিনি পক্ষপাতী নন।

তিন

তিনকড়ি মজুমদার কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন। উত্তর দিতে দেরিও করেন নি, উত্তরের মধ্যে ঝাপসাও কিছু রাখেন নি।

ব্রজেনবাবু এ ভদ্রলোকের খবর পান তাঁর এক দালালের মারফত। তাঁর দালাল শ্রীধর নাগ জহুরী লোক। গেঞ্জির দালালি করতে তাঁকে অনেক জায়গায় যেতে হয়। তিনি কলিকাতাবাসী তিনকড়ি মজুমদারের খবরটি নিয়ে এলেন। বললেন, টালিগঞ্জে প্রকাণ্ড বাড়ি ভদ্রলোকের। ছয় ছেলে, ছ'জনই এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। প্রত্যেকটি ইন্‌জিনিয়ার, প্রত্যেকেই বড় চাকরি করে। আর কি চেহারা সব! রাজপুত্র বলতে চান বলতে পারেন, কন্দর্পকান্তি বলতে চান তাও বলতে পারেন। কোনটাই বেমানান হবে না। আর বাপের চেহারা কি, যেন শিবটি। অবশ্য একটু তফাত আছে। মাথায় জটা নেই, গলায় সাপ নেই, দিগম্বরও নন (ঝোলা পাজামা পরেন)—কিন্তু আর সব মিল। নধর ভুঁড়ি, প্রশান্ত হাসি, চোখের দৃষ্টি থেকে যেন ক্ষমা ঝরে পড়ছে। তাঁর ঠিকানা এনেছি। আজই চিঠি লিখুন তাঁকে। তাঁর পাঁচ ছেলের বিয়ে হ'য়ে গেছে, কেবল ছোটটি বাকি! মেয়ের বাবারা ছেঁকে ধরেছে ভদ্রলোককে। আপনি আজই চিঠি লিখুন। নাগ মশায় ঠিকানা এনেছিলেন। ব্রজেনবাবু অবিলম্বে চিঠি লিখে দিলেন। দিন সাতেকের মধ্যেই উত্তরও এসে গেল:

মান্যবরেষু—

আপনার ৪।১০ তারিখের পত্র পাইয়াছি। যে ঠিকুজি পাঠাইয়াছেন তাহার সহিত আমার পুত্রের ঠিকুজির রাজযোটক মিল হইয়াছে। কিন্তু কন্যার ছকে কুজগ্রহ কোথায় আছে তাহা ধরিতে পারিলাম না। প্রথম যৌবনে জ্যোতিষ লইয়া কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম। কুজগ্রহ যে দাম্পত্যজীবনে নানা বিঘ্নকারক তাহা মনে আছে। কুজগ্রহই কি মঙ্গল? অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

আপনাকে প্রসিদ্ধ গেঞ্জি ব্যবসায়ী ব্রজেন্দ্রনাথ বলিয়া অনুমান করিলে কি ভুল হইবে? আপনার সহিত কুটুম্বিতা কাম্য মনে করি। আপনি শ্রদ্ধেয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন ইহা কম কৃতিত্ব নহে। এইবার আমাদের পরিচয় শুনুন। আমরা ঢাকার বাঙাল। পাকিস্তান ভদ্রাসন গ্রাস করিবার পরে টালিগঞ্জে ছোট একখানা দ্বিতল বাড়ি করাইয়া বাস করিতেছি। আমার ছয় পুত্র, সবগুলিই ইন্‌জিনিয়ার ও ভারত গভর্নমেণ্টের অধীনে কর্মে নিযুক্ত। পাত্র কনিষ্ঠ, বয়স সাতাশ। কিছুদিন পূর্বে সে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের অধীনে ভাল চাকুরী পাইয়াছে।

আপনি লিখিয়াছেন পাত্রী সুশ্রী। সুশ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত গৌরাঙ্গী না হইলে এ পরিবারে মানাইবে না। আর একটা কথাও পূর্বেই পরিষ্কারভাবে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। জীবন-যুদ্ধে নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। চড়াসুদে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কর্জ করিতে হইয়াছে। পাঁচ ছেলের বিবাহ দিয়া ত্রিশ হাজার টাকা শোধ করিয়াছি। কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা পণ লইয়া বাকিটা শোধ করিয়া দিব। সুদের বোঝা আর টানিতে পারিতেছি না। ইহা ছাড়া গহনা-পত্র বরাভরণ প্রভৃতিও আপনাকে দিতে হইবে। আমি কোনও কিছুই ঝাপসা রাখিতে চাহি না। মনে হয় আপনার হাজার বিশেক টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে কন্যাটি পছন্দ হওয়া দরকার। আপনি দূরে থাকেন, আপনার পক্ষে কন্যা লইয়া আসা একটু শক্ত, আমাদের পক্ষেও যাওয়া সহজ নয়। আপনাদের যদি কোনও আত্মীয় কলিকাতায় থাকেন তাঁহাকে আমার কাছে পাঠাইলে সুবিধা হয়। তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া কন্যার রূপের সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ পাইব। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া যদি বুঝি যে কন্যা প্রকৃত গৌরাঙ্গী তাহা হইলে আপনাকে কন্যা লইয়া এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিব। আপনার আত্মীয়কে বলিবেন টালিগঞ্জে চারু অ্যাভেনিউ রোডে পৌঁছিয়া আমার নাম করিলেই অনেকে আমার বাড়ি দেখাইয়া দিবে। বাড়ির রং গোলাপী। বাড়ির নাম বঙ্গকুটির। বাড়ির নম্বর ৩৫।১। চিনিতে কষ্ট হইবে না।

গৌরবর্ণ বর্তমান বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। ফরসা রংও বিভিন্ন চক্ষে বিভিন্ন রকম দেখায়। রবীন্দ্রনাথের মায়ের চক্ষে রবীন্দ্রনাথ কালো ছিলেন!

স্থতরাং আপনার আত্মীয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তবে আপনাকে কন্যা আনিতে অনুরোধ করিব। গৌরবর্ণ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে।

নমস্কার ও প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

শ্রীতিনকড়ি মজুমদার।

হরমোহিনীর এ প্রস্তাবে দুটি আপত্তি ছিল। প্রথম ওরা পূর্ববঙ্গের, দ্বিতীয় ওদের উপাধি মজুমদার। তাঁর ইচ্ছা পাত্রের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় হোক আর বাড়ি হোক কলকাতায়। যদিও কল্‌কাতিয়াদের নিয়ে তিনি স্থযোগ পেলেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে থাকেন কিন্তু মেয়ের বিয়ে তিনি কলকাতাতেই দিতে চান। ব্রজেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান লোক। স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করে যে লাভ নেই এই অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। তিনি কেবল বললেন,—যা বরাবরই বলে আসছেন,—"চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। পাত্রটি ভালো। ভদ্রলোক কলকাতাতেই যখন বাড়ি করেছেন, তখন তো কলকাতার লোকই হ'য়ে গেছেন। আমি শিবুকে লিখে দিচ্ছি ওঁর সঙ্গে দেখা করে আস্থক। কুড়ি হাজার টাকা কোনক্রমে যোগাড় করব ধারধোর করে। পাত্রটি বড় ভালো।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর শ্যালকের নাম শিবতোষ না হ'য়ে কৃষ্ণতোষ হ'লে বেশী মানাতো। কুচকুচে কালো রং। বলিষ্ঠগঠন কোল বা সাঁওতালের মতো দেখতে। ব্রজেন্দ্রবাবুর নির্দেশে শিবতোষই তিনকড়িবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তিনকড়িবাবু নাকি তাকে আপাদমস্তক একবার দেখে একটি প্রশ্নই করেছিলেন, "আপনার ভাগ্নী কি আপনারই মতো দেখতে?"

শিবতোষ ভালোমানুষ লোক। অত ঘোরপ্যাঁচের ধার ধারে না। বলেছিল, "কিছুটা মিল আছে বই কি। হাজার হোক ভাগ্নী তো। তবে আমার মতো এতো কালো নয়।"

তিনকড়িবাবু আর কোন কথা জিজ্ঞেস করেন নি। ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠির উত্তরে সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন—"আপনার শ্যালকের সহিত আলাপ করিলাম। বুঝিলাম আমরা পাত্রী যেরূপ চাই আপনার কন্যা সেরূপ নহে। স্থতরাং এ বিষয়ে আর কথা বাড়াইতে চাহি না। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ব্রজেন্দ্রবাবু চিঠি পেয়ে খুব দমে গেলেন। তাঁর মেয়ে যে কারও অপছন্দ হবে এ ভয় তাঁর ছিল না। তাঁর ভয় ছিল অত টাকা যোগাড় করতে পারবেন কি না। কিন্তু তাঁর ভক্ত এবং পার্টনার স্থন্দরমল আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁকে—আপনি ভালো পাত্র ঠিক করুন, টাকার ভার আমি নিলাম। এই আশ্বাসে তাঁর মন চিন্তামুক্ত হ'য়ে নির্মেঘ আকাশের মতো হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু তিনকড়িবাবুর চিঠি পেয়ে আবার মেঘ জমতে লাগল।

হরমোহিনী কেবল বললেন, "হয়নি বাঁচা গেছে। ও বাড়িতে আমার মেয়ের স্থখ হ'ত না। দেখেছি তো, পূর্ববঙ্গে বউদের ভয়ানক খাটায়!"

ব্রজেন্দ্রবাবু কয়েকদিন চুপ করে রইলেন। মনের বিমর্ষ ভাবটা কাটতে কয়েকদিন

লাগল তাঁর। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হচ্ছিল, যাক্ গে, যা হয় হবে, আর পারা যায় না। কিন্তু এ নিবৃত্তিমার্গে বেশীদিন তিনি চলতে পারলেন না। তাঁর বিবেক তাঁকে বলতে লাগল—'তুমি অন্যায় করছ, কর্তব্যে অবহেলা করছ।' তাঁর অহংকার তাঁকে ওসকাতে লাগল—'তুমি সৎপাত্র যোগাড় করতে পারবে না? কিসের অভাব তোমার! তোমার মিলের দেশজোড়া নাম। সুন্দরমলের মতো টাকার কুমীর তোমার ভক্ত। তোমার তিন তিনটি উপযুক্ত ছেলে, এত বন্ধুবান্ধব। তোমার মেয়ের পাত্র জুটবে না? হতাশ হচ্ছ কেন? কাপুরুষরাই হতাশ হয়।'

উত্তেজিত হ'য়ে ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁর তিন ছেলেকে এবং কয়েকজন বন্ধুকে চিঠি লিখলেন।

চার

তাঁর বড় ছেলে অধ্যাপক। সে চিঠি পেয়েই উত্তর দিল বাবাকে।

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। উষার জন্য আমি পাত্রের সন্ধানে আছি। একটি পাত্রের খবর পেয়েছি। ছেলেটি সম্প্রতি বিলেত থেকে লিটারেচারে ডক্‌টরেট্ পেয়ে ফিরেছে। আশা করছি ভাল চাকরিই পাবে। তার ঠিকানা নীচে দিলাম। ছেলেটির বাবা নেই, মা-ও নেই। মামারাই বিবাহের কর্তা। বড মামা রিটায়ার্ড সব-জজ। নাম শশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুঙ্গেরে থাকেন। তাঁর ঠিকানাও এই সঙ্গে দিলাম। আপনি তাঁকে পত্র লিখুন। আমিও ছেলেটির সহিত এ বিষয়ে আলাপ করব। একদিন তার বাসায় গিয়েছিলাম, দেখা পাইনি। আপনি ও মা আমার প্রণাম জানবেন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত

নরেন।

দ্বিতীয় পুত্র বরেন, ডাক্তার। সে যা উত্তর দিল তা ব্রজেন্দ্রনাথের ভালো লাগল না। ছেলেটা বরাবরই জ্যাঠা। সে লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনি উষার বিয়ের জন্য এত ভাবছেন কেন বুঝতে পারছি না। আজকাল মেয়েদের বিয়ের জন্য কেউ ভাবে নাকি। মেয়েরা আজকাল আর সমাজশৃঙ্খলে বন্দিনী নয়। ছেলেদের মতোই তারা স্বচ্ছন্দে চলতে ফিরতে আরম্ভ করেছে। বিয়ে যথাসময়ে এবং যেখানে হোক হবে। উষা নিজেই পছন্দ করে হয়তো বিয়ে করবে কাউকে। জোর করে কারো ঘাড়ে একটা বিয়ের জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া সমীচীনও নয় সব সময়ে। তাতে তাদের সহজ গতি নষ্ট হ'য়ে যায়, অনেক সময় জীবনই দুর্বহ হ'য়ে পড়ে। আজকাল মেয়েরা তো নিজেদের পায়ে বেশ দাঁড়াতে শিখেছে,—তারা ডাক্তার হচ্ছে,

শিক্ষক হচ্ছে, ইন্‌জিনিয়ার হচ্ছে, ব্যারিস্টার হচ্ছে, উকীল হচ্ছে, পুলিশবিভাগেও ঢুকছে। কেরানী, স্টেনোগ্রাফার, টাইপিস্ট তো অজস্র। মেমসায়েব নার্স আজকাল বিরল, তাদের জায়গা নিয়েছে আমাদের দেশের মেয়েরা। মেয়েদের স্কোপ অনেক, ছেলেদের চেয়েও বেশী। উষা লেখাপড়ায় ভালো, সে এম. এ. পড়ুক। তারপর বিলেতে গিয়ে একটা ভালো ডিগ্রি নিয়ে আসুক। ওর যে রকম সাহিত্য-প্রীতি, তাতে মনে হয় ওদেশের কোনও বড় ইউনিভার্সিটি থেকে ও ডি লিট্. হ'য়ে আসতে পারবে। আপনি ওর বিয়ের জন্যে যে টাকা খরচ করবেন তার চেয়ে ঢের কম টাকায় ওর উজ্জ্বল 'কেরিয়ার' হ'য়ে যাবে। যাই হোক আপনি যখন লিখেছেন তখন পাত্রের সন্ধানে থাকব। আপনি অনর্থক চিন্তিত হবেন না। আজকাল মেয়ের বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। আপনি ও মা আমার প্রণাম নেবেন! উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত

বরেন।

তৃতীয় পুত্র হরেনের উত্তর এল কয়েকদিন পরেই।

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, আপনি উষার জন্যে ইন্‌জিনিয়ার পাত্র খুঁজতে বলেছেন, আমি কয়েকটি পাত্রের খবর দিলাম। আমি ওদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। কুমুদকান্তি আমার সঙ্গে শিবপুরে পড়ত। পড়াশোনায় ভালো। কিন্তু গোঁড়া কমিউনিস্ট। তার বিশ্বাস আমাদের দেশেও পুরোপুরি মজদুররাজ হ'য়ে যাবে আর সেই রাজ্যের সে হবে ক্রুশ্চেভ। তাছাড়া বড্ড বেশী সিগারেট খায়। রোজ প্রায় তিন প্যাকেট। অন্য ছেলেগুলির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। একটি ছেলে যাদবপুরের, আর একটি খড়্গপুরের। আপনি ইন্‌জিনিয়ার পাত্রের উপর এত ঝোঁক দিচ্ছেন কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমি নিজে ইন্‌জিনিয়ার হ'য়ে দেখছি এ অতি ওঁছা প্রফেসন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটি নেই। আর যতসব অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে কাজকর্ম। সন্ধ্যের পর ক্লাবে বা আড্ডায় যাদের সঙ্গে দেখা হয় তারা সব নির্জলা স্নব। ভদ্রলোক তো কই চোখে পড়ল না এখনও। অন্য প্রফেসনের তুলনায় রোজগার কি খুব বেশী? গভর্নমেণ্টের চাকরিতে মাইনে খুবই কম। প্রাইভেট সার্ভিসে বেশী মাইনে দেয় বটে কিন্তু সিকিউরিটি নেই। আর খাটতেও হয় খুব বেশী। তাছাড়া আর একটা কথা মনে হয়। চারিদিকে যে রকম রেটে হু হু করে ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ আর স্কুল হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে ইন্‌জিনিয়ারদের বাজারদরও কমে যাবে। আপনি যদি বলেন অন্য পাত্রেরও চেষ্টা করতে পারি। প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়ত। ভারি ভালো ছেলে। আমাদের পালটি ঘর। এখন মফঃস্বলের কোনও কলেজে প্রফেসারি করছে। প্রাইভেট কলেজ, মাইনে দু'শ টাকার বেশী নয়। পরে উন্নতি

হবে। যদি বলেন এর সঙ্গে সম্বন্ধ করি। এদের পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। সবাই খুব ভালো। আমার মনে হয় উষা এখানে সুখে থাকবে। তবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মতো থাকতে হবে। আমার শরীর আপাততঃ ভালো আছে। মাঝে কয়েকদিন জ্বরে ভুগে উঠলুম। ডাক্তারবাবু বললেন, 'লু' লেগেছে। সমস্ত দিন সাইটে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়, বিশ্রাম করবার যে জায়গাটুকু, তাও টিনের। এখন ভালো আছি।

আপনি ও মা আমার প্রণাম নেবেন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। এই গরমে জাম্বু আর ভুটান কেমন আছে? ইতি—

প্রণত

হরেন।

জাম্বু ভুটান কুকুরের নাম। দুটি কুকুরই হরেনের খুব প্রিয়।

তিন ছেলের চিঠি নিয়ে আলোচনা হ'ল কর্তা-গিন্নীর মধ্যে। ব্রজেন্দ্রকুমার বরেনের উপর চটেছিলেন বলেই হরমোহিনী তার পক্ষ অবলম্বন করলেন।

বললেন, "ও তো মিছে কথা লেখেনি কিছু। তোমরা এতকাল দুপায়ে মেয়েদের থেঁৎলে আধমরা করে রেখেছিলে, এইবার তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াবেই তো। তোমরা যে বড্ড বাড়িয়েছিলে। ঠিক লিখেছে বরেন—"

ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীর একটি বৈশিষ্ট্য বরাবরই লক্ষ্য করেছেন। যখনই এই ধরনের কথা হয় তখনই হরমোহিনী তাঁকেই শত্রুপক্ষ মনে করে পাঁয়তারা করেন। একমাত্র তিনিই যেন মেয়েদের দুর্দশার জন্য দায়ী। মুখে তিনি যদিও 'তোমরা' বলেন, কিন্তু তাঁর চোখ মুখ দেখে মনে হয় বহুবচনটা বাহুল্যমাত্র। পুরুষরাই মেয়েদের উপর নানা অত্যাচার করেছে এ কথাটা ইতিহাসসম্মত। কিন্তু যে সব কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সব কথা মোটেই কম সত্য নয়, তা হচ্ছে এই যে সব দেশে মেয়েমানুষরাই পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। ইতিহাসেও পড়া যায় বড় বড় যুদ্ধের মূলে মেয়েমানুষ। আমাদের দেশেও মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাদের নির্যাতনটা হয়তো পুরুষদের হাত দিয়েই হয়—কিন্তু সে হস্ত নিয়ন্ত্রণ করে অনেক সময় মেয়েরাই। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ এত কথা হরমোহিনীকে বললেন না। তিনি জানেন, বলে লাভ নেই। হরমোহিনীর মনোগত ইচ্ছাটা যে কি তাও তিনি জানেন, সুতরাং সেই পথে আক্রমণ করলেন।

বললেন, "বরেনের মতেই যদি তোমার মত হয় তাহলে আর এতো পাত্র খোঁজা-খুঁজির দরকার কি। ওকে পড়ানোই যাক। বিলেত পাঠাবারই ব্যবস্থা করি না হয়—"

ঝেঁজে উঠলেন হরমোহিনী।

"যা হয় না, হবে না, হ'তে পারে না তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! তোমার ওই আদুরে মেয়ে চাকরি করতে পারবে, না বিলেত যেতে পারবে? এখনও সামনে বসে খাওয়াতে হয়। সবাই কি সব পারে? মেয়েটিকে যেরকম আদুরে করেছ তাতে

বিয়ে দেওয়া ছাড়া গতি নেই, তা-ও যা তা ঘরে দিলে চলবে না। ভালো করে দেখে শুনে দিতে হবে যাতে সেখানে খাপ-খাইয়ে সুখে থাকতে পারে। বরাবর পইপই করে বলেছি মেয়েকে অত আদর দিও না, মেয়েকে অত আদর দিতে নেই। কার হাঁড়িতে চাল দিয়েছে এক ভগবান ছাড়া তো আর কেউ জানে না, নিজেদের সেই বুঝে চলতে হবে। কিন্তু তুমি কি আমার একটি কথাও শুনেছ কখনও ?"

কোনও সতী রমণীকে মিথ্যাবাদিনী বলা উচিত নয়, ভদ্রতার আইনে আটকায়। ব্রজেন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারতেন যে তিনি মেয়েকে একটু-আধটু প্রশ্রয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছেন হরমোহিনী নিজে। উষার খাওয়ার নানা-রকম বাছবিচার। বেগুন খাবে না, পোস্ত খাবে না। ছোট মাছ ছোঁবে না। গৃহস্থ ঘরের ছেলে-মেয়েরা চিরকাল বাসী রুটি আর তরকারি খেয়েছে, কিন্তু উষা তা খাবে না। তার চাই মাখন দেওয়া টোস্ট, বিস্কুট, জ্যাম, জেলি। মাংসটি খুব প্রিয়। কিন্তু কোন্ গৃহস্থ ঘরে রোজ মাংস হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ আগে আগে হরমোহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন এদিকে। কিন্তু হরমোহিনী গ্রাহ্য করেন নি। তখন তাঁর যুক্তি ছিল—"ভবিষ্যতে কি হবে তাই ভেবে এখন থেকে ওর খাওয়া বন্ধ করে দেব না কি! ভবিষ্যতে ওর অদৃষ্টে যদি দুঃখ থাকে ভবিষ্যতেই সেটা ও ভোগ করবে। এখন থেকে সেটা ভোগ করে লাভ কি। ভবিষ্যতে কি হবে তা জানা নেই বলেই তো আরও উচিত এখন ওকে ভালোভাবে খেতে পরতে দেওয়া। আমাদের কাছে যতদিন আছে ততদিন যতটা পারে খেয়ে মেখে নিক, তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তুমি এ নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামাচ্ছ কেন।" ব্রজেন্দ্রনাথকে থেমে যেতে হয়েছিল। আমতা আমতা করে কেবল বলেছিলেন, "না আমি বলছি, মানে অভ্যাসটা একবার বিগড়ে গেলে পরে বদলানো শক্ত হবে তো। বদলাতে কষ্টও হবে। হয়তো ওই নিয়েই মনোমালিন্য হবে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে—"

"তা হোক, তাই বলে এখন থেকে ওকে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়ে আধপেটা খাইয়ে রাখতে পারব না"—এই বলে হরমোহিনী ধামা-চাপা দিয়েছিলেন ব্যাপারটার উপর। পরে এসব নিয়ে আর আলোচনাও করেন নি ব্রজেন্দ্রনাথ। ওদের শাড়ি ব্লাউস আগে নিজেই দোকান থেকে কিনে আনতেন। কিন্তু এখন আর আনেন না। এ ছিট ভালো নয়, ও রংটা ম্যাটমেটে, এত মোটা কাপড় কি পরা যায়, শাড়ির সঙ্গে ব্লাউস ম্যাচ করেনি—এইরকম নানা বায়নাক্কা। আর এ সমস্তর প্রশ্রয় দিয়েছেন হরমোহিনী। তিনি নিজেই এখন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে যান এবং নিজেদের পছন্দমতো কাপড় চোপড় কেনেন। আর সেই ভদ্রমহিলাই এখন অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে ব্রজেন্দ্রনাথই মেয়েকে আদুরে করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার!

আর তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "হরেন যে প্রফেসার ছেলেটির কথা লিখেছে তাদের চিঠি লিখব ?"

"না, প্রফেসার ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না। তুমি তো নিজে প্রফেসার ছিলে। প্রফেসারদের যে কি দুর্দশা তা কি তুমি জান না? যতদিন প্রফেসার ছিলে ততদিন হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে আমার হাড়মাস কালি হ'য়ে গিয়েছিল। চতুর্দিকে দেনার জালায় অস্থির, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে দিতে পারতুম না, সাধ-আহ্লাদ বলে কিছু ছিল না, বাবা যে ক'গাছা চুড়ি দিয়েছিলেন, ক্ষয়ে গিয়েছিল সেগুলো—"

যতই দিন যাচ্ছে হরমোহিনী তাঁর বিগত জীবনের কাহিনীটা ক্রমশঃই অতিরঞ্জিত করে তুলছেন! তিনি ভুলে গেছেন যে ওই প্রফেসারি করতে করতেই তিনি তাঁকে সোনার বিছে গড়িয়ে দিয়েছিলেন, শাড়িও কম কিনে দেননি, ঢাকাই, মুর্শিদাবাদী, বেনারসী, এমন কি জর্জেটও। স্ত্রীকে গয়না কাপড় কিনে দিয়ে কেউ রসিদ নেয় না, তিনিও নেননি। নিলে এখন প্রমাণ দেখাতে পারতেন।

হঠাৎ চটে উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

দু'হাত উপরে তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—"হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে। পুরোনো কাসুন্দি কত আর ঘাঁটবে? প্রফেসারির উপর এতই যখন রাগ নরেনকে প্রফেসার হ'তে দিলে কেন?"

"আমি কি দিয়েছি? যখন আই. এস-সি পাস করলে তখনই বলেছিলাম ডাক্তারি বা ইন্‌জিনিয়ারিতে ঢুকে পড়। ছেলে বললে আমি অঙ্ক পড়ব। অঙ্ক আমার খুব ভালো লাগে। শুনলে না কি আমার কথা! হুবহু তোমার স্বভাবটি পেয়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন যেদিক দিয়েই তিনি যাচ্ছেন চোট্ খেতে হচ্ছে। তাই রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করলেন। হনহন করে বৈঠকখানায় চলে গেলেন।

আহার এবং দিবানিদ্রার পর অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ এবং হরমোহিনী দু'জনেরই মেজাজ শরীফ। হরমোহিনী ইদানীং যা অনেককাল করেন নি সেদিন তাই করলেন। স্বহস্তে এক কাপ চা ছেঁকে নিয়ে এসে কোমলকণ্ঠে বললেন, "নরু ওই যে বিলেতফেরত ছেলেটির কথা লিখেছে তারই মামাকে চিঠি লিখে দাও না একখানা—"

"সে ছেলে তো ডি. লিট্.। শেষ পর্যন্ত প্রফেসারই হবে। তুমি তো প্রফেসার জামাই চাও না—"

"বিলেতফেরত যখন, তখন প্রফেসারি পেলেও বড় চাকরি পাবে। আমাদের স্বদেশী গভর্নমেণ্টে বিদেশী ডিগ্রিরই কদর বেশী। নরু ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল, আর নরুর বন্ধু গজেন পেয়েছিল সেকেন ক্লাস। গজেনের বাপের টাকা ছিল, বিলেত পাঠিয়ে দিলে ছেলেকে। সে একটা ডিগ্রি নিয়ে ফিরে অনেক বেশী মাইনের চাকরি করছে। নরুও বিলেত যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তখন তুমি বললে আমার হাতে টাকা নেই।"

ম্লানমুখে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "টাকা তো ছিলই না। দেখি উষার বিয়েটা হয়ে যাক্ তখন চেষ্টা করব—"

"ওই ছেলেটির মামাকে আজই লিখে দাও একখানা চিঠি। অমন ভালো ছেলে বাজারে বেশীদিন পড়ে থাকবে না।"

"বেশ দিচ্ছি—"

ব্রজেন্দ্রনাথ চা পান শেষ করে সুগন্ধি জরদা সহযোগে এক খিলি পান খেলেন। এইটেই তাঁর একমাত্র বিলাস। হরমোহিনী জুলজুল করে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। ব্রজেন্দ্রনাথের হার্ট খুব সবল নয়, ডাক্তার জরদা খেতে মানা করেছেন। সেই মানার পরোয়ানাটা হরমোহিনীই যখন তখন স-ঝংকারে আস্ফালন করেন। এখন কিন্তু কিছু বললেন না। তাঁর মনে হ'ল ওর মেজাজটা খিঁচড়ে দিয়ে লাভ নেই। ভালো মনে চিঠিটা লিখুক।

'বিহিত সম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন' এই পাঠ ফেঁদে মেয়ের বাবা ব্রজেন্দ্রনাথ ছেলের মামা শশীনাথকে চিঠি লিখতে বসলেন। হরমোহিনী ঠাকুরঘরে গিয়ে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণতা হলেন জগদ্ধাত্রীর ছবির সামনে আর মনে মনে বলতে লাগলেন, মা দয়া কর, দয়া কর।

পাঁচ

পাত্রের মামা শশীনাথ অনেকদিন মুনসেফী করার পর সব-জজ হয়েছিলেন। বেশীদিন জজিয়তি করতে পাননি। সব-জজ হবার মাস ছয়েক পরেই তাঁকে রিটায়ার করতে হ'ল। অনেক চেষ্টা করেও এক্স্টেন্শন পেলেন না। এর জন্যে তাঁর স্ত্রী নাকি বাবা তারকেশ্বরের কাছে ধরনা দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা দয়া করেন নি। শশীনাথের ধারণা তাঁর প্রতি সুবিচার করেনি কেউ কখনও। স্কুলে মাস্টাররা পক্ষপাতিত্ব করে কখনও ভালো নম্বর দেননি তাঁকে। কলেজ জীবনেও প্রফেসাররা বিশেষ আমোল দিতেন না। তাঁর সহপাঠীরা প্রফেসারদের বাড়ি গিয়ে অনেক সময় অনেক কাজ আদায় করে নিত, কিন্তু তিনি কখনও পারেন নি। তিনি মুখ ফুটে তেমন দাবিও করতে পারতেন না। চাকরি জীবনেও ওপরওলার বকুনি খেয়েছেন চিরকাল, অধিকাংশই অন্যায় বকুনি, কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে পারেন নি কখনও। ডাক্তাররা বলেছেন এই সবই নাকি তাঁর বর্তমান রোগের কারণ। রোগটা বিশেষ মারাত্মক কিছু নয়। কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করলে বা অবাধ্য হ'লে, কিংবা তাঁর যদি ধারণাও হয়, যে মুখে প্রতিবাদ না করলেও ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করছে, সামনে অবাধ্য না হ'লেও তাঁর অগোচরে ভবিষ্যতে অবাধ্য হবে—তাহলেই তাঁর সারা মুখমণ্ডলে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হয়, গালের মাংস, থুতনির নীচের মাংস, গলার খানিকটা থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে। মনে হয় তাঁর মুখমণ্ডলে যেন ভূমিকম্প গোছের কিছু একটা হচ্ছে। মুখে একটি কথা বলেন

না, যেন দম আটকে বসে আছেন। অনেক ডাক্তার গুপ্ত-সিফিলিস সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু যার বার রক্ত পরীক্ষা করিয়েও কোন দোষ পাওয়া যায়নি। একজন বিলেত ফেরত মনস্তত্ত্ববিশারদ ডাক্তার শেষে বললেন এটা সারাজীবনব্যাপী ডিপ্রেশনের ফল। বহুকাল ধরে মনে যে সব কষ্ট, যে সব ক্ষোভ চাপা ছিল, তারাই নাকি এখন ওইভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। তাঁর আর একটা কষ্ট নিজের ছেলে-মেয়ে হয়নি। তাঁর স্ত্রী কনকচাঁপা তাই ক্রমাগত সিনেমা থিয়েটার ঠাকুর ঘর আর তীর্থ নিয়ে থাকেন। শশীনাথের ভরসা ভাগ্নেটির উপর। বিলেত থেকে ফেরার পর অনেকেই তাঁকে চিঠি লিখেছে। নানা রকম চিঠি। অধিকাংশই কাকুতি-মিনতিপূর্ণ। কাকুতি-মিনতির উপর তাঁর বিশেষ আস্থা নেই। নিজের চাকরী জীবনে তিনি সারাজীবন নিজের উপর-ওয়ালাদের কাকুতি-মিনতি করেছেন, কোন ফল হয়নি। হাকিম হিসেবে নিজেও তিনি অনেকের কাকুতি-মিনতি শুনেছেন কিন্তু সাক্ষীর মুখে সে সব কাকুতি-মিনতির চেহারা বদলে গেছে। প্রায়ই দেখেছেন যারা বেশী কাকুতি-মিনতি করে তারা বদমায়েস, ভালো অভিনয় করতে পারে।

ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠি পড়ে তাঁর ভালো লাগল। ভদ্রলোক অহেতুক বিনয়-প্রকাশ করেন নি, অশোভনভাবে নিজেকে হীনও করেন নি। সব কথাগুলি শোভন সংযত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কোষ্ঠির মিলটার নামও আছে, সুতরাং পয়সাকড়িও খরচ করবেন বলে মনে হয়।

তাঁর একমাত্র ভগ্নী টুসি বিধবা, তাঁর সঙ্গেই থাকে।

ভাজ কনকচাঁপার সঙ্গে মনের মিল নেই। সে নিজেই আলাদা রেঁধে খায়।

টুসির আশা-আকাঙ্ক্ষা সব এখন টুবলুকে কেন্দ্র করে। ভগবানের দয়ায় ছেলেটি মানুষ হয়েছে, বিলেত থেকে বড় ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, এইবার বোধহয় তার দুঃখ ঘুচবে। দিল্লীর কোন বড় কলেজে নাকি চাকরিরও কথাবার্তা চলছে। এইবার একটি মনোমত বউ পেলেই নিজের স্বপ্নের ছাঁচে আবার আলাদা সংসার পাতবে সে। আঁটকুড়ো ভাজের মুখঝামটা আর সহ্য করতে হবে না। একটা ব্যাপারে কিন্তু টুসি মনে মনে শঙ্কিত হয়েছে। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর টুবলু তার সঙ্গে কথা কয় না। অধিকাংশ সময় বাড়িতেই থাকে না। অধিকাংশ দিনই বাড়ির বাইরে খায়, হোটেলে, কিংবা বন্ধুদের বাড়িতে। টুসির মনে হয় টুবলু হঠাৎ যেন তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। কি হয়েছে ছেলের? কিছুই বুঝতে পারে না টুসি। সর্বদাই অন্যমনস্ক। মুখের ভাবভঙ্গী ভালো নয়, কোন কথা জিগ্যেস করতে ভয় করে। শশীনাথবাবুর কাছে অনেক মেয়ের ফোটো এসেছে। টুসি সব ফোটোই টুবলুকে দিয়েছে, টুবলু একনজর মাত্র দেখে রেখে দিয়েছে সেগুলো টেবিলের উপর। পছন্দ হ'ল কি না বলেনি। টেবিলের উপর ফোটোর স্তূপ জমে গেছে। কিন্তু টুবলুর মত পাওয়া যাচ্ছে না।

শশীনাথবাবু টুসিকে ডেকে বললেন, "এই সম্বন্ধটি ভালো মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের

পয়সাকড়ি আছে, নামও আছে। মেয়েটি বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। ভদ্রলোক লিখেছেন সুশ্রী। ফোটো পাঠাতে লিখব? কিংবা টুবলু যদি দেখতে চায় ভদ্রলোককে লিখি মেয়ে নিয়ে আসুন। তুই জিগ্যেস কর দিকি টুবলুকে—"

"আমি জিগ্যেস করতে পারব না দাদা। তুমিই বরং কর। বিলেত থেকে ফিরে এসে ও বড্ড বেশী গম্ভীর হ'য়ে গেছে। ওর সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে। অধিকাংশ দিন তো বাড়িতে খেতেই আসে না—"

"আচ্ছা, আমিই জিগ্যেস করব—"

সেই দিনই বিকেলে টুবলু যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল শশীনাথ ধরলেন তাকে।

"টুবলু, শোন। এইবার তোমার বিয়ের একটা ঠিক করতে হবে, তোমার মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। সম্বন্ধও এসেছে অনেকগুলি। তোমার মত না পেলে উত্তর দিতে পাচ্ছি না কাউকে!"

"আচ্ছা ভেবে দেখব"—বলে টুবলু বেরিয়ে গেল।

ছিটকে বেরিয়ে এল শশীনাথের চোখ দুটো। গালের আর গলনির মাংস থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল।

ব্রজেন্দ্রনাথ যাহোক একটা উত্তরের প্রত্যাশা করছিলেন। উত্তরটি পেলেন পনেরো দিন পরে। শশীনাথের হাতের লেখা ক্ষুদি ক্ষুদি এবং দুষ্পাঠ্য। এই হস্তাক্ষরে জোলো তিনি লিখেছেন—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার বারো তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমার ভাগিনেয়র অনেক সম্বন্ধ আসিয়াছে। এত আসিয়াছে যে আমরা সামলাইতে পারিতেছি না। ফোটোর স্তূপ, ঠিকুজির গোছা। সব মেয়েই সুন্দরী। একটি মেয়ে গতবৎসর নফর-নগরশ্রী হইয়াছিল। বিশ্ববার্তা পত্রিকায় তাহার প্রতিকৃতি সম্ভবতঃ দেখিয়া থাকিবেন। আপনি আপনার মেয়ের ফোটো পাঠান নাই। না পাঠাইয়া ভালোই করিয়াছেন, কারণ আমার ভাগিনেয় ফোটোর সংখ্যা দেখিয়া সম্ভবতঃ ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেই একটিমাত্র উত্তর দিতেছে—পরে ভেবে বলব। এ অবস্থায় আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই আপনাকে অনুরোধ আপনি মাসখানেক পরে আর একবার খোঁজ করিবেন। নমস্কারান্তে—

ভবদীয়

শ্রীশশীনাথ ভট্টাচার্য।

ব্রজেন্দ্রনাথকে আর চিঠি লিখতে হ'ল না। শশীনাথের চিঠি পাওয়ার দিন সাতেক পরে বড় ছেলে নরেনের চিঠি পেলেন তিনি। নরেন লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনাকে যে ডি. লিট. পাত্রটির কথা লিখেছিলাম তার মামাকে কি চিঠি লিখেছেন? যদি না লিখে থাকেন আর লিখবেন না। কাল টুবলুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বললে বাধ্য হ'য়ে তাকে দিল্লীর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করতে হচ্ছে। এই প্রভাবশালী ব্যক্তিটির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে নাকি খুবই দহরম-মহরম। তিনি টুবলুকে বলেছেন সে যদি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে তিনি তাকে ক্লাস ওয়ান সার্ভিস পাইয়ে দেবেন। টুবলু দুটি কারণে ইতস্ততঃ করছিল। প্রথম, মেয়েটি অবাঙালী। দ্বিতীয়, দেখতে খুব খারাপ। কালো, বেঁটে এবং মোটা। বয়সও অনেক, টুবলুর চেয়ে বোধহয় বড়ই হবে। টুবলু চার পাঁচ জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু কোথাও তার চাকরি হয়নি, সে হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে এইটেই তার মস্ত অপরাধ! এমন কি বাংলাদেশেও তার দাবিকে অগ্রাহ্য করে একজন অবাঙালীকে নেওয়া হয়েছে। তাই সে ঠিক করেছে ওই প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করেই চাকরিটি যোগাড় করবে। যস্মিন্ দেশে যদাচার—এই তার মত। বেচারা মনে মনে কিন্তু বড্ড দ'মে গেছে। আমি অন্য পাত্রের সন্ধানে আছি। পেলেই জানাব। আপনি ও মা প্রণাম জানবেন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত

নরেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ চিঠিটি হরমোহিনীকে দিলেন।

হরমোহিনী সংক্ষেপে মন্তব্য করলেন, 'মুয়ে আগুন।'

ছয়

চিঠিখানি পেয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে রইলেন কয়েকদিন। বেশীদিন কিন্তু পারলেন না। নিজের তাগিদ তো ছিলই, হরমোহিনীও তাগিদ দিতে লাগলেন।

"তুমি যে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলে। হরেন কয়েকটি ইন্‌জিনিয়ার ছেলের খবর দিয়েছিল তাদের চিঠি লেখ না—"

"চিঠি তো অনেক জায়গায় লিখলুম, কোথাও লাগছে না যে।"

"যখন লাগবার লাগবে, খুঁজতে হবে। চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।"

"ভালো লাগছে না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ জানালার ভিতর দিয়ে বহুবার-দেখা ন্যাড়া আমড়া গাছটার দিকে চেয়ে রইলেন। সেদিন আর চিঠি লিখলেন না, তার পরদিন লিখলেন। হরেন তিনটি পাত্রের

ঠিকানা পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে প্রথম একটিকেই নির্বাচন করলেন তিনি, তার বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি দেখে। বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিটার প্রতি হরমোহিনীর তো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছেই, তাঁর নিজেরও আছে। এ চিঠি লিখে তিনি ভাবলেন এর উত্তরটা আসুক, যদি লেগে যায় ভালোই, যদি না লাগে তখন বাকী দু'জনকে লেখা যাবে।

কিন্তু এর পর যে দুটো ঘটনা ঘটল, তাতে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাকী দু'জনকেও চিঠি লিখে ফেললেন। এদের একজনের উপাধি চক্রবর্তী। এ উপাধিটা তাঁর পছন্দ নয়, হরমোহিনীর তো নয়ই। হরমোহিনী বলেন যে তাঁদের দেশে চক্রবর্তী মানেই রাঁধুনী বামুন। হয়তো এ খবর ভুল, কিন্তু ওই ভুল আঁকড়েই হরমোহিনী ব'সে আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন। চক্রবর্তী, মজুমদার, রায় প্রভৃতি উপাধি ব্রজেন্দ্রনাথের পছন্দ নয় অন্য কারণে। ওসব উপাধি মুসলমান আমলে রাজানুগৃহীত ব্যক্তিদের দেওয়া হয়েছিল। সাহেবদের আমলে এবং স্বাধীনতার আমলেও যে সব লোক খেতাব পেয়েছেন তাঁদের উপর তেমন শ্রদ্ধা নেই ব্রজেন্দ্রনাথের। তাই তির্যকভাবে মুসলমান রাজাদের দেওয়া খেতাবের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ তিনি। তাঁর এই মনোভাব হয়তো যুক্তিসম্মত নয়, কিন্তু মানুষ কি সব সময় যুক্তি মেনে চলে?

তৃতীয় যে পাত্রটির জন্যে তিনি চিঠি লিখলেন সেটির উপাধি মিশ্র। কেমন যেন বিহারী-বিহারী গন্ধ আছে উপাধিটাতে। তাঁর অনেক বিহারী বন্ধু আছেন, এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে মিশ্রও আছেন একজন—কিন্তু মিশ্র উপাধিধারী কাউকে জামাই করতে মন সরে না। ব্রজেন্দ্রনাথ শিক্ষিত লোক, কিন্তু কুসংস্কারমুক্ত নন। তবু তিনি এদের দু'জনকেও চিঠি লিখলেন, কারণ যে দুটি ঘটনা ঘটল তাতে বিচলিত হ'য়ে পড়লেন তিনি।

প্রথম ঘটনাটির অনুরূপ ঘটনা প্রায়ই আজকাল ঘটছে। কিন্তু এটি তাঁর বন্ধুর মেয়ের সম্পর্কে ব'লে তিনি একটু বেশী বিচলিত হলেন, হঠাৎ কে যেন তাঁর পিঠে একটা চাবুক মারল। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেপাল চাটুজ্যের মেয়ে এক বৈদ্য ছোকরার সঙ্গে পালিয়েছে! মেয়েটি আই. এ. পড়ছিল। যার সঙ্গে পালিয়েছে সে নন-ম্যাট্রিক।

দ্বিতীয় ঘটনাটি মর্মান্তিক নয়, সামাজিক দিক থেকে ভালোই, কিন্তু তবু ব্রজেন্দ্রনাথের মনকে তা নাড়া দিল। উষা একদিন কলেজ থেকে এসে বললে—"বাবা, নমিতার বিয়ের ঠিক হয়েছে। খুব সুন্দর ছেলে, এরোপ্লেনের গ্রাউণ্ড ইন্‌জিনিয়ার।" উষার চোখে মুখে যদিও হাসি ফুটে উঠেছিল তবু তার পিছনে এমন একটা কি ছিল যা দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যথিত হলেন মনে মনে।

হরমোহিনীকে না জানিয়েই তিনি মিশ্র এবং চক্রবর্তী পাত্রদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে দিলেন।

সাত

ইন্‌জিনিয়ার কমলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নামও কে. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরো নাম কুন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঁটে রোগা এবং খেঁকুরে প্রকৃতির লোক। ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী। কোন এক সাপ্লাই আপিসের ক্ষমতাবান অফিসার ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর। তিনটি ছেলে, সাতটি মেয়ে। ছেলে তিনটির মধ্যে কমলকিশোরই ভালো এবং পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ। বড় ছেলে পুষ্পকিশোর থিয়েটার-বিলাসী, পাড়ার শখের থিয়েটারের পাণ্ডাগিরি করে। শিশির ভাদুড়ীর নিখুঁত নকল করে রসিকমহলে নাম কিনেছে। বি. এ পর্যন্ত পড়েছিল, পাস করতে পারেনি। দ্বিতীয় পুত্র পদ্মকিশোরের বিদ্যা ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত। তার প্রধান কাজ রকে বসে আড্ডা মারা এবং বাড়ির ফাইফরমাশ খাটা। সমস্ত রাজনৈতিক নেতা এবং সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে তার জ্ঞান প্রগাঢ়। পাড়ার লোকের সন্দেহ তার নাকি হাতটানও আছে। কুন্দকিশোরবাবুরও সুনাম নেই। খুব ঘুষ নিতেন নাকি, কলাটা মুলোটাও ছাড়তেন না। মাইনে খুব বেশী ছিল না। মাইনের উপরই নির্ভর করে থাকলে তিনি পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিতেও পারতেন না, কমল-কিশোরকে উচ্চশিক্ষাও দিতে পারতেন না। চাকরি থেকে রিটায়ার করবার পর তিনি ঠিক করেছিলেন যে তিনটি ছেলের বিয়ে দিয়ে যে অর্থ পাবেন তাতেই মেয়ে দুটির বিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এইখানেই তাঁর হিসাবে একটু গোলমাল হ'য়ে গেল। বড় ছেলে বিয়ে করতে চাইছে না, আর মেজ ছেলের ভালো সম্বন্ধও আসছে না। যা আসছে তা খেঁদি বুঁচি গোছের কুৎসিত মেয়ের দল আর তাদের অতিদরিদ্র পিতাদের মিনতিপূর্ণ চিঠি। কুন্দকিশোর বিরক্ত হ'য়ে শেষে ঠিক করেছেন যে ছোট ছেলের বিয়েই আগে দেবেন। ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে তিনি খুশী হলেন। কারণ সুন্দর গেঞ্জি মিলের নাম দেশের সকলেই জানে। ব্রজেন্দ্রনাথও স্বনামধন্য পুরুষ। এঁর সঙ্গে সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয় মনে করে তিনি নিম্নলিখিত চিঠিটি লিখলেন। বাড়িতে চিঠি লেখবার কাগজ ছিল না, এর জন্যে নূতন একটি প্যাডও কিনলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল অমন একটি লোককে যা-তা কাগজে চিঠি লেখা ঠিক নয়।

নমস্কারান্তে নিবেদন,

মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার পুত্র ইন্‌জিনিয়ার বটে। যে চাকুরি করিতেছে যদিও তাহা এখনও পাকা হয় নাই, কিন্তু পাকা হইবার ষোল-আনা আশা রাখি। তাহার বর্তমান বেতন পাঁচশত পঁচাত্তর টাকা। ইহার মধ্যে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সও আছে। আপনার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপিত হইলে অতিশয় আনন্দিত হইব। আপনি কন্যার পিতা, আপনার মনোভাব আমি বুঝিতে পারিতেছি কারণ

আমিও কন্যার পিতা। আমার সাত কন্যা। পাঁচটির বিবাহ দিয়াছি, দুইটি এখনও অবিবাহিতা। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সুতরাং আয়ের পথ বন্ধ। কি করিয়া যে কন্যা দুইটিকে পার করিব তাহাই ভাবিতেছি। আপনার কি কোনও বিবাহ-যোগ্য পুত্র আছে? যদি পরিবর্তে সম্মত থাকেন, আপত্তি করিব না। আপনি জানিতে চাহিয়াছেন আমার বাড়িঘর আছে কিনা। খুলনা জেলায় বাড়িঘর ছিল, সেখানে এমন মুসলমানেরা বসবাস করিতেছে। অনেক লেখালেখি করিয়াও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট হইতে আমার বাড়ির ন্যায্য মূল্য আদায় করিতে পারি নাই। কলিকাতায় ভাড়া বাড়িতে বাস করি। কিন্তু আমার ছেলে যখন ইন্‌জিনিয়ার তখন মনে হয় এইবার বোধহয় কোথাও মাথা গুঁজিবার মতো বাড়ি একটা হইবে। নিউ আলিপুর অঞ্চলে একটা জমির চেষ্টায় আছি।

এইবার আমার ছেলেদের কথা বলি। আমার তিন ছেলে। ইন্‌জিনিয়ার পুত্রটি সব চেয়ে ছোট। বড়ো দুইটির বিবাহ হয় নাই। তাহারা বিবাহ করিতে চাহিতেছে না। আজকালকার ছেলেরা এ বিষয়ে বড়ই অবাধ্য। তাই অগত্যা ছোট ছেলেরই আগে বিবাহ দিতেছি। আপনি যদি পরিবর্তে সম্মত থাকেন—জানি না আপনার বিবাহযোগ্য পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র আছে কি না—তাহা হইলে সব দিক দিয়াই সুরাহা হয়। আপনার কন্যার ঠিকুজি এবং ফোটো পাঠাইয়া দিবেন। ঠিকুজির মিল হইলে এবং ফোটো দেখিয়া কন্যা পছন্দ হইলে মেয়েকে সামনাসামনি একবার দেখিব। ফোটো দেখিয়া অনেক সময় ঠিক ধারণা করা যায় না। অন্যান্য কথাবার্তাও তাহার পর হইবে। আমার সাদর নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীকুন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ চিঠিখানি পড়ে হরমোহিনীকে ডাকলেন—"ওগো শুনছ, চিঠি এসেছে—"

হরমোহিনী পাশের ঘরে ছিলেন, হন্তদন্ত হ'য়ে বেরিয়ে এলেন।

"কার চিঠি, বরেনের?"

কয়েকদিন বরেনের চিঠি না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন হরমোহিনী। তাঁর ইচ্ছা তাঁর প্রত্যেক ছেলে তাঁকে রোজ চিঠি লিখুক। ছেলেরা না লিখলে বউরা লিখুক। কিন্তু কেউ লেখে না, লেখা সম্ভবই নয়। কিন্তু হরমোহিনীর মাতৃ-হৃদয় কোনও যুক্তির তোয়াক্কা করে না। দু'দিন চিঠি না পেলেই তাঁর মনে হয় নিশ্চয় কারও অসুখ করেছে, কিংবা অন্য কোন বিপদ হয়েছে। আরও মুশকিল, তিনি একজন স্বপ্ন-একস্‌পার্ট। চোখটি বুজলেই স্বপ্ন দেখেন। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন। ঘুম ভেঙেই তাঁর মনে হয় মা মঙ্গলচণ্ডী স্বপ্নদূত পাঠিয়ে তাঁকে সাবধান করছেন। গতকল্য তিনি যে স্বপ্নটি দেখেছেন তা ভয়ানক, একটা মরা জানোয়ারকে শকুনিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সেই থেকে তাঁর

মনে আর স্বস্তি নেই। নরেন আর হরেনের চিঠি এসেছে। কিন্তু বরেনের চিঠি অনেক-দিন পাননি। হরমোহিনীর শাস্ত্রে শকুনের স্বপ্ন অত্যন্ত খারাপ, নিশ্চয়ই কোথাও কোনও অমঙ্গল হয়েছে, কিংবা হবে।

"না, বরেনের চিঠি আসেনি—"

"আসেনি? বরেন না হয় ডাক্তার মানুষ, রুগীটুগি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, শিউলি কি একলাইন চিঠি লিখতে পারে না? সমস্ত দিন করে কি!"

ব্রজেন্দ্রনাথ এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না। ইতিপূর্বে বহুবার তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে তাঁর কাছে ঘন-ঘন চিঠি পাওয়াটা প্রয়োজন হ'তে পারে কিন্তু ওদের পক্ষে ঘনঘন চিঠি লেখাটা তেমন প্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজনটা যেখানে একতরফা সেখানে এরকম অসঙ্গতি মাঝে মাঝে ঘটবেই। এসব বিষয়ে অশিক্ষিতদের মনোভাবটাই ভালো মনে করেন তিনি। ওরা প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি প্রায় পায় না, না পেলে চিন্তিতও হয় না, বরং চিঠি এলে শঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। হঠাৎ চিঠি এল কেন? নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আছে! এসব কথা হরমোহিনীকে অনেকবার বলেছেন তিনি, কোনও ফল হয়নি। এখন আর ও-নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে প্রবৃত্তি হ'ল না তাঁর।

"বরেনের চিঠি কাল বা পরশু আসবে। তার চেয়েও দরকারী চিঠি এসেছে একটা—তোমার সেই বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্‌জিনিয়ার পাত্রটির বাবার চিঠি—"

চিঠিটি পড়ে শোনালেন। তারপর নিজের মনের ভাব চেপে রেখে বললেন, "পাত্রটিকে তো ভালোই মনে হচ্ছে। ঠিকুজি আর ফোটো পাঠিয়ে দেব? ঊষার ভালো ফোটো আছে কি?"

এইবার হরমোহিনী বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওই পাত্রের সঙ্গে ঊষার বিয়ে দেবে? সাত-সাতটা ননদের আর দু'দুটো হুমদো আইবুড়ো ভাশুরের ধাক্কা সামলাতে পারবে তোমার মেয়ে? তাছাড়া ঘরবাড়িও নেই। ওই ছোট ছেলেটিই সম্বল। ওকে ভাঙিয়েই আইবুড়ো মেয়ে দুটো পার করবে। ওখানে আমি ঊষার বিয়ে দেব না—"

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরেরই এই অবস্থা। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।"

"তা যাক্। তবু ঠগের হাতে মেয়ে দিতে পারব না।"

আট

হরিহর মিশ্র লোকটিও হিসাবী। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি হিসাব করে জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বোর্ডিং-এ মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে মাত্র পাঁচ টাকা

হাত-খরচ দিতেন। এই পাঁচ টাকার মধ্যেই সব রকম করতেন তিনি। সিনেমা দেখতেন, থিয়েটার দেখতেন, চপ কাটলেট খেতেন, ভীম নাগের সন্দেশেরও রসাস্বাদন করতে ছাড়তেন না। কিন্তু এগুলি করতেন মাসে একবার করে। বাকী দিনগুলি কাটাতেন ছোলা ভিজে বা মুড়ি খেয়ে। সেকালে সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল বলে পাঁচ টাকাতেই কুলিয়ে যেত। ওভারশিয়ার হয়েছিলেন। অনেক কাঁচা পয়সা রোজগার করেছেন, কিন্তু বাড়াবাড়ি রকম বেসামাল হননি কখনও। মদ খেয়েছেন, কিন্তু প্রায়ই পরের পয়সায় এবং লোভের মুখে রাশ টেনে। নারী-মাংসের লোভেও বেপাড়ায় যে মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরি করেন নি তা নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। পা পিছলে পড়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করেন নি কখনও। তুখোড় ছেলে, চৌকোশ মাল এই সব নামে বন্ধুমহলে খ্যাত ছিলেন। বেশ মোটা পণ নিয়ে বিয়ে করেছিলেন। পণের দিকটা ভারী ছিল বলে বধূর দিকটা হালকা হ'য়ে গিয়েছিল। হরিহর-পত্নী ছিলেন কালো, রোগা এবং কুশ্রী। মুখের মধ্যে চোখ দুটিই ছিল আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল। যক্ষ্মারোগের এটি একটি লক্ষণ নাকি। বিয়ের আগে মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। জ্বরও হচ্ছিল রোজ। টাকার জোরে কন্যার পিতা এই মেয়েকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন হরিহর মিশ্রের ঘাড়ে। টাকার লোভে অন্ধ হ'য়ে হিসাবী হরিহরও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এই বেহিসাবী কাজটি করে ফেললেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁর একটি মাত্র পুত্রের জন্ম হয়। তার জন্ম দেবার পর হরিহরের স্ত্রী আর বাঁচেন নি। এক স্যানাটোরিয়মে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তিনি।

হরিহরও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেন নি। শ্বশুরের তিনি নামকরণ করেছিলেন 'জোচ্চোর'। নবজাত শিশুটিকে তাঁর শ্বশুর নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু হরিহর দেননি। নিজেই মানুষ করেছিলেন তাকে এক 'ওয়েট নার্স'-এর সাহায্যে। ওয়েট নার্স মেম নয়, বাঙালীও নয়, এক বিহারবাসিনী কাহারনী। মেয়েটি ওভারশিয়ার হরিহরের অধীনে একদা মজুরনীর কাজ করত। তার স্বামী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ওকে একদিন ফেলে পালায়। পালাবার দিনকতক পরে ছেলে হয় ওর একটি। ছেলেটিও বাঁচেনি। এই সময় হরিহর ওর কোলে তাঁর শিশুপুত্র জলধরকে তুলে দেন। সেই থেকে ওর নূতন নামকরণ হ'ল জলধরের মা। এই জলধরের মা-ই এখন হরিহরের গৃহের কর্ত্রী। হরিহরের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক কতটা ঘনিষ্ঠ তা বাইরে থেকে নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু এ কথাটা মানতেই হবে হরিহর তাঁর কর্তব্য থেকে একচুলও নড়েন নি। প্রাণ দিয়ে ছেলেটিকে মানুষ করেছিলেন। বরাবরই তিনি হিসাবী লোক। ছেলেটির শৈশব থেকেই তার জন্য টাকা জমাবার নানারকম ব্যবস্থা করতে ভোলেন নি। Fixed deposit, সেভিংস ব্যাঙ্ক, পোস্টাল সার্টিফিকেট, ইন্‌সিওরেন্স এসব তো করেই ছিলেন, ছেলের নামে লটারির টিকিটও কিনতেন প্রায়ই। একটা লটারিতে মোটা রকম টাকাও পেয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবন অর্থাভাবের মধ্যে কেটেছিল,

টাকার অভাবেই তিনি ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে পাননি। সেইজন্য তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল জলধর যেন কখনও এ কৃচ্ছ্রতার কবলে না পড়ে। স্কুলজীবন থেকেই ভালো গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন জলধরের জন্য। বাইরে গৃহশিক্ষক তাকে পড়াত আর ভিতরে ওই অশিক্ষিতা কাহারনী বসে বসে উৎকর্ণ হ'য়ে শুনত ঠিকমতো পড়ানো হচ্ছে কি না।

জলধরের মা না থাকলে জলধর হয়তো মানুষ হ'ত না। তার নিজের মা বেঁচে থাকলে তার জন্য এতটা করত কিনা সন্দেহ।

একদিন কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়ল। জলধর তখন ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে সবে ঢুকেছে, মুখ দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠল তার। হরিহর আর কালবিলম্ব করলেন না, তাকে নিয়ে সোজা সুইটজারল্যাণ্ড চলে গেলেন। জলধরের মা-ও সঙ্গে গেল। জলের মতো টাকা খরচ হ'ল, কিন্তু সেরে গেল জলধর। হরিহর তাকে আর এদেশে নিয়ে এলেন না, লণ্ডনেই সে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে লাগল। হরিহর দেশে ফিরে এলেন জলধরের মাকে নিয়ে। দেশে ফিরে এক বছর পরে জলধরের মা পড়ল অসুখে। ডাক্তাররা সন্দেহ করতে লাগলেন তারও যক্ষ্মা হয়েছে। কিছুদিন পরেই মারা গেল সে। তাকে সুইটজারল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার মতো আর টাকা ছিল না হরিহরের।

যথাসময়ে জলধর বিলেত থেকে ইন্‌জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এল। বড় চাকরিও পেল একটা। এর পর হরিহর বিয়ে দেবার আয়োজন করতে লাগলেন ছেলের। হিসাব করে এবং সব দিক বাঁচিয়েই আয়োজন করলেন।

প্রথমতঃ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সেই ডাক্তারকে চিঠি লিখলেন যে জলধরের এখন বিয়ে দেওয়া যেতে পারে কি না। তার শরীরে রোগের আর কোন লক্ষণ নেই, ওজন কমে নি, বরং বেড়েছে। ডাক্তার মত দিলেন। ভারতবর্ষের কয়েকজন নামজাদা ডাক্তারেরও অভিমত নিলেন তিনি। তাঁরাও আপত্তি করলেন না।

এর পর তিনি শরণাপন্ন হলেন জ্যোতিষীর। তারা বললে ছেলে আপনার দীর্ঘায়ু নয়। কিন্তু ওর যদি এমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন যার পতির দীর্ঘায়ুযোগ আছে অর্থাৎ যার সপ্তম, চতুর্থ স্থান এবং চন্দ্র শুক্র খুব ভালো তাহলে ভয় নেই।

জলধর বিয়ে করতে চায়নি, কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হ'ল যখন হরিহর বললেন, তুমি আমার একমাত্র পুত্র। তুমি যদি বিয়ে না কর তাহলে আমার বংশলোপ হ'য়ে যাবে।

জলধর উত্তর দিলে—বেশ, তাহলে করব। কিন্তু একটি শর্ত আছে—আমার যে অসুখ করেছিল তার বিবরণ কন্যাপক্ষদের আগে জানাতে হবে। অসুখের খবর লুকিয়ে আমি বিয়ে করতে পারব না।

হরিহরও এতে রাজী হলেন। তিনি জানতেন দু'চারজন মেয়ের বাপ হয়তো এ খবর পেয়ে পেছিয়ে যাবে, কিন্তু যে দেশে মৃত্যুপথযাত্রী স্থবিরের গলাতেও বধুরা মালা

দেয়, যে দেশে টাকার লোভে যে কোনও পাত্রকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয় মেয়েরা, সে দেশে জলধরের মতো পাত্রের জন্য মেয়ের অভাব হবে না।

হরিহরকে পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপনও দিতে হয়নি। খবরটা মুখে মুখে চাউর হ'য়ে পড়াতেই অনেক পাত্রীর খবর পেয়ে গেলেন তিনি। সব মেয়ের বাপকেই এক উত্তর দিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথও যথাসময়ে উত্তর পেলেন।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পেলাম। এ বিষয়ে অগ্রসর হবার আগে প্রথমেই আপনাকে একটি কথা জানাতে চাই। আমার ছেলের দশ বছর আগে যক্ষ্মা হয়েছিল। তাকে আমি সুইটজারল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্য। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সেখানকার ডাক্তাররা এবং এদেশের বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন যে ও এখন স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে, কোন বাধা নেই। এ খবর জেনেও আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন কি না। যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে আপনার মেয়ের জন্ম-তারিখ, জন্মসময় এবং ঠিকুজি থাকলে ঠিকুজিও পাঠাবেন। মেয়ের ঠিকুজি যদি আমার জ্যোতিষীর মনোমত হয় তবেই আমি এ বিষয়ে অগ্রসর হব। আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীহরিহর মিশ্র

চিঠিটা পড়ে ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে বললেন, বোগাস্। হরিহরের জীবনবৃত্তান্ত জানলে হয়তো একথা বলতেন না। হরিহর যে কৃতী পুরুষ তার একটা প্রমাণ কিন্তু পেলেন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে। আমাদের সমাজে কৃতী পুরুষদেরই শত্রু থাকে, বাঘের পিছনে যেমন ফেউ। হরিহরবাবুর চিঠি পাওয়ার দিন দুই পরেই আর একটি চিঠি এল। চিঠির উপরে লেখা—

কন্‌ফিডেন্‌শ্যাল।

প্রিয় ব্রজেন্দ্রবাবু,

আমি আপনার জনৈক হিতৈষী বলিয়া আপনাকে এই পত্র দিতেছি। শুনিলাম আপনার কন্যার সহিত হরিহরবাবুর ইন্‌জিনিয়ার পুত্র জলধরের বিবাহের কথা আপনি পাড়িয়াছেন। মহাশয়, কদাচ ওখানে বিবাহ দিবেন না। ছেলেটি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মে নাই। তাহার জন্ম হইয়াছে এক ছোটলোক মজুরনীর গর্ভে। ইহা ছাড়া আরও গোল আছে, ছেলেটি যক্ষ্মারোগী। এ বিষয়ে তৃতীয় সংবাদটি দিয়া পত্র শেষ করিব। হরিহর লোকটি চামার, পয়সা-পিশাচ। আপনার জ্ঞাতার্থে এবং হিতার্থে পত্র লিখিলাম। নমস্কার জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

আপনার জনৈক হিতৈষী বন্ধু।

এই চিঠি পড়ে ব্রজেন্দ্রনাথের বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আর একটু বাড়ল।

কিছুদিন আগে তাঁর বাগান থেকে ফুলগাছ চুরি করেছিল বাঙালী কয়েকটা ছোঁড়া। তারাই যে নিয়েছে এ হদিসও দিয়েছিল আর একদল বাঙালী ছোঁড়া। সে সময় সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীর নীচতার কিছু পরিচয় পেয়েছিলেন। আজ আবার নূতন রকম আর একটা পেলেন।

হরমোহিনীকে এ দুটি চিঠির কথা আর জানালেন না তিনি। বরেনের চিঠি পেয়ে তাঁর মনের শান্তি ফিরে এসেছিল, সেটা আর বিঘ্নিত করতে ইচ্ছে হ'ল না তাঁর।

নয়

পার্থ-বিক্রম চক্রবর্তী খুবই আধুনিক-মনা লোক। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের নকল করে আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি ইনি ত্যাগ করেছেন। নামের আগে 'শ্রী' লেখেন না। তাঁর বন্ধু গণেশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "পূর্বপুরুষদের শ্রী-কে বিদায় করে দিলে কেন?" চক্রবর্তী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওতে অহংকার প্রকাশ পায়। নিজেই নিজেকে শ্রীমান্ বলাটা অশোভন নয় কি!" গণেশও ছাড়বার পাত্র না, সে বললে, "তাহলে তোমার ওই পার্থ-বিক্রম চক্রবর্তী নামটাও বদলে ফেলা উচিত। তোমার পার্থ-বিক্রমও নেই, তুমি সত্যিকার চক্রবর্তীও নও। ও নাম বদলে তাহলে নিজের নাম রেখে দাও ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—" চক্রবর্তীও হটবার লোক ছিলেন না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "ওর আর একটা দিক আছে। আমাদের 'শ্রী'টা বিলিতী 'মিস্টার' এর অনুরূপ। নিজের নামে কেউ মিস্টার যোগ করে লেখে না ইংরিজিতে।" গণেশ উত্তর দিয়েছিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ ভায়া ইংরিজি মিস্টার সৃষ্টি হবার ঢের আগে আমাদের 'শ্রী' মূর্তিমতী হয়েছেন, শুধু আমাদের নামের গোড়ায় নয়, আমাদের লক্ষ্মীতে, আমাদের সরস্বতীতে, আমাদের সারাজীবনে। শ্রীকে বাদ দিয়ে দিলে আমাদের সভ্যতার অনেকখানিই বাদ দিতে হয়।"

তর্ক আর বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। পার্থ-বিক্রম অবশ্য গণেশের কথায় নিজের নামের গোড়ায় আর শ্রী যোগ করেন নি। কারণ তিনি আধুনিক। তিনি জানেন এ যুগে আধুনিকতার ছাপ না থাকলে কোনও আধুনিক সমাজে কলকে পাওয়া অসম্ভব। তিনি তাঁর যৌবনকাল থেকেই আধুনিক সমাজে কলকে পাওয়ার জন্য সমুৎসুক। আধুনিক কথাটা অবশ্য আমি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করছি যার নির্গলিতার্থ সাহেবিয়ানার নকল করা। পার্থ-বিক্রম বাইরে স্যুট এবং বাড়িতে খোলা পা-জামা পরেন, চাকরকে 'বয়' বলে ডাকেন, সাহেবী খানা খান সাহেবী কেতায়, বাড়িতে রান্না করে বাবুর্চি, গৃহিণী বা মৈথিল ঠাকুর নয়। গৃহিণী আর কন্যা বেড়িয়ে বেড়ান সভায় সভায়, পার্টিতে পার্টিতে, তাঁদের ফোটো কাগজে বেরোয়, তাঁদের গানের নাচের এবং শিল্পবোধের তারিফ করেন পাইপ-কামড়ে-ধরা মুখে প্রৌঢ় রসিকরা। পরিচিত

কারো সঙ্গে দেখা হ'লে পার্থ-বিক্রম নমস্কার করেন না, বলে ওঠেন 'হ্যালো', যখন তাঁরা বিদায় নেন তখনও প্রণাম বা নমস্কার করেন না, বাঁ হাতটা ঈষৎ উত্তোলন করে বলেন, 'টা টা বাই বাই'। মেয়ের নাম 'জিপ্‌সি'। ছেলের নাম চাকু, এটা চক্রবর্তীরই অপভ্রংশ বোধহয়। ওরা সবাই সোসাইটি ক্রিচার। আমোদের স্রোতে ভাসতে চায় কিন্তু নাকানিচোবানি খায় আন্তরিকতাহীন ন্যাকামির আবর্তে। তা থাক, ওতেই ওরা খুশী।

পার্থ-বিক্রম বহুকাল আগে বিলেত গিয়েছিলেন শ্বশুরের টাকায় এবং সেই সময় আলাপ হয়েছিল সেই সব লোকেদের সঙ্গে যাঁরা আজকাল ভারত-ভাগ্য-বিধাতা। ভারত-ভাগ্য-বিধাতারা অনেক বিষয়েই নিষ্প্রভ কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব-প্রীতির জলুসটা চোখ-ধাঁধানো। তাই এই স্বাধীনতার বাজারে পার্থ-বিক্রমের সুবিধা হয়েছে অনেক। যদিও তিনি খবরের কাগজের ফ্রন্ট-পেজ-বিহারী হোমরাচোমরা নন, কিন্তু নেপথ্যে থেকেও তিনি যা গুছিয়ে নিয়েছেন তা-ও নিন্দনীয় নয়। বিলেত থেকে যে ব্যারিস্টারি ডিগ্রিটা এনেছিলেন (ঠিক এনেছিলেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে অনেকের) সেটা কিন্তু কাজে লাগেনি। পারমিটের নৌকা বেয়েই তিনি ঐশ্বর্যের যে সমুদ্রে পৌঁছতে পেরেছেন তা অগাধ। তাঁর বিশ্বাস আচারে-ব্যবহারে চোস্ত আধুনিকতাই তাঁর উন্নতির কারণ।

তিনি প্রায় খোলাখুলিই বলেন যে গান্ধীজীর নীতি এবং উপদেশ এ যুগে অচল। তা যদি তিনি অনুসরণ করতেন—যা কিছুকাল তিনি করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এখনও দরকার পড়লে যা তিনি থিয়েটারে অভিনয় করার মতো মাঝে মাঝে করেন—তাহলে বড়জোর একটা আশ্রম করতে পারতেন কিংবা কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি পদ অলংকৃত করতেন। তিনি আজ যে ধনকুবের হয়েছেন তা স্বপ্নেরও অতীত থেকে যেত তাঁর কাছে। আর কালোবাজারই তাঁর জীবনে আলো এনেছে। এই কালোবাজারে তাঁর হাতের টর্চ হয়েছেন হোমরাচোমরা গভর্নমেণ্ট অফিসাররাই এবং তাঁর ধারণা নিখুঁত আধুনিকতার ফাঁদেই এই সব অফিসাররা ধরা পড়েছিলেন। ঘুষের জোরে সবটা হয়নি।

জিপ্‌সি অনেককে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রীর অমায়িকতা, অভিনয়-কুশলতা এবং প্রসাধন-পটুতাও কম সাহায্য করেনি। এঁরা যদি পর্দানশীন হতেন বা সাধারণ গৃহস্থ মেয়েদের মতো অনগ্রসর হতেন তাহলে হয়তো পার্থ-বিক্রম যা হয়েছেন তা হ'তে পারতেন না। বর্তমানে তাঁর প্রভাব বিরাট অক্টোপাসের মতো, বহু লোকের এবং বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। এঁর ছেলের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে সে যে রাজরানী হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ছেলেটির নিজের যোগ্যতাও কম নয়, সে আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং জার্মানি—এই তিন দেশে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ে ভালো ডিগ্রি এনেছে। ইচ্ছে করলেই সে খুব বড়

চাকরি পেতে পারত, কিন্তু চাকরি করার রুচি তার নেই। সে ব্যবসা করতে চায়। ছেলেটির আর একটি বৈশিষ্ট্যও বিব্রত করেছে আধুনিকতা বাতিকগ্রস্ত পার্থ-বিক্রমকে। সে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে বিলাতী প্রথায় কোর্টশিপ করে সে বিয়ে করবার পক্ষপাতী নয়, সে চিরাচরিত হিন্দু প্রথায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে পিতামাতার নির্বাচিত মেয়েকেই বিয়ে করবে। সে যদি মার্কিন, লণ্ডনী বা জার্মান বউ ঘরে আনত পার্থ-বিক্রম বিচলিত হতেন না, সে যদি পারসী কোটিপতি অমুকের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইত সে ব্যবস্থাও তিনি অনায়াসে করতে পারতেন। তাঁর মেয়ে জিপ্‌সি অনেকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে শেষে এখন ঠিক করেছে এক লক্ষপতি সিন্ধি বিড়িব্যবসায়ীর গলায় মালা দেবে—পার্থ-বিক্রম আপত্তি করেন নি। কিন্তু চাকুর প্রস্তাব শুনে ঘাবড়ে গেলেন তিনি। তাঁর অমন হীরের টুক্‌রো ছেলের উপযুক্ত সহধর্মিণী কি তিনি পচা পুরানো এঁদো ঘুণ-ধরা হিন্দুসমাজে খুঁজে পাবেন? রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ওর উপযুক্ত মেয়ে আছে কি! সত্যিই তিনি বড় বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন। যদিও তিনি আধুনিকতার উপাসক তবু তাঁর মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে সেকেলে কর্তার ভূত বেঁচেছিল একটা, পিতৃ-অধিকারের দাবি জানিয়ে সে বলতে চাইছিল, আধুনিক যুগে আধুনিক কায়দায় চলতে হবে তোমাকে এই আমার ইচ্ছা এবং আদেশ।

কিন্তু স্বল্পবাক তীক্ষ্ণ-নাক তিন-তিনটে বিলিতী ডিগ্রীওলা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছা বা আদেশ কোনটাই জাহির করতে পারলেন না। এ-ও তাঁর মনে হ'ল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই যখন আধুনিকতার বীজ-মন্ত্র তখন ছেলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্মান না করলে হয়তো তিনি ধর্মচ্যুত হবেন। নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা তাঁর মনে জাগল না। নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাহির করে যদি তিনি বলতে পারতেন, তোমার জন্যে ঐ পচা হিন্দুসমাজে আমি মেয়ে খুঁজতে পারব না, তুমি নিজেই খুঁজে নাও গিয়ে—তাহলে সেটা তাঁর তথাকথিত আধুনিক মনোভাবের সঙ্গে খাপ খেয়ে যেত, কিন্তু তবু তিনি পারলেন না।

আসল কথা ছেলেকে তিনি ভয় পান, মেয়েকেও। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস তাঁর নেই। তাই আধুনিকতা-বিরোধী এই ভীরুতাকে তিনি নিজের কাছেই আমোল দিলেন না শেষ পর্যন্ত। অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে সারাজীবন যা করেছেন এবার তাই করে ফেললেন, মুখোশ পরে ফেললেন একটা। সোৎসাহে বন্ধুমহলে বলে বেড়াতে লাগলেন—চাকুই হচ্ছে মনে-প্রাণে স্বদেশী, এত দেশ ঘুরে এলো, কিন্তু গায়ে আঁচড়টি লাগেনি, বুঝলে। ওর জন্যে একটি খাটি দেশী মেয়ে খুঁজে বার করতে হবে। শুনলে বিশ্বাস করবে না, ও এখনও খেতে বসে গণ্ডুষ করে। কোনদিন হয়তো টিকি রেখে বসবে—আই শান্ট বি সারপ্রাইজ্‌ড্‌। ওর মনের মতো একটি পাত্রী খুঁজতে হবে। ভেবেছিলেন পাত্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন দেবেন একটা। কিন্তু তার দরকার হ'ল না। মুখে মুখেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল এবং তার ফলে এত চিঠি আসতে লাগল যে

বিব্রত হ'য়ে পড়লেন পার্থ-বিক্রম। প্রত্যেক লোকের সঙ্গে পত্রালাপ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ল তাঁর পক্ষে। তাই তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় বার করে ফেললেন একটা। হাজারখানেক চিঠি আর হাজারখানেক ফর্ম ছাপিয়ে ফেললেন। চিঠিটি নিম্নলিখিতরূপ :

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়েছি। একটি ফর্ম পাঠাচ্ছি সেটি ভরে পাঠাবেন। যদি এক মাসের মধ্যে উত্তর না পান জানবেন, আপনার আবেদন গ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়

পার্থ-বিক্রম চক্রবর্তী

প্রথম কয়েকখানা চিঠিতে নিজে হাতেই সই করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ও আর পেরে উঠলেন না, নিজের সইয়ের রবারস্ট্যাম্প করিয়ে নিলেন একটা।

ফর্মটি নিম্নলিখিতরূপ—

(১) পাত্রীর নাম

(২) পাত্রীর পিতামাতার নাম

(৩) পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের পরিচয়

(৪) পাত্রীর বয়স

(৫) পাত্রীর লেখাপড়ার বিবরণ—স্কুল ও কলেজের নাম

(৬) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্‌গুলিতে পারদর্শিতা আছে—
(ক) কণ্ঠসংগীত (খ) বাদ্যযন্ত্র (গ) রন্ধন (ঘ) চিত্রাঙ্কন (ঙ) নৃত্য (চ) সেলাইয়ের কাজ (ছ) বাতিকের কাজ (জ) উল বোনা (ঝ) আলপনা দেওয়া (ঞ) চামড়ার কাজ।

(৭) পাত্রীর গায়ের বর্ণ কিরূপ

(৮) পাত্রীর উচ্চতা কত

(৯) পাত্রীর কোমরের ও বুকের মাপ (ফিতা দিয়া মাপিয়া পাঠাইতে হইবে)

(১০) মাথার চুলের ঘনত্ব এবং দৈর্ঘ্য কত, চুলের ডগা কিরূপ

(১১) ওজন

(১২) স্বাস্থ্য কেমন? ইতিপূর্বে কি কি রোগে ভুগিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১৩) পা পাতিলে পায়ের নীচে ফাঁকা থাকে কি না

(১৪) দাঁত কেমন

(১৫) টেনিস, ব্যাডমিণ্টন বা অন্য কোন আউটডোর খেলায় দক্ষতা আছে কিনা

(১৬) টিকিট সংগ্রহ, অটোগ্রাফ সংগ্রহ বা ওই জাতীয় কোন বাতিক আছে কি ?
পাত্রীর যদি কোন 'হবি' (hobby) থাকে এখানে তাহা বিবৃত করুন।

এই ফর্মটির সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিসগুলিও পাঠাইতে হইবে।

(ক) দুইটি ফোটো :—একটি ফ্রন্ট ফেস, আর একটি প্রোফিল।

(খ) পাত্রীর ঠিকুজি।

(গ) সম্ভব হইলে একজন রেজিস্টার্ড অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বিবাহে যাহা খরচ করিতে পারিবেন তাহার পরিমাণ জানাইবেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ এতটা প্রত্যাশা করেন নি। বিস্মিত এবং ঈষৎ আতঙ্কিত হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি ওই চিঠি এবং ফর্মের দিকে। বাঙালীদের যে এত দ্রুত অধঃপতন হয়েছে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। একবার তাঁর মনে হ'ল তাঁর 'কিউরিও'-সংগ্রহের মধ্যে ওগুলো রেখে দেবেন, কিন্তু পরক্ষণেই ঘৃণা হ'ল। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন চিঠি দুটো। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, সেগুলোকে একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেললেন। তারপর ভিতরে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন।

ব্রজেন্দ্রনাথকে অসময়ে বাথরুম থেকে বেরুতে দেখে হরমোহিনী বললেন, "হঠাৎ বাথরুমে গেছলে যে ? পেট ভাল আছে তো ? যখন খেতে আরম্ভ কর তখন তো আর জ্ঞান থাকে না—"

"সাবান দিয়ে হাতটা ধুতে গিয়েছিলাম—"

"হঠাৎ সাবান দিয়ে হাত-ধোওয়া কেন ?"

"এমনি—"

ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনীর কাছে আর কথাটা ভাঙলেন না। ভাঙলে আর এক চোট বকুনি খেতে হ'ত। হরমোহিনী ওই চক্রবর্তী পাত্রকে গোড়াতেই নাকচ করেছিলেন।

দশ

এই যখন অবস্থা, তখন উষার খবর কি ? সে কি কিছু ভাবছে না এ বিষয়ে ? তার ভাবনার কিছু খবর পাওয়া যাবে তার এই চিঠিখানা থেকে। চিঠিখানা সে লিখেছিল তার এক বিবাহিতা বান্ধবীকে। ছ'মাস আগে তার বিয়ে হয়েছে।

ভাই সুজাতা,

অনেকদিন পর তোর চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। তুই জানতে চেয়েছিস আমার বিয়ের কিছু ঠিক হয়েছে কি না। এখনও কিছু শুনিনি। বাবা অনেক জায়গায় চিঠি লিখছেন। অনেক পুকুরে ছিপ ফেলছেন, অনেক নদীতে জাল। কিন্তু কিছু উঠেছে বলে এখনও শুনিনি। যে সব পাত্রের খবর মাঝে মাঝে শুনি তাদের অধিকাংশই বাজে বলে মনে হয়। কিন্তু বাবা যদি ওই পাত্রের মধ্যে কাউকে নির্বাচন করেন, মুখটি

বুজে বিয়ে করতে হবে। 'না' যে বলতে পারি না, তা নয়, কিন্তু বাবার মনে কষ্ট দিতে পারব না। যদি অমত করি বাবা তা অগ্রাহ্য করবেন না, এ বিশ্বাস আছে। কিন্তু বাবাকে বিব্রত করার ইচ্ছা নেই। তিনি যা করবেন, মেনে নেব।

এখানকার স্কুলের হেডমিস্ট্রেস শুক্লাদি আমাকে খুব ভালবাসেন, তিনি বলছিলেন, তাঁরা তাঁদের স্কুলে একজন 'টিচার' নেবেন। আমি যদি বি. এ. পাস করতে পারি আর যদি চাকরি নিতে রাজী থাকি তাহলে আমাকে তিনি কাজ দেবেন বললেন। মাকে কথাটা একবার বলেছিলাম, তাতে তিনি এমন ধমক দিয়েছেন যে দ্বিতীয়বার আর সে কথা পাড়তে সাহস করিনি। আর সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাই চাকরি করতে ইচ্ছে করে না। শুক্লাদি, বেণুদি, সোনাদি এঁদের মুখ দেখলে মনে হয় না ওঁরা খুব সুখে আছেন। ওঁদের মুখে আনন্দের ছাপ নেই যেন। মনে হয় ওরা সবাই অসুখী, সকলেরই মনের ভিতর যেন অসন্তুষ্টির আগুন জ্বলছে।

কিন্তু তুই তোর শ্বশুরবাড়ির কথা যা লিখেছিস তাতেও ভাই আমি ভয় পেয়ে গেছি। তুই অমন ভালো সেতার বাজাতিস লিখেছিস এখন একবারও বাজাবার সময় পাস না। দিনরাত খালি সংসারের কাজ করতে হয়। তুই ওদের বাড়িতে যাবার আগে ওদের সংসার কি করে চলত তাহলে? নিজের সংসারের কাজ করা যে খারাপ তা বলছি না (যদিও আমি নিজে খুব কুঁড়ে, গতরটি নাড়তে ইচ্ছা করে না), নিজের সংসারের কাজ করা তো উচিতই, স্বামী-শ্বশুর-দেওর-ননদ এদের সেবা করাটাই তো আনন্দের—কিন্তু তাই বলে দাসীবৃত্তিটা ভাল নয়। তুই তোর শ্বশুরবাড়ির কথা যা লিখেছিস তা পড়ে কষ্ট হ'ল। পরাধীনতার নাগপাশে আমাদের সমাজ-জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তাই বাইরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েও আমরা কিছুই পাইনি, আমরা সত্য কথা বলতে ভয় পাই, আনন্দলাভ করবার দাবি জানাতেও ভয় পাই। ঘরে-বাইরে সশঙ্কিত পশুর মতো রয়েছি, সামান্য একটু আনন্দের জন্যে, মানুষের মতো বাঁচবার জন্যে অমানুষের মতো কি হীনতাই না সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের।

মালতীর কথা মনে পড়ে? মাতাল স্বামীর যথেচ্ছাচারকে সহ্য করছে সে এখনও মুখ বুজে। এর মধ্যেই তিনটে মেয়ে হয়েছে তার। ক্রমাগত মেয়ে হচ্ছে বলে তার শাশুড়ী তাকে কী যে গঞ্জনা দিত তা আর বলবার নয়। কিন্তু তা সহ্য করেও সে শ্বশুরবাড়ি আঁকড়ে পড়ে ছিল, কারণ তার আশা ছিল স্বামী হয়তো একদিন ফিরে আসবে, হয়তো একদিন তার সুমতি হবে। কিন্তু তার সে আশাও ভেঙে গেছে, কারণ সে এখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছে যে তার স্বামী কেবল মাতাল নয়, চরিত্রহীনও। আর একটি মেয়েকে নিয়ে সে আছে। তাকে বিয়ে করেনি, তবু স্বামী-স্ত্রীর মতো আছে।

আমাদের দেশে একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে আইন পাস হয়েছে, কিন্তু নীতিহীনতার বিরুদ্ধে হয়েছে কি? যারা দুশ্চরিত্র বা দুশ্চরিত্রা তারা বিয়ের ফাঁদে পা দিতে যাবে

কেন! সুতরাং আমাদের পক্ষে ও আইন ব্যর্থ। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি জানিস? মালতী এখনও তার স্বামীর পা আঁকড়ে পড়ে আছে। কি করবে, নিতান্ত নিরুপায় যে। আই. এ. পাস করেছিল, হয়তো কোথাও চাকরি জুটতে পারে, আমাকেই সে লিখেছিল আমাদের মিলে যদি কোন চাকরি যোগাড় করে দিতে পারি বাবাকে বলে। বাবাকে বলেছিলাম. বাবা বললেন—টাইপিস্ট করে বহাল করে নিতে পারি, কিন্তু একশ' টাকার বেশী মাইনে দিতে পারব না। মালতী টাইপ করতে জানে না, যদি জানতও তাহলে মাত্র একশ' টাকায় তিন তিনটে মেয়ে নিয়ে ওর চলত কি? মেয়ে তিনটেকে ফেলে রেখে তো পালিয়ে আসতে পারে না। মালতীর বাবা খুব গরীব, তিনি ওর ভার নিতে অক্ষম। মালতীর এক দাদা কোথায় যেন কেরানীগিরি করেন। মালতী তাঁকে চিঠি লিখেছিল, উত্তর পায়নি। এ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকা ছাড়া ওর আর গতি কি। সেদিন এসেছিল আমার কাছে, দেখে বড় কষ্ট হ'ল।

ফন্তিকে মনে আছে তোর? সেই যে আমাদের সঙ্গে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে হঠাৎ বিয়ে হ'য়ে গেল যার। কি রূপ ছিল তার মনে আছে? কি রং, কি চুল, কি চোখ মুখ, রূপের জোরেই প্রায় বিনাপণে বিয়ে হয়েছিল। অনেকদিন পরে সেদিন দেখা হ'ল তার সঙ্গে। চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে যে প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি। সে রং নেই, চোখের কোলে কালসিটে পড়েছে, মাথার চুল উঠে গেছে, আর কি রোগা, একটা কঙ্কাল যেন। শুনলাম তার ছেলে বাঁচবে না। পেট থেকেই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। তার স্বামীর রোজগার ভালো, কিন্তু ফন্তির মনে সুখ নেই। এই সব দেখে শুনে বিয়ের কথা উঠলেই ভয় করে। জানি না অদৃষ্টে কি আছে। একটিমাত্র ভরসা বাবা ভাল করে না দেখে শুনে বিয়ে দেবেন না। অনেক লম্বা চিঠি লিখে ফেললাম আবোল-তাবোল। পড়ে নিশ্চয়ই তুই হাসছিস? ভালবাসা নে। আবার অনুরোধ করছি সেতার বাজানো ছাড়িস নি। ইতি—

উষা

এগারো

সব জায়গাতেই হতাশ হ'য়ে ব্রজেন্দ্রনাথ আবার চুপ করে গেলেন কয়েকদিন। ডায়েরি খুলে বিমর্ষও হ'য়ে গেলেন। দেখলেন অনেকেই চিঠির উত্তর দেননি। তার মনে হয়েছিল উত্তর পাওয়ার জন্যে চিঠির সঙ্গে ঠিকানা-দেওয়া খাম দিয়ে দেবেন. কারণ উত্তর পাওয়ার গরজটা তাঁরই। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম ভদ্রতাবোধে আবিষ্ট হ'য়ে শেষ পর্যন্ত তিনি খাম দেননি। যাঁকে চিঠি লিখছেন তিনি ভদ্রলোক এ বিশ্বাস তিনি শেষ পর্যন্ত রেখেছিলেন। উত্তর না পেয়ে হতাশ হলেন বটে কিন্তু তার মধ্যেই সান্ত্বনাও পেলেন

একটু। মনে হ'ল উত্তরের জন্য খাম না দিয়ে এক হিসাবে ভালই করেছেন তিনি, এতে কে ভদ্র কে অভদ্র তা সহজে ধরা পড়েছে। মেয়ের বিয়ে তিনি ভদ্র পরিবারেই দিতে চান, কিন্তু কোথায় সে ভদ্র পরিবার। কি করে নাগাল পাবেন তার। সবাই যে আজকাল মুখোশ-পরা। মুখোসের আড়ালে কে ভদ্র কে অভদ্র খুঁজে পাবেন কি করে। এই চিন্তায় তিনি যখন মগ্ন তখন হরমোহিনী দেখা দিলেন রঙ্গমঞ্চে। তাঁর মন খুব খুশী। বরেনের চিঠি এসেছে। আজও তাঁর হাতে একটি চিঠি।

"শুনছ, শিউলি চিঠি লিখেছে। খুব ভালো পাত্রের খবর দিয়েছে একটা।"

"শিউলি? আমার বউমা?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আবার কোন্ শিউলি চিঠি লিখতে যাবে আমাকে?"

"কি লিখেছে—"

"খুব ভালো একটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছে সে। কলকাতায় তার আলাপী তো অনেক। পার্কে ওদের মহিলা সমিতি আছে, সেখানকার ও মেম্বারও একজন। সেইখান থেকে এই খবরটি পেয়েছে। একেবারে নিঝ'ঞ্ঝাট সংসার। এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হ'য়ে গেছে। সেই মেয়েরি ননদ খবরটি দিয়েছে।"

"ছেলে করে কি?"

"ইন্‌জিনিয়ার। বড় ফার্মে চাকরি করে। এই দেখ না সব লিখেই দিয়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত পড়লেন চিঠিটি। পাত্রটিকে ভালো লাগল। গঙ্গোপাধ্যায় উপাধি দেখে তাঁর বাল্যবন্ধু বিকাশ গাঙ্গুলীকেও মনে পড়ল। দেব-চরিত্র লোক ছিল সে। অন্যমনস্ক হ'য়ে তার কথাই ভাবতে লাগলেন। একটি যুবতীর মান বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডার হাতে প্রাণ দিয়েছিল সে। তার উজ্জ্বল মুখটা বার বার মনে পড়তে লাগল।

"ভুরু কুঁচকে ভাবছ কি? আজই চিঠি লিখে দাও—"

"হ্যাঁ দিচ্ছি—"

তখনই তিনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন।

হরমোহিনীও গিয়ে ঢুকলেন ঠাকুরঘরে।

বারো

শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় ভীতু প্রকৃতির লোক। চিরকাল সবাইকে ভয় করে এসেছেন। বাবা, মা, ভূত-প্রেত, তেত্রিশ কোটি দেবতা, স্কুলের শিক্ষকরা, আপিসের বড়বাবু, জাঁদরেল প্রতিবেশী সবাই তাঁকে ভয় দেখিয়েছে, বৃদ্ধবয়সেও তিনি ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পাননি। গৃহিণী এবং ছেলে-মেয়ের ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত। গৃহিণী বিশালকায়া, নীলকণ্ঠবাবু খর্বাকৃতি। এই বিসদৃশ দম্পতিকে দেখে একজন রসিক একবার মন্তব্য করেছিলেন তুলোর বস্তার উপর নেংটি ইঁদুর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে যেন।

বস্তুতঃ, নীলকণ্ঠবাবু সত্যিই দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মতো। খুঁর্‌খুর্‌ করে তাড়াতাড়ি হাঁটেন, হাঁটতে হাঁটতে চট্ করে থেমে গিয়ে এদিক ওদিক তাকান, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে দিক পরিবর্তন করে খুর্‌খুর্‌ করে অন্যদিকে চলে যান আবার। ছোট ছোট চোখ, ছোট কান, রং ঘোর কালো। সরু একজোড়া গোঁফ আছে, যখন কাঁচা ছিল, তখন তার অস্তিত্ব বোঝা যেত না। এখন পাক ধরাতে সেটা পরিদৃশ্যমান হয়েছে। মেয়ের বিয়ের সময় তিনি অবশ্য কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রেও তাঁর নাম ছাপা ছিল, কিন্তু বিবাহ-ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র হাত ছিল না। হাত ছিল তাঁর দশাসই শ্যালক দিগিন্দ্র ঘোষালের, হাত ছিল তাঁর গৃহিণীর এবং হাত ছিল তাঁর মেয়ে শৈলবালার।

নবীন মুখুজ্যের ছেলে তরুণ যেই বিলেত থেকে ডাক্তারি পাস করে এল, অমনি নীলকণ্ঠগৃহিণী তাকে নিমন্ত্রণ করলেন। একবার নয়, বার বার। শৈলবালা তাকে সকাল বিকাল আধুনিক গান শোনাতে লাগল, দশাসই শ্যালক দিগিন্দ্র ঘোষালের জীপে চড়ে তারা সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় পিক্‌নিকেও মেতে উঠল। নীলকণ্ঠ ক্ষীণকণ্ঠে এই সব অশোভন কাণ্ডকারখানার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেছিলেন একবার। কিন্তু গৃহিণীর ধমক খেয়ে তাঁকে থেমে যেতে হয়েছিল, থেমে গিয়ে তাই করেছিলেন চিরকাল যা করে এসেছেন, মুখ কাঁচুমাচু করে ময়লা পৈতেটা টেনে ধরে পিঠ চুলকেছিলেন।

শৈলবালা আধুনিক মেয়ে। সে জানে এ যুগে সাহস করে এগিয়ে যেতে হয়, লোভনীয় জিনিসটা হামড়ে পড়ে সংগ্রহ করতে হয় ভিড় ঠেলেঠুলে। সসংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেই অপরে সেটি নিয়ে নেবে। শৈলবালা পষ্টাপষ্টি নাম করতে চায় না, কিন্তু সে দেখেছে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের কাছ-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফোটো তুলিয়েছে এমন অনেক অভাজন যাদের নাম পর্যন্ত জানত না কেউ আগে, কিন্তু যারা বড়লোকদের সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করেই শেষ পর্যন্ত পাদ-প্রদীপের বন্দনা লাভ করেছে। দূরে সরে থাকলে গুণের বা রূপের কদর হয় না, নিজেকে জাহির করতে হয়, বিজ্ঞাপিত করতে হয়। তার বাল্যসখী কঙ্কাবতী চক্রবর্তীও টোপ ফেলেছিল এবং শৈলবালা অবহিত না হ'লে হয়তো গেঁথেও ফেলত তরুণকে, কিন্তু শৈলবালার তৎপরতায় হার মানতে হয়েছে তাকে। চটপট বিবাহটা চুকেও গেছে নির্বিঘ্নে।

নীলকণ্ঠবাবু মেয়ের বিয়ের জন্য হাজার দশেক টাকা রেখেছিলেন। কিছু খরচ হয় নি। নবীনবাবুও খরচের দায় এড়িয়েছেন। কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে। নীলকণ্ঠবাবু ভেবেছিলেন এইবার ছেলের বিয়ে দেবেন এবং হয়তো সেই অনাগতা নব-বধূটির কাছে তার ভীত মন একটু প্রশ্রয় পাবে, হয়তো সে তাঁকে যখন তখন এমন বকবে না। কিন্তু সব গোলমাল হ'য়ে গেল। তাঁর ইন্‌জিনিয়ার পুত্র নূতন স্বপ্ন দেখে বসল একা। তার মাকে বলল, শৈলর বিয়েতে তোমাদের তো একটি পয়সাও খরচ হ'ল না। ওই টাকাটা আমাকে দাও না, আমি বিলেত ঘুরে আসি। দুটি বছর ছেড়ে দাও

আমাকে, বিলেত থেকে আমি ভালো ডিগ্রি নিয়ে আসছি। বিলিতী ডিগ্রি থাকলে চাকরির বাজারে অনেক দাম বেড়ে যাবে।

নীলকণ্ঠ-গৃহিণীও ভেবেছিলেন ছেলের এইবার বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিলেত-ফেরত ছেলের সঙ্গে শৈলর বিয়ে হ'য়ে যাওয়াতে তাঁর মনের মধ্যে একটু গোল বেধেছিল। জামাইয়ের বিলিতী ডিগ্রি রয়েছে, অথচ তাঁর ছেলের নেই এই সত্যটাকে যেন ঠিকমতো পরিপাক করতে পারছিলেন না। তাঁর আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। ছেলের কথায় তিনি উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন, বেশ তো, চলে' যা। টাকা তো আছেই, সেই ভালো।

এ প্রস্তাবে নীলকণ্ঠ একটু বিব্রত হলেন মনে মনে। শৈলের তৎপরতায় এবং কর্ম-পটুতায় তাঁর যে টাকাটা বেঁচে গিয়েছিল সে টাকাটার উপর তিনি অনেকখানি ভরসা করেছিলেন। কারণ ওই টাকাটাই ছিল তাঁর যথাসর্বস্ব। আমাদের বাঙালী হিন্দুসমাজের নিয়মানুসারে সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতে গেলে তাঁকে সর্বস্বান্ত হয়েই বিয়ে দিতে হ'ত। শৈল যেভাবে বিয়ে করেছিল সেটা যদিও তাঁর মনঃপূত হয়নি, কিন্তু টাকাটা বেঁচে যাওয়াতে মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন বুড়ো বয়সে অথর্ব হ'য়ে পড়লে ওই টাকাটাই তাঁর সহায় হবে। তাঁর বন্ধু জগদীশ মিত্তিরের অবস্থা দেখে তাঁর এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে বৃদ্ধবয়সে টাকা না থাকলে ছেলে বউ কেউ পোঁছে না, তাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে হয়। দরিদ্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত জগদীশ মিত্তিরের বিছানাও রোজ বদলানো হয় না। বেচারার টাকা থাকলে চাকরে অন্ততঃ তাঁর সেবা করত। জগদীশ মিত্তির ছেলেদের পড়িয়ে এবং মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হ'য়ে গেছেন। ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, বৃদ্ধ পিতার যথোচিত সেবা তারা করতে পারে না।

ছেলের প্রস্তাব শুনে নীলকণ্ঠ বললেন, "বেশ তো, বিলেত যাও, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যাবার আগে বিয়ে করে যাও।" নীলকণ্ঠ ভেবেছিলেন, ছেলের বিয়েতে নগদ কিছু আদায় করতে পারবেন হয়তো এবং তাতে বিলেত যাওয়ার খরচের খানিকটা অন্ততঃ উঠে যাবে।

ছেলে কিন্তু এটা অন্যভাবে নিয়ে চটে উঠল। মাকে বলল, "কেন, তোমরা কি মনে করছ বিয়ে না করে গেলে ওদেশে আমি মেমসাহেবের ফাঁদে পড়ে যাব? আমাকে বিশ্বাস করে দেখ, আমি তোমাদের সে রকম ছেলে নই যে তোমাদের মুখে কালি দেব।"

নীলকণ্ঠ-গৃহিণীর হৃদয় পুত্র-গর্বে ভরে উঠল। মায়ের মন স্বভাবতই ছেলেদের কথা বিশ্বাস করবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকে। সুতরাং তিনিও ছেলের সঙ্গে যোগ দিয়ে চোখ রাঙিয়ে বকলেন নীলকণ্ঠকে—"ছি ছি, কি নীচ মন তোমার, নিজের ছেলেকেও বিশ্বাস করতে পার না!" হকচকিয়ে গেলেন নীলকণ্ঠ। তিনি কেন যে ছেলেকে বিয়ে করে বিলেত যেতে বলছিলেন তা-ও বিবৃত করে বলতে তাঁর সাহসে কুলোল না। তিনি অপ্রস্তুত মুখে ময়লা পৈতেটা টান করে ধরে পিঠ চুলকোতে লাগলেন।

ইন্‌জিনিয়ার ছেলের খবর চাপা ছিল না। অনেক জায়গা থেকেই সম্বন্ধ আসছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠিও পেয়েছিলেন তিনি। সকলকেই এক উত্তর দিলেন।

প্রীতিভাজন মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার সহিত কুটুম্বিতা হইলে অতিশয় সুখী হইতাম। কিন্তু এখন এ বিষয়ে আপনাকে কোনও কথা দিতে পারিতেছি না। কারণ, আমার পুত্র বিলাতে গিয়া আরও পড়াশোনা করিবে স্থির করিয়াছে। এখন সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়। দুই বৎসর পরে সে বিলাত হইতে ফিরিবে। সুতরাং এখন এ বিষয়ে কোনও আলোচনা করা বৃথা। আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়

চিঠি পেয়ে ব্রজেন্দ্রবাবু তো দমে গেলেনই, হরমোহিনীও গেলেন। তাঁর বউমার-দেওয়া এই সম্বন্ধটি যে নির্ঘাৎ লাগবেই, কেন জানি না, এই রকম একটা ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাঁর ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়েও তিনি যেন একটু মৃদু হাসি লক্ষ্য করেছিলেন যাতে তাঁর মনে আশা হয়েছিল যে ঠাকুর বোধহয় দয়া করলেন। নীলকণ্ঠবাবুর চিঠি পড়ে তার মনে হ'ল ঠাকুর যে হাসিটি হেসেছিলেন তা ব্যঙ্গের হাসি। চটে উঠলেন তিনি শিউলির উপর। শুধু শিউলির উপর নয়, আজকালকার মেয়েদের উপরও।

"কি যে আজকালকার ফাজিল মেয়েগুলো, না আছে তাদের কথার ওজন, না আছে দাম। বাজে উড়ো কথা নিয়ে চালাচালি করে কেবল"—বলেই দুম দুম করে ভিতরের দিকে চলে' গেলেন। ইঁদুর ফাঁদে ধরা পড়লে আর যাই করুক হাসে না। ব্রজেন্দ্রবাবুও ফাঁদে পড়েছিলেন, তবু তাঁর মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল। কারণ তিনি মানুষ, ইঁদুর নন। শুধু হাসিই ফুটল না, মতলবও জাগল একটা। নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়কে আর একটি পত্র লিখলেন তিনি। চিঠির খোলো কাগজখানা দেখে তাঁর মনে হ'ল, টাকার লোভ দেখালে হয়তো কাজ হ'তে পারে। ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুমান মিথ্যা ছিল না, নীলকণ্ঠ-বাবুর যদি হাত থাকতো তাহলে হয়তো এতে কাজও হ'ত। তাছাড়া আর একটা দুর্ঘটনা ঘটল, চিঠিখানা পড়ল তাঁর ছেলের হাতে। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরাই নানা ছলে পণ নেয়, কিন্তু সেটা সোজাসুজি বা খোলাখুলি বললেই তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ব্রজেনবাবু লিখেছিলেন—

নমস্কারান্তে সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আপনার পুত্র উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিদেশে যাইতেছে ইহা অত্যন্ত আনন্দজনক খবর। কিন্তু বিদেশে যাইবার পূর্বে সে যদি বিবাহ করিয়া স-স্ত্রীক বিদেশে যায় তাহা হইলে ক্ষতি কি। আমার মেয়েও এবার বি. এ পরীক্ষা দিয়াছে, সম্ভবতঃ পাস করিবে। আপনি যদি আপনার

পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন তাহা হইলে সে-ও বিদেশে গিয়া স্বামীর সহিত লেখাপড়া করিতে পারে। স্বীকার করি ইহা ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু আপনি যদি অনুমতি এবং অভয় দেন উভয়েরই ব্যয়ভার বহন করিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার নমস্কার জানিবেন। আশা করি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল। তাড়াতাড়ি পত্রের উত্তর দিলে বাধিত হইব। ইতি—

বিনয়াবনত
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চিঠির উত্তর তাড়াতাড়ি এল। চিঠির হস্তাক্ষর নীলকণ্ঠের, কিন্তু চিঠির ভাষা ও ভাব তাঁর পুত্রের। চিঠিখানা পেয়ে তাঁর পুত্র যে উত্তর লিখে দিয়েছিল গৃহিণীর আদেশে নীলকণ্ঠ তাই টুকে পাঠিয়েছেন। টাকার লোভে নীলকণ্ঠ-গৃহিণীও যে বিচলিত হননি তা নয়, কিন্তু তিনি পুত্রের আদর্শ-প্রীতিতে এবং পুত্র-গর্বে এত বিমোহিত হ'য়ে পড়েছিলেন যে টাকার প্রশ্নটা তুচ্ছ হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। তাছাড়া আর একটা নিগূঢ় কারণও ছিল। তিনি ভাবলেন নিজের মেয়েকে বিলিতী শিক্ষা দেবার জন্যে উনি টাকা খরচ করবেন তাতে তাঁদের সংসারে কি লাভ হবে। বিলিতী লেখাপড়া আর হাবভাব শিখে তাঁর মেয়েটি যদি হাই-হিল-জুতো-পরা নাক-তোলা ঘাড়-ছাঁটা মেমসাহেব হ'য়ে ফিরে আসেন তাহলে বিপদেই বরং পড়ে যাবেন তাঁরা। তাছাড়া তাঁর মনের নেপথ্য-আকাশে এ বিশ্বাসটাও ধ্রুবতারার মতো জ্বলছিল যে তাঁর ছেলে যদি ভালো একটা বিলিতী ডিগ্রী আনতে পারে তাহলে অনেক মেয়ের বাপ সেধে তার পায়ে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা তো দেবেই, বেশীও দিতে পারে। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে তিনি দ্বিধা করলেন না। ছেলেকে বললেন—খুব কড়া জবাব লিখে দে একটা আর স্বামীকে বললেন, ও যা লিখবে তুমি সেটাকে টুকে পাঠিয়ে দাও। যে চিঠি ব্রজেনবাবু পেলেন তা এই—

প্রীতিভাজন মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত এবং অপমানিত হইয়াছি। আপনি আমাকে এবং আমার পুত্রকে যে পণ-লোলুপ আত্ম-সম্মানহীন ব্যক্তিদের দলভুক্ত করিয়াছেন ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ইহাও অনুভব করিতেছি, দোষ আপনার নয়, দোষ সমাজের। সমাজের হাওয়া যেদিকে বহিতেছে সেই হাওয়ার আনুকূল্য লাভের জন্য সেই দিকেই আপনি ঘুড়ি উড়াইয়াছেন। কিন্তু আপনার জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে আমার পুত্রের শিক্ষার ভার লইতে আমি সক্ষম, ভবিষ্যতে আমার পুত্রবধূকেও যদি বিদেশী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি তাহার ব্যয়ভারও আমরা বহন করিতে পারিব। এজন্য আপনার অর্থসাহায্য আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমার পুত্র বিলাত যাইবার পূর্বে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। সে পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের আদেশই বিনা দ্বিধায়

পালন করে, তাহার মা-ও তাহাকে বিবাহ না করিয়া বিলাত যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং আপনার প্রস্তাবে সায় দিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন। নমস্কারান্তে—

ভবদীয়
শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠের এ চিঠির কথা ব্রজেন্দ্রনাথ একেবারে চেপে গেলেন হরমোহিনীর কাছ থেকে। কিন্তু একটা কথা তাঁর মনে হ'ল—কোন্ পাপে এদেশে মেয়ের বাপ হ'য়ে জন্মেছি! আগেকার দিনে সোজাসুজি পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে হ'ত, যারা পণ দিতে সক্ষম তারা অন্ততঃ মেয়ের বিয়েটা নির্ঝঞ্ঝাটে দিতে পারত। কিন্তু আজকাল এ কি কাণ্ড হয়েছে। পণপ্রথা তো ওঠেই নি, তার ওপর চেপেছে নানারকম মুখোশ, ভণ্ডামি আর চালিয়াতির ঢং। এর থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই! মুক্তির একটা চেহারা কিন্তু হঠাৎ এসে হাজির হ'ল তার পরদিনই। আগে একটা টেলিগ্রাম এল—Reaching tomorrow evening—Kusumika.

কুসুমিকা? চিনতে পারলেন না। নামটা আগে শুনেছেন কি না মনে পড়ল না। এমন কি এ ব্যক্তি মেয়ে না পুরুষ তা-ও সহসা ঠিক করতে পারলেন না ব্রজেন্দ্রনাথ। অনেক পুরুষের মেয়েলী নাম দেখেছেন তিনি। শেষে মনে হ'ল ঊষার কোন সহপাঠিনী সম্ভবতঃ। ঊষাকে ডাকলেন। তার হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে বললেন, "একে চিনিস?"

উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল ঊষার মুখ।

"ও, কুসুমদি আসছেন?"

"আমি তো চিনতে পারছি না—"

"বাঃ—তোমারই তো বন্ধুর মেয়ে। আগে আমাদের হেড্‌মিস্ট্রেস ছিলেন। মনে নেই তোমার? বিলেত গিয়েছিলেন। ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস হয়েছেন আজকাল।"

তখন ব্রজেন্দ্রনাথের মনে পড়ল কুসিকে। তাঁর বন্ধু দেবেন মৈত্রর মেয়ে।

তেরো

দেবেন মৈত্রর কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রফেসারি করতেন, তখন দেবেন মৈত্রর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি যে কলেজে ছিলেন, সেই কলেজের কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক ছিলেন দেবেনবাবু। যেমন দেবতার মতো রূপ ছিল, তেমনি দেবতার মতো স্বভাব। এঁর বন্ধুত্ব লাভ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন তিনি একদা। অথচ আজ তাঁর কথা মনেই পড়েনি। আশ্চর্য মানুষের মন।

অনেকদিন পরে কুসি আসছে এ খবর পেয়ে সমস্ত মন আনন্দে ভরে উঠল ব্রজেন্দ্রনাথের। কুসিকে শেষবার দেখেছিলেন এইখানেই মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী-

রূপে। উষা তখন ওই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল। বেশ নাম করেছিল কুসি শিক্ষয়িত্রীরূপে। এখান থেকেই বিলেত চলে যায়। সে যে স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস হয়েছে এ খবর পাননি ব্রজেন্দ্রনাথ। টেলিগ্রামটার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিলেন তিনি। দেবেনবাবুর কথাই মনে পড়ছিল। সমস্ত দিন নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন দেবেনবাবু। কারও বাড়ি বড় একটা যেতেন না। ব্রজেন্দ্রনাথের কাছেও তিনি কম এসেছেন। কিন্তু যখনই আসতেন সঙ্গে করে একটা পবিত্রতা বহন করে আনতেন। তাঁর চোখ মুখ থেকে একটা বিশুদ্ধতার আভা যেন বিকীর্ণ হ'ত। আদর্শবাদী লোক ছিলেন। যৌবনে বিয়ে করেছিলেন এক গরীবের কুৎসিত কালো মেয়েকে। একটিমাত্র সন্তান হয়েছিল ওই কুসি। কুসিও রূপসী হয়নি এবং সেইজন্যেই দেবেনবাবু আদর করে ওর নাম রেখেছিলেন কুসুমিকা।

দেবেনবাবুর নিজের সংসার ছোট ছিল, কিন্তু স্বার্থপরের মতো নিজের সংসার নিয়েই তিনি থাকতে পারেন নি। এই 'আপনি আর কোপ্‌নি'র যুগেও অনেক আত্মীয়-স্বজন নিয়ে থাকতেন তিনি। সামান্য স্কুল মাস্টার ছিলেন, মাইনে খুব বেশী ছিল না, প্রাইভেট ট্যুশনি করতেন না (যদিও বাড়িতে অনেক ছেলেকে বিনাপয়সায় পড়াতেন), ওই সামান্য আয়েও কৃচ্ছ্রসাধন করে তিনি নিজের আদর্শ বজায় রেখেছিলেন। এর জন্যে সমাজের লোকও তাঁকে যে বিশেষ সম্মান করত তা নয়, অনেকে তাঁকে নির্বোধই বলত। কিন্তু সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না দেবেনবাবু। স্কুল থেকে তিনি একটা কোয়ার্টার পেয়েছিলেন। মাত্র তিনখানি শোওয়ার ঘর ছিল তাতে। কিন্তু তিনি সেই তিনখানি ঘরকেই ছ'খানি ঘরে পরিণত করেছিলেন চৌকির সাহায্যে। রাত্রে একদল চৌকির উপরে শুত, আর একদল চৌকির নীচে। তিনি নিজে শুতেন একখানি চৌকির নীচে। সেইখানে বসে পড়াশোনা করতেন, ছেলেদের হোম্‌টাস্‌কের খাতাও সংশোধন করতেন। আর ভোরে উঠে চলে যেতেন স্কুলের সমীপবর্তী বটগাছটার তলায়। সেইখানে মাদুর পেতে বসতেন আর যে সব ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে পড়তে আসত তাদের পড়াতেন। কখনও শৌখিন কাপড়-জামা পরেন নি। অধিকাংশ দিনই খালি পায়ে স্কুলে আসতেন, বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বা স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার এলে তালতলার চটি পায়ে দিতেন। চিনি কিনতেন না, পাঁউরুটি কিনতেন না, গুড় আর হাতে-গড়া রুটিই চিরকাল খেয়েছেন। রাত্রে তাঁর বাড়িতে রান্না হ'ত না। মুড়ি খেত সবাই। মুড়ি আর ছোলার ঘুগনি।

কুসির মা মুড়ির চাল কিনে নিজেই মুড়ি ভাজতেন। একটি গাই ছিল। তার যখন দুধ হ'ত, তখন রাত্রে দুধ খাওয়া চলত দিনকতক। কুসির মা-ই গরুর সেবা করতেন স্বহস্তে। জাব কাটতেন, দুধ দুইতেন, ঘুঁটেও দিতেন। বাছুর কখনো বিক্রি করেন নি দেবেনবাবু। সৎপাত্রে দান করে দিতেন। এরকম অদ্ভুত আদর্শবাদী লোক ব্রজেন্দ্রনাথ আর দেখেন নি।

কুসি তার বাবার অনেক গুণ পেয়েছিল। দেবেনবাবু তাকে নিজেই পড়িয়েছিলেন বাড়িতে। প্রাইভেটে সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে। পাস করবার পর তাঁর বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিয়ে দিতে পারেন নি। তাকে বাড়িতেই আই. এ. পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর এক ভাইয়ের বড চাকরি হ'য়ে গেল। ভাইটিকে দেবেনবাবুই মানুষ করেছিলেন। সেই ভাই কুসুমকে কলেজে ভর্তি করে দেয়। কলেজে গিয়ে কুসুমের সুপ্ত প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করল। দারিদ্র্যের পাথরে ঝরণাটা যেন চাপা ছিল, পাথরটা সরে যেতেই দিগ্বিজয়িনীর মতো বেরিয়ে পড়ল সে কলোল্লাসে। কলেজের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তিতে এবং পুরস্কারে যা পেতে লাগল তাতে তার নিজের পড়ার খরচ তো চলতই, দেবেনবাবুর সংসারেও সাহায্য হ'ত। এম. এ. এবং ডিপ-ইন-এড্ এর বন্দর পর্যন্ত পৌঁছতে কোথাও আটকালো না কুসুমিকার। এর পরই পেল সে চাকরি। তারপর স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলেত গেল। বিলেত থেকেও ভালো ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস অব স্কুলস হয়েছিল—এই খবর পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের জানা।

দেবেনবাবুও রিটায়ার করে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন সেখানেও নিজের বাড়িতে তিনি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলেছেন একটি। অনেকদিন দেবেনবাবুর বা কুসুমিকার খবর পাননি। এতদিন পরে হঠাৎ কুসুমিকা আসছে কেন? সরকারী কাজ নিশ্চয়ই নয়, কারণ তার কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ডিভিসনে। বদলি হ'য়ে আসছে কি? উষাই মোটর নিয়ে স্টেশনে গেল কুসুমিকাকে আনতে। খবরটা শুনে হরমোহিনী খুব খুশী হলেন না। যে সব মেয়ের ভাবভঙ্গীতে পুরুষালির প্রভাব বেশী, মুখে কিছু বলতে না পারলেও, মনে মনে তাদের উপর খুব প্রীত নন হরমোহিনী। কুসুমিকা যখন ছেলেদের সঙ্গে টেনিস্ বা ব্যাড্‌মিন্‌টন খেলত আর কথায় কথায় হা হা করে হেসে গড়িয়ে পড়ত তখন হরমোহিনী সেটা খুব পছন্দ করতেন না। মনে মনে বলতেন—'ধিঙ্গি মেয়ের কাণ্ড দেখ না!' যাই হোক যখন আসছে তখন অভ্যর্থনা করতেই হবে। একটা কথা তাঁর মনে পড়ল, কুসি পুডিং খেতে খুব ভালবাসে। পুডিংয়ের আয়োজন করতে লাগলেন তিনি।

চৌদ্দ

কুসুমিকাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। হরমোহিনীও কম অবাক হলেন না। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন হাই-হিল-জুতো খটখটিয়ে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে, চোখে গগল্‌স এঁটে, গালে ঠোঁটে রং মেখে, হব্‌লকরা শাড়ির আঁচলা ঝলমলিয়ে বিবি-মার্কা কোনও আধুনিকার আবির্ভাব হবে বুঝি। কিন্তু কুসুমিকাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন। অতি সাধারণ মিলের সাদা শাড়ি পরনে, মাথার চুল টান

করে বাঁধা, চোখে কাজল নেই, ঠোঁটে রং নেই, গলার খাঁজে খাঁজে পাউডার নেই। কালো মুখখানিকে আলো করে রেখেছে একটি স্নিগ্ধ নম্র হাসি। এই মেয়েই কিছুকাল আগে ছুড়োছুড়ি করে টেনিস খেলত! এই মেয়ে এত বড় বিদুষী, বিলেত থেকে ঘুরে এসেছে! হরমোহিনী বিস্ময়ে আত্মহারা হ'য়ে তার থুতনিতে হাত দিয়ে চুমু খেলেন এবং বলে উঠলেন, "ওমা, এ কি ছিরি মেয়ের! এত রোজগার করছিস একটা ভালো শাড়ি কিনতে পারিস নি?" কুসুমিকা মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

"চল খাবি চল—"

জোর করে অনেকখানি পুডিং, চারটে রসগোল্লা, ডবল ডিমের ওমলেট খাওয়ালেন তাকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ব্রজেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন, "এখানে কি বদলি হ'য়ে এলি না কি? এখানকার স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসের কোয়ার্টার তো খুব ভালো—"

"আমি তো স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসের চাকরি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি!"

"কেন?"

"ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগত না। তাছাড়া এক ডাকবাংলোয় একটা অসভ্য এস. ডি. ও.কে চড়িয়েছিলাম বলে গোলমালও হয়েছিল একটু!"

"চড়িয়েছিলি? সে কি!"

"হ্যাঁ, অশ্লীল অসভ্যতা করেছিল। আমি ও চাকরি ছেড়ে প্রফেসারি নিয়েছিলাম, কিন্তু তা-ও শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হবে।"

"এত কাণ্ড করেছিস কিচ্ছুই শুনিনি তো!"

অভিমানভরা কণ্ঠে কুসুমিকা বলল, "আপনি আজকাল আমাদের খবর আর রাখেন নাকি!"

ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে লজ্জিত হলেন, সত্যিই ওদের খবর অনেকদিন রাখেন নি। পৃথিবীতে পরিচিতের সংখ্যা রোজ এত বাড়ছে, আর তাদের খবরের পরিমাণও রোজ এত বেশী হচ্ছে যে সব দিকে হিসাব ঠিক রাখা মুশকিল। কিন্তু এ-ও তাঁর মনে হ'ল দেবেনবাবুর আর কুসুমিকার খবরটা তাঁর রাখা উচিত ছিল। কারণ ওদের সঙ্গে পরিচয়টা ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

"প্রফেসারি ছাড়ছিস কেন?"

"বাবা ছেড়ে দিতে বলেছেন।"

"কেন হঠাৎ?"

কুসুমিকা তখন সব কথা বলল। বক্তব্যটা বক্তৃতার মতো শোনালো অনেকটা।

"আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার পর জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অসাধুতা, কপটতা আর যথেচ্ছাচার চলছে। মনে হচ্ছে যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা আবার ফিরে এসেছে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে। যে দেশে অধিকাংশ লোক মূর্খ, যে দেশে পয়সা দিয়ে ভোট

কেনা যায়, লোভ দেখিয়ে হুমকি দিয়ে ভোট আদায় করা যায়, সে দেশে গণতন্ত্র কতকগুলি মতলববাজ লোকের হাতে পড়ে অত্যাচারের যন্ত্র হ'য়ে উঠবে তাঁতে আর আশ্চর্য কি। আমাদের বর্তমান তো অন্ধকারই, কিন্তু ভবিষ্যৎ মনে হচ্ছে আরও অন্ধকার। কারণ মনুষ্যত্ব গড়বার যে পথ তাই এঁরা কণ্টকাকীর্ণ করে দিচ্ছেন। আমাদের দেশে শিক্ষার আবহাওয়া আজ বিষাক্ত। শিক্ষার পদ্ধতিই ভুলে ভরা। বাইরে থেকে মনে হবে আমাদের ছেলে-মেয়েরা বুঝি অনেক কিছু শিখেছে, কিন্তু কেউ কিচ্ছু শিখছে না। বইয়ের ভারে ছোট ছোট শিশুদের পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে যাচ্ছে কেবল। তাদের শেখাবার মতো শিক্ষকও নেই। সুপারিশের জোরে ভাইপো ভাগনারাই শিক্ষকের চাকরি পাচ্ছেন, ভালো লোকের স্থান নেই। আর সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়েও চোরাকারবার অবাধে চলছে।

"আমি একটি মহিলা কলেজের মহিলা প্রিন্সিপালের খবর জানি। তিনি তাঁর বাজেমার্কা মেয়েকে ফার্স্ট‌ক্লাস অনার্স পাওয়াবার জন্যে চতুর্দিক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে খুশী করবার জন্যে তাঁর অধীন কিংবা প্রসাদকামী পরীক্ষকেরা নির্বিচারে ঢেলে ঢেলে নম্বরও দিচ্ছে তাঁর মেয়েকে। অথচ তার চেয়ে ঢের ভালো ছেলে-মেয়েরা কিচ্ছু পাচ্ছে না।

"অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই আজকাল পরীক্ষকেরা খাতা পরীক্ষা করে নম্বর দেন না, অনেক সময় নম্বর দেন জাত বিচার করে, কিংবা কোন্ প্রদেশবাসী তা জেনে নিয়ে, কিংবা ওপরওয়ালার আদেশ বা অনুরোধে। ডিগ্রির আজকাল কোন মূল্য নেই, প্রকৃত শিক্ষার তো নেই-ই। চাকরির জন্যে যেন-তেন-প্রকারেণ ডিগ্রির একটা তকমা চাই। সে তকমাটা যত চকচকে হয় চাকরির ক্ষেত্রে ততই সুবিধা। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চালকরা আজকাল পক্ষপাতিত্ব করে তাঁদের নিজেদের লোকেদের তকমাটা চকচকে করে দেবার কাজে লেগেছেন উঠে পড়ে। অবাধে ঘুষ দেওয়া-নেওয়াও চলছে। আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষায়তনে শিক্ষা দেওয়া হয় না, গুণের বিচার করা হয় না, ভালো ছেলে-মেয়েদের পিছনে ঠেলে দিয়ে সামনে হাজির করা হয় সেই সব হস্তিমূর্খ ছেলে-মেয়েদের যারা দৈবাৎ আধুনিক রাজকুলের আত্মীয়-স্বজন। দেশ যাতে ভবিষ্যতে আর কিছুতে মাথা তুলতে না পারে, তারই সুনিপুণ ব্যবস্থা করেছেন এঁরা। তাই আমার বাবা বলেছেন চাকরি ছেড়ে দিতে। যে গভর্নমেণ্টের আগাগোড়া কলুষিত সেখানে প্রতিবাদ করেও কোন লাভ নেই। সুতরাং ওদের সংস্রবই ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করে নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। আমাদের এখন প্রধান কাজ মানুষ তৈরি করা। আমাদের গ্রামের যিনি জমিদার ছিলেন তিনি বাবার ছাত্র। তাঁর এখন জমিদারি নেই, কিন্তু এখন কলকাতায় ব্যবসা করে তিনি অনেক টাকা রোজগার করেছেন। তিনি বাবাকে এক লক্ষ টাকা দিতে চান গ্রামে একটা স্কুল করবার জন্যে। বাবা বলেছেন তিনি স্কুলের ভার নিতে রাজী আছেন কিন্তু সে স্কুলের সঙ্গে

গভর্ণমেণ্টের কোনও সংস্রব থাকবে না। সে স্কুলের একমাত্র লক্ষ্য হবে ভালো ছেলে-মেয়ে তৈরি করা। যারা পরীক্ষা পাস করে চাকরি পেতে চায় তাদেরও পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকবে তাতে, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা দিতে হবে প্রাইভেটে। বাবা আমাকে তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওই স্কুলে যেতে বলছেন। মেয়েদের ভার আমার উপর থাকবে। কিন্তু আমি একা তো পারব না, তাই আমি আমার যে সব ভালো ছাত্রী ছিল তাদের খোঁজে বেরিয়েছি। উষা তো এবার বি. এ পরীক্ষা দিয়েছে। ওকে দেবেন আমার সঙ্গে? আমাদের বাড়িতে থাকবে, মাইনেও কিছু দেব আমরা—"

এ প্রস্তাবের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন না। হরমোহিনীও ছিলেন না।

ব্রজেন্দ্রনাথ সোজাসুজি 'না' বলতে পারলেন না। মাথা চুলকে বললেন, "ও এখনও ছেলেমানুষ আছে, ও কি পারবে?"

"খুব পারবে। বাবা বলেছেন কমবয়সী শিক্ষক-শিক্ষিকাই দরকার। তারাই আদর্শবাদী। তারা শুধু পড়াবে না, নিজেরাও পড়বে। আপনি উষাকে দিন—"

এইবার হরমোহিনী আসরে নামলেন।

"দেখ্, আমি তোর মতো লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু তোর চেয়ে আমার বয়স ঢের বেশী, অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। এটা ভাল করে বুঝেছি সময়ে বিয়ে না হ'লে মেয়েদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বাপ মা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন খেতে পরতে পায়। আজকাল তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, চাকরিবাকরি করেও হয়তো অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারবে তোমরা, কিন্তু এটা জেনে রেখ শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকলেই মানুষের সুখ হয় না। বিশেষ করে মেয়েমানুষের। তার কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে চাই। তাতেই তার সুখ। অনেক বড়লোকের বাড়ির বাঁজা বউ মেয়ে দেখেছি, তাদের খাওয়াপরার অভাব নেই, কাপড়-গয়নাও অজস্র, কিন্তু মনে সুখ নেই। কারো ফিট হচ্ছে, কারও মাথায় ছিট এসে গেছে, কেউ মুখ গোমড়া করে বসে আছে দিনরাত, কেউ ঝগড়া করে মরছে, অনেকে পাগলও হ'য়ে গেছে। মনে সুখ নেই কারও—। আমি বাপু আমার মেয়ের বিয়ে দেব, মাস্টারি-ফাস্টারি করতে দেব না। আর তুমি যদি তোমার কাকীমার কথাটি শোন তাহলে ওসব উদ্‌খুটে ব্যাপারে না যেতে একটি বিয়ে করে ফেল!"

ব্রজেন্দ্রনাথও সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও সেই মত। বলিস তো তোর জন্যেও একটি ভালো ছেলের খোঁজ করি—"

হরমোহিনী ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে। তাঁর চোখে একটা ব্যঙ্গের হাসি চকমক করতে লাগল। মুখে যদিও তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নিজের মেয়ের জন্যে পাত্র জোটাতে পারছেন না, পরের মেয়ের ভার নিতে চাইছেন! আশ্চর্য লোক।

কুসুমিকা হেসে বলল, "বাবা তো আমার বিয়ের জন্যে কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু

কেউ আমাকে নিলে না যে। আমাদের সমাজে রূপ রূপিয়া দুটোই চায় সকলে। আমার যে একটাও নেই।"

কুসুমিকা পরের ট্রেনেই ফিরে গেল।

যাবার সময় বলে গেল উষার জন্য সে-ও পাত্রের সন্ধান করবে। ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন। একথা তাঁর বারবার মনে হ'তে লাগল মেয়েদের আত্মসম্মানের যে উচ্চ আদর্শকে তিনি বরাবর সমর্থন করে এসেছেন, নিজের মেয়ের বেলা সে আদর্শের মান তিনি রাখতে পারলেন না। তাঁর বন্ধু দেবেন মৈত্র পেরেছেন, শত দুঃখকষ্ট সহ্য করেও আদর্শের ধ্বজাটাকে উঁচু করে রেখেছেন। কিন্তু তিনি পারলেন না। তিনিও হয়তো পারতেন, যদি উষা নিজে জোর করে এগিয়ে আসত। কিন্তু উষা মায়ের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল মুচকি হেসে। মনে হ'ল মায়ের কথাতেই যেন ওর সায় আছে। ব্রজেন্দ্রবাবু তাই আর জোর পেলেন না, সাহস করতে পারলেন না। এই ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করলেন যে সব মেয়ে কি একরকম হয়? সবাইকেই কি এক ছাঁচে ঢালা যায়?

কুসুমিকা চলে যাবার পর হরমোহিনী তেমন কিছু মন্তব্য করলেন না। কিন্তু স্নান করে উঠে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তিনি নিজের মনে যা বলছিলেন, তা ব্রজেন্দ্রনাথের কানে গেল।

"ওসব ওদের মতো মেয়েরই পোষায়। আমার মেয়ে বিলেতও যায়নি, চাকরিও করেনি। দুটো অচেনা পুরুষের সামনাসামনি হলেই ভয়ে নীল হ'য়ে যায়। সেরকমভাবে তো মানুষ করিনি। হুট্ করে চাকরি করতে পাঠিয়ে দিলেই হ'ল! আমাদের একমাত্র মেয়ে, তাকে চাকরি করতে পাঠাবই বা কেন! ওর কথা আলাদা—"

ব্রজেন্দ্রনাথ সব শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। ভাবলেন বলবার কি-ই বা আছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাও হ'ল, করাই বা যায় কি। সৎপাত্র তো ডুমুরের ফুলের চেয়েও দুর্লভ হ'য়ে উঠল। সেই দিনই তিনি আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে চিঠি লিখলেন, যদি কেউ কোনও পাত্রের খবর দিতে পারে। তাঁর মনে হ'ল আমাদের সমাজে বিবাহ ব্যাপারটা ক্রমশঃই খুব জটিল হ'য়ে উঠছে।

পনেরো

কয়েকদিন পরে কুসুমিকার একটা চিঠি পাওয়া গেল। মজঃফরপুর থেকে লিখেছে:

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, ফিরে গিয়ে আপনাদের কথা বাবাকে সব বলেছিলাম। বাবাও কাকীমার কথায় সায় দিলেন। বললেন, গৃহই মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্র। সে সুযোগ যখন

পাওয়া যায় না তখনই মেয়েদের ক্ষেত্রান্তরে যেতে হয়। তিনি একটি পাত্রের খবরও দিয়েছেন। পাত্রটির নাম তিনি জানেন না, উপাধি চট্টোপাধ্যায় এই খবরটুকু শুধু জানা আছে। পাত্রের পুরা খবর ও ঠিকানা আপনি পাবেন দ্বিজেন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে। তাঁর ঠিকানা নীচে দিলাম। দ্বিজেনবাবু বাবার পুরাতন বন্ধু। এখন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হ'য়ে আছেন। সেজন্য মনে হয় চিঠি লিখে উত্তর পেতে বিলম্ব হবে। সব চেয়ে ভাল হয় আপনি যদি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। পূর্ণিয়া তো খুব বেশী দূর নয়। কাকীমার এক ভাইপোও তো সেখানে আছেন শুনেছি। তাঁকেও চিঠি লিখতে পারেন, তিনি দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে ঠিকানাটা নিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি এখানে এসেছিলাম আমার এক ছাত্রীর খোঁজে। মেয়েটি বিহারী, দু' বছর আগে এম. এ.তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, তার স্বামীও এম. এ. পি-এইচ. ডি.। এরা দু'জনেই আমাদের গ্রামের স্কুলে যোগদান করবে বলছে। এরা এবং এদের পরিবারবর্গ কি যে ভালো, কত যে ভদ্র তা একমুখে বলা যায় না। রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্তে আজ প্রাদেশিকতার বিষ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালী বিহারী পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছে। কিন্তু এ বিষ সবাকেই আচ্ছন্ন করেনি। আদর্শবাদী, ভদ্র, মহৎপ্রাণ অনেক বিহারীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সারা দেশ জুড়ে অন্যায় ও অসাধুতার যে তাণ্ডব চলেছে তার বিরুদ্ধে লড়তে হ'লে সব প্রদেশের আদর্শবাদী লোকদের সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আমার বিশ্বাস সব প্রদেশেই এরকম আদর্শবাদী ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের খবর নিতে হবে, তাদেরও উদ্বুদ্ধ করতে হবে প্রকৃত স্বদেশ-সেবায়। দেশের আত্মসম্মান, শুভ-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে মরে যাওয়ার আগে রক্ষা করতে হবে তাদের। এ কাজ শিক্ষকদের। আপনারা আশীর্বাদ করুন, এ ব্রত যেন উদ্‌যাপন করতে পারি।

উষার ভাল বিয়ে হবেই, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি পাত্রের খবর পেলেই আপনাকে জানাব। আপনি ও কাকীমা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণতা

কুসুমিকা

চিঠিটা পড়ে হরমোহিনী বললেন, "মেয়েটার সব ভালো, কিন্তু বড় জ্যাঠা হ'য়ে গেছে। কে জানে ভবিষ্যতে সুখী হবে কি না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ এবার আর চুপ করে রইলেন না। বললেন, "তোমরা তো কোনোকালে জ্যাঠা ছিলে না, কিন্তু তোমরাই কি সুখী হয়েছ জীবনে? তোমাদের কথা শুনে মনে হয় তোমাদের মতো অসুখী ভূ-ভারতে আর কেউ নেই।"

"দেখ, আর কথা বাড়িও না। আমাদের অসুখ যে কোথায় এবং তার কারণ যে কি তা সবাই জানে। তুমিও জানো। সারাজীবন কেবল না জানার ভান করছ—"

ব্রজেন্দ্রনাথ আবার অনুভব করলেন তর্ক করা বৃথা। তর্কের খোরাক তিনি নিজেই জুগিয়েছেন ভেবে অনুতপ্ত হ'য়ে স-ক্ষোভে থেমে গেলেন।

যোদ্ধা হিসাবে হরমোহিনী ব্রজেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী উঁচুদরের। লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না কখনও। যদিও তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে থাবা মেরে নিজের বক্তব্য বারবার জাহির করেন, কিন্তু এটা তিনি নিঃসংশয়ে মনে মনে জানেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে উষার বিয়ে হবে না।

তাই তিনি উক্ত বাদানুবাদের কাদা গায়ে না মেখে বেশ সহজ-কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন—"দ্বিজেনবাবুর কাছে যাবে নাকি? আমার ভাইপোর কথা কুসি লিখেছে সে তো আজকাল ওখানে নেই, ডালটনগঞ্জে বদলি হ'য়ে গেছে—"

প্রস্তাবটা শুনে বিব্রত হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। তিনি যেখানে আছেন সেখান থেকে পূর্ণিয়া যাওয়ার চেয়ে দিল্লী যাওয়া সহজ। একা নদী বিশ ক্রোশ, কথাতেই আছে। কিন্তু যে সব ঘাট পেরিয়ে তাঁকে পূর্ণিয়া যেতে হবে সে সব ঘাটের কথা মনে হ'লে ক্রোশের হিসাবে কুলোয় না। দোনোমোনো হ'য়ে তাই বললেন, "দেখি—"

"না, আর দেখিটেখি নয়"—সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন হরমোহিনী—"এই গেঁতোমি করে করেই এতদিন দেরি করে ফেলেছো। মেয়ের বিয়ের কথা কি আজ থেকে বলছি আমি। যখন ও ম্যাট্রিক পাস করলে তখন থেকেই সমানে বলে আসছি। বিয়ে যখন দিতেই হবে, ও ছাড়া যখন গতি নেই, তখন দেরি করে লাভ কি!"

নিরুপায় ব্রজেন্দ্রনাথ তখন বললেন, "তাহলে কালই বেরিয়ে পড়ি দুগ্‌গা বলে—"

"কাল শনিবার, কাল কি যাওয়া হয়? শুভকাজে শুভদিনে বেরুতে হবে। দাঁড়াও পাঁজিটা দেখাই—"

"কিন্তু শিউরাম তো ছুটি নিয়েছে, কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। আমার সঙ্গে যাবে কে—"

"আমি যাব। বিশুও চলুক। ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, খুব চটপটে ছোঁড়াটা—"

হরমোহিনী প্রায়ই ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে সফরে বের হন। সুতরাং এ প্রস্তাবে ব্রজেন্দ্রনাথ খুব বেশী বিস্মিত হলেন না।

ষোলো

শুভদিন দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ সপরিবারে যেদিন পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন সেইদিন বিহারের প্রসিদ্ধ 'পছিয়া' হাওয়াও উঠল। সে-ও বোধহয় শুভদিন দেখেই যাত্রা করেছিল। পছিয়া হাওয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে, খুব হুহু করে বয়। স্বভাবটা শুষ্ক রুক্ষ তপ্ত, একবার অঙ্গ স্পর্শ করলে মনে হয় জলন্ত উনুনের কাছে কেউ ঠেলে দিলে বুঝি।

পছিয়া হাওয়ার আর একটি বিশেষত্ব, কখনও একা আসেন না। সঙ্গে থাকে প্রচুর ধুলো আর বালি। ধূলোবালি দিয়ে আকাশকে আচ্ছন্ন করে দেবার ক্ষমতাও রাখেন ইনি। এঁকে সঙ্গী করেই বেরিয়ে পড়লেন ব্রজেন্দ্রনাথ ও হরমোহিনী। সঙ্গে ছোঁড়া চাকর বিশু।

—ট্রেনে অসম্ভব ভিড়। ফার্স্ট ক্লাসেও বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। আমরা এখন স্বাধীনতা পেয়েছি, সুতরাং অধিকাংশ লোকই টিকিট কেনে না। গাড়িতে চেকারবাবুরা থাকেন, কিন্তু চেক করেন না। স্বাধীনতা-প্রবুদ্ধ জনতার কাছ থেকে যতটা পারেন পয়সা আদায় করে নিজেদের পকেটে পোরেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁদের নৈতিক শিক্ষাও উঁচুদরের নয়, তাঁরা যে বেতন পান তা দিয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারে তাঁরা সংসার চালাতেও পারেন না। সুতরাং এই 'উপরি'র উপরই তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে। একথা ওঁদের উপরওলারাও জানেন বোধহয়। কারণ উপরে নালিশ করে সুফল পাওয়া যায় না, বরং যাঁরা নালিশ করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন নিগৃহীতও হয়েছেন, এ খবর ব্রজেন্দ্রনাথ জানেন।

আমাদের স্বাধীন গভর্নমেন্ট পুরাতন জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে নূতন জমিদারির পত্তন করেছেন। সেকালে জমিদারদের নায়েবরা মাইনে পেতেন কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা, কিন্তু থাকতেন রাজার হালে। আধুনিক জমিদারের নায়েবদেরও অনেকটা সেই অবস্থা। তাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিন্তু বেতন পান কম। তাঁদের লোভের, কামের, তাঁদের বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার খোরাক যোগায় এই উপরি পাওনা।

গভর্নমেন্টের দপ্তরে চিঠি লিখলে আজকাল উত্তর পাওয়া যায় না, উত্তর পেতে হলে কেরানীদের ঘুষ দিতে হয়। নিদারুণ ভিড়ে কষ্ট ভোগ করতে করতে এই সবই মনে হচ্ছিল ব্রজেন্দ্রনাথের।

সামনের সীটে একটি ছোক্‌রা প্যাণ্ট আর বুশশার্ট পরে সিগারেট টানছিল। বয়োবৃদ্ধ ব্রজেন্দ্রনাথকে দেখে একটুও সমীহ করছিল না সে। ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু এই ছোক্‌রার দুর্বিনীত আচরণ দেখে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল এরাই কি দেশের ভবিষ্যৎ? তাঁর কষ্ট বাড়ল যখন ছেলেটি পাশের লোকটির সঙ্গে কথা কইতে লাগল। ছোক্‌রা বাঙালী! হঠাৎ একটি বৃদ্ধ বিহারী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে হরমোহিনীকে লক্ষ্য করে সম্ভ্রমপূর্ণ-কণ্ঠে বললেন, "মাইজি, আপ বৈঠ যাইয়ে—"

হরমোহিনীও বিনয়ে হার মানবার লোক নন।

"নেই নেই আপ বৈঠিয়ে। হম্‌ ঠিক হ্যায়—"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু হরমোহিনীকে হার মানতে হ'ল। বৃদ্ধ বিহারী ভদ্রলোকের সীটেই বসতে হ'ল তাঁকে।

"আপনি এখানে বসুন—"

একটি কমনীয় কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল গাড়ির অপর প্রান্ত থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন

একটি রোগা মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ওধারের কোণের সীট থেকে। হাওয়ায় তার রুক্ষ চুল উড়ে উড়ে পড়ছে কপালের উপর, হাত দিয়ে সেটা ঠিক করে নিচ্ছে সে বারবার। চোখে হাই-পাওয়ার চশমা। শীর্ণ মুখ, রং কালো। কিন্তু মুখের হাসিটি কি সুন্দর! অনেকটা যেন উষার হাসির মতো।

"আপনি আসুন এখানে। আমি ওই দিকে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি—"

ব্রজেন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। তিনি আর মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করলেন না। তাঁর মনে হ'ল উষাই তাঁকে ডাকছে। কিন্তু চাকরটা জিনিসপত্র নিয়ে একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে উঠেছিল, তাঁর চিন্তা হ'ল সে ঠিকমতো উঠতে পেরেছে কিনা। এ-ও তাঁর মনে হ'ল এই ব্যাপার নিয়ে হরমোহিনী হয়তো চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাঁর দিকে চেয়ে কিন্তু অবাক হ'য়ে গেলেন তিনি। মুখে চিন্তার লেশ নেই। হাসিমুখে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছেন সেই বিহারী ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোকও একেবারে গদ্‌গদ্‌, মাতাজি মাতাজি ব'লে খুব গল্প করছেন কপাটে ঠেস দিয়ে।...হুহু করে ধুলোর ঝড় বইছে। ওদিকের সব জানালাগুলো খোলা। ব্রজেন্দ্রনাথ একজনকে বললেন জানালাগুলো বন্ধ করে দিতে। একজন বিহারী হেসে বালিয়া জেলার ভাষাতে যা বললেন, তার মর্মার্থ—বন্ধ করতে বলছেন কেন বাবু। এ হাওয়া খুব ভালো হাওয়া, শরীরকে তুরুস্ত্ করে দেয়। অসুখবিসুখ হয় না এ হাওয়া গায়ে লাগলে। সেই দিনই সকালে ব্রজেন্দ্রনাথ কাগজে পড়েছিলেন এই হাওয়ার কৃপায় দশজন ভবযন্ত্রণা থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তিনি আর তর্ক করলেন না। নীরবে হাসিমুখে বসে রইলেন।

সাহেবগঞ্জে নেমে আর এক সমস্যা। ওয়েটিং রুমের পশ্চিম দিকের জানালাটাই ভাঙা। অবাধে ধুলোর ঝড় ঢুকছে তার ভিতর দিয়ে। চেয়ার টেবিল সব ধুলোয় ভরতি। "এ ঘরে তো বসা যাবে না"—ব্রজেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন। "প্ল্যাটফর্মে তো দাঁড়ানও অসম্ভব"—শান্তকণ্ঠে বললেন হরমোহিনী। হরমোহিনীর শান্তভাব দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। বাড়িতে যিনি পদে পদে অসহিষ্ণু বাইরে তিনি হঠাৎ এমন শান্ত হ'য়ে গেলেন কি করে। ব্রজেন্দ্রনাথ জানতেন না যে সুযোগ পেলে হরমোহিনী বড় সেনাপতি হ'তে পারতেন, যে সেনাপতির একমাত্র লক্ষ্য যুদ্ধ জেতা। হরমোহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, যেমন করে হোক মেয়ের বিয়ে তাঁকে দিতেই হবে। শুধু দিতে হবে না, মনের মতো করে দিতে হবে। এর জন্যে সব রকম কষ্টের সম্মুখীন হ'তে তিনি প্রস্তুত আছেন।

পছিয়া হাওয়ায় ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

তিনি বিশুকে দিয়ে চেয়ার টেবিলগুলো ঝাড়াচ্ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "তুমি ওই দিকের কোণটায় বস না গিয়ে। ওখানে তো হাওয়া যাচ্ছে না—"

"আচ্ছা, আমি একবার দেখি গিয়ে—"

বেরিয়ে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তিনি। স্টেশন মাস্টারটি সেকেলে লোক। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ঝাঁকড়া-গোঁফও কাঁচা-পাকা, ভুরু বেশ ঘন, তাতেও পাক ধরেছে। চোখ দুটি বড় বড় এবং রক্তাভ। শরীরটি নধর। গাল চিবুক চর্বি-স্ফীত। ব্রজেন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনে তাঁর চোখ দুটিতে চাপা হাসি ফুটে উঠল।

বললেন, "ওয়েটিং রুমের জানালাটা আর আয়নাটা কালই রাত্রে চুরি গেছে—"

"চুরি গেছে! পাহারা থাকে না—"

"সব থাকে, তবু গেছে। আমাদের যা কর্তব্য তা করেছি, জি. আর. পি-কে খবর দিয়েছি। পেটমোটা খাকি হাফপ্যাণ্টপরা একজন দারোগা সাহেব পান চিবুতে চিবুতে এসেছিলেন, এসে তদন্ত করে রিপোর্ট লিখে নিয়ে গেছেন। ব্যস, ব্যাপার ওইখানেই খতম হয়ে গেছে। আর কিছু হবে না। চোরাই মালও পাওয়া যাবে না, চোরও ধরা পড়বে না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। স্টেশন মাস্টার তাঁর চোখের দিকে চেয়ে গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ফুটিয়ে বললেন, "স্বাধীনতা পেয়েছেন, আবার কি চান! কোন্ ক্লাসের টিকিট আপনার—"

"ফার্স্ট ক্লাসের—"

"ফার্স্ট ক্লাসের আজকাল কি অবস্থা তা তো দেখেই এলেন। থার্ড ক্লাস ওর চেয়ে ভালো। আমাদের কর্তারা তো আজকাল সব প্লেনে যাতায়াত করেন তাই ফার্স্ট ক্লাসের গদিই ছিঁড়ুক আর আয়নাই ভাঙুক, সেদিকে তাঁদের নজর দেবার দরকার হয় না। তাঁরা এখন নজর দিয়েছেন জনসাধারণ অর্থাৎ মুটে, মেথর, কিষাণ, মজদুরদের যাতে উন্নতি হয়। তাই থার্ড ক্লাসে বনবন পাখা ঘুরছে। ওসব দাদন, বুঝলেন, ভবিষ্যৎ ভোটের জন্য দাদন—"

হঠাৎ তাঁর চোখ দুটোতে দপ্ করে আগুন জলে উঠল।

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন—"

ব্রজেন্দ্রনাথ সামনের চেয়ারটায় উপবেশন করলেন। বললেন, "গরীব লোকরা এতকাল দুঃখভোগ করে এসেছে, স্বাধীনতা পাওয়ার পর তারা একটু সুখভোগ করুক তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের উপর এ অত্যাচার কেন—"

"আপনারা যে ভদ্রলোক। ওদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আপনাদের ওরা ক্রাশ্ করে ফেলতে চায়। আপনাদের গাড়ি খারাপ হবে, আপনারা ভালো খাবার পাবেন না, ভালো ওষুধ পাবেন না, আপনাদের ছেলেরা ভালো শিক্ষা পাবে না, চাকরি পাবে না। আর ওই কিষাণ মজদুরদেরও কি উন্নতি হচ্ছে ভেবেছেন? ওরা কি শিক্ষা পাচ্ছে? ওদের মাইনে বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়ির দোকান বেড়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হ'ল আমাদের নেতাদের বিরাট বিরাট পরিকল্পনার মর্ম বোধহয়

বুঝতে পারেন নি ভদ্রলোক। বললেন, "সে যাই হোক, আমি এখন কি করি বলুন। আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। এই পছিয়া হাওয়াতে ওই খোলা জানালার সামনে তো বসে থাকা যাবে না। রেস্ট রুম আছে?"

"সব ভরতি!"

তারপর হঠাৎ গোঁফে আঙুল চালিয়ে বললেন, "তবে একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে, যদি কিছু পয়সা খরচ করেন।"

"কি বলুন—"

"স্টেশন ইয়ার্ডে খানকয়েক করোগেটেড্ শীট পড়ে আছে। মালগুদামের ছাতের জন্যে এসেছিল, সব খরচ হয়নি। ইয়ার্ডে পড়ে আছে খানকয়েক। আপনি কুলি দিয়ে সেগুলো তুলে আনিয়ে ওই খোলা জানালার সামনে দাঁড় করিয়ে দিন, বাইরে থেকে ভিতরে তাহলে আর হাওয়া ঢুকবে না। আর অত হাঙ্গামা যদি না করতে চান, আমার ওই ইজিচেয়ারটা দখল করতে পারেন!"

"আমি তো একা নই। সঙ্গে স্ত্রীও আছেন—"

"ও, তাহলে ওই যা বললুম তাই করুন।"

একটু ইতস্তত: করে ব্রজেন্দ্রনাথ আর একটি প্রশ্ন করলেন।

"আচ্ছা এখানে ভালো চা পাওয়া যাবে কি?"

"ভালো চা বলতে যা বোঝায় তা পাওয়া যাবে না। আমাদের ওই রেস্টুরেণ্টে আলকাতরার মতো কালচে রংয়ের খানিকটা গরম জল পাবেন অপরিষ্কার পেয়ালায়। তা খেয়ে যদি আপনার রাগ হয় ওইখানেই একটা 'কম্‌প্লেনট্ বুক' আছে তাতে লিখে দেবেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না।"

স্টেশন মাস্টার চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে। তারপর 'ফিক্' করে হেসে ফেললেন। বললেন, "বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—ওরে ফাগুয়া—"

একটি ইউনিফর্ম পরিহিত কুলির আবির্ভাব হ'ল দ্বারপ্রান্তে।

"রেস্টুরেণ্টের ম্যানেজারবাবুকে বল গিয়ে আমার জন্যে ভাল 'এক পট' চা আলাদা করে যেন করিয়ে দেন। এক্ষুনি চাই।"

ফাগুয়া চলে গেল।

"কোথায় আপনার করোগেটেড্ শীটগুলো আছে? আমি তাহলে ততক্ষণ সেগুলো নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি—"

স্টেশন মাস্টারমশাই নিজেই বেরিয়ে একটা কুলিকে ডেকে সব বলে দিলেন। তারপর ভিতরে এসে বললেন, "চারটে কুলি লাগবে। ওদের একটা টাকা দিয়ে দেবেন।"

করোগেটেড্ টিন দিয়েও বিশেষ সুবিধা হ'ল না। হাওয়ার বেগে তুবার পড়েই

গেল। তৃতীয়বার কয়েকটা ইটের সাহায্যে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব হলেও হাওয়া সম্পূর্ণভাবে রোধ করা গেল না। দু'পাশে ফাঁক থেকে গেল আর হাওয়া ঢুকতে লাগল তার ভিতর দিয়ে। হরমোহিনী চা খেলেন না। একাই 'একপট' চা খেয়ে ঘামতে লাগলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। ঘাম হওয়াতে খানিকটা আরাম পেলেন। তারপর হঠাৎ হরমোহিনীর দিকে চেয়ে একটা শিক্ষালাভ করলেন সহসা। হরমোহিনী ওয়েটিং রুমের এককোণে ছোট একটা বিছানা পেতে পাশ ফিরে শুয়ে ছিলেন মুখ ঢেকে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন সমস্ত প্রতিকূলতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ওই আত্মসমর্পণটাই যেন বর্মের কাজ করছে তাঁর। ব্রজেন্দ্রনাথও তাই করলেন। হাওয়া, ধুলো, গরম সমস্ত অগ্রাহ্য করে বসে রইলেন মরিয়ার মতো। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—কেন এত কষ্ট সহ্য করছি? কি দরকার ছিল? মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে কি এতটা কৃচ্ছ্রসাধন না করলে চলত না? তাঁর বিবেক উত্তর দিল, না চলত না। আধুনিক যুগের সঙ্গে পা ফেলে যখন তুমি চলতে পারবে না তখন তোমাকে প্রাচীন প্রথাতেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, আর সে প্রথা মানতে হ'লে এসব কষ্ট অনিবার্য। তুমি পিতা, পিতার কর্তব্য তোমাকে পালন করতে হবে। তাঁর পিতৃবন্ধু মুখুজ্যে মশাইয়ের একটা উপদেশ মনে পড়ল। কোন কাজে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে অলস হ'য়ে বসে থাকলে চলবে না। সিদ্ধিলাভ করবার যত রকম উপায় তোমার মাথায় আসবে সবগুলোকে অনুসরণ করে দেখতে হবে। উদ্যম চাই, পুরুষকার চাই, তা না হ'লে কিছু হবে না।

হঠাৎ হরমোহিনী মুখের কাপড়টা সরিয়ে প্রশ্ন করলেন, "পূর্ণিয়ার দ্বিজেনবাবুকে কবে চিঠি দিয়েছিলে?"

"দিন সাতেক আগে। বেরুবার আগে একটা টেলিগ্রামও করেছি—"

"ওঁদের সঙ্গে আমাদের জানাশোনা নেই। ওঁদের বাড়িতে গিয়ে ওঠাটা কি ঠিক হবে? ওখানে যদি হোটেল টোটেল থাকে সেইখানেই গিয়ে উঠব, বুঝলে—"

"ওসব শহরে হোটেল না থাকারই কথা। ডাকবাংলোয় উঠব। সেখানেও একটা চিঠি লিখে দিয়েছি—"

সাহেবগঞ্জ থেকে সকরিগলি ঘাটে এলেন তাঁরা সন্ধ্যা প্রায় সাতটায়। তারপর স্টীমার। অসম্ভব ভিড় সেখানেও। ধাক্কাধাক্কি করে কোনমতে জায়গা পেলেন ফার্স্ট ক্লাসে। মনিহারিঘাটে পৌঁছলেন যখন, তখন রাত প্রায় দশটা। সেখানেও উঁচু পাড় ভেঙে জনতার ধাক্কা খেতে খেতে গিয়ে কোনক্রমে ট্রেনে উঠলেন। এ ট্রেনেও ভয়ানক ভিড়। হরমোহিনীকে কোনরকমে বসিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন। এর পর কাটিহারেও নাকি আবার গাড়ি বদলাতে হবে! হরমোহিনী সমস্ত দিন কিছু খাননি। গাড়ির জানালা দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন সামনেই একটা খাবারের দোকান।

"তোমার জন্যে কিছু খাবার কিনব ? ভালো পানতোয়া রয়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথ জানেন পানতোয়া মিষ্টান্নটি হরমোহিনীর খুব প্রিয়।

"কিছু কিনে নাও পৌঁছে কাপড়চোপড় ছেড়ে খাব'খন।"

"এখনি খাও না। সমস্ত দিন তো উপোস করে আছ।"

"উপোস করলে আমি ভালোই থাকি।"

ব্রজেন্দ্রনাথের তখন মনে পড়ল হরমোহিনী ব্রত-এক্‌স্‌পার্ট। বহুরকম ষষ্ঠী, জয়মঙ্গলবার, শিবরাত্রি, অষ্টমী, নবমী—কিচ্ছু বাদ দেন না।

সতেরো

পূর্ণিয়া স্টেশনে নেমে ব্রজেন্দ্রনাথ আর হরমোহিনী অবাক হ'য়ে গেলেন। দ্বিজেনবাবুর দুই ছেলে তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসেছে মোটর নিয়ে! এটা তাঁরা প্রত্যাশা করেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথের এ-ও মনে হ'ল যদি তিনি খোলাখুলি দ্বিজেনবাবুকে পাত্রের কথা লিখতেন তাহলে তাঁর ছেলেরাই তো উত্তর দিয়ে দিতে পারত! কিন্তু সে কথা তিনি লেখেন নি। লিখেছেন—'কোন কার্যবশতঃ আমাকে পূর্ণিয়া যেতে হবে, সেই সময় আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ আগ্রহ এই জন্যে যে আপনি দেবেনের বন্ধু। আমার সঙ্গেও দেবেনের বন্ধুত্ব অনেককালের, সে আমার সাধারণ বন্ধু নয়, শ্রদ্ধেয় বন্ধু।' এই ভণ্ডামিটুকু না করলে ব্রজেন্দ্রনাথকে এই পথ-কষ্ট ভোগ করতে হ'ত না। ভণ্ডামি করবার কারণ অবশ্যই ছিল। প্রত্যেকের কাছে মেয়ের বিয়ের জন্য মিনতিপূর্ণ চিঠি লিখতে অনেকদিন থেকেই তাঁর আত্মসম্মানে বাধছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ভিখারীর পর্যায়ে নেমে যাচ্ছেন। তাছাড়া কুসুমিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে মনে তিনি যেন অপরাধী হ'য়ে পড়েছিলেন। হরমোহিনীর সামনে যদিও কথাটা তিনি প্রকাশ করতে পারেন নি, কিন্তু নিজের অন্তরের মধ্যে তিনি অনুভব করেছিলেন যে কুসুমিকাই ঠিক পথ ধরে চলেছে, ওই আত্মসম্মানের পথ। কুসুমিকার সঙ্গে দ্বিজেনবাবুর ঘনিষ্ঠতা আছে, তাই তাঁকে মেয়ের বিয়ের কথাটা চিঠিতে জানাতে সংকোচ হয়েছিল তাঁর।

দ্বিজেনবাবুর দুই ছেলে সমর এবং অমরকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন তিনি। যেমন চেহারা, তেমন কথাবার্তা, তেমনি সভ্য আচরণ। যদিও কথাটা শুনতে হাস্যকর তবু তারা তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে দেখে শুধু পুলকিত নয়, বিস্মিত হ'য়ে গেলেন তাঁরা। আজকালকার অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না, অনেকে প্রণামই করে না, দেখা হ'লে মুচকি হাসে একটু। একজন তাঁকে বলেছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নাকি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে বারণ করেছেন। তিনি কোথায়, কি সূত্রে কবে বারণ করেছেন তা তাঁর জানা নেই, কিন্তু একথাটা তাঁর অজানা

নয় যে প্রধানমন্ত্রীর অনেক উপদেশই ছেলে-মেয়েরা পালন করে না। হঠাৎ এই উপদেশই পালন করবার দিকে তাদের এমন প্রবণতা কেন! এর যে অনিবার্য উত্তর তাঁর মনে জেগেছিল তা আনন্দজনক নয়। সমর এবং অমরকে দেখে তাই খুব ভালো লাগল তাঁর।

দ্বিজেনবাবু পক্ষাঘাতগ্রস্ত বটে, কিন্তু মোটেই জীবন্মৃত নন। বেশ জীবন্ত। পা দুটোই অবশ হয়েছে, শরীরের উপরার্ধ ঠিক আছে। তাঁর ছাত-কাঁপানো হাসি শুনে ব্রজেন্দ্রনাথের তাক লেগে গেল। বেশ বলিষ্ঠ লোক। ঘন ভুরু, পুরুষোচিত গোঁফ, দৃঢ় চিবুক, ব্যঞ্জনাময় চোখের দৃষ্টি, প্রশস্ত বুক, উন্নত ললাট দেখলে শ্রদ্ধা হয়। অল্পদিন হ'ল রিটায়ার করেছেন। বয়স ষাটের কোঠায় এখনও পৌঁছায় নি। তাঁকে দেখলে মনে হয় বয়স পঞ্চাশের বেশী নয়। কথায় কথায় চোখ মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। আর রসিকতার মাত্রা সামান্য বেশী হ'লে হা হা করে ফেটে পড়েন হাসিতে।

ব্রজেনবাবুকে বললেন, "আপনার পায়ের ধুলো আমার বাড়িতে পড়ল আমি কৃতার্থ হলাম। আর বৌদিও যে এসেছেন এতে কি খুশী যে হয়েছি তা বলবার নয়। দেবেনের কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। দেবেনের ধারণা আপনি যদি প্রফেসারি লাইনে থাকতেন দেশের ঢের বেশী উপকার হ'ত। আপনার ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান দেখে সে মুগ্ধ।"

ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন, "দেবেন বাড়িয়ে বলেছে। দুজনে বন্ধুত্ব ছিল তো খুব!"

"প্রফেসারি লাইন আপনি ছেড়ে দিলেন কেন—"

"প্রফেসার থেকে আমি প্রিন্সিপালও হয়েছিলাম, আর সেইটেই হ'ল আমার কাল। কলেজে একজন নতুন প্রফেসার নেওয়া হ'ল। আমি একটি ফার্স্ট ক্লাস ছেলেকে রেকমেণ্ড করেছিলাম। কিন্তু তাকে নেওয়া হ'ল না। নেওয়া হ'ল একটি থার্ড ক্লাস ক্যাণ্ডিডেট্‌কে, সে একজন হোমরা-চোমরা মেম্বারের জামাই বলে। এর পর আর চাকরি করতে পারলাম না। ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম। আর একটা কলেজে প্রফেসারির চাকরি পেয়েছিলাম কিন্তু আমার এক মাড়োয়ারি ছাত্র সুন্দরমল আমাকে আর চাকরি নিতে দিলে না। এক হিসেবে ভালই হয়েছে। আর্থিক কষ্ট আর নেই, যখন প্রফেসার ছিলাম বাঁয়ে আনতে ডাইনে কুলোতো না। এখন দু'দিকেই কুলুচ্ছে। গিন্নী খুশী আছেন।"

ঘর কাঁপিয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন দ্বিজেনবাবু। তারপর বললেন, "দেশের ছেলে-মেয়েরা কিন্তু আপনার মতো একজন প্রফেসার তো হারালো।"

ব্রজেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "আপনি ওকথা বলছেন বটে, কিন্তু আমাদের দেশ সত্যিই কি গুণীকে চায়? আমার মনে হয় চায় না। গুণীরা দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও সুখে থাকত যদি সত্যিকার শ্রদ্ধা পেত। তাদের শ্রদ্ধাও করে না কেউ। আমার ক্লাসে সত্যিকার ভালো ছেলে ছিল মাত্র গুটিকয়েক। বাকী

সব জানোয়ার। ক্লাসে বসে সিটি মারত, শেয়াল কুকুরের ডাক ডাকত। কথায় কথায় স্ট্রাইক আর হুজুক। সুপারিশ করে নম্বর বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা, না বাড়িয়ে দিলে রাস্তায় ঘাটে অপমান, অনেক সময় প্রহারও। একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় বা সিনেমা অভিনেতা তাদের কাছে যে খাতির পায় কোনও প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক তা পায় না। তাদের কাছে ভালো প্রফেসারের চেয়ে মন্দ প্রফেসারের দর বেশী। যে প্রফেসার তাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করে, তাদের হৈ-হুল্লোড়ে মাতে, তাদের আবদার শোনে, নম্বর বাড়িয়ে দেয়, পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়, তারাই তাদের চোখে ভালো প্রফেসার। ছেলে-মেয়েদের বাপ-মায়েরাও চান না যে ছেলে মানুষ হোক, তাঁরা চান ছেলে পাশ করুক। তাঁদের কাছেও ভালো প্রফেসারের কদর নেই। তাই ভালো ছেলেরা আজকাল প্রফেসারি লাইনে যেতে চায় না। তারা ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার হচ্ছে, শাসন-বিভাগে বড় অফিসার হবার চেষ্টা করছে। ওই সব লাইনে গেলেই আজকাল কদর হয়, পয়সাও হয়।"

দ্বিজেনবাবু হেসে বললেন, "আপনি যা বললেন তা ঠিকই। দেশের অবস্থা সব দিক দিয়েই শোচনীয়, কিন্তু বিশেষ করে এই জন্যেই দেশের শিক্ষা-বিভাগে ভালো লোক থাকা দরকার!"

"কিন্তু আমাদের স্বাধীন গভর্নমেণ্টের যে রকম কাণ্ডকারখানা তাতে কোনও আত্মসম্মানী লোক শিক্ষা-বিভাগে থাকতে পারবে না—"

"সেই জন্যেই দেবেন গভর্নমেণ্ট সংস্পর্শবর্জিত স্কুল খুলছে একটা। আপনি শুনেছেন বোধহয়—"

"শুনেছি। কুসুম আমার কাছে এসেছিল। সে আমার মেয়ে উষাকে নিয়ে যেতে চাইছিল তাদের স্কুলে। কিন্তু আমার গিন্নী তাতে আপত্তি করলেন, আমারও মনে হ'ল ও পারবে না। ওর বিয়েই দিতে হবে। হ্যাঁ ভালো কথা, কুসুম বলছিল আপনার জানা একটি ভালো পাত্র আছে নাকি? চাটুজ্যে তাদের উপাধি?"

দ্বিজেনবাবু দু'এক মিনিট ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন। তারপর বললেন, "ও হ্যাঁ, আছে। গয়ার গিরিন চাটুজ্যের ছেলে। ছেলেটি খুব ব্রিলিয়াণ্ট নয়, একবার আই. এস-সি ফেল করেছিল। এম. বি. বি. এস.ও বোধহয় একবারে পাশ করতে পারেনি। তারপর গিয়েছিল বিলেত। সেখানেও বার দুই ঘোলটান খেয়ে শেষে এফ. আর. সি. এস. টা পাশ করেছে। ভালো চাকরিও পেয়েছে একটা। তবে ওর কাঁধে লায়াবিলিটিও অনেক। দুটি অবিবাহিতা ভগ্নী আছে। দুটি ভাই এখনও স্কুলে পড়ছে। নিজেদের বাড়ি আছে অবশ্য। গিরিনবাবুরও টাকা আছে। আপনি যান না, দেখে আসুন। চিঠিপত্র লিখে সুবিধা হবে না। মেয়েকে যেখানে দিতে হবে সেখানে নিজে গিয়ে সব দেখে শুনে আসাই ভালো। গিরিন চাটুজ্যে লোক খারাপ নয়। আপনি বলেন তো আমি চিঠি লিখে দিতে পারি একটা!"

"ভদ্রলোক করেন কি ?"

"বিড়ির ব্যবসা করেন। ওখানে পরিচিত মহলে উনি বিড়িবাবু বলেই পরিচিত। বিড়ির ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে মশাই। একটু কন্‌জুসও আছে। মোটর টোটর নেই, বাইরের কোন বহ্বাড়ম্বরও নেই। আডময়লা ফতুয়া গায়ে, পায়ে কেড্‌স-এর জুতো পরে ছাতি ঘাড়ে নিয়ে পায়ে হেঁটেই বিশ্বজয় করে বেড়াচ্ছে! আলাপ করে আসুন।"

"বেশ তাই যাব—"

"কি নাগাদ যাবেন, আজই তাহলে চিঠি লিখে দি একটা—"

"এখান থেকে ফিরেই যাব। এই ধরুন, আগামী রবিবার—"

"বেশ। সেই রকমই লিখে দিচ্ছি তাহলে—"

হরমোহিনী অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। শুধু অবাক নয়, হতভম্ব। এতদিন ধরে যে দুটো ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হ'য়ে ছিল সে দুটোই যে বানচাল হ'য়ে গেল। এরা চক্রবর্তী, কিন্তু কি ভদ্র এদের ব্যবহার, কি আভিজাত্যপূর্ণ আচরণ। এরা বাঙাল, কিন্তু বউদের খাটায় না তো! বউরা কুটোটি পর্যন্ত নাড়ে না। চাকর, রাঁধুনী, দাই, বেয়ারাতে বাড়ি ভরতি! অবাক কাণ্ড।

আঠারো

গিরিন চাটুজ্যেও স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রজেনবাবু তাঁর বাড়িতে উঠলেন না। একটা হোটেলেই উঠলেন গিয়ে। তারপর স্নানাহার সেরে বিকেলের দিকে গেলেন তাঁর বাড়িতে। একটা রিক্‌শা করেই গেলেন। দেখলেন রিক্‌শাওলারাও তাঁকে বিড়িবাবু বলে চেনে। কারণ যে লোকটি তাঁকে নিতে এসেছিল সে রিক্‌শাওলাকে কেবল বললে—'বিড়িবাবুকা মকান যানা হ্যায়।' অমনি সে চলতে লাগল। হরমোহিনীর গোড়া থেকেই 'বিড়িবাবু' নামটা পছন্দ হয়নি। যেতে যেতে বললেন, "এখানে এসেছি যখন, তখন চল একবার দেখে আসি, কিন্তু এখানে মেয়ের বিয়ে দেব না। 'বিড়িবাবু' যার নাম তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করা যায় না কি ?"

ব্রজেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, "ইংরেজীতে একটা কথা আছে—What is in a name অন্য সব দিকে যদি ভালো হয় নামে কিছু আসবে যাবে না।"

গলির গলি তস্য গলির মধ্যে একটি ত্রিতল বাড়ি। হঠাৎ মনে হয় যেন একটা খাঁচা কিংবা বাড়ির কঙ্কাল। বাড়িতে বহুকাল রং পড়েনি। বাড়ির সামনেই সারি সারি অনেকগুলো লোহার গরাদ-দেওয়া জানালা। আশেপাশে রঙের কোনও চিহ্ন নেই। বাড়ির দেওয়ালে শুকনো শ্যাওলার কালো দাগ। বিড়িবাবু বাড়ির সামনেই

দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুধু গা, পরনের কাপড়টা মনে হ'ল ন'হাতি। পায়ে জুতো নেই, খড়ম।

রিক্‌শা থামতেই সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করলেন।

"আসুন আসুন আসুন। আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

ব্রজেন্দ্রবাবু চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল যেন একটা পাতিহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠল। মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাতিহাঁসের কণ্ঠস্বরের যে এতটা সাদৃশ্য থাকতে পারে তা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল।

"আসুন আসুন ভিতরে আসুন। বল্‌ভদ্দরজী পাংখা খোল দিজিয়ে—"

তারপর হরমোহিনীর দিকে ফিরে বললেন—"মালক্ষ্মী, আপনি ভিতরে যান। ওগো এঁকে ভিতরে নিয়ে যাও।"

আধঘোমটা-দেওয়া একটি স্থূলাঙ্গিনী মহিলা ভিতর থেকে বাইরে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে হরমোহিনী অন্তঃপুরে চলে গেলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বাইরের ঘরে গিয়ে বসলেন। বাইরের ঘরে একটি কাঠের টেবিল এবং তার দু'পাশে দুখানি কাঠের হাতল-হীন চেয়ার। দেওয়ালে একটি মাত্র ফোটো। সেটি বিড়িবাবুর। নামাবলী গায়ে, হাতে মালা, চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত। টেবিলের উপর একটি মাত্র লাল মলাটের প্যামফ্লেটগোছের বই রয়েছে, তার উপরে প্রথমেই বড় দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা রয়েছে 'বিড়ি বার্তা,' তার একটু নীচে ব্র্যাকেটের মধ্যে ইংরেজি ছোট অক্ষরে (Biri News)। ঘরে আর কোন আসবাব নেই।

বিড়িবাবু বললেন, "এইখানেই বসুন। আমার বন্ধু নবীনবাবু এখনই আসবেন। তাঁকেও আসতে বলেছি। বল্‌ভদ্দরজী—"

বল্‌ভদ্দরজী (বলভদ্রজী) বিড়িবাবুর চাকর।

"কহিয়ে—"

"আপ নবীনবাবুকো খবর দিজিয়ে যে ব্রজেন্দ্রবাবু আ গয়ে হেঁ।"

"তুরন্ত যাতা হুঁ। চায় কা পানি চঢ়া দিয়া উতারকে যায়েঙ্গে না ?"

"ঠিক হ্যয়। উতারকে পাত্‌তি ভিজাকে, তব যাইয়ে—"

ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হ'ল বল্‌ভদ্দরজী বোধহয় বিড়িবাবুর একমাত্র চাকর। বিড়িবাবু তার সঙ্গে এরকম সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা কইছেন দেখে একটু বিস্মিত হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। যাই হোক বল্‌ভদ্দরজীকে আর যেতে হ'ল না, নবীনবাবু নিজেই এসে পড়লেন। সরু লিকলিকে চেহারা। মুখে ছুঁচলো পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর পাকা চুলে তেড়ি দেখে মনে হয় ভদ্রলোক এককালে শৌখিন ছিলেন। আড়ময়লা প্যান্টের উপর বুশশার্ট পরে এসেছিলেন। বাঁ হাতটা উত্তোলন করে হাসিমুখে সম্বর্ধনা করলেন ব্রজেন্দ্রনাথকে। তারপর হেসে বললেন, "দেখা হ'য়ে খুশী হ'লাম। আপনি শুনে সুখী হবেন, আমরা সবাই আপনার মিলেরই গেঞ্জি ব্যবহার করি।"

ব্রজেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। নবীনবাবুর বসবার চেয়ার ছিল না। বিড়িবাবু আবার তাঁর বল্‌ভদ্দরজীকে ফরমাশ করলেন—"বল্‌ভদ্দরজী, আউর এক কুরসী লে আইয়ে।"

টিনের একটি চেয়ার দিয়ে গেল সে।

ব্রজেন্দ্রনাথ হঠাৎ লক্ষ্য করলেন বিড়িবাবুর সঙ্গে নবীনবাবুর চোখের ইশারায় কি যেন একটা কথা হ'য়ে গেল।

"জগুকে ফোন করেছিলেন নবীনবাবু ?"

"করেছি। সে এক্ষুনি আসছে।"—এ কথা বলে নবীনবাবু ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললেন, "জগু হচ্ছে এঁর ছেলে, এখানকার হাসপাতালেই কাজ করছে এখন। হীরের টুকরো ছেলে—যদি ভগবানের ইচ্ছেয় আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়—তখন দেখবেন—"

ব্রজেন্দ্রনাথ বিড়িবাবুকে প্রশ্ন করলেন—"ইনি কে, পরিচয় করিয়ে দিলেন না তো—"

প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলেন বিড়িবাবু।

"আরে আরে মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে। ইনি নবীনবাবু, আমার বন্ধু, আমার দক্ষিণহস্ত। আমার ব্যবসায় দেখাশোনা করেন, তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস্‌ও করেন। খুব হাতযশ। জগু যখন ইস্কুলে পড়ত, তখন উনি ওর প্রাইভেট টিউটারও ছিলেন। জগুকে আমার চেয়ে উনিই ঢের বেশী চেনেন। ওই রোগা চেহারা কিন্তু ওস্তাদ লোক—"

ক্যাঁক ক্যাঁক করে হেসে উঠলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। এমন সময় ভিতর থেকে ডাক এল। বল্‌ভদ্দরজী এসে বললেন মাতাজি সকলকে উপরে যেতে বলছেন। উপরে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন—সেকেলে চকমিলানো বাড়ি। দোতলার চারদিকে ফালি বারান্দা, সেগুলিও লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা। গরাদের উপর আবার ক্যাম্বিসের পরদা টাঙাবারও ব্যবস্থা আছে। ব্রজেন্দ্রনাথের আবার খাঁচার উপমাটা মনে পড়ল।

ওঁরা উপরে গিয়ে শোবার ঘরেই বিছানার উপর বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে বল্‌ভদ্দরজী তিনটি ছোট ছোট টেবিল এনে রাখল ঘরের ভিতর। চা এবং জলখাবার এল তারপর। প্রচুর জলখাবার। সিঙ্গাড়া এবং কচুরির বেয়াড়া সাইজ। এ ছাড়া মিষ্টিও অনেক রকম। মামুলী বিনয়-বচনের আদান-প্রদান হ'ল যথারীতি। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "এতো খেতে পারব না।"

বিড়িবাবু হাত কচলে কচলে হাসতে হাসতে বললেন, "সামান্যই তো দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মতো লোককে খাওয়াবার সাধ্য কি আমার আছে !"

ব্রজেন্দ্রনাথ টেনিস বলের মতো কচুরিটি তুলে নিলেন এবং চা দিয়ে সেইটেই

খেলেন কেবল। কচুরিটি ভালো কিন্তু চা অত্যন্ত খারাপ। নবীনবাবু কিন্তু কিছু ফেললেন না। সব খাবারগুলি নীরবে খেলেন বসে বসে।

এর পরই জগু এসে পড়ল। কালো রং, রোগা, বেঁটে, মাথার সামনের দিকে চুল নেই। পরনে হাফশার্ট আর প্যাণ্ট। চোখে মুখে সপ্রতিভ সবজান্তা ভাব।

নবীনবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"ইনিই বিখ্যাত ব্রজেনবাবু, সুন্দর গেঞ্জি মিলের মালিক এবং সম্ভবতঃ তোমার উড-বি শ্বশুর—"

জগু একটু মুচকি হাসল শুধু। প্রণাম তো করলই না, নমস্কার পর্যন্ত করল না। তার মুখে একটা মুরুব্বিসুলভ ভাব ফুটে উঠল বরং—ভাবটা যেন, ও আমাকে দেখতে এসেছে, ও, তা তো আসবেই। তারপর সে নবীনবাবুকে বলতে লাগল—কোথায় কোথায় তার চাকরির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কথা শুনে মনে হ'ল সবাই যেন তাকে চাকরি দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। নবীনবাবু তার কথা শুনতে শুনতে ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চাইতে লাগলেন, তাঁর দৃষ্টির অর্থ, শুনছেন ? শুনুন ! জগু নবীনবাবুকে শেষে বললেন, "আপনার ফোন পেয়েই আমি এলাম। আমাকে এখুনি আবার চলে যেতে হবে। একটা স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া কেস এসে অপেক্ষা করছে। বোধহয় সেটাকে এখনই 'ওপ্‌ন্' করতে হবে। আমি চলি—"

এই বলে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে চলে গেল সে। বিড়িবাবু বললেন, "চলুন আমার বাড়িটা আপনাকে দেখাই।" ব্রজেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলেন বাড়িটা। সত্যিই বাড়িটি একটি খাঁচা বিশেষ। তেতলার বারান্দা থেকে উঠোনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যেন কুয়োর ভিতর উঁকি দিচ্ছেন। অনেকগুলি ঘর। কয়েকটি ঘরে বিড়ির পাতা, আর বিড়ির তামাক ঠাসা। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন, বাড়িতে একটি বই নেই। খবরের কাগজও না। একটি ঘরে দেখলেন একটি সুন্দরী মেয়ে একটি শিশু কোলে করে বসে আছে। ব্রজেন্দ্রনাথকে দেখে ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিড়িবাবু বললেন, "এটি আমার ভাইপো-বউ।" ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হ'ল যেন বন্দিনী হ'য়ে আছে! ফিরে আসবার মুখে বিড়িবাবু বললেন, "একটা কথা বোধহয় আপনি জানেন না। আপনার মেয়েকে আমরা দেখেছি—"

"কোথায়—"

"আপনি গতবার যখন দিল্লী এক্‌জিবিশনে গিয়েছিলেন, আপনার মেয়ে সঙ্গে ছিল তো ?"

"হ্যাঁ—"

"সেই এক্‌জিবিশনে আমি আর নবীনবাবু ছিলাম—। মেয়ে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। আমার ছেলেকেও তো দেখলেন, এখন বাকি কথাবার্তাগুলো হ'য়ে গেলেই ব্যস্—"

ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরে ফিরে এসে হেসে জিগ্যেস করলেন—"আপনার ডিমাণ্ড কি রকম—"

জিব কেটে বিড়িবাবু বললেন, "ছি, ছি, আপনার কাছে কি ডিমাণ্ড করতে পারি! আপনার যা খুশী দেবেন—"

নবীনবাবু একধারে একটু কাত হ'য়ে বসে একটা কাগজে কি কি যেন লিখছিলেন। লেখা শেষ করে বললেন, ডিমাণ্ড আমাদের নেই। কিন্তু মেয়ে জামাইকে আপনি তো কিছু দেবেন? আপনার খ্যাতি আর মর্যাদা অনুসারে আপনাকেও কিছু দিতে হবে তো! তাই আপনার হ'য়ে আমি এই লিস্টটা তৈরি করছিলুম। এর ওপর আপনি যা বাড়াতে চান বাড়াবেন বা কমাতে চান তো কমাবেন।"

বিড়িবাবু প্যাঁক প্যাঁক করে বলে উঠলেন—"না, না, লিস্ট দেবেন না নবীনবাবু—"

মুখে একথা বললেন বটে, কিন্তু চোখ মুখের ভাবে যা প্রকাশ পেল তা অন্যরকম। মুচকি মুচকি হাসছিলেন তিনি।

নবীনবাবু বললেন, "আহা, এটা ওঁরই সুবিধের জন্য দিচ্ছি। জাস্ট ফর এ গাইডেন্স।"

ব্রজেন্দ্রনাথ কাগজটা নিয়ে দেখলেন নবীনবাবু ত্রিশ হাজার টাকার ফর্দ করেছেন।

হরমোহিনী কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিলেন।

রিক্‌শায় নীরবেই বসে রইলেন দু'জনে পাশাপাশি। অবশেষে ব্রজেন্দ্রনাথই কথা বললেন, "এখানে বিয়ে দেব না!"

হরমোহিনী ছোট্ট উত্তর দিলেন—"রামোঃ।"

উনিশ

প্রায় মাসখানেক কেটে গেল। এর আগে যে ক'জনকে চিঠি লিখেছিলেন তাদের কেউই আর উত্তর দিলেন না। ক্রমশঃ আবার হতাশ হ'য়ে পড়তে লাগলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। হরমোহিনী কিন্তু হতাশ হবার লোক নন। তিনি এসে একদিন কড়া তাগাদা দিলেন।

"তুমি বেশ হাল ছেড়ে বসে আছ তো। এভাবে বসে থাকলে চলবে কি। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো।"

"আমি কি করব বল। চিঠি তো লিখেছি কয়েক জায়গায়। উত্তর না এলে কি করতে পারি।"

"ছেলেদের চিঠি লেখ আবার। ওরা বড় হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে, ওরাই ভার নিক।"

"ওদেরও তো লিখেছি। ওরা কয়েকটি পাত্রের সন্ধান তো দিয়েও ছিল, কিন্তু তোমারই তো পছন্দ হ'ল না।"

"পছন্দ হবার মতো হলেই পছন্দ হ'ত। যার তার হাতে তো মেয়ে দিতে পারি না। না, না, অমন বসে থাকলে চলবে না। ছেলেদের আজই চিঠি লেখ ফের।"

"লিখব।"

তিন ছেলেকেই আবার চিঠি লিখলেন তিনি।

অন্যান্য কথার পর লিখলেন, "উষার বিয়ের তো কোথাও ঠিক করতে পারলাম না এখনও। তোমরাও তো কিছু চেষ্টা করছ না। পাত্র নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। এ কাজ তোমাদেরই। তোমার মা ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। তাগাদার জ্বালায় জীবন দুর্বহ করে তুলছেন আমার। আজকাল অবশ্য মেয়েদের অনেক বয়েসে বিয়ে হচ্ছে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে তো ঘরে ঘরে। সে হিসেবে উষার এমন কিছু বয়স হয়নি। কিন্তু তোমার মায়ের আর তর সইছে না। আমাকে ক্রমাগত খোঁচাচ্ছেন। কিন্তু আমি কি করব বল, চেষ্টার ত্রুটি করছি না। কষ্ট করে পূর্ণিয়া আর গয়ায় গিয়েছিলাম তোমার মাকে নিয়ে। হ'ল না। সবই অদৃষ্ট—"

তিন ছেলেকে একই চিঠি লিখলেন।

ছেলেদের চিঠি লেখার দিন দুই পরে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু শিবেন দত্তের চিঠি পেলেন। অনেকদিন আগে তাঁকেও চিঠি লিখেছিলেন উষার জন্যে পাত্র সন্ধান করতে। শিবেন তাঁর সহপাঠী ছিলেন। প্রফেসারি করতেন। এখন রিটায়ার করে ফার্মিং করছেন। নানারকম খবর-টবর রাখেন। বেশ মার্জিতরুচি লোক। অনেকদিন আগে চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে। কিন্তু উত্তর পাননি। হঠাৎ তাঁর চিঠি এসে হাজির হ'ল।

ভাই ব্রজ,

নিশ্চয়ই চটে আগুন হ'য়ে আছ। তোমার চিঠির উত্তর অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভাই মনই চিঠির উত্তর দেয়, হাত বা কলম নয়। মনই ব্যাপৃত ছিল অন্যত্র। এতদিনে তার ছুটি হয়েছে। তুমি আমাকে তোমার কন্যাদায়ের সমস্যা সমাধান করতে বলেছ। প্রথমত আমার মনে হয় ওটা কোনও সমস্যাই নয়, আমরা নিজেরাই ওটাকে সমস্যা বানিয়েছি, নিজেদের স্বার্থের জন্য এবং নিজেদের অহংকার-তৃপ্তির বাসনায়। আমাদের ইচ্ছা আমরা মেয়েকে যতদূর সম্ভব কম খরচে যতদূর সম্ভব ভালো পাত্রে সমর্পণ করব, যদি তার জাত কুল কুষ্ঠী আমাদের মজ্জাগত কুসংস্কারের অনুকূল হয়। এই অস্বাভাবিক সমস্যার কোন স্বাভাবিক সমাধান নেই। ওটা অনেকটা জিগ্‌শ পাজ্‌লের মতো। যদি মিলে যায় তো ভালই, যদি না মেলে ধৈর্য হারালে চলবে না।

আমাদের দেশে আগে মেয়ে বিক্রি হ'ত। অন্যান্য রত্নের মতো কন্যা-রত্নেরও কেনা-বেচা চলত। তার বাজার-দরও ভালো ছিল। এখনও এদেশের অনেক সমাজে কন্যা

বেচা-কেনা চলছে। আমাদের সমাজে এর চেয়েও ঘৃণ্য ব্যবসা চলছে আজকাল। মেয়েকে সাময়িকভাবে বিক্রি করে অনেক পিতামাতা নিজেদের সংসার চালাচ্ছেন স্ত্রীকে বিক্রি করতে বা সাময়িকভাবে ভাড়া দিতে অনেক স্বামীরও দেখছি আপত্তি নেই।

আমরা, মানে তথাকথিত সদ্‌ব্রাহ্মণেরা, মেয়েদের বিক্রি করতে চাইনি, দান করতে চেয়েছিলাম কুলীনবংশোদ্ভব সৎপাত্রের হাতে। দানের সঙ্গে দক্ষিণা দিতে হয়। ক্রমশঃ ওই দক্ষিণার পরিমাণটা বাড়তে বাড়তে 'পণে' রূপান্তরিত হয়েছে, কন্যারাও আর রত্ন নেই, হয়েছেন গলগ্রহ। কুলীনদেরও রূপান্তর ঘটেছে। নবধা-কুল লক্ষণ-যুক্ত কুলীনদের সমাজ-কৌলিন্য এখন আর নেই, এখন অর্থ-কৌলিন্যই একমাত্র কৌলিন্য। এখন আচার বিনয় বিদ্যা নয়, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ি গাড়ি—এই সবেরই কদর বেশী। আমরা দুরকম কুলীনকেই একপাত্রে চাইছি। তা কি পাওয়া যায়? সোনার পাথরবাটি কবিকল্পনাতেই সম্ভব। যুগ বদলাচ্ছে, তোমাকেও বদলাতে হবে।

আমার জানাশোনা একটি পাত্র আছে। ছেলেটি বারেন্দ্র। শাস্ত্রের মানদণ্ডে নিখুঁত কুলীন হয়তো নয়, একটু-আধটু খাদ আছে, কিন্তু ছেলেটি ভালো। সুরূপ, বিদ্বান এবং ভালো চাকরিও করে। মেকানিকাল ইন্‌জিনিয়ার। তার বাপও গভর্নমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন, কিন্তু আটটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, অনেক রুধির ক্ষয় হয়েছে। সম্প্রতি কিছু হীনবল। ওই ছেলেটির তাঁর একমাত্র ছেলে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি ওঁদের বলতে পারি। আমাকে খাতির করেন। পণ হয়তো কিছু দিতে হবে কিন্তু কচ্ছপের কামড় আছে বলে মনে হয় না।

আর একটি পাত্র আছে, সেটি কায়স্থ, আমারই বড় ছেলে। সে এবার আই. এ. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা তো আছেই, কুটুম্বিতা হ'লে আরও সুখী হব। ছেলের মত আছে। পণের কোনও দাবি নেই। তবে আমাদের পরিবারের সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। আমার বড় মেয়ে বিয়ে করেছে একজন ব্রাহ্মণের ছেলেকে। লাভ ম্যারেজ। আমি কোনও আপত্তি করিনি, যুগের হাওয়াকে মেনে নিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে বিপত্নীক নিকুঞ্জবাবুর কথা মনে পড়ছে। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। দেখতে পরী নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। তার নামে যখন বার বার প্রেমপত্র আসতে লাগল তখন বিব্রত হ'য়ে পড়লেন ভদ্রলোক। একবার একজন প্রণয়ীকে ধরেছিলেন তিনি। তাকে জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি কি একে বিয়ে করবে? সে বললে, বিয়ে? আচ্ছা বাবাকে জিগ্যেস করে আসি। প্রেম করবার আগে বাবাকে জিগ্যেস করবার প্রয়োজন অনুভব করেনি ছোক্‌রা। বলা বাহুল্য, কাপুরুষটা আর ফিরল না।

নিকুঞ্জবাবুর বিপদ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। বাড়িতে স্ত্রী নেই, তাঁকেই মেয়ে পাহারা দিতে হ'ত। সুসভ্য বাংলাদেশে মেয়েকে বাড়িতে একা রেখে নির্ভয়ে বেরুনো

যায় না। খবরের কাগজে প্রত্যহ যে সব খবর বের হয় (সম্ভবতঃ সেগুলি সত্য খবর) তা পড়লে বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায়।

নিকুঞ্জবাবুর পৈতৃক অর্থ ছিল কিছু, ব্যাঙ্কে ফিক্‌স্‌ড্‌ ডিপজিট। তার সুদ পেতেন এবং ঘরে বসে টাইপ করতেন। ভাঙা টাইপরাইটার একটা ছিল তাঁর। তাঁর দু একজন হিতৈষী বন্ধু তাঁর টাইপের কাজ যোগাড় করে দিতেন। আমিও তাঁকে দিয়ে আমার থীসিস্‌টা টাইপ করিয়েছিলাম। নির্ভুল টাইপ করতেন। পিতাপুত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন কোনক্রমে চলত এই সামান্য আয় থেকে। কিন্তু মেয়ের বিয়ের খরচ জোটানো সম্ভবপর ছিল না। মেয়েকে বাড়িতেই পড়াতেন তিনি। প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশও করেছিল মেয়েটি। শেষকালে মরিয়া হ'য়ে এক অসমসাহসিক কাজ করে বসলেন নিকুঞ্জবাবু।

স্ত্রী ছিল না বলেই বোধহয় পেরেছিলেন, স্ত্রী থাকলে পারতেন না।

তিনি এক ইংরেজী কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। সারমর্ম হচ্ছে—আমার একটি আঠারো বছরের মেয়ে আছে। মেয়েটি রূপসী নয়, কুৎসিতও নয়। স্বাস্থ্যবতী। যে-কোনও জাতের এবং যে-কোনও প্রদেশের ভদ্র ছেলের হাতে আমি এ মেয়েকে সম্প্রদান করতে রাজী আছি, যদি তিনি মেয়েটিকে বিনাপণে গ্রহণ করতে সম্মত থাকেন।

কোনও বাঙালী যুবক এগিয়ে এল না। তারা প্রেম করতে প্রস্তুত, বিয়ে করবার তাগদ নেই।

এগিয়ে এলেন একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক। ভারত গভর্নমেণ্টে পদস্থ অফিসার একজন। বিনা আড়ম্বরে বিয়ে হ'য়ে গেল। তারা এখন সুখে আছে। খবর নিয়েছি মেয়েটির দুটি ছেলে হয়েছে। নিকুঞ্জবাবু কন্যাদায়মুক্ত হয়েছেন। আমি এই ধরনের আরও খবর জানি। ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করেছে সোনার-বেনে। বাঙালী হিন্দু মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করেছে মুসলমান, পাঞ্জাবী এবং সিন্ধি।

তোমাকে এত কথা লেখবার উদ্দেশ্য—যুগ বদলেছে, তুমিও বদলাও। যে জাত নেই সে জাত আঁকড়ে থেকো না। নূতন জাত তৈরি কর।

তোমার পত্রের আশায় রইলাম। ভালবাসা জেনো। ইতি—

তোমারই
শিবেন

ব্রজেন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

ভাই শিবেন,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলাম। তুমি যা লিখেছ সবই ঠিক। তোমার সঙ্গে আমার মতের কিছু অমিল নেই। আমার একার মতে যদি বিয়ে হ'ত তাহলে আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী হতাম। কিন্তু বিবাহ সামাজিক ব্যাপার। বিশেষ করে যে

ব্যক্তিটির সঙ্গে এর সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সেই ব্যক্তিটিরই এতে আপত্তি। আমার মেয়ে অসবর্ণ বিবাহে রাজী নয়, যে নিয়ম আমাদের পরিবারে চিরাচরিত তার বাইরে সে যেতে চায় না। আমার স্ত্রী তো চানই না। সুতরাং আমি ভাই নাচার। আমার ভালবাসা জেন। ইতি—

তোমার

ব্রজেন্দ্রনাথ

দিনকয়েক পরে কুসুমিকারও চিঠি এল একটি।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, প্রায় মাস তিনেক আপনাদের চিঠি পাইনি। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। কাল দ্বিজেনকাকার একটা চিঠিতে জানলাম আপনারা পূর্ণিয়া গিয়েছিলেন। দ্বিজেনকাকার কাছে পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন। সেখানে কি হ'ল? জানাবেন। আমি কলকাতায় আর একটি পাত্রের খবর পেয়েছি। পাত্রটি ইন্‌জিনিয়ার। তার বাবা বড় উকীল। নীচে ঠিকানা দিলাম। আপনি তাঁকে চিঠি লিখে দেখুন। আমাদের স্কুল আরম্ভ হ'য়ে গেছে। পাকা বিল্ডিং এখনও হয়নি। বাবা খুব বড় বিল্ডিং করতে চাইছেন না। ছোট পাকা বাড়ি পরে হবে। এখন আমরা মাটির ঘরেই স্কুল শুরু করে দিয়েছি। এখানে অন্য কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগছি। এখানে আর একটা অসুবিধা, বড্ড সাপ। গোখরো সাপ। তিন চারটে মারা হয়েছে। আপনাদের খবর দেবেন। বাবার শরীরও ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর উৎসাহ খুব। আপনি ও কাকীমা আমার প্রণাম নিন। ইতি—

প্রণতা

কুসুমিকা

কুড়ি

ব্রজেন্দ্রনাথের তিন ছেলেই কলকাতাতে ছিল। বাবার এবং মায়ের চিঠি পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ল সবাই প্রথমটা। নরেন বলল, "বাবা কেন যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন তা তো বুঝি না। ব্যস্ত হলেই তো পাত্র জুটবে না—"

বরেন হেসে বলল, "বাবার চেয়ে মা-ই বেশী ব্যস্ত হয়েছেন। আর তিনিই ব্যস্ত করে তুলছেন বাবাকে—"

হরেন প্র্যাক্‌টিকাল লোক। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "বিজ্ঞাপন না দিলে পাত্রের খবর পাওয়া যাবে না। আমরা রাস্তায় রাস্তায় কোথায় পাত্র খুঁজে বেড়াব। সব কাগজগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলা যাক পোস্ট বক্সের নম্বর দিয়ে। খবর এলেই বাবাকে ঠিকানা পাঠানো যাবে। পরপর তিনি চিঠি লিখে ব্যবস্থা করুন। এ ছাড়া তো অন্য কিছু আমার মাথায় আসছে না—"

বরেন বলল, "হ্যাঁ, ওই ব্যবস্থাই ভালো। তাছাড়া আর একটা জিনিস করা দরকার। এদের সবাইকে বাবা মার কাছে পাঠিয়ে দাও—"

"এদের মানে—"

"বউদিকে, শিউলিকে আর অরুণাকে।"

"তাতে লাভটা কি হবে?"

"ওরা গেলে বাবা মা দু'জনেই অন্যমনস্ক থাকবেন। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ওঁদের এই ছটফটানির আসল কারণটা উষার বিয়ে নয়, আসল কারণ হাতে কোন কাজ নেই। এরা গেলে হাতের এবং মনের আর অবসর থাকবে না। বিশেষতঃ জিরে, মৌরি আর লবঙ্গ গেলে বিয়ের কথা চাপাই পড়ে যাবে।"

জিরে নরেনের ছেলে, মৌরি তার মেয়ে। লবঙ্গ বরেনের মেয়ে। হরেনের ছেলে মেয়ে হয়নি এখনও। অরুণার বয়স মাত্র কুড়ি। বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছর আগে।

তাই ঠিক হ'ল।

এই উপলক্ষে বউদের মধ্যে গোপন যে কথাবার্তা হ'ল তা উপভোগ্য। তিনজনই লেখাপড়া জানা আধুনিকা।

নরেনের বউ রূপ-রেখা মুচকি হেসে বরেনের বউ শিউলিকে বলল, "আমরা কেন যাচ্ছি জানিস? পীস্ মিশনে। বাবা কেনেডি, মা ক্রুশ্চেভ, আমি ম্যাকমিলান, তুই দি গ্যল, আর ছুট্‌কি আডেনয়ার—"

শেফালি হেসে লুটোপুটি।

"যুদ্ধটা কার সঙ্গে কার?"

"যুদ্ধ এখনও বাধেনি। সমস্যা নিউক্লিয়ার এনার্জি নিয়ে—"

"সেটা কার কাছে বেশী?"

"এখনও বোঝা যাচ্ছে না সেটা—। বোধ হয় মা—"

অরুণা মুচকি হেসে বলল, "বেশ বোঝা যাচ্ছে মূর্তিমতী নিউক্লিয়ার এনার্জি হচ্ছে উষা।"

"ঠিক বলেছিস, কোন্ দিক দিয়ে যে ফেটে পড়বে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

তিনজনেই আবার হেসে উঠল।

একুশ

তিন বউ একসঙ্গে এল না।

প্রথমে এল বড় বউ। সঙ্গে জিরে আর মৌরি। আসার আগে নরেনের ছোট একটা চিঠি—"বড় বউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কাছে। ওর শরীরটা এখানে খুব ভালো থাকছে না। প্রায়ই অম্বল হয়। ওখানকার জলহাওয়া ভালো, হয়তো উপকার হতে পারে। পাত্রের সন্ধান পেলেই আপনাকে জানাব। প্রণাম নেবেন।"

চিঠি পড়ে হরমোহিনী মন্তব্য করলেন—"অম্বল হবে না? যা লঙ্কা খাওয়ার ধুম। জিরে আর মৌরিকেও ওই মসলা-গরগরে তরকারি খাওয়ায়—"

ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, "ওদের নামকরণই করেছে মসলার নামে। মসলা-প্রীতি ওদের অসাধারণ।"

রূপ-রেখা যখন এল তখন কিন্তু তার চেহারায় কোনও রোগের লক্ষণ দেখা গেল না। ঢলঢলে মুখখানি ঠিক তেমনি ঢলঢলে আছে। রূপ-রেখা গৌরাঙ্গী নয়, শ্যামা। কিন্তু তার মুখশ্রী অপরূপ। তার রূপ একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে। হরমোহিনী কিন্তু ছাড়লেন না, তাঁর মনে হ'ল বাইরের ও রূপ ওপর-চকচকে রূপ। ভিতরে ভিতরে সর্বনাশা ডিস্‌পেপসিয়া ওকে জীর্ণ করছে।

বললেন, "এখানে শরীর সারাতে এসেছ, খাওয়া-দাওয়ার একটু ধরা-কাট কোরো। জিব সামলাতে না পারলে পেটের অসুখ সারে না।"

রূপ-রেখা আকাশ থেকে পড়ল।

"শরীর তো আমার খারাপ হয়নি। যা খাই বেশ হজম হয়। এখানে এসেছি এমনি বেড়াতে। কলকাতার ওই একঘেয়ে জীবন ভালো লাগছিল না। তাই চলে এলাম।"

"নরেন তবে যে লিখেছে তোমার প্রায়ই অম্বল হয়—"

"না তো। ওটা ওঁর নিজেরই বাই। নিজেরই অম্বল হয়, আঝালা সিদ্ধ তরকারী খান, ওষুধ তো লেগেই আছে, তবু অম্বলের কমতি নেই—"

রূপ-রেখা ফিক করে হেসে ফেললে।

জিরে চোখ বড় বড় করে বলল, "জান ঠা'মা, আমাকে বাবা এক্‌তা হাতী কিনে দিয়েছে। এত্‌তো বলো তাল শুঁল—"

মৌরি একটু বড়। তার কথা পরিষ্কার হয়েছে।

"কি যে বোকা জিরেটা! অত বড় শুঁড় কি করে হবে। হাতীটাই তো এত্‌তো টুকু। বড় বরং আমার পুতুলটা। শুইয়ে দিলেই চোখ বুজে ফেলে—"

জিরে আবদার ধরল—"ঠা'মা, আমাকেও ওই রকম পুতুল কিনে দাও না একটা—"

হরমোহিনী আর রূপ-রেখার অসুখের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলেন না। নাতি-নাতনীর সমস্যা নিয়ে পড়তে হ'ল। কারণ মৌরিও পরক্ষণেই বলল, "আমাকেও তাহলে হাতী কিনে দিতে হবে। ওর চেয়ে বড় হাতী। অনেক অনেক বড়—"

"সব হবে সব হবে—"

নাতি-নাতনীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন রূপ-রেখা কলের ময়দা নিয়ে মাখতে বসেছে। সে বড় বউ, এ বাড়িতে বেশ কিছুদিন এসেছে, সে জানে এ বাড়িতে অধিকার সাব্যস্ত করতে হ'লে

অনুমতির অপেক্ষা চলে না। সে স্বল্পভাষিণী কিন্তু শক্ত মেয়ে। যা করবার তা সে করবেই। তার চরিত্র তার হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস কারফরমা ভালো করেই জানতেন।

"হঠাৎ ময়দা বার করে বসলে যে বউমা?"

রূপ-রেখা বলল, "বাবা বললেন, আমার হাতের নিমকি খাবেন। লেবুর রস দিয়ে নিমকি করব আজ।"

"ভীমরতি ধরেছে তোমার বাবার। ডাক্তাররা ঘিয়ের খাবার ওঁকে খেতে বারণ করেছে জান?"

"দু' একখানা খেলে আর কি হবে।"

আসলে নিমকি খেতে চেয়েছিল উষা। বলেছিল, "বউদি তুমি যে সেই নেবু দিয়ে নিমকি করেছিলে, কি চমৎকারই যে হয়েছিল। আবার কর না—"

রূপ-রেখা সোজা চলে গিয়েছিল ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে।

"বাবা, আপনার জন্যে নিমকি করব?"

"হ্যাঁ বেশ তো। তোমার হাতে নিমকিটা ওতরায় ভালো—"

ব্যস, রূপ-রেখা সোজা ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ময়দা বার করে মাখতে বসে গেল। হরমোহিনী থ' হয়ে গেলেন। কি কাণ্ড আজকালকার মেয়েদের! কারু তোয়াক্কাই করে না।

শিউলি এল দিন চারেক পরে। হঠাৎ এল, চিঠিপত্র না দিয়েই। রূপ-রেখা ছাড়া সবাই বিস্মিত হ'য়ে গেল।

"কি মজা, কি মজা! মেজ বৌদিও এসে গেছে। এবার চল একদিন বাগানে পিকনিক করে আসা যাক—" লাফিয়ে উঠল উষা।

হরমোহিনী শিউলিকে তুই-তোকারি করেন।

"তুই হঠাৎ চলে এলি যে—"

শিউলি সদা হাস্যমুখী। এই কথায় সে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল একেবারে। আসল কারণটা সে যেন আর চেপে রাখতে পারছিল না। পারলও না শেষ পর্যন্ত। বলল, "উনি বললেন বাবা মা উষার বিয়ের জন্যে ভারী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, তুমি গিয়ে সামলাও ওঁদের।"

হরমোহিনী তাঁর বাঁ গালের উপর বাঁ-হাতটি রেখে ঘাড়টি কাত করে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "তোমাদের খুরে খুরে পেন্নাম! আমরা কি কচি ছেলে যে সামলাতে এসেছ? আসল কাজের বেলায় তো সব নবডঙ্কা। যে পাত্রটির খবর দিয়েছিলে সেটি তো খবর নয়, গুজব। তাই বিশ্বাস করে চিঠি লেখালেখি করে হয়রান হলুম আমরা। ওগো শুনছো, ইনি এসেছেন আমাদের সামলাতে—"

রূপ-রেখা তখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'ল। গম্ভীরভাবে শিউলিকে ধমক দিয়ে বলল, "কেন মিছে কথা বলছিস? তুই তো পালিয়ে এসেছিস স্যাকরার তাগাদার ভয়ে। জানেন মা, ও লুকিয়ে একটা হার গড়িয়েছে, তার 'বানি' দিতে পারেনি এখনও। সেই ভয়ে পালিয়ে এসেছে- "

শিউলি আবার একবার হেসে লুটিয়ে পড়ল। সত্যিই সে হার গড়িয়েছিল একটা আর সত্যিই তার 'বানি' বাকি আছে। গয়নার নামে হরমোহিনী এই বুড়োবয়সেও উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন।

বললেন, "হার গড়িয়েছিস নাকি? ভালই করেছিস। কই দেখি কি রকম হার— বাঃ, বেশ সুন্দর প্যাটার্ন তো। কত বানি চেয়েছে—"

"একশ' টাকা—"

"সে আমি দিয়ে দেব'খন"—হঠাৎ খুব প্রসন্ন হ'য়ে গেলেন তিনি। হারটি উলটে পালটে দেখতে লাগলেন।

শিউলির মেয়ে লবঙ্গর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথেরই ভাব বেশী। সে গিয়ে তাঁর কোল দখল করে বসেছিল এসেই।

অরুণাও যখন দিন সাতেক পরে এসে গেল, তখন হরমোহিনীর মনে সন্দেহ হ'ল ভিতরে একটা নিগূঢ় ব্যাপার আছে কিছু। এরকম একজোট হ'য়ে সবাই চলে এল এর মানে কি। অথচ ঘরের বউ, তারা এসেছে, তা নিয়ে বেশী আলোচনা করাটা একটু অশোভন। ওরা ভাববে—ওরা যে কি ভাববে, কি যে না ভাববে—তা হরমোহিনীর কল্পনার অতীত। আজকালকার মেয়েদের কাণ্ডকারখানা দেখে হরমোহিনী উত্তরোত্তর বিস্মিতই হচ্ছেন। কোন কূলকিনারা পাচ্ছেন না। সেকালে কি বউরা এমন 'হুট' করে নিজের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যেতে পারত? এখনকার বউরা পারে। পারবে না কেন? ছেলেরাই যে কমজোর হ'য়ে গেছে সব। আজকাল বউরা তাদের ইয়ার। ইয়ারের উপর জোর চলে না। ঘোড়া বোঝে তার পিঠের সওয়ার কি রকম। সেই ভাবেই চলে। আর শাশুড়ীদের তো আজকাল কিছু বলবার জো নেই। নিজের মান বাঁচিয়ে মুখটি বুজে সব সহ্য করতে হয়। কিছু বললেই অশান্তি। হরমোহিনীর এসব চিন্তা নিতান্তই ব্যক্তিগত। মুখে ফুটে এসব কথা বলেন না কাউকে। এমন কি ব্রজেন্দ্রনাথকেও নয়। তিনি জানেন, বলে লাভ নেই। স্রোতের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। মাঝ থেকে অশান্তি হবে কেবল।

অরুণা যদিও বউদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট তাকেই কিন্তু মনে মনে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন হরমোহিনী। ইংরেজিতে এম. এ. পাশ। দেখতে সুন্দরী। ভারী গম্ভীর। হরমোহিনী ওর সঙ্গে বেশ সহজ হ'তে পারেন নি। আড়াল থেকে ওর হাবভাব যা লক্ষ্য করেছেন তাতে তাঁর মনে হয়েছে মাথায় ছিট আছে মেয়েটির। বারবার আয়নায়

মুখ দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই হাসে। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তার হাসিমুখটা কেমন দেখাচ্ছে। গুনগুন করে গান গায় আপনমনে। আপনমনে কথাও বলে। একা একা কথা বলে, কিন্তু লোকের সামনে একদম চুপ। হরমোহিনীকে শ্রদ্ধাযত্নও যে না করে তা নয়। বাইরে খুবই কেতা-দুরস্ত। কিন্তু হরমোহিনীর মনে হয় ও সবই যেন বাইরে-বাইরে, যা উচিত যা কর্তব্য তা করে যাচ্ছে কেবল। ঠিক প্রাণের যোগ নেই। শিউলির যেমন আছে। শিউলি আলবিড়ে, অগোছালো, হি হি করে হেসে মরছে, ওর শত দোষ, ও কিন্তু ভালবাসে হরমোহিনীকে। ভারী সরল মেয়েটা। অরুণা সে রকম নয়। অরুণা স্বতন্ত্র, ছিমছাম, যেন ভিন্নলোকবাসিনী।

ও এসে যা বললে তাতে অবাক হ'য়ে গেলেন হরমোহিনী। বলল, "বাবার কাছে শেক্‌স্‌পীয়র পড়ব বলে এসেছি।"

শেক্‌স্‌পীয়র পড়বে বলে? সংসার ফেলে চলে এসেছে শেক্‌স্‌পীয়র পড়বে বলে? আর হরেন তাতে আপত্তি করেনি! ধন্যি আজকালকার ছেলে-মেয়েরা। সে ঠাকুরের রান্না খাবে, আর বউ এসে শেক্‌স্‌পীয়র পড়বে? আর ব্রজেন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখেও অবাক হ'য়ে গেছেন তিনি। ব্রজেন্দ্রনাথের বুদ্ধির উপর তাঁর কোনকালেই আস্থা নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি হকচকিয়ে গেছেন একেবারে। তিনিও এই বুড়োবয়সে পুরোনো বইপত্র বার করে শেক্‌স্‌পীয়র নিয়ে মেতে উঠলেন। কি কাণ্ড!

উষা মেতে উঠেছে পিকনিক নিয়ে। রূপ-রেখা আর শিউলিও। হরমোহিনী এখনও মরেন নি, কিন্তু রূপ-রেখা এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন সে-ই এ বাড়ির কর্ত্রী। হরমোহিনীর মত না নিয়েই পিকনিকের জায়গা ঠিক হ'য়ে গেছে, 'মেনু' ঠিক হ'য়ে গেছে, কি কি হবে তা ঠিক হ'য়ে গেছে, ভাঙা গ্রামোফোনটা সারানো হ'য়ে গেছে—এখন সবাই মিলে ধরেছে হরমোহিনীকে পায়েস আর চাটনি করতে হবে। ওদুটো জিনিস নাকি ওঁর মতো কেউ রান্না করতে পারে না। ব্রজেন্দ্রনাথই নাকি ভিতরে ভিতরে উসকে দিয়েছেন উষাকে, তোর মাকে বল ওই দুটোর ভার নিতে। আমার ডায়েবিটিসের কারণ ওঁর রান্না পায়েস। হরমোহিনীর হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আশকারা দিয়ে দিয়ে এদের যে কোথায় উনি নিয়ে যান, কতদূর পর্যন্ত যে ওদের দৌড়, সেইটিই তিনি দেখতে চান কেবল!

তিন বউয়ের চক্রান্ত সফলই হয়েছিল বলতে হবে। কারণ মাসখানেক সত্যিই তারা এমন হৈ হৈ করেছিল যে উষার বিয়ের কথা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার সময়ই পাননি ব্রজেন্দ্রনাথ বা হরমোহিনী।

কিন্তু বিজ্ঞাপনের উত্তর এসেছিল অনেক। তিন ছেলে সে সব ঠিকানা পাঠাতে লাগল ব্রজেন্দ্রনাথকে। তিনি আবার চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

বাইশ

ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠির যে সব জবাব আসতে লাগল তা নিম্নলিখিত প্রকার :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। আপনার সঙ্গে যদি পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হয় তাহলে তা বিশেষ আনন্দের হবে। আমার পুত্রটি বিবাহযোগ্য। লণ্ডন থেকে বি. এস-সি. পাশ করেছে। বয়স ঠিক পঁচিশ বছর। এখন সে বাড়িতে বসে আছে। কিন্তু কাজ শীঘ্রই পাবে। অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছে, দু'এক জায়গায় ইন্‌টারভিউও দিয়ে আসছে। একটি কথা জানানো দরকার মনে করি। আমার ছেলেটি উগ্ররকম ফরসা। আমার ইচ্ছা এবং আমার স্ত্রীরও ইচ্ছা মেয়েটি যাতে গৌরাঙ্গী এবং সুশ্রী হয়। আপনি তার চেহারার বিশেষ বিবরণ পাঠাবেন। প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

মাননীয় ব্রজেনবাবু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হ'ল, তার জন্যে মার্জনা করবেন। আমি যখন আপনার বিজ্ঞাপন দেখে আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম, তখন আমার ধারণা ছিল যে আমার ভাগিনেয় বিবাহে সম্মত আছে। কিন্তু এখন দেখছি বিপরীত। সে ডি. এস-সি'-র জন্য রিসার্চ করছে। সেটা শেষ না হ'লে বিবাহ করবে না। আমি তার মত করাবার জন্যে তার কর্মস্থানেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী নয়। অতএব আমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও এ বিষয়ে উপস্থিত অগ্রসর হওয়া গেল না। ক্ষমা করবেন। ইতি—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৩।৪ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনি স্বনামধন্য পুরুষ, আপনার পরিচয় দরকার হয় না। আপনি আপনার কন্যার যে ঠিকুজিটি পাঠাইয়াছেন, তাহা একাধিক জ্যোতিষীকে দিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু মিল কিছুতেই হইল না। সুতরাং বুঝিলাম আপনার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন বিধাতার অভিপ্রেত নয়। আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার ছেলে এবার আই. এ. এস. পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে তাহা ঠিক, কিন্তু সে এখন বিবাহ করিতে চায় না। তাহার বয়সও অল্প। মাত্র তেইশ বছর কয়েক মাস। আপনার বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠি লিখিয়াছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি অবশ্য ছেলের বিবাহ দিতে উৎসুক। কিন্তু ছেলে বলিতেছে এখন বিবাহ করিবে না। প্রীতি ও নমস্কার জানিবেন। ইতি—

মান্যবরেষু,

আপনার ১৪।৪ তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র বিবাহিত। তৃতীয় পুত্র সুইজারল্যাণ্ড হইতে টি. বি. স্পেশালিস্ট হইয়া ফিরিয়াছে। ভালো হাসপাতালে বড় চাকরি পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমার তিনটি কন্যা এখনও অবিবাহিতা। তাহারা সকলে স্কুলে মাস্টারি করে। আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রবধূও চাকুরিস্থ। আজকাল মেয়েরা চাকরি না করিলে সংসার চলে না। আমার তৃতীয় পুত্রের ইচ্ছা তাহার বউও চাকরি করুক। ইহাতে আপনার মত আছে কি না জানাইবেন। নমস্কার লইবেন। ইতি—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। জ্ঞাতার্থে জানাই যে আমার ছেলেটি বি. কম. ফেল। কোথাও তাহার চাকুরি জুটাইতে পারি নাই। এখন ভরসা তাহার স্ত্রীর ভাগ্যে এবং শ্বশুরকুলের সহায়তায় যদি কোথাও জোটে। আমি সরল মানুষ। সব কথা খুলিয়াই লিখিলাম। আমার ছেলের যদি কোন চাকুরির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, এক্ষুণি আমি রাজী হইব। কথাটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার দুটি অবিবাহিতা কন্যা আছে। স্ত্রী রোগবশতঃ কর্মপটু নহেন। যদি আপনার কন্যা আমার গৃহে পুত্রবধূরূপে আসেন তাঁহাকে সংসারের ভারও লইতে হইবে। সব কথা খুলিয়াই লিখিলাম। আগেই সব খোলসা হইয়া যাওয়া ভাল। আপনার পত্রের আশায় রহিলাম। নমস্কার জানিবেন। ইতি—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইলাম। আজকাল সৎপাত্র যেমন দুর্লভ, সৎপাত্রীও তেমনি। আমার ছেলেটি এম. এস-সি. পাশ করিয়া রিসার্চ করিতেছে। বয়স প্রায় বত্রিশের কাছাকাছি। অনেক সন্ধান করিয়াও তাহার জন্য এযাবৎ একটি সৎপাত্রী যোগাড় করিতে পারি নাই। অন্ততঃপক্ষে দুইশত পাত্রী দেখিয়াছি, একটিও মনোমত হয় নাই। মনোমত পাত্রী বলিতে কি বুঝি তাহা আপনাকে জানানো দরকার। আমার ছেলেটি লম্বা, উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। সুতরাং পাত্রীর উচ্চতা ছয় ফুট কিংবা পৌনে ছয় ফুট না হইলে মানাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, পাত্রীর বর্ণ ফিট গৌরবর্ণ হওয়া দরকার। কারণ আমার পুত্রের রং কালো। উভয়ের রং কালো হইলে বংশই কালো হইয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষায় অন্ততঃ গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই। আপনি লিখিয়াছেন আপনার কন্যা বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছে, বি. এস-সি. হইলেই ভালো হইত। আমার ছেলের সহিত শিক্ষায় তাহা হইলে মিল থাকিত। কিন্তু বি. এ. পাশেও চলিবে। কিন্তু পাশ করা চাই। চতুর্থতঃ, জানা দরকার আপনার পিতৃকুলের এবং আপনার শ্বশুরকুলের

পুত্র-কন্যার সংখ্যা কিরূপ। যদি কন্যার সংখ্যাই বেশী হয়, তাহা হইলে আমি বিবাহ দিব না। কারণ তাহা হইলে আপনার কন্যারও বহুকন্যাপ্রসবিনী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। সে সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতে আমি প্রস্তুত নই। আপনি নামজাদা লোক, আপনার বংশপরিচয় যাহা দিয়াছেন তাহাও নিন্দনীয় নয়। এখন উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য শুনিলে অন্যান্য কথাবার্তা কহিব। নমস্কারান্তে—

প্রিয় ব্রজেনবাবু,

আপনি যে রতন ব্যানার্জির খোঁজ লইতে বলিয়াছিলেন তাহার খোঁজ লইয়া কোনই হদিস পাইতেছি না। বার্মা শেলের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। বার্মা অয়েল কোম্পানিতেও খোঁজ লইয়াছি, সেখানেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের লিস্টে রতন ব্যানার্জির নাম পাইলাম না। রতন ব্যানার্জির পিতা শৈলেশবাবুর বাড়িও গিয়াছিলাম। বাড়ি তাঁহার নিজের বাড়ি শুনিলাম, কিন্তু কি জঘন্য বাড়ি। একতলা স্যাঁতসেঁতে। আপনার মেয়ে সে বাড়িতে থাকিতে পারিবে না। শৈলেশবাবু দরিদ্র স্কুলমাস্টার। খুব বিনীত ভদ্রলোক। আমি যাওয়াতে শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে তাঁহার পুত্র কভেনান্টেড চাকরি পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কোথাও পোস্টেড হয় নাই। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে হইবে। মোটের উপর পাত্রটি হয়তো ভালো, কিন্তু আপনার মেয়ের উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। আপনি যথাকালে আপনার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র ঠিক পাইয়া যাইবেন। বিয়ের ফুল না ফুটিলে তো তাহা হইবে না। ততদিন অপেক্ষা করুন। আমার ভালবাসা সকলে জানিবেন। ইতি—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ভালো পাত্রীর সন্ধান পাইব বলিয়া আপনার বিজ্ঞাপনের উত্তরে আপনাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। আমার মেজ ছেলেটি শিবপুরের B. E. বটে। আপনার মতো প্রতিষ্ঠাবান লোকের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু আমার ছেলের বয়স এখনো চব্বিশ পূর্ণ হয় নাই। আপনার কন্যার বয়স লিখিয়াছেন কুড়ি। বয়সের তফাত একটু কম বলিয়া মনে হইতেছে। তাই এই লোভ সংবরণ করিলাম। আপনার কন্যা সৎপাত্রস্থা হউক—ইহাই কামনা করি। আপনার জানাশোনা অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী মেয়ে (ষোল বছরের বেশী নয়) যদি আপনার জানা থাকে জানাইবেন। আমার আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার জানাইতেছি। ইতি—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আমার ছেলে এখন বিলাতে। এক বৎসরের আগে

ফিরিবে না। ফিরিলেই তাহার বিবাহ দিব। ইতিমধ্যে তাহার জন্য কন্যা বাছিয়া রাখিতেছি। আপনার কন্যার উচ্চতা, বর্ণ, দেহের ও চোখ-মুখের গড়ন কেবল জানাইবেন। সম্ভব হইলে একটি ফোটোও পাঠাইবেন। আমাদের যদি পছন্দ হয় আপনাদের সহিত পরে পত্রালাপ করিব। আশা করি ভালো আছেন। নমস্কারান্তে—

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র পেয়ে একটু হতাশ হলাম। আমি আপনার পোস্ট বক্সে যখন চিঠি লিখেছিলাম তখন ভাবিনি যে আপনার মতো স্বনামধন্য ব্যক্তির নাগাল পাব। কিন্তু নাগাল পেয়েও কোনও সুবিধা হ'ল না। আমরা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তদুপরি আপনার সগোত্র। এ অবস্থায় এ বিষয়ে আর আলোচনার অবসর থাকে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার প্রস্তাবে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি এবং আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে নিঃসন্দেহে সুখী হতাম। কিন্তু কি করব উপায় নাই। সামাজিক বাধানিষেধ আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, একথা আপনি নিশ্চয়ই বিবেচনা করে আমাকে ক্ষমা করবেন। নমস্কারান্তে—

এই ধরনের অনেক চিঠি আসতে লাগল। কোথাও একটুও আশা বা আশ্বাসের সুর নেই। মরিয়া হ'য়ে উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। হরমোহিনীর ঠাকুর প্রায় পঞ্চাশ টাকার সিন্নি খেলেন, হাসলেনও কয়েকবার কিন্তু কৃপা করলেন না। অবশেষে সকলের কলকাতায় যাওয়া স্থির হ'ল। ঠিক হ'ল সেখানেই বসে ব্রজেন্দ্রনাথ কোমর বেঁধে লাগবেন আবার। কলকাতায় সব পাওয়া যায়, পাত্রও পাওয়া যাবে।

তেইশ

অদ্ভুত জায়গা কলকাতা। অনেকদিন পরে ব্রজেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। এত ভিড়, এত অসুবিধা, এত স্থানাভাব কিন্তু এর মধ্যেই একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলেন তিনি। আর কিছু নয়, এই ভিড়ের মধ্যেও বেশ একটা একাকিত্ব, কেউ কারু হাঁড়ির খবর নেয় না। জনস্রোত চলেছে, কেউ কারও খবর রাখে না। সবাইয়ের লক্ষ্য নিজের স্বার্থের উপর নিবদ্ধ। ঘাড় ফিরিয়ে অপরের দিকে চাইবারও অবসর নেই কারও। এর মধ্যেই নরেন আরও দুটি সম্বন্ধ এনেছিল। একটি ইন্‌জিনিয়ার, উপাধি চক্রবর্তী। হরমোহিনী রাজী হলেন না। দ্বিজেনবাবুর সংসার স্বচক্ষে দেখেও তাঁর মত বদলায় নি।

দ্বিতীয় পাত্রটি গাঙ্গুলী। ছেলেটি মন্দ ছিল না, কিন্তু কোষ্ঠী মিলল না। তার সপ্তমে রাহু, শনি এবং রবি দেখে ব্রজেন্দ্রনাথের জ্যোতিষীই এখানে বিয়ে দিতে বারণ করলেন।

বরেন একটি প্রফেসার ছেলের কথাও বলেছিল, কিন্তু প্রফেসার পাত্রও হরমোহিনীর পছন্দ নয়।

হরেন একটি এয়ার-পাইলট পাত্র এনেছিল। কিন্তু তখন উপর্যুপরি কয়েকটি এরোপ্লেন দুর্ঘটনার কথা কাগজে বেরিয়েছে, সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনী দুজনেই পেছিয়ে গেলেন। হরমোহিনী বললেন, 'মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। ওরা কি মানুষ, ওরা পাখী।' হরমোহিনী সমানে জেদ ধরে বসে রইলেন কলিকাতা নিবাসী 'বন্দ্যোপাধ্যায়' উপাধিধারী সৎপাত্র না পেলে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

সুতরাং অবস্থা আগে যেমন জটিল ছিল, কলকাতায় এসেও ঠিক তেমনি রইল। জট এতটুকু খুলল না। মাঝে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন পরিচিত সাধু এসেছিলেন। কানু ছাড়া যেমন গান নেই, তেমনি মেয়ের বিয়ের কথা ছাড়া ব্রজেন্দ্রবাবুর মুখে আজকাল অন্য কথা নেই। তিনি কথায় কথায় মহারাজকে বললেন, "আজকাল মেয়েদের বিয়ে দেওয়া ঘোরতর সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মেয়েটির জন্য পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলুম। আর পেরে উঠছি না। ভাবছি বি. এ. পাশ করলে ওকে এম. এ ক্লাসে ভরতি করে দিয়ে যাব। তারপর যা হয় হবে। যা হবে তাও দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কোনও বয়-ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত। যুগের এই হাওয়া আজকাল—"

স্বামীজী বললেন, "এ যুগের হাওয়ায় সবাই গা ভাসিয়ে দিলে সমাজ উচ্ছন্ন যাবে। আজকালকার ধনী সমাজ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল অত্যধিক পয়সা থাকার জন্য। গরীব সমাজও উচ্ছন্ন যাচ্ছে দারিদ্র্যের জন্য। মধ্যবিত্ত সমাজের কিছুটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে প্রাচীন প্রথা। তারাই একমাত্র তাদের মধ্যেই আমাদের সমাজের সুন্দর আদর্শটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারাই এখনও কন্যাকে সযত্নে লালন-পালন করে সৎপাত্রে সম্প্রদান করে। তারাই এখনও বাবা মায়ের শ্রাদ্ধ করে, তারাই দশবিধ সংস্কারের ধারক। বাকী সব বেজাত হ'য়ে গেছে, জাতের বৈশিষ্ট্য, কৌলিন্য সব হারিয়ে সাহেবদের নকল করে হাস্যকর হয়েছে। চতুর্দিকেই বর্ণসঙ্কর। বিবেকানন্দ আমাদের দেশের সনাতন বিবাহ পদ্ধতিকে সমর্থন করতেন। বলতেন, একমাত্র পিতা-মাতাই কন্যার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র নির্বাচন করতে পারে, আর কেউ পারে না। কন্যা মোহে অন্ধ হ'য়ে অনেক সময় বিপথগামিনী হয়। আজকাল সুবিধাবাদীদের যুগ। সুবিধা হবে ব'লে কাপড় ছেড়ে ঝোলা পায়জামা পরে 'সবাই', সুবিধা হবে বলে যেখানে সেখানে হোটেলে খায়, সুবিধা হবে বলে চাকুরে মেয়ে বিয়ে করে, সুবিধা হবে বলে যে-কোনও দুরাত্মার পায়ে প্রণত হ'তে তাদের আপত্তি নেই। মাত্র কয়েকটি মধ্যবিত্ত পরিবার এখনও এই হাস্যকর অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আগলে আছে পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার। মনে রাখবেন আপনি তাদের মধ্যে একটি। যে আধুনিকতা অসংযমের নামান্তর আপনিও তাতে গা ভাসিয়ে দেবেন না। খবরদার না!"

হরমোহিনী মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিলেন। মহারাজের বক্তৃতা শেষ হতেই প্রণাম করলেন তাঁকে। তারপর বললেন, "আপনি আমার মনের কথাটি বলেছেন মহারাজ। এরা মেয়েকে যেখানে সেখানে বিয়ে দিতে চায়, মেয়েকে চাকরি করতে বলে—একমাত্র আমি রুখে দাঁড়িয়েছি বলে পারেনি।"

"মেয়েরাই তো যুগে যুগে ধর্মের রক্ষক মা।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "কিন্তু আমার যে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছে। কোথাও যে মনোমত পাত্র পাচ্ছি না।"

"পাবেন পাবেন"—আশ্বাস দিলেন মহারাজ—"যখন সময় হবে পেয়ে যাবেন। যেখানে ভবিতব্য সেখানেই হবে। আপনি বৃথাই ভেবে মরছেন—ইংরেজিতে একটা কথা আছে, marriages are made in Heaven. মর্ত্যের ওতে কোন হাত নেই।"

মহারাজ চলে গেলেন।

সেই দিনই রাত্রি সাড়ে দশটার সময় দুয়ারের কড়া নড়ল। ব্রজেন্দ্রনাথই তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলেন। দেখেন এক সৌম্যদর্শন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাথার চুলে যদিও পাক ধরেছে, কিন্তু মুখে চোখে যৌবনের ছটা। ব্রজেন্দ্রনাথ নমস্কার করে বললেন, "আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো!"

ভদ্রলোক এক মুখ হেসে বললেন, "আমাকে চেনবার কথা নয়। এই চিঠি আপনি আমাকে লিখেছিলেন।"

একটি চিঠি দিলেন। কুসুমিকা কিছুদিন আগে যে ইন্‌জিনিয়ার পাত্রটির খবর দিয়েছিল তার বাবাকে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখেছিলেন কলকাতায় আসার আগে। দেখলেন ভদ্রলোক সেই চিঠিখানি এনেছেন।

"ও। আপনিই কি ভূপেশবাবু?"

"হ্যাঁ আমিই।"

"আসুন আসুন আসুন। এত রাত্রে আপনি কষ্ট করে এলেন কেন! এক লাইন লিখে জানালে আমিই যেতুম আপনার কাছে—"

"তাতে কি হয়েছে"—এক মুখ হেসে বললেন ভূপেশবাবু—"বিয়ে তো ভবিতব্যের হাতে, যদি হবার হয় হ'য়ে যাবে। ভাবলাম বিয়ে হোক আর না-ই হোক, একজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ তো করে আসি—"

হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসিতে শিশুর সারল্য।

"উষা—উষা—"

উষা পাশের ঘরেই ছিল। এসে দাঁড়াল।

"এইটেই আমার মেয়ে, প্রণাম কর—"

উষা প্রণাম করল।

"বাঃ—"

এরপর আর কিছুতেই আটকাল না। অতিশয় সহজভাবে সব হ'য়ে গেল। ভূপেশবাবু কোষ্ঠী পর্যন্ত চাইলেন না। বললেন, "অদৃষ্টকে দেখা যায় না। দেখবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। ভগবান যা করবেন তা-ই হবে।"

ব্রজেন্দ্রবাবু সসংকোচে একবার দেনা-পাওনার কথা তুলেছিলেন। ভূপেশবাবু হেসে বললেন, "দেনা-পাওনা ক্যানসেল্‌স্ ইচ্ আদার (cancels each other). তবে বরপণ আপনাকে দিতে হবে। যে পণ আমার বাবা নিয়েছেন, আমি নিয়েছি, আমার বড় ছেলে নিয়েছে সে পণ আপনাকেও দিতে হবে। নগদ একটি টাকা—"

হো হো করে হেসে উঠলেন নিজের রসিকতায় নিজেই। তার পরদিন এসে বললেন—"ও মশাই, যে বরপণ দাবি করেছিলুম তা-ও আর আদায় করতে পারব না। কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়, ডাউরি বিল পাশ হয়ে গেছে!"—আবার সেই হো হো হাসি।

ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনী দু'জনেই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। এমনটা যে এ যুগে সম্ভব তা তাঁরা ভাবতে পারেননি।

চব্বিশ

নির্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহে বিবাহ হ'য়ে গেল। বিয়ের দিন ভিড়ে গোলমালে ব্যস্ত ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। সেদিন তিনি বুঝতে পারেননি উষা চলে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে। কিন্তু যখন উষা সিঁথের সিঁদুরে দশদিক আলো করে হাসিমুখে চলে গেল, সেদিন তিনি যেন অন্ধকার দেখলেন চোখে। মনে হ'ল একা থাকব কি করে। ঠিক ওই সময়ে আবার দুয়ারে কড়া নড়ল। একাই বসেছিলেন তিনি। উঠে কপাট খুলে দিলেন। কপাট খুলেই ভূত দেখলেন যেন।

"এ কি কুসি? তুই! এ কি তোর চেহারা—"

কুসুমের চেহারা জরাজীর্ণ, চক্ষু কোটরগত, চোখের কোলে কালি। দাঁতগুলো বড্ড বেশী বড় দেখাচ্ছে। মাথার সামনের চুল উঠে গেছে। চুলে তেল নেই। গালের হাড় দুটো উঁচু।

"হ্যাঁ, চেহারাটা বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে। গত দু'মাস থেকে রোজ জ্বর হচ্ছিল। কাল মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে। তাই বাবা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—"

"ও। আচ্ছা বোস। কিছু খেয়েছিস? নরেন বেরিয়ে গেছে। সে এলে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভয় কি। ভাল হয়ে যাবি—"

"উষার বিয়ের চিঠি আমরা পেয়েছিলুম। বাবা ভূপেশবাবুকে চিনতেন। তিনিও একটা চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে। ছেলেটি খুব সুন্দর, নয় ?"

"হ্যাঁ—"

"আমার শরীর খারাপ বলে আর তো আসতে পারিনি। কিন্তু কাল মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে চলে এলুম।"

"বেশ করেছিস। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ব্রজেন্দ্রনাথ আশ্বাস দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছিল।

পঁচিশ

কুসুমিকার যক্ষ্মাই হয়েছিল। নরেন তাকে একটা ভালো স্যানাটোরিয়মে পাঠিয়ে দিলে। ডাক্তাররা আশা দিলেন ভালো হ'য়ে যাবে। স্যানাটোরিয়মের খরচ ব্রজেন্দ্রনাথ দেবেন বললেন।

যাবার আগে কুসুমিকা ম্লান হেসে বলল, "কাকাবাবু, আমার স্কুলটার কি হবে ? আমি অনেক জায়গায় ঘুরে দেখলুম, কম মাইনেতে কোন ভাল টিচার আসতে চায় না। আমি তো বিনা মাইনেতে কাজ করতুম। আমি চলে গেলে স্কুলে ইংরিজি পড়াবে কে ?"

"আমি পড়াব—"

বলে উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। বলে হঠাৎ যেন তৃপ্তি পেলেন।

* * *

কুসুমিকা মাদ্রাজে চলে যাওয়ার পরদিনই ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনীকে বললেন, "তুমি ছেলেদের কাছে থাক। আমি দেবেনের কাছে যাচ্ছি—ওর স্কুলে পড়াব।"

"তুমি এই বয়সে পারবে ওই পাড়াগাঁয়ে থাকতে ?"

"পারব, পারতেই হবে। ওইটুকু কচি মেয়ে যা পেরেছে তা আমি পারব না—"

কারও কথা শুনলেন না, পরদিনই চলে গেলেন।

দিন পনরো পরে হরমোহিনীও সেখানে গিয়ে হাজির। বিস্মিত দেবেনবাবু বললেন, "একি বউদিদি, আপনি চলে এলেন যে !"

হরমোহিনী হেসে উত্তর দিলেন—"এলুম। ঝগড়া করতে না পেরে গলা কুটকুট্ করছে।"

"কি কাণ্ড !"

সীমারেখা

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

এই গল্পে যে হাসপাতালের কথা বলছি তা আর আজকাল কোথাও নেই। সেকালে ছিল। প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বাইরের চেহারাটা অনেক বদলেছে আজকাল। তবে মানুষের ভিতরটার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি।

সেকালের এই হাসপাতালের ভিতর সুব্যবস্থা প্রায় ছিল না বললেই হয়। ইংরেজরা তখন সবে এসেছে, তারা দয়া করে যতটুকু করত ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত সবাই। ভিক্ষার চাল কাঁড়া হলেই বা কি আকাঁড়া হলেই বা কি।

হাসপাতালের আসল নামটা গোপন রাখলাম। যে শহরের একপ্রান্তে এটা অবস্থিত ছিল সেটার ঠিক নাম কি ছিল জানি না। লোকে বলত কাপ্তেনগঞ্জ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল হাসপাতালটা। প্রথমে মিলিটারি ছাউনি হিসাবে এর পত্তন হয়েছিল, পরে হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়।

এই হাসপাতালের প্রকাণ্ড হাতার একধারে আর একটা পোড়োগোছের বাড়ি ছিল, সেটাকে সবাই বলত অ্যানেক্স (annexe); মানে হাসপাতালেরই একটা প্রত্যঙ্গ। এর চারদিকে ছিল জঙ্গল। কচু, ঘেঁটু তো ছিলই, বিছুটিও ছিল। ঘরের ছাদ ছিল টিনের। তাও মরচে-পড়া। ঘরের দেওয়ালে শ্যাওলা। সিঁড়িগুলো ভাঙা; সেখানে ঘাস গজিয়ে গেছে। বাড়িতে কোনও কালে যে প্ল্যাস্টার ছিল তা বোঝা যায় না। বাড়ির সামনের দিকটা হাসপাতালের দিকে, আর পিছনটায় একটা মাঠ। মাঠ আর বাড়িটার মাঝখানে একটা বেড়া, ভাঙা বেড়া, লোহার তার আর পেরেক দিয়ে তৈরি। কাঠের থামগুলো প্রায় সবই পড়ে গেছে। বেড়াটা তার আর পেরেকের বোঝায় জড়ামড়ি হ'য়ে ভ্যাংচাচ্ছে যেন বাড়িটাকে।

এসব দেখে শুনে আপনার যদি ভয় না হয় হাসপাতালের বাঁ দিক থেকে যে সরু রাস্তাটা অ্যানেক্সের দিকে গেছে সেইটে দিয়ে আমার সঙ্গে এসে ভিতরের অবস্থাটা দেখুন একবার। বাড়িটার সামনের দুয়ারটা খুললেই একটা দালানের মতো জায়গায় এসে পড়বেন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্যাসেজ'। হাসপাতালের যত ঝড়তি-পড়তি বাজে রাবিশ এখানে স্তূপীকৃত করা আছে এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষে। একটা পাহাড়ের মতো হ'য়ে গেছে। ছেঁড়া গদি, লেপ, তোশক, বালিশ, ভাঙা চেয়ার, স্ট্রেচার, ড্রেসিং গাউন, ছেঁড়া জামা, জুতো সব আছে সেখানে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না।

কিন্তু নন্দী—অ্যানেক্সের রক্ষক—এই রাবিশের স্তূপের উপরই থাকে। নন্দী এককালে মিলিটারিতে সাহেবদের চাপরাসী ছিল। তাই সে প্রায় সর্বদাই খাকি প্যাণ্ট আর মিলিটারি কোট গায়ে দিয়ে থাকে। অবশ্য কোট প্যাণ্ট দুইই শতচ্ছিন্ন, তালিমারা। সিগারেট খায়। অভাবে বিড়ি। তাছাড়া তাড়িখোর। ভুরু দুটো ঝাঁকড়া, কানেও চুল আছে। মুখের ভাব অনেকটা লোম-ওলা বিলিতি কুকুরের মুখভাবের মতো। নাকের

ডগাটা লাল, শরীরটা পাকানো পাতলা। কিন্তু তাহলে কি হয়, তাকে দেখলেই কেমন যেন ভয় করে। হাত দুটোও বিলিতি কুকুরের থাবার মতো, বেশ চওড়া এবং বলিষ্ঠ। পৃথিবীর অধিকাংশ পাহারাওলার মতো সে-ও একবগ্‌গা, বিশ্বাসী, কর্মপটু এবং ঈষৎ নির্বোধ। তার কাছে একটি মাত্র জিনিসই মূল্যবান—উপরওলার আদেশ। এ আদেশ অমান্য করবার সাধ্য তার নেই, ইচ্ছাও নেই। আর একটি জিনিসে তার বিশ্বাস আছে—মার। সে জানে মারের তুল্য ওষুধ নেই। যত বড় বদমায়েশই হোক ঠিক শায়েস্তা হ'য়ে যাবে। যখনই দরকার হয় তখনই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সে ঘুসি চালায়—মুখে, বুকে, পেটে, পিঠে কোথাও বাদ দেয় না। তার দৃঢ়বিশ্বাস শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হ'লে মারের তুল্য মোক্ষম জিনিস আর নেই।

দালান পার হয়েই বড হল-ঘর। ঘরটি বড় বটে, কিন্তু বিশ্রী। দেওয়ালে ময়লাটে নীল রং, ঘরের ছাদটা কালিঝুলে ভরতি। মনে হয় উনুনের ধোঁয়া বেরুবার পথ না পেয়ে ছাদে আশ্রয় করেছে। জানলাগুলোয় মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া। দেখলেই ভয় হয়। ঘরের মেঝে কাঠের, কিন্তু কাঠ সব ফেটে ফেটে গেছে আর সেই সব ফাটলের ভিতর ঢুকেছে প্রচুর ময়লা আর ধূলো। তাছাড়া ঘরটা নানারকম দুর্গন্ধে ভরতি। পচা তরকারির গন্ধ, কেরোসিন ল্যাম্পের গন্ধ, ছারপোকার গন্ধ, প্রস্রাবের গন্ধ। ঘরে ঢুকলেই মনে হয় কোনও জানোয়ারের খাঁচায় ঢুকলুম বুঝি।

ঘরের প্রত্যেকটি খাট মেঝেতে স্ক্রু দিয়ে আঁটা। যারা খাটের উপর বসে কিংবা শুয়ে আছে তাদের গায়ে হাসপাতালের ইউনিফর্ম। নীল রঙের গাউন আর টুপি। এখন এসব ইউনিফর্ম উঠে গেছে।

এরা সবাই পাগল।

পাঁচজন আছে। এদের মধ্যে একজন শুধু উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বাকী চারজন সাধারণ শ্রেণীর। দ্বারের সব চেয়ে কাছে যার বিছানা সে লোকটি লম্বা, রোগা। তার গোঁফ জোড়াটি যদিও পুষ্ট, কিন্তু অবিন্যস্ত। ঝুলেও গেছে। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি লাল। লোকটি তার দুই হাতের মুঠোর উপর থুতনিটি রেখে সামনের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে আছে। তার দুঃখের অন্ত নেই। দিবারাত্রি কখনও কাঁদছে, কখনও মাথা নাড়ছে, কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, মাঝে মাঝে এক-আধবার ম্লান হাসিও হাসছে। ঘরের বাকী চারজনের সঙ্গে তার বাক্যালাপ নেই বললেই চলে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয় না। যখন হাসপাতালের খাবার আসে তখন যন্ত্রচালিতবৎ সেগুলো খেয়ে ফেলে। কোনও মন্তব্য করে না। সর্বদাই কাশছে। গালের হাড় দুটো উঁচু আর লাল। মনে হয় কাল-রোগ যক্ষ্মায় ধরেছে ওকে।

এর পরের বিছানাটিতে যে আছে, সে বৃদ্ধ, কিন্তু খুব চঞ্চল আর ছটফটে। বেঁটে লোক, ছুঁচলো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে। মাথার চুলগুলি কাফ্রিদের চুলের মতো

কোঁকড়ানো আর কালো। সারাদিন সে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। কখনও এ জানলায়, কখনও ও জানলায়, কখনও এ কোণে কখনও ও কোণে। যখন বিছানায় এসে বসে একটা পায়ের উপর আর একটা পা দিয়ে বসে। আর ক্রমাগত শিস দেয়, দোয়েলও বোধ হয় ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিস দিতে পারবে না। মাঝে মাঝে মৃদুকণ্ঠে গানও গায়। কিন্তু শিস দেওয়ার দিকেই ঝোঁক বেশী। রাত্রেও শিশুর মতো ছটফট করে। দেখে মনে হয় যেন খুব আমোদেই আছে। প্রার্থনা করতে বসে খুব ঘটা করে এবং দমাদ্দম নিজের বুকে ঘুষি মারে। তারপর কপাটের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে নন্দী কোথায় আছে। এর নাম টুপি-ওলা জিতেন। এককালে হ্যাটের ব্যবসা ছিল। টুপির দোকানে আগুন লেগে যাবার পরই পাগল হ'য়ে যায়। কুড়ি বছর হাসপাতালে আছে।

জিতেনই একমাত্র লোক যে হাসপাতাল থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে। সে অ্যানেক্স্ থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের হাতায় তো ঘুরে বেড়ায়ই, বাজারেও চলে যায়। হাসপাতালে অনেকদিন ধরে আছে বলেই এবং তার পাগলামির মধ্যে বিপজ্জনক কিছু নেই বলেই তাকে এই সুবিধাটা দেওয়া হয়েছে সম্ভবতঃ। জিতেন শহরের রাস্তায় রঙ্গরসের একটা জীবন্ত উৎস। সকলেই তাকে নিয়ে একটু না একটু রসিকতা করে। প্রায়ই দেখা যায় রাস্তায় জিতেনের পিছু পিছু একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর দু'তিনটে নেড়ী কুকুরও চলেছে। জিতেনকে পেয়ে সবাই খুশী। টুপি আর লম্বা-গাউন পরা জিতেন, কখনও ছেঁড়া চটি পরে কখনও বা খালি পায়ে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ায় আর প্রত্যেক দোকানে গিয়ে পয়সা চায়। অনেকে পয়সা দেয়, অনেকে খেতেও দেয়। কেউ একেবারে বঞ্চিত করে না তাকে। এই সব নিয়ে আনেক্সে ফিরে আসে। আসামাত্রই নন্দী সব নিয়ে নেয়। জোর করে কেড়ে নেয় আর চীৎকার করে বলতে থাকে—এশালাকে আর কখনও বাইরে বেরুতে দেব না। হাতপাতালের মানসম্ভ্রম নষ্ট করে দিলে ব্যাটা। হাসপাতালের আইন কি করে টিকবে এরকম করলে ?

জিতু কিচ্ছু আপত্তি করে না। জিতেন এমনি লোকও ভালো। তার সঙ্গীদের কারও তেষ্টা পেলে বাইরে থেকে জল এনে দেয়, গায়ে ঢাকাও দিয়ে দেয় যখন কেউ আদুড় গায়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সবাইকে বলে, এবার তোমার জন্যে পয়সা এনে দেব, ভালো টুপিও করিয়ে দেব। ঠিক তার পাশের বিছানায় যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীটি আছে জিতুই তাকে চামচ দিয়ে খাবার খাইয়েও দেয়। ঠিক যে দয়াপরবশ হ'য়ে দেয় তা নয়, মহৎ মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হয়েও দেয় না। সে তার অন্য পাশের রোগীটির নকল করে মাত্র, নকল না ক'রে পারে না। যন্ত্রচালিতবৎ নকল ক'রে যায়।

চিন্ময় সান্যালের বয়স তেত্রিশ বছর। ভালো ঘরের ছেলে, কিছুদিন আদালতে গভর্ণমেণ্ট আপিসে কাজ করেছিল। এখন পাগল। একটা নাম-হীন ভয় তাকে উন্মাদ করে তুলেছে। ডাক্তারি ভাষায় এ রোগের নাম পারসিকিউশন ম্যানিয়া

(persecution mania)—তার ভয় ওই বুঝি কেউ তাকে ধরতে আসছে। হয় সে সমস্ত দিন বিছানায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে, না হয় সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়ায় যেন এক্‌সার্‌সাইজ করছে। বিছানায় সে বসে না, বসলেও কদাচিৎ বসে। সর্বদাই উত্তেজিত হ'য়ে আছে সে, শুধু উত্তেজিত নয়, উৎকণ্ঠিতও। একটা অজানা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় সর্বদা অভিভূত হ'য়ে আছে, সর্বদাই প্রত্যাশা করছে এইবার বুঝি সেটা এসে পড়ল। দালানে সামান্য খসখস শব্দ হ'লে কিংবা উঠানে সামান্য শব্দ পাওয়া গেলেই সে মাথা উঁচু করে কান পেতে শোনে—তাকে ধরতে এল নাকি? তাকেই কি তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে, না, আর কাউকে? এই সময় তার সমস্ত মুখের পেশীগুলো শক্ত হ'য়ে ওঠে, চোখে ফুটে ওঠে একাগ্র ভীত দৃষ্টি। বীভৎস দেখায় মুখটা।

চিন্ময় সান্যালকে আমার ভালো লাগে। তার মুখটা বেশ বড়সড়, রং পাণ্ডুর, গালের হাড় দুটো উঁচু উঁচু, আর সমস্ত মুখখানি ম্লান, বিষণ্ণ। মনে হয় মুখের আয়নায় যন্ত্রণাজর্জরিত অন্তরটা প্রতিফলিত হয়েছে। তার মুখভঙ্গী অদ্ভুত এবং বিশ্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মুখে যে সব সূক্ষ্ম রেখার দাগ পড়েছে তা গভীর বেদনার দ্যোতক, মনে হয় সে সবের মধ্যে একটা বুদ্ধিদীপ্ত অনুভূতি মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। তাই চোখের দৃষ্টিও বুদ্ধিদীপ্ত। লোকটিকে আমার বেশ ভালো লাগে। এমনিতে কথাবার্তায় বেশ শিষ্ট, বিনয়ী, আর এক নন্দী ছাড়া সকলের সঙ্গে তার ব্যবহারও ভদ্র। যদি কারো হাত থেকে একটা বোতাম বা একটা চামচ মেঝেতে পড়ে যায়, অমনি বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে চিন্ময় এবং সেটা কুড়িয়ে যার জিনিস তাকে দিয়ে দেয়। সকালে উঠেই প্রত্যেকের সামনে গিয়ে 'গুড্‌ মর্নিং,' রাতে শুতে যাবার আগে 'গুড্‌ নাইট'।

তার ভীতচকিত মুখভঙ্গী দেখলে মনে হয় বরাবরই সে একটা আতঙ্কের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু তার পাগলামির আসল প্রকাশটা হয় অন্যভাবে। সন্ধের দিকে সে জামাকাপড় সর্বাঙ্গে জড়িয়ে কাঁপতে থাকে, তার দাঁতে দাত লেগে ঠকঠক করে শব্দ হয় আর তখন সারা ঘরময় সে দাপাদাপি করে বেড়ায়। মনে হয় যেন তার কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। দাপাদাপি করতে করতে মাঝে মাঝে সে হঠাৎ থেমে গিয়ে তার সঙ্গীদের মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকে যেন সে তাদের একটা দরকারী কথা বলতে চায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরে যায়—ভাবটা যেন এদের কাছে কিছু বলা বৃথা, এরা কেউ শুনবেও না, বুঝবেও না। কিন্তু একটু পরেই এ ভাবটাও কেটে যায়, তখন সে মনের আবেগে অনর্গল বকতে থাকে, যেন তোড়ে জল বেরুচ্ছে নল থেকে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপের মতো শোনায় তার এ অসংলগ্ন বক্তৃতা, সব বোঝা যায় না, কথাও স্পষ্ট নয় অনেক জায়গায়। কিন্তু তবু মনে হয় তার বক্তৃতায় এমন একটা কি যেন আছে যা তুচ্ছ করবার মতো নয়, যার আবেদন অন্তরকে স্পর্শ করে। একটা পাগল আর একটা সুস্থ মানুষ যেন একসঙ্গে কথা বলে চলেছে এক মুখ দিয়ে। তার এ বকুনি কাগজে লিপিবদ্ধ করা যায় না। তার বক্তব্য প্রধানতঃ মানুষের নীচতা

নিয়ে, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যে অত্যাচার জীবনে নিয়ত নানারূপে সত্যকে সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে। সে বলে যে, এমন দিন থাকবে না, নূতন জীবনের নূতন প্রভাত একদিন আসবেই। জানলার লোহার গরাদের বিরুদ্ধে তার ভয়ানক রাগ। বলে ওইগুলোই অত্যাচারী মানুষের প্রতীক। অসংলগ্ন অস্পষ্ট ভাষায় যা বলে যায়, মনে হয় তা একটা অদ্ভুত সংগীত, যার শেষ কলি এখনও গাওয়া হয়নি।

দুই

প্রায় দশ পনেরো বছর আগে শ্রীযুক্ত সুরথ সান্যাল শহরে বড় রাস্তার উপর তাঁর নিজের বাড়িতে বাস করতেন। গভর্নমেণ্টের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। ধনী মানী বলে সকলে তাঁকে সম্মান করত। তাঁর দুই ছেলে ছিল—মৃন্ময় ও চিন্ময়। মৃন্ময় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর পড়বার পর সাংঘাতিক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হ'য়ে মারা যায় এবং তারপরই সান্যাল পরিবারে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করে। মৃন্ময়ের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরেই সুরথবাবু জুয়াচুরি এবং তহবিল-তছরুপের দায়ে ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই জেলে মারা যান টাইফয়েড হ'য়ে। তাঁর বাড়িঘর, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নীলামে বিক্রি হ'য়ে গেল। নিঃসম্বল হ'য়ে পড়ল চিন্ময় আর তার বিধবা মা।

তার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন চিন্ময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। তিনি মাসে মাসে তাকে পঞ্চাশটি করে টাকা পাঠাতেন। বলা বাহুল্য, এ টাকা সে যুগের পক্ষে যথেষ্ট। চিন্ময় বিলাসের মধ্যেই লালিতপালিত হয়েছিল, অভাবের তীক্ষ্ণ-দন্তের দংশন তাকে অনুভব করতে হয়নি। কিন্তু এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পর তাকে কোমর বাঁধতে হ'ল। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সামান্য বেতনে টিউশনি করতে লাগল সে। এর মধ্যে আবার দরখাস্তও লিখে দিতে হ'ত। কিন্তু এত করেও সে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার মতো টাকা বাঁচাতে পারত না। যা রোজগার করত পাঠিয়ে দিত তার বিধবা মাকে। কিন্তু এ জীবনে মোটেই অভ্যস্ত ছিল না বেচারা, শেষ পর্যন্ত আর চালাতে পারল না। অসুখে পড়ে গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দিয়ে ভগ্নহৃদয়ে অবশেষে দেশে ফিরে এল সে। দেশ মানে, ছোট একটা শহর। জেলা শহর। বন্ধুদের সুপারিশে সেখানে একটা স্কুলে মাস্টারি জুটল তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারল না চাকরিটা। সহকর্মীদের সঙ্গে তেমন বনল না, ছাত্রদের সঙ্গেও না। শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হ'ল। এর পর তার মা মারা গেল। ছ'মাস রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল সে, কোনদিন অনাহারে, কোনদিন অর্ধাহারে। মুড়ির বেশী আর কিছু জোটে

নি। তারপর আদালতে চাকরি পেল একটা। বেলিফের চাকরি। এই চাকরিই সে করছিল, কিন্তু শরীর খারাপ হওয়াতে তা-ও ছেড়ে দিতে হ'ল শেষ পর্যন্ত।

সে ছাত্রজীবনে কোনদিনও খুব বলিষ্ঠ ছিল না। রোগা-রোগাই ছিল। দেখে মনে হ'ত শরীরে রক্ত নেই। ফ্যাকাশে চেহারা। সর্দি কাশি প্রায়ই লেগে থাকত। অগ্নিমান্দ্য ছিল, রাত্রে ঘুমও হ'ত না। এক কাপ চা বা কফি খেলে সারারাত বসে কাটাতে হ'ত তাকে। আর একটা কথা। ছাত্রজীবনে যদিও অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কিন্তু কারও সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়নি। তার স্বভাবটাই এমন রগচটা গোছের ছিল, সকলকেই সে এমন সন্দেহের চোখে দেখত যে, কেউ তার আপনজন হয়নি। শহরের একটিও লোকের উপর সে প্রসন্ন ছিল না। বলত, জানোয়ার সব, গাড়োলের দল। তাদের কথা যখন উল্লেখ করত তখন ঘৃণা যেন উপচে পড়ত তার চোখ মুখ দিয়ে। তীক্ষ্ণ জোরালো গলার স্বর ছিল তার। কথাও বলত খুব জোরে আর খুব আবেগভরে। বলতে বলতে আত্মহারা হ'য়ে পড়ত, হয় ঘৃণায়, না হয় বিস্ময়ে, না হয় আনন্দে। তার কথা শুনলে একটা কথা মনে হ'ত কিন্তু, যা বলছে তার মধ্যে ভণ্ডামি নেই, আন্তরিকতা আছে। আর তার কথার একটি মাত্রই ধুয়ো ছিল, যাতে সে বার বার ফিরে আসত। তার সঙ্গে যে বিষয়েই আলাপ শুরু করা যাক্ না সে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে ঠিক সেই ধুয়োটিতে এনে হাজির করবে। ধুয়োটি হচ্ছে এই : চারিদিকের আবহাওয়া ক্রমশঃ শ্বাসরোধকর হ'য়ে আসছে, জীবনে কোনও বৈচিত্র্য নেই, সমাজে কোথাও উচ্চাদর্শ নেই। প্রত্যেকেই একটা অর্থহীন কদর্য জীবন যাপন করে চলেছে, সেই গ্লানিময় জীবনকে মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্য দান করছে হিংসা, রিরংসা আর ভণ্ডামি। পাপীদেরই জয়জয়কার, পুণ্যবানদের মহাকষ্ট। সমাজকে এই সর্বগ্রাসী ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হ'লে ভালো স্কুল চাই, আদর্শবাদী খবরের কাগজ চাই, ভালো নাট্যমঞ্চ ও নাটক চাই, ভালো বক্তা চাই। দেশের প্রতিভা আর সদবুদ্ধি যদি এর বিরুদ্ধে একসঙ্গে লাগে তাহলেই কাজ হবে। সমাজকে জাগাতে হবে, সবাইকে জানাতে হবে কি ভয়ঙ্কর পাঁকে তোমরা ডুবে যাচ্ছ। তার সমসাময়িক লোকদের ছবি যখন সে আঁকত তখন বেশ গাঢ় রঙেই আঁকত। আর মাত্র দুটো রঙই ব্যবহার করত—কালো আর সাদা। মাঝামাঝি কোন রঙের চিহ্নও থাকত না। তার মতে সমাজে দু'রকম লোকই আছে—পুণ্যাত্মা আর পাপাত্মা। মাঝামাঝি কিছু নেই। নারীদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে প্রেমের সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে গদগদ হ'য়ে পড়ত সে, যদিও নিজে সে জীবনে কখনও প্রেমে পড়েনি।

তার এই 'ক্ষেপ চুরিয়াস' মেজাজ এবং তেরিয়া মনোভাব সত্ত্বেও শহরের প্রায় সকলেই ভালবাসত তাকে। চিনু বলে ডাকত সবাই। তার ভদ্র ব্যবহার, তার পরোপকার করবার প্রবৃত্তি, তার উচ্চাদর্শ আর নৈতিক চরিত্র, তার রোগজীর্ণ চেহারা, তার পারিবারিক দুর্দশা—এই সব কারণে সবাই তাকে স্নেহের চক্ষে দেখত। তার জন্য

দুঃখও করত সবাই। এমন শিক্ষিত ছেলে, অথচ কি দুর্দশা! জ্ঞানের পরিধি তার সত্যিই অনেক বড ছিল। সে না জানত কি? লোকে তাকে চলন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া (বিশ্বকোষ) বলে মনে করত।

খুব পড়ত। ক্লাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে নিজের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটিতে হাত বুলোতে বুলোতে সে ক্রমাগত পড়ত—মাসিকপত্র, বই,—রিডিং রুমের টেবিলে যা থাকত সব। তাকে দেখলে মনে হ'ত সে পড়ছে না, যেন গোগ্রাসে গিলছে। এই পড়াটা তার নেশার মতো হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—যা পেত তাই পড়ত। পুরোনো কাগজ, বিজ্ঞাপন কিচ্ছু বাদ দিত না।

বাড়িতে যখন থাকত, শুয়ে থাকত। শুয়ে শুয়ে পড়ত। খালি পডত।

তিন

ভাদ্র মাসের একদিন সকালে তাকে বেরুতে হয়েছিল সমন জারি করবার জন্য। মেজাজ, শরীর কোনটাই ভালো ছিল না। কোটের কলার দিয়ে কান দুটো ঢেকে প্যাচপেচে কাদায় তবু যেতে হয়েছিল তাকে। যেতে যেতে সে দেখতে পেল, দুজন লোককে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চারজন সশস্ত্র পুলিশ কনেস্টবল। এ রকম দৃশ্য বিরল নয়, চিনু আগেও দেখেছে, এদের দেখে বরাবরই তার খারাপ লাগত, কষ্ট হ'ত। কিন্তু সেদিন একটা নূতন অনুভূতি জাগল তার মনে। কেন জানি না সেদিন তার মনে হ'ল তারও তো ঠিক ওই দশা হ'তে পারে। তাকেও যদি ঠিক ওই রকম হাতকড়ি লাগিয়ে, কাদায় হাঁটিয়ে, আগু-পিছু পুলিশ পাহারা দিয়ে জেলে নিয়ে যায়, বাধা দেবে কে। ফিরবার পথে তার চেনা একজন পুলিশ ইন্‌স্‌পেকটরের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে ভদ্রলোক নমস্কার করে এগিয়ে এলেন এবং তার সঙ্গে গল্প করতে করতে গেলেন কিছুদূর। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, কিন্তু চিন্ময়ের কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। বাড়ি ফিরে এসে মনটা খুব খারাপ হ'য়ে গেল, সেই হাতকড়ি পরা লোক দুটো আর বন্দুকধারী পুলিশ চারটের কথা বার বার মনে জাগতে লাগল। সমস্ত দিন ওই চিন্তাই আচ্ছন্ন করে রাখল তার মনকে। কেমন যেন অস্বস্তি হ'তে লাগল সারাদিন। পড়ায় মন বসাতে পারলে না, অন্য কোন কথা ভাবতেও পারলে না। সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বালালে না তার ঘরে, রাত্রে ঘুমও হ'ল না, একটি কথাই বার বার মনে হ'তে লাগল যদি তাকেও অমনি হাতকড়ি দিয়ে জেলে নিয়ে যায়। সে জানে সে কখনও কোন দোষ করেনি। সে শপথ করে বলতে পারে সে কখনও চুরি করেনি, রাহাজানি করেনি, ঘরে আগুন লাগায়নি বা খুন করেনি। কিন্তু অজ্ঞাতসারেও তো এসব করা অসম্ভব নয়। না জেনে না বুঝে কত লোকই তো দুষ্কর্ম করে ফেলে। তাছাড়া ভুলও তো হ'তে

পারে। বদমায়েশি করে কেউ তাকে ফাঁসিয়েও তো দিতে পারে, বিচারকদের ভুলও হ'তে পারে। এ রকম কাহিনী তো কত শোনা গেছে। বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। এ শ্লোকের কি কোন মানে নেই? আজকাল বিচার আর বিচারকদের বা ধারা তাতে তো যে কোনও লোক যে কোনও মুহূর্তে তাদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে পারে। বিচারক, পুলিশ আর ডাক্তাররা মানুষের দোষ-দুঃখ-কষ্টকে সহৃদয়ভাবে দেখতে পারে না, ওই সব নিয়ে তাদের দৈনন্দিন আপিসের কাজ, সহৃদয় হ'লে চলে না, ক্রমশঃ তাদের মন অসাড় হয়ে যায়। হ'য়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কসাইরা যেমন ছাগল ভেড়া গরু কাটে। তারা কি ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ভাবে? আর একবার এই হৃদয়হীন পুলিশ আর জজেদের খপ্পরে পড়লেই সর্বনাশ। তাদের একটি মাত্র নজর তখন আইনের উপর, যে আইন চালু রাখবার জন্য তারা মাইনে পাচ্ছে। সেই আইনটুকু দেখে নিতে যতটুকু সময়—বাস্। তারপর তুমি জেলে যাও আর ফাঁসিই যাও, তারা কেয়ারও করবে না। আদালতে কখনও বিচার হয়? যখন দেশের সর্বত্র জাল জুয়াচুরি অবিচার অত্যাচার দিনের আলোয় স্বচ্ছন্দে চলছে, তখন সুবিচারের প্রত্যাশা কি মূঢ়তার নামান্তর নয়?

তার পরদিন সকালে চিন্ময় যখন বিছানা থেকে উঠল তখন তার সমস্ত দেহ-মন ভয়ে আচ্ছন্ন, তার দৃঢ় ধারণা হ'য়ে গেছে যে কোনও মুহূর্তে তাকেও পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে পারে। ভয়টা কিছুতেই মন থেকে দূর হ'তে চায় না। ঘুরে ফিরে ওই একটি চিন্তাই মনে বার বার আসে। এ চিন্তা তার মনে জাগছে কেন? নিজেই প্রশ্ন করে, নিজেই উত্তর দেয়—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। এমন সময় একজন পুলিশ কনেস্টবল ধীরে ধীরে জানলার কাছ দিয়ে চলে গেল। এর মানে কি? তারপর দুজন লোক তার বাড়ির সামনে এসে থামল আর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল! অমন চুপ করে আছে কেন?

এরপর থেকে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি ওই এক দুশ্চিন্তা। যখনই কেউ তার জানলার কাছ দিয়ে যায় কিংবা বাড়ির দিকে তাকায় তখনই তার মনে হয় নিশ্চয় পুলিশের লোক কিংবা ডিটেক্‌টিভ। একজন ডিস্ট্রিক্‌ট পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর প্রত্যহ জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে তার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেন। এই রাস্তা দিয়েই নিজের বাড়ি থেকে আপিসে যেতেন তিনি। চিন্ময়ের মনে হ'ত উনি এত জোরে গাড়ি হাঁকাচ্ছেন কেন, ওঁর চোখ-মুখের ভাবই বা অমনধারা কেন। চিন্ময়ের মনে হ'ত উনি বোধহয় ঊর্ধ্বশ্বাসে থানায় চলেছেন খবর দিতে যে একটা ভয়ংকর আসামী এই শহরে লুকিয়ে আছে। দুয়ারের কড়া নড়লে এবং গেটের কাছে সামান্য শব্দ হ'লে সে চমকে উঠত। গৃহকর্ত্রীর ঘরে কোনও অচেনা লোক এলে তার অস্বস্তির আর সীমা থাকত না। রাস্তায় কোনও পুলিশ বা পাহারাওলার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে গেলে মুচকি মুচকি হেসে বা শিস দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করত সে, এমন একটা সপ্রতিভতার ভান করত যেন সে নির্দোষ, পুলিশ দেখে কিছুমাত্র ভয় পায়নি। পাছে তাকে পুলিশে হাতকড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে যায়

এই ভয়ে রাত্রে তার ঘুম হ'ত না। কিন্তু সে এমনভাবে নাক ডাকাতো আর এমনভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলত যেন তার গৃহকর্ত্রী (তিনি পাশের ঘরেই থাকতেন) সন্দেহ না করেন যে, সে ঘুমুচ্ছে না। কারণ গৃহকর্ত্রী যদি জানতে পারেন যে ও ঘুমুচ্ছে না তখনই তিনি এই অনিদ্রার কারণ অনুসন্ধান করতে চাইবেন, হয়তো তাঁর মনে হবে নিশ্চয়ই ওর বিবেকে কোনও গলদ আছে, তাই ঘুম আসছে না এবং শেষে হয়তো এই অনিদ্রাটাই ওর বিরুদ্ধে মস্ত একটা প্রমাণ হ'য়ে দাঁড়াবে। চিনু অবশ্য নিজের যুক্তি দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে, তার এ ভয় অমূলক, এও বুঝতে পারছিল যদি তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে জেলেই পুরে রাখে তাতেই বা মারাত্মক এমন কি আছে, যদি তার নিজের বিবেকে কোন গলদ না থাকে। যতই সে যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চাইছিল ততই যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল সব, ততই অস্থির হ'য়ে পড়ছিল। তার অবস্থা অনেকটা সেই তপস্বীর মতো হ'ল। এক তপস্বী একবার এক জঙ্গলে গিয়ে ঠিক করলেন যে, খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানে তপস্যা করতে বসবেন। কিন্তু শেষে দেখলেন, যতই তিনি কুড়ুল দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করছেন ততই জঙ্গল আরও ঘন হ'য়ে গজিয়ে উঠছে তার চারিদিকে। চিন্ময়েরও অনেকটা তাই হ'ল। যুক্তির হালে পানি না পেয়ে শেষে যুক্তি-টুক্তি সব বিসর্জন দিয়ে ভয় আর হতাশার কাছেই আত্মসমর্পণ করে ফেলল সে।

মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করে একা একা নির্জনে থাকত। আদালতের এই চাকরিটা তার কোনও দিনই ভালো লাগেনি, এখন বিষবৎ মনে হ'তে লাগল তা। তার ভয় হ'ত যদি কোনও লোক বদমায়েশি করে তার পকেটে তার অজ্ঞাতসারে ঘুষের টাকা ঢুকিয়ে দেয়, আর তার উপর হাকিমের কাছে নালিশ করে অপদস্থ করে তাকে, কিংবা আপিসের কাগজপত্রে নিজেই হয়তো সে এমন ভুল করে বসতে পারে যে, ওপরওলার ধারণা হবে সে দলিল জাল করতে চেষ্টা করছিল কিংবা আপিসের টাকা যদি সে হারিয়ে ফেলে কোনদিন! এর যে কোনও একটার জন্যেই তো তাকে পুলিশে হাতকড়ি লাগিয়ে ধরে নিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের নানা উদ্ভট চিন্তায় ব্যাকুল হ'য়ে থাকত সে সর্বদা। এ বিষয়ে তার উদ্ভাবনীশক্তি আর কল্পনা প্রখর থেকে প্রখরতর হ'য়ে উঠছিল ক্রমশঃ। নানারকম অলীক কল্পনা করে সে ভাববার চেষ্টা করত কি ভাবে এবং কত অপ্রত্যাশিত উপায়ে তার সম্ভ্রম এবং স্বাধীনতা বিপন্ন হ'তে পারে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমশঃই শিথিল হ'য়ে আসছিল, বই পড়তেও আর ভালো লাগত না, স্মৃতিশক্তিও ক্ষীণ হ'য়ে আসছিল।

তার বাড়ির কাছে একটা নদী ছিল। ছোট নদী। নাম খুকী। একদিন বর্ষার বানে সেই নদীতে একটি স্ত্রীলোক আর শিশুর মৃতদেহ ভেসে এল। দেখেই মনে হয় স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কেউ খুন করে ভাসিয়ে দিয়েছে। শহরে তুমুল আলোড়ন উঠল ওই মড়া দুটোকে কেন্দ্র করে। নানারকম গুজব উঠতে লাগল। পাছে লোকে চিন্ময়কেই

খুনী সন্দেহ করে তাই তাদের চোখে যেন ধুলো দেবার জন্তেই সে হাসিমুখে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল আর পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হতেই আলোচনা করতে লাগল যে, অসহায় নারী আর শিশুকে হত্যা করার মতো হীন পাপ আর নেই। হ'তে পারে না। বলতে বলতে তার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে যেত, কখনও বা লাল হ'য়ে উঠত। কিন্তু এরকম ভান করতে করতেও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল সে। অবশেষে ঠিক করলে যে, তার পক্ষে চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। এক দিন, এক রাত্রি এবং তার পরদিন সে চুপ করে বসে রইল চিলেকোঠার খালি ঘরটাতে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মতো পা টিপে টিপে ফিরে এল নিজের শোবার ঘরে। শোবার ঘরের মাঝখানে সারারাত দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকিয়ে, যেন কি শুনছে। ভোরবেলায় কলের মিস্ত্রী এল কয়েকটা। চিন্ময় ভালো করেই জানত যে, কলের মিস্ত্রী আসবে রান্নাঘরের কলটা সারাতে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হ'ল মিস্ত্রীর ছদ্মবেশে পুলিশই এসেছে। তাকে ধরবে বলে এসেছে। সে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বাড়ি থেকে জামা গায়ে না দিয়েই বেরিয়ে গেল রাস্তায়। বেরিয়েই চোঁ চাঁ দৌড়। কয়েকটা কুকুর ডাকতে ডাকতে তার পিছুতে ছুটল, কয়েকজন মানুষও। তার কানের দু'পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে হাওয়া বইছে, মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দানবীয় শক্তি একত্রিত হ'য়ে যেন তাড়া করছে তাকে।

একটু পরেই ধরা পড়ল। ধরে সবাই নিয়ে এল তাকে তার বাড়িতে। গৃহকর্ত্রী ডাক্তার ডাকলেন। এলেন হাসপাতালের ডাক্তার যামিনীভূষণ দত্ত। এসে মাথায় বরফ দিতে বললেন, ঘুমের ওষুধ দিলেন, তারপর করুণভাবে মাথা নেড়ে বললেন তাঁর আর আসবার দরকার নেই, চিন্ময়বাবু উন্মাদ হ'য়ে গেছেন। সারবেন না। ফি দিয়ে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করবার সামর্থ্যও ছিল না চিন্ময়ের, সেই জন্যে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। অনেক কষ্টে যোগাড় হ'ল একটা বিছানা, ভেনিরিয়েল ওয়ার্ডে। সমস্ত রাত ঘুমুল না চিন্ময়, সমস্ত রাত চীৎকার চেঁচামেচি করে আর কাউকে ঘুমুতেও দিলে না। ডাক্তার যামিনীভূষণ দত্ত শেষে তাকে পাঠিয়ে দিলেন অ্যানেক্সে— পাগলারা থাকে যেখানে।

এক বছর পরে চিন্ময়ের কথা আর কারো মনে রইল না। গৃহকর্ত্রী তার বইগুলো পাড়ার ছেলেদের বিলিয়ে দিলেন।

চার

আগেই বলেছি চিন্ময়ের বাঁ ধারে থাকত জিতু পাগলা আর ডান ধারে থাকত কিম্ভূতকিমাকার অদ্ভুত একটা লোক। জাতে বোধ হয় চণ্ডাল। বলিষ্ঠ বিশাল চেহারা, চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে, কিন্তু সে দৃষ্টি অর্থহীন, মুখ ভাবলেশশূন্য।

অদ্ভুত মোটা আর তাগড়া লোকটা। সর্বাঙ্গে ময়লা লেগে আছে আর গা থেকে বিকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে সর্বদা। কাছে দাঁড়ানো শক্ত।

নন্দীর কর্তব্য হচ্ছে এর দেখাশোনা করা। নন্দী এ কর্তব্য করে ঠেঙিয়ে। ভয়ানক মারে ওকে, পশুর মতো মারে, গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মারে। মারতে মারতে নিজের হাতই জখম হ'য়ে যায় অনেক সময়। মারটা ভয়াবহ তো বটেই কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ লোকটা মার খেয়ে কিছু বলে না। একটি শব্দ বেরোয় না তার মুখ থেকে, নিজেকে বাঁচাবার একটু চেষ্টাও করে না। মার খেয়ে কেবল দোলে প্রকাণ্ড একটা জালার মতো।

এই ওয়ার্ডের পঞ্চম এবং শেষ রোগীটিও এই শহরের। আগে ডাকঘরের পিয়ন ছিল। রোগা পাতলা চেহারা, মাথার চুল কটা, চোখে মুখে একটা দুষ্টু দুষ্টু ভাব। হাবভাব দেখে মনে হয় না পাগল। মনে হয় সে যেন কি একটা গোপন করতে চেষ্টা করছে। সে তার বালিশের বা তোশকের নীচে কিছু একটা লুকিয়ে রেখে দেয়। কাউকে দেখায় না। জিনিসটা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে বলে নয়, লজ্জায়। কখনও জানালার ধারে গিয়ে সকলের দিকে পিছু ফিরে নিজের বুকে কি যেন একটা ঝুলিয়ে দেয়, তারপর ঘাড় হেঁট করে চেয়ে চেয়ে দেখে সেটা। এই সময় কেউ যদি তার কাছে এসে পড়ে তৎক্ষণাৎ সেটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে বিব্রত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু ও যে কি গোপন করতে চায় তা সবাই জেনে গেছে।

নিজেই একদিন বলেছিল চিন্ময়কে, "জানেন? গভর্নমেণ্ট আমাকে দিয়েছে মেডেল একটা। সোনার মেডেল। এ মেডেল সাধারণতঃ সাহেবদের দেওয়া হয়, কিন্তু আমার কাজকর্ম দেখে আমাকেই দিয়েছে। আমি এটা প্রত্যাশাও করিনি। কেন দিয়েছে বলুন তো—"

"আমি জানি না"—চিন্ময় গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়।

"কিন্তু এর পর আমি কি হব জানেন?"

চোখ ছোট ছোট করে ধূর্তের মতো সে চেয়ে থাকে চিন্ময়ের দিকে। চিন্ময় কোন উত্তর দেয় না।

"এর পর আমি রায়বাহাদুর হব। নিশ্চয় হব। সব ঠিক হ'য়ে গেছে! রায়বাহাদুর হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু আমার এমনিতেই হবে।"

এই অ্যানেক্সের জীবন অত্যন্ত একঘেয়ে। ওই পক্ষাঘাতগ্রস্ত আর মোটা রোগীটি ছাড়া বাকী সকলে সকালবেলায় ওই দালানের মতো জায়গাটায় গিয়ে একটা কাঠের টব থেকে জল নিয়ে হাত মুখ ধোয়। গামছা তোয়ালে কিছু নেই, নিজেদের জামা-কাপড়েই হাত মুখ মুছে ফেলে। তারপর নন্দী টিনের মগে চা এনে দেয় তাদের। এক মগের বেশি কেউ পায় না। দুপুরে তারা পায় লাল চালের ভাত, একটু ডাল আর শাক-

সবজির একটা তরকারি। রাত্রেও তাই। ডাল আর শাকসবজি ওবেলারই। বাকী সময়টা তারা হয় বিছানায় শুয়ে ঘুমোয়, না হয় জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে, কেউ কেউ ঘরের চারিদিকে পায়চারি করে বেড়ায়। পোস্টাপিসের পিয়নটাও তার সেই মেডেলের আর রায়বাহাদুর হওয়ার গল্পই করে রোজ। কোনও বৈচিত্র্য নেই।

এখানে নতুন মুখ প্রায় দেখাই যায় না। ডাক্তারবাবু নতুন পাগল রোগী আর ভরতি করেন না। এই পাগলাদের দেখবার জন্যে বাইরের লোকও বড় একটা আসে না কেউ। দু'মাস অন্তর অন্তর তিনু নাপিত আসে। নন্দীর সাহায্যে সে যে কি করে ওই পাগলাদের চুল আর নখ কাটে তা অবর্ণনীয়। সদাহাস্যমুখ মাতাল তিনুকে দেখলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে সবাই।

তিনু ছাড়া বাইরের কোনও লোক অ্যানেক্সে আসে না। দিনের পর দিন ওই নন্দীর নির্জলা সঙ্গসুখ উপভোগ করতে হয় রোগীগুলোকে। সম্প্রতি অবশ্য একটা গুজব শোনা যাচ্ছে হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু নাকি নিয়মিতভাবে অ্যানেক্সে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন।

পাঁচ

গুজবটা সত্যিই অদ্ভুত।

ডাক্তার যামিনীভূষণ দত্তকে অসাধারণ লোকই বলা উচিত। প্রথম যৌবনে তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা শেষ করে কোনও মঠে বা আশ্রমে প্রবেশ করবেন। কিন্তু তাঁর বাবা বাধা দেন এতে। তিনি বড় ডাক্তার ছিলেন একজন। সার্জারিতে খুব নাম ছিল। তিনি বেঁকে দাঁড়ালেন। বললেন, তুমি যদি ওই ধর্মের বুজরুগিতে মাতো, তাহলে আমি তোমাকে ত্যাজ্য পুত্র করব। জানি না কথাটা কতদূর সত্য, কিন্তু শুনেছি যামিনীবাবু বলতেন যে, ডাক্তারীতে বা কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর রুচি ছিল না।

সে যাই হোক, ডাক্তারী পাস করবার পর তিনি কোনও মঠে বা আশ্রমে আর যাননি। তাঁর মধ্যে বিশেষ কোন ধর্মের ভড়ংও দেখা যেত না। বাইরে থেকে অনাড়ম্বর সাদাসিধে মানুষই মনে হ'ত তাঁকে।

কিন্তু তাঁর চেহারাটা ছিল একটু অদ্ভুত। ছিমছাম ভদ্রলোকের মতো নয়। বলিষ্ঠ গঠন চাষার মতন ছিলেন অনেকটা। তাঁর প্রকাণ্ড মুখ, তাঁর দাঁড়ি, তাঁর মাথার খাড়া খাড়া চুল, তাঁর বলিষ্ঠ গঠন, লম্বা লম্বা হাত পা—না, তাঁকে ডাক্তার বলে মনে হ'ত না। মনে হ'ত কোন হোটেলের মালিক বুঝি। সুপুষ্ট দেহ, মুখের ভাবে একটা একগুঁয়েমি আর জেদ, কোমলতার লেশমাত্র নেই। তাঁর সমস্ত মুখে অসংখ্য ছোট ছোট শিরার জাল থাকাতে আরও ভয়ঙ্কর দেখাত। চোখ দুটি ছোট ছোট্ট। নাকের ডগা লাল।

বেশ লম্বা লোক। বৃষস্কন্ধ, ব্যূঢ়োরস্ক। আজানুলম্বিত বাহু, হাতের থাবা দুটো প্রকাণ্ড। মনে হয় এক ঘুসি মারলে একটা ষাঁড়ও বোধ হয় ঘুরে পড়ে যাবে।

কিন্তু ডাক্তার দত্ত যখন হাঁটেন, তখন খুব সাবধানে হাঁটেন, পায়ের শব্দ হয় না। অনেকটা বিড়ালের হাঁটার মতো। চলতে চলতে যদি কারো সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে পড়েন তাহলে তিনি নিজেই আগে থেকে একটু পাশ কাটিয়ে বলেন, 'সরি'। তাঁর চেহারা দেখে মনে হয় তাঁর গলার স্বরও বুঝি খুব জোরালো হবে। কিন্তু তা নয়, খুব কোমল কণ্ঠ, বাঁশীর মতো। তাঁর ঘাড়ের একধারে একটা আঁব আছে। তাই তিনি শক্ত কলার পরতে পারেন না, নরম কলারের সুতোর কামিজই পরে বেড়ান। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও ডাক্তারের মতো নয় ঠিক। একটা স্যুট তাঁর দশ বছর যায়। তাঁর আর একটা স্বভাব, নূতন স্যুট করান না। যখন দরকার হয় পুরোনো জামাকাপড়ের দোকান থেকে কেনেন। তাই স্যুট যখন বদলানও, তখনও মনে হয় পুরোনো স্যুটই পরে আছেন। তিনি ওই এক স্যুট পরেই রোগী দেখেন, খাবার খান, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িও যান। কৃপণতার জন্য যে এসব করেন তা নয়—ওই স্বভাব—নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন।

যামিনীবাবু যখন ডাক্তারখানার চার্জ নিয়ে আসেন তখন হাসপাতালের অবস্থা ভয়াবহ ছিল। দুর্গন্ধের চোটে ওয়ার্ডে, বারান্দায় এমন কি হাসপাতালের বাইরের উঠোনেও দাঁড়ান যেত না। হাসপাতালের নার্সরা, চাকররা সপরিবারে ওই হাসপাতালেই বাস করত রোগীদের সঙ্গে। আরশোলা, ছারপোকা আর ইঁদুরের রাজত্ব ছিল হাসপাতালে। অপারেশন করলেই সেপ্‌টিক হ'য়ে যেত। এখন বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যিই তখন হাসপাতালে দুটির বেশি ছুরি ছিল না। থার্মোমিটার ছিলই না মোটে। রোগীদের স্নান করবার বাথটবে আলু রাখা হ'ত। হাসপাতালের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট, মেট্রন, আর কম্পাউণ্ডাররা রোগীদের খাবার চুরি করত। যামিনীবাবুর আগে যে বুড়ো ডাক্তারবাবুটি ছিলেন তিনি হাসপাতালের ওষুধপত্র—বিশেষ করে স্পিরিট আর ব্রাণ্ডি—বিক্রি করতেন। চরিত্রও খুব খারাপ ছিল তাঁর। হাসপাতালের নার্স, এমন কি রোগিণীদের নিয়েও বদনাম ছিল খুব। শহরের সবাই এসব জানত, এসব নিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে গালগল্পও জমত অনেক আড্ডায়—কিন্তু কেউই এর উন্নতির জন্য মাথা ঘামাত না। অনেকে বলত—গরীব-গুর্বোদের জন্য হাসপাতাল আর কত ভালো হবে, ওদের বাড়িতে যা অবস্থা তার চেয়ে তো ভালো। ওদের কি ছানা মাখন খাওয়াতে হবে? কারো কারো মত ছিল ওপরওলা গভর্নমেণ্ট সাহায্য না করলে ভালো হাসপাতাল হবে কি করে। গভর্নমেণ্ট দয়া করে যতটুকু দিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু ওপরওলা গভর্নমেণ্ট এদিকে আর নজর দেননি। দেওয়া দরকারও মনে করেন নি। একটা হাসপাতাল যখন আছে আর তাতেই যখন চলে যাচ্ছে তখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামানো কেন।

যামিনীবাবু প্রথমে যখন হাসপাতালে আসেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল, এর আগাগোড়া সবই দুর্নীতিতে ভরতি। এখানে রোগীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি তো'হবেই না, ক্ষতিই হবে বরং। তাঁর মনে হয়েছিল রোগীদের বিদায় করে দিয়ে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়াটাই সুবুদ্ধির কাজ হবে। কিন্তু পরে তিনি ভেবে দেখলেন, তিনি ইচ্ছে করলেই এ পাপ দূর হবে না, কোনও উপকারও হবে না। দৈহিক এবং নৈতিক জঞ্জালগুলো যদি এক জায়গা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা যায় তাহলে আর এক জায়গায় গিয়ে জমবে সেগুলো। ওগুলো যতক্ষণ না আপনা থেকে যাচ্ছে ততক্ষণ ওদের হাত থেকে নিস্তার নেই। এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া লোকে যখন এই রকম একটা হাসপাতাল খুলেছে আর তার নামে অনুষ্ঠিত অনাচারগুলো সহ্য করছে, তখন মেনে নিতে হবে এইই ওরা চায়। অন্ধ কুসংস্কার আর দৈনন্দিন এই সব নোংরামি ওদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কালক্রমে এই জিনিসই ভালো জিনিসে পরিণত হবে, ভালো ফসল ফলাবে, গোবর পচে যেমন জমি উর্বরা হয়। পৃথিবীতে বোধ হয় এমন ভালো জিনিস কমই আছে যার আদিম উৎস মন্দ জিনিস নয়।

যামিনীবাবু যখন কাজ আরম্ভ করলেন তখন হাসপাতালের বিশৃঙ্খলা, দুরবস্থা প্রভৃতি নিয়ে বেশি হৈ চৈ করেন নি। তিনি কেবল নার্স আর হাসপাতালের চাকরদের বললেন, হাসপাতালের ওয়ার্ডে রাত্রিবাস করা চলবে না। আর সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি রাখবার জন্য গোটা দুই আলমারি কিনলেন। আর সব যেমন ছিল তেমনি রইল। সেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সেই মেট্রন, সেই সেপ্‌টিক হওয়া—কিছু বদলালো না।

মনে মনে যামিনীবাবু যুক্তি এবং সততার খুব পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সেই যুক্তি এবং সততাকে নিজের চারিদিকে মূর্ত করতে হ'লে যে চরিত্রবল থাকা দরকার, তা তাঁর ছিল না। এমন কি নিজের ক্ষমতার উপর, নিজের কর্তৃত্বের উপর আস্থা ছিল না তাঁর। তাই মনে মনে যে সাধুতা আর যুক্তির তিনি ভক্ত ছিলেন নিজের কর্মজীবনে তা গড়ে তুলতে পারতেন না। তিনি কাউকে হুকুম করতে পারতেন না, জোর করে কোন অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারতেন না, এমন কি—এটা হোক, এটা করতেই হবে—এ কথাও তিনি জোর করে বলতে পারতেন না কাউকে। চড়া গলায় কোন কিছু বলা যেন অসম্ভবই ছিল তাঁর পক্ষে। হুকুমই করতে পারতেন না—"ওটা দাও", "ওটা নিয়ে এস"—এ ধরনের কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না। যখন ক্ষিধে পেত তখন রাঁধুনীর কাছে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে একটু কেশে বলতেন—"একটু চা খেলে মন্দ হ'ত না" কিংবা "খাওয়ার কত দূর"।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁর চোখের সামনে চুরি করত, বাইরের ভ্যাগাবণ্ডের দল হাসপাতালে এসে ঘুরে বেড়াত—তিনি কিছু বলতে পারতেন না। বলার ক্ষমতাই ছিল না তাঁর। যখন কেউ তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলত, কিংবা তাঁর খোশামোদ করত, কিংবা মিথ্যা ভাউচারে সই করতে বলত তখন নিজেই তিনি লজ্জায় লাল হয়ে উঠতেন এবং

মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলেও সুড়সুড় করে সই করে দিতেন। রোগীরা যখন তাঁর কাছে নালিশ করত যে, তারা ক্ষিধের সময় খাবার পায় না, নার্স'রা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তখন মহাবিপদে পড়ে যেতেন তিনি। আমতা আমতা করে মৃদুকণ্ঠে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলতেন খালি—"আচ্ছা, আমি দেখব। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে—"

প্রথম প্রথম যামিনীবাবু খুব উৎসাহ সহকারে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বেলা বারোটা পর্যন্ত রোগী দেখতেন, অপারেশন করতেন, এমন কি প্রসূতি-বিভাগেও যেতেন মাঝে মাঝে। মেয়েরা তাঁর খুব সুখ্যাতি করত। তিনি যত্ন করে দেখতেন, ভালো ডায়াগ্‌নোসিস করতেন, চিকিৎসাও করতেন অদ্ভুত। বিশেষতঃ, মেয়েদের আর শিশুদের চিকিৎসায় খুব নামডাক হয়েছিল তাঁর। কিন্তু কিছুদিন পরে সব যেন মিইয়ে গেল। একঘেয়ে কাজ করতে করতে আর চারিদিকের অনিবার্য দুর্নীতি আর অপটুতা দেখতে দেখতে কেমন যেন মন-মরা হ'য়ে গেলেন ভদ্রলোক। আজ ত্রিশটা রোগী দেখলেন, তার পরদিন পঁয়ত্রিশ জন এল, তার পরদিন চল্লিশ। শহরে মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে। তার নতুন রোগীও। আউটডোরে বসে দুঘণ্টায় চল্লিশ জন রোগীর চিকিৎসা করা অসম্ভব। চিকিৎসার নামে প্রতারণা করতে হয়। যেমন ভাবেই হিসাব করুন, ওই দাঁড়ায়। বছরে যদি বারো হাজার রোগী আউটডোরে দেখা হয়, তার অর্থ বারো হাজার স্ত্রী-পুরুষকে ঠকানো হয়েছে। শক্ত রোগীদের হাসপাতালে ভরতি করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও সম্ভব নয়, যদিও আইন-কানুনের অভাব নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের অভাব আছে। বিজ্ঞান বাদ দিয়েও যদি অন্ধভাবে কেবল আইন-কানুন মেনে চলা যায়—যেমন অন্যান্য ডাক্তারেরা সাধারণতঃ করে—তাহলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, পুষ্টিকর খাবার, সচ্চরিত্র অ্যাসিস্টাণ্ট, এসব থাকা দরকার, কিন্তু যা আছে তা পরিচ্ছন্নতা নয়—জঞ্জাল, পুষ্টিকর খাদ্য নয়—শাকসিদ্ধ, সচ্চরিত্র লোক নয়—চোর।

তাছাড়া যামিনীবাবুর মনে হ'ত মরাই যখন পৃথিবীর নিয়ম তখন কি হবে এদের বাঁচিয়ে? একটা দোকানদার বা কেরানীর জীবনের মেয়াদ পাঁচ বা দশ বছর বাড়িয়ে লাভ কি! যদি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয় মানুষের যন্ত্রণা লাঘব করা তাহলে প্রশ্ন ওঠে যন্ত্রণা লাঘব করে কি হবে? প্রথমতঃ, লোকে বলে যে, কষ্টই মানুষের উন্নতির সোপান, দ্বিতীয়তঃ, যদি একটা বড়ি বা এক দাগ ওষুধ খেয়ে কারো কষ্ট কমে যায় তাহলে এতকাল যে ভগবানকে ডেকে বা যে ধর্মকে আঁকড়ে ধরে লোকে সান্ত্বনা বা সুখ পেত তা কি আর পাবে? লোকে ভগবানকে, ধর্মকে ভুলে যাবে। পৃথিবীর কত মহাপুরুষ রোগের যন্ত্রণায় জীবনে অসীম কষ্ট পেয়েছেন, মৃত্যুশয্যাতেও তাঁদের কষ্টের অবধি ছিল না। রামা শ্যামা যদুর তুচ্ছ জীবনের জন্য আমাদের অত মাথাব্যথায় দরকার কি তাহলে? কষ্টে পড়লেই এরা বরং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করবে। এদের অহরহ তোয়াজ করলে এরা তো পশুত্বের স্তরে নেমে যাবে!

এই সব ভেবে-চিন্তে যামিনীবাবু আর হাসপাতালে কাজ করার উৎসাহ পেলেন না। রোজ হাসপাতালে যাওয়া ছেড়েই দিলেন তিনি।

ছয়

তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম এই হ'য়ে দাঁড়াল।

সকাল প্রায় আটটা নাগাদ উঠতেন। উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেতেন। তারপর নিজের লাইব্রেরীতে বসে পড়তেন খানিকক্ষণ। কোনও কোনও দিন হাসপাতালেও চলে যেতেন। গিয়ে দেখতেন হাসপাতালের সরু বারান্দায় আউটডোর রোগীর ভিড়, ভরতি হ'তে চায় অনেকেই। হাসপাতালের পুরুষ এবং স্ত্রীলোক অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে জুতো খট্‌খটিয়ে। হাসপাতালের জীর্ণশীর্ণ ইন্‌ডোর রোগীরা লম্বা গাউন গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্ততঃ, মড়া পড়ে আছে কোথাও, বিষ্ঠার পাত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেথররা, ছেলে-মেয়েরা চীৎকার করছে, আর সবার উপর দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া বইছে বারান্দার উপর। এ পারিপার্শ্বিক যে রোগীদের পক্ষে অনুকূল নয়, বিশেষ করে যক্ষ্মা আর জরগ্রস্ত রোগীদের পক্ষে যে নয়, তা তিনি বুঝতেন, কিন্তু করবেন কি! তাঁর ঘরে তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডাক্তার ঘোষাল তাঁকে দেখলেই নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেন। ডাক্তার বিশ্বম্ভর ঘোষাল মোটাসোটা বেঁটেখাটো গোল-গাল লোক। পরিষ্কার কামানো মুখটিতে ভদ্রতার ছাপ। ঢিলে-ঢালা নূতন স্যুটে তাঁকে ডাক্তার মনে হ'ত না, মনে হ'ত বুঝি কোনও সেনেটার। শহরে তাঁর খুব প্র্যাকটিস। তাঁর টাইটি শাদা এবং তাঁর ধারণা প্র্যাকটিস-হীন যামিনীবাবুর চেয়ে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান অনেক বেশী। ঘরে দুখানি ছবি টাঙানো। একটি রায়বাহাদুর শিবশঙ্কর চৌধুরীর। তিনি পূর্বে এই হাসপাতালের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। আর একটি পার্লামেণ্টের ছবি। ডাক্তার ঘোষাল একটি কালীর পটও টাঙিয়ে রেখেছিলেন একধারে। রাউণ্ডে বেরুবার আগে প্রণাম করে যেতেন।

রোগী অনেক, সময় অল্প। সুতরাং দু' একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই ডাক্তারবাবুকে যাহোক একটা ব্যবস্থা করতে হ'ত। ক্যাস্টর অয়েল, কুইনিন মিকশ্চার, মালিশ আর মলম—এই সবই দিতেন সাধারণতঃ। যামিনীবাবু সাধারণতঃ বাঁ হাতটা বাঁ গালের উপর দিয়ে টেবিলে ভর দিয়ে বসতেন, অন্যমনস্কভাবে রোগীদের প্রশ্ন করতেন এবং যন্ত্রচালিত-বৎ ব্যবস্থা করে যেতেন। ডাক্তার ঘোষালও বসে থাকতেন এবং হাত দুটো কচলাতে কচলাতে ফোড়ন দিতেন মাঝে মাঝে।

"আসল ব্যাপার কি জানেন, আমাদের ভগবানে বিশ্বাস চলে গেছে, তাই এতো কষ্ট, তাই এতো রোগ।"

ডাক্তার দত্ত অপারেশন করতেন না। অনেকদিন অপারেশন না করে অপারেশন করার অভ্যাসটাই চলে গিয়েছিল। এখন রক্ত দেখলেও বিচলিত হয়ে পড়েন।

সামান্যতেই বিচলিত হন আজকাল। কোনও শিশুর গলা পরীক্ষা করবার সময় যদি ছেলেটা চেঁচামেচি করত বা হাত-পা ছুঁড়ত তাহলে তাঁর মাথা ঘুরত, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ত, তিনি তাঁর মাকে বলতেন সরিয়ে নিয়ে যেতে। এমনি একটা প্রেসকৃপ্‌সন করে দিতেন।

রোগীদের ভীরুতা আর মূর্খতা দেখে দেখে, ধর্মপ্রাণ ডাক্তার ঘোষালের টিপ্পনী শুনে শুনে, ঘরের ওই ছবিগুলোর উপর রোজ চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে আর তাঁর নিজের অন্তরের প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে (এসব প্রশ্ন গত কুড়ি বছর ধরে ক্রমাগত তাঁর মনে জাগছে) ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। পাঁচ ছ'টা রোগী দেখেই উঠে পড়তেন, বাকী-গুলো সামলাতেন ডাক্তার ঘোষাল।

তাঁর যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস নেই, বাড়িতে যে রোগীর দল তাঁকে বিরক্ত করতে আসবে না—এই মনোরম চিন্তায় মশগুল হ'য়ে বাড়ি গিয়েই বই নিয়ে বসে যেতেন। তিনি পড়তেন প্রচুর এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। তিনি যা মাইনে পেতেন তার অর্ধেক যেত বই কিনতে। তাঁর দুখানি ঘরের তিনটিই বইয়ে ঠাসা। নানারকম বই, নানারকম মাসিকপত্র। ইতিহাস এবং দর্শনের বইই বেশী পড়েন তিনি। ডাক্তারী কাগজ একটা নেন বটে, কিন্তু ভালো করে পড়েন না। যখন পড়েন তখন শেষ থেকে পড়েন। অক্লান্তভাবে অনেকক্ষণ তিনি পড়তে পারেন। চিন্ময় সান্যাল যেমন আবেগের সঙ্গে পড়ত সে-আবেগ অবশ্য ডাক্তার দত্তের ছিল না। তিনি ধীরে সুস্থে ভেবে-চিন্তে আস্তে আস্তে পড়তেন। অনেক জায়গা দুবার তিনবার করে পড়তেন, হয় ভালো লাগত বলে, না হয় দুর্বোধ্য বলে। পাশে থাকত ব্র্যাণ্ডির গ্লাস আর কিছু শশা কুঁচোনো। পড়তে পড়তে, বই থেকে চোখ না তুলেই, মাঝে মাঝে এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি বা এক-আধ টুকরো শশা খেতেন। শশার বদলে কখনও আপেল।

দুটোর পর চেয়ার থেকে উঠতেন, তারপর রান্নাঘরে সন্তর্পণে গিয়ে উঁকি মেরে একটু কেশে বলতেন, "পাঁচির মা, রান্নার আর কত দেরি?" পাঁচির মা যা রাঁধত তা অখাদ্য। কিন্তু তাই নির্বিবাদে খেয়ে নিতেন ডাক্তারবাবু। খাওয়ার পর দুই বগলে দুই হাত দিয়ে নিজের ঘরেই ঘুরে বেড়াতেন তিনি। চিন্তা করতেন। ঘড়িতে চারটে বাজত, পাঁচটা বাজত, যামিনীবাবু ভ্রূক্ষেপ করতেন না। চিন্তা করতেন আর ঘুরে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে পাঁচির মায়ের ঝাঁকড়া-চুল-ভরা মাথা দেখা যেত।

"চা করে দেব?"

"এখন নয়, আর একটু পরে—। বেশী নয়, একটু পরে—"

সন্ধ্যার সময় আসতেন পোস্ট মাস্টার সতীশবাবু। শহরের মধ্যে ইনিই একমাত্র লোক যাঁর সঙ্গ ডাক্তারবাবু পছন্দ করতেন। সতীশবাবু এককালে বেশ বড়লোক ছিলেন, অনেক জমিজায়গা ছিল, গালার ব্যবসা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই রাখতে পারেন নি। শেষে এক সাহেবের দয়ায় এই চাকরিটি পেয়েছেন। বুড়ো বয়সে সাধারণতঃ এ চাকরি

কেউ পায় না। সতীশবাবু রোগা বা খেঁকুরে প্রকৃতির লোক নন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং হাসিখুশী। পাকা গোঁফ জোড়াটি তো দেখবার মতো। তাঁর আচরণও বেশ ভদ্র। একটু চেঁচিয়ে কথা বলেন, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে না। একটু অভিমানী, কিন্তু বদরাগী নন। পোস্টাপিসে কোনও লোক কোনও ব্যাপার নিয়ে হাল্লা করলে সতীশবাবুর মুখ-চোখ লাল হ'য়ে যায়, তিনি কাঁপতে থাকেন এবং চিৎকার করে ওঠেন, "চুপ করুন।" সুতরাং অনেকেই তাঁকে ভয় খায়। সতীশবাবু সাধারণ লোকদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না, কিন্তু ডাক্তার যামিনী দত্তকে খুব খাতির করেন। তিনি বলেন, শহরের মধ্যে উনিই একমাত্র লোক যাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি মেধা।

"এই যে আমি এসে গেছি ডাক্তার সাহেব"—এই বলে চীৎকার করে রোজ ঢোকেন তিনি। "কেমন আছেন? আমি রোজ রোজ আসি, বিরক্ত হন না তো?"

"আরে না, না। কি যে বলেন"—বলে ওঠেন যামিনীবাবু—"আপনি কি জানেন না, আপনি এলে কত খুশী হই। আসুন, বসুন।"

দুই বন্ধুতে সোফায় বসে সিগারেট ধরাতেন। নীরবেই ধূমপান চলত খানিকক্ষণ।

"পাঁচির মা, এবার একটু চা হ'লে কেমন হয়?"

পাঁচির মা দু'পেয়ালা চা দিয়ে যায় একটু পরে। চা-টাও দুজনে নীরবে খান। যামিনীবাবুকে একটু চিন্তিত মনে হয়। কিন্তু সতীশবাবুর মুখ আনন্দ-দীপ্ত, মনে হয় তিনি যেন একটা মজার সংবাদ এনেছেন।

যামিনীবাবুই সাধারণতঃ প্রথমে আলাপ শুরু করেন। খুব শান্তভাবে আস্তে আস্তে সতীশবাবুর মুখের দিকে না চেয়ে (তিনি কারও মুখের দিকে তাকান না) বলতে আরম্ভ করেন তিনি।

"এটা কি খুবই দুঃখের কথা নয় সতীশবাবু যে, এই শহরে এমন একটি লোক নেই, যার সঙ্গে সদালাপ করা যায়? সদালাপ করবার যোগ্যতাই কারো নেই। মনে হয় যেন উপবাস করছি। শহরের যাঁরা ছাপ-মারা শিক্ষিত লোক, তাঁরাও তুচ্ছতার উপরে উঠতে পারেন না। মনে হয় তাঁদের মনের গঠন আর তথাকথিত অশিক্ষিত ছোটলোকদের মনের গঠন এক। কোনও তফাত তো দেখি না?"

"ঠিক বলেছেন। আমারও তাই মত।"

ডাক্তারবাবু শান্ত অনুচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পৃথিবীতে মানুষের মনের উন্নত আধ্যাত্মিক বিকাশ ছাড়া বাকী সব তুচ্ছ, অর্থহীন। মানসিক বিকাশের মানদণ্ড দিয়েই আমরা ঠিক করি—সে মানুষ না পশু। মানুষের মধ্যে আমরা দেবত্বের আভাস পাই, যে অমৃতকে আমরা ধারণার মধ্যে আনতে পারি না তারও ইঙ্গিত মানুষের মধ্যেই আমরা পেয়ে থাকি। এর থেকে এইটুকু বলা যায় যে, মানুষের মনই আনন্দের উৎস! কিন্তু সে-মনের পরিচয় তো এখানে কোথাও পাই না, তাই বোধহয় আমরা সবাই নিরানন্দ হ'য়ে আছি। বই অবশ্য আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত

আলাপ-পরিচয়, ব্যক্তিগত মনের স্পর্শ আলাদা জিনিস। একটা উপমাতে যদি আপনি আপত্তি না করেন তাহলে বলব বই হচ্ছে—গানের ছাপা স্বরলিপি এবং ব্যক্তিগত আলাপ হচ্ছে সত্যিকার গান।"

"ঠিক বলেছেন—"

এর পর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন দুজনেই। পাঁচির মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দ্বারের পাশে দাঁড়ায়, আর গালে হাত দিয়ে অবাক হ'য়ে এঁদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করে। একটু পরে সতীশবাবু চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত করে বলেন, "আজকাল কি মানুষের মন বলে কিছু আছে মনে করেন?"

এর পর তিনি অতীত কালের আলোচনা আরম্ভ করেন। "সেকালে কি সব লোক ছিল! বলিষ্ঠ, সবল, জীবন্ত। শিক্ষিত লোকেরা তখন সত্যিই মানী লোক ছিলেন, তাঁদের নিজেদেরও মান ছিল, তাঁরা অপরের মানও রাখতে জানতেন। বন্ধুত্বকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন তাঁরা। তাঁরা টাকা ধার দিতেন কিন্তু তার জন্যে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিতেন না, দুঃস্থ বন্ধুকে সাহায্য করা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করতেন তাঁরা। তাছাড়া সেকালের লোকেরা কত পরিশ্রম করতেন, কি খেতেন, দোল-দুর্গোৎসবে কি খরচ করতেন! সেকালের মেয়েরাই বা কি ছিল। এক হাতে কি অসাধ্যসাধনই না করতেন তাঁরা। খেতেও পারতেন খুব। আধসের চালের ভাত তো সাধারণ খোরাক ছিল সকলের। তদুপযুক্ত ডাল-তরকারি। আমার বন্ধু সনাতনের দিদিমা ভরপেট খাওয়ার পর আড়াই সের ক্ষীর খেতে পারতেন। একটা বড় জামবাটি ভরতি ক্ষীর—"

"ওমা, বলে কি!"—

পাঁচির মা আড়াল থেকে মন্তব্য করে।

যামিনীবাবু অন্যমনস্ক হ'য়ে শুনে যান, কথাগুলো ঠিক তাঁর মর্মে প্রবেশ করে না। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস ভাবতে থাকেন তিনি।

"মাঝে মাঝে আমি বুদ্ধিমান লোকের স্বপ্ন দেখি, বুঝলেন, এবং কল্পনায় তাদের সঙ্গে আলাপও করি"—হঠাৎ বলে ওঠেন যামিনীবাবু সতীশবাবুর কথার মাঝখানেই—"বাবা আমাকে ভালো কলেজে ভালো শিক্ষাই দিয়েছিলেন, কিন্তু সেকালের কেমন একটা কুসংস্কার ছিল,—কুসংস্কারই বলতে হবে একে—যে ডাক্তার হলেই বুঝি সব দুঃখ ঘুচে যাবে, তাই আমাকে জোর করে তিনি ডাক্তারী পড়তে পাঠিয়েছিলেন। তা না হ'লে আমি আজ নিশ্চয়ই দেশের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করতাম, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটার হতাম, কিংবা ওই ধরনের একটা কিছু।

এটা অবশ্যই ঠিক যে, পৃথিবীতে সবই ক্ষণস্থায়ী, মানুষের মনও মরে যায়, চিন্তাধারাও লুপ্ত হয়। কিন্তু তবু আমি মনকে প্রাধান্য দিয়েছি, কেন দিয়েছি তা আগেই বলেছি আপনাকে। আমাদের জীবন একটা জঘন্য ফাঁদ বই তো আর কিছু নয়। একজন বুদ্ধিমান লোক কিছুদিন পরেই বুঝতে পারে—লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার দাসখৎ

লিখে নিয়েছে হায়! এর থেকে পালাবার কোন উপায় নেই। আর সব-চেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে, এ ফাঁদে সে ইচ্ছা করে পা দেয় না। অজানা কোন যোগাযোগের ফলে অদৃশ্য থেকে হঠাৎ জন্ম হয় তার। কেন হয়? জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য কি জানবার জন্য সে যদি চেষ্টা করে, কোনও সদুত্তর পায় না, যা পায় তা হয় ধাঁধা, না হয় ভাঁওতা। দ্বারে দ্বারে সে আঘাত করে বেড়ায়, কিন্তু কোনও দ্বারই খোলে না। তারপর এক দিন মৃত্যু এসে হাজির হয়, তাও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। একই রকম দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে জেলের কয়েদীরা যেমন একত্র হ'তে পারলে সুখী হয়, তেমনি যারা চিন্তাশীল, যারা বিশ্লেষণপটু, যারা জাগতিক ব্যাপারের দক্ষ দর্শক তারা পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে এবং আলাপ-আলোচনা করে সুখ পায়। আলোচনা করে তারা অনেক সময়েই ভুলে যায় যে, তারা একটা জটিল ফাঁদে আটকে পড়েছে, উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেই জীবনের দিন ক'টা সুখে কাটিয়ে দেয়। এই দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষিত মনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কারণ মানুষের জীবনে মনই আনন্দেরই স্রষ্টা এবং ভোক্তা।"

"ঠিক বলেছেন—"

সতীশবাবুর চোখের দিকে না চেয়ে যামিনীবাবু মৃদু শান্তকণ্ঠে একটু ইতস্ততঃ করে বলে চলেন, বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে আলাপ করলে কি আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দের গভীরতা কত দূর আর সতীশবাবু নিবিষ্টভাবে তাঁর কথা শোনেন আর মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, "ঠিক বলেছেন—"

হঠাৎ সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "আত্মার অমরত্বে কি আপনার বিশ্বাস নেই?"

"না, মাস্টার মশাই, নেই। বিশ্বাস করবার কোনও হেতু আমি দেখতে পাই না।"

"সত্যি কথা বলতে কি, আমিও পাই না। কিন্তু মনে মনে কেমন একটা বিশ্বাস আছে যে, আমি মরব না। মাঝে মাঝে নিজেকেই জিজ্ঞেস করি—কি রে, এবার তো মরবার সময় হ'ল, এবার তৈরী হয়ে নে। কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন বলে, ও সব বিশ্বাস করিস না, তুই মরবি না।"

ন'টার পর সতীশবাবু উঠে পড়েন। যাবার আগে ওভার কোটটা গায়ে দিতে দিতে বলেন, "ভাগ্য আমাদের গভীর গাড্ডায় ফেলেছে বুঝলেন। এখান থেকে আর বেরোবার উপায় নেই। এখানেই মরতে হবে।"

সাত

সতীশবাবু চলে যাওয়ার পর আবার বই নিয়ে বসতেন ডাক্তার দত্ত। নীরব নিথর রাত্রি, মনে হচ্ছে সময় নিঃশব্দ গতিতে যেন এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারবাবুর পাশে আর তাঁর পড়া দেখছে। পৃথিবীতে যেন ওই বইটি আর ওই সবুজ শেড দেওয়া আলোটি

ছাড়া আর কিছু নেই। মানব-মনের বিচিত্র সংস্পর্শে তাঁর পরুষ মুখভাব ধীরে ধীরে প্রেম শ্রদ্ধায় স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। তিনি ভাবেন মানুষ অমর হয়নি কেন? মানুষের এই রহস্যময় মস্তিষ্ক, চোখের দৃষ্টি, বাচনভঙ্গী, আত্ম-উপলব্ধি, প্রতিভা এসব—যদি শেষ পর্যন্ত সব শেষ হ'য়ে চিতার আগুনে পুড়ে যায়, তারপর সেই ভস্মরাশি পঞ্চভূতে বিলীন হ'য়ে কোটি কোটি বৎসর ধরে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে তাহলে সে সবের কি কোন অর্থ নেই? সবই উদ্দেশ্যহীন? সবই নিরর্থক? অজানা মহাশূন্য থেকে মানুষের মতন এমন বিরাট বিচিত্র সত্তা সৃষ্টি করে তারপর তাকে এমন ভস্মস্তূপে পরিণত করা কি একটা অদ্ভুত পরিহাস নয়?

রাসায়নিক পরিবর্তন! অমরত্বের বদলে এই নিয়ে এক মূর্খ ছাড়া আর কি কেউ সান্ত্বনা পেতে পারে? হীনতম মানুষের মধ্যেও কিছু জ্ঞান, কিছু ইচ্ছাশক্তি থাকে, কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন সৃষ্টির যে-স্তরে হয় সেখানে কি জ্ঞানের কোনও স্থান আছে? কেবল যারা ভীরু বা মূর্খ, যারা মৃত্যুভয়ে ভীত, যাদের আত্মসম্মান নেই, তারাই এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করবার চেষ্টা করে যে, মৃত্যুর পর তারা ঘাসের পাতায়, পাথরে বা কোনও ব্যাঙের মধ্যে আবার নবজীবন যাপন করবে। রাসায়নিক পরিবর্তনে অমরত্ব কল্পনা করা একটা বেহালা ভেঙে নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার পর তার বাক্সটার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কল্পনা করার মতো হাস্যকর।

প্রত্যেকবার ঘড়ি বাজলেই যামিনীবাবু চোখ বুজে ইজিচেয়ারে আরও ভাল করে ঠেস দিয়ে বসেন এবং খানিকক্ষণ নিজের চিন্তাধারাকে ঘনীভূত করবার চেষ্টা করেন। যে-বইটি পড়ছিলেন তারই আলোকে তিনি নিজের জীবনের অতীত এবং ভবিষ্যত বিশ্লেষণ করেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই করেন। অতীতের কথা মনে হলেই তাঁর অন্তরের জুগুপ্সা জেগে ওঠে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করতেই প্রবৃত্তি হয় না তাঁর। আর বর্তমানও তো অতীতেরই মতো। তিনি অনুভব করেন, তাঁর বর্তমান চিন্তাধারা যখন ক্রমশঃ-শীতল পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করছে, কাছেই হাসপাতালে কত লোক রোগে কষ্ট পাচ্ছে, আবর্জনায় লুটোচ্ছে, কেউ হয়তো জেগে আছে, কেউ হয়তো ছারপোকা মারছে, কারও ঘা হয়তো দূষিত হ'য়ে গেছে, কেউ হয়তো টাইট ব্যাণ্ডেজের যন্ত্রণায় চীৎকার করছে, কেউ হয়তো তাস খেলছে, কেউ বা নার্সদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মদ খাচ্ছে। গত বছর বারো হাজার লোক প্রতারিত হয়েছে। সমস্ত হাসপাতালটাই চুরি, ঝগড়া, গুজব, পক্ষপাতিত্ব আর নির্লজ্জ হাতুড়ে ডাক্তারদের আড্ডা। কুড়ি বছর আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে, মানুষের স্বাস্থ্য-লাভের মূর্তিমতী বাধা। যামিনীবাবু জানেন যে, ছ'নম্বর ওয়ার্ডে নন্দী রোগীদের ঠেঙায় আর জিতু রোজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শহরে ভিক্ষা করে।

এ-ও তিনি জানেন যে, গত পঁচিশ বছরের মধ্যে ডাক্তারী বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আশ্চর্যজনক উন্নতি। যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন তখন তাঁর মনে হ'ত

যে, পুরাকালে অ্যালোপ্যাথি আর মেটাফিজিক্সের যা পরিণতি হয়েছিল ডাক্তারী-শাস্ত্রেরও বোধহয় তাই হবে, কিন্তু এখন তাঁর সে-ধারণা বদলেছে। রাত্রে ডাক্তারী বই আর মাসিকপত্র পড়তে পড়তে তিনি বিস্ময়ে আর আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়েন। কি অপ্রত্যাশিত উন্নতি, আগে কল্পনাও করা যেত না। আগে যে-সব অপারেশন করলে মৃত্যু অবধারিত ছিল, আজকাল অ্যান্‌টিসেপ্‌টিক ওষুধের কল্যাণে তা করা কত সহজ হ'য়ে গেছে। সাধারণ ডাক্তাররা আজকাল অ্যাম্‌পুটেশন করছে, হাঁটুর উপর অপারেশন আজকাল আকছার করছে সবাই। মৃত্যুসংখ্যাও খুব কম। কথায় কথায় পেট কাটা হচ্ছে, চোখের অপারেশন হচ্ছে। সিফিলিস সম্পূর্ণরূপে সেরে যাচ্ছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা বিভাগে নিত্য নূতন আবিষ্কারে সেকালের অন্ধকার আর নেই. আলোকিত হ'য়ে গেছে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শুধু দৈহিক অসুখ নয়, মানসিক অসুখের ক্ষেত্রেও যুগান্তর এসেছে। নূতন ধরনের চিকিৎসা, রোগনির্ণয়ের নূতন নূতন পদ্ধতি যেন পর্বতের মতো উঠেছে অতীতের সমতলক্ষেত্রের উপর। মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে বা স্ট্রেট জ্যাকেট পরিয়ে আজকাল পাগলাদের চিকিৎসা করা হয় না। তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা হয়। এও তিনি পড়েছেন যে, তাদের জন্য থিয়েটার. নাচ এইসবের ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু এসব কেতাবে পড়ে তো লাভ নেই। কাপ্তেনগঞ্জ হাসপাতালে ছ'নম্বর ওয়ার্ডের রোগীরা আগেও যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরেই আছে। আধুনিক যুগে একটা মূর্তিমান বিদ্রূপ যেন! এ সম্ভব হয়েছে, কারণ কাপ্তেনগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। এসব ব্যাপারে এখানের যাঁরা কর্তা অর্ধশিক্ষিত যো-হুজুরের দল, ডাক্তারকে তাঁরা বিজ্ঞানী মনে করেন না, বোধহয় পুরোহিতজাতীয় কোন জীব মনে করেন। তাঁর মূর্খতা এবং যথেচ্ছাচারকেও মেনে নিতে আপত্তি নেই তাঁদের। তিনি যদি কোন রোগীর কানে বা মুখে গরম সীসেও ঢেলে দেন এঁরা মেনে নেবেন, মনে করবেন রোগীর হিতার্থেই ওটা করা হচ্ছে। অন্য কোন দেশ হ'লে এই সব হাসপাতালকে ভেঙ্গে-চুরে নিঃশেষ করে দিত।

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভ কি"—চক্ষু বিস্ফারিত করে যামিনীবাবু নিজেকেই আবার প্রশ্ন করেন—"শেষ পর্যন্ত লাভ হয়েছে কি কিছু? অ্যান্‌টিসেপ্‌টিক্, কক্, পাস্তুর কি মূল পরিবর্তন আনতে পেরেছেন কিছু? মৃত্যু আর রোগ তো যেমন ছিল তেমনিই আছে। পাগলাদের জন্য থিয়েটার আর নাচের বন্দোবস্ত হয়েছে, কিন্তু তারা তো পাগলা-গারদেই রয়েছে এখনও। সবই বাইরের আড়ম্বর। তলিয়ে ভেবে দেখলে ভিয়েনার হাসপাতালে আর আমার হাসপাতালে মূলতঃ কোন তফাৎ নেই।

তবু কিন্তু একটা দুঃখ এবং ঈর্ষার ভাব তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সম্ভবতঃ ক্লান্তির জন্যই হয় এটা। তিনি বইটার উপর ঝুঁকে পড়েন এবং দুই গালের উপর হাত দুটোকে রেখে আর একটু আরাম করে বসে চিন্তা করতে থাকেন।……

"আমি শয়তানের দাসত্ব করছি এবং যাদের কাছ থেকে মাইনে নিচ্ছি তাদের

ঠকাচ্ছি। আমি জোচ্চোর। কিন্তু সবাই জোচ্চোর। বিরাট শয়তানী কারখানায় আমি ছোট্ট একটা 'নাট' বা বল্টু মাত্র। সব অফিসাররাই চোর, সবাই কিচ্ছু না করে মাইনে নেয়।...এই-ই যুগের হাওয়া, এ আমার একার দোষ নয়।...হয়তো দুশো বছর পরে জন্মগ্রহণ করলে আমি অন্যরকম হতাম।"

ঘড়িতে যখন টং টং করে তিনটে বাজল, তখন আলো নিবিয়ে তিনি নিজের শোবার ঘরে গেলেন। কিন্তু চোখে ঘুম নেই।

আট

কর্তৃপক্ষরাও মাঝে মাঝে উদার হন। প্রায় বছর দুই আগে তাঁরা একবার স্থির করেছিলেন যে, যতদিন না একটা ভালো হাসপাতাল খোলা হচ্ছে ততদিন এই হাসপাতালেই বছরে হাজার-খানেক টাকা দেওয়া হোক, হাসপাতালে আরও কর্মচারী নিয়োগ করবার জন্য, বিশেষ করে ডাক্তার। জেলার ডাক্তার বীরেন দস্তিদার সুতরাং আমন্ত্রিত হলেন যামিনীবাবুর কাজে সাহায্য করবার জন্য। বীরেন দস্তিদার একেবারে ছোকরা, বয়স ত্রিশের নীচেই। লম্বা, কালো, গালের হাড় দুটো উঁচু উঁচু, ছোট ছোট চোখ। তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় এসে হাজির হলেন। সঙ্গে কেবল একটি ছোট ট্রাঙ্ক, আর একটি সাদা-মাটা-গোছের তরুণী, তার কোলে আবার একটি শিশু। তরুণীটির তিনি পরিচয় দিলেন নিজের রাঁধুনী বলে। ডাক্তার দস্তিদারের পোশাক-পরিচ্ছদও খুব সাধারণ গোছের। মাথায় শোলার হ্যাট, পায়ে বুট, গায়ে সস্তাদামের একটা স্যুট। তিনি এসেই ডাক্তার ঘোষাল আর হাসপাতালের কেরানীটির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন। বাকী সকলকে, কেন জানি না, তিনি বলতেন, "ওরা সব বড়লোক, অ্যারিস্টোক্র্যাট।" তাঁর কাছে একটি মাত্র বই ছিল, একটি প্রেসক্রপ্‌সনের বই। নানা রোগের নানারকম প্রেসক্রপ্‌সন লেখা আছে তাতে। যখন কোন রোগী দেখতে যেতেন এই বইটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সন্ধ্যার সময় ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলতেন। তাস খেলায় তাঁর তেমন রুচি ছিল না। তাঁর কতকগুলো কথার মাত্রা ছিল। প্রায়ই বলতেন—"যা বাব্বা, বেশ জমে উঠল তো" কিংবা, "আরে মশাই, মানুষ জন্মেছে ফুর্তি করতে"—এই ধরনের কথা সব।

হাসপাতালে সপ্তাহে দু'দিন যেতেন, ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিতেন, তারপর আউটডোরে গিয়ে বসতেন। তিনি যখন আবিষ্কার করলেন যে, হাসপাতালে অ্যান্‌টিসেপ্‌টিক নেই, কিন্তু কাচের বাক্সে জিনিসপত্র অনেক আছে, তখন তাঁর মেজাজটা বিগড়ে গেল একটু, কিন্তু পাছে ডাক্তার দত্ত কিছু মনে করেন এই ভেবে আর উচ্চবাচ্য করলেন না, যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। কিন্তু মনে মনে তিনি ধারণা করলেন ডাক্তার দত্ত একটি ঘুঘু, হয়তো বেশ ধনীও, একটু হিংসাও হ'ল। ভাবলেন, এ লোকটাকে যদি দাবাতে পারি বেশ হয়।

নয়

একদিন চৈত্র মাসের মাঝামাঝি একটু বৃষ্টির পর আবার বেশ গরম প'ড়ে গেছে, কোকিলরা ডাকাডাকি করছে, যামিনীবাবু তাঁর বন্ধু সতীশবাবুর সঙ্গে গল্প শেষ করে তাঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলেন। ঠিক সেই সময় জিতু পাগলা তার শহর-পরিভ্রমণ শেষ করে হাসপাতালের গেটে এসে ঢুকল। মাথার টাকে কাদার ছিটে, গায়ে ছেঁড়া একটা আলখাল্লা, পায়ে ছেঁড়া কাদামাখা বুট। হাতে একটি ছোট থলি, তাতে ভিক্ষার পয়সা আর অন্যান্য জিনিস।

"একটা পয়সা দেবেন হুজুর"—জিতু পাগলা হাত পেতে ডাক্তারবাবুর কাছেই পয়সা চাইল। যামিনীবাবু কাউকেই প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। একটি সিকি দিলেন তাকে।

কিন্তু তার মনে হ'ল—"কি কাণ্ড! এই বৃষ্টিতেও শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল—"

যুগপৎ করুণা আর বিরক্তিতে তাঁর অদ্ভুত একটা কষ্ট হতে লাগল। জিতুর পিছু পিছু তিনি অ্যানেক্সে গেলেন। যেতে যেতে বার বার তিনি জিতুর কাদামাখা টাক আর জুতো দেখতে লাগলেন। ডাক্তারবাবুকে দেখে নন্দী তার রাবিশের স্তূপ থেকে তড়াক করে নেমে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"নন্দী, জিতু এভাবে ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওকে এক জোড়া ভালো বুট দিলে কেমন হয়?"

"আচ্ছা, আমি 'সুপার' সাহেবকে বলব।"

"হ্যাঁ বোলো। আমার নাম করে বোলো। এ রকমভাবে ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়ালে ওর নিমোনিয়া হ'য়ে যেতে পারে।"

ভিতরে ঢুকবার কপাটটা খোলাই ছিল। চিন্ময় সান্যাল একটা কনুয়ের উপর ভর দিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে বাইরের কথাবার্তা শুনছিল। অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলেই সে শঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর চিনতে তার দেরি হ'ল না। চেনবামাত্রই রাগে কাঁপতে লাগল সে, এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল, সমস্ত মুখ ভীষণ লাল হ'য়ে উঠল, মনে হ'তে লাগল চোখ দুটো এখনি বুঝি ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে সে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

"ডাক্তার এসেছে, ডাক্তার"—হা হা করে হেসে চীৎকার করে উঠল চিন্ময়—"শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেচে ভদ্রলোক। আমাদের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য, শেষ পর্যন্ত দয়া করে এখানে পদার্পণ করেছেন উনি। পাজি শয়তান কোথাকার—"

মেঝেতে পা ঠুকে হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড করে তুলল চিন্ময়। এতটা সে আগে কখনও করেনি।

"খুন করে ফেল ব্যাটাকে। না, খুন করলে ঠিক শাস্তি হবে না। পায়খানায় ফেলে দাও ওকে!"

যামিনীবাবু একটু এগিয়ে এসে কপাটের ভিতর মুণ্ড ঢুকিয়ে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"এত রাগ কেন?"

"কেন!"—চেঁচিয়ে উঠল চিন্ময়—তারপর গটগট করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। নিজের ঝলঝলে জামাটা কোমরে জড়িয়ে ঘৃণিত লোচনে দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল —"কেন? তুমি একটা চোর"—তারপর মুখ ভেংচে বললে—"হাতুড়ে, কসাই"...

"না, না, অত উত্তেজিত হ'য়ো না"—মৃদু হেসে একটু যেন ক্ষমা-চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন ডাক্তারবাবু—"আমি তো জীবনে কখনও কারো জিনিস চুরি করিনি। হাতুড়ে, কসাই—কি যা তা বলছ সব। অত উত্তেজিত না হ'য়ে একটু শান্ত হও, মনে হচ্ছে আমার উপর রাগ হয়েছে খুব। কেন, কি অপরাধ আমার। একটু শান্ত হ'য়ে ভেবে বল দেখি।"

"আমাকে এখানে আটকে রেখেছেন কেন?"

"কারণ তুমি অসুস্থ।"

"আমি অসুস্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু বাইরে রাস্তায় যে হাজার হাজার পাগলা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা কি? তারা স্বাধীনতা ভোগ করছে কেন? কারণ তুমি, হাতুড়েরাম, তাদের রোগ ধরতে পারনি। তাহলে আমি আর এই হতভাগারা কেন এখানে পচে মরছি? অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে? তুমি, তোমার অ্যাসিস্টেণ্ট, ওই ইন্‌স্‌পেক্‌টর তোমাদের দলকে দল আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে অনেক নীচু স্তরের লোক—তবে তোমরা এখানে না থেকে আমরা থাকব কেন? এ কি রকম যুক্তি?"

"নীতি দিয়ে বা যুক্তি দিয়ে এসব মাপা যায় না! সবই ঘটনাচক্রের উপর নির্ভর করে। যাদের এখানে আনা হয়েছে, তারা এখানে থাকবে আর যাদের আনা হয়নি তারা স্বাধীনতা ভোগ করবে। ব্যস্‌—এই হ'ল কথা! তুমি পাগল আর আমি ডাক্তার—এর মধ্যে কোনও নীতি বা যুক্তির স্থান নেই। ঘটনাচক্রের হেরফেরে যে যা হয়েছি তাই হয়েছি!"

"তোমার ওসব বুজরুকি আমি শুনতে চাই না।"

চিন্ময় সান্যাল হতাশাভরা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে বিছানার ধারে বসে পড়ল।

ডাক্তারবাবুর সামনে নন্দী জিতুকে খানাতল্লাসী করতে সাহস করেনি। সে তার আহরিত সম্পত্তি বিছানার উপর ছড়িয়ে বসল—রুটির টুকরো, কাগজের টুকরো, হাড়ের টুকরো, আরও সব কত কি! সত্যি, ঠাণ্ডায় বেচারা কাতর হ'য়ে পড়েছিল, তখনও কাঁপছিল। জিনিসগুলোর সামনে বসে বিড়বিড় করে বলতে লাগল সে, যেন দোকান খুলেছে, খদ্দের ডাকছে।

"আমাকে ছেড়ে দাও"—হঠাৎ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল চিন্ময় সান্যাল।

"আমি তা পারি না।"

"কেন? না পারবার হেতু?"

"কারণ তা আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তুমি নিজেই ভেবে দেখ না, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে লাভ হবে কি? ধরে নাও তোমাকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু শহরের লোকেরা কিংবা পুলিশের লোকেরা আবার তোমাকে ধরে এখানে টেনে আনবে।"

"ঠিক বলেছ, ঠিক। আবার এখানে টেনে আনবে। কি ভয়ংকর অবস্থা! কি করব আমি তাহলে? বল, বল, সেটা বল আমাকে—"

যদিও তার মুখভাবে একটা ভীষণ ভাব ফুটে উঠেছিল তবু তার তরুণ মুখে বুদ্ধির দীপ্তি নিবে যায়নি। ডাক্তার দত্তর মনে অনুকম্পার সঞ্চার হ'ল; ভাবলেন, ওকে দুটো মিষ্টি কথা বলে একটু সান্ত্বনা দিই। তার পাশে তার বিছানায় গিয়ে বসলেন।

"তুমি জিগ্যেস করছ, তোমার কি করা উচিত! তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভালো কি হবে জানো, যদি পালাতে পার। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতে কোন ফল হবে না। অবিলম্বেই আবার ধরা পড়ে যাবে তুমি। আবার তোমাকে নিয়ে আসবে এখানে। সমাজ যখন চোর বদমায়েশ খুনীদের বা পাগলদের বা অন্য কোন বিপজ্জনক লোকেদের সঙ্গ পরিহার করতে চায় তখন তাকে থামানো অসম্ভব। সেইজন্য এখন একমাত্র উপায় এখানেই আত্মসমর্পণ করা, ভেবে নেওয়া যে, তোমার উপস্থিতি এখানে প্রয়োজন।"

"কিন্তু কার কি প্রয়োজন তা তো বুঝতে পাচ্ছি না।"

"যখন জেলখানা আর পাগলা-গারদ আছে তখন সেগুলোকে ভরতি করবার জন্য লোকও প্রয়োজন। তুমি যদি না থাক আর একজন থাকবে। অপেক্ষা কর—এমন একদিন আসবে যখন জেলখানা বা পাগলা-গারদ থাকবে না, যখন এই শিক-দেওয়া জানালা আর হাসপাতালের গাউন লোপ পেয়ে যাবে। আজ হোক, কাল হোক এ সুদিন আসবেই।"

চিন্ময় সান্যালের মুখে অবজ্ঞার একটা হাসি ফুটে উঠল। চিন্ময় সান্যাল 'আপনি' আর 'তুমি'র প্রায় গোলমাল করে ফেলত। তাই বলল, "আপনি যা বললেন, তা আপনি নিজে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না?—"

চোখ দুটো কুঁচকে গেল তার।

"সেদিন যদি আসে আপনার আর আপনার ওই সহকারী নন্দীর কি গতি হবে তাহলে? কিন্তু এটা জেনে রাখুন—সে সুদিন আসবে। আসবেই। আমি হয়তো গুছিয়ে বলতে পারছি না, আমার বক্তব্য হয়তো হাস্যকর মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা জেনে রাখুন সেই সুদিনের নব-প্রভাত দশদিক উদ্ভাসিত করে একদিন আসবে, সত্যের জয় হবে, আমরাও সে-আলো দেখব। আমি হয়তো দেখব না, কিন্তু অন্য লোকের নাতির-নাতিরা দেখবে। আমি আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে তাদের অভিনন্দন করে আনন্দ অনুভব

করছি। তাদের মুক্তির জন্যেই এ আনন্দ। এগিয়ে যাও বন্ধুগণ, ভগবান তোমাদের সহায় হোন—"

চিন্ময় সান্যালের চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে দু'হাত প্রসারিত করে সে বলতে থাকে—"এই কারাগার থেকে তোমাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছি। সত্যের জয় হোক। কি আনন্দ, কি আনন্দ"—

"আমি তো আনন্দের কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না"—মৃদু হেসে ডাক্তার দত্ত বললেন। যদিও চিন্ময়ের এই উচ্ছ্বাস থিয়েটারি মনে হচ্ছিল তাঁর, তবু এই জন্যই তাকে ভালোও লাগছিল। তিনি বললেন, "ভবিষ্যতে হয়তো জেল আর পাগলা-গারদ থাকবে না, প্রকৃতির শেষ মারটি কিন্তু থেকে যাবে। তোমার মতে যা সত্য তার হয়তো জয় হবে। কিন্তু প্রকৃতির হাতে পরাজয় হবেই শেষ পর্যন্ত। মানুষ অসুখে পড়বে, বুড়ো হবে এবং এখন যেমন মরছে তখনও তেমনি মরবে। নব-প্রভাতের আলো যতই না উজ্জ্বল হোক, শেষ পর্যন্ত তোমাকে খাটিয়ার উপর কাপড়-ঢাকা দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে যাবে। এর থেকে পরিত্রাণ আছে কি ?"

"কেন, অমরত্ব বলে একটা কথা যে শোনা যায়—"

"সেটা অর্থহীন, রাবিশ।"

"তোমার এতে বিশ্বাস না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। দস্তয়ভ্স্কি না ভল্‌তেয়ার কে যেন বলেছিল মনে নেই যে ঈশ্বর যদি না-ও থাকতেন তাহলে নিজের প্রয়োজনেই মানুষ তাঁকে তৈরি করত। আমার বিশ্বাস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অমরত্ব বলে কিছু যদি না-ও থাকে—আজ না হয় কাল মানুষের বিরাট মন তা আবিষ্কার করবে।"

"বাঃ বেশ বলেছ"—বলে উঠলেন ডাক্তার দত্ত হাসি-মুখে—"তোমার যে বিশ্বাস আছে, এটা খুব ভালো। এরকম বিশ্বাস থাকলে লোকে বন্দী অবস্থাতেও সুখী থাকে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি বেশ শিক্ষিত লোক—"

"হ্যাঁ, আমি কলেজে পড়েছিলাম, যদিও গ্র্যাজুয়েট হ'তে পারিনি।"

"যে-কোনও অবস্থার মধ্যে পড়ে তুমি চিন্তার সাহায্যে সান্ত্বনা লাভ করতে পার। এটা কম কথা নয়। গভীর স্বাধীন চিন্তা—যা মানুষের চিত্তে সম্পূর্ণ মুক্তির আস্বাদ এনে দিতে পারে—আর যে আস্বাদ পেলে পৃথিবীর দৈনন্দিন মূঢ়তা তুচ্ছ হয়ে যায়—এর চেয়ে বেশী সম্পদ মানুষের কি আছে ? তুমি এই জঘন্য ঘরে বন্দী অবস্থায় বাস করেও সে সম্পদের অধিকারী হ'তে পার। দার্শনিক ডায়োজিনিস একটা কাঠের টবে বাস করতেন কিন্তু তিনি রাজার চেয়েও সুখী ছিলেন।"

"তোমার ডায়োজিনিস একটি গাড়োল ছিলেন"—বলে উঠল চিন্ময়—"ডায়োজিনিসের কথা আর মানবজীবনে চিন্তার সম্পদ এসব বাজে ভাঁওতা দিয়ে লাভ কি !"—হঠাৎ ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় চিন্ময়—"আমি জীবনকে

ভালোবাসি, ভয়ানক ভালোবাসি। কিন্তু একটা অদ্ভুত যন্ত্রণার ভয়ে আমি অস্থির। অদৃশ্য, নামহীন এই ভয় আমার জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওই ভালোবাসার তৃষ্ণাও আমাকে অস্থির করে তোলে, দুর্নিবার এই জীবন-তৃষ্ণা, তখন ভয় হয়, হয়তো আমি পাগল হ'য়ে যাব। আমি বাঁচতে চাই, ডাক্তার, মানুষের মতো বাঁচতে চাই—"

উত্তেজনাভরে পায়চারি করতে করতে ঘরের ওদিকে চলে যায় চিন্ময়। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে—"জানেন, স্বপ্নে মাঝে মাঝে আমি ভূত দেখি! নানারকম লোক আসে আমার কাছে, অনেক রকম কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, অনেক রকম গান। মনে হয় আমি যেন কোন অরণ্যে বা কোন সমুদ্রতীরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখন আবার সমাজের ভিড়ের মধ্যে, সমাজের দুঃখের মধ্যে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে। ওখানে কি হচ্ছে বলুন তো—" হঠাৎ বলে ওঠে সে—"বাইরের পৃথিবী কিভাবে চলছে?"

"আমাদের শহরের কথা শুনতে চাইছ, না, পৃথিবীর সাধারণ খবর?"

"প্রথমে শহরের খবরই শোনা যাক্। তারপর পৃথিবীর খবর শোনা যাবে।"

"বেশ, তবে শোন। শহরের খবর হচ্ছে একঘেয়েমি, একটানা একঘেয়েমি। শহরে কথা বলবার একটি লোক নেই, কথা শোনবার লোকও নেই। নতুন মানুষ নেই। সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একজন নতুন লোক এসেছেন অবশ্য, ডাক্তার ঘোষাল।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। নিশ্চয়ই গাড়োল একটি—"

"না, খুব মার্জিতরুচির লোক বলে মনে হয় না। বড় মজা লাগে, বুঝলে—যা শুনি —অবাকও লাগে! সবাই বলে এখানে নাকি জড়তা নেই, সবাই নাকি প্রাণোচ্ছল, সাংস্কৃতিক আবহাওয়া নাকি এখানে বুদ্ধির সৌরভে ভরপুর। তার মানে এখানে নাকি সত্যিকার মানুষ আছে, কিন্তু যা দেখি তাতে তো হতাশ হ'তে হয়। মনে হয় অভিশপ্ত শহর—"

"অভিশপ্ত, ঠিক বলেছেন"—চিন্ময় সান্যাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সায় দেয়, তারপর হেসে ওঠে—"দুনিয়ার খবর কি? মাসিকপত্রে সাময়িকপত্রে কি সব খবর বেরোয় আজকাল।"

ওয়ার্ডের ভিতর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। যামিনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাগজের খবর সব বলতে লাগলেন। বিদেশের লোকেরা কে কি বলছে, আধুনিক চিন্তাধারা কোন্ খাতে বইছে, এই সব। চিন্ময় শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ কি যেন ভয়ঙ্কর একটা মনে পড়ে গেল তার, দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে শুয়ে পড়ল সে বিছানায় ডাক্তারের দিকে পিঠ করে।

"শরীরটা ভালো লাগছে না?"—জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

"আর একটি কথাও বলব না"—হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলে উঠল চিন্ময়—"আমাকে একা থাকতে দাও।"

"কেন, কি হ'ল হঠাৎ।"

"তুমি চলে যাও, দূর হও, আমায় একা থাকতে দাও বলছি। কি আপদ!"

যামিনী দত্ত একটু অপ্রস্তুত হলেন। তারপর মৃদু হেসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বাইরে যেতেই নন্দীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

"বুঝলে নন্দী, এই জায়গাটা একটু সাফসুত্‌রো করলে কেমন হয়। বড়ই দুর্গন্ধ ছাড়ছে।"

"আচ্ছা, করিয়ে দেব হুজুর।"

"ছোকরাটি ভালো"—বাড়ি যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন ডাক্তার দত্ত—"এতদিন পরে এই প্রথম মনে হ'ল যে, একটা লোকের মতো লোকের সঙ্গে কথা কইলুম। বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, দেখবার চোখ আছে—"

সেদিন সন্ধ্যার সময় পড়তে পড়তে এবং পরে রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়েও ওই চিন্ময় সান্যালের কথাই বার বার মনে হ'তে লাগল তাঁর। পরদিন সকালে উঠেও তাঁর মনে হ'ল একটি চমৎকার বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর।

ঠিক করলেন আবার তাঁর কাছে যাবেন।

দশ

যামিনীবাবু চিন্ময়কে আগের দিন যেমন দেখে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনই দেখলেন। দু'হাত দিয়ে মাথা ধরে, হাঁটু দুটো গুটিয়ে, দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে।

"কি ভাই, কেমন আছ"—জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার দত্ত—"ঘুমুচ্ছ না কি?"

"প্রথম কথা, আমি তোমার ভাই নই"—বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে বলে উঠল চিন্ময়,—"দ্বিতীয় কথা, আমি কেমন আছি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আমি তোমাকে একটি কথাও বলব না।"

"এ কি কাণ্ড"—মৃদু হেসে বললেন ডাক্তার দত্ত, "কাল অতক্ষণ ধরে গল্প করলাম, তারপর হঠাৎ এমন চটে উঠলে কেন। আমি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি কি? কিংবা হয়তো তুমিই ভুল বুঝছ আমাকে—"

"আপনি কি আশা করেন যে, আপনার কথায় আমি আর বিশ্বাস করব"—চিন্ময় সান্যাল উঠে বসল এবং ডাক্তারের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। দৃষ্টিতে কেবল ব্যঙ্গ ছিল না, ঈষৎ ভয়ও ছিল।

"আপনি যান, অন্যত্র গিয়ে স্পাইগিরি করুন। আমি আপনার একটি কথারও উত্তর দেব না। কালই বুঝেছিলাম আপনি কেন এসেছেন।"

ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করলেন চিন্ময়ের চোখের পাতাগুলো কেমন যেন ফোলা ফোলা আর লাল।

"আরে কি মুশকিল! তুমি আমাকে স্পাই ভেবেছ?"—হাসবার চেষ্টা করলেন ডাক্তার দত্ত।

"হ্যাঁ! হয় তুমি পুলিশের স্পাই, না হয় ডাক্তার গুপ্তচর। ওরা তোমাকে আমার পিছনে লাগিয়েছে।"

"আরে, অদ্ভুত লোক তো তুমি!"

ডাক্তার তার বিছানার পাশে টুলের উপর বসলেন।

"ধরে নিলাম তুমি যা বলছ তা সত্যি। ধরে নিলাম আমি তোমার গোপন কথা বার করে তোমাকে শেষে পুলিশে ধরিয়ে দেব। তোমাকে তারা তখন ধরে নিয়ে যাবে, তোমার বিচার হবে। কিন্তু এখন তুমি যে অবস্থায় আছ তার চেয়ে বেশী খারাপ আর কি হ'তে পারে। তোমাকে যদি সশ্রম কারাদণ্ড দেয়, কিংবা ধর যদি নির্বাসনেও পাঠায় তাহলে তা কি এই অ্যানেক্সে থাকার চেয়ে খারাপ হবে? আমার তো তা মনে হয় না। তুমি তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন? এর চেয়ে খারাপ আর কি হ'তে পারে?"

এতে কিছু ফল হ'ল বলে মনে হ'ল। একটু নরম হ'ল যেন চিন্ময়। চারটে বেজে গিয়েছিল। এই সময়টা ডাক্তারবাবু সাধারণতঃ নিজের ঘরে পায়চারি করেন, আর পাঁচির মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে চা করে দেবে কি না।

"বিকেল বেলা একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। ভাবলাম তোমার কাছেই যাই। চমৎকার দিনটি আজ। বসন্তকাল এসে গেছে—"

"এটা কি মাস? মার্চ?"

"মার্চের শেষ।"

"বাইরে তেমনি ময়লা আর ধুলো আছে?"

"না, অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে।"

"কি ইচ্ছে করছে জানেন? ইচ্ছে করছে বেশ বড় একটা জুড়ি গাড়ি করে শহরের বাইরে একটা লম্বা চক্কোর দিয়ে আসি।"

সে তার ফোলা ফোলা চোখ দুটো দু'হাতে কচলাতে লাগল, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে।

"তারপর বাড়ি ফিরে এসে নিজের লাইব্রেরী ঘরটিতে ঢুকে একজন ভদ্র ডাক্তার ডেকে আমার মাথাধরার একটা ব্যবস্থা করি···এসব ভুলে গেছি, মানুষের মতো কি করে বাঁচতে হয় তা ভুলে গেছি। এখানে চারিদিকে এত নোংরা, এত দুর্গন্ধ, সহ্য করা যায় না।"

সম্ভবতঃ আগের দিনের উত্তেজনার জন্য সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, তার কণ্ঠস্বরও বেশ ক্লান্ত শোনাচ্ছিল। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছিল তার, মুখ দেখে মনে হচ্ছিল মাথার ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে পড়েছে বেচারা।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আরামজনক লাইব্রেরী ঘরের সঙ্গে এই অ্যানেক্সের বিশেষ

কোন তফাত নেই। সুখ-শান্তির উপাদান যদি আমরা বাইরে খুঁজি তাহলে আমাদের ঠকতে হবে। সেটা নিজেরই মধ্যে খুঁজতে হবে।"

"তার মানে ?"

"সাধারণ লোক সুখের সন্ধান করে বাড়ি, গাড়ি, লাইব্রেরী এই সব জিনিসে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক সেটার সন্ধান করে নিজের মধ্যে।"

"আপনি গ্রীসে গিয়ে ওসব বক্তৃতা করুন গে। সেখানকার জল-হাওয়া ভালো, হাওয়ায় কমলালেবুর গন্ধ ভেসে বেড়ায়, সেখানে ও বক্তৃতা ভালো শোনাবে। এদেশে ওসব অচল। ডায়োজিনিস-এর কথা কাকে বলছিলাম। আপনাকে ?"

"হ্যাঁ, কাল বলছিলে—"

"ডায়োজিনিস-এর লাইব্রেরী ঘরের দরকার ছিল না। সেদেশে এত অসহ্য গরমও নেই, এমন ভীষণ শীতও নেই সেখানে। কমলালেবু আর জলপাই খেতে খেতে টবে বসে দর্শনচর্চা করা সম্ভব। এদেশের গরমের বা শীতের পাল্লায় পড়লে বাপ বাপ করে ঘরের সন্ধানে দৌড়তেন তিনি। হয়তো ভিরমি খেয়ে যেতেন।"

"মোটেই না। যে-কোনও বাইরের জিনিসের মতো প্রাকৃতিক পরিবেশকেও উপেক্ষা করা যায়। মার্কাস অরেলিয়াস বলেছেন, 'কষ্ট হচ্ছে কষ্টের অনুভূতি মাত্র, এই অনুভূতিকে যদি আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি, কষ্ট নিয়ে যদি বেশী মাথা না ঘামাই, কষ্ট আর থাকবে না।' ঠিকই বলেছেন তিনি। ঋষিদের সঙ্গে বা জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে সাধারণ লোকের ওইখানেই তো তফাত। তাঁরা দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করতে পারেন, তাঁরা যে-কোনও অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তাঁরা কোনও কিছুতেই আশ্চর্য হন না।"

"তাহলে আমি নিশ্চয়ই বোকা, কারণ আমি কষ্ট হ'লে দুঃখ পাই, আমার অবস্থায় আমি একটুও সন্তুষ্ট নই। লোকের নীচতা দেখে আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাই।"

"ওইখানেই তোমার ভুল। তুমি যদি সমস্ত জিনিসের মূল পর্যন্ত অনুসন্ধান কর বুঝতে পারবে যে, যেসব বাইরের জিনিসে আমাদের মন বিচলিত হয় তা কত তুচ্ছ। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা কর, তাহলেই শান্তি পাবে।"

"উপলব্ধি!"—চিন্ময় সান্যাল একটু আহত-কণ্ঠে বলে উঠল—"বাইরের জিনিস, তার মূল—ক্ষমা করবেন, এসব জিনিস আমার মাথায় ঢোকে না। একটি জিনিস যা আমি বুঝি, সেটা হচ্ছে"—চিন্ময়ের চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠল, যামিনী দত্তর দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে বলল—"সেটা হচ্ছে যে, ভগবান আমাকে রক্ত-মাংসের মানুষ করে তৈরি করেছেন। হ্যাঁ সার, তপ্ত রক্ত, কাঁচা মাংস, আর স্পর্শকাতর স্নায়ু দিয়ে আমি তৈরি। এর জীবনী শক্তি যদি থাকে বাইরের আঘাতে তা সাড়া দেবে। তাই আমি সাড়া দি। কষ্ট পেলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে, চীৎকার করে কাঁদি। নীচতা দেখলে মনে ঘৃণা জাগে, বর্বরতা দেখলে সমস্ত মন বিরূপ হ'য়ে যায়। এই আমি বুঝি, আমার কাছে এই হচ্ছে জীবনের অর্থ। নিম্নস্তরের জীবরা এতটা স্পর্শকাতর নয়, তাই

তারা আমাদের মতো চেঁচামেচি করে না। যারা উচ্চস্তরের প্রাণী, যারা মানুষ, তারা বাস্তব জগতের রূঢ়তায় যত বেশী কষ্ট পায়, তত বেশী প্রতিবাদ করে। আশ্চর্য, আপনি ডাক্তার অথচ আপনি এই সামান্য সাধারণ কথাগুলো জানেন না! যে লোক কষ্টে বিচলিত হয় না, যে যে-কোন অবস্থায় সন্তুষ্ট, যে কিছুতে বিস্মিত হয় না, তার তো ওই লোকটার মতো অবস্থা"—চিন্ময় সেই মোটা চণ্ডালটাকে দেখিয়ে দিলে—"কিংবা সে এত কঠোর, এমন অসাড় হ'য়ে গেছে, তাকে মড়া বললেও ভুল হয় না। আমাকে মাপ করবেন"—চোখ আরও কটমট করে সে বলতে লাগল—"মাপ করবেন, আমি মুনিও নই, ঋষিও নই, দার্শনিকও নই। ওসব ব্যাপারে আমার কোনও জ্ঞান নেই। আর আমি এসব নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্কও করতে চাই না"—

"কিন্তু তুমি কি চমৎকার তর্ক কর।"

"যে সব মুনি-ঋষিদের বচন আপনি আওড়ালেন তাঁরা বড়লোক ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা দু'হাজার বছর আগে যেখানে ছিল, আজও সেইখানেই আছে। একটুও এগোয় নি। এগোতে পারে না, কারণ তাঁরা যা বলেছেন তা করা যায় না, তা অবাস্তব। সেকালে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সমাজে তাঁদের এসব দর্শনের খ্যাতি ছিল। এই সীমাবদ্ধ সমাজে লোকের কাজই ছিল নানারকম চেখে চেখে বেড়ানো। কিন্তু দেশের জনসাধারণ ওর মর্ম গ্রহণ করেনি করতে পারেনি। গীতার নামও শোনেনি অনেকে, শুনলেও, বা পড়লেও গীতার ধর্ম ক'জন লোক পালন করেছে? পালন করেনি, কারণ করা যায় না। যে ধর্ম আর্থিক সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে, দুঃখ বা মৃত্যু সম্বন্ধে যে ধর্ম উদাসীন তা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। সাধারণ লোক সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদই পায়নি, তাদের পক্ষে এসবকে অস্বীকার করা মানে জীবনকেই অস্বীকার করা। যারা সারাজীবন দুঃখ-দারিদ্র্য অনাহার-অত্যাচারে দগ্ধ তারা সে প্রদাহ সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে কি করে। তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা মৃত্যুভয়ে সর্বদা জর্জরিত, এই তাদের জীবন, এরই মধ্যে তারা সুধারও সন্ধান করছে, এর সম্বন্ধে তারা কি উদাসীন থাকতে পারে? সেইজন্য আমি আবার বলছি। ওই সব মুনি-ঋষিদের বচন আমাদের কাছে অর্থহীন, ওর কোন ভবিষ্যৎ নেই, থাকতে পারে না। চিরকাল মানুষ যা সম্বল করে সভ্যতার পথে এগিয়েছে তা হচ্ছে দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার আর যুদ্ধ করবার শক্তি। এর উপরই তার মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত।"

চিন্ময় সান্যাল হঠাৎ চিন্তার খেই হারিয়ে চুপ করে গেল, তারপর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বিরক্তিভরে বলে উঠল, "আমি আপনাকে খুব দরকারী একটা কথা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু সব গুলিয়ে গেল। কি বলছিলাম, বলুন তো? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গ্রীসের একজন স্টোয়িক প্রতিবেশীকে রক্ষা করবার জন্য নিজেকে একজন দাসব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে ফেলেছিল। এর মানে সে প্রতিবেশীর দুঃখের সম্বন্ধে নির্বিকার থাকতে পারেনি। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা হ'লে পরের জন্য এত বড় আত্মবিসর্জন

সম্ভব হ'ত না। আরও অনেক উদাহরণ আছে, এই জেলে থেকে থেকে সব ভুলে গেছি। যীশুখৃষ্টের কথাই ধরুন না। বাস্তবের সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন কি? তিনি কাঁদতেন, শোকপ্রকাশ করতেন, হাসতেন, রাগতেন, দুঃখিত হতেন। দুঃখ-কষ্টকে তিনি হাসিমুখে কখনও স্বীকার করেন নি, তিনি মৃত্যু সম্বন্ধেও উদাসীন ছিলেন না।"

চিন্ময় হা হা করে হেসে উঠে বসল।

"ধরে নিলাম আপনি যা বলছেন তাই ঠিক, সুখ-শান্তি মানুষের অন্তরেই আছে, বাইরে নেই! ধরে নিলুম দুঃখকে আর মৃত্যুকে হাসিমুখে মেনে নেওয়াই উচিত। কিন্তু একথা প্রচার করবার আপনার কি অধিকার আছে? আপনি কি মুনি, না ঋষি?"

"না আমি মুনি বা ঋষি নই। কিন্তু তবু আমার মনে হয় একথা সকলেরই প্রচার করা উচিত। কারণ এই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত সত্য কথা।"

"কিন্তু এই সত্য কথা প্রচার করবার ভার আপনি নিলেন কেন? জীবনের সম্বন্ধে এই উপলব্ধি, দুঃখের সম্বন্ধে এই উদাসীনতা এসব প্রচার করে বেড়াবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? আপনি কি কখনও দুঃখ পেয়েছেন? দুঃখ যে কি জিনিস তার সামান্যতম পরিচয় কি আপনার জানা আছে? আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি বলে ক্ষমা করবেন, বাল্যকালে আপনি বেত খেয়েছেন কখনও? আপনাকে কি কেউ কখনও চাবকেছে?"

"না। আমার বাবা-মা ওসবের বিরোধী ছিলেন।"

"কিন্তু আমার বাবা আমাকে নির্দয়ভাবে চাবকাতেন। তিনি ভয়ংকর রাগী ছিলেন। বড় অফিসার ছিলেন তিনি, তাঁর লম্বা নাক ছিল, গর্দানটা ছিল হলদে রঙের, অনেকটা বাঘের গর্দানের মতো। অর্শে ভুগতেন। আপনার কথাই বলি। সারাজীবন আপনার গায়ে একটু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি, কেউ আপনাকে ভয় দেখায় নি, কেউ আপনার উপর অত্যাচার করেনি। আপনার চেহারা বলিষ্ঠ ঘোড়ার মতো। বাবার আদরে মানুষ হয়েছেন, বাবার টাকায় লেখাপড়া শিখে একটি শাসালো চাকরি পেয়েছেন। গত কুড়ি বছর ধরে আপনি চমৎকার আলো-বাতাসওলা গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টারে বিনা পয়সায় আরামে বাস করছেন, আপনার চাকর আছে। আপনি নিজে আপনার মরজিমতো কাজ করেন, কিংবা করেন না। আপনি অলস, হচ্ছে-হবে-গোছের মানুষ আর সেই জন্য গা-বাঁচিয়ে বিপদ এড়িয়ে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। আপনি আপনার সমস্ত কাজের ভার দিয়ে দিয়েছেন হাসপাতালের নচ্ছার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-গুলোর উপর আর নিজে বেশ আরামে আছেন, টাকা বাঁচাচ্ছেন, বই পড়ছেন আর নানারকম গাঁজাখুরি দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে মশগুল হ'য়ে আছেন। আর আপনার" —চিন্ময় সান্যাল যামিনীবাবুর নাকের দিকে এক নজর চেয়ে বলল—"আপনার চোখ-মুখ দেখে মনে হয় আপনি মদও খান। মোট কথা, জীবন বলতে যা বোঝায় তা

আপনি দেখেন নি, তার পরিচয়ও আপনার জানা নেই। বাস্তব জীবনের একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে আপনার। দুঃখকে অগ্রাহ্য করে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে নির্বিকার থেকে যে সুখ-শান্তি আপনি কল্পনা করেছেন তা অলস লোকেরই শোভা পায়। যারা কুঁড়ে তারাই ভাবে জগৎ মিথ্যা, বাইরের দুঃখ অলীক কিংবা মায়া। এসব হচ্ছে কুঁড়েদের দর্শন। একজন তার বউকে ধরে ঠাঙাচ্ছে, ঠ্যাঙাক, বাধা দেবার দরকার কি! কারণ এ তো জানা কথা আজ না হয় কাল ওরা দুজনেই মরবে। তাছাড়া যে ঠ্যাঙাচ্ছে সেই অবনত করছে নিজেকে, যাকে ঠ্যাঙাচ্ছে তার আর ক্ষতি কি। মদ খেয়ে মাতাল হওয়া অশোভন বিশ্রী ব্যাপার—কিন্তু যে মদ খায় সেও শেষ পর্যন্ত মরে, যে না খায় সেও মরে! সুতরাং মদ খেলে কি এমন ক্ষতি! কেউ আপনার কাছে দাঁতের ব্যথা নিয়ে এল, দাঁতে ব্যথা হয়েছে তো কি হয়েছে! ব্যথা তো মনের একটা অনুভূতি মাত্র, আর সে অনুভূতি তো মায়া। তাছাড়া এটা কি আশা করা উচিত যে, তোমার সারাজীবন কোনও কষ্ট না পেয়ে কেটে যাবে? শেষ পর্যন্ত তো মরতেই হবে। সুতরাং মশাই, দাঁতের ব্যথার আর চিকিৎসা করার দরকার নেই। আমাকে একটু আরামে থাকতে দিন। কোনও ছোকরা যদি কষ্টে পড়ে এসে আপনার পরামর্শ চায় সে কি করবে, কোথা চাকরি পাবে। অন্য লোক হ'লে হয়তো একটু ভেবে উত্তর দিত। কিন্তু আপনার উত্তর তো ছকাই রয়েছে—জীবনকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর, প্রকৃত সুখ-শান্তি কি তা জানবার চেষ্টা কর, তাহলেই আনন্দ পাবে, তাহলেই তোমার মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তি ব্যাপারটা কি? কোনও উত্তর দিতে পারেন? পারেন না, কারণ এর উত্তর কেউ জানে না। আমাদের এখানে একটা খাঁচার মধ্যে পুরে রেখেছেন, মারছেন, পচাচ্ছেন। আপনি বলবেন—হ'লই বা! এই গারদ আর চমৎকার বৈঠকখানার সঙ্গে আসলে তো কোন তফাতই নেই। মূল অনুসন্ধান করলে তো মায়া। ভারি সুবিধাজনক দর্শন আপনার, বাঃ! এ দর্শন থাকলে করবার কিছু নেই, বিবেকে কোন গলদ নেই, নিজেকে আপনি বোধহয় মনে করছেন শংকর বা রামানুজ। বাঃ বাঃ চমৎকার! কিন্তু শুনুন, ওসব দর্শনও নয়, উপনিষদও নয়—আপনি যা করছেন তা ধাষ্টামি। কুঁড়েমি পেজোমি আর বোকামির সমন্বয়। আসলে কি করছেন জানেন? যা আছে কপালে বলে চোখ বুজে বসে আছেন। হ্যাঁ মশাই যা বললাম তা সত্যি"—চিন্ময় সান্যাল আরও রুখে উঠল—"আপনি বলছেন দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করতে? কিন্তু আপনার কড়ে আঙুলটা যদি কপাটে চেপে যায় তাহলে আপনি আর্তকণ্ঠে তারস্বরে চীৎকার করে উঠবেন।"

"বোধহয় উঠব না"—যামিনী দত্ত হেসে উত্তর দিলেন।

"উঠবেন না? বলেন কি। ধরুন যদি এখনি আপনার স্ট্রোক হ'য়ে পক্ষাঘাত হয়, কিংবা যদি কোন গুণ্ডা তার শক্তি বা উচ্চপদের সুযোগ নিয়ে আপনাকে প্রকাশ্যে অপমান করে এবং আপনি যদি বুঝতে পারেন যে, তার শাস্তি হবে না, তাহলেই আপনি বুঝবেন যে, সবাইকে আপনি যে সব বাজে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তার

প্রকৃত অর্থ কি? জীবনকে উপলব্ধি করা কিংবা জীবনের দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করা অত সোজা নয়, বুঝলেন।"

"বাঃ চমৎকার"—বলে উঠলেন ডাক্তারবাবু—"তোমার বক্তৃতা ভারি ভালো লাগল। চমৎকার বলেছ। আর আমার চরিত্রের সম্বন্ধে যা বললে তা তো একেবারে নিখুঁত। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে ভারি খুশী হয়েছি। তোমার কথা তো আদ্যোপান্ত সব শুনলুম, এইবার আমার তরফের কথাটা শোন—"

এগারো

তারা প্রায় আরও এক ঘণ্টা আলাপ চালাল। যামিনী দত্তের কথা শুনে চিন্ময়ও যেন আশ্বস্ত হ'ল একটু। এর পর থেকে ডাক্তারবাবু রোজই অ্যানেক্সে আসতে লাগলেন। সকালবেলায় যেতেন, বিকেলেও খাওয়া-দাওয়ার পর যেতেন। চিন্ময় সান্যালের সঙ্গে কথা কইতে কইতে প্রায়ই সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত। প্রথম প্রথম চিন্ময় তাঁর সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চলত, তার সন্দেহ ছিল যে, ডাক্তার হয়তো গুপ্তচর। খোলাখুলি সেকথা বলতও। কিন্তু ক্রমশঃই ডাক্তারের সঙ্গ অভ্যস্ত হয়ে গেল তার। আর তত ভয় করত না। তার আচরণও কোমল হ'ল। আর রূঢ় কর্কশ কথা বলত না। তবে কথাবার্তায় ব্যঙ্গের সুরটা ফুটে উঠত।

ক্রমশঃই ব্যাপারটা চাউর হয়ে গেল যে, ডাক্তারবাবু রোজই ছ' নম্বর ওয়াডে যাচ্ছেন। ডাক্তারবাবুর অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা, নার্সরা বা নন্দী কেউ বুঝতেই পারত না কেন উনি রোজ ওখানে যাচ্ছেন, কেনই বা অতক্ষণ থাকছেন, এত কথাই বা কি বলছেন। সেখানে একটা প্রেসক্রিপ্‌সনও লিখতেন না তিনি। তবে যান কেন? তাঁর চালচলন, হাবভাবও অদ্ভুত মনে হ'তে লাগল সকলের। পোস্টমাস্টারবাবু প্রায়ই তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে যেতেন। পাঁচির মা দেখত ডাক্তারবাবু প্রায়ই আজকাল চা না খেয়ে বেরিয়ে যান, অনেক রাত্রে ফেরেন, খাওয়ার দেরি হ'য়ে যায়। পাঁচির মা-ও ডাক্তারের এই পরিবর্তনে বিস্মিত হয়।

একদিন ডাক্তার ঘোষাল যামিনী দত্তের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পেলেন না। ভাবলেন হয়তো আশেপাশে কোথাও আছেন, কিন্তু বেরিয়ে দেখতে পেলেন না তাঁকে। কে একজন বলল, তিনি অ্যানেক্সে আছেন। গেলেন সেখানে। সেখানে গিয়ে শুনতে পেলেন ভিতরে তিনি যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে তিনি শুনতে লাগলেন।

"না, না, তোমাকে আমার মতে আমি দীক্ষিত করতে মোটেই চাইছি না"—যামিনী দত্তের কণ্ঠস্বর বড় শান্ত এবং করুণ শোনাল, যেন চিন্ময় যে তাঁকে ভুল বুঝেছে

এতে তিনি দুঃখিত হয়েছেন—"আসল কথা তা নয় বন্ধু। আমি দুঃখভোগ করেছি কি না তার সঙ্গে আসল প্রশ্নটাকে জড়াচ্ছ কেন? দুঃখ এবং সুখ দুই-ই ক্ষণিক, সুতরাং দুটোকেই অগ্রাহ্য করা উচিত, ও সব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়! আসল কথা হচ্ছে—তুমি আমি দুজনেই চিন্তা করতে পারি। আমরা পরস্পরের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করি, এতেই আমাদের আনন্দ। আমাদের মতে যদি অমিল থাকে তাতেও কিছু এসে যায় না। যে সমাজে বাস করি তার পাগলামি, ন্যাকামি, পেজোমি, বোকামি দেখে দেখে আমি যে কত ক্লান্ত তা যদি জানতে! তোমার কাছে আসি, কারণ তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ পাই। তুমি বুদ্ধিমান, তোমার সঙ্গ তাই ভালো লাগে। তাই এখানে আসি ভাই।"

ডাক্তার ঘোষাল কপাটটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে সন্তর্পণে দেখলেন, যামিনী দত্ত চিন্ময় সান্যালের পাশে তার বিছানায় বসে আছেন। চিন্ময় নানারকম মুখভঙ্গী করে নিজের গায়ের কাপড়টা বার বার জড়াচ্ছে আর যামিনীবাবু চুপ করে বসে আছেন। তাঁর মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, মুখটা মনে হচ্ছে লাল। কেমন যেন একটা অসহায় বিষণ্ণ মূর্তি। ডাক্তার ঘোষাল কাঁধ দুটো ঈষৎ তুলে মুচকি হেসে নন্দীর দিকে চাইলেন। তার সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল একটা।

তার পরদিন ডাক্তার ঘোষাল একজন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। সেদিনও দুজনে অমনি আড়ি পেতে যামিনীবাবুর আলোচনা শুনলেন।

ফিরে যাবার সময় ডাক্তার ঘোষাল বললেন, "বুড়োর মাথাটাও বেঠিক হ'য়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

অ্যাসিস্ট্যাণ্টটি পথের কাদা থেকে নিজের জুতোটি বাঁচিয়ে বললেন, "ভগবান কার অদৃষ্টে কি যে লিখেছেন, কে জানে। আপনি যা বললেন আমারও তাই সন্দেহ। অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছে যে, এই রকম একটা কিছু হবে শেষ পর্যন্ত।"

বারো

এরপর থেকেই ডাক্তার দত্ত অনুভব করতে লাগলেন তাঁকে ঘিরে যেন একটা রহস্যময় চক্রান্ত চলছে। হাসপাতালে তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, নার্স বা রোগীদের সঙ্গে দেখা হ'লে তারা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে, তারপর তিনি চলে গেলেই নিজেদের মধ্যে ফুসফুস গুজগুজ করে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মেয়ে মায়ার সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব ছিল। দেখা হ'লেই তার মাথায় গালে হাত বুলিয়ে তাকে আদর করতেন। এখন সে তাঁকে দেখলে পালিয়ে যায়। তাঁর বন্ধু পোস্টমাষ্টার সতীশবাবু সোৎসাহে এখন তাঁর প্রতি কথায় 'ঠিক, ঠিক' বলেন না; কেমন যেমন বিড়বিড় ক'রে বলেন, 'তা বটেই তো তা বটেই তো'—এবং তাঁর দিকে কেমন যেন একটা বিষণ্ণ চিন্তিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে

থাকেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবার চেষ্টা করেন অত বই পড়া ভালো নয়, চা-ও একটু কম খাওয়া উচিত। উদাহরণ দেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু বড় অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু বেশী পড়ে পড়ে শেষটা মাথার অসুখ হ'য়ে পড়ল তাঁর। গোপেন সরকার বড় উকিল ছিল, দিনরাত চা খেত খালি, শরীরটা ভেঙে পড়ল তাঁর। আকারে-ইঙ্গিতে সতীশবাবু ডাক্তার দত্তকে সাবধান করবার চেষ্টা করতেন। ডাক্তার ঘোষাল দু'একবার অযাচিত-ভাবেই এলেন তাঁর বাড়িতে। তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেন এবং ঘুমের ওষুধ খেতে বলে গেলেন।

দিনকতক পরে মেয়রের কাছ থেকে যামিনীবাবু চিঠি পেলেন একটা। মেয়র তাঁর সঙ্গে জরুরী দরকারে দেখা করতে চান। টাউন হলে গিয়ে যামিনীবাবু দেখলেন সেখানে অনেক পদস্থ অফিসাররা সমবেত হয়েছেন। পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, স্কুল ইন্‌স্‌পেকটর, মিউনিসিপাল কাউন্সিলের একজন মেম্বার, ডাক্তার ঘোষাল এবং শহরের নামজাদা একজন মোটাসোটা ডাক্তার।

কাউন্সিলের মেম্বার বললেন, "আমরা একটা দরখাস্ত পেয়েছি, সে সম্বন্ধে আপনার মতামত জানা দরকার। ডাক্তার ঘোষাল বলেছেন যে, হাসপাতালের মেন বিল্‌ডিংয়ে ডিস্‌পেন্সারির স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সেজন্য ওটাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত, হাসপাতালের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় নিয়ে গেলে ভালো হয়। এতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা ভাবছি মেরামত না করলে সেটা কি সম্ভব"—

"হ্যাঁ, মেরামতের খুবই দরকার"—যামিনীবাবু বললেন—"দক্ষিণ দিকের বারান্দায় যদি নিয়ে যান তাহলে ওটা ভালো করে মেরামত করতে হবে। তার মানে অন্তত হাজার দেড়েক টাকা খরচ হবে। কিন্তু ও খরচ ক'রে লাভ কি!"

সবাই চুপ ক'রে রইলেন।

যামিনীবাবু বলতে লাগলেন, "দশ বছর আগেই আপনাদের আমি বলেছিলাম যে, আমাদের শহরের আয়ের অনুপাতে আমাদের হাসপাতালটি এখন যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেও সেটিকে একটি বিলাসের ব্যাপার বলা যেতে পারে। যখন এটা তৈরি হয়েছিল তখন অবস্থা অন্য রকম ছিল। আমার মনে হয় আপনারা বিল্‌ডিংয়ে আর নমিনেশনে যে টাকা অনর্থক খরচ করবেন তা দিয়ে দুটি আদর্শ হাসপাতাল করা যায়।"

"বেশ তাহলে আপনি যা বলছেন সেই অনুসারেই হাসপাতালের ব্যবস্থা করা যাক"—

"আমি তো আগেই বলেছি, হাসপাতালের ভার মিউনিসিপালিটির উপর না দিয়ে গভর্নমেণ্টের হাতেই দেওয়া উচিত।"

"গভর্নমেণ্টের হাতে দেওয়া মানে"—মোটা ডাক্তারবাবু হেসে বললেন—"আমাদের

টাকাকড়ি যা কিছু আছে সব তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া। সে টাকা যদি তাঁরা চুরি করেন, আমাদের কোনও কথা চলবে না।"

"তা তো চলবেই না"—কাউন্সিলার সায় দিলেন হেসে।

যামিনীবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর মোটা ডাক্তারবাবুটির দিকে তিক্ত দৃষ্টি হেনে বললেন,—"আমাদের পক্ষপাতশূন্য হওয়া উচিত।"

নীরবতা ঘনিয়ে এল খানিকক্ষণের জন্য। বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট যেন একটু বেশি বিরক্ত হয়েছেন মনে হ'ল। তিনি একটু ঝুঁকে যামিনীবাবুর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "আপনি তো আমাদের একেবারে বয়কট করেছেন মশাই। আপনি একা একা থাকাই পছন্দ করেন তা জানি। তাস খেলেন না, ক্লাবে যান না, আড্ডা দেন না, প্রেম করেন না। আমাদের মতো লোকের সঙ্গ আপনার ভালোই লাগে না বোধহয়"—

এরপর সবাই কথা বলতে লাগল। প্রসঙ্গ এক—এ শহরে ভদ্রলোকের পক্ষে বাস করা মুশকিল। থিয়েটার নেই, গানবাজনার মজলিস নেই, কিচ্ছু নেই। অধিকাংশ লোক চিত্তবিনোদনের জন্য হয় তাস পাশা খেলে, কিংবা মদ খায়, কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে। কারুর দিকে না চেয়ে যামিনীবাবুও ধীর শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা। শহরের অধিকাংশ লোকেরা তাস পাশা খেলে বা মদ খেয়ে বা বাজে হুল্লোড় করে সময় কাটাচ্ছে। এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। মানসিক উন্নতি, সংস্কৃতির চর্চা, বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা বা ভালো বই পড়ার রেওয়াজই নেই মোটে। আনন্দের খোরাক কোথাও নেই। মনের এ খোরাক সংগ্রহ করবার ইচ্ছাও নেই, সামর্থ্যও নেই অনেকের। অথচ ভেবে দেখলে মানুষের জীবনে মনটাই আসল, বাকী সব বাজে ভুয়ো জিনিস।

ডাক্তার ঘোষাল মন দিয়ে যামিনীবাবুর কথা শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি বেমক্কা প্রশ্ন করে বসলেন, "ডাক্তারবাবু, আজ কোন্ তারিখ বলুন তো"—

যামিনীবাবু বললেন। তারপর অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন হতে লাগল। সেই মোটা-সোটা ডাক্তারটি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি বার। তারপর এক বছরে ক'টা দিন থাকে। তারপর হেসে বললেন, "আপনার ছ'নম্বর ওয়ার্ডে নাকি অসাধারণ প্রতিভাবান একজন লোক আছে?"

এই প্রশ্নে যামিনীবাবুর কান দুটো লাল হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, সে রোগী। কিন্তু সত্যি অসাধারণ লোক।"

এরপর আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। তিনি যখন বেরিয়ে আসছেন তখন পুলিশের বড় সাহেব তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "আমরা বুড়ো হয়েছি, এবার আমাদের রিটায়ার করা উচিত। কি বলেন।"

টাউন হল থেকে বেরিয়ে যামিনীবাবু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মানসিক অবস্থা

পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে এই কমিশনের সামনে ডাকা হয়েছিল। যে সব প্রশ্ন তাঁকে করা হ'ল তা ভেবে লজ্জা হ'ল তাঁর। আবার কান দুটো লাল হ'য়ে উঠল। তাঁর জীবনে এই প্রথম তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুকম্পান্বিত হলেন।

ডাক্তারবাবুরা তাঁকে যা প্রশ্ন করেছিলেন তা ভেবে তাঁর মনে হ'ল—"হায় ভগবান, এই এদের বিদ্যের দৌড়! এই কিছুদিন আগেই এরা মানসিক ব্যাধি বিষয়ে পড়ে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে—অথচ সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই এদের। কি আশ্চর্য!"

জীবনে এই প্রথম তিনি অপমানিত বোধ করলেন। জীবনে এই প্রথম তাঁর রাগ হ'ল।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় পোস্টমাস্টার সতীশবাবু এলেন এবং এসেই তাঁর দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "আপনি আমাকে যে আপনার বন্ধু বলে মনে করেন এবার সেটা প্রমাণ করুন। আপনি শুধু আমার বন্ধু নন, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।"

যামিনীবাবুকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই তিনি বলে যেতে লাগলেন, "আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর উদার হৃদয়ের জন্য আপনাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। এখন আসল কথাটা শুনুন। প্রফেসনাল এটিকেটের জন্য আপনার ডাক্তার বন্ধুরা সত্যি কথাটা আপনাকে বলতে পারছেন না। কিন্তু আমি মশাই মন-খোলা লোক, সোজাসুজি আপনাকে বলেই দিচ্ছি—আপনি অসুস্থ হয়েছেন। মাপ করবেন, কিন্তু এইটি হচ্ছে সত্যি কথা। সবাই এটা লক্ষ্য করেছে, অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছে। যোগেনবাবু এই একটু আগেই বলছিলেন ডাক্তারবাবু ঠিক সুস্থ নন। তাঁর এবার বিশ্রাম নেওয়াই উচিত। বিশেষ করে মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। ঠিকই বলেছেন। আর সুবিধাও হ'য়ে গেছে। কয়েকদিন পরে আমি ছুটি নিয়ে চেঞ্জে যাচ্ছি। ফাঁকা হাওয়ায় একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাই। সাঁওতাল পরগণার ওদিকে যাব ভাবছি। মধুপুর কিংবা দেওঘর। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। আপনি সত্যিই যে আমার বন্ধু সেটা প্রমাণ করুন।"

"আমার তো কোনও অসুখ হয়নি"—যামিনীবাবু একটু থেমে বললেন—"আপনার সঙ্গে আমি যাব কেন শুধু শুধু। অন্য কোনও উপায়ে আপনার বন্ধুত্বের প্রমাণ দেওয়া যাবে।"

অকারণে চলে যাব কেন! তাঁর মনে হ'ল তাঁর পড়াশোনা, পাঁচির মায়ের সেবা-যত্ন, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ত্যাগ করে, এই কুড়ি বছরের বাঁধা পথ ছেড়ে কোথায় যাবেন? অদ্ভুত পাগলামী হবে যে সেটা। তারপরই টাউন হলে যা হয়েছিল তা মনে পড়ল। মনে পড়ল কি বিমর্ষভাবে বাসায় ফিরেছিলেন তিনি। তারপর ভাবলেন—এই হতভাগা শহর ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো। যেখানকার মূর্খ গাড়োল লোকেরা তাঁকে পাগল বলে মনে করে কি হবে সেখানে থেকে!

"মধুপুর, না দেওঘর কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন ?"

"কিছু ঠিক করিনি এখনও। আপনি যদি চান মন্দারেও যেতে পারি, কিংবা কাশী। কাশীতে কিছুদিন আগে ছিলাম। অদ্ভুত শহর। চমৎকার। চলুন যামিনীবাবু, কাশীই চলুন আমার সঙ্গে। বাবা বিশ্বেশ্বর আবার ঠিক ভালো করে দেবেন আপনাকে—"

তেরো

এক সপ্তাহ পরে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ডাক্তার যামিনী দত্তকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন, অর্থাৎ ভদ্র ভাষায় কাজে ইস্তফা দিতে বললেন। ডাক্তারবাবু বিনা প্রতিবাদে প্রায় নির্বিকারভাবেই ইস্তফা দিয়ে দিলেন কাজে। আর এক সপ্তাহ পরে বেরিয়ে পড়লেন সতীশবাবুর সঙ্গে হাওয়া বদলাতে। আকাশ নীল, গরম নেই, বাতাস বেশ পরিষ্কার—প্রাকৃতিক পরিবেশ ভালোই ছিল। ট্রেনেও জায়গা পেতে কষ্ট হ'ল না।

স্টেশনে ফেরিওলাগুলো অবশ্য বড্ড নোংরা ছিল। সতীশবাবু তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বচসা করছিলেন, চটেও যাচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। আর তারপর গল্প করছিলেন ক্রমাগত, বকবক করছিলেন বললেই ঠিক হয়। কত শহরে তিনি ঘুরেছেন, কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কত রকম ঝঞ্ঝাটে কতবার পড়েছিলেন আর কিভাবে উদ্ধার পেয়েছিলেন এই সব গল্প। তাঁর চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখে সন্দেহ হচ্ছিল যে, সব কথা বোধহয় সত্যি নয়। যামিনীবাবুর অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ সতীশবাবু তাঁর মুখের খুব কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন। খুব জোরে হাসছিলেন তাঁর কানের কাছে। তাঁর নিশ্বাসও মুখে এসে লাগছিল যামিনীবাবুর। যামিনীবাবুর ভালো লাগছিল না, তাঁর চিন্তাধারা ব্যাহত হচ্ছিল।

পয়সা বাঁচাবার জন্যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছিলেন তাঁরা। সতীশবাবু ক্রমশঃ অনেক যাত্রীর সঙ্গে ভাব করে ফেললেন এবং তাদের পাশে বসে চীৎকার করে বলতে লাগলেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির অসুবিধা দূর করবার জন্যে সকলের আন্দোলন করা উচিত। চারিদিকে নোংরা, পাইখানা অপরিষ্কার, মেঝেতে বিড়ির টুকরো, লেবুর খোসা, চিনাবাদামের খোলা ছড়ানো। কখনও বোধহয় ঝাড়ু পড়ে না। তাঁর এই অবিরাম বকুনি আর মাঝে মাঝে অট্টহাসি ক্রমশঃ বিরক্তিজনক হ'য়ে উঠছিল যামিনী দত্তের কাছে।

"আমাদের দুজনের মধ্যে কাকে পাগল বলা উচিত"—ভাবছিলেন তিনি—"প্যাসেঞ্জারদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য আমি এক পাশে চুপ করে বসে আছি, আর এ লোকটা ষাঁড়ের মতো ক্রমাগত চেঁচিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে যে,

ওর মতো বুদ্ধিমান সবজান্তা লোক আর ভূ-ভারতে নেই। কাউকে একদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না।"

দেওঘরে নামবার আগে সতীশবাবু নিজের ট্রাঙ্ক থেকে কোট প্যাণ্ট আর টুপি বার করে পরে ফেললেন। বললেন, সাহেবী পোশাক পরা থাকলে অনেক সুবিধা। দেওঘরে কুলি-খানসামা সবাই তাকে সেলামও করতে লাগল। সতীশবাবুর ভাবভঙ্গী দেখে যামিনীবাবু বুঝলেন যে, সতীশবাবু সাহেবদের ভালো গুণ একটিও নিতে পারেন নি। নিয়েছেন খারাপ গুণগুলো। কথায় কথায় 'ড্যাম', 'সোয়াইন', বলছিলেন। একটা হোটেলে গিয়ে চ্যাচামেচি করে এমন কাণ্ড করলেন যে, যেন তিনি কোন নবাব খাঞ্জা খাঁ। যামিনীবাবু লক্ষ্য করলেন, তাঁর শালীনতারও কোন বালাই নেই। আণ্ডারওয়্যার পরে হোটেলের ঝি-এর সামনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! 'তুই' বলতে লাগলেন সকলকে। ছোটলোকের মতো মুখ খারাপ করেও গালাগালি দিলেন একটা চাকরকে। খুব খারাপ লাগতে লাগল যামিনীবাবুর।

তারপর তিনি মহাদেবের মন্দিরে গিয়ে পট্টবস্ত্র পরে শিবপুজো আরম্ভ করলেন সাড়ম্বরে। তাঁর গদগদ ভাব দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন যামিনীবাবু। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, নাক ফুলে ফুলে উঠছে, গড়গড করে সংস্কৃত স্তোত্র বলে যাচ্ছেন। প্রণাম করছেন তো করছেনই, আর ওঠেন না।

যামিনীবাবুকে বললেন, "বিশ্বাস করুন আর নাই করুন প্রার্থনা করতে ক্ষতি কি! হেঁট হ'য়ে ভালো করে প্রণাম করুন বাবা বদ্যিনাথকে। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

যামিনীবাবু একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন, তারপর ভদ্রতার খাতিরে মাথাটা ঝোঁকালেন একটু, কিন্তু ঠিক ভক্তি-গদগদ হতে পারলেন না। এ দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন সতীশবাবু, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর ফিস ফিস করে স্তোত্র আওড়ালেন একটা, তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। যামিনীবাবু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

তারপর তারা দেওঘরের ত্রিকূট পাহাড়ে গেলেন, আরও নানা দ্রষ্টব্য জায়গা দেখলেন।

তারপর একটা হোটেলে গেলেন। সেখানে গিয়ে বললেন, "ডবল ডিমের আমলেট দাও। আর কাটলেট যদি গরম ভেজে দিতে পার, তা-ও দাও খানচারেক করে।"

চোদ্দ

ডাক্তার যামিনী দত্ত অনেক কিছু দেখলেন, অনেক জায়গায় ঘুরলেন, হোটেলে ভালো ভালো খাবার খেলেন। কিন্তু সতীশবাবুর উপর তাঁর বিরক্তি বাড়তেই লাগল। লোকটা ছিঁনে জোঁকের মতো তাঁর সঙ্গে লেগে আছে! একদণ্ড নিস্তার নেই। তাঁর

মনে হতে লাগল, কি করে পালাই, কি করে এর হাত থেকে উদ্ধার পাই। সতীশবাবু এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন যামিনীবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা থাকা তাঁর একটা কর্তব্য, তাঁর মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখতে হবে। তাই তাঁকে নিয়ে নানা জায়গায় যাচ্ছিলেন, নানারকম জিনিস দেখাচ্ছিলেন। কিছু না পেলে গল্প করে তাঁকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যামিনীবাবুর কিছুই ভালো লাগছিল না। তিনি দুদিন সহ্য করলেন, তৃতীয় দিন বললেন, আমি আর কোথাও বেরুব না। বাড়িতেই থাকব। সতীশবাবু বললেন, তাহলে আমিও থাকব। একটু বিশ্রাম করা দরকার বই কি। বড্ড বেশি হৈ হৈ করা হচ্ছে। শুয়ে পড়লেন যামিনীবাবু। সতীশবাবুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে শুনতে লাগলেন তার বকবকানি। সতীশবাবু বলছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের পরমায়ু বেশিদিন নেই। ওরা বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। তারপর বলতে লাগলেন চোর-জোচ্চোরে সব লুটে পুটে খাচ্ছে, দেশের অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হ'য়ে উঠছে। তারপর হঠাৎ বললেন, কেবল শিং বা খুর দেখে যেমন গরুর আসল পরিচয় পাওয়া যায় না, বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মানুষ চেনাও তেমনি শক্ত। প্রায় সবাই মুখোশ পরে আছে। যামিনীবাবুর মনে হ'ল তাঁর বুক ধড়ফড় করছে, কানের ভিতর ঝিঁঝি ডাকছে। কিন্তু তিনি ভদ্রলোক, তিনি সতীশবাবুকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারলেন না, কথা বলতে বারণও করতে পারলেন না। সতীশবাবু নিজেই খানিকক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, "আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

তিনি চলে যাওয়ার পর যামিনীবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন, অনেকদিন পরে শান্তির আস্বাদ পেলেন যেন। মনে হ'ল একা ঘরে বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকা কি আরামের! নির্জনতাই সুখ। স্বর্গের পরিবেশ বোধহয় এই রকম নির্জন শান্ত। এ ক'দিন যা সব দেখেছেন সে সব বিষয়ে ভাববার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দেখলেন সতীশবাবুই তাঁর সমস্ত মগজ অধিকার করে বিরাজ করছেন।

"কি আশ্চর্য, লোকটা আমার জন্যই ছুটি নিয়ে আমার ভালোর জন্যই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ওর উদারতা আর বন্ধুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই"—ভাবতে লাগলেন যামিনীবাবু—"কিন্তু কি যন্ত্রণাদায়ক ওর এই উদারতা আর বন্ধুত্ব! লোকটার গুণ অনেক, কিন্তু ভীষণ একঘেয়ে ওর কথাবার্তা। সাংঘাতিক একঘেয়ে। কেবল চেষ্টা—কি করে আমাকে জ্ঞানের কথা আর ধর্মের কথা শোনাবে। কিন্তু বুঝতে দেরী হয় না যে, ও একটা গাড়োল ছাড়া আর কিছু নয়।"

এর পর কয়েকদিন আর যামিনীবাবু নিজের ঘর ছেড়ে বেরুলেন না। শরীর খারাপ হয়েছে এই ছুতোয় ঘরেই বসে রইলেন। সতীশবাবু যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণ যামিনীবাবু শুয়ে থাকতেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে, সতীশবাবুর কথার একটিও উত্তর দিতেন না। সতীশবাবুর কথাবার্তা আর বক্তৃতা অসহ্য মনে হ'ত তাঁর। সতীশবাবু বেরিয়ে যাবার পর নিশ্চিন্ত হতেন তিনি। সতীশবাবুর সঙ্গে এখানে এসেছেন বলে তাঁর

নিজের উপরই রাগ হতে লাগল। সতীশবাবুর উপর ক্রমশঃ বিরূপ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর মন। লোকটা আরও যেন বেশী গায়েপড়া হ'য়ে যাচ্ছে, বক্তৃতার মাত্রা বাড়ছে রোজ রোজ। যামিনীবাবু যে ধরনের চিন্তা করতে অভ্যস্ত তা করবার সুযোগই পাচ্ছিলেন না। লোকটা কানের কাছে ক্রমাগত ঘ্যানর ঘ্যানর করে যাচ্ছে। ভাবছিলেন, "চিন্ময় ছোকরা যে ধরনের বাস্তবের কথা বলত সেই বাস্তবের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণা ভোগ করছি।"

তিনি এই তুচ্ছ ব্যাপারের উর্ধ্বে উঠতে পারছিলেন না বলে তাঁর রাগ হচ্ছিল নিজের উপরই। শেষে ভাবলেন, "যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ নেই। যখন ফিরে যাব তখন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এর পর তাঁরা মধুপুর গেলেন। সেখানেও ওই একই ব্যাপার। একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন তাঁরা। যামিনীবাবু সেই ঘরে বিছানার উপর চুপচাপ শুয়ে থাকতেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে। কেবল খাওয়ার সময় উঠতেন।

"মন্দারে যাবেন? চলুন সেখানে যাওয়া যাক। মন্দার পাহাড়ের কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে, সেইখানেই খাসা থাকা যাবে। চলুন সেইখানেই যাই—"

"কি হবে মন্দারে গিয়ে"—করুণকণ্ঠে বললেন যামিনীবাবু—"যদি যেতে চান, আপনি একাই যান। আমি বাড়ি ফিরে যাই।"

"আরে না না, সে কি হয়"—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন সতীশবাবু—"মন্দারের মতো জায়গা খুব কম আছে। কি সুন্দর জলহাওয়া, যা খাবেন তাই হজম হ'য়ে যাবে। জিনিসপত্রও খুব সস্তা। ফাঁকা জায়গা, তাছাড়া মধুসূদন আছেন। পাহাড়ের উপর তাঁর মন্দিরটি চমৎকার। আমি ওখানে পাঁচ বছর কাটিয়েছি, কি সুখেই যে ছিলাম।"

যামিনীবাবু বেশী প্রতিবাদ করতে পারলেন না। সতীশবাবুর সঙ্গে মন্দার যেতে হ'ল। সেখানেও ওই একই ব্যাপার। ঘরে নিজের বিছানাতে শুয়ে থাকতেন যামিনীবাবু। রাগে বিরক্তিতে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। বাসার চাকরগুলো বাংলা কথা বোঝে না। বুঝতে চায় না। তাঁদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা কওয়া অসম্ভব, শুধু তাই নয়, হাস্যকরও। হিন্দী তিনি মোটেই বলতে পারেন না। কিন্তু সতীশবাবু মহানন্দে অদম্য উৎসাহে প্রাণের প্রাচুর্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে। সকালে বিকালে সন্ধ্যায়, কখনও বিরাম নেই। পুরোনো বন্ধুদের খুঁজে খুঁজে বার করছেন। কখনও কখনও বন্ধুদের বাড়িতে রাতও কাটাচ্ছেন। একদিন বাইরে সমস্ত রাত কাটিয়ে সকাল বেলা এসে হাজির হলেন! ভয়ানক উত্তেজিত, চোখ মুখ লাল, চুল বিস্রস্ত। এসে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ থেমে বললেন, "মানই সবার চেয়ে বড়।"

তারপর আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করে বললেন, "হ্যাঁ, মানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। কি কুক্ষণেই যে মন্দারে আসার বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছিল! জানেন ডাক্তারবাবু, আপনি শুনলে হয়তো আমাকে ঘৃণা করবেন, ঘৃণা করাই উচিত, জানেন,

কাল রাত্রে আমি জুয়া খেলেছি। জুয়া খেলে হেরে গেছি। আমাকে শ দুই টাকা দিতে পারেন ?"

যামিনীবাবু ক্ষণকাল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর নীরবে টাকাটা বার করে দিলেন।

সতীশবাবু লজ্জায় রাগে চোখ-মুখ লাল করে অসংলগ্ন ভাষায় কি যে বললেন তা বোঝা গেল না। তারপর বেরিয়ে গেলেন তিনি। ফিরলেন ঘণ্টা দুই পরে। ফিরে ইজিচেয়ারটায় ধপাস করে বসে বললেন, "যাক মানটা আমার বেঁচেছে। মানে মানে উদ্ধার পেয়েছি। চলুন সরে পড়ি, এখানে আর একদণ্ড থাকব না। এ একটা জোচ্চোরদের আড্ডা!"

শীত পড়েছিল। চারিদিকে বেশ ঠাণ্ডা। দুই বন্ধু ফিরে এলেন। স্বস্থানে যামিনীবাবু এসে দেখলেন তাঁর জায়গায় ডাক্তার ঘোষাল কাজ করছেন। তিনি তাঁর পুরোনো বাসাতেই আছেন, কিন্তু প্রতীক্ষা করছেন যামিনীবাবু ফিরে এসে কোয়ার্টারটা খালি করে দিলেই তিনি সেখানে চলে আসবেন। যে মেয়েটি তাঁর সঙ্গে এসেছিল যাকে তিনি রাঁধুনী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, সে হাসপাতালের একধারেই বাস করছে। শহরে হাসপাতাল সম্বন্ধে একটা জোর গুজব রটেছিল। ওই রাঁধুনী মেয়েটির সঙ্গে নাকি ইন্‌স্‌পেক্টরের খুব ঝগড়া হয়ে গেছে এবং ইন্‌স্‌পেক্টর নাকি হাঁটু গেড়ে মেয়েটির কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

যামিনীবাবু এসেই ঘর ভাড়া করতে বেরুলেন।

"একটা কথা জিগ্যেস করছি, মনে কিছু করবেন না"—সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে—"আচ্ছা, কত টাকা আপনার আছে বলুন দেখি—"

যামিনীবাবু তাঁর ব্যাগ বার করে গুনে বললেন, "একশ' আশি টাকা।"

"না, না, ব্যাগে কত আছে তা জানতে চাইছি না"—একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন সতীশবাবু—"সবশুদ্ধ কত টাকা আছে আপনার ?"

"ওইতো বললাম, একশ' আশি টাকা। ওই আমার যথাসর্বস্ব।"

সতীশবাবু অবাক হয়ে গেলেন। যদিও তিনি জানতেন যে, যামিনীবাবু সৎ লোক, অসদুপায়ে কখনও কোন উপার্জন করেন নি, তবু তাঁর ধারণা ছিল যে, অন্ততঃ হাজার বিশেক টাকা তিনি জমিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখলেন তিনি প্রায় নিঃস্ব, বাকি জীবনটা চালাবার মতো অর্থও তাঁর নেই। হঠাৎ তাঁর দুই চোখ জলে ভরে গেল, তিনি যামিনীবাবুকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

পনেরো

একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়িতে শেষে ঘর ভাড়া করলেন যামিনীবাবু। বাড়ির মালিক পুরুষ নয়, মেয়েছেলে। নাম সিন্ধুবালা। সিন্ধুবালার তিনটি ছেলে। স্বামীটি দুশ্চরিত্র

মাতাল। বাড়িতে তিনটি মাত্র ঘর। তুটি ঘর যামিনীবাবু নিয়েছিলেন। তৃতীয় ঘরটিতে পাঁচির মা আর সিন্ধুবালা রাত্রে শুত। সিন্ধুবালার স্বামী প্রায় রাত্রে বাড়ি ফিরত না। কিন্তু যেদিন ফিরত, মত্ত অবস্থায় ফিরত। এসে চীৎকার গালাগালি করত কুৎসিত ভাষায়, মাঝে মাঝে মারতেও যেত। ঘরের মধ্যে চেয়ার টেনে এনে বসত। তার উপর আবার চীৎকার করে বলত, মদ চাই। জলদি মদ আনাও। ছেলেগুলো ভয়ে কাঁদত। যামিনীবাবু তখন তাদের এনে নিজের ঘরে শোয়াতেন এবং তাদের ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতেন। এতে যেন বিশেষ আনন্দ পেতেন তিনি একটা।

যেমন তাঁর চিরকালের অভ্যাস, সকালে আটটায় উঠে চা খেয়ে পড়তে বসতেন। নূতন বই কেনার পয়সা ছিল না, পুরোনো বই আর মাসিকপত্রগুলোই পড়তেন। আগে পড়তে পড়তে তন্ময় হ'য়ে যেতেন, কিন্তু এখন আর তা হওয়া সম্ভব ছিল না। পুরোনো বই পড়তে পড়তেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়তেন তিনি শেষ পর্যন্ত। এইসব কারণে বই পড়া ছেড়ে দিলেন। বই গোছানোর দিকে মনোযোগ দিলেন। বইগুলির তালিকা করলেন, বইগুলির পিছনে কাগজ সেঁটে নম্বর দিলেন, সেগুলি ঝেড়েঝুড়ে সাজিয়ে রাখলেন আলমারিতে। এই একঘেয়ে কাজ করেও কিন্তু বেশ একটা শান্তি পেলেন তিনি। মনে কোনও চিন্তার ঝড় বইত না, প্রশান্ত মনে বই গুছিয়ে যেতেন তিনি। সময় বেশ কেটে যেত। এমন কি শেষে আলু পটল ছাড়াতেও ভালো লাগত তাঁর। পাঁচির মার অনেক কাজ করে দিতেন। চাল ডাল বেছে দিতেন। বেশ লাগত। সকাল সন্ধ্যায় পূজো করতে আরম্ভ করলেন। চোখ বুজে আসনে বসে থাকতেন চুপ করে। নানারকম দেবদেবীর মূর্তি ভেসে উঠত চোখের উপর। নানারকম ধর্ম, নানারকম দর্শনের কথা মনে হ'ত। বেশ ভালো লাগত পূজো করে।

চিন্ময় সান্যালের সঙ্গে গল্প করবার জন্য তুবার তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কিন্তু তুবারই দেখলেন চিন্ময় মোটেই প্রকৃতিস্থ নেই। ভয়ানক উত্তেজিত, ভয়ানক রাগ। তাঁকে দেখেই বলে উঠল, "আমাকে রেহাই দাও না বাবা। কেন বাজে বকবক করে জ্বালাতন করছ। আমার উপর যতদূর অত্যাচার করা সম্ভব তা তো করেইছ, একাও থাকতে দেবে না? এটুকু দয়াও করবে না?"

তুবারই যখন যামিনীবাবু তাকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন চিন্ময় চীৎকার করে উঠল—"জাহান্নমে যাও—।"

যামিনীবাবু তৃতীয়বার যেতে আর সাহস করলেন না, যদিও যেতে তাঁর খুবই ইচ্ছা করছিল।

আগে যামিনীবাবু বিকেলে চা খেয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে চিন্তা করতেন, কিন্তু এখন আর তা ভালো লাগত না। চুপ করে শুয়ে থাকতেন বিছানায় দেওয়ালের দিকে মুখ করে। সন্ধ্যার সময় পাঁচির মা আর এক কাপ চা দিয়ে যেত। এরপর নানারকম তুচ্ছ চিন্তা পেয়ে বসত তাঁকে। একটা কথা খুব বেশী করে মনে হ'ত—তিনি

কুড়ি বছর চাকরি করছেন, গভর্নমেণ্টের উচিত তাঁকে পেন্‌সন দেওয়া। কিন্তু কই কিছু দিচ্ছে না তো। যদিও চাকুরি জীবনে তিনি সব সময়ে বিবেক-নির্দিষ্ট পথে চলতে পারেন নি। কিন্তু গভর্নমেণ্ট কি বিবেক নিয়ে খুব মাথা ঘামায়? যারা চাকরি করছে, তারা সৎ বা অসৎ যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পেন্‌সন তো পায়। তাঁর বেলায় এ ব্যতিক্রম কেন। তাঁর টাকা-কড়ি ফুরিয়ে গিয়েছিল। রাস্তা দিতে চলতে লজ্জা করত তাঁর, দোকানদাররা চেয়ে থাকত তাঁর দিকে। অনেক বাকি পড়ে গেছে। প্রায় একশ' টাকা ধার হয়ে গেছে দোকানে। সিন্ধুবালাকেও বাড়িভাড়া দেওয়া হয়নি। পাঁচির মা গোপনে তাঁর বই আর জামাকাপড় বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করত। সে সিন্ধুবালাকে বলত ডাক্তারবাবু শিগগিরই অনেক টাকা পাবেন।

সতীশবাবুর পাল্লায় পড়ে বেড়াতে গিয়ে তাঁর প্রায় হাজার-খানেক টাকা খরচ হ'য়ে গেছে। ভেবে আপসোস হ'ত। টাকাটা এখন থাকলে সুবিধা হ'ত অনেক। আর বিরক্ত হতেন তিনি কেউ এলে। একা থাকতে দেবে না তাঁকে কিছুতে। কর্তব্যবোধে ডাক্তার ঘোষাল প্রায়ই দেখতে আসতেন তাঁকে। অসুস্থ সহকর্মীকে দেখাশোনা করা উচিত বই কি। কিন্তু যামিনী দত্ত বিরক্ত হতেন এতে। ঘোষালের টেবো-টেবো গাল, তাঁর মেকী ভদ্রতা, তাঁর "দাদা দাদা" বলে পিঠচাপড়ানো অসহ্য বোধ হ'ত তাঁর। লোকটা বুট পায়ে দিয়ে আসত। এতে আরও বিরক্ত হতেন তিনি। কিন্তু ঘোষাল যে তাঁর কাছে আসা একটা কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং তাঁর চিকিৎসার ভার নিয়েছেন একথা মনে হলে তাঁর রাগের আর সীমা থাকত না। প্রতিবারই ডাক্তার ঘোষাল সঙ্গে করে একটা জোলাপ আর ঘুমের ওষুধ আনতেন।

সতীশবাবুও কর্তব্যবোধে তাঁর কাছে আসতেন। তাঁর উদ্দেশ্য তাঁর মনটাকে চাঙ্গা করা। এ আর এক বিরক্তিকর ব্যাপার।

পুরাতন বন্ধুদের দাবি নিয়ে, চোখে-মুখে একটা মেকী আনন্দের ভাব ফুটিয়ে ঘরে ঢুকতেন তিনি। ঢুকেই বলতেন, "বাঃ চেহারা তো আজ বেশ ভাল দেখছি। এইবার ঠিক সেরে যাবেন।" তাঁর ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হ'ত তিনি যেন যামিনী দত্তকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলেন। মন্দারে যে টাকাটা তিনি নিয়েছিলেন সেটা ফেরত দেননি, আর এ লজ্জাটা ঢাকবার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি আরও জোর করে হাসতেন আর মজার মজার গল্প করতেন। তাঁর মজার গল্প যেন আর ফুরোতে চাইত না এবং শেষ পর্যন্ত তা সতীশবাবু এবং যামিনীবাবু উভয় পক্ষেই যন্ত্রণাদায়ক হ'য়ে উঠত।

সতীশবাবু এলেই যামিনীবাবু পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকতেন, আর দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর কথা শুনতেন। তাঁর মনে হ'ত তাঁর মনের উপর কেউ যেন কাদার প্রলেপ দিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশঃ তা যেন তাঁর শ্বাসরোধ করে ফেলছে।

একটি কথা ভেবে তিনি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করতেন—কিছুদিন পরে কেউ থাকবে

না। তিনি, ডাক্তার ঘোষাল, সতীশবাবু কোন চিহ্ন না রেখে মহাকালগর্ভে বিলীন হ'য়ে যাবেন। এককোটি বছর পরে কোনও বিদেহী আত্মা যদি পৃথিবীর আকাশ দিয়ে উড়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে সে কাদা আর পাথর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম সব লোপ পাবে. ঘাসের একটি পাতাও গজাবে না। এই যদি হয় তাহলে ওই দোকানদারের চাউনি. ডাক্তার ঘোষালের জঘন্য ব্যবহার, সতীশবাবুর উৎপীড়ন—এসবে কিইবা এসে যায়।

কিন্তু এ সান্ত্বনাও মাঝে মাঝে ঘোলাটে হ'য়ে যেত। তিনি কল্পনা করতেন যে, এককোটি বছর পরে ডাক্তার ঘোষাল হয়তো কোনও পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন, কিংবা সতীশবাবু অট্টহাস্য করতে করতে এসে চুপি চুপি তাঁর কানে কানে বলছেন, "আপনার মন্দারের ধারটা আমি শোধ করে দেব, দিনকয়েক পরেই দেব, সত্যি দেব।"

ষোলো

একদিন ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে সতীশবাবুও এলেন। যামিনী দত্ত বিছানায় শুয়েছিলেন, অতি কষ্টে উঠে বসলেন। দেখতে পেলেন ডাক্তার ঘোষাল তাঁর জন্যে আবার ঘুমের ওষুধ এনেছেন।

"বাঃ, আপনি আজ বেশ ভালো আছেন দেখছি"—সতীশবাবু শুরু করলেন—"কালকের চেয়েও আজ আপনাকে ভালো দেখাচ্ছে। চমৎকার দেখাচ্ছে।"

"দাদা, তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন''—ডাক্তার ঘোষাল তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন,—"এভাবে শুয়ে থাকতে কি আপনারই ভালো লাগছে।"

"আরে না না, এইবার সেরে উঠছেন উনি"—বলে উঠলেন সতীশবাবু—"লাট্টুর মতো ছুটে বেড়াবেন চতুর্দিকে। আরও একশো বছর আমরা পৃথিবীকে ভোগ করবো, দেখে নেবেন।"

"একশো বছরের কথা বলতে পারি না"—মৃদু হেসে ডাক্তার ঘোষাল বললেন—"কিন্তু আরও বছর কুড়ি ওঁর কাটানো উচিত। কিন্তু দাদা, মনে হচ্ছে আপনি দমে গেছেন! দমবার কি আছে, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে উঠুন—"

''উঠবেনই তো"—চীৎকার করে উঠলেন সতীশবাবু—"আমরা যে কি মাল দিয়ে তৈরি তা দেখতে পাবেন। দেখিয়ে দেব আমরা। এর পরের বার আমরা হরিদ্বারে বেড়াতে যাব, ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে উঠব, মনের আনন্দে বলব—হেট্ হেট্ হেট্। তারপর হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে বিয়ের ব্যবস্থা করব"—বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, ভালো কনে খুঁজে আপনারই বিয়ে দেব—"

যামিনী দত্ত যেন অনুভব করলেন তাঁর গলা পর্যন্ত কান্না ভরে উঠেছে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।

"এসব কি নোংরামি"—হঠাৎ উঠে তিনি জানালার কাছ পর্যন্ত গেলেন—"এরকম অসভ্যতা করছেন কেন আপনারা—"

তিনি মৃদু শান্ত কণ্ঠেই কথাগুলো বলবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তা হ'ল না। তিনি ঘুষি পাকিয়ে দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেরিয়ে যান এখান থেকে।" তাঁর মুখ লাল হ'য়ে গেল, রাগে তিনি কাঁপতে লাগলেন। "বেরোন, বেরোন, দুজনেই বেরিয়ে যান—"

ডাক্তার ঘোষাল আর সতীশবাবু দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠলেন, অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন যামিনী দত্তের দিকে।

"বেরিয়ে যান দুজনেই"—আবার চীৎকার করে উঠলেন যামিনী ডাক্তার—"গেট্ আউট্! বোকা হাঁদার দল সব। তোমাদের বন্ধুত্বও চাই না, ওষুধও চাই না। বেরোও এখান থেকে। ছোটলোক, পাজি—"

ডাক্তার ঘোষাল আর সতীশবাবু পরস্পরের দিকে চেয়ে পিছু হাঁটতে হাঁটতে দরজার কাছ পর্যন্ত এলেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

যামিনীবাবু ঘুমের ওসুধের বোতলটা তুলে নিয়ে তাঁদের পিছু পিছু গিয়ে ছুঁড়ে দিলেন সেটা। ঝনঝন করে চুরমার হ'য়ে গেল বোতলটা।

"চুলোয় যাও, জাহান্নমে যাও সব।"

যামিনীবাবুর চীৎকারে কান্নার আভাস পাওয়া গেল একটা। তারপর তিনি কাঁপতে লাগলেন, কম্প দিয়ে জ্বর এল যেন। বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে বলতে লাগলেন—"বোকা হাঁদা ছোটলোক সব!" একটু যখন শান্ত হলেন তখন তাঁর মনে হ'তে লাগল, ছি ছি! সতীশবাবু হয়তো কি মনে করেছেন। কি কাণ্ড করে ফেললেন তিনি। ছিঃ! এমন বেসামাল তো তিনি আগে হননি। তাঁর ভদ্রতা, সুরুচি, শালীনতা—এসব লোপ পেল কি করে?

ধিক্কারে আর লজ্জায় তাঁর মন ভরে উঠল। সমস্ত রাত তিনি ঘুমুতে পারলেন না। সকালে উঠে সতীশবাবুর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন। সতীশবাবু তখন পোস্টাপিসে ছিলেন।

"আরে না না, ওসব কথা মনে রাখবার মতো নয়"—সতীশবাবু খুব দরদ দিয়ে বললেন—"যা হয়ে গেছে, যেতে দিন। ঝামরু"—পিয়নকে এমন জোরে হাঁক দিলেন তিনি যে, পোস্টাপিসের সকলে চমকে উঠল—"এই ঝামরু। একটা চেয়ার দিয়ে যাও এখানে। বাছা, একটু থাম না অমন ঘোড়ায় চড়ে এলে কি কাজ হয়, নিচ্ছি তোমার রেজিস্ট্রী। দেখছ না ব্যস্ত আছি।"

একজন বুড়ি একটা রেজিস্ট্রী এনেছিল, সে বেচারা একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল।

"যা হ'য়ে গেছে, তা হ'য়ে গেছে, বুঝলেন, ও নিয়ে আর কচলাবেন না। বসুন, বসুন।"

তারপর তিনি মিনিট খানেক ধরে হাঁটু নাচালেন। তারপর বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমার একটুও রাগ বা দুঃখ হয়নি। অসুখে পড়লে লোকের মেজাজ খারাপ তো হবেই। ডাক্তার ঘোষাল আর আমি দুজনেই কাল কিন্তু আপনার ওই ব্যাপার দেখে একটু ভড়কে গেছলাম। আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে। আপনি আপনার অসুখটাকে অবহেলা করছেন কেন? এ বিষয়ে একটু সিরিয়াস হোন। আমি আপনার বন্ধু বলেই বলছি।"—তারপর কণ্ঠস্বর একটু নীচু করে বললেন—"কিন্তু আপনি যেখানে আছেন সে জায়গাটা অতি বদ। চারিদিকে ছোট-লোকের ভিড়, কথা কইবার লোক নেই, নোংরা, কেউ যত্ন করবার নেই। ওখানে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে না। একটা কথা শুনবেন? ডাক্তার ঘোষালেরও এই মত। আপনি হাসপাতালে চলুন। সেখানে ভালো খাবার পাবেন, আপনাকে সবাই যত্ন করে সেবা-যত্ন করবে। ডাক্তার ঘোষাল খুব মাই ডিয়ার লোক, ডাক্তারও ভালো, তাঁর উপর বিশ্বাস করা যায়। তিনি বলেছেন যে, ভালোভাবে আপনার দেখাশোনা করবেন। যা বলছি শুনুন, বুঝলেন—"

যামিনীবাবু পোস্টমাস্টারের আকুলতা দেখে, বিশেষ করে তাঁর চোখে জল দেখে বিচলিত হলেন।

"আপনি আমার ঘনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু"—যামিনীবাবু বললেন—"আপনাকে আমি বলছি ওঁদের কথা বিশ্বাস করবেন না! ওঁরা যা বলছেন তা মিথ্যা আমার কোন অসুখ নেই। আসল ব্যাপার হচ্ছে গত কুড়ি বছরের মধ্যে আমি একটিমাত্র বুদ্ধিমান লোকের দেখা পেয়েছি এবং সে লোকটি পাগল। আমার কোনও অসুখ নেই, আমি একটা দারুণ ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছি, তার থেকে বেরুতে পারছি না। এই আমার অবস্থা। এখন আপনারা যা ইচ্ছে করুন। আমি গ্রাহ্য করি না।"

"আপনি হাসপাতালেই যান।"

"তাতেও আপত্তি নেই। আপনারা যদি চান, আমাকে জীবন্ত কবরও দিতে পারেন।"

"একটা প্রতিশ্রুতি দিন আমাকে। ডাক্তার ঘোষালের পরামর্শ অনুসারে চলবেন।"

"বেশ দিলুম। কিন্তু আমি আবার আপনাকে বলছি, আমার অসুখ করেনি, আমি একটা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে গেছি। বুঝতে পারছি এখন থেকে সব কিছুই, এমন কি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর গভীর সমবেদনাও একই অনিবার্য পরিণতির দিকে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে—সে পরিণতি হচ্ছে আমার মৃত্যু। আমি মরছি এবং সেটা উপলব্ধি করবার সাহস আমার আছে।"

"কিন্তু আমি বলছি, আপনি ভালো হ'য়ে যাবেন।"

"এসব কথা বলে লাভ কি। পৃথিবীর নিয়মই এই। সবাইকে এই একই পথে চলতে হবে। ব্যক্তি বিশেষে একটু ইতর-বিশেষ হ'তে পারে। আপনার কিডনি খারাপ হোক, কিংবা হার্ট ই খারাপ হোক, কিংবা মাথাই খারাপ হোক—যেই লোকে ধরে ফেলবে যে, আপনার কিছু একটা খারাপ হয়েছে অমনি আপনি ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যাবেন—তার থেকে আর উদ্ধার নেই। যত হাঁকুপাঁকু করবেন তত আরও ডুবে যাবেন। সুতরাং আত্মসমর্পণ করাই উচিত। কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। অন্ততঃ এই আমার মত।"

ইতিমধ্যে পোস্টাপিসের জানালার কাছে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। তা দেখে যামিনীবাবু উঠে পড়লেন। সতীশবাবু এগিয়ে দিয়ে এলেন তাঁকে দরজা পর্যন্ত। যাবার আগে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা আবার মনে করিয়ে দিলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে ডাক্তার ঘোষাল এলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তাঁর গায়ে গরম জামা, পায়ে বুট। যেন বিশেষ কিছু নয় এমনিভাবে কথাটা পাড়লেন।

"দাদা, আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি। হাসপাতালের একটা রুগীর বিষয়ে আপনার একটু পরামর্শ চাই। রুগীটাকে দেখবেন গিয়ে?"

যামিনীবাবুর মনে হ'ল ঘোষাল তাঁর ভালোর জন্যই এসেছে। ভেবেছে বোধহয় যে, হাসপাতালে গিয়ে রুগী-টুগী দেখলে তাঁর মনটা ভালো থাকবে, হাঁটলেও হয়তো শরীরটা চাঙ্গা হবে একটু। আগের দিন ঘোষালের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছেন তার জন্য লজ্জিত হলেন। ঘোষাল সে কথার উল্লেখ পর্যন্ত করল না দেখে কৃতজ্ঞতাও অনুভব করতে লাগলেন। ঘোষালের কাছে এ ধরনের ভদ্রতা তিনি প্রত্যাশা করেন নি।

"আপনার রুগী কোথায়?"

"হাসপাতালে। অনেকদিন থেকেই ভাবছি আপনাকে দেখাব। অদ্ভুত কেসটা—"

তাঁরা হাসপাতালে এলেন। এসে সোজা চলে গেলেন অ্যানেক্সের দিকে। দুজনেই নীরব। অ্যানেক্সে আসতেই নন্দী যথারীতি সেলাম করে উঠে দাঁড়াল।

"এইখানেই একটা রুগীর লাংসে কি যেন হয়েছে"—আমতা আমতা করে বললেন ডাক্তার ঘোষাল—"আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি এখুনি, স্টেথোস্কোপটা নিয়ে আসি।"

বলেই তিনি চলে গেলেন।

সতেরো

চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। চিন্ময় সান্যাল নিজের বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটা বসেছিল অনড় হ'য়ে, চোখ দিয়ে জল

পড়ছিল তার, ঠোঁট দুটো ক্রমাগত নড়ছিল। কেউ জেগে ছিল না। সেই মোটা লোকটাও ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাঢ় নীরবতা ঘনিয়ে এসেছিল ঘরটায়।

যামিনী দত্ত চিন্ময়ের বিছানার একধারে বসেছিলেন। আধ ঘণ্টা কেটে গেল, ডাক্তার ঘোষাল এলেন না। তাঁর বদলে এল নন্দী। তার হাতে এক সেট রোগীর পোশাক।

"হুজুর, পোশাকটা বদলে ফেলুন। এইটে আপনার খাট—"একটা খালি খাট দেখিয়ে নন্দী বললো—"ভালো হ'য়ে যাবেন হুজুর, ভাববেন না, ভগবান দয়া করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ডাক্তার যামিনী দত্ত তখন বুঝতে পারলেন সব। একটি কথাও না বলে তিনি খাটটায় গিয়ে বসলেন। তারপর যখন বুঝলেন নন্দী পোশাকগুলো নিয়ে অপেক্ষা করছে, তখন নিজের পোশাক খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গেলেন তিনি। অদ্ভুত লাগছিল তাঁর। তারপর হাসপাতালের পোশাক পরে ফেললেন। কোটটা একটু বেশী ঢলঢলে মনে হ'ল। মনে হ'ল কোট থেকে একটা আঁশটে গন্ধ ছাড়ছে।

"কিচ্ছু ভাববেন না হুজুর, ভগবান দয়া করলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

তাঁর কাপড়চোপড়গুলো নিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নন্দী চলে গেল।

"সবই সমান"—ঢলঢলে কোটটাকে গায়ে জড়িয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি, "কোন তফাত নেই। ভালো দরজীর তৈরী জামা আর এই জামাতে কোন তফাত নেই। সব সমান"—

কিন্তু তাঁর ঘড়িটা? নোটবুকটা? সিগারেটগুলো? নন্দী সবই নিয়ে গেল নাকি! তখন তাঁর মনে হ'ল এ জীবনে বোধহয় তিনি আর ওসব জামাকাপড় পরতে পারবেন না। অদ্ভুত লাগছিল তার প্রথমে। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর বাড়িতে আর এই ছ'নম্বর ওয়ার্ডে কিছু তফাত নেই। পৃথিবীতে সবই অর্থহীন, সবই অলীক, সবই মায়া। কিন্তু তাঁর হাত দুটো কাঁপতে লাগল। চিন্ময় সান্যাল যে তাঁকে এই বেশে দেখবে এই ভেবে তিনি দমে গেলেন। তিনি উঠে পায়চারি করলেন একটু, তারপর আবার এসে বসলেন।

আধ ঘণ্টা কাটল, তারপর এক ঘণ্টা, ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কি এইভাবে কাটানো সম্ভব? আবার একটু পায়চারি করলেন, আবার খাটে এসে বসলেন, তারপর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চাইলেন একবার। বাস্, এরপর আর কি করবার আছে? কিচ্ছু নেই! তারপর ছবির মতো বসে থাকতে হবে খাটের উপর? না, না, তা অসম্ভব, অসম্ভব।

যামিনীবাবু খাটটায় শুয়ে পড়লেন, তারপর উঠে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে ফেললেন। আবার অনুভব করলেন জামাটায় ভীষণ আঁশটে গন্ধ।

"না, না, ওরা ভুল করেছে"—হঠাৎ দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন তিনি—"ওদের বলতে হবে। ওরা ভুল করেছে—"

চিন্ময় সান্যালের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসল সে। দুই মুঠোর উপর গাল দুটো রেখে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর থুতু ফেলল। তারপর যামিনীবাবুর দিকে চেয়ে দেখল এক নজর। প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। তারপরই কিন্তু সমস্ত মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটা নিষ্ঠুর আনন্দ যেন চকমক করতে লাগল তার চোখে-মুখে।

"ও, তোমাকেও তাহলে ওরা এনেছে এখানে। স্বাগত, স্বাগত! এতদিন তুমি পরের রক্ত শুষেছিলে, এবার ওরা তোমার রক্ত শুষবে। বাঃ"—

"ওরা ভুল করেছে"—মৃদুকণ্ঠে বললেন যামিনীবাবু। চিন্ময়ের ভাবভঙ্গী দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। আবার বললেন, "ওরা ভুল করে এনেছে আমাকে এখানে।"

চিন্ময় সান্যাল আবার থুতু ফেলে শুয়ে পড়ল। "অভিশপ্ত জীবন!"—শুয়ে শুয়েই বলতে লাগল সে—"আর সব চেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে যে, আমাদের এই নিদারুণ কষ্টের শেষে আমরা ভালো কিছু পাব না, নাটকে যেমন হয়, দুঃখের শেষে সুখ, তেমন কিছু হবে না। আমরা এখানে মরব। আর দুটো মেথর এসে আমাদের পা ধরে, টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে। বাস্। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। এ জীবনের পরে আমাদের সুদিন আসবে। আমি ভূত হ'য়ে এসে এদের ভয় দেখাব, এদের জীবন দুর্বহ করে তুলব"—

এই সময় জিতু ফিরে এল। ডাক্তারবাবুকে দেখে হাত বাড়িয়ে বললে, "একটা পয়সা দিন না হুজুর—"

আঠারো

যামিনীবাবু জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। অন্ধকার হ'য়ে এসেছিল, শীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ উঠছিল দূরে। কিছুদূরে শাদা প্রকাণ্ড জেলটা দেখা যাচ্ছিল। পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

"এই তাহলে বাস্তব"—হঠাৎ মনে হ'ল যামিনীবাবুর। ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। সবই ভয়ংকর মনে হ'তে লাগল। চাঁদ, জেলখানা, কাঁটাতার দেওয়া রেলিং, দূরে ইটের ভাটায় যে আগুন জ্বলছিল সেই আগুনের হল্‌কা—সমস্তই ভয়ংকর। হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর, পিছনে দাঁড়িয়ে কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। দেখলেন একজন লোক নানারকম মেডেল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তাঁর দিকে চেয়ে শয়তানের মতো হাসছে।··· যামিনীবাবু নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, কিছুই ভয়ংকর নয়, সবই স্বাভাবিক। ওই চাঁদ, জেলখানা, যে সব লোক গভর্নমেণ্টের অনুগ্রহ আর মেডেল পায় তারা, সবাই স্বাভাবিক। কালক্রমে সবই নষ্ট হ'য়ে ধুলায় বিলীন হবে। কিছুই কিছু নয়।

কিন্তু আবার সহসা হতাশায় তিনি যেন অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। দু'হাতে জানালার গরাদেগুলো ধরে ঝাঁকানি দিতে লাগলেন। মজবুত গরাদে নড়ল না। তারপর একটু পায়চারি করলেন। ভাবলেন, না এভাবে দমে যাওয়া ঠিক নয়। চিন্ময়ের কাছে গিয়ে বললেন, "ভাই, বড়ই দমে গেছি। কি করি বল তো—"

"আপনার মায়াবাদ আওড়ান —"

"মায়াবাদ? হ্যাঁ, মনে পড়ছে তুমি একদিন বলেছিলে যে, এদেশে সবাই দার্শনিক, এমন কি চাষা পর্যন্ত। কিন্তু দার্শনিক হলে ক্ষতি কি? মায়াবাদ কি অনিষ্টকর?"

যামিনীবাবুর কণ্ঠস্বর কান্নার মতো শোনালো। "আমাকে ব্যঙ্গ করছ কেন বন্ধু? মায়াবাদের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ানো ছাড়া আর আমাদের কি করবার আছে বল? সুখ তো কোথাও নেই। আমি লেখাপড়া শিখেছিলাম, বাবা আমাকে ডাক্তারী পড়িয়েছিলেন, ডাক্তারী 'নোব্‌ল' প্রফেসন! কিন্তু আমি সারাজীবন কি নোব্‌ল কাজ করলাম? দাদের মলম, ম্যালেরিয়ার প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন, ফোড়াকাটা আর আপিসের কেরানীগিরি, আর অসংখ্য অসভ্য লোকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করা। এ ছাড়া আর করেছি কি! উঃ ভগবান, এই কি কপালে লিখেছিলে!"

"আপনি যা তা বলছেন। ডাক্তার হ'তে যদি আপত্তি ছিল, রাজনৈতিক নেতা হ'তে পারতেন।"

"না, ভাই, কিছু করবার উপায় নেই। বন্ধু, আমরা দুর্বল··· · আমি আগে এ সব ভাবতামই না, তর্ক করতাম, যুক্তি নিয়ে আস্ফালন করতাম। কিন্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়েই কাবু হ'য়ে পড়লাম আমি—একেবারে শুয়ে পড়লাম। ভাই আমরা দুর্বল, আমরা অসহায়। তুমিও তাই। তুমি বুদ্ধিমান, উদার, মায়ের দুধের সঙ্গে তোমার বংশের গরিমাধারা তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে—কিন্তু জীবন আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি কাবু হ'য়ে পড়েছ। দুর্বল, আমরা সবাই দুর্বল—"

একটা কিসের যেন অভাব অনুভব করছিলেন তিনি অনেকক্ষণ থেকে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলেন। চা আর সিগারেট।

"আমি এখুনি আসছি"—চিন্ময়কে বললেন তিনি—"ওদের একটা আলো দিতে বলি। অন্ধকারে থাকা যাচ্ছে না, থাকা অসম্ভব।"

যামিনীবাবু এগিয়ে গিয়ে কপাটটা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে নন্দী এসে হাজির হ'ল।

"কোথা যাচ্ছেন? বাইরে যাওয়া চলবে না।"

"আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে একটু বেড়িয়ে আসব।"

নন্দীর মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়ে গেলেন তিনি।

"না, বাইরে যাবার হুকুম নেই। আপনি কি জানেন না?"

নন্দী তাঁর মুখের উপর দড়াম্ করে কপাটটা বন্ধ করে দিয়ে কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

"একটু বেড়িয়ে এলে ক্ষতি কি! এ তো আমার মাথায় ঢুকছে না। আমাকে যেতে দাও নন্দী, আমাকে যেতেই হবে।"

"কেন বৃথা হাল্লা করছেন আপনি"—নন্দীর কণ্ঠস্বরে একটা ভৎর্সনার সুর ফুটে উঠল।

"এ কি সাংঘাতিক কাণ্ড"—হঠাৎ চীৎকার করে উঠল চিন্ময় সান্যাল—লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে— বাইরে যেতে দেবে না কেন? আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করবার কি অধিকার আছে তোমার? গভর্নমেণ্টের আইন হচ্ছে বিনা বিচারে কেউ কাউকে আটকে রাখতে পারবে না। এ জুলুম! এ অবিচার।"

"নিশ্চয়ই অবিচার"—চিন্ময়ের সমর্থন পেয়ে যামিনীবাবু যেন একটু জোর পেলেন।

"আমি বেরোতে চাই। আমাকে বেরোতে হবেই। ওর কি অধিকার আছে আমাকে বাধা দেবার। কপাট খোল, কপাট খোল বলছি।"

"ওরে ব্যাটা শুনতে পাচ্ছিস না"—দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চিন্ময় চীৎকার করতে লাগল—"খোল কপাট, তা না হলে এক লাথিতে ভেঙে ফেলব। বেটা কসাই কোথাকার!"

কপাটের ওপার থেকে নন্দী বলতে লাগল, "বলে যাও, যা খুশি বলে যাও।"

"কপাট না খোলো তো ডাক্তার ঘোষালকে ডেকে আন। তাঁর সঙ্গে কথা বলব।"

"তিনি কাল আসবেন।"

"ওরা আমাদের কিছুতেই বেরুতে দেবে না"—

চিন্ময় বললে—"আমাদের পচাবে এখানে। মৃত্যুর পর যদি নরক না থাকে তাহলে কি হবে, এই পাষণ্ডগুলো ছাড়া পেয়ে যাবে? বিচার বলে কি কিছুই নেই? ওরে, খোল না কপাটটা। দম বন্ধ হয়ে আসছে যে আমাদের"—তারস্বরে চীৎকার করতে পাগল চিন্ময়। কপাটে লাথি মারতে লাগল—"আমি এখানে মাথা খুঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে মরব। খুনে, খুনে, এরা সব খুনে—"

নন্দী হঠাৎ কপাট খুলে এক ধাক্কায় চিন্ময়কে সরিয়ে দিল একধারে। তারপর যামিনী দত্তকে ধরে শুইয়ে ফেলল বুকে হাঁটু দিয়ে, তারপর এক প্রচণ্ড ঘুষি মারল তাঁর মুখের উপর। যামিনীবাবু কেমন যেন অসাড় হয়ে গেলেন। নন্দী তাঁর পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল তাঁকে তাঁর বিছানার কাছে। যামিনীবাবু মুখে কেমন যেন নোনতা স্বাদ পেলেন একটা। তাঁর দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছিল। তিনি আকুলভাবে হাত নাড়তে লাগলেন। কিন্তু উঠতে পারলেন না। মনে হ'ল কে যেন তাঁকে আরও দুটো ঘুষি লাগাল। যামিনীবাবু শুনতে পেলেন চিন্ময়ও চীৎকার করছে, নন্দী তাকেও ঠ্যাঙাচ্ছে খুব।

তারপর সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকল, মেঝের উপর জালের মতো ছায়া পড়ল একটা। সমস্তই ভয়ংকর মনে হ'তে লাগল যামিনীবাবুর। বিছানার উপর রুদ্ধশ্বাসে শুয়ে ছিলেন তিনি, অপেক্ষা করছিলেন, নন্দী আরও বোধহয় মারবে। তাঁর মনে হচ্ছিল তাঁর পেটের ভিতর একটা কাস্তে ঢুকিয়ে কে যেন সেটা ক্রমাগত ঘোরাচ্ছে। বুকের ভিতরও। অসহ্য যন্ত্রণায় বালিশ কামড়ে ধরছিলেন তিনি, দাঁতে দাঁত দিয়ে, দু'হাত মুঠো করে বিছানায় পড়ে ছিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তাঁর, বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন তিনি। মনে হ'ল এ লোকগুলোও তো দিনের পর দিন এই কষ্ট পেয়েছে। এখন ম্লান জ্যোৎস্নায় তারা ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। গত কুড়ি বছর তিনি কি করে উদাসীন ছিলেন এ সম্বন্ধে? এদের ব্যথা কি বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন কোনওদিন? না, তিনি কিচ্ছু করেন নি। এ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না তাঁর। তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না, তাঁর ধারণাই ছিল না। নন্দীর মতো তাঁর বিবেকও তাঁকে রেহাই দিল না। মনে হ'ল তাঁর পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর ইচ্ছে হ'ল লাফিয়ে উঠে চীৎকার করি। নন্দী, ঘোষাল, কম্পাউণ্ডার, নার্স—সবাইকে খুন করে শেষে নিজে আত্মহত্যা করি। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরুল না। তাঁর পা দুটো অবশ হ'য়ে পড়ে রইল। রাগে ক্ষোভে দুঃখে শেষে তিনি হাসপাতালের জামাটাকে ছিঁড়তে লাগলেন। ছিঁড়তে ছিঁড়তে শেষে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

উনিশ

পরদিন যখন যামিনীবাবুর ঘুম ভাঙল তখন তাঁর মাথা দপদপ করছে, কানের ভিতর ঝিঁঝিঁ শব্দ হচ্ছে অদ্ভুত একটা, আর সর্বাঙ্গে ব্যথা! গত রাত্রের কথা ভেবে তাঁর কোনও লজ্জা হ'ল না। মনে হ'ল তাঁরই দোষ, তিনি নিজেই কাপুরুষের মতো ব্যবহার করেছিলেন। চাঁদকে তাঁর ভয় করছিল! তাছাড়া এমন সব কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল যা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল না। সাধারণ লোক দুর্বল বলে দর্শনের আশ্রয় নিয়েছে? এটা বলা উচিত হয়েছে কি? কিন্তু এখন তাঁর আর কোন দুঃখ বা ভয় ছিল না। বেপরোয়া হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। কিচ্ছু খেলেন না, অনড়, নির্বাক হ'য়ে পড়ে রইলেন বিছানায়।

"আমি আর কারো তোয়াক্কা করি না"—ভাবতে লাগলেন তিনি—"কারো কথার আর জবাব দেব না। কিচ্ছু তোয়াক্কা করি না।"

দুপুরের পর সতীশবাবু চা আর মিষ্টি নিয়ে দেখা করতে এলেন। পাঁচির মা-ও এল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তার বিষণ্ণ মুখ আর দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল সত্যিই সে যামিনীবাবুকে শ্রদ্ধা করত। ডাক্তার ঘোষাল এক শিশি ঘুমের ওষুধ নিয়ে এলেন।

এসে নন্দীকে বললেন, "চারিদিক সাফসুতরো কর। ফিনাইল দাও! ভালো করে ধুনো দাও।"

সন্ধের দিকে সন্ন্যাসরোগে যামিনীবাবু মারা গেলেন। প্রথমে কম্প হ'ল, তারপর বমি। তাঁর মনে হ'তে লাগল জঘন্য কি যেন একটা বস্তু তাঁর শরীরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আঙুলের ডগা পর্যন্ত। পেট থেকে মাথা পর্যন্ত উঠছে, চোখ কান নাক সব যেন ভরে যাচ্ছে। সমস্ত জিনিস যেন পাণ্ডুর হ'য়ে যাচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু এসেছে। এও তাঁর মনে হ'ল চিন্ময় সান্যাল, সতীশবাবু এবং আরো লক্ষ লক্ষ লোকে অমরত্বে বিশ্বাস করে। সত্যি এরকম কিছু আছে কি? ইহলোকের পর পরলোক আছে? কিন্তু এ নিয়ে আর বেশী ভাববার ইচ্ছা হ'ল না তাঁর। এমনি একবার মনে হ'ল শুধু। কয়েকদিন আগে একটা বই পড়েছিলেন। তাতে হরিণের কথা ছিল। তাঁর মনে হ'ল একদল হরিণ যেন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে: তারপর দেখলেন একটি সুন্দরী মেয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে; তারপর পোস্টাপিসের জানালার সেই বুড়ি মেয়েটা, যে চিঠি রেজিস্ট্রি করতে এসে ধমক খেয়েছিল সতীশবাবুর কাছে, তাকেও দেখতে পেলেন যেন।...তারপর সব মিলিয়ে গেল, সব অন্ধকার, যামিনীবাবু সম্পূর্ণ অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

হাসপাতালের দুটো মেথর এসে তাঁর হাত পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আর একটা ঘরে রাখল।

তারপর সৎকার সমিতিকে খবর দেওয়া হ'ল। জন ছয়েক লোক এসে একটা দড়ির খাটিয়ায় তুলে, শাদা চাদর ঢাকা দিয়ে, কিছু ফুলপাতা সাজিয়ে বলহরি হরিবোল করতে করতে নিয়ে গেল তাঁকে শ্মশানে। সতীশবাবু শ্মশানের সব খরচ বহন করলেন। পাঁচির মা কাঁদতে কাঁদতে শ্মশান পর্যন্ত গেল।

● নিবেদন—এ. পি. শেখভের 'ওয়ার্ড নম্বর সিক্স' গল্পের ভাবানুবাদ।

গল্পগ্রন্থ

দূরবীন

উৎসর্গ

শ্রীমান বাণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণবরেষু

আইনের বাইরে

খুব দুঁদে ডেপুটি ছিলেন বিশ্বম্ভর বাঁড়ুয্যে। হামদো মুখ, গোল গোল ভঁাটার মতো চোখ, ভেড়ার শিংয়ের মতো গোঁফ। চিবুকের ঠিক মাঝখানে কালো আঁচিল একটা। আঁটসাঁট বলিষ্ঠ-গঠন ব্যক্তি। দেখলেই ভয় পেত সবাই। তিনি চাইতেনও যে সবাই ভয় পাক। কারো দিকে যখন চাইতেন, কটমট করে চাইতেন। তাঁর ধারণা পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বোম্বেটে বদমাইশ, যত দূরে থাকে ততই ভালো। কারও সম্বন্ধে কোন দুর্বলতা ছিল না তাঁর। কেবল তাঁর মেয়ে সুবি ছাড়া। তাঁর ওই মা-হারা মেয়েটাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। সুবি তাঁর একমাত্র সন্তানও। ওকে কেন্দ্র করেই তাঁর সংসার। বাড়িতে দ্বিতীয় লোক ছিল না। তাই, যদিও তিনি আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না, তবু সুবিকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলেন। তাঁকে তো সমস্ত দিন কাছারিতে থাকতে হত, বাড়িতে ওকে দেখবে কে। গতানুগতিক পথ ধরে সুবি স্কুল থেকে ক্রমশ কলেজেও গেল! বিশ্বম্ভর মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন বি.এ. পাশ করলে তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমদাচরণ মুকুজ্যের ছেলে সমরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। সমরও মাতৃহারা এবং প্রমদার এক মাত্র ছেলে। বেশ রাজযোটক মিল হবে ভেবেছিলেন বিশ্বম্ভর। এ-ও তাঁর গোপনে গোপনে অভিসন্ধি ছিল যে সমরকে ক্রমশ ঘরজামাই করে ফেলবেন। কিন্তু সব ভেস্তে গেল। সমর ছোকরা পণ করে বসল যে সে ডানাকাটা রাঙা পরী ছাড়া বিয়ে করবে না। সুবিকে তার মোটেই পছন্দ নয়, সে নাকি বিশ্বম্ভরের মতোই দেখতে। ডানাকাটা রাঙাপরী অবশ্য পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু স্নেহান্ধ প্রমদাচরণ তাই খুঁজে বেড়াতে লাগল ব্যাকুল চিত্তে। ছেলেকে ধমকে সুবির সঙ্গে যদি জোর করে বিয়ে দিয়ে দিত ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু তা হল না, যা হল তা মর্মান্তিক। সমর 'লভে' পড়ে এক কালো সুঁটকো কায়েতের মেয়েকে বিয়ে করে বসল। প্রেমে পড়লে চোখের দৃষ্টিই অন্য রকম হয়ে যায় হয়তো। ওই সুঁটকো কালো মেয়েটাকেই তার রাঙা পরী বলে মনে হতে লাগল। বিশ্বম্ভর গোঁড়া লোক, এ বিয়েতে তিনি যাননি। দিন সাতেক পরে প্রমদাচরণের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হল তখন তার দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "কেমন, শিক্ষা হয়েছে তো, রাসকেল!"—বলেই হনহন করে চলে গেলেন বিপরীত দিকে।

কিন্তু একই খড়্গ যে তাঁরও মাথার উপর উদ্যত হয়েছিল তা টের পাননি বিশ্বম্ভর। অনেকদিন পাননি। যখন পেলেন তখন আর চারা নেই, ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। সাধুচরণ যে এ কাণ্ড করতে পারে তা তাঁর স্বপ্নাতীত ছিল। কিন্তু আজকাল পরমাণুর যুগ, স্বপ্নাতীত ব্যাপারই ঘটছে সব।

গুরুচরণের পুত্র সাধুচরণ। গুরুচরণ জাতে মেথর। আধুনিক ভাষায় 'হরিজন'। গুরুচরণ আর বিশ্বম্ভর সমবয়সী। গুরুচরণই বোধহয় কিছু বড় ছিল। গুরুচরণকে বিশ্বম্ভরের বাবা ত্রিলোচন খুব স্নেহ করতেন। ছেলের মতোই। মেথর হলে কি হয়, গুরুচরণের মধ্যে এমন একটা নম্র শুচিতা ছিল যাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। গুরুচরণের বিয়েও ত্রিলোচনই দিয়েছিলেন। বিশ্বম্ভরের বিয়ের অনেক আগে গুরুচরণের বিয়ে হয়েছিল। গুরুচরণের ছেলে সাধুচরণের যখন জন্ম হল তখনও বিশ্বম্ভরের বিয়ে হয় নি। শিশু সাধুচরণ ত্রিলোচনের বাড়িতেই প্রায় সমস্ত দিন থাকত। বিশ্বম্ভরের মা তাকে খেতে দিতেন, দেখা শোনা করতেন। সাধুচরণের মা সমস্ত দিন কাজ করে বেড়াত। মিউনিসিপ্যালিটির কাজ তো ছিলই, অনেকের বাড়িতেও কাজ করত সে। সন্ধ্যার সময় এসে ঘুমন্ত সাধুচরণকে বাড়িতে নিয়ে যেত। ত্রিলোচনের সংসারে মানুষ হওয়াতে সাধুচরণও আর মেথরের ছেলে রইল না. ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে গেল। একটু বড় হলে ত্রিলোচন তাকে মাইনর স্কুলে ভরতি করে দিলেন। প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হত, মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তিও পেল। তখন ত্রিলোচন তাকে পাঠালেন শহরে, বিশ্বম্ভরের কাছে। বিশ্বম্ভরের বাড়িতে থেকে খেয়ে সে সসম্মানে ম্যাট্রিকুলেশনটাও পাশ করলে। সে যখন ফোর্থ ক্লাসে তখন সুবির জন্ম হয়। সাধুচরণই ওর সুবাসিনী নাম রেখেছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সে বৃত্তি পেয়েছিল। একটা ক্রিশ্চান কলেজে ভরতি হয়ে গেল কলকাতায়। সেখানেও সসম্মানে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল সে। সর্বভারতীয় আই. এ. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন আগে সে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে। বিশ্বম্ভরের বাড়িতে প্রায় আসে। যখনই আসে তখনই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে। নিজের বাবারই মতো খাতির করে বিশ্বম্ভরকে। সুবি সাধুদা বলতে পাগল। সাধুচরণ এলে সে যে কি করবে ভেবে পায় না। এই সাধুচরণ যে শেষটা এমন দাগা দেবে তা বিশ্বম্ভর কল্পনা করেন নি। হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী তিনি, সাধুচরণের চিঠিটা পেয়ে তাঁর রগের শিরগুলো দপদপ করতে লাগল।

খুব বিনয় সহকারে সম্ভ্রমপূর্ণ চিঠিই লিখেছিল সাধুচরণ।

শ্রীচরণেষু,

আমি জানি আপনি খুব গোঁড়া এবং এ চিঠি পেয়ে খুব বিচলিত হবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখতে বাধ্য হলাম, কারণ না লিখে উপায় নেই। আপনি সুবাসিনীর বাবা, আপনাকে না জানিয়ে, আপনার আশীর্বাদ না নিয়ে আমি তাকে বিয়ে করতে ইতস্তত করছি। আপনাকে এ চিঠি লিখবার আগে সুবাসিনীকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, তার খুব মত আছে। সে বি. এ. পাশ করেছে, এ যুগের মেয়ে সে। সেকেলে সংস্কার আঁকড়ে থাকতে সে চায় না। জাতিভেদ চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে! গুণ এবং কর্ম অনুসারেই জাতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেকালের জাতি-ভেদ একালে অচল। একালে নতুন

নতুন জাতি সৃষ্টি হয়েছে। যারা চাকুরে তারা একজাত। ওদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ হয়েছে। অফিসাররা এক গোষ্ঠীভুক্ত, পুলিসরাও তাই, ডাক্তাররাও তাই, রেলের বাবুরাও তাই। যারা ব্যবসা করে তারা আর একজাতের, যারা শিক্ষক তারা আবার আর এক জাত। মিলিটারিতে যারা থাকে তাদের ক্ষত্রিয় বলতে পারেন, লেখাপড়া নিয়ে যাঁরা থাকেন তাঁরা ব্রাহ্মণ। প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ বড় বেশী নেই। কারণ যে বিশুদ্ধ চরিত্র এবং তপস্যার জন্যে তাঁরা সেকালে সমাজে শ্রদ্ধার আসন পেতেন তা এ যুগে দুর্লভ। এ যুগে বৃত্তি বা পেশা অনুসারে নতুন নতুন জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এ হিসেবে আমি আপনার স্বজাতি, কারণ আপনিও চাকুরিজীবী, আমিও তাই। আপনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আমি ম্যাজিস্ট্রেট। সুতরাং সুবিকে আমি যদি বিয়ে করি তাহলে তা অসবর্ণ বিয়ে হবে না। সুবি যখন খুব ছোট তখন থেকেই ওকে আমি ভালবাসি। আপনি যদি ওকে আমার বিবাহিতা পত্নী হবার অনুমতি দেন তাহলে আমাদের উভয়েরই জীবন সুখের হবে এবং আমি কৃতার্থ হব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। সামনাসামনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে সঙ্কোচ হল বলেই চিঠি লিখছি। আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। ইতি—

প্রণত

সাধুচরণ

বিনা মেঘে বজ্রপাত! খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন বিশ্বম্ভরবাবু। তারপর সুবি যখন কলেজ থেকে ফিরল তখন তাকে সাধুচরণের চিঠিটা দিয়ে বললেন—"ছোঁড়ার আস্পর্ধা দেখ্। এবার এলে ঢুকতে দিসনি বাড়িতে। দুধকলা দিয়ে কালসাপকে পুষেছিলাম আমরা—"

সুবি সবই জানত।

চিঠিখানা নীরবে পড়ে ফেরত দিলে।

"তোকেও বলেছিল, লিখেছে—"

"হ্যাঁ। আমি ওঁকেই বিয়ে করব। আপত্তি কোরো না তুমি—"

"মেথরের ছেলেকে বিয়ে করবি?"

"মেথর বোলো না, হরিজন বল।"

"আমি মেথরকে মেথরই বলব। ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে বলেই তোর চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, না? ও সাধারণ মেথর থাকলে ওকে বিয়ে করতিস?"

"ও সাধারণ নয়, ও অসাধারণ। ম্যাজিস্ট্রেট যদি না-ও হত তাহলেও ও অসাধারণ থাকত। তাহলেও ওকে আমি বিয়ে করতুম—"

বিশ্বম্ভরবাবুর গোল গোল চোখ দু'টি আরও গোল হয়ে গেল। নির্নিমেষে তিনি কন্যার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

সুবি দৃঢ়পদে অন্য ঘরে চলে গেল।

তার পরদিনই চিঠির উত্তর দিলেন বিশ্বম্ভর।

সাধুচরণ,

তোমার স্পর্ধা এবং ধৃষ্টতার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। বামন হইয়া চন্দ্রে হাত দিবার লোভ সম্বরণ কর। আমি প্রাণ থাকিতে এ অনুমতি দিতে পারিব না। কিছুতেই না, কিছুতেই না। সুবি কিছুতেই তোমার পত্নী হইবে না, হইতে দিব না। ইতি—

বিশ্বম্ভর

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল সাধুচরণের।

শ্রীচরণেষু,

বড় আশা করেছিলাম যে, বিবাহে আপনার আশীর্বাদ পাব। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তা পেলাম না। একটা জিনিস বোধহয় আপনি ভুলে গেছেন। সুবির বয়স একুশ পার হয়ে গেছে। আইনের চক্ষে সে এখন সাবালিকা। আপনার অনুমতি না নিয়েও সে আইনত আমাকে বিয়ে করতে পারে। সাতদিন পরে তাই হবে। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

প্রণত

সাধুচরণ

সাতদিন পরে সুবি বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করে বলল—"বাবা, আমি যাচ্ছি। উনি গাড়ি পাঠিয়েছেন। তুমিও চল না বাবা—"

"উচ্ছন্নে যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও—"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন বিশ্বম্ভর। সুবি ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর যা হল তা প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত দুইই। দড়াম করে পড়ে গেলেন বিশ্বম্ভর মেঝের উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তাঁর।

বিয়ের দলিলে সুবাসিনী সই করতে যাচ্ছে, কলমটা তুলেছে, এমন সময় অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেল একটা।

"এ কি বাবা, ছাড় ছাড় হাতটা ছাড়, বড লাগছে যে—" কলমটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। অফিসের অন্য সবাই অবাক হয়ে গেল, কারণ কেউ কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিল না।

তারপর যা হল তা আরও অদ্ভুত।

দড়াম করে পড়ে গেল সুবি অফিসের মেঝের উপর। তার এক গোছা চুল কেবল শূন্যে উঠে রইল। মনে হতে লাগল কে যেন তার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

"বাবা—বাবা—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—"

কিন্তু রেহাই পেল না সে। হুড় হুড় করে কে যেন তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সাধুচরণ তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। যে টানছে তাকে দেখতেও পেল না।

বড় রাস্তার উপর টানতে টানতে নিয়ে এল সুবিকে। তারপর ছুঁড়ে দিল তাকে একটা ছুটন্ত লরির সামনে। নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সে।

খগার মা

আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার সময় বৈঠকখানায় রোজ আড্ডা বসে একটা। নানাবিষয়ের আলোচনা হয় তাতে। পাশের বাড়ির কেচ্ছা থেকে শুরু করে ক্রুশ্চেভ-নেহরু, রবীন্দ্রনাথ-শেক্সপীয়র, কালোবাজার, উদ্বাস্তু-সমস্যা কিচ্ছু বাদ যেত না। আমরা ক্ষিতীশবাবুর কলেজে-পড়া-মেয়ের অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম কয়েকদিন থেকে, কিন্তু সেটা চাপা পড়ে গেল চীন-ভারত-সীমান্তে লালফৌজের হুমকিতে। যদিও ম্যাকমোহন লাইন সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না তবু তাতে আমাদের আলোচনা আটকায় নি। ওই নিয়েই আমরা ক'দিন ধ'রে জাবর কাটছিলুম, এমন সময়ে জগন্নাথবাবু উকিল হঠাৎ একদিন একটা নূতন বিষয় উত্থাপন করলেন। প্রফেসার ধীরেনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"আচ্ছা, মশাই বলুন তো, আর্টের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ কি? যা সত্য তাই কি আর্টপদবাচ্য?"

সাহিত্যের অধ্যাপক ধীরেন ভৌমিক বললেন, "না, নট্ নেসেসারিলি। সত্যের উপর আর্টিস্টের কল্পনার জাদুস্পর্শ না লাগলে তা আর্টের সম্মান পাবে না। নিরলংকার সত্য বিজ্ঞান বা দর্শনের এলাকায় সমাদৃত, আর্টের এলাকায় আসতে হলে তাকে অলংকার পরতে হবে, আর সে অলংকার পরাবার জন্মগত অধিকার আছে একমাত্র কবির।"

"কবি কাকে বলবেন?"

"যিনি রসস্রষ্টা তাঁকে।"

"রস কি বস্তু?"

"যা রসিকের চিত্তে আনন্দ উৎপাদন করে।"

"ওটা থেকে কিছু বোঝা গেল না। ধরতে ছুঁতে পারা যায় এমন কোন সংজ্ঞা নেই রসের?"

"সংস্কৃতে একটা আছে কিন্তু সেটা আরও কটমট মনে হবে। বলব?"

"বলুন, শুনি—"

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্ব-প্রকাশানন্দ চিন্ময়
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ।"

"মানেটা বুঝিয়ে দিন—"

"রস হচ্ছে সত্ত্বোদ্রেককারী, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দ-স্বরূপ চিন্ময়, জড়বস্তু নয়। বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য, মানে রসিক যখন এই রস আস্বাদন করেন তখন অন্য কোন বেদ্য মানে জ্ঞানগম্য বস্তু রসিকের চিত্তকে আর স্পর্শ করতে পারে না। এমন কি রস আস্বাদনের সময় রসিক আত্মহারা হয়ে নিজেকেও ভুলে যান।"

"অখণ্ড কথাটার মানে কি?"

"দেশকালের গণ্ডী তাকে খণ্ডিত করতে পারে না। সর্বকালে সর্বদেশে সে রস আস্বাদন করে রসিকরা সমান আনন্দ পান। যে সত্য নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার তা মাঝে মাঝে বদলাতে পারে—কিন্তু রসের চেহারা কখনও বদলায় না।"

"ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর ব্যাপারটা কি?"

"ব্রহ্মের উপলব্ধি করে জ্ঞানীরা, যোগীরা, ভক্তেরা যে আনন্দ লাভ করেন কাব্যরস সৃষ্টি করে এবং আস্বাদন করেও ঠিক সেই আনন্দ লাভ করেন স্রষ্টা এবং রসিক। তাই একে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলা হয়েছে।"

লাইফ ইন্‌শিওরেন্সের এজেন্ট জগুবাবু অধীর হয়ে পড়েছিলেন।

"এ কি কচকচি শুরু করলেন আপনারা মশাই! আমি তো রস মানে বুঝি হয় ফলের রস, না হয় রসগোল্লার রস। এঠাৎ এ বিদ্‌ঘুটে রসের আমদানি করলেন কেন?"

"বলছি—"

জগন্নাথবাবু পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন—"একজন রসিকের সঙ্গে একজন আর্টিস্টের মকোদ্দমা বেধেছে। তাই ব্যাপারটা জেনে নিচ্ছিলুম—"

"কোন্ আর্টিস্ট—?"

"স্বচ্ছন্দ স্বর। নাম শুনেছেন নিশ্চয়।"

"হ্যাঁ। আজকাল তো খুব নাম করেছে ছোকরা। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। আচ্ছা স্বচ্ছন্দ স্বর নামটা ও নিজেই নিয়েছে বোধহয়!"

"ঠিক ধরেছেন। ওর আসল নাম ভগেশ্বর। ভগা ভগা বলে ডাকত সবাই। ওর বাবাকেও আপনারা হয়তো চেনেন অনেকে। নগা স্যাকরার খুব নাম ডাক ছিল এককালে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার বিয়ের সময় জড়োয়ার সেট তো ওই করেছিল। চমৎকার হাত। ওরকম কারিগর দুর্লভ আজকাল।"

নগা স্বরের দুই ছেলে ভগা আর খগা। বাপের দুটো গুণ ওরা দু'ভায়ে ভাগ করে নিয়েছিল। ভগা হ'ল আর্টিস্ট আর খগা হ'ল মিস্ত্রি। ভগা কিছু লেখাপড়া শিখেছিল,

সে আর্টস্কুলে গেল। খগাটা ছিল বখাটে গোছের, স্কুলের ক্লাসে উঠতে পারত না। তাই নগেন স্যাকরা ওকে একটা ওয়ার্কশপে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ওখানে বছর তিনেক থেকে সে ভালো একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হয়ে বেরুল। যদিও একই বৃক্ষের ফল, কিন্তু দু'জনের মধ্যে স্বভাবের এবং চেহারায় আকাশ পাতাল তফাত। ভগা আর্টস্কুলে পড়বার সময় যে সমাজে মিশেছিল সে সমাজে তার বাপ নগা বা ভাই খগা খাপ খেত না। সে সমাজের লোকেরা একটু উগ্ররকম আধুনিক। ধুতি-চাদর বর্জন করেছিল তারা অনেক আগেই। ভগাও তাদের অনুকরণ করত। তাদেরই নকলে ঢিলে পায়জামা পরত আর তার উপর পরত এক অদ্ভুত ধরনের জামা। তার উপরটা ডবল ব্রেস্টেড মিরজাইয়ের মতো, আর নীচেটা খুব লম্বা, হাঁটু ছাড়িয়েও প্রায় বিঘৎ-খানেক লম্বা। লম্বা চুলে তেল দিত না, নাকি সুরে ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলত। পায়ে থাকত শুঁড়-তোলা নাগরা আর মুখে থাকত লম্বা-সরু-পাইপে লাগানো সিগারেট। ভগার চেহারাও ছিল খুব লিক্‌লিকে। আর খগেশ্বর, মানে খগা, ছিল ঠিক এর উলটো। গ্যাট্টাগোঁট্টা গরিলার মতো। পরিধানে খাকির ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট হাফ-শার্ট, প্রায়ই তাতে তেলকালি লাগা থাকত। মাথার চুল ঝাঁকড়া, গোঁফ ঝাঁকড়া, ভুরুও ঝাঁকড়া। তেলে আর ময়লায় জট পাকানো। পায়ে শতছিন্ন একজোড়া ডার্বি শু। সিগারেট-টিগারেটের ধার ধারত না সে। গাঁজা খেত। কিন্তু মিস্ত্রি ছিল খুব ভালো। একটা বড় ইলেকট্রিক কনট্রাকটারের ফার্মে কাজ করত।—"

জগুবাবু আবার অধীর হয়ে উঠলেন।

"মোদ্দা কথাটা চট্ করে বলে ফেলুন না! অত ভনিতা করছেন কেন?"

"ভনিতা করছি কারণ সবটা খুলে না বললে অধ্যাপক মশাই জিনিসটার মর্মগ্রহণ করতে পারবেন না। ওঁর মতটা আমি জানতে চাই। এবার ভগার (মানে স্বচ্ছন্দ সুরের) আর্ট সম্বন্ধে কিছু শুনুন। স্বচ্ছন্দ সুরের বিশেষত্ব হচ্ছে ওর অনন্যতা অর্থাৎ ওরিজিনালিটি। ও সোজা চোখে কিছু দেখে না, বাঁকা চোখে দেখে। ওর আঁকা কয়েকটা ছবি আমি দেখেছি। একটা ছবির নাম 'মরুভূমি'। কিন্তু তাতে না আছে বালি, না আছে উট, না আছে ওয়েশিস! একটা পোড়ো-বাড়ির উঠোনের ছবি, তার এককোণে একটা তুলসী-মঞ্চ আর তার উপর একটা মরা তুলসীগাছ কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। স্বর্ণপদক পেয়েছে ছবিখানা। আর একটা ছবির নাম 'নদী'। কিন্তু তাতে জল নেই, সৈকত নেই, নৌকা নেই। আছে শ্যাওলা-ঢাকা খানিকটা জায়গা। অনেক সময় নদীর ধারে, যেখানে স্রোত থাকে না সেখানে শ্যাওলা জমে। সেই শ্যাওলাটুকু এঁকেছে স্বচ্ছন্দ সুর। হৈ হৈ নাম হয়েছে ছবিটার। শ্যাওলার ছবিটা অবশ্য পারফেক্ট। আর একটা ছবি দেখেছিলাম—'দেবী প্রতিমা'—কিন্তু ছবিটা একটা পুতুলের, বোকা-বোকা চেহারা, বোকার মতো হাসছে। আর একটা ছবির নাম 'তালগাছ', কিন্তু ছবিতে তালগাছ নেই, আছে তালগাছের গোড়ার দিকের খানিকটা

অংশ, মাটি থেকে হাত দুই হবে, যেখানটা খুব এবড়ো-খেবড়ো বিশ্রী সেইটেই এঁকেছে স্বচ্ছন্দ সুর। সে অংশটুকু অবশ্য এঁকেছে ভালো। সাধারণতঃ লোকে প্রকৃতি জিনিসকে যে ভাবে দেখে স্বচ্ছন্দ সুর সে ভাবে দেখে না, বেঁকিয়ে দেখে এবং বেঁকিয়ে দেখাতে চায়। ওইখানেই ওর ওরিজিনালিটি।"

জগন্নাথবাবু আর এক টিপ নস্যি নিলেন।

"তারপর?"

"পরশু দিন একটা ছোটখাটো ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল আমার বাড়ির কাছে। জ্যোতিষবাবুর বাড়িটা খালি পড়ে থাকে, সেই বাড়িটাই যোগাড় করেছিল ওরা। বাড়ির ঘরগুলো ভালই, কিন্তু ঘরের আলোগুলো এমন জায়গায় যে সব ছবির উপর ভালো করে আলো পড়ে না। তাই ওরা এক ইলেকট্রিক ফার্মে খবর দিয়ে দেওয়ালের নানা জায়গায় টেম্পোরারি বাল্ব টাঙাবার ব্যবস্থা করেছিল। আর সেই বাল্ব ফিট্ করতে এসেছিল খগা। খগার ছবির সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলই ছিল না, তার দাদা বিখ্যাত স্বচ্ছন্দ সুরের যে একখানা ছবি এ প্রদর্শনীতে আছে তা-ও জানত না সে। বাইরের বারান্দার একধারে বসে বিড়ি ফুঁকছিল সে তার মিস্ত্রি-বন্ধু ইউসুফের সঙ্গে। স্বচ্ছন্দ সুরও এসেছিল তার আধুনিক পোশাক পরে, সরু লম্বা পাইপে সিগারেট লাগিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল তার স্তাবকদলের মাঝখানে বসে। স্বচ্ছন্দ তার ভাই খগাকে কখনও আমোল দেয়নি, পাঁচজনের সামনে তাকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দেওয়ার কল্পনাও সে সম্ভবতঃ করতে পারত না। তাছাড়া দু'জনে থাকত দু'রকম জগতে। একই রঙ্গমঞ্চে দু'জনের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু সেদিন ঘটনাটা ঘটে গেল, আর আমার মাধ্যমেই ঘটল! প্রদর্শনী দেখবার জন্যে আমাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিল ওরা। কার কার ছবি দেখানো হবে তারও একটা ফিরিস্তি ছিল কার্ডে। আমি যখন গেলুম তখন বারান্দায় খগার সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল প্রথমে। আমাকে দেখে সে বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, একটা নমস্কারও করল।

"এখানে কি মনে করে? দাদার ছবি দেখতে এসেছ নাকি?"

"আজ্ঞে না। আমি বাল্বগুলো লাগাতে এসেছিলাম।"

"তোমার দাদার ছবি দেখেছ?"

"আজ্ঞে না।"

"চল দেখি গিয়ে—"

খগার যাবার ইচ্ছে ছিল না খুব। কিন্তু আমার কথা এড়াতে না পেরে বললে—"চলুন—"

হলের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম দু'জনে।

"কোথায় তোমার দাদার ছবিটা আছে দেখেছ?"

"না, অত লক্ষ্য করিনি।"

বেশী খুঁজতে হ'ল না, সামনেই দেখলুম স্বচ্ছন্দ সুরের আঁকা ছবিখানা ঝুলছে। ছবির নাম 'মা'। ছবিটা দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল একটা স্তনের ছবি বুঝি। কিন্তু পরে লক্ষ্য করে দেখলুম, স্তন নয়, আব। গালের উপর একটি আব। মায়ের মুখ চোখ কিছু দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে খালি গালের খানিকটা অংশ আর তার উপর ওই আবটা। এঁকেছে ভালো। আমাকে দেখে স্বচ্ছন্দ এগিয়ে এল।

"কেমন লাগছে ছবিটা"—

খগা আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ফিরে দেখি তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হয়েছে, রগের শিরগুলো ফুলে উঠেছে। আমি কিছু বলবার আগেই বোমার মতো ফেটে পড়ল খগা।

"ওই মায়ের ছবি হয়েছে! মায়ের মুখের ওই আবটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও নি তুমি শুয়োর!"

খগা তড়াক ক'রে এগিয়ে গেল আর পকেট থেকে ছুরি বার করে ফাঁস করে কেটে দিলে ক্যানভাসটা।

"নাবিয়ে ফেলে দাও ও ছবি রাস্তায়। আমার মায়ের অপমান হ'তে আমি দেব না।"

"একি করলে তুমি রাসকেল—"

স্বচ্ছন্দ এগিয়ে আসতেই এক প্রচণ্ড ঘুঁষি ঝেড়ে দিলে খগা তার নাকের উপর। রক্তারক্তি কাণ্ড। হৈ হৈ ব্যাপার। খগাকে ধরবার জন্যে অনেকে এগিয়ে এল, কিন্তু পারলে না, খগা সব্বাইকে মেরে ধুনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অসুরের মতো শক্তি তো ওর গায়ে। পরে শুনলাম ওটা খগার মায়েরই পোর্ট্রেট। খগার মায়ের গালে নাকি বেশ বড় আব আছে। আর একটা খবরও শুনলাম যা আগে জানতাম না। খগার মা স্বচ্ছন্দের মা নয়, সৎমা। স্বচ্ছন্দ নগা স্যাকরার প্রথম পক্ষের ছেলে। আজ খবর পেলাম খগাকে পুলিশে অ্যারেস্ট করেছে। খগার বউ আমার কাছে এসেছিল। তাকে জামিনে খালাস করেছি। কিন্তু তার হ'য়ে মকোদ্দমাটা এইবার আমাকে লড়তে হবে। আর্টের ব্যাপার তো, তাই ভৌমিক মশায়ের কাছে আর্টের তত্ত্বটা জেনে নিতে চাই। খগাকে কি রসিক বলা চলবে?"

ভৌমিক মশায় বললেন, "না, বোধ হয়"—

"তাহলে কি বলবেন ওকে?"

"সুপুত্র।"

"আর স্বচ্ছন্দ সুরকে?"

"পাজি।"

ইন্‌শিওরেন্সের এজেন্ট জগুবাবু বললেন—"শুধু পাজি নয়, পাজির পা-ঝাড়া।"

সেদিনের মতো সভা-ভঙ্গ হ'ল।

মাসখানেক পরে আবার সভা বসেছে। সেদিন আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল

ভেজাল। কোন্ কোন্ জিনিসের সঙ্গে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ জিনিস ভেজাল দেওয়া হয় তাই নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন কেমিস্ট যুগল নাগ।

উকিল জগন্নাথবাবু প্রবেশ করলেন।

"আপনার সে মকোদ্দমার কি হ'ল মশাই"—প্রশ্ন করলেন জগুবাবু।

"মকোদ্দমায় হেরে গেলুম মশাই। খগার সাজা হ'য়ে গেল, পাঁচশ টাকা জরিমানা।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। মকোদ্দমা আমি জিততাম। কিন্তু সব মাটি করে দিলেন খগার মা। ভগা তাঁকে সাক্ষী মেনেছিল। তিনি এসে কোর্টে দাঁড়িয়ে বললেন, তিনিই স্বচ্ছন্দ সুরকে তাঁর গালের আবের ছবিটা অাঁকতে বলেছিলেন। তাঁকে অপমান করবার জন্যে সে ও ছবি অাঁকেনি, তাঁর ফরমাশ মতো এঁকেছিল। আমি অনেক জেরা করলুম তাঁকে কিন্তু সুবিধে করতে পারলুম না কিছু। খগার মা অটল হ'য়ে রইলেন।

কোর্ট ভেঙে যাবার পর দেখা হ'ল আমার তাঁর সঙ্গে। বললুম আপনার মান বাঁচাবার জন্যে আপনার ছেলে এই কাণ্ডটা করলে আর আপনি কোর্টে দাঁড়িয়ে তারই বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে দিলেন! সত্যি কি আপনি আপনার আবটা অাঁকতে বলেছিলেন ওকে ? খগার মা কি উত্তর দিলেন শুনবেন ?

'না। ও দুষ্টু, তাই ওরকম করে এঁকেছে। তার শাস্তিও তো খগা দিয়ে দিয়েছে ওকে হাতে হাতে। কিন্তু এর আর একটা দিক আছে। আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বল করেছে খগা নয় ভগা। দশজনের সামনে তার মাথাটা নীচু হ'য়ে যাবে সেটা কি ভাল ? তাই আমি ওকেই জিতিয়ে দিলুম।' আমি কি আর বলব! ঘাড়-বেঁকা গালে আবওলা বুড়িটার মুখের দিকে হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে রইলুম। শুনছি জরিমানার টাকাটা বুড়িই দিয়ে দিয়েছে।"

"আর স্বচ্ছন্দ সুরের খবর কি ?"

"সে প্লেনে করে আমেরিকা চলে গেছে।"

"সেখানে ছবির প্রদর্শনী খোলবার জন্যে ?"

"না। নাকের প্লাসটিক সার্জারি করবার জন্যে। নাকটা তো থেঁতো হ'য়ে গেছে একেবারে—"

জগুবাবু বলে উঠলেন—"খগেশ্বর জিন্দাবাদ।"

আবার শুরু হ'ল ভেজালের আলোচনা।

নদী

পীতাম্বর আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। একই গ্রামে একই পরিবেশে আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। আমাদের গ্রামের ঠিক গা ঘেঁষে বইত তরলা নদী। সেই নদীর ধারে পীতাম্বর আর আমি কত খেলা খেলেছি, সেই নদীর জলে কত সাঁতার কেটেছি, কত নৌকা ভাসিয়েছি। সে নদীর কত ছবি আজও মনে আঁকা আছে। তরলাকে বাদ দিয়ে গ্রামের কথা আমরা কখনও ভাবতে পারিনি। তরলা যেন গ্রামেরই একজন ছিল। তার সর্বাঙ্গে কত রূপ, তার মৃদু কলধ্বনিতে কত কথা। তাকে বড় ভালবাসতাম। আমার বড় কষ্ট হ'ত গ্রামের লোকেরা যখন তাতে জঞ্জাল ফেলত। গ্রামের সমস্ত জঞ্জাল জড়ো করে ফেলা হ'ত তরলার জলে। যেন ও নদী নয়, নর্দমা। তরলা কিন্তু হাসিমুখে সে জঞ্জালও বইত। যখন জঞ্জাল ফেলা হ'ত তখন তাকে একটু বিব্রত বিপন্ন মনে হ'ত বটে, কিন্তু তার পরদিনই দেখতাম তরলা আবার হাসছে।

মায়ের কোলে যেমন চিরকাল থাকা যায় না, গ্রামের কোলেও তেমনি। গ্রাম ছেড়ে অবশেষে বাইরে যেতে হয়। গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ হ'তেই আমাকে আর পীতাম্বরকে গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হয়েছিল। আমি গেলাম কোলকাতায় আর পীতাম্বর গেল কুচবিহারে। আমি বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করতে লাগলাম। পীতাম্বরের মামা কুচবিহারে চাকরি করতেন, সে পড়াশোনা করতে লাগল তাঁর বাড়িতে থেকেই। প্রথম প্রথম কিছুদিন দু'জনের মধ্যে পত্রালাপ চলেছিল, কিন্তু তাও ক্রমশঃ থেমে গেল। পীতাম্বরের সঙ্গে সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার ছাড়াছাড়ি। আমি লেখাপড়া করবার জন্য বিদেশেও গিয়েছিলাম। পীতাম্বর কুচবিহারেই তার পড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিল। বেশী দূর পড়াশোনা করতে পারেনি সে। ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডীও পার হতে পারেনি বেচারী। তাই কর্মজীবনেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, কারণ বাঙালীর কর্মজীবন মানে, চাকরি। নন্-ম্যাট্রিকের চাকরিজীবন উজ্জ্বল হওয়ার কথা নয়। একটা আপিসে দিনকতক কেরানীগিরি করবার সুযোগ অবশ্য পেয়েছিল। কিন্তু যা মাইনে পেত তাতে তার কুলোত না। শেষে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা ধরল সে। বিনা মূলধনে এবং বিনা বিদ্যায় যে ব্যবসা স্বচ্ছন্দে চলে সেই ব্যবসা—পুরোহিতগিরি। ব্রাহ্মণের ছেলে, নিষ্ঠারও ভড়ং ছিল, মিষ্টি কথা বলে গৃহিণীদের মনোরঞ্জন করবার ক্ষমতাও ছিল—তাই এই বারো-মাসে-তের পার্বনের দেশে তার রোজগার নিতান্ত মন্দ হ'ত না। বিবাহ করেছিল, কিন্তু ভগবানের দয়ায় ছেলেপিলে বেশী হয়নি। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল—মেয়ে। তার নাম দিয়েছিল আদরিণী।

আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে নানা জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কুচবিহারে যখন এলাম তখন পীতাম্বরের সঙ্গে দেখা হ'ল। প্রথমে তাকে আমি চিনতে পারিনি। সে যে কুচবিহারে আছে একথাও প্রথম প্রথম আমার মনে পড়েনি। আমার

সঙ্গে আমার বিধবা বোন থাকত। সে খুব নিষ্ঠাবতী ছিল। যেখানেই যেতাম তার পূজাপার্বন ব্রত প্রভৃতির জন্য পুরোহিত যোগাড় করতে হ'ত আমাকে। কুচবিহারে এসে পুরোহিতের খোঁজ করতেই পীতাম্বরকে পেলাম। আমারই অ্যাপিসের একজন ক্লার্ক তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এল। সত্যিই তাকে চিনতে পারিনি আমি। যে সুকুমার গৌরবর্ণ বালক আমার সহপাঠী ছিল তার চিহ্নমাত্রও ছিল না পীতু পুরুতের মধ্যে। লম্বা, রোগা, এক-মুখ-কাঁচা পাকা গোঁফদাঁড়ি, গায়ে আধময়লা নামাবলী, অনামিকায় অষ্টধাতুর আংটি, শরীরের উপরার্ধ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে, মুখে সশঙ্ক হাসি, চোখে উৎসুক দৃষ্টি, মুখের দু'কোণে সাদা সাদা ঘায়ের মতো দাগ—এই চেহারার সঙ্গে আমার বাল্যবন্ধুর কিছুমাত্র মিল ছিল না। বাল্যকালে আমরা পরস্পরকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতাম। পীতু পুরুত একটু ইতস্ততঃ করে হাত কচলে বললে, "আমাকে চিনতে পারছেন স্যর?"

আমি একটু অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। এ লোককে যে আগে কখনও দেখেছি তা মনে হ'ল না। বললাম, "না তো। আগে কি কোথাও দেখেছি আপনাকে?"

"সোনাপুর গাঁয়ে আমি আপনার সঙ্গে রামঠাকুরের পাঠশালায় একসঙ্গে পড়েছিলাম। আমার নাম পীতাম্বর।"

"আরে—!"

সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম সেদিন।

তুই

আদরিণী ক্রমশঃ আমারই বাড়ির মেয়ে হ'য়ে গেল! আমি যৌবনেই বিপত্নীক হয়েছিলাম। বাড়িতে আমার ওই বিধবা বোন ছাড়া দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোক ছিল না। দু'চার দিন আসা-যাওয়া করতে করতে আদরিণী অবশেষে সরলার (আমার বোনের) খুব প্রিয় হয়ে পড়ল। সত্যিই ভালবাসবার মতো মেয়ে আদরিণী। অমন নম্র মধুর স্বভাব বড় একটা দেখা যায় না। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। অর্থাভাবে পীতাম্বর তাকে কলেজে পড়াতে পারেনি। আমি বলেছিলাম, "আমিই ওর পড়াবার সব ভার নিচ্ছি। ওকে কলেজে ভরতি করে দাও।" কিন্তু পীতাম্বর এতে রাজী হ'ল না। মনে হ'ল আমার এ প্রস্তাবে তার আত্মসম্মান যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দরিদ্রের আত্মসম্মান বড় তীক্ষ্ণ। সে ম্লান হেসে বললে, "বেশী পড়িয়ে আর কি হবে ভাই। শেষ পর্যন্ত তো বিয়ে দিতেই হবে! সেই চেষ্টাই দেখছি! ও ছেলেবেলা থেকে মন দিয়ে শিবপুজো করেছে। ওর ভালো বর জুটবেই। একটি ভালো পাত্রের সন্ধানও পেয়েছি।"

ভালো পাত্রের বাবা ও পিসেমশাই এলেন আদরিণীকে দেখতে। তাঁদের আসা-যাওয়ার খরচ পীতাম্বরকে বহন করতে হ'ল। যদিও তাঁরা দুজনেই কেরানী-শ্রেণীর লোক কিন্তু তাঁদের হাবভাব কথাবার্তা থেকে মনে হ'ল তাঁরা যেন আমীর-ওমরাহ! সাধ্যাতীত খরচ করে পীতাম্বর তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। তাঁরা আদরিণীর আপাদমস্তক নানাভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। তারপর মত প্রকাশ করলেন—মেয়ে কালো। আমরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পাত্রী খুঁজছি। এ পাত্রী চলবে না। আদরিণীর রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নয়, সে শ্যামাঙ্গিনী। কিন্তু ওর মতো শ্রীমতী মেয়ে বড একটা চোখে পড়ে না। পীতাম্বর হতাশ হ'ল। কিন্তু আবার পাত্র খুঁজতে লাগল। দ্বিতীয়বার যে পাত্রটি পাওয়া গেল, তাকে সুপাত্র বলা চলে না। আই. এ. পাশ করে বাড়িতে বসে আছে। এরা আদরিণীকে পছন্দ করল বটে, কিন্তু যে পরিমাণ পণ দাবি করল তা পীতাম্বর দিতে পারল না। পীতাম্বর অতি কষ্টে মেয়ের বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা জমিয়ে রেখেছিল এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে। এ পাত্র নগদই চাইল পাঁচ হাজার, তাছাড়া অলংকার, বরাভরণ এবং কুড়িজন বরযাত্রীর যাওয়া-আসার ভাড়া। সুতরাং এটাও ফসকে গেল। এরপরও ক্রমাগতই ফসকে যেতে লাগল। অধিকাংশ লোকেরই মেয়ে পছন্দ হ'ল না, অনেকের পণের দাবি পীতম্বরের পক্ষে সাধ্যাতীত হ'ল, অনেক জায়গায় কুষ্ঠী মিলল না। এই শেষোক্ত পর্যায়ে আমার এক বন্ধু সুধীরের ছেলে পড়ে। আমার সহপাঠী ছিল, একসঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলাম। তার ছেলে দীপঙ্কর সত্যিই ভালো ছেলে। খবর পেলাম এম. এ. পরীক্ষায় বেশ ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমিই আদরিণীর সঙ্গে দীপঙ্করের সম্বন্ধ করে সুধীরকে চিঠি লিখলাম। আশা ছিল সুধীর আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে না। সুধীর সোজাসুজি অগ্রাহ্য করেওনি। সে মেয়েও দেখতে চাইলে না। লিখলে, 'তুমি যখন মেয়ে দেখে পছন্দ করেছ আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু দীপঙ্কর আমাদের একমাত্র ছেলে, তাই আমার স্ত্রীর বিশেষ ইচ্ছা যে পাত্র-পাত্রীর যোটক বিচার করে যেখানে ভালো মিল হবে সেইখানে ছেলের বিয়ে দেবেন।' আদরিণীর কুষ্ঠি পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। সাত দিন পরে খবর এল, মিল হয়নি। বাঙ্গালীদের চক্ষুলজ্জা খুব প্রবল, যেখানে সোজা পথে প্রত্যাখ্যান কর সম্ভব নয় সেখানে বাঁকা-পথ আবিষ্কার করে চক্ষুলজ্জার মর্যাদা রক্ষা করবার মতো বুদ্ধিও তার আছে। যাই হোক, আমি ওখানে যতদিন ছিলাম ততদিন আদরিণীর বিয়ের কোন ব্যবস্থা হয়নি। হবে এ আশাও ছিল না। কারণ যে যোগাযোগের ফলে আমাদের সমাজে মেয়ের বিয়ে হয় সে যোগাযোগ ঘটাবার সামর্থ্য পীতম্বরের ছিল না।

কিছুদিন পরে আমি ওখান থেকে বদলি হ'য়ে গেলাম।

আমি বগুড়ায় গিয়ে আমার আর এক বন্ধু দ্বিজেনের চিঠি পেলাম। দ্বিজেন সুধীরেরও বন্ধু। দ্বিজেন লিখেছে, 'সুধীর তার ছেলের জন্যে চারিদিকে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে। মুখে যদিও খোলাখুলি বলছে না, কিন্তু মনে হয় তার আসল লক্ষ্য টাকা।

একজায়গায় শুনলাম খোলাখুলিই নাকি সে নগদ দশ হাজার টাকা চেয়েছিল। মেয়ের বাবা যখন বললেন অত টাকা আমি দিতে পারব না, বড় জোর হাজার ছয়েক দিতে পারি,—সুধীর কি উত্তর দিলে জান? লিখলে আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী হতাম, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে কুষ্টির মিল হয়নি।

এ চিঠি পাওয়ার মাস ছয়েক পরে খবর পেলাম সুধীরের ছেলে দীপঙ্কর আই. এ. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর কিছুদিন পরে সে আমারই কাছে এ. ডি. এম. হ'য়ে এল ট্রেনিং নেবার জন্য। খুশী হলাম তাকে দেখে।

এসেই সে তার বউ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। কালো সুঁটকো লম্বা একটি মেয়ে। শুনলাম জাতে সোনারবেনে, কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো। দীপঙ্করের সহপাঠিনী ছিল। লভ্ ম্যারেজ। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে ভালোই লাগল। কথায় কথায় জানতে পারলাম এ বিয়েতে কুষ্টিও মেলানো হয়নি, পণ নিয়ে কচলাকচলি করবার সুযোগও পায়নি সুধীর। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সুধীর দীপঙ্করের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধও ছিন্ন করেনি। এই বউকেই বরণ করে নিয়েছে।

তিন

বদলি হয়ে চলে আসবার পর পীতাম্বরের একটি মাত্র চিঠি পেয়ে ছিলাম। আদরিণীও একটি চিঠি লিখেছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ তারা থেমে গেল। আমি চিঠি লিখেও আর তাদের পেলাম না। নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'ত আমাকে, আর তাদের খবর নিতে পারিনি। তারপর সাধারণতঃ যা হয়, ক্রমশঃ তাদের কথা ভুলেই গেলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুলে থাকা গেল না।

আমি রিটায়ার করে কলকাতায় বসবাস করছিলাম। সময় কাটাবার জন্যে কাজও নিয়েছিলাম একটা। পাঞ্জাবের একজন বড় চামড়া-ব্যবসায়ী জাফর খাঁ তার ব্যবসায়ের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন আমাকে। আপিসে একদিন বসে আছি, চাপরাসী এসে খবর দিলে—এক 'আওরৎ' আমার সঙ্গে 'মুলাকাত' করতে চান। আমার কামরায় নিয়ে আসতে বললাম। আপাদমস্তক বোরখা ঢাকা এক মহিলা এসে প্রবেশ করলেন। অবাক হ'য়ে গেলুম যখন সে বোরখার মুখের কাপড়টা তুলে ফেললে

"আমাকে চিনতে পারছেন কাকাবাবু?"

সত্যিই আমি চিনতে পারিনি।

"আমি আদরিণী—"

"আদরিণী! তোমার এ বেশ!"

"আমি মুসলমানকে বিয়ে করেছি। আপনাদের সমাজে তো ঠাঁই পেলাম না। এরা আমাকে আদর করে নিয়েছে, আদর করে রেখেছে, আমি সুখে আছি। আমার স্বামী আপনার আপিসেই আপনার অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার।

'কাদের সাহেব তোমার স্বামী ?''

"হঁ্যা—"

নির্বাক হ'য়ে রইলাম।

একটি ছেলে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে।

"এটি আমার ছেলে। আব্বাস এদিকে আয়। নানা। নানাকে আদাব কর—"

আব্বাস এসে আদাব করল। আমি তার গাল টিপে একটু আদর করলাম। কি ক'রে আদরিণী মুসলমানকে বিয়ে করল, পীতাম্বরের খবর কি, এসব কথা আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলাম না।

চার

অনেকদিন পরে সোনাপুর গিয়েছিলাম একবার। গিয়ে দেখলাম তরলা নদী আর গ্রামের পাশ দিয়ে বইছে না। তার জলে জঞ্জাল ফেলে ফেলে গ্রামের লোকেরা তার খাত প্রায় বুজিয়ে দিয়েছে। নদী কিন্তু মরেনি। সে তার গতি পরিবর্তন করে পাশের গাঁয়ের গা ঘেঁষে বইছে। যে নদী সোনাপুরের শোভা ছিল, যে নদী সোনাপুরকে শস্যশ্যামল করে রাখত, সে নদী এখন রহিমগঞ্জের পাশ দিয়ে বইছে রহিমগঞ্জের শোভা-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে।

জবর দখল

আমি যখন সুনন্দাকে দেখতে যাই, তখন আমি জানতাম না যে সে আমার বাল্যবন্ধু হরিশের স্ত্রী। হরিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব অবশ্য বাল্যকালেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা-ও মাত্র এক বৎসরের জন্য! মেডিকেল কলেজে যখন পড়ি, তখন আর একবার দেখা হয়েছিল। সে কলেজে এসেছিল বসন্তের টিকা নেবার জন্য। বলেছিল, আফ্রিকা যাচ্ছি একটা চাকরি পেয়ে। তখন তার বিয়ের কথা শুনিনি। তারপর তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি পাশ করবার পর মেডিকেল কলেজেই হাউস সার্জন হয়ে বছর দুই ছিলাম। তারপর প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম কলকাতায়। অবশ্য নামেই 'প্র্যাকটিস', পয়সা দেনেওলা রোগী প্রায়ই জুটত না। অধিকাংশ সময়ই ব্যাগার খাটতে হ'ত। এই সময়েই আবিষ্কার করেছিলাম 'কলকাতা' শহরে আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা কত বেশী। আমি যতদিন ডাক্তার হইনি ততদিন তারা আমার বিশেষ খবর নিত না। কিন্তু ডাক্তার হয়ে গ্রে স্ট্রীটে ঘর ভাড়া করে বসবামাত্র পিল পিল করে বেরিয়ে এল তারা সবাই চার দিক থেকে। অনেককে আমি চিনতেও পারতাম না, কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচয় পত্র থাকত, তখন বুঝতে পারতাম তারা আমার অমুক

খুড়তুতো বোনের দেওর বা অমুক মামাতো ভায়ের খুড়তুতো শালী। এ সময়ে আমি পয়সা রোজগার করতে পারিনি বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম অনেক। এই সময়েই আমি সুনন্দাকে দেখি। যারা আমাকে সুনন্দাকে দেখবার জন্যে ডেকেছিলেন, তাঁরা আমাকে বলেন নি যে সুনন্দা আমার বাল্যবন্ধু হরিশের স্ত্রী। সম্ভবত তাঁরা নিজেরাও জানতেন না এ কথা। আমাকে তাঁরা ডেকেছিলেন, কারণ একটি অর্ধ-পাগলিনী মেয়ে আমার চিকিৎসায় ভালো হয়েছিল এবং সে ছিল সুনন্দাদের পাশের বাড়িতে। তার স্বামীর সুপারিশের জোরেই আমার ডাক পড়েছিল। সুনন্দার বাবাই আমাকে ডাকতে এসেছিলেন। তাঁর মুখেই শুনলাম কলকাতার কয়েকজন নামজাদা ডাক্তারকেও তাঁরা দেখিয়েছেন। কবিরাজী এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোন ফল হয়নি। শেষে পাশের বাড়ির ভদ্রলোক তাঁকে আমার কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রীর হিস্টিরিয়া হয়েছিল, ফিট্ হ'ত এবং সেই সময় আবোল-তাবোল বকত। হিস্টিরিয়ার সাধারণ চিকিৎসা করেই ভালো হয়েছিল সে। সুনন্দার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার মেয়েরও কি ফিট্ হচ্ছে ?"

"প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম, ফিট্ই হয়েছে। কিন্তু 'ফিট্' হলে তো 'ফিট্' ভাঙ্গে, এ গত দু'মাস থেকে আচ্ছন্নের মতো পড়েই আছে। চলুন না আপনি নিজেই দেখবেন ব্যাপারটা—"

দুই

সুনন্দা বিছানায় চোখ বুঁজে শুয়েছিল আর ফিস্ ফিস্ করে বলছিল,—"জলে গেল, জলে গেল! সর্বাঙ্গ জলে গেল আমার।" অনবরত ওই কথাই বলছিল। কিন্তু ফিস্ ফিস্ করে বলছে কেন তা প্রথমে বুঝতে পারিনি।

"ওই রকম ফিস্ ফিস্ করেই কি বরাবর কথা বলছে ?"

"না, প্রথম প্রথম খুব চীৎকার করত। এখন গলা ভেঙ্গে গেছে।"

নাড়ী দেখলাম। নাড়ী ভালই মনে হল। আমি অবাক হয়ে গেলাম সুনন্দার রূপ দেখে। মহাভারতের কৃষ্ণার রূপবর্ণনা পড়েছিলাম, সুনন্দাকে দেখে তা মনে পড়ে গেল। রং কালো বটে, কিন্তু কি চমৎকার মুখশ্রী! কি কালো চুল! অমন সুন্দর চুল আমি আগে কখনও দেখিনি। বালিশের উপর গোছা গোছা ছড়ানো ছিল এলোমেলো হয়ে, সত্যিই মনে হচ্ছিল মেঘ নেমেছে। চোখ দুটি বোঁজা ছিল, কিন্তু তবু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে, সে দুটি টানা টানা। অদ্ভুত রূপসী।

"জলে গেল, জলে গেল, সর্বাঙ্গ জলে গেল আমার"—ফিস্ ফিস্ করে ক্রমাগত বলে চলেছে।

"কি কষ্ট হচ্ছে আপনার ?"

কোন উত্তর নেই।

"কি কষ্ট হচ্ছে বলুন। চোখ খুলুন, চেয়ে দেখুন আমার দিকে—"

চোখ খুলল না, কোনও উত্তরও পেলাম না।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম চোখের কোণ থেকে জল পড়ছে।

একটা ইন্‌জেক্‌শন দিলাম ঘুমের জন্য।

বললাম, "কাল আবার আমাকে খবর দেবেন।"

সুনন্দার বাবা আমাকে ফি দিতে এলেন।

বললাম, "আগে উনি ভালো হয়ে উঠুন! তারপর ওসব কথা হবে—"

"ভালো হবে তো?"

"চেষ্টা তো করব।"

তিন

তার পরদিন খবর পেলাম সুনন্দার ঘুম হয়নি। ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার পর তার আচ্ছন্ন ভাবটা আর একটু বেড়েছিল মাত্র, যাকে ঘুম বলে তা হয়নি। সমস্ত রাত ঠোঁট সমানে নড়েছে আর তেমনি ফিস্ ফিস্ করে ক্রমাগত বলেছে—জলে গেল, জলে গেল, সর্বাঙ্গ জলে গেল। তবে সেটা আর খুব স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে না।

গিয়ে দেখলাম, সুনন্দা তেমনিভাবেই পড়ে আছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। বুঝতে পারলাম খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে ওর।

টেম্পারেচার নিয়ে দেখলাম জ্বর নেই। নাড়ীও ভালো। রক্তের চাপ এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু ও বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। অনেকদিন থেকেই পারছে না। প্রায়ই বিছানা নষ্ট করে ফেলে। দেখলাম এইটেই ওদের পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন করে বুঝলাম, প্রস্রাব, পায়খানা স্বাভাবিক যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। ওঁরা যতটা পারছেন ওকে খেতেও দিচ্ছেন। গলা-গলা ভাত, আলু, ডিম, তরি-তরকারী, ফলের রস, ভিটামিন, সিদ্ধ মাছ সবই দেওয়া হচ্ছে। মুখের ভিতর চামচে করে আস্তে আস্তে দিয়ে দিলে বেশ খেয়ে নেয়। ক'দিন থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করে তাঁরা আশ্চর্য বোধ করছেন। তরি-তরকারীর মধ্যে বেগুন থাকলে ও খেতে চাইছে না, মুখ থেকে বার করে দিচ্ছে। অথচ বেগুন ওর খুব প্রিয় তরকারী। বেগুন ভাজা, পোড়া, সিদ্ধ সবরকম ও খেতে খুব ভালবাসত। অথচ এখন খেতে চাইছে না।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর অতি সাধারণ একটা ঘুমের ওষুধ, যাকে ডাক্তারী ভাষায় বলে সিডেটিভ মিকশ্চার, তাই দিয়ে চলে এলাম।

চার

কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপার ঘনীভূত হ'তে লাগল। একদিন সকালে গিয়ে লক্ষ্য করলাম তার সর্বাঙ্গে ফোস্‌কার মতো হয়েছে। অনেক জায়গায় চামড়া কুঁচকে গেছে। তাছাড়া মনে হল চোখের কোণ দিয়ে পুঁজ পড়ছে। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। মনে হচ্ছে যেন মুখখানা জরাগ্রস্ত। সুনন্দার কালো রং আরও কালো হয়ে গেছে। যেন ঝলসে দিয়েছে কেউ। মুখের সে সুন্দর শ্রী আর নেই। মুখটা বেগুন-পোড়ার মতো দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো কিন্তু নড়ে যাচ্ছে সমানে। কিন্তু কথা আর শোনা যাচ্ছে না। ঠোঁটের চামড়াও কুঁচকে গেছে দেখলাম।

সুনন্দার নিদারুণ পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ডাক্তারি বিবেক বললে, কোন রকম ইনফেকশন হয়েছে। সুতরাং পেনিসিলিন চালাও। তাই ব্যবস্থা করলাম। তার রক্ত এবং চোখের পুঁজটাও পরীক্ষা করতে দিলাম। কিন্তু বিশেষ কোনও জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল না। তবু পেনিসিলিন চলতে লাগল।

পাঁচ

এর দিন চার পাঁচ পরে গভীর রাত্রে সুনন্দার বাবা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন আমার কাছে।

"শিগ্‌গির চলুন ডাক্তারবাবু, আমার মেয়ে বোধহয় আর বাঁচবে না। কিরকম যেন করছে। মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলছে—"

"চুল ছিঁড়ে ফেলছে! কি রকম?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি চলুন তাড়াতাড়ি। সমস্ত মাথা রক্তাক্ত হয়ে গেছে, উঃ সে যে কি দৃশ্য।"

আমি গিয়ে যা দেখলাম, তা সত্যিই মর্মান্তিক এবং ভয়াবহ। কি করে যে এ ব্যাপার হল তা-ও বুঝতে পারলাম না। বাড়ির কেউ বলতেও পারল না। কারণ প্রত্যক্ষদর্শী কেউ ছিল না, সবাই ঘুমুচ্ছিল। দশ-বারো বছরের যে ছেলেটি সুনন্দার ঘরে শুত, সে বললে—আমি যেন শুনলাম, কে বলছে দূর হ, দূর হ, দূর হ। তারপরই দিদি আর্তনাদ করে উঠল। আলো জেলে দেখি এই কাণ্ড। যা ঘটেছিল তা সত্যিই ভয়ঙ্কর। দেখলাম সুনন্দার সমস্ত চুল পরচুলার মতো বালিশের একধারে পড়ে আছে, আর সমস্ত মাথা রক্তাক্ত। বালিশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কি করে হল এটা? সুনন্দা নিজে ছিঁড়েছে? তার সমস্ত দেহের চামড়া অবশ্য ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, জোরে টান দিলে চামড়া উঠে আসা অসম্ভব নয়, কিন্তু কে এমনভাবে টানল! সুনন্দা নিজে? যন্ত্রণায় অধীর হয়ে? কিন্তু এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার তখন অবসর ছিল না। অবিলম্বে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

সেইদিনই সুনন্দার বাবাকে বললাম—"ওঁর স্বামী কোথায় থাকেন ? তাঁকে একবার খবর দিন। তাঁকে তো একদিনও দেখিনি, তিনি খবর পেয়েছেন তো ?"

"অনেকবার খবর দিয়েছি। কিন্তু সে তো বিদেশে থাকে। তার পক্ষে চট্ করে আসা মুশকিল—"

"বিদেশে ? কোথায় ?"

"আফ্রিকায়। কঙ্গোতে—"

তখনও আমার মনে পড়েনি যে, আমার বাল্যবন্ধু হরিশও আফ্রিকাতে গেছে। সুনন্দার বাবাও সব খবর খুলে বলেন নি আমাকে। হয়তো তিনিও জানতেন না। সুনন্দা যখন অসুস্থ, হরিশ কঙ্গোতে তখন জেল খাটছে।

ছয়

হাসপাতালে গিয়ে সুনন্দা সুস্থ হতে লাগল ক্রমশ। মাথার ঘা সেরে গেল, চুলও উঠতে লাগল নতুন করে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম, চুলের রং কালো নয়, লালচে। আর একটা জিনিসও হল যা অদ্ভুত। তার সর্বাঙ্গের চামড়া যেন খোলসের মতো খসে পড়ল। নতুন যে চামড়া দেখা দিল তার রং কালো নয় গোলাপী। চোখের চেহারা বদলাল। টানা টানা চোখ ছিল সুনন্দার। কিন্তু চোখের কোণে ঘা হয়েছিল, চোখের পাতাতেও। ঘা অবশ্য সারল, কিন্তু চোখ আর টানা টানা রইল না। সুনন্দার চোখের ভিতরেও ঘা হয়েছিল · ঘা সারতে দেখা গেল, চোখের তারার রংও বদলেছে। ছিল কালো, হয়েছে কটা। সুনন্দার বাবা বললেন, গলার স্বরেরও নাকি পরিবর্তন ঘটেছে। রুচিরও। সুনন্দা বেগুন খেতে ভালবাসত কিন্তু ভালো হবার পর আর বেগুন খেতে চায় না। সুনন্দার পোস্ত মোটে ভালো লাগত না. কিন্তু ভালো হবার পর খুব পোস্ত খাচ্ছে। সুনন্দার গান-বাজনার খুব ঝোঁক ছিল, কিন্তু ভালো হবার পর তাকে আর কেউ গান গাইতে শোনেনি। সেতারটা একবারও ছোঁয়নি।

কোনও ইন্‌ফেক্‌শনের ফলে কোন ব্যক্তির এরকম দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের কথা শুনিনি। এ নিয়ে একটা গবেষণা করব ভাবছিলাম। এমন সময় হরিশ এসে হাজির হল। হরিশ যখন তার স্ত্রীকে দেখতে এল, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হরিশ এসেই চমকে উঠল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"এ কি আভা! তুমি!"

সুনন্দা মৃদু হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমি ফিরে এসেছি—"

পরে হরিশের কাছে শুনলাম, আভা ওর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। বিয়ের দু বছর পরে ও সুনন্দার প্রেমে পড়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছিল সুনন্দাকে। কিন্তু খবরটা বেশী দিন চাপা থাকেনি। অন্তত আভার কাছে থাকেনি। সে আত্মহত্যা করেছিল।

পীতাম্বর দাস চাষা লোক। ঘোর পাড়াগাঁয়ে থাকে। জমিতেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। ঘরে চার-পাঁচটি গাই আছে। তাহাদের সেবাও স্বহস্তে করে পীতাম্বর। অসুখ-বিসুখ যে মাঝেমাঝে হয় না তাহা নয়, কিন্তু মোটের উপর তাহার শরীর বেশ সুস্থ। আধ সের চালের ভাত, তদুপযুক্ত ব্যঞ্জন এবং খাঁটি এক সের দুধ সে অনায়াসে হজম করিয়া থাকে। পীতাম্বরের ভাই নীলাম্বর স্কুলে পড়িয়াছিল, স্কুল হইতে কলেজে যায়। কলেজ হইতে বাহির হইয়া সে কেরানী হইয়াছে। কলিকাতায় একটি এঁদো গলিতে বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে। দশবৎসর একটানা কেরানীগিরিই করিয়া চলিয়াছে। ছুটি লয় নাই, বাড়ি যায় নাই। কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র পীতাম্বর তাহার বিবাহ দিয়াছিল। কেরানীগিরি পাইবামাত্র নীলাম্বর বধূকে আনিয়া উক্ত এঁদো গলির মধ্যে তাহার গৃহস্থালি পাতিয়াছে। গুটি তিনেক সন্তানও হইয়াছে। পীতাম্বর ভাইকে দশ বৎসর দেখে নাই। নীলুর ছেলেমেয়ে কলিকাতাতেই হইয়াছে, পীতাম্বর পোস্টকার্ডযোগে সে খবর পাইয়াছে মাত্র।

…সহসা তাহার চিত্ত একদিন আকুল হইয়া উঠিল। ধানকাটা শেষ করিয়া সে ঠিক করিল নীলুকে এইবার একবার দেখিয়া আসিতে হইবে। সুযোগও জুটিয়া গেল, গ্রামের একটি ছেলে কমল কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতা যাইতেছিল, পীতাম্বর ঠিক করিল তাহার সহিতই যাইবে। সঙ্গে কেহ না থাকিলে তাহার পক্ষে কলিকাতা শহরে নীলুকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব, কমলকে সঙ্গে পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

নীলুর জন্য পীতাম্বর ক্ষীর লইয়া যাইতেছিল। বাড়ির গরুর দুধ প্রায় পাঁচ সের হয়, বিধু গয়লানীর নিকট সে আরও পাঁচ সের লইয়াছিল। এই দশ সের দুধ মারিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিয়াছিল সে। লোকমুখে সে শুনিয়াছিল কলিকাতা শহরে নাকি ভাল দুধের খুব অভাব। কমল ছোকরা খুব বুদ্ধিমান। বলিল, ক্ষীর মাটির হাঁড়িতে লইবেন না। অ্যালুমিনিয়ম বা পিতলের হাঁড়িতে লওয়াই ভাল। মাটির হাঁড়িতে লইলে ট্রেনের ভিড়ে ঠোকা লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙিয়া যাইতে পারে।

তাহার দ্বিতীয় পরামর্শটিও সুপরামর্শ। সে বলিল, একটি বড় ঝুড়ির ভিতর হাঁড়িটি বসাইয়া লউন। হাঁড়ি গড়াইবে না, তা ছাড়া হাঁড়ির চারিপাশে বরফ দেওয়ারও সুবিধা হইবে। কলিকাতা পৌঁছিতে বারো ঘণ্টার উপর লাগিবে। গ্রীষ্মকালে ক্ষীর পচিয়া যাইতে পারে। হাঁড়ির চারিদিকে বরফ দিলে সে ভয় আর থাকিবে না। পীতাম্বর কমলের দুইটি উপদেশই পালন করিল।

হাওড়া স্টেশনে যখন তাহারা নামিল তখন রাত্রি প্রায় নটা। ঝুড়িসুদ্ধ ক্ষীরের হাঁড়ি লইয়া ট্রামে বা বাসে চড়া গেল না। কমল বলিল ট্যাক্সি করিতে হইবে। ট্যাক্সির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল।

ক্ষীরের জন্য এত ঝঞ্ঝাট, তবু কিন্তু পীতাম্বর উৎফুল্ল। খাঁটি ক্ষীর পাইয়া নীলু, নীলুর বউ এবং ছেলেমেয়েরা যে কত খুশী হইবে এই মনে করিয়া সমস্ত ঝামেলা সে হাসিমুখে সহ্য করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় তাহারা নীলুর বাসায় পৌঁছিল। নীলুর চেহারা দেখিয়া পীতাম্বর তো অবাক। চেনা যায় না। চক্ষু কোটরাগত, গালের হাড় দুইটা উঁচু, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। তাহার বউ, ছেলে-মেয়েরাও খুব রোগা।

ঝুড়িসুদ্ধ ক্ষিরের হাঁড়িটা দেখাইয়া নীলু প্রশ্ন করিলে—"ওটা কি ?"

"ক্ষীর। খাঁটি ক্ষীর এনেছি তোদের জন্য—"

"ক্ষীর! ক্ষীর না এনে কিছু কাঁচকলা আনলেই পারতে—"

"কাঁচকলা! কাঁচকলা কি এখানে পাওয়া যায় না ?"

"যায়, কিন্তু বড্ড দাম—"

"সে খেয়াল তো করিনি। যাই হোক, ক্ষীরটা এনেছি, খেয়ে ফেল। এখনই খা। তা না হলে টকে যাবে। বরফ দিয়ে দিয়ে এনেছি—"

"এখন তো খাওয়া যাবে না"—

"কেন!"

"চৌবাচ্চায় এক ফোঁটা জল নেই।"

তিনটি

জবালাল পূর্বে কুকুর পুষিতেন। এখন বাঁদর পুষিতেছেন। তিনি ইতিহাসের সাহায্যে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, বাঁদরদের সহায়তায় শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় করিয়া সীতা-উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি নিজ কার্য উদ্ধারের আশায় তাই বাঁদরদের প্রশ্রয় দিতেছেন। বলা বাহুল্য, কলার লোভেই বাঁদররা বশীভূত হইয়াছে। জবালাল আরও নানা উপায়ে বাঁদরদের চিত্ত জয় করিয়াছেন। নানা-বর্ণের প্লাস্টিকের কণ্ঠাভরণ উপহার দিয়াছেন তিনি বাঁদরদের। কোনটা লাল, কোনটা নীল, কোনটা সবুজ, কোনটা বা সোনালি। যদিও দেখিতে সেগুলি অনেকটা কুকুরের গলার বকলেশের মতো কিন্তু জবালাল সেগুলির নাম দিয়াছেন শ্রীহার। তিনটি বাঁদরের কিন্তু বিশেষ রকম খাতির হইয়াছে। তাহাদের পুচ্ছাগ্রও সোনালি প্লাস্টিকে মণ্ডিত করিয়াছেন জবালাল। তাহাদের বলিয়াছেন, তোমরা বাঁদরশ্রেষ্ঠ, তোমরা বানরোত্তম। ইহা শুনিয়া তিনজনই বিশেষ রকম অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং গদগদ কণ্ঠে নিম্নলিখিতরূপ আলাপ করিতেছে।

প্রথম বাঁদর। টিক্ টিকা টিকা টিকা টিকা।

দ্বিতীয় বাঁদর। লিক্ লিকা লিকা লিকা লিকা।

তৃতীয় বাঁদর। চিক্ চিকা চিকা চিকা চিকা।

এ আলাপের অর্থ কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু তাহাদের খাড়া ল্যাজ, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, পা ফাঁক করিয়া চলা, কষায়িত লোচন দেখিয়া অনুমান করা যায় তাহারা বড়ই হৃষ্ট হইয়াছে।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু বিপদ দেখা দিল। তাহাদের খাড়া ল্যাজ আর কিছুতেই নামিতে চাহে না, সর্বদাই খাড়া হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম কিছুদিন তাহারা ইচ্ছা করিয়াই ল্যাজটাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন টনটন করিতে লাগিল তখন তাহাদের মনে হইল কিছুক্ষণ নামাইয়া রাখা যাক, একটু পরে আবার খাড়া করিব কিন্তু নামাইতে গিয়া দেখে কি সর্বনাশ—ল্যাজ নামিতেছে না। শুধু তাহাই নয়। ল্যাজের ডগা টন্‌টন্ করিতেছে তাহাদের আলাপের ভাষা বদলাইয়া গেল।

প্রথম বাঁদর। টুক্ টুক্রু টুক্ টুক্রু।

দ্বিতীয় বাঁদর। লুক্ লুক্রু লুক্ লুক্রু।

তৃতীয় বাঁদর। চুক্ চুক্রু চুক্ চুক্রু।

এবারও কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু তাহাদের আর্ত ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল তাহারা বেকায়দায় পড়িয়াছে।

বাঁদর মহলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কয়েকটি পালোয়ান বাঁদর টানিয়া ল্যাজ নামাইতে চেষ্টা করিল, ল্যাজ নামিল না। কয়েকটি ভক্ত বাঁদর প্রার্থনা করিতে লাগিল—হে পুচ্ছ, তুমি অবনত হও। দয়া কর, অবনত হও, একটু নামো। ল্যাজ নামিল না। জবালাল মজা দেখিতেছিলেন। তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী ডাক্তার পাঠাইলেন।

ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন—প্লাস্টিকের সোনালি টুপিগুলি ল্যাজের ডগায় কাপে কাপে বসিয়াছে। রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া পচ্ ধরিয়াছে—ডাক্তারি ভাষায় যাহাকে গ্যাংগ্রিন বলে তাহাই হইয়াছে। ডগার খানিকটা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আর ল্যাজের গোড়ায় বাত হইয়াছে, যাহাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে স্পণ্ডিলাইটিস। ক্রমাগত ল্যাজ খাড়া করিয়া রাখিবার ফলেই সম্ভবত এইরূপ হইয়াছে। ইনজেক্‌শন দিলে সারিতে পারে, যদি না সারে গোটা ল্যাজটাই কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া বাঁদর তিনটির মুখে মানুষের ভাষা ফুটিল—

প্রথম বাঁদর। কিছুতেই ল্যাজ কাটিব না।

দ্বিতীয় বাঁদর। Ditto

তৃতীয় বাঁদর। Ditto

জবালালের পা ধরিয়া তাহারা তারস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

জবালাল বলিলেন, "ছি, ছি, বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের নির্দেশ মানিয়া না চলিলে লোকে কি বলিবে? তুচ্ছ রক্তমাংসের ল্যাজ কাটিয়া ফেলিলে ক্ষতি কি? আমি ভাল

সোনায় তোমাদের ল্যাজ গড়াইয়া সোনার স্প্রিং দিয়া তোমাদের পশ্চাদ্দেশে লাগাইয়া দিব। আসল ল্যাজের চেয়ে দেখিতে আরও ভাল হইবে।"

শোনা যাইতেছে বাঁদর তিনটি রাজি হইয়াছে।

উপলক্ষ

শশধর কানুনগো এবং পরমেশ্বর আইচ খবরটি শুনিয়া প্রথমে বিস্মিত এবং পরে আতঙ্কিত হইলেন। মৃত্যুঞ্জয় বসাক রামানন্দ গোস্বামীর কাছে মন্ত্র লইয়াছে! কি সর্বনাশ! তাহা হইলে মৃত্যুঞ্জয়ের খরচে এত দিন ধরিয়া তাঁহারা যে মুর্গি-মেধ যজ্ঞ চালাইতেছিলেন তাহা তো বন্ধ হইয়া যাইবে! মুর্গির স্থান হয়তো মালপো অধিকার করিবে, কিন্তু তাহাতে লাভ কি! শশধর কানুনগো বহুমূত্র রোগে কাবু, আর পরমেশ্বরের মালপো মুখে দিলেই বমি আসে। ওই তুলতুলে চটচটে ব্যাপার পছন্দই করেন না তিনি। রামানন্দ গোস্বামীর নিকট মন্ত্র লইয়াছে—কি সর্বনাশ! অবিলম্বে তাঁহারা বন্ধুর উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের একটি আশা ছিল মৃত্যুঞ্জয় বিবেচক ব্যক্তি। রামানন্দ গোস্বামীর সম্বন্ধে সত্য সংবাদগুলি সে হয়তো জানে না, তাই ওই খপ্পরে পড়িয়াছে। সংবাদগুলি শুনিলে তাহার ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইবে না। রামানন্দ সম্পর্কে যে সব মারাত্মক খবর পরমেশ্বর জানেন তাহা শুনিবার পরও কি মৃত্যুঞ্জয় বসাকের মতো একজন বৈজ্ঞানিক তাহাকে গুরুপদে বহাল রাখিবে? অসম্ভব। শশধর কানুনগোর ভাণ্ডারেও গুরুবিরোধী কতকগুলি চোখা চোখা যুক্তি ছিল। তাঁহার আশা ছিল তাহাও মৃত্যুঞ্জয়কে বিচলিত করিবে।

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার ত্রিতলের ঘর হইতে দেখিলেন শশধর এবং পরমেশ্বর আসিতেছেন। তিনি নামিয়া আসিলেন।

"কি খবর হে—"

"শুনলাম তুমি মন্ত্র নিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"রামানন্দ গোস্বামীর কাছে?"

"হ্যাঁ, কেন?"

উভয় বন্ধু ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর পরমেশ্বর বলিলেন, "তোমার গুরুদেবের সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু বক্তব্য আছে—"

শশধর বলিলেন, "তাছাড়া তোমার গুরু নেওয়ার দরকারটাই বা কিসের—"

মৃত্যুঞ্জয় একবার পরমেশ্বর একবার শশধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা বস। আমি আসছি একটু ভিতর থেকে—"

মৃত্যুঞ্জয় ভিতরে চলিয়া গেলেন।

"দেখেছ, এর মধ্যেই গেরুয়া ধারণ করেছে !"

"কপালের মাঝখানে সূক্ষ্ম তিলকটি লক্ষ্য কর নি ?"

"করেছি বই কি। কিন্তু ওকে আমরা কন্‌ভিন্স করবই।"

"ফিজিক্সের প্রফেসার—ছি, ছি, ছি। একটা কথা কিন্তু শুনেছি ভাই, লুকিয়ে লুকিয়ে ও কবিতা লেখে—ওই রন্ধ্র পথেই বোধ হয় শনি ঢুকেছে—"

মৃত্যুঞ্জয় প্রবেশ করিলেন।

"কি বলবে বল-

পরমেশ্বর বলিতে লাগিলেন—"তোমার রামানন্দ স্বামীর আসল পরিচয় বোধ হয় তুমি জান না। ওর আসল নাম হচ্ছে ঘেঁাতনা। আমার পিসতুতো শালার বাড়িতে বাজার সরকার ছিল। তখন ওর বয়স বেশী নয়। কিছুদিন পরে হঠাৎ দেখা গেল ও দাড়ি কামাচ্ছে না, চুলও ছাঁটছে না। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে মুচকি মুচকি হাসে শুধু। তারপর উধাও হল একদিন। পাশের বাড়ির বউটিও নিরুদ্দেশ, সঙ্গে সঙ্গে তার গয়নার বাক্সটিও। থানা পুলিশ হল। ধরাও পড়ল কাশীতে। তুমি যদি চাও প্রমাণ দিতে পারি— "

মৃত্যুঞ্জয় নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না।

পরমেশ্বর বলিতে লাগিলেন—"তারপর জেল থেকে যখন ঘেঁাতনা বেরুল তখন তার মুনি ঋষির মতো চেহারা হয়ে গেছে। তারপর কোথায় সে কি সাধনা কোন গুহায় বসে করেছিল জানি না, এখন দেখছি তোমরা দলে দলে তার দিকে দৌড়ুচ্ছ। ভদ্রঘরের জোয়ান জোয়ান মেয়েরা তাকে ঘিরে আরতি করছে, তার গা ঘেঁষে বসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে। মনে হচ্ছে বাঙালী জাতটা সব হারিয়ে এখন সিনেমা আর গুরু নিয়ে মেতেছে, কারণ ওটা একই মনোবৃত্তির দুটো দিক। কিন্তু তোমার মতো লোক যে এই খপ্পরে পড়বে শেষে তা ভাবি নি—"

মৃত্যুঞ্জয় কোন জবাব দিলেন না।

শশধর বলিলেন, "তাছাড়া ধরেই যদি নেওয়া যায় যে গুরু হিসেবে রামানন্দ স্বামী খুব উঁচুদরের লোক তাহলেও তোমার কি দরকার আছে গুরুর ? কোন্‌টা ধর্ম কোন্‌টা অধর্ম তা কি তুমি জান না ? যে খোঁড়া তারই ক্রাচ্‌ দরকার, যে অন্ধ তারই লাঠি দরকার, তুমি চক্ষুষ্মান তোমার এক জোড়া সমর্থ পা রয়েছে তুমি ক্রাচ্‌ নিয়ে লাঠি হাতে করে বেড়াচ্ছ কেন ? চোখ মেলে দেখলেই তো ভগবানের অসংখ্য লীলা দেখতে পাওয়া যায়, তা দেখবার জন্যে অন্ধকার ঘরে বসে নাক টিপে বিশেষ একটা মন্ত্র যপ করা কি দরকার তোমার পক্ষে ? মুর্গি ছেড়ে মালপো খেলেই কি তুমি ভদ্রলোক হয়ে যাবে ? না, না মৃত্যুঞ্জয়, ওসব পাগলামি তোমাকে সাজে না। গুরু টুরু ছাড়ো। আমরা কিছুতেই ওসব বরদাস্ত করব না—"

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডল প্রস্তরবৎই রইল।

"কিছু বলছ না যে—"

পরমেশ্বর প্রশ্ন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় নীরব।

শশধর তাঁহার গায়ে ঠেলা দিয়া বলিলেন, "কি হল হে, তোমার—"

মৃত্যুঞ্জয়ের যেন চমক ভাঙিল।

বলিলেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি—"

"ভাবাভাবি নয়, আমাদের গা ছুঁয়ে কথা দাও যে ও গুরুকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না—"

"না, না, ভাবুক একটু। কাল আমরা আবার আসব।"

পরমেশ্বর এবং শশধর বাহির হইয়া গেলেন।

শশধর হাসিয়া বলিলেন, "একটু ভিজেছে মনে হচ্ছে—"

"ভিজতে হবেই। চালাকি নাকি—"

মৃত্যুঞ্জয় জানালা দিয়া যখন দেখিলেন যে শশধর এবং পরমেশ্বর বেশ কিছু দূর চলিয়া গিয়াছেন তখন তিনি তাঁহার দুই কান হইতে তুলাগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি দামী মোটরকার আসিয়া থামিল। রামানন্দ স্বামী অবতরণ করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বসাক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "আসুন—"

রামানন্দ স্বামী যখন চলিয়া গেলেন তখন মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "একটু আগে শশধর এবং পরমেশ্বর এসেছিল। গুরুদেবের সম্বন্ধে কিছু বলতে এসেছিল সম্ভবত। রাস্কেলরা এটা বুঝতে পারছে না যে তাঁর কথা শুনে আমার মনে যে কল্পনা-বিগ্রহ মূর্ত হয়েছে আমি তাঁর পূজা করছি। রামানন্দ স্বামী উপলক্ষ মাত্র—"

স্ত্রী বলিলেন—"তাতো বটেই! এস, অনেকক্ষণ কিছু খাওনি। ক্ষীরটুকু খেয়ে নাও—"

রাতে ও প্রভাতে

আমার বারান্দার ঠিক নীচেই গোলাপ বাগান। আর বারান্দায় ওঠবার সিঁড়ির ঠিক উপরেই হাই পাওয়ারের একটা ইলেকট্রিক বাতি। সেটা জেলে দিলে আমার বাড়ির সামনেটা আলোয় ভরে যায় গেট পর্যন্ত। সেদিন রাত্রি তখন বারোটা। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও শুয়েছিলাম, কিন্তু তখনও ঘুম আসেনি। মনে হল গেটের কড়াটা কে যেন নাড়ছে। উঠতে হল। আলোটা জেলে বাইরে এলাম। গেটের কাছে কাউকে দেখতে পেলাম না। মনে হল বোধহয় হাওয়ার শব্দ। ফিরছিলাম, কিন্তু

হঠাৎ যা চোখে পড়ল তাতে আর ফিরতে পারলাম না। দেখলাম বাল্‌ব্‌টার ঠিক নীচেই একটা মাকড়সা জাল তৈরী করছে। ধপধপে সাদা মাকড়সাটা ঠিক যেন একটা নিটোল মুক্তোর মতো। আর সেই মুক্তোটা যেন ঘুরে ঘুরে তার নিজের ভিতর থেকেই মুক্তোর সূতো বার করে অপরূপ জাল বুনে চলেছে। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। উপনিষদের একটা শ্লোক মনে পড়ল। মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল তারপর জালটা আলোর নীচে। উর্নার সঙ্গে, চূর্ণা, পূর্না, ঘুর্না, ঝরণা প্রভৃতির মিল মিলিয়ে কবিতাও রচনা করতে লাগলাম মনে মনে। তারপর মাকড়সাটা শোঁ করে নেবে গেল। অনেকক্ষণ ফিরল না। আমি ভিতরে চলে গেলাম, ভাবলাম কাল সকালে এই অপরূপ শিল্পসৃষ্টিটা ভাল করে দেখা যাবে।

দুই

"বাবা, বাবা ওঠ, কি কাণ্ড হয়েছে দেখবে এস।"

"কি ?"

"আমাদের ক্লিওপেট্রা গোলাপের কুঁড়িটা একদম নষ্ট করে দিয়েছে।"

"সে কি! কে ?"

উঠে বসলাম।

"একটা মাকড়সা। ইয়া বড় সাদা একটা মাকড়সা। বাল্‌বটার নীচে প্রকাণ্ড একটা জাল পেতেছিল—"

উঠে বেরিয়ে এলাম।

"কই জালটা ?"

"ঝেঁটিয়ে সব সাফ করে দিয়েছি।"

"মাকড়সাটা কোথায় ?"

"পালিয়ে গেল।"

ক্লিওপেট্রার কুঁড়িটা দেখলাম। বেচারার প্রাণরস শুষে নিয়েছে একেবারে। কুঁকড়ে গেছে। মনে পড়ল মিশরের রাণী নীল-নদ-নন্দিনী ক্লিওপেট্রাকে। পরক্ষণে, মাকড়সাটাকে দেখতে পেলাম—পাশের ডালে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে গোলাপ কুঁড়িটার দিকে। সাদা টোগা পরে রোমান দস্যু অক্টেভিয়াস যেন দেখছে সর্পাহতা ক্লিওপেট্রাকে। আমাকে দেখেই টপ করে সরে পড়ল আবার।

মড়াটা

ব্যাপারটার সূত্রপাত তর্ক থেকে। মেডিকেল কলেজের একটা মেসে থাকত জীবেন, কানু আর অমল। তিনজনেই থার্ড ইয়ারে পড়ে। তখন শীতকাল। মড়া-কাটা চলছে। অ্যানাটমি হলের প্রত্যেক টেবিলেই তখন এক-একটি করে মড়া শোয়ানো। মাথা মুখ গলা বুক হাত পা পেট কেটে কেটে ছিন্নভিন্ন করেছে ছাত্রের দল।

জীবেন আর কানু এক ঘরে থাকে। আর অমল থাকে তেতলার উপর ছোট্ট একটা ঘরে, একা। সে ঘরটা খুব ছোট, তাই সিঙ্গেল-সীটেড।

জীবেনদের ঘরেই তর্কটা শুরু হয়েছিল।

কানু। আজ ভাই আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

জীবেন। হঠাৎ? বউয়ের চিঠি আসেনি?

কানু। চিঠি এসেছে। মন খারাপ হয়েছে অন্য কারণে—

অমল। টাকা ফুরিয়ে গেছে বুঝি—

কানু। আরে না না, সে সব নয়। টাকা ফুরুলেই বা কি! নীলমণি ধার দিতে কোনদিন আপত্তি করবে না।

নীলমণি কলেজ-রেস্তোরাঁর মালিক। ছাত্ররা তার দোকানে ধারেই খাওয়া দাওয়া করে।

অমল। তাহলে মন খারাপ হবার কারণটা কি হল হঠাৎ?

কানু। আমাকে যে 'বডি' (body) দিয়েছে সেটা মেয়েছেলের। তার হাতে উলকি দিয়ে নাম লেখা আছে 'পারুল'। ছেলেবেলায় আমাদের গাঁয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। তার নামও পারুল। অনেকদিন তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। আজ ডিসেকশন করতে করতে কেবলই তার কথা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

অমল হো হো করে হেসে উঠল।

অমল। ছি, ছি এত ভীতু তুই! ওর মুখ দেখে চিনতে পারলি না?

কানু। মুখ তো নেই। হেড নেক ডিসেকশন হয়ে গেছে যে—আমি পা-টা করছি, মহসীন পেটটা, গোবিন্দ হাতখানা। ওদের পার্টনার হচ্ছে কালী, যতীন আর মহাবীর। ওরাও বলছিল ওদের গা ছমছম করছে।

অমল। দুৎ! যত সব কুসংস্কারের ডিপো!

জীবেন। তোর কুসংস্কার নেই?

অমল। একদম না।

জীবেন। গরুর মাংস খেতে পারিস?

অমল। থিয়োরেটিকালি আপত্তি নেই। খাই না কারণ খেতে প্রবৃত্তি হয় না।

জীবেন। ওইটেই প্রচ্ছন্ন কুসংস্কার।

অমল তা হতে পারে। কিন্তু কানুর মতো অমন দিনে দুপুরে গা-ছমছম করবে না।

জীবেন। রাত্রেও করবে না?

অমল। না, আমি ভূত বিশ্বাস করি না।

জীবেন। বিশ্বাস না করার মানে? অনাদিকাল থেকে পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজের সব স্তরের লোক যা বিশ্বাস করে সেটা কি ভুয়ো হতে পারে? তোমার অবিশ্বাসের হেতু কি?

অমল। আমি নিজে কখনও দেখিনি—

জীবেন। তুমি কি নিজে কখনও সুইজারল্যাণ্ড বা আইসল্যাণ্ড দেখেছ? ওগুলো নেই? মাইক্রোসকোপ আবিষ্কার হবার আগে কি কেউ ব্যাকটিরিয়া দেখেছিল, তা বলে কি ওগুলো ছিল না?

কানু। হয়তো একদিন কেউ ভূতোস্কোপ আবিষ্কার করবে। তখন দেখা যাবে যে আমাদের চারদিকে ভূত কিলবিল করছে।

অমল। যত সব বাজে কথা।

কানু। আমার কিন্তু ভাই গা ছমছম করছিল—এটা বাজে কথা নয়।

জীবেন। আজ যে বডিটা এসেছে দেখেছিস? কালো মুসকো, ষণ্ডা চেহারা, দু'গাল ভরতি কাঁচা-পাকা দাড়ি, প্রকাণ্ড চোখ, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন হাসছে, ওটাকে দেখে আমারও গা ছমছম করছিল। ওটাতে কাদের পার্ট পড়বে কে জানে? মনে হয় ওর গায়ে ছুরি বসালে ও লাফিয়ে উঠে কামড়ে দেবে—বাবা কি চেহারা!

অমল। আমিও দেখেছি, আমার কিন্তু ভয় করেনি। মড়া মড়া, তাকে আবার ভয় কি?

জীবেন। রাত বারোটার সময় অন্ধকারে একা অ্যানাটমি হলে ঢুকে ওটার কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়ে আসতে পার?

অমল। অনায়াসে পারি।

জীবেন। কক্‌খনো পারবে না।

অমল। নিশ্চয় পারব—

জীবেন। আমি বাজি রাখতে পারি পারবে না। দিনের আলোয় বসে ওরকম লম্বাই চওড়াই সবাই করতে পারে।

অমল। বেশ, রাখ বাজি, কত দেবে?

জীবেন। দশ টাকা।

অমল। বেশ।

জীবেন। আজ রাত্রি বারোটার পর আমরা তোমাকে মেস থেকে বার করে দেব।

মুন্না ডোমকে দুটো টাকা দিলেই সে 'অ্যানাটমি হল' খুলে দেবে। তাকে বলে রাখব আমি। আমাকে সে খুব খাতির করে। তুমি কিন্তু কোন আলো বা টর্চ নিয়ে যেতে পারবে না। অন্ধকারে হলের ভিতর ঢুকতে হবে। টেবিলটা কোথায় আছে তা আন্দাজ করে নিতে পারবে আশা করি। প্রোসেকটারের ঘরের সামনেই। রাজি তো?

অমল। রাজি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জীবেনের মেসে থাকা হল না। তার বোনের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ এল, রাত্রে সেখানে খাবার জন্য। ঠিক হল রাত্রি বারোটার পর কানুই অমলের সঙ্গে যাবে। কানু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে আর অমল ঢুকবে 'অ্যানাটমি হলে'।

ঘড়িতে 'এলার্ম' দিয়ে শুয়েছিল তারা বারোটার সময়। এলার্ম বাজতেই উঠে পড়ল দুজনে। অমল সিঁদূর আর তেল আগেই গুলে রেখেছিল একটা শিশিতে। সেইটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

কানু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। অমল চলে গেল অ্যানাটমি হলের দিকে। গিয়ে দেখল 'অ্যানাটমি হলে' ঢোকবার কপাটটা খোলা রয়েছে। জীবেন আগেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছিল। প্রথমে ঢুকেই কিছু দেখতে পেল না সে। সব অন্ধকার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। খুট খুট করে শব্দ হল। ভাবলে ইঁদুর সম্ভবতঃ। অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হওয়ার পর টেবিলগুলো আবছাভাবে চোখে পড়তে লাগল। প্রোসেকটারের ঘরের সামনের টেবিলটাও চোখে পড়ল তার। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ডান হাতের তর্জনী আঙুলটায় সিঁদুর মাখিয়ে মড়ার কপালে যেই সেটা লাগাতে যাবে অমনি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড হয়ে গেল একটা। মড়াটা তাকে জাপটে ধরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চীৎকারও শোনা গেল ভিন্ন কণ্ঠে।

ছুটে গেল কানু আর মুন্না ডোম।

গিয়ে দেখল, অমল অজ্ঞান হয়ে আছে আর জীবেন রক্তে ভাসছে। মড়াটাকে টেবিল থেকে নামিয়ে দিয়ে জীবেনই শুয়েছিল টেবিলের উপর মুন্নার সঙ্গে সড় করে। আর অমলও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল একটা ছুরি।

মুখে জলের ঝাপটা দিতেই অমলের জ্ঞান ফিরে এল। জীবেনকে 'ইমারজেন্সি রুমে' নিয়ে যাওয়া হল। কানু তার কাছে রইল।

অমল যখন নিজের ঘরে ফিরল তখন দুটো বেজে গেছে। ঘরে ঢুকেই আবার চীৎকার করে উঠল অমল। সেই কালো ষণ্ডা মড়াটা তার বিছানার উপর বসে আছে। প্রকাণ্ড চোখ, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। ভূত!

ভূত ধীরভাবে বলল—"তোমাদের খেলা তো শেষ হল, এইবার আমার একটা

ব্যবস্থা কর। আমাকে নীচে মেঝের উপর শুইয়ে রেখেছে। আমার বড় শীত করছে—"

অমল কিন্তু তার কথাগুলো শুনতে পেল না, কারণ সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ঠাকুমার বৈঠকে

ছুটির সময় একপাল ছেলে-মেয়ে জুটেছিল বাড়িতে। কেউ স্কুলে পড়ে, কেউ কলেজে। তর্কে গানে গল্পে বাড়ি একেবারে মশগুল। সেদিন হঠাৎ রাজা-রানীর বিষয়ে তর্ক উঠে পড়ল ঠাকুমার বৈঠকে।

ষোল বছরের ফনতি সবে কলেজে ঢুকেছে।

সে বেণী দুলিয়ে মন্তব্য করল—"যাই বল তোমরা, কুইন ভিক্টোরিয়ার মতো রানী কখনও হয়নি, আর হবেও না।"

ফনতির সমবয়সী শান্তা ঠোঁট উলটে বলল—"বাজে কথা বলিস নি। রানীর মতো রানী ছিল এলিজাবেথ, যাকে স্প্যানিশ আর্মাডা সামলাতে হয়েছিল। ঘরে বাইরে ক্রমাগত যুদ্ধ করে নিজের মাথা উঁচু করে রেখেছিল যে, তার সঙ্গে কোন রাজারই তুলনা হয় না তো কুইন ভিক্টোরিয়া,—"

জগু প্রতিবাদ করল এইবার।

"থাম থাম। ওঁরা সব নামেই রানী। ওঁদের প্রত্যেকের পিছনে জাঁদরেল জাঁদরেল পুরুষ মন্ত্রী ছিলেন। রাজা ছিলেন আলফ্রেড্ দি গ্রেট, উইলিয়ম দি কঙ্কারার, রিচার্ড দি লায়ন-হার্টেড্। নাম করতে হলে এদের নাম করা উচিত—"

বিলু বললে—"ফ্রান্সের লুই, রাশিয়ার আইভান এরাও কম কি—"

ফনতি হটবার পাত্রী নয়।

সে বলল—"তোমাদের গলায় জোর আছে চেঁচিয়ে যাও, কিন্তু এটা ঠিক জেনে রেখ পৃথিবীর সব রাজা-রানীর সেরা হচ্ছে কুইন ভিক্টোরিয়া।"

বিমল তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে এক লাইন গানই গেয়ে দিলে, "রাজা-রানীর সেরা সে যে ভিক্টোরিয়া রানী। আচ্ছা, মেনে নিলাম। ভাল করে চা কর দিকি—"

"আমি একলা পারব না এত কাপ চা করতে। শান্তা তুইও চল—"

ফনতি আর শান্তা চলে গেল।

জীবু এতক্ষণ কিছু বলেনি। বিলুর দিকে চেয়ে এইবার সে বলল—"তুমি ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনি, স্টালিন এদের রাজা বলবে না?"

বিলু বলল—"না। ওরা জাতে আলাদা। জবা ফুল যত ভালো আর যত বড়ই হোক তাকে গোলাপ ফুল কিছুতেই বলা চলবে না—"

বিলু বি. এ. পড়ে। তার ভাব ভঙ্গি একটু ভারিক্কি গোছের।

"ওদের কি বলবে তাহলে ?"

"ইংরেজীতে ডিক্‌টেটার বলে। বাংলায় ডাকাতের সর্দার বললে খুব অন্যায় হবে না।"

বারো বছরের মিনি বলে উঠল—"আমার ইতিহাসে কিন্তু যে সব রাজাদের নাম আছে তার তো একটাও বলছ না মেজদা। রামেশিস ইখ্‌নাটোন, হাম্মুরাবি, সীজার, নীরো—"

"এসব তোদের পড়াচ্চে না কি আজকাল—"

"আমাদের বিশ্বের ইতিহাস পড়তে হয় যে—"

"ও বাবা, তাতো জানতাম না!"

মিনির দাদা রমু বললে—"আমাদের দেশের রাজাদের নামও তো করলে না তোমরা। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে, দেবপাল, ধর্মপাল, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত কত ভালো ভালো রাজা হয়েছে আমাদের দেশে—"

বিলু ধমকে উঠল।

"থাম থাম ডেঁপো কোথাকার। হিস্ট্রিতে লেটার পেয়ে ভেবেছিস খুব একটা দিগগজ হয়েছিস, না ? ভারতবর্ষের ওসব রাজারা হচ্ছে রূপকথার রাজা—"

রমু ভালো ছেলে, স্কলারশিপ পেয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকেছে, বিলু তা পারে নি, তাই রমুর উপর বিলুর হিংসে আছে একটু।

রমু কিছু না বলে চুপ করে গেল। দাদার মুখের উপর উত্তর দেওয়া যে অনুচিত, এ জ্ঞান তার আছে।

বিমল কিন্তু রমুর হ'য়ে জবাব দিল—"রমু ঠিকই বলেছে। আমাদের দেশের রাজারাই আদর্শ রাজা। রূপকথার রাজা মানে ? অশোক, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল এরা সব রূপকথার রাজা ?"

বিলু মুখ বেঁকিয়ে মুচকি হেসে বললে—"প্রায় তাই—"

দীপ্তি বিমলের দিকে চেয়ে হাসল একটু। বিলুর ছোট মাসী সে। বি. এ. পড়ছে।

"বিলুকে বেশী ঘাঁটিও না। ও মস্ত লায়েক হয়েছে। এখুনি হয়তো বলে বসবে সুরেন বাঁড়ুয্যে, চিত্তরঞ্জন, গান্ধি, নেহেরু এরাও সব রূপকথা—"

বিলু কলেজে পড়ে বটে, কিন্তু এখনও বেশ ছেলেমানুষ আছে!

সে নাকে কেঁদে ঠাকুমার দিকে চেয়ে বলল—"দেখ না ঠাকুমা, ছোট মাসী রাগাচ্ছে আমাকে—"

ঠাকুমা আপিং খেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন বসে। কিন্তু এদের কথা শুনছিলেন সব।

বললেন—"তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না। আসল রাজাদের তো নামই করলে না কেউ—"

"আসল রাজা মানে ?"

"যারা পৃথিবীতে প্রথম রাজা হয়েছিল।"

ঠাকুমার দিকে অবাক হয়ে চাইল সবাই। ঠাকুমা আবার কি বলে!

ঠাকুমা সেকেলে লোক হলেও মূর্খ নন। সে যুগেও বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। তা ছাড়া এই সেদিন পর্যন্ত কাগজে কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর কথা তুচ্ছ করবার মতো নয়। ঠাকুমা কি বলেন তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল সবাই। ঠাকুমা কিন্তু কিছু বললেন না, নিমীলিতনয়নে হাসিমুখে বসে রইলেন।

"কোন রাজাদের কথা তুমি বলছ ঠাকুমা ?"

"পৃথিবীর প্রথম রাজাদের কথা।"

"কোন বইয়ে আছে তাদের খবর ?'

"কোন বইয়ে নেই।"

আর একটু হাসলেন ঠাকুমা।

"কোথায় আছে তাহলে—?"

"তারা আমার ভঁাড়ার ঘরে আছে !"

ঠাকুমা বলে কি ! হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

"তোমার ভঁাড়ার ঘরে !"

ঠাকুমা হাসিমুখে বললেন—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ভাঁড়ার ঘরে। তোমরাও চেন তাদের, কিন্তু জান না। তোমরা কেতাবী কথা মুখস্থ করতেই ব্যস্ত।"

ফনতি আর শান্তা ফিরে এল।

ফনতি বললে—"দুধ কেটে গেছে, চা হল না। কারু এসে দুধ দুইবে তারপর চা হবে।"

"আচ্ছা, তাই হবে না হয়। তোরা বস, ঠাকুমা মজার কথা বলেছেন একটা। পৃথিবীর প্রথম রাজারা না কি ওঁর ভঁাড়ার ঘরে বন্দী হয়ে আছেন—"

শান্তা ঠোঁট টিপে হাসল একটু।

ফনতি গিয়ে ঠাকুমার পাশে বসে তাঁর গলা জড়িয়ে বললে—"কতটা আপিং আজ খেয়েছ ঠাকুমা ?"

"সরে বস্ মুখপুড়ী। গায়ে আমানির মতো গন্ধ ছাড়ছে। কি যে সব ছাইপাঁশ মাখিস তোরা আজকাল—"

ফনতি হেসে বললে—"কাল তোমাকেও মাখিয়ে দেব। তোমার টুকটুকে রং আরও টুকটুকে হয়ে যাবে।"

বিমল ধমকে উঠলো।

"ঠাকুমাকে গল্পটা বলতে দে না। এই ফনতি সরে বস ওখান থেকে—"

ঠাকুমা ফনতিকে বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন—"থাক না, বেশ তো বসে আছে। তোর যদি হিংসে হয় তুইও না হয় এপাশে এসে বস—"

"আমি এখানেই বেশ আছি। পৃথিবীর প্রথম রাজাদের গল্পটা বল শুনি। সব চেয়ে প্রথম রাজা কে?"

ঠাকুমা মুচকি হেসে বললেন—"বেগুন—"

"বেগুন!"

হাসির ধুম পড়ে গেল আবার।

হাসি থামলে ঠাকুমা বললেন—"গোড়া থেকে শোন তবে। পৃথিবী এককালে ঘোর অন্ধকার ছিল। লক্ষ লক্ষ বছর অন্ধকারে কেটেছে। তারপর সেই অন্ধকার ক্রমশঃ বেগুনী হয়ে গেল। সব বেগুনী। আকাশ বাতাস গাছপালা সব বেগুনী। তখন জন্তু-জানোয়ার মানুষ-টানুষ কিছু জন্মায় নি। চারিদিকে জল আর গাছ-পালা। সেই যুগে একটি ছোট গাছে একটি ফল ফলল, তার রংও বেগুনী। সে-ই রাজা হল। সে-ই হচ্ছে বেগুন। প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে লাগল বেগুন। হুকুম জারি করে দিলে, যার রং বেগুনী নয় সে রাজসরকারে কোন চাকরি পাবে না। হাজার হাজার বচ্ছর এই আইন চলল। কিন্তু এরকম অত্যাচার বেশী দিন চলতে পারে না। বেগুনী রংকে আক্রমণ করল ঘন-নীল রং। অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলল। যুদ্ধে ঘন-নীল জিতল। বেগুনী রংকে দূর করে দিয়ে ঘন-নীলের রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। ঘন-নীলের রাজত্বকালে রাজা হয়নি, রানী হয়েছিল। তার নাম অপরাজিতা। ভাঁড়ার ঘরের মা-কালীকে যে অপরাজিতা দিয়ে পুজো করি রোজ, সেই অপরাজিতা। ছোট্ট ওইটুকু ফুল তো, কিন্তু কি যে প্রতাপ ছিল তার সেকালে। সমস্ত পৃথিবী ঘন-নীল করে দিয়েছিল। কিন্তু কোন কিছুই চিরকাল থাকে না, ঘন নীলের রাজত্বও রইল না। নীল এসে হারিয়ে দিলে তাকে। নীলেদের সঙ্গে আপোষ করে অপরাজিতা একটু ফিকে হয়ে গেল। কিছুদিন রানীও রইল সে।

কিন্তু নীল আকাশই রাজা হল শেষ পর্যন্ত। আকাশের সঙ্গে কি ওইটুকু ফুল পারে? কিন্তু নীলের রাজত্বও বেশী দিন থাকেনি। আগেই বলেছি পৃথিবীতে তখন গাছ-পালাই বেশী। গাছ-পালাদের সবুজ রং জোট পাকিয়ে বিদ্রোহ করলে নীলের বিরুদ্ধে, তারাই জিতল শেষকালে। তারাই প্রথমে শাসন-পরিষদ্ তৈরি করে—যাকে তোমরা এখন পার্লামেণ্ট বল। সবুজ শাসন-পরিষদ। পালংশাক থেকে আরম্ভ করে বটগাছ পর্যন্ত সব রকম সবুজ-পাতাওলা গাছ থাকত সে সবুজ-পরিষদে। ভোট নিয়ে ঠিক হত কে প্রধান-মন্ত্রী হবে। যে পালং শাকের চচ্চড়ি তোমরা রোজ খাও, সে-ই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল একবার। অনেকদিন রাজত্ব করেছিল এরা। কিন্তু একটা জিনিস প্রথমে এদের মাথায় ঢোকেনি, সবুজ চিরকাল সবুজ থাকে না, একটু বুড়ো হলেই হলদে হয়ে যায়। তখন ঠিক হল যে-সব সবুজ প্রবীণ হয়ে হলদে হয়ে গেছে তারা রাজত্ব করুক। পাকা কলা, পাকা লেবু, পাকা আম, পাকা পেয়ারা অনেক রকম হলদে পাকা পাতা এরা তখন শাসন-পরিষদে জাঁকিয়ে বসল এসে। কমলা-লেবুরা বললে, আমরা হলদে হইনি বটে,

কিন্তু আমরাই বা কম কিসে। আমরাও তো পাকা, আমরাও রসে ভরপুর, আমাদের বাদ দেবে কেন ?

মহা আন্দোলন শুরু করলে তারা। শেষ পর্যন্ত জিতেও গেল। কমলা রংই সিংহাসন দখল করে রইল কিছুদিন। কিন্তু সব ফল পাকলে হলদে বা কমলা রং হয় না। লালও হয় অনেকে। তারা বললে—বারে, আমরা বাদ পড়ব কেন তাহলে ? লঙ্কা আর তেলা-কুচো ফল দল পাকাতে লাগল। রাঙাজবা, রঙ্গন, পলাশ, এরাও সব দলে ভিড়ে গেল। শেষে ভোটেও জিতল তারা। তারাও রাজত্ব করল কিছুদিন। দুনিয়া লালে লাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন অন্য রঙেরা ক্ষেপে উঠল আবার। মহা হট্টগোল বাধল একটা। তাদের হট্টগোলে দেবতারা চটে গেলেন। পাঠিয়ে দিলেন তোদের ঠাকুরদাকে—"

"ঠাকুরদাকে"—সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তিনি এসে গপাগপ করে রংগুলোকে গিলে ফেললেন। আপদের শান্তি হল। কিন্তু তিনি নিজে বিপদে পড়ে গেলেন। অতগুলো রংকে হজম করা কি সহজ কথা। তিনি ছিলেন লম্বা, পট্ করে গোল হয়ে গেলেন। আর গা থেকে তেজ আর আলোর ছটা বেরুতে লাগল। তারপর বনবন করে ঘুরতে লাগলেন। আজও ঘুরছেন। দিবারাত্রি ঘুরছেন। এই চলছে এখন।"

ঠাকুমা চুপ করলেন। ঠাকুরদার কথা উঠে পড়াতে বাকি সকলেও চুপ করে রইল। বছর দুই আগে ঠাকুরদা মারা গেছেন। ঠাকুরদার সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলেন ঠাকুমা। যা বলেন সব সত্যি বলে মেনে নিতে হয়। যৌবনে ঠাকুরদা না কি গোটা কাঁঠাল, গোটা পাঁঠা খেতে পারতেন। দশ বিশ ক্রোশ পায়ে হেঁটেই চলে যেতেন। কাকে যেন এক থাপ্পোড় মেরেছিলেন, তিন দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে। শহর থেকে সায়েব ডাক্তার এনে তবে না কি তার জ্ঞান-ফেরানো হয়।

এ ঠাকুরদাকে অবশ্য নাতি-নাতনীরা দেখেনি। তারা দেখেছিল পুরু-লেন্সের-চশমা পরা রোগা লম্বা এক বৃদ্ধকে। দিনরাত গীতা খুলে বসে থাকতেন। তবে খেতে পারতেন। রোজ ক্ষীর খেতেন একটি বাটি। ঠাকুরদার সম্বন্ধে ঠাকুমা অনেক আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলেন আর সে-সব বিশ্বাস না করলে মনে মনে দুঃখও পান। সবাই ভাবলে সেই রকমই বানানো গল্প এটা। আপিঙের ঝোঁকে আরও অদ্ভুত করে ফেলেছেন।

জিতেন এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, একটি কথাও বলেনি। সে আই. এস. সি. পড়ে। সে হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে উঠল—"বুঝেছি, বুঝেছি, তোমার গল্প বুঝেছি ঠাকুমা। ঠাকুরদার নাম ছিল দিবাকর, দিবাকর মানে সূর্য আর সূর্যের আলোয় সাতটা রং আছে, ভিব্‌জিওর। এইটেই গল্প করে বললে তুমি, না ? স্বামীর নাম করতে নেই বলে সূর্যের নাম করনি, নয় ?"

ঠাকুমা হাসিমুখে চুপ করে রইলেন।

তারপর জিগ্যেস করলেন, "কি বই পড়িস তোরা আজকাল? আমরা গ্যানো পড়েছিলাম।"

ফনতি হঠাৎ ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর গালে চুমু খেলে।

"সর আর জ্বালাস নি তুই। ধুমসি কোথাকার—"

বিমল বলে উঠল—"বোলো ভাই ঠাকুমা মহারানী কী জয়—"

সবাই সমস্বরে বলল—"জয়—"

রবীন্দ্রনাথের গল্প

একবার গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলাম। খুব গরম সেদিন। তিনি আমার ঘর্মাক্ত কলেবর দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"খুব গরম লাগছে বুঝি? পাখার কাছে একটু সরে বস।"

তারপর একটু হেসে বললেন, "এখন এখানে ইলেকট্রিসিটি হয়েছে, আগে তো কিছুই ছিল না। ঘোর গ্রীষ্মে তখন কতদিন কাটিয়েছি এখানে—"

বললাম, "কষ্ট হত নিশ্চয় খুব—"

হেসে উত্তর দিলেন, "না, খুব কষ্ট হত না। গরম নিবারণের একটা খুব ভাল ওষুধ জানা আছে আমার।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

বললেন, "কবিতা লেখা। বেলা বারোটার সময় একটা কবিতা লিখতে শুরু করলে সমস্ত দুপুরটা যে কোন দিক দিয়ে কেটে যায় জানতেও পারি না। হঠাৎ দেখি বিকেল হয়ে গেছে।"

কুঁজোর জল

আর একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে দেখি তিনি টেবিলের উপর খুব ঝুঁকে পড়ে লিখছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, বস। তাঁর ওই ঝুঁকে পড়া দেহটার দিকে চেয়ে আমার মনে হল নিশ্চয়ই ওঁর ওভাবে লিখতে কষ্ট হচ্ছে।

বললাম, আজকাল তো নানারকম টেবিল নানারকম ডেস্ক বেরিয়েছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেও আরামে লেখা যায়।

তিনি উত্তর দিলেন, সে সব আমার আছে, তবু কিন্তু এই টেবিলে বসে এমনি করে লিখতে হয়। কুঁজোয় জল কমে গেছে যে, উপুড় না করলে কিছু বেরোয় না!

ভোরের স্বপ্ন

খোকন এখন অনেক বড় হয়েছে কিন্তু এখনও সে সেই স্বপ্নটা দেখে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নয়, জেগে জেগেই। তখন স্কুলে পড়ত। সেটা ঠিক সরস্বতী পূজোর আগের দিন। স্কুলে খুব ধুমধাম করে পূজো হবে। মাস্টারমশাই বলেছেন কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনা হবে, তিনি বায়না দিয়ে এসেছেন। পূজোর ঠিক আগের রাত্রে তিনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবেন প্রতিমা। বিকেল বেলাই দেবদারু-পাতা আর রঙীন-কাগজের শিকল দিয়ে স্কুল সাজানো হয়ে গেছে। কালু, রমু, বিনয় আর পরেশের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, তারা খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতেই ডাকতে আসবে খোকনকে। সবাই মিলে মাঠে যাবে যবের শীষ, আমের মুকুল আর কুল সংগ্রহ করতে। খোকন বাইরের ঘরে শুয়েছে সেজন্য, যাতে তারা ডাকলেই শুনতে পায়।

…ভোর বেলা স্বপ্নটা দেখল।

খোকন একাই যেন চলেছে মাঠের দিকে। পকেটে আছে বাঁশের ছোট বাঁশিটা, আর গোটা দুই চকোলেট। খোকন তখনই বাঁশি বাজাতে শিখেছিল। যাঁর কাছে শিখত তিনি বলেছিলেন, তুমি যদি মন দিয়ে বাজাও তাহলে বেশ বড় বাজিয়ে হতে পারবে। বাবা বলেছিলেন, ক্লাসে যদি ফার্স্ট হতে পার ভাল বাঁশি কিনে দেব। তাই খোকন যখনই বেড়াতে বেরোয় বাঁশিটি সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। শহরের বাইরে যে মাঠটা আছে সেটার ওপারে আছে একটা বাগানের মতো। ঠিক সাজানো গোছানো বাগান নয়। এলোমেলো নানা-রকম গাছ আছে সেখানে, অনেক গাছের নামও জানে না সে। আম, জাম, আতা, শিমুল, আকন্দ, কাপাস, ঘেঁটু, বাবলা এলোমেলো ভাবে হয়েছে সেখানে। এক ধারে একটা বাঁশ ঝাড়ও আছে। তারপর আবার মাঠ। যব, গম, সর্ষের ক্ষেত। জায়গাটি খুব পছন্দ খোকনের। বেশ নির্জন। এইখানে এসে অনেক সময় সে বাঁশি বাজায় বসে।

সেই বাগানের দিকেই চলেছে খোকন। সঙ্গে টর্চও নিয়েছে। অন্ধকার তখনও কাটেনি ভাল করে। তার ভয় করছে না। খুব ভাল লাগছে।…চলেছে তো চলেইছে। পথ যেন ফুরোয় না। মনে হচ্ছে অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা যেন সুর বাজছে। সুর, না নূপুরের আওয়াজ, না ঝিঁঝির ডাক? টর্চের আলো ফেলে ফেলে চলতে লাগল। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। চলতে লাগল সে। তার কেবলি মনে হতে লাগল কিছু একটা হবে এইবার। কি হবে তা কিন্তু বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ পরে মাঠে এসে পড়ল। চেনা মাঠ কিন্তু মনে হতে লাগল অচেনা। দিনের বেলা কত ছোট কিন্তু অন্ধকারে মনে হচ্ছে অফুরন্ত। তারপর হঠাৎ সে দেখতে পেলে কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল খোকন। তারপর টর্চের আলো ফেলে দেখলে। আশ্চর্য হয়ে গেল, ফুটফুটে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি। এ রকম সময়ে কোন্ মেয়ে একা মাঠে আসবে! দিনের বেলাতেও কোনও মেয়েকে সে মাঠে দেখেনি। আরও আশ্চর্য

হল মেয়েটি যখন আর একটু এগিয়ে এসে তার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সুন্দর মুখখানি। ধপধপে ফরসা রং, টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটি, একমাথা কালো চুল, পিছনে বেণী দুলছে। চমৎকার কোটও গায়ে দিয়েছে একটি। খোকনের মনে হল মখমলের, সাদা মখমল। তার উপর ফিকে নীল রেশমের কাজ করা। অদ্ভুত মানিয়েছে। সমস্তটাই যেন অদ্ভুত মনে হল খোকনের। গায়ে-পড়ে আলাপ করা তার স্বভাব নয়। মেয়েটির দিকে এক নজর চেয়ে তাই এগিয়ে গেল সে। তারপর আলো ফুটতে লাগল ধীরে ধীরে। অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। খোকন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মেয়েটি তার পিছু পিছু আসছে। চোখাচোখি হতেই আবার মুচকি হাসল একটু। তারপর এক ছুটে চলে এল তার কাছে।

"তুমি বুঝি খোকন?"

"হ্যাঁ। আমার নাম জানলে কি করে তুমি!"

মেয়েটি হেসে মাথা নেড়ে বললে, "অনেকদিন থেকে জানি!" খোকন তো একে দেখেই নি কখনও। এই সহরেই থাকে না কি! কোন পাড়ায়?

"তুমি কি এইখানেই থাক?"

ঘাড় কাত করে মেয়েটি জানালে এইখানেই থাকে সে।

"নাম কি তোমার?"

"মণ্টি।"

বলেই সে হাসতে লাগল।

তারপর পাশাপাশি চলতে লাগল দু'জনে।

হঠাৎ মেয়েটি বললে, "তোমার বাঁশি আমি শুনেছি—"

"কোথায় শুনলে!"

এর জবাব না দিয়ে মুচকি হাসলে সে আবার। খোকন লক্ষ্য করল, হাসলে তার গালে টোল পড়ে।

খোকন উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল।

মেয়েটি তার পকেটের দিকে চেয়ে বললে, "বাঁশি এনেছ দেখছি। দেখি বাঁশিটা—"

খোকন বাঁশিটা পকেট থেকে বার করে তার হাতে দিলে। বার করতে গিয়ে একটা চকোলেট পড়ে গেল মাটিতে। খোকন সেটা কুড়িয়ে পকেটে রেখে দিলে।

"ওটা কি?"

"চকোলেট।"

"একটি মাত্র এনেছ না কি?"

"আর একটা আছে।"

মেয়েটি আবার তার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। অদ্ভুত হাসি মেয়েটির। মনে হয় ভিতর থেকে একটা আলোর আভা যেন ছড়িয়ে পড়ছে চোখে মুখে।

"হাসছ কেন ?"

"চকোলেট পকেটে রেখেছ দেখে।"

"কোথায় রাখব তাহলে ?"

"মুখে।"

খোকনও হেসে ফেললে এবার।

"মুখেই রাখতাম। কিন্তু আজ সরস্বতী পুজো। অঞ্জলি না দিয়ে খাব কি করে !—"

"ও, তাই বুঝি ?"

একথা শুনে আবার অবাক হল খোকন। অঞ্জলি না দিয়ে কিছু খেতে নেই তা জানে না এই বুড়ো ধাড়ি মেয়ে। খ্রীষ্টান না কি !

…মাঠের মাঝামঝি এসে পড়েছে তারা তখন। একপাল গরু আর ভেড়াও চরছে দেখা গেল।

হঠাৎ মেয়েটি বললে, "আমি একটা ম্যাজিক জানি। দেখবে ?"

"কি ম্যাজিক ?"

"দেখবে কি না বল না ?"

"দেখাও তো দেখব না কেন ?"

"ভয় পাবে না তো ?"

"আমি ভীতু নই। দেখাও কি দেখাবে !"

মেয়েটি হেসে ঠোঁটের ভঙ্গী করে বললে, "আমি কিন্তু অমনি ম্যাজিক দেখাই না।"

"আমি তো পয়সা সঙ্গে করে আনিনি।"

"একটা চকোলেট পেলেই দেখাব !"

ঘাড় বেঁকিয়ে মেয়েটি তার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। সত্যি কি মিষ্টি হাসি মেয়েটার !

"এখনই চকোলেট খাবে ? অঞ্জলি দেবে না ?"

এর কোন উত্তর না দিয়ে একছুটে এগিয়ে গেল মেয়েটি। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে খোকনের দিকে একবার চেয়ে আবার ছুটতে লাগল ! খোকনের ভয় হল রাগ করে চলে যাচ্ছে না কি !

"শোন, শোন—"

ডাক শুনে দাঁড়াল মেয়েটি, তারপর ফিরে দাঁড়াল। মুখে মুচকি হাসি, চোখে ফুটে উঠেছে যেন একটা গর্ব আর স্পর্ধা। ভাবটা যেন—জানতাম আবার ডাকবে। কি বলছ—?

"ম্যাজিক দেখাবে বললে অথচ চলে যাচ্ছ যে ! এই নাও চকোলেট—"

এগিয়ে গিয়ে দুটো চকোলেটই সে বার করলে পকেট থেকে।

"দুটো চাই না। একটা নেব। আর একটা তোমার জন্যে থাক।"

টপ্ করে একটা চকোলেট সে খোকনের হাত থেকে তুলে নিলে, তারপর আড়চোখে খোকনের দিকে চাইতে চাইতে রাংতার মোড়কটা খুলতে লাগলো।

"কি রকম ম্যাজিক দেখাবে?"

চকোলেটটা মুখে ফেলে দিয়ে মেয়েটি বলল, "এখুনি দেখতে পাবে। তোমার হাতটা দেখি—"

হাত বাড়িয়ে দিলে খোকন।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের আঙুলে ধপধপে সাদা একটা শাঁকের আংটি পরিয়ে দিলে মেয়েটি। তারপর বললে, "ওই দেখ—!" বলেই দে ছুট। দূরে একটু কুয়াসা হয়েছিল। খোকনের মনে হল মেয়েটি সেই কুয়াসার ভিতর মিলিয়ে গেল।

তারপরই ঘটতে লাগল সব অদ্ভুত কাণ্ড।

সামনে যে গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছিল তাদের দিকে চেয়ে খোকন অবাক হয়ে গেল। গরুগুলো নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে শিং-ওলা মানুষ কতকগুলো। পায়ে জুতোর বদলে খুর, হাতেও আঙুলের বদলে খুর। মুখও গরুর মতো, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে, ঠিক মানুষ যেন। মানুষের মতোই কাপড়-জামা পরা, কিন্তু পিছনে কাছার ফাঁক দিয়ে ল্যাজও ঝুলছে। এরা কে! মানুষ-গরু, না গরু-মানুষ। মনে পড়ে গেল সুকুমার রায়ের কবিতাটা। শুধু গরু নয়, যে ক'টা ভেড়া ছিল তারাও মানুষের মতো দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে! আর সবচেয়ে আশ্চর্য, বাঙালীর মতো বাংলা ভাষায় কথা বলছে তারা!

খোকন শুনতে পেলে একটা গরু বলছে, "ওই যে আসছে ডাকাতটা। জুতো মশমশিয়ে আসছে। লজ্জাও নেই। আমাদের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে জুতো বানিয়েছে আর তাই পরে বেড়াচ্ছে। অথচ এর জন্যে এতটুকু লজ্জা নেই ওর। শুধু কি জুতো, আমাদের কি কম নির্যাতন করে ওরা! আমরা ওদের লাঙল টানছি, মাল বইছি। আমরা ওদের দুধ খাওয়াচ্ছি। আমাদের বাছুরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে ওরা। ভণ্ডামি করে আবার গরুকে মা বলা হয়। পাজি ভণ্ড সব!"

ভেড়া বললে, 'শুধু তোমাদের কেন, আমাদের উপর কি ওরা কম অত্যাচার করে? ওর ওই গরম কোটটা দেখ না। আমাদের গা থেকে লোম কেটে নিয়ে তবে না ওই গরম জামা হয়েছে। শুধু কি জামা, কম্বল টম্বল কত কি বানায় ওরা আমাদের লোম লুট করে! আর ওর নধর চেহারাটা কি কেবল দুধ খেয়ে হয়েছে ভেবেছ, মাংস খায় না? আমাদের কেটে খায়। কেটে কেটে আমাদের তো শেষ করে এনেছে। ওরা আবার নিজেদের সভ্য বলে। ওরা খুনে, ওরা পাষণ্ড—"

হঠাৎ চারিদিক থেকে রব উঠল—"ওরা আমাদের খায়। আমাদের ডাল, পাতা, ফল, শিকড় কিছু বাদ দেয় না। আমাদের কেটে কুচিয়ে পুড়িয়ে সিদ্ধ করে ভেজে ধ্বংস করে রোজ। কি যন্ত্রণা যে দেয় তা আর কহতব্য নয়।"

খোকন দেখলে মাঠের গাছেরা চীৎকার করছে। বাগানের আমগাছ, জামগাছ, মাঠের গম যবের চারা, তার পাশে সবজী-ক্ষেতের শাক-সব্জিরা সবাই যোগ দিয়েছে সে চীৎকারে।

পাশে যে পুকুরটা ছিল তার থেকে মাছেরাও লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে বলতে লাগল—"আমাদেরও বাদ দেওয়া হয় না। আমরা জলের তলায় থাকি তবু আমাদের নিস্তার নেই। রোজ লক্ষ লক্ষ ছিপ আর লক্ষ লক্ষ জাল পড়ছে আমাদের জন্যে। ওরা সর্বভুক্, ওরা রাক্ষস—"

আকাশ থেকেও শব্দ আসতে লাগল।

"আমরাও ভয়ে ভয়ে আছি। ওরা আমাদের এলাকাতেও হানা দিয়েছে এবার।"

খোকন দিশাহারা হয়ে পড়ল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, মেয়েটিকে দেখতে পেল না কোথাও। ছুটে এগিয়ে গেল খানিকটা। সামনেই সারি সারি কয়েকটা কার্পাস গাছ।

শুনতে পেল তারা বলছে—"আমাদের তুলা চুরি করে কেমন কাপড় পরেছে দেখ না—"

কি করবে ভেবে পেল না খোকন। আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর ভরে উঠল তার। শীতেও কান দুটো গরম হয়ে উঠল। তার কেবলি মনে হতে লাগল, সত্যিই কি আমি চোর, ডাকাত, খুনে, রাক্ষস ? কিন্তু ওরা যা বলছে তাও তো মিছে কথা নয়!

শুনতে পেল বাঁশগাছের ঝাড় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে, "আমাদের কেটে চিরে টুকরো টুকরো করে ঘর-বাড়ী তৈরী করে ওরা, আসবাব তৈরী করে। ওই যে ওর পকেটে বাঁশিটা রয়েছে সেটা আমাদেরই কাউকে কেটে করেছে। আর শুধু কি কেটে ? কেটে, শুকিয়ে, চেঁচে, গরম লোহার শিক পুড়িয়ে ছাঁদা করে তবে হয়েছে ওই বাঁশী—! ভয়ানক নিষ্ঠুর ওরা।"

খোকন আংটিটা খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে সব যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। দেখতে পেল সেই মেয়েটাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার দিকে চেয়ে হাসছে।

খোকন অবাক তো হয়েই ছিল এবার ভয়ও পেল একটু। যদিও একটু আগেই সে বলেছিল ভয় পাবে না। কে এই মেয়েটি ? কোন মায়াবিনী ডাইনী টাইনী নয় তো ? কোথা থেকে এল! এর আগে তো কখনও দেখিনি একে।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এস না এদিকে—"

মেয়েটি মুচকি হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকলে খোকনকে।

খোকন দাঁড়িয়ে রইল, যাবে কি না ভাবতে লাগল। এক-একবার এ-ও মনে হতে লাগল বাড়ী ফিরে যাবে কিনা। কিন্তু তখনই মনে পড়ল যবের শীষ, আমের মুকুল সংগ্রহ করা হয়নি। অঞ্জলি দেবার সময় ওগুলো চাই।

কালু. রমেশ, বিমুরা আসবে বলেছিল কিন্তু কেউ তো এল না। কোথা থেকে এই অদ্ভুত মেয়েটা জুটে গেল।

হঠাৎ খোকন দেখতে পেল মেয়েটাই ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই খোকন বললে—"এই নাও তোমার আংটি—"

মেয়েটি মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, "কেমন ম্যাজিক দেখালুম ?"

"খুব অদ্ভুত সত্যি। কি করে হল বল তো ?"

"তা জানি না। কেমন লাগল তোমার ?"

"খুব খারাপ লাগল। আমি সত্যি ওই রকম ? দু'হাতে কেবল লুট আর খুন করে চলেছি ?"

"পৃথিবীর সমস্ত বীরদের তো ওই পরিচয়। ইতিহাস তো পড়েছ ?"

"পড়েছি। কিন্তু এমনভাবে চোখে আঙুল দিয়ে কেউ আর দেখিয়ে দেয়নি যেমন তোমার আংটি দেখিয়ে দিলে। আচ্ছা, কেমন করে হল বল তো ?"

"বললুম তো জানি না। ও আংটি যে পরে সে-ই ওরকম দেখতে পায়। যে শাঁখ দিয়ে ও তৈরী সে শাঁখের নাম জ্ঞান-শঙ্খ। আমি একজন সাধুর কাছে পেয়েছিলুম ওটা।"

"আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে।"

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে. "তোমাকে কিন্তু একটা কথা বলতে পারি।"

"কি ?"

"নিজেকে তুমি যতটা হীন মনে করছ ততটা হীন তুমি নও। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে অপরকে খানিকটা শোষণ করেই বাঁচতে হয়। গাছেরা মাটির রস শোষণ করে, গরু-ভেড়ারা ঘাস-পাতা ছিঁড়ে খায়। এ না হলে সৃষ্টি রক্ষা হত না। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না তুমি। তোমার আর একটা রূপ আছে। সেটা তোমার চোখে পড়েনি এখনও।"

"কি সেটা ?"

"দেখাচ্ছি। এস না আমার সঙ্গে—"

"কোথায় যাব ?"

"ওই মাঠে।"

খোকন মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলতে লাগল মেয়েটির পিছু পিছু।

মেয়েটি বাগান পেরিয়ে নামল মাঠে। যবের ক্ষেত। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। তার উপর হীরের টুকরোর মতো ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য শিশিরকণা। যবের ক্ষেতের মাঝখানে একটি আমগাছ। থোকো থোকো মুকুল তাতে। গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি চলতে লাগল সেই গাছের দিকে। গাছের তলায় দুটো ঢিবি ছিল। একটা উঁচু আর একটা নীচু। মেয়েটি যবক্ষেতের ভিতর দিয়ে গিয়ে সেই উঁচু ঢিবিটিতে উঠে বসল।

"তুমি এইটেতে বস।"

খোকন বসল নীচু ঢিপিতে।

"এইবার আংটিটি পরে চোখ বুজে বাঁশি বাজাও দিকি। বেশ মজার জিনিস দেখতে পাবে একটা। চোখ খুলো না কিন্তু"—

খোকন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। আপত্তি করবার মতো মনের জোর ছিল না তার আর। সে চোখ বুঁজে বাঁশিতে ফুঁ দিলে। কিছুদিন থেকে সে আশাবরীর গৎ সাধছিলো একটা, সেইটেই বাজাতে লাগল। বাজাতে শুরু করেই আশ্চর্য হয়ে গেল সে। বাঃ, সুন্দর বাজছে তো। এমনভাবে তার বাঁশি তো আর কোনদিন বাজেনি। মনে হল সুরের ঝরণা যেন নেমে আসছে তার বাঁশি থেকে। তন্ময় হয়ে বাজাতে লাগল খোকন। আশাবরীতে ডুবে গেল সে যেন।

…ক্রমশঃ তার নিমীলিত দৃষ্টির সামনে মূর্ত হতে লাগল এক নূতন জগৎ। সে জগতে অন্ধকার নেই, প্রখর আলোও নেই। এক আবছা মৃদু নীলাভ আলোয় ঢাকা সমস্ত আকাশ। অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্রও দেখা যাচ্ছে। এমন নীল আকাশ আর এত উজ্জ্বল নক্ষত্র খোকন আর কখনও দেখেনি। তার মনে হল নক্ষত্রগুলো যেন কাঁপছে; তারা যেন জীবন্ত, বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে কি যেন বলতে চাইছে আলোর ভাষায়, কিন্তু খোকন বুঝতে পারছে না. সে কেবল দেখছে নক্ষত্রগুলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে ক্রমশঃ। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে তাদের দিকে। তাদের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

তারপর হঠাৎ সে সচেতন হল, তার চারপাশেও ভিড় জমে গেছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন এসে দাঁড়িয়েছে। যে গরু আর ভেড়ারা একটু আগে তাকে গাল দিচ্ছিল সবাই হাত-জোড় করে দাঁড়িয়েছে তারা।

বলছে, "এতক্ষণ আমরা ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে। তুমি সুরের সাধক, তাই তুমি এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্‌। তোমার এই সুর শুধু বাঁশিতেই বাজছে না, বাজছে তোমার ধর্মে, তোমার বিজ্ঞানে, তোমার সভ্যতায়, তোমার সংস্কৃতিতে। তোমার এই বিরাট সৃষ্টির জয়যাত্রায় আমাদেরও ডেকেছ তুমি সহায়তা করবার জন্য, এতেই আমরা কৃতার্থ, আমরা ধন্য।"

গাছপালা মাটি আকাশ সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "আমরা কৃতার্থ, আমরা ধন্য।"

খোকন তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজিয়েই চলেছে।

এরপর যা ঘটল তা আরও অদ্ভুত। খোকনের বাঁশির সুর ছাপিয়ে আর একটা সুর বাজতে লাগল। সুন্দর গম্ভীর মিষ্টি সুর একটা। সে সুরের ঝংকারে আকুল হয়ে উঠতে লাগল চতুর্দিক। সেই আবছা মৃদু নীলাভ আলো স্বচ্ছ হতে লাগল ক্রমশঃ। এর ঠিক পরেই একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেলে খোকন চক্রবাল-রেখায়। যেখান থেকে রোজ সূর্য ওঠে সেইখানে সোনার মতো চকচকে কি যেন একটা উঠেছে, রঙটা সূর্যেরই

মতো, কিন্তু গোল নয় তিন-কোণা। সূর্য তিন-কোণা হয়ে গেল কি করে? ক্রমশঃ উপরে উঠতে লাগল সেটা। তখন খোকন দেখে অবাক হয়ে গেল ওটা সূর্য নয়, মণি-মাণিক্য-খচিত সোনার মুকুট। তারপর মুকুটের নীচে কপাল দেখা গেল, তারপর চোখ আর ভুরু। জীবন্ত চোখ, কি দৃষ্টি সে চোখের! সমস্ত মুখটা উঠল তারপর। আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল সুরের ঝংকার, মনে হতে লাগল লক্ষ লক্ষ ভ্রমর গুঞ্জন করছে যেন। মুখের পর ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরটা দেখা গেল। খোকন সবিস্ময়ে দেখলে—এ কি! এ যে সরস্বতীর জীবন্ত প্রতিমা, সদ্য-ফোটা শতদলের উপরে বসে আছেন, পায়ের কাছে জীবন্ত হাঁস, বীণা বাজাচ্ছেন বীণাপাণি। সোনালী আলোর ছোঁয়া লেগে স্বচ্ছ হয়ে গেছে আবছা নীলাভ আলো। খোকন অবাক হয়ে দেখতে লাগল—সরস্বতীর মুখ ওই মেয়েটির মতো।

খোকনের বাঁশি থেমে গেল। চোখ খুলে চেয়ে দেখলে উঁচু ঢিবির উপর মেয়েটি বসে আছে। খোকনের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে যবের শীষ, মাথার উপর দুলছে আমের মুকুল। আমের মুকুল ঝরে ঝরেও পড়ছে তার পায়ে।

"বাঁশি থামালে কেন, চোখই বা খুললে কেন?"

এসব কথার জবাব না দিয়ে খোকন জিগ্যেস করলে, "তুমিই কি সরস্বতী?"

"দ্যুৎ। আমি তো মন্টি।"

"কিন্তু তোমাকে ঠিক সরস্বতীর মতো দেখাচ্ছে। তোমার পায়ের কাছে যবের শীষ আর আমের মুকুল। মনে হচ্ছে যেন সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দেওয়া হয়েছে—"

"অঞ্জলি দেওয়া যখন হয়েই গেছে তখন চকোলেটটা খেয়ে ফেল এইবার।"

ঠিক এই সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল খোকনের। দেখলে অনেক বেলা হয়ে গেছে। তাকে তো ডাকতে আসেনি ওরা। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল বিছানা থেকে। জামা গায়ে দিল। জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখলে দুটো চকোলেটই আছে। তারপর মুখ ধুয়ে ছুটল স্কুলে। রাত্রের ট্রেনে মাস্টারমশাই কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়। এতক্ষণ প্রতিমা বোধ হয় বসানো হয়ে গেছে।

খোকন গিয়ে দেখল এ প্রতিমার মুখও ঠিক সেই মেয়েটির মতো। তার দিকে চেয়ে ঠিক মুচকি মুচকি হাসছে।

মন্টিকে আর দেখতে পায়নি খোকন।

খোকন এখন অনেক বড় হয়েছে। নাম-করা বাঁশি-বাজিয়ে হয়েছে সে। অনেক প্রাইজ, অনেক মেডেল পেয়েছে। লেখা-পড়াতেও সে বেশ ভালো ছেলে। কিন্তু ওই স্বপ্নটা সে এখনও দেখে, ঘুমিয়ে নয়, জেগে জেগেই।

কোলকাতার আকাশ

সুরেন পালিত মফঃস্বল থেকে কোলকাতায় এসেছে তার ভগ্নীপতির বাড়িতে। চিৎপুরের একটা গলির ভিতরে চারতলা একটা বাড়ীর ফ্লাটে থাকে তার ভগ্নীপতি নীলমণি। নীলমণি আটটার সময়ে কাজে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যা ছ'টার পর। যাবার সময় সুরেনকে সাবধান করে যায়—একলা রাস্তায় বেরিও না যেন। সুরেন মাথা নেড়ে বলে, আচ্ছা। সুরেন খাওয়াদাওয়া সেরে চুপ করে বসে থাকে জানালার ধারে, চেয়ে থাকে কোলকাতার আকাশের দিকে। দেখে অনেক চিল উড়ছে, অনেক। এত চিল কোথা থেকে আসে এখানে? মনে প্রশ্ন জাগে তার, কিন্তু উত্তর পায় না। তার দিদিকে একদিন জিগ্যেস করেছিল সে। দিদি সংক্ষেপে বলেছিল, কি জানি। তারপর তার মনে জেগেছিল আর একটা প্রশ্ন, এত চিল রাত্রে থাকে কোথায়? কোথায় ঘুমোয় ওরা? চারদিকে তো কেবল বাড়ী, বাড়ী আর বাড়ী। গাছপালা তো তেমন নেই! দিদিকে এ কথাটাও জিগ্যেস করেছিল সে। দিদি সেই একই উত্তর দিয়েছিল, কি জানি। তারপর হেসে বলেছিল, চিল নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে মরছিস কেন? ঘুমো একটু। কিন্তু সুরেনের চোখে ঘুম আসে না। সে সারাদিন আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে। একদিন এরোপ্লেন দেখতে পেলে একটা। আর একদিন ঘুড়ি। এরোপ্লেন আর ঘুড়ি সে গ্রামেও দেখেছে। কিন্তু এত চিল সে কখনও দেখেনি একসঙ্গে। অসংখ্য চিল ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে, আশ্চর্য ব্যাপার। চিলের ব্যাপারটা তার মনে বেশ দাগ কেটে বসে গেল। বেশ ভয় ভয় করতে লাগল। একি কাণ্ড!

সুরেনের বয়স বেশী নয়। আট বছর মাত্র। তাদের বাড়ী হুগলী জেলার এক পাড়াগাঁয়ে। বাড়ীর পিছনে পকুর, পাশে শিবমন্দির। পুকুরের পাড়ে তালগাছের সারি। তাছাড়া আরও নানারকম ঝোপঝাপ, নানারকম পাখি। চড়ুই, শালিক, টিয়া, হলদে পাখি, দোয়েল, বুলবুল, কোকিল কত রকম পাখি দেখেছে সে সেখানে। মাঝে মাঝে শিয়ালও দু'একটা। কিন্তু এখানে কেবল চিল আর কাক। পায়রাও আছে, কিন্তু চিলই বেশী।

তার ভগ্নীপতি নীলমণিবাবু আপিস থেকে ফিরে এসে রোজই এক কথা বলে, কাছাকাছি স্কুলে সীট পাওয়া যাচ্ছে না। কোলকাতার স্কুলে পড়বে বলে সুরেন এসেছে। কোলকাতায় অনেক স্কুল, কিন্তু নীলমণি সুরেনকে দূরে পাঠাতে চায় না। তার ভয় হয়, পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ট্রামে বাসে চড়তে পারে না, হয়ত কোথাও হারিয়ে যাবে।

এইভাবে দিন কাটছিল। রোজই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। দিনের বেলা জানলার ধারে বসে চিল দেখা আর সন্ধে-বেলা নীলমণিবাবুর কথা শোনা—স্কুলে সীট পাওয়া যাচ্ছে না।

দিন কতক পরে পাড়ার বীরেনের সঙ্গে ভাব হল তার। বীরেন বয়সে কিছু বড়। একেবারে চৌকশ ছেলে। কত খবরই যে রাখে। খেলার খবর, সিনেমার খবর, কোথায় কবে প্রসেশন বেরুবে তার খবর, সমস্ত তার নখদর্পণে। পরনে হাফপ্যাণ্ট, হাফ্ সার্ট। পায়ে চপ্ পল। মাথার চুল অদ্ভুত কায়দায় ছাঁটা। পিছনে কিছু নেই, সামনে গোছা গোছা।

বীরেন একনজরেই বুঝে গেল সুরেন কি চীজ্। ওকে তাক লাগিয়ে দেওয়া কত সহজ। নানারকম লম্বাই চওড়াই করতে লাগল সে সুরেনের কাছে। কি করে সে স্কুলের দুঁদে মাস্টার বিশ্বম্ভরবাবুকে এক ধমক দিয়ে 'থ' করে দিয়েছিল, কি করে স্কুলের দুর্জয় সেণ্টার ফরোয়ার্ড ধীরু সাণ্ডেলকে লেঙ্গি মেরে কাত করে দিয়েছিল, কোন্ সিনেমা স্টারের বারোটা বেজে গেছে, কোন্ ক্রিকেট টিমের পড়তা পড়েছে এবার—এই ধরনের গল্প করে সুরেনকে অবাক করে দিত সে। সুরেন হাঁ করে তার কথা শুনত, আর যা শুনত তা বিশ্বাস করত।

সুরেন একদিন তাকে জিগ্যেস করল—"আচ্ছা, ভাই, একটা কথা বলতে পার? এখানে দিনের বেলা আকাশে এত চিল ওড়ে কেন, আর রাত্তির বেলা ওরা থাকেই বা কোথা!"

সবজান্তা হাসি হেসে বীরেন বলল—"ও, তা জান না বুঝি! জানবেই বা কি করে? অজ পাড়াগাঁয়ে থাকো তো! ওসব চিল সাধারণ চিল নয়।"

"কি রকম?"

"ওরা মানুষ। চোর, ডাকাত, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। রাত্রে চুরি ডাকাতি করে চোরা-বাজারে ঘোরে আর দিনের বেলা আকাশে চিল হয়ে ওড়ে।"

সুরেনের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল।

"মানুষ চিল হয় কি করে?"

"তা জান না বুঝি, জানবেই বা কি করে! ওদের প্রত্যেকের এক একটি করে গুরু আছে। সে গুরুরা মন্ত্রবলে ওদের চিল করে দেয়। সে মন্ত্রের নাম ছোঁ-মন্ত্র। সেই মন্ত্র বলে গুরুরা একবার ছুঁয়ে দিলেই মানুষ চিল হয়ে যায়। আবার আর এক মন্ত্রে চিলরা মানুষ হয়।"

"সত্যি?"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল সুরেন।

বীরেনের কথা অবিশ্বাস করবার শক্তি ছিল না সুরেনের। বীরেন চলে যাবার পর আকাশের দিকে চেয়ে রইল সে। ওই অত চিল—সব চোর ডাকাত! ভয় ভয় করতে লাগল।

এর দিন দুই পরে আর একটা লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটল। ছাত্রেরা নাকি শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিল, পুলিশ তাদের উপর গুলি চালিয়েছে। হতাহতের সংখ্যা অনেক। হাত-পা নেড়ে বিরাট বক্তৃতা করে গেল বীরেন।

সুরেন হাঁ করে শুনতে লাগল।

"পুলিশ গুলি চালিয়েছে কেন ?"

"আরে, কি বোকা, ওরা গুলি চালাবার জন্যে মাইনে পায়, গুলি চালাবে না ?"

চুপ করে রইল সুরেন।

তার আর একটা কথা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছিল—ছাত্রেরা শোভাযাত্রা করেছে কেন। শোভাযাত্রা মানে কি।

কিন্তু বীরেনের কাছে নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করতে লজ্জা হল তার।

চুপ করে রইল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে চুপ করে বসেছিল জানালার ধারে। একটিও চিল নেই আকাশে। এতক্ষণে সব মানুষ হয়ে গেছে বোধ হয়। ছোরাছুরি নিয়ে কিলবিল করছে কোলকাতার অলিতে-গলিতে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল তার।

তারপর দেখতে পেল দু'একটা তারা মিটমিট করে জ্বলছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল সন্ধ্যাতারাকে। তাদের গাজিপুরে এই সময় রোজ দেখা যেত তাকে। বারান্দায় বসে দেখতে পেত। শিবমন্দিরের চুড়োর পাশে দপদপ করে জ্বলত রোজ। অনেকক্ষণ ধরে জ্বলত। তারপর তালগাছটার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকত খানিকক্ষণ। তারপর আবার বেরুত। সুরেনের মনে হত তার সঙ্গে যেন ও লুকোচুরি খেলছে। কিন্তু এখানে কোথায় গেল সেই সন্ধ্যাতারা ?

প্রত্যাশিত দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল সে।

তার পরদিন জিগ্যেস করলে বীরেনকে—"আচ্ছা ভাই, এখানে সন্ধ্যাতারা দেখা যায় না ?"

"দেখা যায় বই কি।"

"আমি তো একদিনও দেখতে পাইনি।"

"তুমি হাঁদুরাম তাই দেখতে পাওনি। আচ্ছা, আজ সন্ধের সময় দেখিয়ে দেব তোমাকে।"

সন্ধের সময় বীরেন এসে নিয়ে গেল ছাদে।

"ওই দেখ—"

সুরেন দেখল রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো বাড়ি দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাড়ির ছাদের উপর থেকে বিরাট শজারুর কাঁটার মতো অনেক কাঁটা বেরিয়ে আকাশে যেন খোঁচা মারছে।

"ওগুলো কি ?"

"ম্যারাপ্ বেঁধেছে। বিয়ে হবে বোধ হয়।"

"বিয়ে হবে ? কই আমরা তো শুনিনি। আমাদের তো নিমন্ত্রণ করেনি।"

"হাঁদুরাম কোথাকার। তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে যাবে কেন ? তোমরা কি ওদের

আত্মীয় ? কোলকাতায় আত্মীয়দেরই অনেকে করে না। একি তোমাদের পাড়াগাঁ পেয়েছ ?"

সুরেন কেমন যেন একটু বিমর্ষ হয়ে গেল। চুপ করে চেয়ে রইল ম্যারাপের দিকে। আকাশে খোঁচা মারছে, কেবলি মনে হতে লাগল তার।

"সন্ধ্যাতারা কোথায় ?"

"ওই যে। দুটো বাড়ির ফাঁকে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছ না ?" প্রকাণ্ড দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে আকাশের যে চিলতেটুকু দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে দেখতে লাগল বীরেন।

"ওই যে দেখতে পাচ্ছ না ?"

"ওই সন্ধ্যাতারা ? আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যাতারা ওঠে শিবমন্দিরের চুড়োর পাশে, দপ দপ করে জ্বলে। কি তার রূপ ! এ তো টিম টিম করছে।"

"হাঁদারাম, এ পাড়াগাঁ নয়, এ কোলকাতা।"

সুরেনের মনে হল ওই ম্যারাপ-ওলা বাড়িটার ভয়ে সন্ধ্যাতারা হয়তো ছোট হয়ে গেছে। কাঁপছে··· ।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা নীলমণিবাবু খবর আনলেন একটা সীট অনেক কষ্টে পাওয়া গেছে। কেরানীকে নগদ পাঁচ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

এরপর সুরেন যা করলো তা কেউ প্রত্যাশা করেনি।

সে বলল—"আমি এখানে পড়ব না। আমি গ্রামের পাঠশালেই পড়ব।"

"ওসব আবদার চলবে না, তোমার বাবা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, এখানেই পড়তে হবে। সীট যোগাড় করতে নাজেহাল হতে হয়েছে আমাকে—!"

···তার পরদিন সুরেনকে জোর করে স্কুলে নিয়ে গেল নীলমণি। সুরেন কিছুতেই যাবে না, হাত ধরে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে যেতে হল তাকে।

রাস্তার ধারেই স্কুল। সুরেন দেখল স্কুলের গেটের সামনে লাল পাগড়ি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে একজন। দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল তার। ওরা গুলি চালাবার জন্য মাইনে পায়।

তারপর স্কুলে ঢুকেই দেখতে পেল সারি সারি তিনটে চিল বসে আছে স্কুলের কার্নিসের ধারে।

"আমি এখানে থাকতে পারব না। আমায় ছেড়ে দাও গো জামাইবাবু, ছেড়ে দাও—"

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে রাস্তায়, আর সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ল একটা ছুটন্ত ট্যাকসির চাকার তলায়।

মৎস্য পুরাণ

খুকুর বিয়ের গল্প, সে এক অদ্ভুত গল্প। বললে কেউ বিশ্বাস করে না। তোমাদেরও বলছি, দেখ তোমরা বিশ্বাস করতে পার কি না। খুকুর ভাল নাম মানকুমারী। মানের মরাই একটি, নামের মর্যাদা ও রেখেছে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলে ওঠে, নাকের ডগা কাঁপতে থাকে, তারপর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এখন তার বয়স ষোল, এখনও অমনি।

তার এই আশ্চর্য বিয়ের গল্প বলতে হলে শুরু করতে হবে তার ছেলেবেলা থেকে। যখন তার বয়স তিন কি চার তখন তার মাসী তাকে একটি বড় পুতুল উপহার দিয়েছিল তার জন্মদিনে। বেশ বড় পুতুল, যেন বড়সড় খোকা একটি। নীল চোখ, মাথার চুল চমৎকার কোঁকড়ানো, ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল, আর কি মিষ্টি হাসি তাতে। খুকু পুতুলটিকে দিনের বেলা তো কাছ-ছাড়া করতই না, রাত্রেও কাছে নিয়ে শুত। কিন্তু এক আপদ জুটল দিন কয়েক পরে, ফন্তি মাসীর বায়নাদার মেয়ে মনু। ভালো নাম মনোরমা কিন্তু ওই নামেই মনোরমা, কাজের বেলায় ঠিক উলটো। একবার গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে আর রক্ষে নেই, কাঁদছে তো কাঁদছেই, বাড়িতে কাক চিল বসবার উপায় নেই, বাড়ির লোকেদের প্রাণান্ত হবার উপক্রম। আর কথায় কথায় বায়না, এটা চাই, ওটা চাই। এই মেয়েকে নিয়ে ফন্তি মাসী এল শরীর সারতে। খুকু জানত না তখন যে মনুটি কি 'চিজ্', তাহলে কি আর তাকে পুতুল দেখায়? আগেই লুকিয়ে ফেলত। কিন্তু তা হল না। মনু আসতেই খুকু এক মুখ হেসে এগিয়ে গিয়ে বললে—"আমার পুতুল দেখ্। চল্ একে নিয়ে খেলি গিয়ে। একে আজ বর সাজাই আয়। পাশের বাড়িতে মানতুর খুকীপুতুল আছে, তার সঙ্গে বিয়ে দেব। মানতুর বাড়ি যাবি?" মনু কিন্তু লুব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল পুতুলটার দিকে। কিছু না বলে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়েই রইল মিনিটখানেক। তারপর বলল, "ও পুতুল তোমার নয়, আমার—"

"ইস তোমার বই কি! মাসী আমাকে জন্মদিনে কিনে দিয়েছে—"

যুক্তি মানবার মেয়ে মনু নয়। সে আরও খানিকক্ষণ পুতুলটার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে লাফিয়ে এগিয়ে গেল খুকুর দিকে, ছোঁ মেরে পুতুলটা কেড়ে নিয়ে বললে—"আমার পুতুল—তোমার নয়। আমার—"

এ রকম জবরদস্তি সহ্য করা শক্ত। খুকু এক ধাক্কায় মনুকে ধরাশায়ী করে কেড়ে নিলে পুতুলটা। তারপরেই শুরু হল মনুর আকাশ-ফাটানো চিৎকার। হাঁ হাঁ করে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এল। কুটুমের মেয়ে দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে, কি হল তার। খুকু এক ছুটে আগেই চলে গিয়েছিল চিলে-কোঠার ঘরটাতে। সেখানে শ্রীমন্ত মালীর খোলা কাঠের বাক্সটাতে লুকিয়ে ফেলেছে পুতুলটাকে। যখন জানা গেল সামান্য একটা পুতুলের জন্য এই কাণ্ড তখন খুকুর মা বললেন, "কেঁদো না মনু, লক্ষীটি,

তোমাকেও আমি আনিয়ে দিচ্ছি ঠিক অমনি পুতুল। পুরীর সমস্ত দোকান খুঁজেও কিন্তু ঠিক অত বড় দ্বিতীয় পুতুল আর পাওয়া গেল না। মনু ছোট পুতুল নেবে না, ঠিক অত বড় পুতুলই চাই। কিছুতেই কান্না থামে না তার। খুকুর মা শেষে খুকুকে বললেন দিয়ে দাও তোমার পুতুলটা মনুকে। তোমার ছোট বোন হয়, কোলকাতা থেকে তোমাকে আনিয়ে দেব একটা পুতুল। এখন ওটা দিয়ে দাও ওকে, ছোট বোনকে কি কাঁদাতে আছে?—মায়ের কণ্ঠস্বরে আদেশের আমেজ পেয়ে খুকু আর আপত্তি করতে সাহস করলে না। দিয়ে দিলে পুতুলটা। কিন্তু বুক ফেটে গেল তার। মালী শ্রীমন্তর কাছে গিয়ে দুঃখে ভেঙে পড়ল সে একেবারে। বৃদ্ধ শ্রীমন্ত মালীই তার মনের কথা বোঝে, বিপদে আপদে আশ্রয় দেয়, প্রশ্রয়ও দেয় নানাভাবে। কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে কিনা, তাই যত আবদার তার কাছেই। সে ওড়িয়া ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, এতে কাঁদবার কি আছে। ওর চেয়ে ঢের ভালো পুতুল তাকে সে এনে দেবে। যদি এনে দিতে না পারে নিজের নাক কেটে ফেলবে সে, শুধু তাই নয় নিজের নামও বদলে ফেলবে। শ্রীমন্তর মুখে এমন সব কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনে খুকুর আশা হল। আজ পর্যন্ত শ্রীমন্তর কথার খেলাপ হয়নি। এই সেদিনও সে তাকে একটি পাকা চালতা এনে দিয়েছে লুকিয়ে।

মাসখানেক পরেই মনুরা চলে গেল। বলা বাহুল্য, পুতুলটা নিয়েই গেল সে। পুরীর বাজারে আর তেমন পুতুল একটিও এল না। মামাবাবু কোলকাতা থেকে জানালেন সেলুলয়েডের বড় পুতুল আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না আর। শ্রীমন্ত চেষ্টার ত্রুটি করছিল না অবশ্য। এদিক সেদিক থেকে প্রায়ই সে পুতুল জোগাড় করে আনত। কখনও ন্যাকড়ার পুতুল, কখনও মাটির পুতুল, কখনও রবারের পুতুল। গালার পুতুলও এনেছিল একদিন। কিন্তু খুকুর একটাও পছন্দ হয়নি। শ্রীমন্ত কিন্তু নিজের নাক কাটবার জন্য বা নাম বদলে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হল না। সে ক্রমাগত খুকুকে আশ্বাস দিয়ে যেতে লাগল যে ওর চেয়েও ভালো পুতুল সে খুকুকে এনে দেবেই দেবে। দিলেও একদিন। ভারী আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল একটা।

একদিন সকালে শ্রীমন্ত খুকুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আস্তে আস্তে বলল, তোর পুতুল এনেছি খুকু, জীয়ন্ত পুতুল!

কোথা?

বাগানের পিছনে যে চৌবাচ্চাটা আছে, তার ভিতরে।

চৌবাচ্চার ভিতরে পুতুল রাখতে গেলে! কি বুদ্ধি তোমার শ্রীমন্ত দা।

দেখেই যা না আগে—

খুকু গিয়ে সত্যই অবাক হয়ে গেল!

এক চৌবাচ্চা জলের ভিতর সত্যিই একটা জীবন্ত পুতুল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে আরও অবাক্ হয়ে গেল সে। পুতুলের উপরটা মানুষের মতো, কিন্তু

কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত মাছ। মাছের প্রতিটি আঁশ যেন রুপোর তৈরি আর তার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রামধনুর সাতটি রং। মাছের ল্যাজের পাখনাগুলোও অপরূপ, ঠিক যেন মখমলের তৈরি।

শ্রীমন্ত বললে, আমার এক জেলে বন্ধু আছে, সে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। কাল তারই জালে ধরা পড়েছে এটি। আমি তার কাছ থেকে দশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি। চিড়িয়াখানায় বিক্রি করলে আরও বেশী টাকা পেত সে। বন্ধু বলে আমাকে দশ টাকায় দিয়েছে।

খুকু অবাক হয়ে গেল।

খবর চাপা রইল না। দলে দলে লোক দেখতে এল মৎস্য নারীকে। খুকুর কিন্তু আশ্চর্য লাগল, নারী কি নর, তা এরা ঠিক করছে কি করে! কিচ্ছু তো বোঝা যায় না। মাথার চুলগুলো একটু লম্বা। কিন্তু ছেলেদেরও লম্বা চুল হয় না কি? ওই তো মাখনবাবুর ছেলে বুলু, লম্বা লম্বা চুল তার, মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানত করা আছে। পুরুষ কি মেয়ে যাই হোক সুন্দর দেখতে কিন্তু। ধপধপে ফরসা গায়ের রং, টানা টানা চোখ, মিশ কালো চোখের তারা, পাতলা ঠোঁট দুটি টুকটুক করছে। খুকু এগিয়ে যায় তার সঙ্গে ভাব করতে, সে-ও এগিয়ে আসে কিন্তু কথা বলতে পারে না।

তোমার নাম কি—খুকু জিগ্যেস করে।

চুপ করে চেয়ে থাকে সে, উত্তর দিতে পারে না। খুকুর মাঝে মাঝে মনে হয় তার চোখ দুটো যেন হাসছে। লজেন্স, বিস্কুট, সন্দেশ, রসগোল্লা, আচার নিয়ে রোজ তাকে সাধাসাধি করে, সে কিন্তু স্পর্শ পর্যন্ত করে না কিছু। শ্রীমন্ত বললে ও সমুদ্রের ছোট ছোট মাছ খায়, আমি রোজ সকালে এনে দি। শ্রীমন্ত আর একটা কাজও করে। সমুদ্র থেকে জল এনে চৌবাচ্চাটার জল বদলে দেয় রোজ। সমুদ্রের প্রাণী কি না, কুয়োর জল সহ্য হবে না হয়তো।

দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেল।

মৎস্যনারীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল খুকুর। মানুষের খাবারও খেতে লাগল সে ক্রমশঃ; বিস্কুট, মাছভাজা, টোস্ট, ওমলেট্—খুকু তাকে রোজ খাওয়াতো। মনে হতে লাগল কথা বলবারও যেন চেষ্টা করছে, কু-কু বলত মাঝে মাঝে। খুকুর কি আনন্দ! প্রথম ভাগ এনে পড়াতেই শুরু করে দিলে তাকে। মনে হত সে-ও যেন পড়বার চেষ্টা করচে। খুকু স্কুলে যেত না। একজন মাস্টার মশাই তাকে বাড়িতে পড়িয়ে যেতেন। খুকুর জেদাজেদীতে মৎস্যনারীকে পড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। তাঁরও মনে হল, চেষ্টা করলে ওকে হয়তো কিছু শেখান যাবে। খুকুর বাবা-মাও কৌতুক অনুভব করলেন এতে, মাস্টার মশাইকে বললেন, দেখুন না ওকে কথা কওয়াতে পারেন যদি,

তাহলে খুকুর বেশ সঙ্গী হয় একটি। মাস্টার মশাই চেষ্টা করতে লাগলেন। আর খুকুর তো কথাই নেই, সে যেন মেতে উঠল। সমস্তক্ষণই সে ওকে নিয়ে থাকত। অনেক বকাবকি করে তবে তাকে খেতে বা শুতে নিয়ে যাওয়া হত।

মৎস্যনারী ক্রমশঃ কথা কইতে শিখল, লেখাপড়াও শিখতে লাগল।

তারপর প্রায় দশ বৎসর কেটে গেছে। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

এখন খুকুর বয়স ষোল। মৎস্যনারীও বড় হয়েছে বেশ, তার জন্যে আরও বড় চৌবাচ্চা করানো হয়েছে, আর সেই চৌবাচ্চা ঘিরে হয়েছে কাচের প্রকাণ্ড ঘর। আর একটা বিস্ময়জনক ঘটনাও ঘটেছে যা চমকে দিয়েছে সকলকে। মৎস্যনারী আর নারী নেই, সে রূপান্তরিত হয়েছে নরে। তার গোঁফ উঠেছে। চমৎকার বাংলা কথা বলতে পারে সে, বাংলা ইংরাজী দুই পড়তে পারে, অঙ্ক কষতে পারে, এমন কি অ্যালজেব্রার অঙ্কও। চৌবাচ্চার ধারে প্রকাণ্ড টেবিল, টেবিলের উপর বইয়ের শেল্‌ফ। এখন রীতিমত ছাত্র সে! মাস্টার মশাই বলেন, খুকুর চেয়ে ওরই নাকি পড়ায় বেশী মন।

একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে কিন্তু। খুকুর বিয়ে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। খুকু বলছে—সমুদ্রগুপ্তকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। মাস্টার মশাই ওর নাম দিয়েছেন সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তকে সমুদ্রের ধার ছাড়া অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারণ সমুদ্রের জল না পেলে ও বাঁচবে না। অথচ সমুদ্রের ধারে যে সব শহর বা গ্রাম আছে তাতে খুকুর যোগ্য কোনও পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। খুকুর বাবা ওয়াল্‌টেয়ার, মাদ্রাজ পর্যন্ত খোঁজ করে দেখেছেন।

শেষে তাঁরা ঠিক করলেন জোর করেই খুকুর অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে হবে। পাটনায় খুব ভালো পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ পাত্র হাতছাড়া করা উচিত নয়। খুকু না-হয় মাঝে মাঝে এসে সমুদ্রগুপ্তকে দেখে যাবে। একটা পোষা জানোয়ারের জন্যে সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করার মানে হয় কোনও? সমুদ্রগুপ্তকে কিন্তু সামান্য একটা জানোয়ার বলে মনে করতে কষ্ট হচ্ছিল খুকুর বাবা মার। রাজপুত্রের মতো চেহারা, কি বুদ্ধি, কি কথাবার্তা।

খুকুর মা বললেন, "আহা, ওর নীচের দিকটা যদি মাছের মতো না হত তাহলে ওর সঙ্গেই খুকুর বিয়ে দিতাম। খুকুই তো আমাদের একমাত্র সন্তান, জামাইও ঘরে থাকত তাহলে।"

খুকুর বাবা বললেন, "যা হবার নয় তা ভাবছ কেন?"

বিয়ের কথাবার্তা চলতে লাগল। একদিন খুকু শুনল তাকে দেখবার জন্য পাটনা থেকে পাত্রের বাবা আসছেন।

গভীর রাত্রি।

সমুদ্রগুপ্তের ঘরে বসে খুকু কাঁদছিল। সমুদ্রগুপ্ত খুকুকে কখনও কাঁদতে দেখেনি। খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল সে!

"ও কি করছ তুমি—"

খুকু চোখের জল মুছে ফেললে।

"কি করছিলে?"

"কাঁদছিলাম।"

"কাঁদছিলে? কেন! বইয়ে পড়েছি লোকে দুঃখ হলে কাঁদে। কি দুঃখ হয়েছে তোমার?"

"তোমাকে ছেড়ে এইবার চলে যেতে হবে।"

"সে কি! কোথায় যাবে?"

"শ্বশুরবাড়ি। আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। পরশু আমাকে ওরা দেখতে আসবে—"

সমুদ্রগুপ্ত নির্বাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"আমাকেও নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।"

"পাটনায় তুমি থাকবে কেমন করে? তোমার চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল চাই। সেখানে তো সমুদ্র নেই। তোমার মাছের অংশটা যদি না থাকত তাহলে কোন ভাবনাই ছিল না।"

তারপর একটু থেমে খুকু বললে—"মা কাল কি বলছিল জান? বলছিল সমুদ্রগুপ্তের নীচের দিকটা যদি মাছের মতো না হত তাহলে ওর সঙ্গেই খুকুর বিয়ে দিতাম।"

"তাই না কি!"

সমুদ্রগুপ্তের সমস্ত মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। তার যে অংশটুকু মাছের মতো সেটা জলের ভিতর নিস্পন্দ হয়ে গেল হঠাৎ।

তার পরদিন খুব ভোরে খুকুর ঘুম ভেঙ্গে গেল হঠাৎ। শুনতে পেলে সমুদ্রগুপ্ত খুব জোরে জোরে তার নাম ধরে ডাকছে। বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি নেবে সে ছুটে চলে গেল সমুদ্রগুপ্তের ঘরে।

"খুকু দেখ দেখ, আমার মাছের খোলসটা ফেটে গেছে। আমি একা হাত দিয়ে ওটা ছাড়াতে পারছি না, তুমি একটু সাহায্য কর! আমি বুঝতে পারছি ওই খোলসটার ভিতর আমার পা আছে। একটু জোরে টান, মাছের খোলসটা খুলে যাবে এখুনি!"

খুকু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল। সত্যিই ফেটে গেছে খোলসটা।

"দাঁড়াও, আগে বাবার হাফপ্যাণ্টটা নিয়ে আসি তাহলে—"

ছুটে চলে গেল খুকু এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে এল একটা হাফপ্যাণ্ট হাতে করে।

আধ-ঘণ্টা পরে খুকুর বাবা মাও অবাক হয়ে গেলেন হাফপ্যাণ্টপরা সমুদ্রগুপ্তকে দেখে। এ কি কাণ্ড!

পাটনায় তখ্খুনি 'তার' চলে গেল, পাত্রের বাবার আসবার দরকার নেই। খুকুর বাবা পুরোহিত মশাইকে খবর দিতে বেরিয়ে গেলেন। খুকুর মা গেলেন লুচি ভাজতে।

খুকু জিগ্যেস করলে—"আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে। কি করে তুমি বেরুলে!"

সমুদ্রগুপ্ত বললে—"ইতিহাসের সমুদ্রগুপ্ত কত অসাধ্য-সাধন করেছিলেন, আর আমি এটুকু পারব না? চেষ্টায় কি না হয়। আমি তোমার কথা শুনে কাল সমস্ত রাত ধ'রে বেরুতে চেষ্টা করেছি—ভোরের দিকে ফেটে গেল খোলসটা—"

সাতদিন পরে খুকুর বিয়ে হয়ে গেল সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে।

বরকর্তা হল শ্রীমন্ত।

কবি জানেন

বহুকাল পূর্বে বনমহল নামে এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজা ছিল না, ছিল এক রাণী। রাণীর নাম ছিল বনদেবী। তিনি এত ভাল ছিলেন যে বনের পশু-পাখী গাছপালা সবাই ভালবাসত তাঁকে। তিনিও সবাইকে ভালবাসতেন। আকাশ-বাতাস রোদ জ্যোৎস্নার সঙ্গেও ভাব ছিল তাঁর। এরাও তাঁকে খাতির করত, ভালবাসত! এত ভালবাসা পেলে কি আর কোনও অভাব থাকে? বনমহলের রাণী বনদেবী সত্যিই রাণীর মতো থাকতেন। গাছেরা তাঁকে ফল দিত, গাই এসে দুধ দিয়ে যেত, পাখীরা গান শোনাত, ফুলেরা গন্ধ দিত। বনের মধ্যে ছোট্ট একটি নদী ছিল, সে দিত পিপাসার জল। তার জলে আকাশের ছায়া পড়ত। সন্ধ্যা-উষার আলোয় জল রাঙা হয়ে উঠত কখনও, বর্ষার মেঘের ছায়া পড়লে মনে হত নদী যেন নীলাম্বরী শাড়ি পরেছে। কত রকম ছবি যে ফুটে উঠত নদীর বুকে তার আর ঠিক নেই। বনদেবী আর তাঁর সহচরীরা বসে বসে দেখতেন। অনেক সহচরী ছিল তাঁর। তাদের নিয়ে বনমহলে বেশ সুখেই ছিলেন তিনি।

কিন্তু বিপদ এল একদিন। শহর থেকে একদল মানুষ এসে বনমহল ঘেরাও করল। অনেক জিনিস লুটপাট করে নিয়ে গেল তারা। বনদেবী আর তাঁর সহচরীরা খুব উঁচু গাছে উঠে ঘনপাতার আড়ালে বসে দেখলেন সব। বনদেবী বললেন—"এর ফল ভাল হবে না। নিজেদের অস্ত্রে ওরা নিজেরাই মরবে একদিন।" কিন্তু ওদের সব চেয়ে দুঃখ হল যখন দেখলে ওদের প্রিয় ঘোড়া পবনকে ওরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সকলের। আহা, বেচারা!

কিন্তু ওই পবনই একদিন শহর থেকে লাল রঙের ঘাগরা নিয়ে এল। এক আধটা ঘাগরা নয়, এক গাড়ী ঘাগরা। প্রত্যেকটি লাল টুকটুকে। পবনের চেহারাও অদ্ভুত।

মুখে লাগাম, খুরে লোহার নাল। গলায় পুঁথির মালা, তাতে আবার ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। প্রকাণ্ড একটা গাড়ি টানতে টানতে ঝড়ের বেগে পবন এসে ঢুকল একদিন বনমহলে। গাড়ির ভিতর অসংখ্য লাল ঘাগরা। পবন যা বলল তা-ও অদ্ভুত। তাকে দিয়ে ওরা নাকি গাড়ি টানায়। সে গাড়িতে মানুষ থাকে না, মাল থাকে। এক দোকান থেকে মাল নিয়ে আর এক দোকানে যেতে হয়। সেদিন পবন ফাঁক পেয়ে পালিয়ে এসেছিল। আবার তাকে নাকি ফিরে যেতে হবে।

"ঘাগরাগুলো নামিয়ে নাও তোমরা। কারণ এখুনি আমি চলে যাব। না গেলে ওরা আবার এখানে আসবে, আবার সব লুটপাট করবে। ভয়ঙ্কর লোক ওরা। সিংহপতিকে অবশ্য বলে যাব—।"

বনদেবীর সহচরীরা ঘাগরাগুলো নামিয়ে নিলে গাড়ি থেকে। তারা কখনও ঘাগরা দেখেনি, সবাই বল্কল পরে থাকত। ঘাগরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এ নিয়ে কি করব আমরা—?"

"পর। শহরের মেয়েরা এই জিনিস পরে। পরলে চমৎকার দেখাবে।"

বনদেবী বললেন, "এ নিয়ে আবার গোলমাল হবে না তো?"

"না। আমি যাবার সময় সিংহপতিকে খবর দিয়ে যাব। তিনি বনমহল পাহারা দেবার ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়।"

বনমহলের পাশেই বিরাট-মহল। সিংহপতি সেখানকার রাজা। সিংহপতির সঙ্গে বনদেবীর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে আছে। বিয়ে দু'বছর পরে হবে। বিরাট-মহলের নিয়ম গোঁফ না উঠলে বিয়ে হয় না। সিংহপতির এখনও গোঁফ ওঠেনি। কিন্তু তাই বলে বিক্রমে তিনি কিছু কম নন। শহরের লোকেরা বনমহল আক্রমণ করেছে শুনলে তিনি ক্ষেপে উঠবেন।

পবন চলে গেল।

বনদেবীর সহচরীরা লাল ঘাগরা পড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল মনের আনন্দে। তাদের প্রত্যেকেরই গায়ের রং ধপধপে সাদা। লাল ঘাগরায় চমৎকার মানালো তাদের। মনে হতে লাগল যেন নূতন ধরনের ফুলেরা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বনদেবী বললেন—"এগুলো ছিঁড়ে গেলে আবার শহর থেকে এমনি লাল ঘাগরা আনিয়ে দেব তোমাদের। আর তোমাদের বল্কল পরতে হবে না।"

"সত্যি বলছ?"

সহচরীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘিরে ধরল বনদেবীকে।

বনদেবী প্রতিশ্রুতি দিলেন—"সত্যি বলছি। আবার আনিয়ে দেব। বরাবর আনিয়ে দেব।"

"কে নিয়ে আসবে শহর থেকে—?"

"পবনই হয়তো আবার আসবে। না আসে তো কোন না কোন ব্যবস্থা করবই।"

বনদেবীর আশা ছিল, কিছুদিন পরেই সিংহপতির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যাবে। কারণ একদল প্রজাপতি সেদিন বনমহল থেকে বিরাট-মহলে গিয়েছিল। তারা বলল সিংহপতির গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। সিংহপতির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে আর কোনও ভাবনা থাকবে না। তার প্রচুর লোকবল।

...বিয়ে কিন্তু হল না। শহরের মানুষদের সঙ্গে সিংহপতির ঘোর যুদ্ধ বেধে গেল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটতে লাগল, যুদ্ধ আর থামে না। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। বনমহলের আকাশের উপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে লক্ষ লক্ষ তীর বেগে চলে যায়। পাখী দেখা যায় না, অনেক সময় মেঘও দেখা যায় না। এদিকে পবনের কোনও খবর নেই, সিংহপতিরও কোনও খবর নেই।

...লাল ঘাগরাগুলি ক্রমশ ময়লা হয়ে গেল, ছিঁড়তে লাগল। সহচরীরা ঘাগরার জন্য মুখ ফুটে আর তাগাদা করতে পারে না, কারণ তারা জানে কেন ঘাগরা আসছে না। এই সর্বনেশে যুদ্ধ না থামলে আর আসবেও না। সহচরীরা কিছু না বললেও বনদেবীর খুব কষ্ট হতে লাগল, লজ্জাও হতে লাগল। তিনি ওদের কথা দিয়েছিলেন যে ঘাগরা ছিঁড়ে গেলে নতুন ঘাগরা আনিয়ে দেবেন, বারবার আনিয়ে দেবেন। কিন্তু একি হল! তাঁর কথার নড়চড় কখনও হয়নি, ভগবান কোন না কোন উপায়ে বরাবর তাঁর মান রক্ষা করেছেন। কিন্তু এবার একি হল! বনদেবী ভগবানকেই ডাকতে লাগলেন। গভীর রাত্রে উঠে তিনি চুপি চুপি নদীর তীরে চলে যেতেন আর সেখানে চোখ বুঁজে বসে একমনে প্রার্থনা করতেন, ভগবান, আমার মানরক্ষা কর। ওদের আমি কথা দিয়েছি। আমার কথা যেন থাকে। রোজই যেতেন। একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বনদেবী রোজ যেমন চোখ বুঁজে বসে প্রার্থনা করেন সেদিনও তেমনি করছিলেন হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁর বোঁজা-চোখের ভিতর দিয়েও তিনি যেন আলো দেখতে পাচ্ছেন। চোখ খুললেন, দেখলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, "আপনার একাগ্র প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে ভগবান আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

বনদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কে?"

"আমি সূর্য। আমি আপনার সহচরীদের ঘাগরার ভার নিয়েছি। আমি যখন ভোরে পূর্বাকাশে উঠি তখন আপনার এই নদীর জল টুকটুকে লাল হয়ে যায়। সেই সময় যদি আপনার সহচরীরা নদীর জলে ঘাগরা পরে স্নান করে, তাহলে তাদের ঘাগরা আবার নতুন হয়ে যাবে। একটুও ময়লা থাকবে না, একটুও ছেঁড়া থাকবে না, টুকটুকে লাল হয়ে যাবে আবার।"

কথাগুলি বলে সূর্য অন্তর্ধান করলেন।

বনদেবী অবাক হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মনে হল তিনি স্বপ্ন দেখলেন বুঝি বা। কিন্তু স্বপ্নও তো অনেক সময় সত্য হয়।

…সত্যিই হল। পরদিন উষার কিরণ পড়ে নদীর জল যখন লালে লাল হয়ে উঠেছে তখন বনদেবীর সহচরীরা তাদের ময়লা ছেঁড়া ঘাগরা পরে নামল তাতে স্নান করবার জন্য। স্নান করে যখন উঠল তখন প্রত্যেকের ঘাগরা শুধু নতুন নয়, অপরূপ হয়ে গেছে! ভগবানের দয়া হলে সবই হয়।

বনদেবী আর একদিন সূর্যের দেখা পেয়েছিলেন। সেদিনও তিনি নদীতীরে বসে ভাবছিলেন—এই অসম্ভব আশ্চর্য কাণ্ড বারবার কি হবে? পাশেই একটা সূর্যমুখী গাছে প্রকাণ্ড একটা সূর্যমুখী ফুল ফুটেছিল। সে কথা কয়ে উঠলো। বলল—আপনি যতদিন থাকবেন, ততদিন হবে। বনদেবী চেয়ে দেখলেন সূর্যমুখীর প্রতিটি পাপড়ি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। বনদেবীর বুঝতে দেরী হল না যে স্বয়ং সূর্যই ফুলের ভিতর আবির্ভূত হয়ে আশ্বাস দিয়ে গেলেন তাঁকে।

…ঘাগরা সমস্যার সমাধান হল বটে কিন্তু আর একটি সমস্যা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। শহরের মানুষদের সঙ্গে সিংহপতির যুদ্ধ ক্রমশ তুমুল হয়ে উঠল। পাখীরা এসে খবর দিল যে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। সিংহপতির সৈন্য-সামন্তেরা সমস্ত বনমহল ঘিরে রেখেছে যাতে শহরের মানুষেরা সেখানে হানা দিতে না পারে। শহরের মানুষরাও চেষ্টার ত্রুটি করছে না। দেশ-বিদেশ থেকে নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র আনাচ্ছে তারা। দুপক্ষের অসংখ্য তীর শন শন করে আকাশ দিয়ে যাচ্ছে। যে সাঁকো দিয়ে শহরের লোকেরা বনমহলে আসতো সেই সাঁকো সিংহপতি নাকি ভেঙে দিয়েছে। তাই পবনও আর আসতে পারে না। ভাঙা সাঁকোর সামনে স্বয়ং সিংহপতি সসৈন্যে দাঁড়িয়ে আছে যাতে শহরের মানুষেরা আবার সাঁকো তৈরী করতে না পারে।

সমস্ত বনমহল বিষাদে আচ্ছন্ন। পাখীরা পর্যন্ত ভয়ে ওড়ে না। যদি কারও গায়ে তীর লেগে যায়! কেবল শকুনি আর কাকেরাই সব বিপদ তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধ হওয়াতে তাদের যেন সুবিধাই হয়েছে। অনেক মড়া পাচ্ছে তারা। এমন ভোজ বহুদিন তাদের ভাগ্যে জোটেনি। একটি কাকই একদিন নিদারুণ দুঃসংবাদটি নিয়ে এল। সিংহপতি যুদ্ধে মারা গেছেন।

…দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। বনদেবী স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। মুখে কথা নেই, চোখে জল নেই। ঠিক যেন পাথরের মূর্তি। আর তাঁকে ঘিরে বসে আছে তাঁর অসংখ্য সহচরীরা। ফুলের মতো দেখতে, টুকটুকে লাল ঘাগরা পরা। তাদেরও কারও মুখে কথা নেই।

অনাহারে বসে রইলেন বনদেবী দিনের পর দিন! পাখীরা ঠোঁটে করে ফল এনে কত সাধ্যসাধনা করল, নদী অনুরোধ করল, আমার জল খাও এসে কিন্তু বনদেবীর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। তিনি নিশ্চল হয়ে বসেই রইলেন আর তাঁর সহচরীরাও নির্বাক হয়ে ঘিরে বসে রইল তাঁকে। একদিন বুলবুলির দল এসে দেখলে বনদেবী মারা গেছেন। তাঁর সহচরীরাও বেঁচে নেই কেউ। বনদেবীর প্রাণহীন দেহ যেন পাথরের

মূর্তির মতো বসে আছে আর তাঁকে ঘিরে শুয়ে আছে লাল ঘাগরা-পরা সহচরীর দল।

…তার পর বহু শতাব্দী কেটে গেছে। বনদেবীর কথা ভুলে গেছে সবাই, কেবল একজন ছাড়া। তিনি কবি। তিনি জানেন বনদেবী মরেন নি। নূতন রূপে বেঁচে আছেন। তোমরাও নূতন রূপে দেখেছ তাঁকে, কিন্তু চেন না।

শিউলি গাছ দেখনি? শিউলি গাছই বনদেবী। শরতকালে লাল ঘাগরা-পরা তাঁর সহচরীদেরও দেখেছ তোমরা নিশ্চয়। শিউলি ফুল হয়ে প্রতি বছর আসে তারা। বনদেবীকে ঘিরে প্রতি বছরই ঝরে পড়ে, আবার ফুল হয়ে ফোটে, আবার ঝড়ে পড়ে।

কবিই জানেন মৃত্যু মানে রূপান্তর। তাই তিনি বনদেবীকে ভোলেন নি।

কেন এমন?

কুমারের বয়স মাত্র দশ বছর। খুব বড়লোকের ছেলে সে। একমাত্র ছেলে। শুধু তাই নয়, কুমার পিতৃহীন। বাবার বিরাট সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার মাকে সবাই রানী-মা বলে ডাকে। কুমার বুঝতে পারে না কেন ডাকে। তার বাবা তো রাজা ছিলেন না। কুমার এর প্রতিবাদ করতে পারে না, কিন্তু মনে মনে লজ্জিত হয়। যে রানী নয় তাকে রানী বলে ডাকা কি তাকে ঠাট্টা করা নয়? মনে মনে এই সব ভাবে কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না।

রানী-মায়ের সমস্ত স্নেহ পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল তাঁর একমাত্র ছেলে কুমারকে কেন্দ্র করে। তার জন্যে আলাদা মোটর গাড়ি, আলাদা একটা টাট্টু ঘোড়া। তার জন্যে দুটো ঝি, দুটো চাকর। দুজন প্রাইভেট টিউটর তাকে পড়াতে আসেন। একজন সকালে, আর একজন সন্ধ্যায়।

কুমার হাঁপিয়ে ওঠে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার একটুও অবসর নেই, একটুও একলা থাকতে পায় না। ভোরবেলা সে চোখ খুলেই দেখতে পায় রামাকে। রামা তার মুখ ধোয়াবে, বাথরুমে নিয়ে যাবে, কাপড় বদলে দেবে, মাথার চুল আঁচড়ে দিয়ে পৌঁছে দেবে তাকে মণি পিসির কাছে। মণি পিসি বাড়ির পুরোনো ঝি। কুমারের খাওয়া-দাওয়ার ভার তার উপর। সে প্রথমেই এক গ্লাশ দুধ খাইয়ে দেবে জোর করে। এর পর কি আর কিছু খাওয়া যায়? কিন্তু খেতেই হবে। আঙুর, আপেল, পেস্তা, বাদাম, সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি, তরকারি একগাদা খাবার সামনে ধরে দিয়ে সাধ্যসাধনা করবে মণি পিসি খাবার জন্যে। মণি পিসির কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। তাকে খুশি করবার জন্য কিছু খেতেই হয়। কিন্তু ভাল লাগে না কুমারের! খাওয়া শেষ হতে না হতেই বাইরের চাকর খবর দেয়—কুমারবাবু, মাস্টার মশাই এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পড়ার ঘরে যেতে হয়। শিবনাথবাবু বেশ ভাল মাস্টার, প্রবীণ লোক। আগে কলেজে

প্রফেসারি করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। তাঁর পড়াবার ধরণ একটু স্বতন্ত্র। তিনি প্রথমেই এসে একজন বিখ্যাত লোকের জীবনী মুখে মুখে গল্প করে বলেন। তারপর পড়াতে শুরু করেন। দশটা বাজতে না বাজতেই ভিতর থেকে ডাক আসে, মা ডাকছেন। মা খুব ভোরে উঠেই স্নান করে পূজোর ঘরে ঢোকেন। অনেকক্ষণ পূজো করে তবে বেরোন। বেরিয়েই কুমারকে ডাকেন তিনি। কুমারের খাস খানসামা তিতু তখন তাকে তেল মাখাবে মায়ের সামনে। রানী-মা বসে বসে নির্দেশ দেন আর তিতু তেল মাখায়। তিন রকম তেল মাখানো হয় তাকে। সরষের তেল, অলিভ অয়েল আর জবাকুসুম। অলিভ অয়েল সর্বাঙ্গে মালিশ করা হয়। সরষের তেল কানে আর নাকে টেনে নিতে হয়। জবাকুসুম মাখানো হয় মাথায়।

বিরক্তি ধরে যায় কুমারের। তিতু যেন তাকে দলাই মলাই করে, সে যেন মানুষ নয় ঘোড়া। কিন্তু কিচ্ছু বলবার উপায় নেই। মা সামনে বসে থাকেন। তারপর স্নানের ঘরে গিয়ে বাথ-টবে বসিয়ে মা তাকে নিজের হাতে স্নান করান গরম জলে। তোয়ালে দিয়ে এমন জোরে জোরে ঘষেন! কুমার মাঝে মাঝে বলে—আমি কি বাসন নাকি যে অমন জোরে জোরে ঘষছ? মা উত্তরে বলেন—এই যে হয়ে গেল বাবা, একটু থাম না। না ঘষলে গায়ের ময়লা উঠবে কেমন করে। কুমার জানে তার গায়ে একটুও ময়লা নেই। ময়লা লাগবে কি করে? সর্বদা জামা-কাপড় পরে থাকতে হয়, জুতোও কয়েক জোড়া আছে, খালি পায়ে হাঁটতে মানা। শুধু জুতো নয়, মোজাও আছে! শীতকালে দস্তানাও পরতে হয়। ময়লা লাগবে কি করে? কিন্তু রানী-মার ময়লা-ময়লা বাতিক। মুখটা এমন জোরে জোরে ঘষে দেন গামছা দিয়ে যে কুমারের মনে হয় চামড়া উঠে যাবে। সে চেঁচায়, কিন্তু মা ছাড়েন না। বলেন—থাম না তেলগুলো উঠিয়ে দি। তেল ওঠবার পর সাবান মাখাবার পালা। সে-ও এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। সাবান খুব দামী, কিন্তু চোখের ভিতর ফ্যানা ঢুকে গেলে জ্বালা কিছু কম করে না। স্নান পর্ব শেষ হলে শুরু হয় প্রসাধনের পালা। এ কাজটাও রানী-মা নিজের হাতে করেন। চিরুনি দিয়ে এমন জোরে জোরে মাথা আঁচড়ে দেন যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে কুমারের। রুপোর চিরুনি, তার দাঁতগুলো কি ধার! কুমার যত বলে—ছাড়, ছাড়—মা তত জোরে জোরে চিরুনি চালান। তারপর বুরুশ। তারপর স্নো, তারপর পাউডার। তারপর জামা আর পায়জামা পরা। প্রত্যেকটাই বিরক্তিকর!

সব শেষ হলে মা একটি চুমু খেয়ে বলেন, চল এইবার খাবে চল। এই চুমুটাই বেশ ভাল লাগে কুমারের। কিন্তু খাবার প্রস্তাবটা ভাল লাগে না। বলে—এখনও খিদে পায়নি। ধমকে ওঠেন রানী-মা—খিদে তো তোমার কখনও পায় না। এগারোটার সময় খেতে বলে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, মনে নেই?

একজন ডাক্তার প্রতি সপ্তাহে এসে পরীক্ষা করে যায় কুমারকে। তাঁর হুকুম মতো চলতে হয়। বড়দের খাবার জন্যে শ্বেতপাথরের একটা 'ডাইনিং টেব্‌ল্' আছে। কিন্তু

কুমারের পক্ষে সেটা বড্ড বেশী উঁচু। তাই তার জন্তে শ্বেতপাথরের কম-উঁচু এক ছোট টেবিল কিনে দিয়েছেন রানী-মা। অনেকটা জলচৌকির মতো। সেই টেবিলের সামনে একটি দামী কার্পেটের আসন পাতা হয়। সেই আসনে বসে কুমার খায়। রানী-মাও পাশে একটি ছোট মোড়ায় বসেন এবং খাইয়ে দেন তাকে। ঘাড়ে ধরে খাইয়ে দেন বললে ঠিক হয়। সে-ও এক হৈ হৈ ব্যাপার। কুমার প্রতিটি জিনিস খাবার সময় বায়না করে, 'ঝাল' 'ঝাল' বলে বার বার জল খায়, কাঁটা বলে মাছ খেতে চায় না, কিন্তু রানী মাও ছাড়বার পাত্রী নন। খোশামোদ করে, ধমক দিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়েন। অথচ কুমারের যে জিনিসটির দিকে প্রচুর লোভ, আচার, সেটি দেন না তাকে বেশি। কুমারের মনে হয় অত্যাচার, সেরেফ অত্যাচার। খাওয়ার পর তাকে শুতে হবে। ঘুম পাক না পাক শুতে হবেই। প্রায়ই ঘুম আসে না। মাথার উপরে পাখা ঘুরছে, চমৎকার বিছানা, ঠাণ্ডা ঘর, দরজা জানালা বন্ধ, কিন্তু তবু ঘুম আসে না তার। সে চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে থাকে। উঠে পালাবার উপায় নেই, কারণ মা ঠিক পাশেই শুয়ে থাকেন।

বেলা তিনটে পর্যন্ত এই নির্যাতন ভোগ করতে হয় তাকে। তিনটের পর খেলার ঘরে নিয়ে যায় তাকে রামা। রামা তার সঙ্গে খেলা করে না, খেলার ঘরের দরজায় বসে পাহারা দেয় খালি। খেলার ঘরে নানারকম খেলনা আছে। বড় কাঠের ঘোড়া, বড় টেডি বিয়ার, ভাল একটা মেকানো, কার্ডবোর্ডের তৈরি ইঁট-কড়ি-বরগা, তাছাড়া নানারকম পুতুল, নানারকম ছবি। একটা ছোট রকিং চেয়ারও আছে। কুমারের কিন্তু এদের সম্বন্ধে আর ঔৎসুক্য নেই, এদের নিয়ে খেলা যেন আর জমে না। সব পুরোনো হয়ে গেছে, মন ভরে না। মেকানোটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু, ঘোড়ার পিঠে চড়ে একটু দোলা যায়, কিন্তু খেলা ঠিক জমে না। যন্ত্রচালিতবৎ এটা-ওটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করে, মনে হয় খেলাটাও যেন পড়ার মতো একটা অবশ্য করণীয় কর্তব্য। ওতে মজা নেই। ঘণ্টা দেড়েক খেলার ঘরে থেকে আবার যেতে হয় তাকে খাবার ঘরে। অর্থাৎ আবার মণি পিসির পাল্লায় পড়তে হয় মণি পিসি গরম হালুয়া আর লুচি করেছে তাই খেতে হবে। মুখটি বুজে খেতে হয়। কারণ বেশি আপত্তি করলে গোলমাল হবে আর মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কুমার তিনটের সময় উঠে পড়ে, কিন্তু রানী-মা ওঠেন না, তিনি পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমোন। তাঁর কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেলে মাথা ধরে, বারবার অডিকোলন দিলেও সে মাথা ব্যথা কমে না। মেজাজও খারাপ হয়ে যায়, সবাইকে তুচ্ছ কারণে বকেন। তাই কুমার এ সময়টা খেতে বেশি আপত্তি করে না। । করলেও হাত নেড়ে বা ভুরু কুঁচকে করে। খাবার পর মণি পিসিই তাকে বেড়াতে যাওয়ার পোশাক পরিয়ে দেয়। নিত্য নূতন পোশাক। কখনও ভেলভেটের কোট প্যাণ্ট, কখনও আদ্দির পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী জরি পেড়ে ধুতি, কখনও নিকার বোকার, কখনও ঢিলে পাজামা হাওয়াই শার্ট। কুমার এসব বেশ উৎসাহ সহকারেই পরে। কারণ এর পর বেড়াতে যেতে হবে। ড্রাইভার বিজয় তাকে অনেকদূরে এক মাঠে নিয়ে যায়। সেই মাঠের ধারে একটা

বস্তি আছে। গরীবদের বস্তি। কুমারের খুব ভাল লাগে বস্তির কাছে যেতে। সেখানে ফাগুয়া আছে। তারই সমবয়সী।

ফাগুয়া চামারের ছেলে। তার বাবা দুখন রোজ মজুরী খাটতে যায়। তার মা-ও। ছোট্ট একটি খাপরার ঘর তাদের। পাশাপাশি আরও কয়েকটা ঘর আছে। চামারদের ছোট বস্তি ওটা। একটা উঠোনের চারপাশেই ঘরগুলো। সে উঠোনে সকলেরই সমান অধিকার। কুমারের মোটর থেকে দেখা যায় উঠোনটা। একধারে ছাই-গাদা। আর একধারে ঘুঁটে। একটা মুরগী একপাল বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ঘাড়ের পালক ফুলিয়ে 'ক্লাক' 'ক্লাক' করে শব্দ করছে। ফাগুয়ার দুটি বোন, ঝুমরি আর সুনরি। ঝুমরির বয়স ছ'বছর, সুনরির চার বছর। মাথা-ভরা ঝাঁকড়া চুল তাদের। চুলে তেল নেই। চোখের কোণে পিঁচুটি, নাকভরা সর্দি। খালি গা, পরনে এক টুকরো ময়লা ন্যাকড়া। ওরা রাস্তার ধারে বসেই ধুলো নিয়ে খেলা করে। ধুলোর স্তূপ করে, তার একধারে ছোট্ট একটু ফাঁক রেখে, ঘর বানায়। পথের ধারে ঘাস পাতা ছিঁড়ে তরকারী করে, ভাঙা হাঁড়ির টুকরো ওদের কড়া, পাশাপাশি ভাঙা দুটো ইঁট দিয়ে ওদের উন্থন হয়েছে। পাশেই ডোবা আছে একটা। মাটির ভাঁড় করে ঝুমরি সুনরি জল নিয়ে আসে সেখান থেকে। একবার নয়, বারবার নিয়ে আসে। পায়ে কাদা লেগে যায়, গ্রাহ্য করে না। তাদের ভাই ফাগুয়া মোষ চরায় ওই মাঠে। মোষের পিঠে বসে থাকে লম্বা একটা লাঠি নিয়ে।

অতবড় ভীষণ মোষ কিন্তু ফাগুয়াকে কিছু বলে না। ফাগুয়া 'হেট্' 'হেট্' করে যেখানে খুশি নিয়ে যায় তাকে। মোষের সঙ্গে তার বাচ্চাও থাকে। কি সুন্দর সেটা! মায়ের পিছনের দু' পায়ে মুখ ঢুকিয়ে দুধ খায়। কখনও ফাগুয়া আবার শুয়ে পড়ে মোষটার পিঠে লম্বা হয়ে। ফাগুয়ার একটা ছোট বাঁশি আছে, বাঁশের বাঁশি। মোষের পিঠে বসে বসে বাঁশি বাজায় সে মাঝে মাঝে। কাছেই একটা বটগাছ আছে। অনেক ঝুরি নেমেছে তার থেকে, ফাগুয়া মাঝে মাঝে মোষের পিঠ থেকে নেমে গিয়ে সেই ঝুরি ধরে দোলে। কখনও আরও দু'তিনজন রাখাল এসে জোটে, তখন তারা খেলে ডাংগুলি।

কুমার দামী পোশাক পরে দামি মোটরে চক্কোর খেয়ে খেয়ে এদের দেখে। প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে তার মন। ভাবে আহা, আমি যদি ঝুমরি, সুনরি আর ফাগুয়ার সঙ্গে খেলতে পারতুম! মনে হয়—মোটরে চড়ার চেয়ে মোষের পিঠে চড়া ঢের ভাল। কাঠের ঘোড়ার পিঠে দোল খাওয়ার সঙ্গে ওই ঝুরি ধরে দোল খাওয়ার কি তুলনা হয়! মোটর ধীরে ধীরে মাঠে চক্কোর দেয় আর কুমার ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে দেখে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে। কিন্তু সে মনে মনে জানে ওদের সঙ্গে খেলবার সুযোগ সে কোনদিন পাবে না। বিজয় মোটর থামাবেও না, তাকে যেতেও দেবে না। তাকে মোটরে বসেই দূর থেকে দেখতে হবে ওসব।

ফাগুয়াও দূর থেকে রোজ দেখে মোটরটাকে। প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে সে-ও চেয়ে থাকে। ভাবে, আহা কি সুন্দর মোটরটা! কি সুন্দর রং, কেমন চকচকে ঝক্‌ঝকে। ফরসা-কাপড়-জামা-পরা খোকাবাবুর দিকে সে চেয়ে থাকে নির্নিমেষে। যেন দেব-দর্শন করছে। তারও মনে দুরাকাঙ্ক্ষা জাগে—আহা আমি যদি একবার মোটরটায় চড়তে পেতাম। কিন্তু সে জানে এ সুযোগ কখনও আসবে না।

কিন্তু সুযোগ একদিন এসে গেল।

ড্রাইভার বিজয় রোজ আফিং খায়। একদিন হঠাৎ তার মনে পড়ল তার আফিং তো ফুরিয়েছে, কেনা হয়নি। বাড়ি ফিরে গিয়ে দোকান থেকে আফিং কেনবার আর সময় থাকবে না। কালালি বন্ধ হয়ে যাবে। একবার সে ভাবল, মোটরটা নিয়ে সোজা কালালিতে চলে যাই। কিন্তু রানী-মার কানে যদি কথাটা ওঠে তাহলে চাকরি যাবে। তাঁর কড়া হুকুম বাজারের ভিড়ে যেন কুমারকে কখনও না নিয়ে যাওয়া হয়। তার বন্ধু বোম্বু মাঠের ওপরে আর একটা বস্তিতে থাকে। সে-ও আফিং খায়। তার কাছ থেকে চেয়ে আনবে একটু? কিন্তু মোটর নিয়ে তো সেখানেও যাওয়া যাবে না। রাস্তা খুব খারাপ। হেঁটেই যেতে হবে।

"কুমার সাহেব, তুমি মোটরে চুপ করে বস একটু। আমি ঘুরে আসছি এখুনি। তুমি মোটর থেকে নেমো না যেন। আমি যাব আর আসব—"

বিজয় চলে গেল।

চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কুমার নেমে পড়ল মোটর থেকে। এক ছুটে চলে গেল ফাগুয়ার কাছে। ফাওয়া তখন মোষের পিঠে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল।

"তোমার নাম কি ভাই?"

"ফাগুয়া।"

"আমাকে তোমার মোষের পিঠে চড়তে দেবে?"

"হ্যাঁ—"

দেখা গেল ফাগুয়ার গায়ের জোর বুদ্ধির জোর দুই-ই আছে। সে মাটিতে বসল। কুমার তার কাঁধে পা দিয়ে উঠে পড়ল মোষের পিঠে। মোষের পিঠে চড়ে ঘুরল খানিকক্ষণ।

তারপর বলল, "আমি ওই ঝুরি ধরে দুলব—" ফাগুয়ার সাহায্যে ঝুরি ধরে দোলও খেল সে খানিকক্ষণ।

তারপর ঝুমরি সুনরিকে দেখিয়ে বলল, "ওরা কে?"

"ওরা আমার বোন। ঝুমরি আর সুনরি।"

"ওদের সঙ্গে গিয়ে একটু খেলে আসি?"

"বেশ তো যাও না—চল আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

সেই ধুলো কাদার মধ্যে গিয়ে চাপটালি খেয়ে বসল কুমার। হাতে যেন স্বর্গ পেল।

ফাগুয়া কুন্ঠিতকণ্ঠে বলল—"আমাকে তোমার মোটরে চড়াবে খোকাবাবু?"

"বেশ তো গিয়ে চড় না।"

ঝুমরি স্নরি বললে—"আমরাও চড়ব।"

"খোকাবাবু, তুমি ততক্ষণ ধূলো দিয়ে ঘর বানাও, আমরা মোটরে চড়ি গিয়ে—"

"বেশ—"

একছুটে চলে গেল তারা তিনজন। মোটরের কপাট খোলাই ছিল। ঝুমরি স্নরি বসল পিছনের সীটে আর ফাগুয়া বসল স্টীয়ারিং ধরে।

একটু পরেই আর্ত চীৎকার শুনে চমকে উঠল কুমার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিজয় ফিরেছে আর মারছে ওদের। ছুটতে ছুটতে কুমার গিয়ে হাজির হল সেখানে। দেখল ফাগুয়াকে বিজয় এমন মেরেছে যে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। ঝুমরি আর স্নরির গালে চড়ের দাগ।

"ছেড়ে দাও ওদের। আমিই ওদের বসতে বলেছিলাম—"

বিজয় বললে—"ছি, ছি, কি কাণ্ড তুমি করেছ কুমারবাবু! তোমার জামায় কাপড়ে এত ধূলো, এত কাদা, জুতো ভিজে গেছে—রানী-মা আমাকে কি বলবেন—"

সেইদিনই বিজয়ের চাকরি গেল।

তার জায়গায় বহাল হল সরদার শার্দুল সিং।

এখনও কুমারের মোটর সেই মাঠে চক্কোর দেয়। কুমার দূর থেকে দেখতে পায় ফাগুয়া আর ঝুমরি-স্নরিকে। কিন্তু আর তাদের কাছে সে যেতে পারে না। শার্দুল সিং খুব কড়া লোক।

ওদের মাঝখানে যে অদৃশ্য প্রাচীরটা ছিল সেটা একদিনের জন্য হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছিল। আবার মেরামত করে দিয়েছেন সেটাকে রানী-মা। আর ভাঙবার আশা নেই। কুমার ভাবে—কেন এই অদ্ভুত নিয়ম। ফাগুয়া আর ঝুমরি-স্নরিও তাই ভাবে।

গুলি

রবার্ট ব্রুস একবার উর্ণনাভের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি বার বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এক গুহায় লুকিয়ে বসে ছিলেন। সেখানে তাঁর চোখ পড়েছিল একটা উর্ণনাভ বারবার সুতো বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছে আর বারবার পড়ে যাচ্ছে। সে কিন্তু হতাশ বা নিরুদ্যম হয়নি। তার অধ্যবসায় শেষকালে জয়ী হয়েছিল। সুতো বেয়ে উপরে উঠতে পেরেছিল সে। পরাজিত রবার্ট ব্রুস এ দেখে উৎসাহিত হলেন, পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করলেন এবং জিতলেন।

আমি সেদিন রাত্রে যা দেখলাম তা ঠিক এ জাতীয় জিনিস নয়, কিন্তু তাতে আলোকের ইঙ্গিত আছে।

ঘুম হচ্ছিল না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। এমন সময় বাজখাঁই গলায় কে যেন ডাক দিলে—"ডাক্তার, জেগে আছ নাকি ?"

তাড়াতাড়ি উঠে কপাটটা খুলে দিলাম। একটি দিব্যকান্তি পুরুষ ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

"আমাকে চিনতে পারলে না বোধ হয়—"

"না। কোথায় আলাপ হয়েছিল বলুন তো ?"

"তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ ছিল। আমি যখন বিখ্যাত ছিলাম, তখন তোমার জন্ম হয়নি। গুলিখোর তিনু গোঁসাইয়ের নাম শুনেছ কি কখনও—?"

মনে পড়ল শুনেছি। বাবার বৈঠকখানায় উনি বসতেন এসে, আর খুব মজার মজার গল্প বলতেন।

বললাম—"আসুন, বসুন। এত রাত্রে এসেছেন যে, কোন দরকার আছে নাকি ? অসুখ বিসুখ করেছে নাকি কারো—"

চেয়ারে বসে মৃদু হেসে বললেন—"রাত্রিই এখন আমাদের দিন! অন্ধকারই আলো। অন্ধকারই দরকার। আর অসুখের কথা বলছ, সুখ কোথায়, সবই তো অসুখ। তোমার বাবাকে এককালে অনেক গল্প শুনিয়েছিলুম। সবাই হেসেছিল তা শুনে। এখন মনে হচ্ছে আমার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছিল তা গল্প নয় ভবিষ্যদ্বাণী। অহিফেন-প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলুম। তোমাকেও বলি কয়েকটা—"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তাঁর মুখের দিকে। তিনি বললেন—"অনেকদিন আগে আমি একটা দোতলার ঘরে বাস করতুম। ঠিক আমার নিচের ঘরেই থাকত একটা দরজি। সে ছুঁচ দিয়ে হাতের কাজ করত। সে যতক্ষণ কাজ করত আমি চমকে চমকে উঠতুম। সবাই জিগ্যেস করত—'কি তনুদা অমন চমকাচ্ছ কেন ? কি হল তোমার ?' আমি বলতাম—ওই ছুঁচটা এসে লাগতে পারে তো। তারা হা হা করে হাসত শুনে। কিন্তু এখন দেখ সেই ছুঁচই কাল নয় বর্শা হয়েছে, বুকে এসে বিঁধছে।"

তিনু গোঁসাইয়ের চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম চকচক করতে লাগল। খানিকক্ষণ নির্নিমেষ চেয়ে থেকে বললেন—"আর একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। একদিন রাত্রে গুলির আড্ডা থেকে ফিরছি। একটা গলির ভিতর ঢুকেছি। হঠাৎ সামনে দেখি এক গাড়ি বাঁশ। চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল, নেশা ছুটে যাবার উপক্রম। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়ালাম। ধাক্কাটা লাগল, কিন্তু পিছন দিক থেকে। তখন চোখ খুলে দেখি সকাল হয়ে গেছে, বাঁশের গাড়ি অনেকক্ষণ চলে গেছে। আমি একজনের কপাটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, সে-ই কপাট খুলতে গিয়ে ধাক্কা মেরেছে আমাকে। আমি তখন বলেছিলাম, জানতাম ধাক্কা লাগবেই, ভাগ্যি ভাল তাই চোখটা বেঁচে গেছে। ইংরেজের বাঁশের গাড়ি অনেকক্ষণ চলে গেছে, ধাক্কা খাচ্ছি আমরা এখন পিছন

দিকে ঘরের লোকের কাছ থেকে। এবারেও চোখটা বেঁচে গেছে, শুধু বাঁচেনি ভাল করে খুলে গেছে—"

হা হা করে হেসে উঠলেন তিনু গোঁসাই। আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। এ যে অট্টহাস্য। আমার মনে হতে লাগল গুলিখোরের ধরণ-ধারণ তো এ রকম হয় না। তারা সাধারণত চোখ বুজে নিঝ্‌ঝুম হয়ে থাকে। হঠাৎ অট্টহাসি থামিয়ে তিনু গোঁসাই স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

"আর একটা গল্প শোনাই তোমাকে। আমি তখন গঙ্গা পেরিয়ে আমাদের এক আড্ডায় যেতাম গুলি খেতে। চারটে পয়সা কাছায় বেঁধে নিয়ে যেতাম। পারানীর পয়সা। পাছে খরচ করে ফেলি সেইজন্য কাছায় বেঁধে নিয়ে যেতাম। কিন্তু নেশার ঝোঁকে একদিন সেটাও খরচ হয়ে গেল। ফিরবার সময় মাঝি ব্যাটা কিছুতেই পার করে দিলে না। তাকে বললাম—কাল পারানীর পয়সা দিয়ে যাব। কর্ণপাত করলে না আমার কথায়। আমাকে সমস্ত রাত গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরে বেড়াতে হল। সেদিন একটা কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল বাহাদুর লোক বটে হনুমান। গন্ধমাদন পর্বতের দরকার হয়েছিল, মাথায় করে বয়ে আনলে তাকে। দরকার যেই শেষ হয়ে গেল অমনি যেখানকার গন্ধমাদন সেইখানে রেখে এল। কিন্তু ভগীরথ লোকটা করলে কি ! পূর্ব-পুরুষদের উদ্ধার করবার জন্যে স্বর্গ থেকে টেনে আনলে গঙ্গাকে। পূর্বপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল, যেখানকার গঙ্গা সেইখানে রেখে আয়। তুই যে দেশময় গঙ্গাকে ছেড়ে দিয়ে গেলি এখন আমরা পেরিয়ে বাড়ি যাই কি করে। আমাদের নেতারাও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একটি মেকি স্বাধীনতার গঙ্গা এনেছেন বিলেতের স্বর্গ থেকে। সে গঙ্গা এখন দেশময় ছড়িয়ে গেছে, তার প্রবল বন্যায় দেশ ডুবে গেল, সে গঙ্গা পেরিয়ে পালাবারও উপায় নেই। কি বিপদ বল দিকি !"

ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ আবার বললেন, "আর একটা গল্প মনে পড়ল। একবার আমি আর তেনা গুলি খেয়ে ফিরছি। বেশ রাত হয়েছে। চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের। একটা সরু গলি দিয়ে যাচ্ছি দু'জনে। হঠাৎ তেনা থমকে দাঁড়িয়ে তরতর করে পেছিয়ে গেল। আমিও গেলুম। তারপর তাকে জিগ্যেস করলুম—কি রে অমন ভাবে পেছিয়ে গেলি কেন ? সে চোখ বড় বড় করে তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই দেখ। ওটা কি বল দেখি ? দেখলাম রাস্তার উপর আড় হয়ে কি যেন একটা পড়ে আছে। তেনাকে বললুম—একটা ঢিল ছোঁড় না। যদি ওড়ে তাহলে বুঝবি ঘুঘু তা না হলে নিশ্চয় উট। আসলে সেটা ছিল একটা আধ-ভাঙ্গা ইঁট। এদের কি উপমা দেব তাতো মাথায় আসছে না। এদের প্রথমে যা মনে হয়েছিল এখন দেখছি তা নয়, কিন্তু এদের আসল স্বরূপ যে কি তাও তো বুঝতে পারছি না।"

একটু ইতস্তত করে জিগ্যেস করলাম—"আপনি আমাকে এসব বলছেন কেন ?"

"নিজের ঢাক পেটাবার জন্যে। আমাকে গুলিখোর বলে সবাই ঠাট্টা করত এককালে। কিন্তু আমার কথাগুলো যে আসলে ভবিষ্যদ্বাণী সেইটে জাহির করবার জন্যে তোমার কাছে এসেছি। এখন যারা নিজেদের ঢাক পেটাচ্ছে—তারা তো গাঁজাখোর গুলিখোরদেরও কান কেটে দিয়েছে। জোঁক বলছে, দেখ আমি কেমন লম্বা হতে পারি, সরু হতে পারি, চেপ্টা হতে পারি, গোল হতে পারি, আমাকে তোমার গলার হার কর।' আমি যখন প্রথম গুলি খেতে শিখি তখন রাত্রে বাড়ি ফিরে লাঠিটাকে বিছানায় শুইয়ে নিজে সারারাত কোণে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মায়ের কাছে এজন্য কত বকুনি খেয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি আমি ঠিকই করতাম। লাঠিরই তো জয়জয়কার আজকাল। শুধু বিছানায় কেন সিংহাসনে সবাই বসিয়েছে তাকে। আমি গুলির ঝোঁকে যা করেছিলাম তা সত্যি হয়ে গেছে। তাই আমার একটা কথা মনে হয়। আশা হয়—"

স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন তিনু গোঁসাই।

"কি আশা হয়—?"

"আশা হয় যে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীকমলাকান্ত শর্মার স্বপ্নও হয়তো সফল হবে একদিন।"

"কি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি?"

"কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' পড়নি? শোন—"

তিনু গোঁসাই গড়গড় করে বলে গেলেন—"কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি। এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হঁ্যা, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকা রূপিণী—অনন্ত-রত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এই মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা..... "

তিনু গোঁসাই চুপ করে গেলেন।

তারপর মৃদু হেসে বললেন—"গুরুদেবের এ স্বপ্ন সফল করতে গেলে আরও অনেক গুলি খেতে হবে।"

"গুলি ?"

"হ্যাঁ গুলি। কিন্তু আফিমের নয়, সীসের। এইবার আমি চলি। তুমি দেশের কথা ভেবে ছটফট করছ দেখে তোমার কাছে এসেছিলাম। এবার উঠি—"

"কোথায় থাকেন আপনি ?"

"ওপারে।"

মৃদু হেসে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন তিনি।

রঘুনাথের ভাগ্য

রঘুনাথ তালুকদার ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছিল। ভাগ্যলিপি ললাটেই লেখা থাকে, ইহাই জনশ্রুতি, কিন্তু ইহাও সুবিদিত যে, সে লিপির অর্থ কোথায় সার্থক হইবে তাহা অন্বেষণ-সাপেক্ষ। যাহার জন্ম বঙ্গদেশে, তাহার ভাগ্য হয়ত বোম্বাই শহরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। যাহার জন্ম শহরে, তাহার ভাগ্যোদয় হইল হয়ত অরণ্যে। যে সব ভাল ছেলে একের পর এক পরীক্ষার বেড়াগুলি কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে সাফল্যের সম্মুখীন হয়, রঘুনাথ সে দলের ছেলে নয়। সে একটা পরীক্ষাতেও পাশ করিতে পারে নাই। পাঠ্য পুস্তকগুলির কাঠিন্য এবং বুদ্ধির দুর্বলতাই যে কেবল তাহার সাফল্যের অন্তরায় হইয়াছিল তাহা নয়, তাহার পিতামহ, পিতামহী এবং পিসিমাও বাণী-মন্দিরের পথে উত্তুঙ্গ বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বদ্ধ ধারণা ছিল, লঘু রামায়ণ-মহাভারতটা যদি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে তাহা হইলেই শিক্ষার চরম হইল. স্কুল কলেজে পড়িয়া আর কি হইবে ? ওই তো ঘোষেদের বাড়ীর ক্যাবলা এম-এ পাশ করিয়াও ক্যাবলাই থাকিয়া গিয়াছে, একটি পয়সা উপার্জন করিতে পারে না, নানারকম কিম্ভূতকিমাকার পোষাক পরে আর চালিয়াতি করে। বস্তু কিছু নাই। তাঁহারা আরও বলিতেন, রঘুর ভাবনা কি ? তাহার দাদা প্রভু নিশ্চয় রঘুকে ত্যাগ করিবে না। সে শ্বশুরবাড়ী হইতে যে বিষয় পাইয়াছে তাহাতে দুই ভাইয়ের হাসিয়া খেলিয়াই সারাজীবন চলিয়া যাইবে। রঘুর পিতামহ, পিতামহী এবং পিসীমা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন সত্যই রঘুর হাসিয়া-খেলিয়াই চলিয়াছিল। সে গাছে চড়িত, পুকুরে সাঁতার দিত, বন্দুক দিয়া পাখী শিকার করিত, ফুটবল খেলিত, যে কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অগ্রণী হইত এবং রামায়ণ শুনিত। রামায়ণ পড়িবার মতো বিদ্যা তাহার ছিল না, পাড়ার ঠাকুর-মহাশয় প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ করিতেন, তাহাই শ্রবণ পথে প্রবেশ করিয়া রঘুর চিত্ত-সংস্কার করিত।

এইভাবে কিছু দিন বেশ চলিল। কিন্তু পিতামহ-পিতামহী-পিসীমা কেহই অমর ছিলেন না। যথাকালে তাঁহারা সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন। পিসীমাই সর্বশেষে গেলেন। তখন রঘুর বয়স বাইশ বৎসর। অতঃপর প্রভুর স্বরূপ প্রকটিত হইল। দেখা

গেল তিনি মহাপ্রভু। সংক্ষেপে একদিন বলিয়া দিলেন—গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া এতদিন তোমাকে অনেক খাওয়াইয়াছি, পরাইয়াছি, তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। আর করিব না। এইবার তুমি নিজের রাস্তা দেখ।

রঘুনাথ সহজে নিজের রাস্তা দেখে নাই। প্রভুর ঐশ্বর্যে ঈর্ষ্যাক্লিষ্ট এক উকিলের সহায়তায় প্রায় বিনা খরচে মামলা মোকদ্দমাও করিয়াছিল, কিন্তু কিছু হয় নাই। প্রভুর শ্বশুর কন্যাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা কন্যার নামেই স্ত্রী-ধন স্বরূপ দিয়াছিলেন, রঘু তাহার কিছুই পাইল না। রঘুর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল বসতবাড়ীখানি এবং তিন বিঘা ধেনো জমি। তাহারই অর্ধাংশ সে পাইল। কিন্তু এরূপ হৃদয়হীন দাদা বৌদিদির সান্নিধ্য রঘু সহ্য করিতে পারিল না। সে তাহার অংশটুকু উক্ত উকিলকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া একদিন বাড়ির বাহির হইয়া পড়িল। উকিল মহাশয় তাহাকে পাঁচশত টাকা মাত্র দিয়াছিলেন!

এই পাঁচ শত টাকা সম্বল করিয়া রঘু নানা স্থানে ঘুরিল, নানা ঘাটের জল খাইল, নানা লোকের সহিত আলাপ করিল। দেখিল, রামায়ণে যদিও রামকে আদর্শ পুরুষ বলা হইয়াছে এবং এদেশে রাম মহিমা যদিও বহুকাল হইতে কীর্তিত হইতেছে, কিন্তু কার্যকালে কেহই রামের মতো হইতে চায় না। রাবণের মতো হইবার দিকেই সকলের বেশি ঝোঁক। সকলেই ধন চায়, মান চায়, প্রতিপত্তি চায়, সকলের উপর, এমন কি ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি বরুণের উপরও প্রভুত্ব করিতে চায়। পর-স্ত্রীকে হরণ করিয়া বা ফুসলাইয়া ভোগ করিবার ইচ্ছা বেশীর ভাগ লোকেরই। এই নিদারুণ সত্য আবিষ্কার করিয়া রঘু কিন্তু দুঃখিত হইল না, তাহার মনেও বাসনা জাগিল, সে-ও রাবণ হইবে। যেদিন এ বাসনা তাহার মনে জাগিল সেদিন সে দেখিল, তাহার পকেটে মাত্র একটি আড়ময়লা দশ টাকার নোট আছে। মাত্র এই সম্বল লইয়া রাবণ হওয়া যায় না, অনতিবিলম্বে অমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে হইবে। কিন্তু কিরূপে? বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে সহসা তাহার চমকলালের কথা মনে পড়িল। কিছু দিন পূর্বে সে তাহাকে একটি পত্রও লিখিয়াছিল। তাহার ঠিকানা জানা আছে। তাহার কাছে গেলে কেমন হয়? সে নাকি 'বিজনেস্' করিয়া লাল হইয়াছে এবং সকলকে চমকাইয়া দিয়াছে। সার্থকনামা ব্যক্তি। পুরাতন বন্ধুও। রঘুনাথ তাহার নিকট যাওয়াই স্থির করিল।

চমকলালের সহিত রঘুনাথের ঘনিষ্ঠতার আদি কারণ লোভ। চমকলাল বৈষ্ণব বংশের সন্তান। তাহাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় মাছ মাংসের নামোচ্চারণ পর্যন্ত করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু কুসঙ্গে মিশিয়া চমকলাল মাছ-মাংসের স্বাদ পাইয়াছিল। সুবিধা পাইলেই লুকাইয়া-চুরাইয়া ওই নিষিদ্ধ আমিষগুলি সে সানন্দে ভক্ষণ করিত। কিন্তু তাহার সবিশেষ লোভ ছিল পক্ষীমাংসের প্রতি। এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিত রঘুনাথ। রঘুনাথ পক্ষীশিকারে সিদ্ধহস্ত ছিল। রঘুনাথেরও পক্ষী লইয়া বাড়ীতে যাইবার উপায় ছিল না। কারণ পিতামহী অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। সুতরাং পক্ষী-শিকার করিয়া

প্রায়ই তাহা বাগানে, মাঠে বা ঝিলের ধারে ঝলসাইয়া গলাধঃকরণ করিতে হইত। চমকলাল এইভাবে এককালে অনেক ঘুঘু-পোড়া খাইয়াছে। রঘুনাথ ঘুঘুই বেশি শিকার করিত, হাঁস, তিতির বা হরিয়াল বড় একটা জুটিত না। ঘুঘুর মাধ্যমে উভয়ের প্রণয়টা বেশ জমাট বাঁধিয়াছিল।

চমকলাল বলিল, "তোকে ত এক্ষুণি একটা খুব ভাল কাজ দিতে পারি, কিন্তু তুই পারবি কি ?"

"পারব না কেন, কি কাজ--"

চমকলাল কয়েক মুহূর্ত স্থির-দৃষ্টিতে রঘুনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "কিছু বলবার আগে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমার কাজ যদি ভাল না লাগে ছেড়ে দিতে পার, কিন্তু আমাদের কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করতে পাবে না। যদি কর প্রাণ যাবে। এতে রাজি ?"

"প্রাণ যাবে ?"

"প্রাণ যাবে। তোমারও যাবে আমারও যাবে—"

"কি রকম রোজগার হবে এতে ?"

"বছর খানেকের মধ্যেই লক্ষপতি হতে পারবে।"

"বলিস্ কি ! রাজি আছি। প্রতিজ্ঞা করলাম আমার দ্বারা কখনও কিছু প্রকাশ হবে না।"

"তামা তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।"

রঘুনাথ তাহাই করিল। তামা তুলসী গঙ্গাজল চমকলালের বাড়ীতেই ছিল।

তখন চমকলাল বলিল—"আমাদের কাজ হচ্ছে নোট জাল করা। জার্মানী থেকে ভাল মেশিন আনিয়েছি, দশ টাকার নোটই জাল করছি এখন। কিছুদিন পরেই একশ টাকার নোটে হাত দেব। নোট ম্যানুফ্যাকচার হয় এক জায়গায় আর সেগুলোকে পাচার করতে হয় নানা জায়গা থেকে। তোমাকে একটা সেণ্টারের চার্জে দিতে পারি। জায়গাটা বড় নির্জন, সেখানে থাকবার মতো বিশ্বাসযোগ্য কোনও লোকই পাচ্ছি না।

"আমাকে কি করতে হবে ?"

"সেখানে আমাদের একটা কাছারি আছে, সেই কাছারিতে তোমাকে ম্যানেজার সেজে যেতে হবে। কাছারি এককালে আমাদের জমিদারীর কাছারি ছিল। এখন কেউ থাকে না। এর সঙ্গে নোট জালের কোন সম্পর্ক নেই। কাছেই পাহাড় আর নদী আছে। তোমার কাজ হবে, সেই নদীর উপরে গেরুয়া রঙের পাল-তোলা কোনও নৌকো আসছে কিনা লক্ষ্য করা। নৌকো দেখলেই তাকে ডাকবে এবং জিজ্ঞেস করবে, খড়্কে বাটা মাছ আছে ? সেটা যদি আমাদের নৌকো হয় তাহলে মাঝি বলবে—আছে, কিন্তু সবাইকে বেচি না। আপনি যদি ভাল দাম দেন, দিতে পারি। তখন তুমি তিন-কোণা পিতলের চাকতিটি বার করে তাকে দেখাবে। সে তৎক্ষণাৎ চাকতিটি নিয়ে

একটি ছোটো বাক্স তোমাকে দেবে। সেই বাক্সর ভিতর নোট আছে। বাক্সটি নিয়ে তুমি পাহাড়ের উপর চলে যাবে আর সেখানে একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে, সেই জায়গায় রেখে চলে আসবে। তার পরদিন দেখবে, বাক্সটি সে জায়গায় নেই, তার জায়গায় নগদ একশোটি টাকা রয়েছে। এই টাকাটি তোমার নগদ মজুরি। এ ছাড়া বিজনেসের শেয়ারও তোমাকে দেব। কাছারির ম্যানেজার হিসাবে দু'শো টাকা মাইনে এবং খাওয়া-দাওয়ার খরচও পাবে।"

"পিতলের তিন-কোণা চাকতি কোথায় পাব?"

"আমিই দেব। নম্বর দেওয়া অনেক চাকতি আছে আমাদের। কিন্তু আর একটি অসুবিধা আছে। খাওয়ার খরচ আমরা দেব বটে, কিন্তু সেখানে চাকর বা রাঁধুনী রাখা চলবে না। স্বপাক খেতে হবে। মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রাম আছে, সেখানে জিনিস-পত্র পাওয়া যায়। একটা সাইকেল রেখো, তাহলেই সহজে আনতে পারবে। আমিই দেব একটা সাইকেল তোমাকে। একটা বন্দুক আর একটা বাইনোকুলারও দেব।"

রঘুনাথ অবাক হইয়া শুনিতেছিল।

বলিল, "এ যে উপন্যাসের মতো শোনাচ্ছে!"

"উপন্যাস ত কল্পনা, আর এটা হল সত্যি, সুতরাং উপন্যাসের চেয়েও ভাল। তুই রাজি আছিস্ ত? একা নির্জন-বাস করতে হবে কিন্তু।"

"তুমি মাঝে মাঝে যাবে ত?"

"কখনও সখনও যাব। আমাকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হয়, তোমার ওখানে যাবার পালা যখন আসবে তখন যাব। রাজি ত?"

"রাজি।"

দুই

স্থানটি রঘুনাথের বড়ই ভাল লাগিল। মনোরম স্থান। শুধু যে নদী, পাহাড় এবং অরণ্য সৌন্দর্যের জন্যই মনোরম তাহা নয়। রঘুনাথের মনে হইতে লাগিল, একটা অনির্বচনীয়, অনবদ্য শোভা যেন চতুর্দিক হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, সে শোভার বর্ণনা করা যায় না, তাহা চক্ষুগ্রাহ্য নহে, সূক্ষ্মরূপে তাহা সমস্ত অনুভূতিকে আবিষ্ট করে। রঘুনাথের মনে হইতে লাগিল, সে যেন কোন দেবস্থানে আসিয়াছে। একটা অদৃশ্য মহিমা, অবর্ণনীয় পবিত্রতা যেন সমস্ত স্থানটাকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বড় বড় পাহাড়, বিরাট বিরাট বনস্পতি, এমন কি ওই চটুলা নদীটা পর্যন্ত যেন সসম্ভ্রমে কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। রঘুনাথও অভিভূত হইল।

যে কাজের জন্য রঘুনাথ আসিয়াছিল, সে কাজও বেশ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছিল। সে

মাত্র একমাস আসিয়াছে, এই একমাসের মধ্যেই গেরুয়া-পাল-তোলা নৌকা বার পাঁচেক দেখা দিয়াছে। প্রথম তুইবার নৌকায় গেরুয়া রঙের পাল ছিল কিন্তু পরে সাদা পাল উড়াইয়াই নৌকা আসিয়াছে। কারণ, যে লোকটি নোটের বাক্স লইয়া আসে, তাহার সহিত জানা-শোনা হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, "নতুন লোকের কাছেই আমরা প্রথম প্রথম গেরুয়া পাল উড়িয়ে যাই। পরে আর দরকার হয় না। বার বার গেরুয়া পাল উড়িয়ে আসাটা নিরাপদও নয়, পুলিশের সন্দেহ হতে পারে।"

রঘুনাথ সাধারণতঃ পাহাড়ে পাহাড়ে কাটাইত। ইহার প্রথম কারণ, পাহাড়ের উপর হইতে সমস্ত নদীটা দেখা যায়। দ্বিতীয় কারণ, ওই পাহাড়ী জঙ্গলে প্রচুর পাখী। ঘুঘু, বন-পায়রা, তিতির প্রায়ই শিকার করিত সে। দিনের বেলা রান্নার হাঙ্গামা সে করিত না। রাঁধিত রাত্রে, পাখীর মাংস আর আলোচালের ভাত। দিনের বেলা সে চিঁড়া-মুড়ি দই-মিষ্টি খাইয়া কাটাইয়া দিত। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া সে বন্দুক কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া পড়িত এবং সমস্ত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে পাখির পিছনে পিছনে ঘুরিত। বস্তুতঃ, শিকার করিবার সুযোগ না থাকিলে রঘুনাথ এই নির্জন নির্বান্ধব স্থানে টিঁকিতে পারিত কিনা সন্দেহ এবং এই শিকারের সূত্র ধরিয়াই সে একদিন তাহার অদ্ভুত আবিষ্কারটা করিয়া ফেলিল।

রঘুনাথ সাধারণতঃ নদীর তীরের পাহাড়গুলির উপরই বিচরণ করিত। কিন্তু এ পাহাড়গুলির পিছনেও আরও অনেক পাহাড় ছিল, অনেক বড় বড় পাহাড়। রঘুনাথ মধ্যে মধ্যে পাহাড়গুলির দিকে প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিত। তাহার মনে হইত, ওখানে নিশ্চয় আরও নানারকম পাখি আছে। সে দূর হইতে কয়েকবার ময়ূরের ডাক শুনিয়াছে, বন্য মুরগীর ডাকও শুনিয়াছে। তাহার ধারণা, ফ্লরিকানও ওই জঙ্গলে নিশ্চয়ই আছে। ফ্লরিকানের মাংস এক জমিদার বন্ধুর কৃপায় একবার খাইয়াছিল! চমৎকার! স্বাদটা যেন আজও মুখে লাগিয়া আছে। সে মনে মনে রোজই বলিত—ওই পাহাড়গুলো একবার ঘুরে দেখতে হবে।

একদিন সে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। যে পাহাড়ে সে রোজ ওঠে সেই পাহাড়ের গা বাহিয়া সে ধীরে ধীরে নামিতেছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, এই পাহাড় হইতে নামিয়া দুই পাহাড়ের মধ্যে যে অরণ্যটা আছে সেটা পার হইয়া ওপারের পাহাড়টায় চড়িবে. কিন্তু কিছুদূর নামিতেই বাধা পড়িল। ভয়ঙ্কর বাধা। কোথা হইতে বিরাট একটা গোক্ষুর সর্প আসিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। রঘুনাথ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সাপটা কিন্তু তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল না। ফণা তুলিয়া মূর্তিমান নিষেধের মতো একস্থানে স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে তুলিতে লাগিল। রঘুনাথ শিকারী মানুষ, তাহার লোভ হইল, ওটাকে খতম করিয়া দিলে কেমন হয়। দো-নলা বন্দুকে গুলি ভরাই ছিল, ফায়ার করিল। রঘুনাথের হাতের লক্ষ্য সাধারণতঃ অব্যর্থ হয়। কিন্তু এবার ব্যর্থ হইল। গুলি লাগিল না, সাপটাও

দাঁড়াইয়া রহিল। আর একবার ফায়ার করিল রঘুনাথ। এবারও লাগিল না। সাপটা কিন্তু ফণা তুলিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভাবটা যেন কতবার মারিবে মার না, দেখি তোমার দৌড় কতদূর। রঘুনাথ সভয় বিস্ময়ে সাপটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর ফায়ার করিতে সাহস করিল না। সাপটা আরও খানিকক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচের জঙ্গলে মিলাইয়া গেল। ইহার পর যে সব বিস্ময়কর ঘটনা-পরম্পরা রঘুনাথের সাধারণ বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল, এই ঘটনাটিতেই তাহার সূত্রপাত, কিন্তু এটিকে রঘুনাথ অলৌকিক বলিয়া একবারও মনে করে নাই। সে বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে বিস্ময় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে নাই।

দ্বিতীয় দিন রঘুনাথ পাহাড় হইতে নামিবার চেষ্টা করিল না। সে সমতলের উপর দিয়াই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অরণ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দূরবর্তী যে দোকান হইতে সে প্রত্যহ খাবার আনিতে যাইত, সেই দোকানের মালিককে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ওই বড় বড় পাহাড়গুলিতে ওঠা যায় কি না. গেলে কোন্ পথ দিয়া ওঠা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই পাহাড়ের মাঝে যে জঙ্গল আছে সেই জঙ্গলের ভিতর সরু পথ আছে একটা। অনেক ঘুরিয়া সেখানে পৌঁছিতে হয়। রাস্তাটা তিনি বলিয়া দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন. "ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। দু' একজন যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, মারা পড়েছে—"

"তাই না কি? কাল একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ দেখেছিলাম।"

"অনেক কিছু আছে ওখানে। এ অঞ্চলের কোনও লোক ওদিকে যায় না। ওই জঙ্গলের ভিতর শিকার করবার মতো অনেক জন্তু-জানোয়ার আছে. শিকারীর পক্ষে খুব লোভনীয়, কিন্তু আমার মনে হয় না যাওয়াই ভাল।"

"সঙ্গে আমার বন্দুক থাকবে, জানোয়ারকে ভয় করি না।"

"ভয়টা ঠিক জানোয়ারের নয় —"

"তবে?"

দোকানদার একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "সবাই বলে ওখানে দেবীজি আছেন।"

"দেবীজি কি? মেয়ে মানুষ?"

"তাই ত শুনি। আমি নিজের চোখে দেখিনি কখনও। কেউই বোধহয় দেখেনি। কিন্তু গুজব যে ওই পাহাড়ের এক গুহায় এক দেবীজি থাকেন—"

রঘুনাথ দোকানদারের নিকট ইহার বেশি আর কোনও খবর পায় নাই। দোকানদার যদিও তাহাকে যাইতে বারণ করিয়াছিল কিন্তু সে বারণে সে কর্ণপাত করিল না। সে আরও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। অজানার আহ্বান তাহাকে উতলা করিয়া তুলিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ওই অরণ্যের গহনে কি রহস্য পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহা দেখিতেই হইবে—একটা জেদ যেন তাহাকে পাইয়া বসিল।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই যাত্রা করিল সে। অনেক দূর হাঁটিয়া যখন সে জঙ্গলের একপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল তখনও পর্যন্ত তাহার বিশেষ কিছু মনে হয় নাই। সে নির্ভয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। শাল বন। ছোট বড় অনেক শালগাছ এবং অসংখ্য ছোট ছোট গুল্ম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই কিন্তু তাহার মনে হইল—ঠিক কি যে মনে হইল তাহা তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে হয়ত বলিতে পারিত না—কিন্তু তাহার মনে হইল, সে যেন অনধিকার প্রবেশ করিতেছে। একটা অদৃশ্য বাধার প্রাচীর যেন স্থানটাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর তাহার মনে হইল—না, এভাবে সময় নষ্ট করা ত ঠিক হইতেছে না। এতদূর যখন আসিয়াছি শেষ পর্যন্ত যাইব। কিন্তু সে যাইতে পারিল না। যাইবার উপক্রম করিতেই একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সম্মুখের সু-উচ্চ শালগাছে একটা বিরাটকায় বন্য-কুক্কুট উড়িয়া আসিয়া বসিল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল - কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ। রঘুনাথ শিহরিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, যেন কোন প্রহরী সতর্ক করিয়া দিতেছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু আত্মস্থ হইল সে। বন্দুক হাতে আছে, ভয় কি। উপর্যুপরি দুইবার ফায়ার করিল। কিছুই হইল না মোরগের, একটি পালক পর্যন্ত পড়িল না। সগর্বে মাথা তুলিয়া সে আর একবার ডাকিয়া উঠিল – কোঁকর কোঁ ···। সাপটার কথা মনে পড়িল রঘুনাথের। তাহারও ত গায়ে গুলি লাগে নাই, সে-ও ত এমনি স্পর্দ্ধাভরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে আর বন্দুক তুলিতে সাহস করিল না। ভাবিল —থাক না মোরগটা, যত ইচ্ছা ডাকুক, আমি বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়ি। কিন্তু সে ঢুকিতে পারিল না! পা তুলিতেই ঘড়ঘড়ঘড় ঘড় একটা আওয়াজ হইল, রঘুনাথের মনে হইল কর্কশকণ্ঠে কে যেন হাসিতেছে। চোখ তুলিয়াই রঘুনাথের বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। বিরাট একটা ভালুক পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া সামনের পা দুইটি দুই হাতের মতো দুইদিকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে। তাহার চোখ-মুখের ভাব যেন—খবরদার, আর এক পা-ও এগিও না। রঘুনাথ উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। মোরগটা আবার ডাকিয়া উঠিল। রঘুনাথের মনে হইতে লাগিল, সেই ঘর্ঘর-হাসিটা যেন তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই।

পরদিন সে আর অরণ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিল না। কিন্তু তাহার কৌতূহল শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। সেদিন নদীর ধারের যে পাহাড়টার উপর সে রোজ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই পাহাড়েই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বাইনোকুলার দিয়া দূরের পাহাড়টাকে, পাহাড়ের পাদদেশের ঘন অরণ্যকে দেখিতে লাগিল বারবার। দেখিয়া দেখিয়া যেন আশা মিটিতেছিল না, কিন্তু এই রহস্যের উপর আলোকপাত করিতে পারে এমন কিছুই তাহার চোখে পড়িল না। মাঝে মাঝে নদীর দিকেও সে দেখিতেছিল, কোন নৌকা আসিতেছে কিনা। এমন সময় হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস তাহার চোখে পড়িল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অরণ্যের একটা অংশ কিছুদূরে গিয়া নদীতীরাভিমুখী হইয়াছে। এ

জঙ্গল খুব ঘন নহে। একটা সরু পথের দুইপাশে সারি সারি কয়েকটা উচ্চশীর্ষ দেবদারু গাছ একটা বীথিকা সৃষ্টি করিয়াছে। জনশ্রুতি, ওই পথ দিয়া একটি বাঘ নদীতে জল খাইতে আসে। সেজন্য ও পথের কাছাকাছি কেহ যাইতে চাহে না। রঘুনাথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সেইদিকে একদল পাখী ধীরে ধীরে উড়িয়া চলিয়াছে। এক-রকম পাখী নয়, নানারকম পাখী অদ্ভুত শ্রেণীবদ্ধ শৃঙ্খলায় যেন একটি বিচিত্র বর্ণাঢ্য চন্দ্রাতপের ন্যায় আকাশপথে ভাসিয়া চলিয়াছে। চতুর্দিকে প্রখর রৌদ্র, কিন্তু ওই পাখীর চন্দ্রাতপ খানিকটা ছায়াময় করিয়াছে আর সেই ছায়ায় হাঁটিয়া চলিয়াছেন এক অপরূপ লাবণ্যময়ী নারী। তাঁহার পিছনে পিছনে একটা দৈত্য কাপড়-গামছা এবং একটি উজ্জ্বল কলস বহন করিয়া চলিয়াছে। আরও ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া রঘুনাথের মনে হইল, দৈত্যটি একটি বিরাটকায় হনুমান এবং কলসটি সম্ভবতঃ সোনার। বিস্মিত রঘুনাথ আরও দেখিল, সেই নারী যখন দেবদারু-বীথিকার সমীপবর্তী হইলেন তখন দেবদারু গাছগুলি মাথা নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রঘুনাথ অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিল, তিনি ধীরে ধীরে নদীতে নামিলেন, মনে হইল যেন নদীর তরঙ্গমালা তাঁহার পাদবন্দনা করিতেছে। হনুমান তাঁহার হাতে কাপড়-গামছা দিয়া কলসটি নদীতীরে নামাইয়া রাখিল, তাহার পর একটি দেবদারুগাছের শীর্ষে উঠিয়া বসিয়া রহিল। ইহার অব্যবহিত পরেই যাহা ঘটিল তাহাও অদ্ভুত। একটা দুগ্ধ ধবল কুজ্ঝটিকায় নদীর ঘাট অবলুপ্ত হইয়া গেল। সেই মহিমময়ী নারীকে আর দেখা গেল না। রঘুনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না যে ওই কুজ্ঝটিকার অন্তরালে তিনি স্নান সমাপন করিতেছেন! একটু পরেই কুজ্ঝটিকা মিলাইয়া গেল। তিনি স্নান সমাপন করিয়া তীরে উঠিলেন। হনুমানও দেবদারু গাছ হইতে নামিয়া নদী হইতে এক কলস জল ভরিয়া লইল এবং সেটি মাথায় করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। দেবদারু গাছগুলি আবার প্রণত হইল, পাখীর চন্দ্রাতপ আবার আকাশে ভাসমান হইয়া তাঁহার মস্তকে ছায়াপাত করিতে করিতে চলিল। একটা অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য কল্পনা যেন রঘুনাথের বিস্মিত নয়নের সম্মুখে মূর্ত হইয়া মিলাইয়া গেল। ইনিই কি দেবীজি? নিশ্চয়ই ইনিই। এমন অপরূপ লাবণ্য রঘুনাথ আর কখনও দেখে নাই। রঘুনাথ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে যেন্ আলোকের আভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তিনি বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রঘুনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। দেবীজি যে পথে আসিলেন এবং গেলেন সেই পথের দিকেই পা বাড়াইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই দেবদারুর সারি ত ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার দেখিয়াছে, কিন্তু দেবীজিকে আর কখনও দেখে নাই ত! ইনি কে? তাঁহাকে আর একবার দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগিল। কিন্তু ইহাও সে অনুভব করিল, উনি নিজে কৃপা না করিলে দেখা পাওয়া যাইবে না, এখানকার সমস্ত অরণ্য-প্রকৃতি, সমস্ত পশুপক্ষী, এমন কি সর্প পর্যন্ত উঁহার

সেবায় নিযুক্ত। সকলেই যেন উঁহাকে আগলাইয়া রহিয়াছে। সে কি করিয়া দেবীজির সান্নিধ্য লাভ করিবে, কি করিলে তিনি কৃপা করিবেন, এই অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার কি করিয়া দিবালোকে সম্ভব হইল—এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে ক্রমশঃ সেই দেবদারু গাছের সারির কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, দেবীজি যে পথ দিয়া বনের মধ্যে গেলেন, সেই পথে গেলে কেমন হয়? কিন্তু ওই বিরাটকায় হনুমানের চেহারাটা মানসপটে ভাসিয়া উঠিল! সে নিশ্চয় বাধা দিবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। নদীর দিকে চাহিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। যে নৌকাটা তাহাকে নোটের বাক্স দিয়া যায়, সেই নৌকাটা তীরের কাছাকাছি আসিয়াছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া আরও দুইটি নৌকা। পুলিশের নৌকা। কারণ নৌকা দুইটির আরোহীদের সকলেরই মিলিটারী পোষাক এবং হাতে বন্দুক। রঘুনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না যে এত সাবধানতা সত্ত্বেও চমকলালের নৌকা বামালসুদ্ধ ধরা পড়িয়াছে। তিনটি নৌকাই দেখিতে দেখিতে তীরে ভিড়িল। পুলিশ অফিসাররা নীচে নামিয়া তাহার দিকেই অগ্রসর হইল। একজন পরুষকণ্ঠে আদেশ করিল—এই, এদিকে এস। রঘুনাথ আর কালবিলম্ব করিল না—উর্ধ্বশ্বাসে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। দেবীজি যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথেই ছুটিতে লাগিল। আরও দুইবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। বনের মধ্যে কিছুদূর যাইতেই সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই ঘটিল। বজ্রপাতের মতো শব্দ হইল—হুপ্, হুপ্। ঘূর্ণিত লোচন প্রকটিত। দংষ্ট্রা হনুমান এক লম্ফে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল রঘুনাথ—"মা, মা দেবীজি, আমাকে বাঁচান—"

সম্মুখেই একটি পুষ্পিত লতামণ্ডপ ছিল। তাহার ভিতর হইতে দেবীজি বাহির হইয়া আসিলেন এবং হনুমানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহাবীর, কিছু বলো না ওকে। আসতে দাও—"

হনুমান সরিয়া গেল। রঘুনাথ দেবীজির পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—"আমাকে রক্ষা করুন দেবীজি, আমাকে পুলিশে তাড়া করেছে, দয়া করে আমাকে বাঁচান।"

"মহাবীর, দেখ ত কে ওকে তাড়া করেছে—" হনুমান একলম্ফে বাহিরে চলিয়া গেল। রঘুনাথ নিঃশঙ্ক হইল। মহাবীরকে পরাস্ত করিয়া পুলিশের লোক বনে ঢুকিতে পারিবে না, তা সে যত শক্তিমান পুলিশই হোক না কেন।

"তুমি কে? তোমার নাম কি?"—দেবীজি প্রশ্ন করিলেন।

"আমার নাম রঘুনাথ।"

"রঘুনাথ?"

দেবীর কপোল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

"এখানে কি কর ?"

"চাকরি করি—"

"কি চাকরি ?"

রঘুনাথ কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। সে যে জাল নোট পাচার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে, একথা বলিতে তাহার শুধু ভয় নয়, লজ্জাও করিতে লাগিল। মনে হইল দেবীর নিকট মিথ্যা কথা বলাটা কি সমীচীন হইবে ? তাছাড়া উঁহার নিকট সত্য গোপন করা যাইবে কি ? দেবীরা ত অন্তর্যামিনী। সরলভাবে সত্য কথাই বলা ভাল। অকপটে সব কথা সে খুলিয়া বলিল। সর্বশেষে বলিল, "মা, আমি নিতান্ত গরীব। আমার ভাই আমাকে দূর করে দিয়েছে। অভাবে পড়েই আমি এ হীন কাজ করছি। টাকা না থাকলে যে এক পা-ও চলবার উপায় নেই মা—"

দেবীজি প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কত টাকা চাই তোমার ?"

এ প্রশ্নের জন্য রঘুনাথ প্রস্তুত ছিল না। একটু থতমত খাইয়া গেল।

"কত টাকা হলে চলবে তোমার, বল"—পুনরায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

রঘুনাথ ভাবিল, কম করিয়া বলি কেন। ইনি দেবী, ইচ্ছা করিলে অসম্ভব প্রার্থনাও পূর্ণ করিতে পারেন।

বলিল—"অন্ততঃ লাখখানেক টাকা ব্যাঙ্কে না থাকলে আজকালকার দিনে সংসারে স্বচ্ছন্দে চলা যায় না।"

দেবীজির মুখের হাসি আরও প্রসন্ন হইল।

বলিলেন—"আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে—"

রঘুনাথকে লইয়া তিনি গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর গিয়া একটি উন্মুক্ত প্রান্তর পাওয়া গেল। প্রান্তরটি ঘন সবুজ দূর্বায় সমাচ্ছন্ন, চতুর্দিকে তালগাছের সারি। রঘুনাথ সবিস্ময়ে দেখিল, প্রান্তরের উপর একটি সোনার হরিণ চরিতেছে। তাহার মাথায় শাখাপ্রশাখাময় বিরাট সুবর্ণ-শৃঙ্গ। সর্বাঙ্গে সুবর্ণদ্যুতি। দেবীজিকে দেখিয়া হরিণটি আগাইয়া আসিল। দেবীজি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমার শিং দুটো একে দিয়ে দাও। বেচারা গরীব। তোমার শিং দুটোতে যত সোনা হবে তাতে এর জীবন চলে যাবে। দিয়ে দাও ওকে, ও আমার শরণাপন্ন হয়েছে—"

হরিণ যাহা করিল তাহা আরও বিস্ময়কর। সে পিছনের বাম পদ দিয়া দক্ষিণ শৃঙ্গটি এবং দক্ষিণ পদ দিয়া বাম শৃঙ্গটি খুলিয়া ফেলিল। কপালের দুই পাশে দুইটি গোলাকৃতি রক্তাক্ত চিহ্ন রহিল কেবল। হরিণের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আবার চরিতে আরম্ভ করিল।

"ওই দুটো তুমি নিয়ে যাও। দুটোর ওজন দশ-পনের সের ত হবেই। খাঁটি সোনা। আশা করি এতে চলে যাবে তোমার।"

রঘুনাথ নির্বাক হইয়া গিয়াছিল।

"তুলে নাও—"

রঘুনাথ বিরাট শৃঙ্গ দুইটি তুলিতে গিয়া দেখিল, বেশ ভারি। তবু অনেক কষ্টে সে দুইহাতে দুইটাকে ঝুলাইয়া লইল। তাহার পর তাহার মনে হইল—বাহিরে গেলেই ত এখন ধরা পড়িবে। তাছাড়া এই স্বর্ণ-শৃঙ্গের জন্য কি জবাবদিহি দিবে সে? এই অবিশ্বাস্য সত্য কথাটা ত কেহ বিশ্বাসই করিবে না।

সে দেবীজিকে বলিল—"মা, এখানে কোথাও আমাকে কয়েকদিনের জন্যে আশ্রয় দেবেন? এই বড় বড় সোনার শিং নিয়ে ত বাইরে যাওয়া যাবে না। গেলেই একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে। তার চেয়ে আমি এখানে বসে এগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে বাইরে নিয়ে যাব—"

দেবীজি বলিলেন—"আমার গুহায় অনায়াসেই থাকতে পার। সেখানে কুড়ুল কাটারি সব আছে। এস, দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, ভালই হবে, আমি কয়েকদিন থাকব না এখানে, তুমি আমার গৃহস্থালী দেখাশোনা ক'রো। এস—"

দেবীজি অগ্রসর হইলেন। রঘুনাথ অনুসরণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হইতেই প্রশ্নটা রঘুনাথের অন্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ সে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না। আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"মা, আপনার পরিচয় ত দিলেন না, কে আপনি?"

রঘুনাথ নিজের কর্ণকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না।

দেবীজি উত্তর দিলেন—"আমি জনক-নন্দিনী সীতা।"

রঘুনাথ অভিভূত হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত।

তাহার পর বলিল—"কিন্তু রামায়ণে লেখা আছে আপনি পাতালে প্রবেশ করেছিলেন—"

"করেছিলাম। কিন্তু আমার মা বসুন্ধরা বললেন, তুমি ফিরে যাও। পতি-গৃহই নারীর কাম্য স্থান। রামও তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। তুমি ফিরে যাও। তাই ফিরে এসেছি। কিন্তু তাঁকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। শুনেছি এখানে রামরাজ্য স্থাপিত হয়েছে, তিনি নিশ্চয় তাহলে কোথাও আছেন। আমি মহাবীরের সহায়তায় নানা প্রদেশ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি, যদি কোথাও তাঁকে দেখতে পাই। কাল পম্পা সরোবরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে—"

"কিন্তু ওই সোনার হরিণ কি ক'রে এল এখানে—"

"এখানে আসবার কয়েকদিন পরেই ও হঠাৎ আপনা থেকেই এল একদিন। বললে—মা, আমিই আপনার কষ্টের কারণ হয়েছিলাম বলে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। আজ আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, আর আমি পালাব না, আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে থাকব। আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিন। সেই থেকে ও আছে—"

"ও অমন অনায়াসে শিং দুটো খুলে দিলে কি করে ?"

"ও মায়াবী, ও সব পারে !"

তিন

মহাবীরের সঙ্গে সীতা পম্পা সরোবরে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার যাওয়াটাও একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এ যুগে যে ইহা ঘটিতে পারে তাহা রঘুনাথের সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁহাকে বহন করিবার জন্য দিব্যকান্তি পুষ্পকরথ আসিয়াছিল। তাহা প্রাণহীন ধাতু নির্মিত রথ নহে, তাহা সজীব, তাহার আচরণ সম্ভ্রমপূর্ণ।

সে আসিয়া স-সম্ভ্রমে বলিল—"মহাবীরের নির্দেশ অনুসারে আমি এসেছি। কোথায় আপনাকে নিয়ে যাব বলুন—"

"পম্পা সরোবরে—"

দেবী রথের উপর আসীন হইলেন। রথ উড়িয়া গেল। মহাবীর একলম্ফে শূন্যে উঠিয়া রথকে অনুসরণ করিতে লাগিল। মনে হইল, বিরাট একটা ধূসর মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে। সম্ভবতঃ ওই মেঘ পুষ্পকরথকে আবৃতও করিয়াছিল, কারণ পুষ্পক রথকে আর দেখা গেল না।

রঘুনাথ স্বর্ণশৃঙ্গ দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার মনে হইতেছিল—ওজনে অন্ততঃ আধ মণ হইবে। আধ মণ খাঁটি সোনা। লক্ষ টাকার অনেক বেশি পাইবে। কিন্তু মাত্র লক্ষ টাকাতে কি সে সুখে থাকিতে পারিবে ? শুনিতেই লক্ষ টাকা। আজকাল সমস্ত জিনিসপত্র যা অগ্নিমূল্য। একটা সাধারণ মোটরকার কিনিতেই ত হাজার বিশেক টাকা লাগিয়া যাইবে। দেবীজির কাছে আরও বেশি কিছু টাকা চাহিলে ভাল হইত। তাহার পর সে ভাবিল—ওই হরিণটার কাছেই চাহিয়া দেখা যাক না। পায়ের ক্ষুরগুলা যদি খুলিয়া দেয়, আরও কিছু টাকা হইবে। হরিণের শিং লইবার পর সে আর হরিণের কাছে যায় নাই। গুহায় বসিয়া সেগুলিকে ছোট ছোট করিয়া কাটিতেই ব্যস্ত ছিল। ক্ষুরের কথা মনে উদয় হইবামাত্র সে হরিণের সন্ধানে বাহির হইল। গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিল হরিণের শিং দুইটি আবার গজাইয়াছে, ঠিক তত বড় এবং তেমনি সুন্দর শাখা প্রশাখাময়। রঘুনাথ ধীরে ধীরে হরিণের কাছে গেল। ভাবিল, ক্ষুর না চাহিয়া, শিং দুইটাই আবার চাওয়া যাক।

"ভাই হরিণ, তোমার এ শিং দুটোও আমাকে দাও না—"

হরিণ ঘাড় ফিরাইয়া তার দিকে একবার চাহিল, তাহার পর যেমন ঘাস খাইতেছিল, খাইতে লাগিল।

"ভাই হরিণ, দাও না শিং দুটো। তোমার ত আবার গজাবে। দাওনা ভাই—"

হরিণের পিছনের দিকে গিয়া তাহার গায়ে হাত দিল রঘুনাথ। তড়াক্ করিয়া হরিণটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শিং বাঁকাইয়া তাড়া করিল তাহাকে। রঘুনাথ ছুটিতে ছুটিতে গুহায় ফিরিয়া আসিল। সে কেমন যেন অপমানিত বোধ করিতেছিল। একটা হরিণ—তা হউক না সোনার হরিণ—তাহাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা চিন্তা তাহার মনে খেলিয়া গেল। বন্দুকের এক গুলিতে ওটাকে শেষ করিয়া দিলে কেমন হয়! সঙ্গেই ত বন্দুক এবং গুলি আছে। চিন্তাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। তাহার বন্দুকের গুলি যে বারবার ব্যর্থ হইয়াছে একথা সে ভুলিয়া গেল, তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, সমস্ত হরিণটাকে যদি লইয়া যাইতে পারি, কয়েক মণ সোনা পাইব। বন্দুকে গুলি ভরিয়া বাহির হইয়া গেল সে।

হরিণ মাঠের মাঝখানে নির্ভয়ে চরিতেছিল। রঘুনাথ ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা, খুব কাছাকাছি আসিয়া বুকের নিকট গুলি করিবে। খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল রঘুনাথ। হরিণের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যেমন চরিতেছিল, চরিতে লাগিল। খুব নিকটে আসিয়া রঘুনাথ ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। কি অপূর্ব স্বর্ণ কান্তি! কান দুইটা মাঝে মাঝে নাড়িতেছে আলোক ঠিকরাইয়া পড়িতেছে যেন। সমস্ত হরিণটা যদি পায় সে 'মাল্‌টি মিলিয়নেয়ার' হইয়া যাইবে। এদেশে আর থাকিবে না, আমেরিকায় গিয়া আকাশচুম্বী বাড়ী কিনিবে।

গুলি করিবার সঙ্গে সঙ্গে হরিণ অদৃশ্য হইয়া গেল!

তাহার স্থানে আবির্ভূত হইল একটি বিকট রাক্ষস।

রঘুনাথ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

"কে, আপনি—"

"আমি মারীচ রাক্ষস। তুই কি জানিস না, যে আমিই সোনার হরিণের রূপ ধরেছিলাম? পাষণ্ড লোভাতুর, তুই দেবীকে প্রতারণা করেছিস্, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারবি না। দূর হ—"

চুলের মুঠি ধরিয়া মারীচ রঘুনাথকে শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

চূর্ণিত-মস্তক রঘুনাথের মৃতদেহটা পাহাড়ের উপর পড়িয়াছিল। পাশে বন্দুকধারী কয়েকজন পুলিশ অফিসারও ছিলেন।

একজন বলিতেছিলেন—"আমার গুলিটাই ঠিক মাথায় লেগেছিল—"

আর একজন বলিলেন—"আমিও ফায়ার করেছিলাম। হয়ত আমারটা লাগেনি। লোকটা বনে ঢুকে পড়ল কিনা। ওই হনুমানটা তেড়ে না এলে আমি ঠিক বনের মধ্যে ঢুকে জীবন্তই ধরতাম ওকে! আমার কিন্তু আশ্চর্য লাগছে, হনুমানটাকেও গুলি করেছিলাম, কিন্তু তার ত কিছু হল না—"

"মিস করেছিলে—"

"আর একটা কথা। লোকটা বনের মধ্যে ঢুকেছিল, আপনার গুলি যদি ওর মাথায় লেগে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মরবার কথা। ও পাহাড়ে এল কি করে?"

"কোনও জানোয়ার টেনে এনেছে বোধহয়—"

"কিন্তু খায় নি ত?"

"কি জানি!"

অন্তিম উপলব্ধি

সুরেন প্রাণভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের আমবাগানে। বাগানটা গ্রামের বাইরে। সেখানে একটা খোড়ো ঘরও ছিল। সেই ঘরে এসে বসেছিল সুরেন। বসে কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, কেবলি মনে হচ্ছিল, এ কি হল। এত সাধ, এত স্বপ্ন, এত বক্তৃতা, এত উৎসাহ, এত লাফালাফি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সব। হঠাৎ পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হল সে। চতুর্দিকে মেঘঢাকা জ্যোৎস্না। আম গাছগুলো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রত্যেকটি গাছে অসংখ্য জোনাকী। লক্ষ লক্ষ চোখ যেন চেয়ে আছে তার দিকে। তারা যেন উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছে কারও। এ-ও তার মনে হল ওই অসংখ্য চোখে যেন ব্যঙ্গের হাসিও ফুটে বেরুচ্ছে। তারা যেন নীরবে তাকে বলছে ভীরু, তুমি পালিয়ে এলে কেন? ওই গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে লড়তে লড়তে মরতে পারলে না? সহসা ওই অসংখ্য চোখের দৃষ্টি যেন সরব হয়ে উঠল লক্ষ লক্ষ ঝিল্লীকণ্ঠে। প্রশ্ন করতে লাগল তারা।

"ভীরু, তুমি পালিয়ে এলে কেন? পালিয়ে এলে কেন? কেন, কেন, কেন—"

"আমি একা কি অত লোকের সঙ্গে লড়তে পারি!"

"নিশ্চয়ই পার। ইচ্ছে করলে তুমি একাই একশ' হ'তে পার। তোমার দেহটা হয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত কিন্তু তুমি বাঁচতে। রোজ তো গীতা আওড়াও এ কথাটা মাথায় ঢোকেনি এখনও—"

"কিন্তু আমার এই দেহটার জন্যেই তো সব। সমাজ, দেশ, রাজনীতি, সাহিত্য, আত্মীয়স্বজন সবই তো এই দেহটাকে কেন্দ্র করে। দেহটাই যদি না থাকে—"

"তোমার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে তুমি আদিম অসভ্য বর্বর। স্বার্থপরের মতো নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। কিন্তু এটা কি ভুলে গেছ স্বার্থপরতাই শেষ পর্যন্ত সমূহ বিনাশের কারণ হয়? এটা কি জান না যে, পালিয়ে তুমি বাঁচতে পারো না? এখনই যদি ওই গুণ্ডার দল তোমাকে এখানে ঘিরে ধরে, কি করতে পার তুমি! আবার ছুটবে, কতদূর ছুটবে? শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত মরতে হবেই।

পশুর মতো মরতে হবে। তার চেয়ে বীরের মতো মরলে না কেন? যারা স্বার্থপর পশু, তারা যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের অধঃপতন হবেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে যারা মরেছে তাদেরই সম্মিলিত শক্তি শেষ পর্যন্ত টেনে নাবিয়ে দেবে তাকে। ওই দেখ—"

সুরেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। সে চারিদিকে চেয়ে দেখল অসংখ্য জোনাকী তার দিকে চেয়ে যেন সকৌতুকে হাসছে। ঝিল্লীকণ্ঠ অবিশ্রান্ত বলে যাচ্ছে—পালিয়ে এলে কেন! কেন, কেন, কেন—তারপর একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন বিদীর্ণ করে দিলে অন্ধকারকে। একটা পেঁচা ডেকে উঠল। তারপর আর একটা পেঁচা। তারপর আর একটা। সুরেনের মনে হল কিসের যেন একটা প্রস্তুতি চলছে। সামনের ফাঁকা জায়গাটা হঠাৎ বেশী আলোকিত হয়ে উঠল। চাঁদ এতক্ষণ মেঘ-ঢাকা ছিল, সহসা মেঘমুক্ত হল। তারপর কোলাহল উঠল একটা। অসংখ্য লোকের চীৎকার। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাজনা। মনে হল যেন কারা টিন বাজাচ্ছে। পরমুহূর্তে আর সন্দেহ রইলো না। একজন লোক ছুটতে ছুটতে উর্ধ্বশ্বাসে এসে দাঁড়াল সেই আলোকিত স্থানটায়। লোকটার পোষাক-পরিচ্ছদ থিয়েটারের রাজার মতন। কিন্তু বিস্রস্ত। একদিকের জুলফি নেই, খুলে পড়েছে। তার পিছু পিছু ছুটে এল একদল লোক টিন বাজাতে বাজাতে। আর একদল লোক তারস্বরে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল একটা—

খুলে গেছে রাংতা যে ধুয়ে গেছে রং
আর কেন আর কেন মিথ্যে ভড়ং।
বেরিয়েছে মাটি খড়
করে সব নড়বড
আর তো মানাচ্ছে না
থিয়েটারি ঢং
খুলে গেছে রাংতা যে ধুয়ে গেছে রং।

সব টিনগুলো একসঙ্গে বেজে উঠল। হাততালি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল সবাই। থিয়েটারের রাজা এদিক ওদিক চাইতে লাগল। ভাবটা যে ফাঁক পেলে পালাবে। কিন্তু ফাঁক নেই।

তখন আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সে।

"ঠিক করে দেব, ঠিক করে দেব—সব ঠিক করে দেব—" হা-হা করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল সবাই। আবার শুরু হল আবৃত্তি।

পশু কি দেবতা হয় মুখোশ পরে?
মুখোশ যে সরে গেছে চিনেছি তোরে।
ধরা পড়ে গেছ দাদা
বেরিয়ে পড়েছে কাদা

আর কেন আর কেন
পড়না সরে !
পশু কি দেবতা হয় মুখোশ পরে !

থিয়েটারের রাজা কটমট করে চেয়ে রইল এই অদ্ভুত জনতার দিকে। যেন তাদের ভস্ম করে দেবে। কিন্তু কিচ্ছু হল না। আবার উঠল উচ্চ হাসির রোল। আবার বেজে উঠল টিনগুলো। সুরেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার সন্দেহ হচ্ছিল সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। আবার শুরু হল আবৃত্তি।

ফুলিয়ে গলার শির দিয়ে লেকচার
বোকাদের কতকাল ভোলাবে গো আর ?
আসবে দণ্ডদাতা
আসবে ভয়ত্রাতা
দম্ভের গম্বুজ হবে ছারখার
বোকাদের কত কাল ভোলাবে গো আর !

"আমি বলছি সব ঠিক করে দেব। সব ঠিক হয়ে গেছে, তোমরা মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। আমাকে যেতে দাও—"

চীৎকার করে হাত পা নেড়ে বলতে লাগল থিয়েটারের রাজা। কিন্তু কেউ তাকে যেতে দিলে না। আরও ঘিরে ধরল চারদিকে। আরও জোরে জোরে বাজতে লাগল টিন। আরও জোরে জোরে করতে লাগল আবৃত্তি।

এ কথা যে লেখা আছে ইতিহাসময়
শিবহীন যজ্ঞের ধ্বংসই হয়।
দক্ষ পারেনি যাহা
তুমি কি পারিবে তাহা ?
বীরভদ্রের কথা অলীক তো নয়
তার পদাঘাতে সব চূর্ণ যে হয় !

"থাম—থাম—থাম তোমরা"—

কিন্তু কেউ থামল না। হঠাৎ সুরেন লক্ষ্য করল তার জামাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হাতে একটা গুলি লেগেছিল মনে পড়ল। জামাটা খুলে ফেলে ক্ষতস্থানটা সে চেপে ধরল আর একহাত দিয়ে। কবিতার আবৃত্তি চলতে লাগল।

যে কান্না ফেটে পড়ে লক্ষ চোখে
বজ্র হয় যে তাহা রুদ্রলোকে
মহাকাল করে আজ
উদ্যত সেই বাজ
কি করে এখন বল রুকবে ওকে।

ঝরিয়েছ অশ্রু যে লক্ষ চোখে।
পুড়িয়ে ঘরের চাল উড়িয়েছ ছাই
করিয়েছ হত্যা যে পিতামাতা ভাই
ধর্ষিতা রমণীর
ঝরেছে নয়ননীর
সুতরাং ওরে পাপী নিস্তার নাই।
সুদে ও আসলে শোধ হবে পাই পাই।

এর পর অন্ধকার নেমে এলো সুরেনের চোখে! তার মৃত্যু হল। "কই, পালিয়েও তো তুমি বাঁচতে পারলে না?"

একটি যুবক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল। সুরেনের মনে হল তাহলে সে তো মরেনি।

"কে আপনি?"

"আমি ক্ষুদিরাম।"



বনফুল

রচনাবলী ১৪